



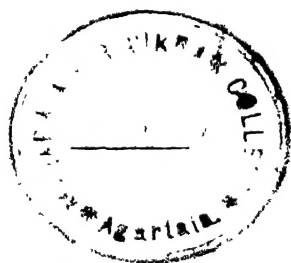




## গ্রন্থাবলী-সিরিজ

# শ্রীমদ্‌ গ্রন্থাবলী

( ଡକ୍ଟରୀ ଡାକ )



সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

# বসুমতী - সাহিত্য - মন্দির

১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, - - - - - কলিকাতা



গ্রন্থাবলী-সিরিজ

# সৌরীন্দ্র গ্রন্থাবলী

( চতুর্থ ভাগ )

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত



শ্রীমতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার স্ট্রীট, “বঙ্গমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত

[ মূল্য ১।।০ দেড় টকা ]

# সূচী

১।	মাতৃখণ	(উপস্থাস)	
২।	সোনার কাঠি	(উপস্থাস)	১২৩
৩।	পুনশ্চ	(গল্প)	১৭১
	১।	দাহ	১৭২
	২।	বিধাতার ইঙ্গিত	১৭৮
	৩।	প্রজাপতির রঙ্গ	১৮৩
	৪।	পল্লী-দর্শন	১৮৮
	৫।	বেঙ্গল-বেহার কাটুনারি	১৯৬
	৬।	ভূতের বাড়ী	২০১
	৭।	সুন্দর মুখ	২০৯
	৮।	আদর্শ স্বামী	২১৫
	৯।	ভ্রমণ-বৃত্তান্ত	২১৮
	১০।	ভগবান্ আছে	২২৮
৪।	হাতের পাঁচ	(কৌতুক-নাট্য)	২৩৫
৫।	নেপথ্যে	(উপস্থাস)	২৫৫
৬।	মনের মিল	(উপস্থাস)	২৭৫
৭।	মৃণাল	(গল্প)	৩০৯
	১।	সুদূর	৩১০
	২।	স্বখাত সলিল	৩১৪
	৩।	চিঠি	৩১৯
	৪।	দাগী	৩২২
	৫।	নিশীথে	৩২৭
	৬।	ফেল-জামিন	৩২৯
	৭।	মুক্তি	৩৩৭
	৮।	বোম্বায় বেকুবি	৩৪৩
৮	দেশের জন্ম	(নভেলট)	৩৪৫
৯	লক্ষ্মীলাভ	(নভেলট)	৩৪৮
১০	বৃষ্টি	(নভেলট)	৩৫০
১১	সহযাত্রী	(নভেলট)	৩৫২
১২	প্রায়শ্চিত্ত	(নভেলট)	৩৫৫
১৩	মুক্তার মালা	(নাটিকা)	৩৫৯
১৪	ছু'দিক	(নাটিকা)	৩৬৪
১৫	নয়া যুগের নাট্য-ঠাট	(নক্সা) ...	৩৭৩
১৬	জাতীয় নাটকের প্লট	(নক্সা) ...	৩৭৮
১৭	মোটরে কাশ্মীর যাত্রা	(ভ্রমণ—৪র্থ পর্ক)	৩৮৮
১৮	রৌদ্র-মেঘে	(কবিতা) ...	৩৯৪

# যাত্রা

( উপন্যাস )

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## পূর্বকথা

“যাত্রা” প্রকাশিত হইল। ১৩১৮ ও ১৩১৯ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় “যাত্রা” ধারাবাহিকভাবে প্রথম বাহির হয়। বর্তমান গ্রন্থে উপন্যাসখানি আগাগোড়া পরিমার্জনা করিয়াছি; স্থলবিশেষ পুনর্লিখিত হইয়াছে।

“যাত্রা” প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক আলফন্স দোদে রচিত ‘জ্যাক’ নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। মূল গ্রন্থের লাইন ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছি, এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। সেরূপ অনুবাদ প্রায়ই নিষ্ফল হয় এবং তাহাতে মূল গ্রন্থের রস একেবারে মারা পড়ে। বর্তমান গ্রন্থে দোদেব প্রধান ভাবটিকে ও প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলিকে মাত্র বজায় রাখিয়া নিজেব ভাবেই আগাগোড়া লিখিয়া গিয়াছি। এ দেশের পাঠকসম্প্রদায় কতখানি গ্রহণ করিবেন, এবং কোন্ অংশ তাঁহাদের নিকট বিরক্তিকর ঠেকিবে, লিখিবার সময় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছি। সে জন্ত দোদেব রচনার অংশ-বিশেষ কোথাও একেবারে পরিবর্তন করিয়াছি; কোথাও বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে লিখিয়াছি। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া যদি কেহ দোদেব প্রতিভাসম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করিয়া বসেন, তাহা হইলে মূল গ্রন্থের অপূর্ণ-শক্তিশালী লেখকব প্রতি তাঁহার অবিচার করিবেন! তবে এ গ্রন্থে দোদেব প্রতিপাত্ত কি, তাহা যাহাতে ঢাকা না পড়ে, সে বিষয়ে আমাব সাধ্যমত যত্নের ক্রটি করি নাই। সে প্রতিপাত্ত কি, তাহার ইঙ্গিত দেওয়া নিম্নয়োজন। সুদী পাঠক সহজেই তাহা ধরিতে পারিবেন। সে বিষয়টি আমাদের এ দেশেও ভাবিয়া দেখিবার যোগ্য; অথচ উক্ত বিষয় লইয়া মৌলিক উপন্যাস লেখার সময় এদেশে এখনও বোধ হয় আসে নাই। এ গ্রন্থ-অনুবাদে আমার অগ্রসর হওয়ার ইহাই প্রধান বৈফিৎ।

এই অনুবাদ-গ্রন্থখানির নাম করণের জন্ত প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কুবর শ্রীমুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এ, বার্ন-এ্যাট-ল মহাশয়ের নিকট আমি কৃতজ্ঞ আছি।

পরিশেষে আর একটি কথা আছে : ‘ভারতী’র ভূতপূর্ব সম্পাদিকা পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর আগ্রহে ও অনুরোধেই বিদেশীয় উপন্যাস-অনুবাদে আমি প্রবৃত্ত হই। তিনি যদি ‘ভারতী’ পত্রিকায় এ গ্রন্থ প্রকাশ না করিতেন, তবে এ কার্যে প্রবৃত্ত হইবার সুযোগ আমার ঘটিত না। এজন্ত তাঁহাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

এখন কি গড়িতে কি গড়িয়াছি, তাহার বিচার বাঙালার সুদী পাঠকের হাতে। ইতি

ভবানীপুর,  
৩রা আষাঢ়, ১৩২২

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বঙ্কুবর

সুকবি

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেশু

# মাতৃখণ

## প্রথম অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

মা ও ছেলে

শীতের কুয়াশা ঠেলিয়া সূর্য্য তখন আকাশেব অনেকখানি উল্কে উঠিয়াছে। একখানি শুদ্ধ ক্রহম আসিয়া প্রকাণ্ড স্থল-বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। একটি বালকের হাত ধরিয়া এক সুন্দরী গাড়ী হইতে নামিল। বালকটি ঈষৎ ক্রুশ হইলেও দেখিতে বেশ সুশ্রী, তাহাব পরিচ্ছদেও একটা পারিপাটা ছিল; বয়স সাত-আট বৎসরের বেশী হইবে না।

রমণী কুশঙ্গী। দেহে বহুম্বা কালো পোষাক, কণ্ঠে পশু-লোমের বেষ্টনী, মাথায় টুপি—জমকালো গাড়ী-ঘোড়া। এ-সকল দেখিয়া তাহাকে রীতিমত বিলাসিনী বলিয়া মনে হয়। সুন্দর কোমল মুখের চারিদিকে সোনালি কেশের গুচ্ছ উড়িয়া পড়িতেছে—রমণী সুভেল বাহু দ্বারা সেগুলি সরাইয়া দিতেছিল। সম্মিত ওষ্ঠ, উজ্জল নীল চক্ষু, গতিতে সুন্দর লীলা-ভঙ্গী, ক্ষুদ্র ললাটে চিস্তাব রেখাটি পড়ে নাই, রমণী অপূর্ণ সুন্দরী। পুঞ্জের হাত ধরিয়া সে স্থল-গৃহে প্রবেশ করিল।

রমণী আসিয়া স্থলের অধ্যক্ষের সহিত দেখা কবিল। বালকটিকে স্থলের বোর্ডিংয়ে রাখিবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হইলে মোটা একখানি খাতা টানিয়া অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন,—ছেলেটির নাম কি?

—জাক।

অধ্যক্ষ কহিলেন,—জাক।...পদবী?

রমণী কহিল,—জাক, শুধু জাক। এর ধর্ম-বাপ বিনি, তিনি ছিলেন ইংরেজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিতে তিনি কাজ করতেন। ভারী নামজাদা লোক, লর্ড পিমবক! বোধ হয়, নাম শুনে থাকবেন। খুব সম্ভাস্ত বংশ! নাচতে গাইতেও ভারী মজবুত! এই সে-বছর সিঙ্গাপুরে তিনি মারা গেছেন! রাজার সঙ্গে বাঘ শিকার করতে গেছিলেন! সিঙ্গাপুরের রাজা, মস্ত রাজা, ভারী বীর! নামটা—আহা, ভুলে যাচ্ছি—মনে ছিল। ঐ যে,—রাণা—কি,—রাণা—ভালো—

অধ্যক্ষ কহিলেন,—ক্ষমা করবেন, জাকের পদবীটা?

রমণী বালকের মুখের দিকে একবার চাহিল। জাকের চোখ ছল-ছল করিতেছিল! ‘মা’ ছাড়া সে কাহাকেও জানে না—মার সঙ্গে মুহূর্তের জ্ঞান কখনও সে ত্যাগ কবে নাই! সে জানে, বোর্ডিংয়ে রাখিবার জ্ঞানই মা তাহাকে আজ লইয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে কাদিয়া কাটিয়া মাকে সে কত মিনতি করিয়াছে, কত বলিয়াছে, মাকে ছাড়িয়া স্থলে সে থাকিতে পারিবে না, মাকে না দেখিয়া একমুহূর্ত সে বাঁচিবে না! কিন্তু মা সে কথায় মোটে কান দেয় নাই! শেষে স্থলে আসিবার সময় মা আশা দিয়াছে, ছুটি হইলেই জাক বাড়ী যাইতে পাইবে—মাও মধ্যে মধ্যে স্থলে তাহাকে দেখিতে আসিবে—কাদিলে কিন্তু মা ভারী রাগ করিবে! তাই জাক অনেক কষ্টে চোখের জলটুকু কোনমতে সামলাইয়া বাখিয়াছে, পড়িতে দেয় নাই।

বুড়া অধ্যক্ষের চোখে ধূলি দেওয়া কিন্তু সহজ নয়। স্থলের কাজে তাঁহার মাথার চুল শাদা হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া পানি সহবে সমাজ-বন্ধন অত্যন্ত শিথিল; উচ্ছৃঙ্খল আমোদ-বিলাসের স্রোতে নর-নারী এখানে গা ভাসাইয়া চলিয়াছে—ইহার মধ্যে ভালো-মন্দ লোক বাজিয়া লওয়া দায়, এই ধারণাই অধ্যক্ষের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া আছে।

রমণীর বেশভূষা ও বাচালতা দেখিয়া বৃদ্ধের মনে কেমন একটা সন্দেহ জন্মিল। রমণীকে নিকন্তর দেখিয়া তাহার মুখের দিকে কুতূহলী দৃষ্টিতে তিনি চাহিলেন, কহিলেন,—তা হলে নামটা কি লিখবে?

বৃদ্ধের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিলে রমণী একান্ত সঙ্কুচিত হইল। তাহার গোলাপের মত গণ্ডঘর গাঢ় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। দৃষ্টি নত কবিয়া সে কহিল,—মাণ করবেন—পরিচয় দিতে ভুলে গেছলুম। বলিয়া পকেট হইতে হস্তিদন্তনির্মিত কার্ড-কেস বাহির করিয়া তাহা হইতে একখানি সুন্দর কার্ড লইয়া রমণী অধ্যক্ষের হাতে দিল। তাহাতে পরিষ্কার ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা ছিল,—

ইদা গু বারালি।

অধ্যক্ষ যুধ হাসিয়া কহিলেন,—নামটা তাহলে জাক

## মাতৃশ্রাবণ

জ বারালি ? বস্তার সুরে কেমন-একটা প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপ ।  
সঙ্কোচ কাটাওয়া রমণী কহিল,—হাঁ ।

অধ্যক্ষ গভীর স্বরে কহিলেন, আমিও তাই বলছি ।

কথাটা বলিয়া অধ্যক্ষ কার্ডখানি হস্তে লইয়া উঠিলেন,  
পরে সম্মুখের শাশি খুলিলেন । বাহিরে গাছপালাগুলার  
উপর সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি তখন ছড়াইয়া পড়িয়াছে ।  
শাশির পশ্চাতে একজন তরুণ শিক্ষক আসিয়া দেখা দিল ।

অধ্যক্ষ কহিলেন,—দ্যাক্ষি, এই ছেলেটিকে একবার  
ওধারে নিয়ে যাও—চারিধার দেখিয়ে আনো ।

জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল । সে ভাবিল, মাতাব  
সঙ্গ ত্যাগ করাইবাব জগ এ বুঝি একটা ছল ! হতাশভাবে  
সে মার মুখেব পানে চাছিল—তাঁহাব চোখ ফাটিয়া জল  
বাহির হইবাব উপক্রম কবিল !

অধ্যক্ষ বুঝিলেন, মিষ্ট স্বরে কহিলেন,—যাও জাক,  
ভয় কি ! তোমার মা এখনই যাচ্ছেন না । ঘুরে এসো ।  
ইনি এখন এখানে কিছুক্ষণ আছেন !

তবু জাক নড়িতে চাহে না । মার পানে চাহিয়া  
মার গা ঘেঁষিয়া আবও সে সরিয়া দাঁড়াইল । মা বলিল,  
“যাও—জাক, ছি । লক্ষ্মী ছেলে যে তুমি !”

তখন কোন কথা না বলিয়া জাক শিক্ষকের সহিত  
চলিয়া গেল ।

জাক চলিয়া যাইবার পূর্ব কক্ষ-মধ্যে কাঁহারও মুখে  
কিছুক্ষণ কোন কথা ফুটিল না । বাহিরে ছাত্রের দল  
খেলা কবিতোছিল । তাহাদের উল্লাস-চৌক্যাব কক্ষমধ্যে  
ভাসিয়া আসিতেছে । কচিং দুই একটা পাগী  
ডাকিতেছে, সেই সব শব্দ এবং অদৃবে পিয়ানোব বন্ধার,  
—এ-সমস্ত মিলিয়া এক সুমধুব মিশ্র বাগিনীব সৃষ্টি  
করিয়াছিল ! শীতের এই ষাতনা-কাতর মুখু মলিন রুদ্ধ  
দিনগুলার মধ্যে যেন ব্যগ্র জীবনের একটা স্পষ্ট আভাস  
পাওয়া যাইতেছে !

অধ্যক্ষই প্রথমে কথা কহিলেন । জাকের কচি মুখ  
ও শাস্ত মধুব ভাব দেখিয়া তাঁহাব প্রাণে কেমন মায়া  
জন্মিয়াছিল । তিনি কহিলেন,—ছেলেটি আপনাকে ভারি  
ভালোবাসে !

মাদাম বারালির যেন চমক ভাজিল । সে কহিল,  
—তা আর বাসবে না ! এত বড় পৃথিবীতে মা ছাড়া ওর  
আর কে আছে, বলুন ! মা ছাড়া কাকেই বা আর ও  
জানে ? বেচারী জাক !

—আপনি বিধবা ?

—হাঁ মশায় ! আমার স্বামী আজ দশ বৎসর হলো,  
মারা গেছেন ! সে এক ভয়ঙ্কর মৃত্যু ! যারা উপজ্ঞাস  
লেখেন, তাঁরা কল্পনার চোখে কত মিথ্যে দুঃখ-যন্ত্রণা দেখে  
বেড়ান—কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, আমাদের এই সাদা-  
সিঁথে জীবনে কি সব অসহ্য দুঃখ-বাতনা আমরা ভোগ

করি ! তা থেকে তাঁদের দশখানা উপজ্ঞাসের খোঁরাক  
জোগানো যেতে পারে । আমাব নিজের জীবনই তার  
মস্ত প্রমাণ ! আমার স্বামী কাউন্ট জ বারালি তুরেনের  
এক কত বড় বংশের—

অধ্যক্ষ চমকিয়া উঠিলেন ! কাউন্ট জ বারালি ! না,  
না, অসম্ভব ! তাঁহার সংশয় বাড়িল—মনের ভাব চাপিয়া  
তিনি কহিলেন,—তবে এই অল্প বয়সেই ছেলেটিকে স্কুলে  
দিচ্ছেন কেন ? এখনও ও ছেলেমাছুষ । তা ছাড়া  
আপনাকে ছেড়ে যখন থাকতে পারবে না... এ বিচ্ছেদ  
ওর সহ্য হবে কি ?

রমণী কহিল,—আপনি ভুল কচ্ছেন ! জাক এ দিকে  
তেমন অবুঝ নয় । তা ছাড়া ওর শরীর ভাল, অসুখ-  
বিসুখ নেই বললেও চলে ! একটু রোগা, এই বা ! তা এ  
পারি সহরেব বন্ধ বাতাসে শরীর আর কি হবে, বলুন ?

অধ্যক্ষ কহিলেন,—তা ছাড়া দেখুন, আমাদের  
বোর্ডিংয়ে এখন এত ছেলে রয়েছে যে, নতুন ছেলে নেওয়া  
আপাততঃ সম্ভব নয় । আস্তে বছর সুবিধে হতে পারে—  
কিন্তু তার জগ এখন থেকে অবশ্য আমি কথা দিয়ে  
রাখতে পারি না ।

রমণী এ ইঙ্গিতের কিছু বুঝিল, কহিল,—তা হলে  
আমার ছেলেকে আপনাবা রাখবেন না ! বেশ, কারণটুকু  
জানতে পারি ?

অধ্যক্ষ বাঁহের দিকে একবার চাহিলেন—চশমা  
খুলিয়া তাহার কাঁচ দুইখানা কমালে সাক করিতে করিতে  
কহিলেন,—শুনবেন ? কিন্তু কারণটুকু না শুনলেই বোধ  
হয় ভাল হতো ! তবে শুনতে যখন চাইছেন, তখন বলতে  
হবে । শুনলে আপনি কষ্ট পাবেন বই—

রমণীর মুখ লজ্জায় দুঃখে রাঙা হইয়া উঠিল ! অধ্য-  
ক্ষের মুখের পানে সতেজে সে চাহিয়া দেখিল । অধ্যক্ষ  
বলিতে লাগিলেন,—কথাগুলো শুনিয়া রমণী একান্ত  
কাতর হইয়া পড়িল—বেদনায় সে কাঁদিয়া ফেলিল !  
হতভাগিনী ! ওগো, সত্যই সে হতভাগিনী ! কেহ জানে  
না, এই দুর্ভাগা পুত্রের জগ কি দুঃখ না তাহাকে সহ্য  
করিতে হইয়াছে !

সত্য ! একথাখুব সত্য ! সত্যই বালকের কোন  
পদবী নাই । পিতা নাই,—ছিল না ! কিন্তু এ কি  
ছেলের দোষ ? পিতা-মাতার কবের একটা পাপের ভার  
মাথায় বহিয়া সারা জীবন তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত  
করিয়া মরিবে, এমনই সে দুর্ভাগা ! রমণী কাঁদিয়া ফেলিল,  
চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল,—দয়া করুন—  
বেচারাকে একটু দয়া করুন আপনি । নিষ্ঠুর হবেন না ।

সে স্বরে কি গভীর নিরাশা, কি মর্শ্বেভেদী অহুতাপ !

অধ্যক্ষ ব্যথিত চিত্তে কহিলেন,—শান্ত হন, আপনি !  
কিন্তু কথাটা নিতান্ত চাপা দিবার নয় । অধ্যক্ষ

## সৌন্দর্য-প্রহাবলী

জানিতেন, তুরেনের এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন বংশ, কি সে কলঙ্ক-কালিমায় আচ্ছন্ন! সে এক গভীর পাপের স্মরণীয় ইতিহাস! বারান্সি পরিবারের প্রতিবেশী এই অধ্যক্ষের আজ আবাব নূতন কবিতা সব কথা মনে পড়িল! কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি অস্থির হইয়া উঠিলেন।

রমণীকে সাস্তনা দিবার কোন কথা নাই! তবু তিনি কহিলেন, এ পাপের শুধু এক প্রায়শ্চিত্ত আছে! আপনি হেলের মা—নিজেব ঘবটিকে ভালো করুন—জীবনের সমস্ত কালি, সমস্ত পাপ দূব কবে নতুন মানুষ হবার চেষ্টা করুন—এ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিছু না। প্রাণপণে ছেলেটিকে মানুষ কবে তুলুন।

কমালে চোখেব জল মুছিয়া রমণী কহিল,—আমারও জীবনের তাই সাধ। জাক এখন বড় হয়েছে, সেয়ানি হয়েছে। সে এ সব কিছু জানে না। তাই ওকে আমি আমার কাছে থেকে দূরে রাখতে চাই। আপনাদের সঙ্গে থেকে, আপনাদের কাছে শিক্ষা পেয়ে ও মানুষ হয়, এই আমার সাধ। আজ যদি আপনারা ওকে ঠাই না দেন, ওজর-আপত্তি করে তাড়িয়ে দেন, তাহলে ও কোথায় যাবে?—মানুষ হবারই বা ওর সম্ভাবনা কোথায় থাকে?

সে কথাটাও অধ্যক্ষ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন। হতভাগ্য বালক! সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, বিকচোগুথ ফুলের মত তাহার এই অমূল শুভ্র নবীন জীবন, বিধাতা এই অমূল্য দান, এমন অনাদরে অবজ্ঞায় ধুলায় লুটাইবে!

তিনি কহিলেন,—ছেলেটিকে নিতে আমি বাজী আছি। কিন্তু দুটি সর্ত্তে।

রমণী কহিল, কি সর্ত্ত, বলুন।

—প্রথম, যতদিন আপনার জীবনের গতি না শোধরায়, ততদিন জাক আপনার বাড়ীতে যেতে পাবে না—মোট ন। দুটির সময়ও সে এখানে আমাদের কাছে থাকবে।

—কিন্তু আমাকে না দেখতে পেলে যে ও মবে যাবে! আহা, জাক! আমাকে ছেড়ে ও যে কোথাও কখনও থাকেনি। এই প্রথম!

—কেন? আপনি মাঝে মাঝে এখানে এসে ওকে দেখে যেতে পাবেন। কিন্তু সে দেখা আমাব ঘরে আমাব সামনে হবে—অজ্ঞ কোনো ঘরে নয়, আর কারও সামনে নয়।

রমণী শিহরিয়া উঠিল! দুটির সময় অপব সকলে আসিয়া যখন তাহাদের পুত্রগুলিকে আদর করিবে, তাহাদের সহিত কত কথা কহিবে—সে তখন আসিতে পাইবে না—আপনার ঐশ্বর্য দেখাইয়া অপরের ঈর্ষা উদ্রেক করিতে পারিবে না! আর ইহাতে জাকই বা

কি মনে করিবে? সে কি লজ্জা—কি অপমান! ইদা সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সারা পারিবার সম্ভ্রান্ত নব-নারীব চিত্তে আপনাব ঐশ্বর্যের জাঁকজমক দেখাইয়া ঈর্ষা জাগাইতে পারিবে না, ইহা একেবারে অসম্ভব!

রমণী কহিল,—এ বড় নিষ্ঠুর সর্ত্ত! আমি কি করে সহ্য করব—বিশেষ আমি তার মা! আর ছেলেই বা কি মনে করবে?

সেই সময় খোলা শাশিব পশ্চাতে পুত্রকে দেখিয়া ইদা চূপ কবিল। পুত্রকে কক্ষে আসিতে সে ইঙ্গিত করিল। জাক আসিল। হাসিয়া মা'র গা ঘেঁষিয়া সে কহিল,—তুমি এখনও আছ, মা! বাঃ! ওরা বলছিল, আছ, তবু আমি মনে কবেছিলুম, তুমি চলে গেছ।

জাকেব ছোট হাতখানি আপনার হাতেব মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া তাহার অধরে চুষন করিয়া ইদা কহিল,—না বাবা—চলো, আমবা বাড়ী যাই! এদের স্কুলে তোমাব পড়া হবে না। এরা রাখবেন না।

কথাটা বলিয়া পুত্রের হাত ধরিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। খাঁচাব পাখীকে বাহির করিয়া দিলে সে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে, মা'র সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এই স্নেহ-হীন পুরুষ কঠিন স্কুলগৃহে থাকিতে হইবে না, ইহা শুনিয়া জাকেব ক্ষুদ্র হৃদয়খানি ঠিক তেমনই আনন্দে ভরিয়া উঠিল!

ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে অধ্যক্ষ কহিলেন, আহা, বেচরা! ছেলেটি! কথাটা জাকেব কাণে গেল। তাহার বুকটা চাঁৎ করিয়া উঠিল।

বেচা'বা? সে বেচা'রা! কেন?

কথাটা তাহার অন্তরে দীর্ঘ একটা কালির রেখার মত গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া গেল।

অধ্যক্ষ ঠিক বুঝিয়াছিলেন। এই কাউন্টেন্স দ্য বাবান্সি সত্যই ছদ্ম নাম। এই রমণী মাদাম বাবান্সি নহে—ইদাও তাহার প্রকৃত নাম নয়! কে তবে এই রমণী? এক গভীর রহস্যের জাল তাহার চারিদিকে বিছানো রহিয়াছে! প্রতিবেশীরা কেহ তাহার পরিচয় জানে না। এই বিলাসিনী চবিত্র-সীনা রমণীর দুর্ভেদ্য অতীত রহস্যের কোনরূপ একটা মীমাংসা এ-পর্যন্ত কেহ করিতে পাবে নাই! এক-একটা লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্ধাপিণ্ড যেমন সহসা অন্ধকারের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়া কোথায় পৃথিবীর গানে বরিয়া পড়ে, এ যেন তাহারই মত পারি লহরের বৃকে সহসা কোথা হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে!

গাড়ীতে মাতা-পুত্র কিছূক্ষণ কোন কথা হইল না! সহসা জাক ডাকিল, মা!

ইদা কহিল, কেন জাক?

তুমি কথা কইচো না কেন, মা?

ইদা কহিল, তো'র জন্ম আমার কি কষ্ট, তা তুই



জানিস না, জাক! যৈদিন তুই প্রথম এসেচিস, সেই-  
দিন থেকেই যে আমি কি বাতনা পাচ্ছি!

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! জাকের মুখে বিবাদের একটা  
কালো ছায়া পড়িল। মুখ তুলিয়া সে কহিল, আমি তো  
কিছু করিনি, মা!

জগতে জাক শুধু একজনকে জানে, একজনকে  
ভালোবাসে—সে একজন আব কেহ নয়, তাহার এই মা!  
সেই মার মনে সে ব্যথা দিয়াছে! জাকের বুক যেন  
ফাটিয়া গেল! ফুঁপাইয়া সে কাঁদিয়া উঠিল। মায়ের  
প্রাণ এ দুঃখে স্থির রহিল না। ইদা বলিল,—ছিঃ, দুষ্ট  
ছেলের মত কাঁদে কি! আমি তোমায় ক্ষেপাচ্ছিলুম  
যে! ছিঃ, চুপ কর—সোনা আমার, মানিক আমার!  
না, না, তোমাকে পেয়ে আমি স্নেহে আছি! বড় স্নেহে  
আছি! আব কে আমাব আছে, জাক? আমারই  
দোষ—না,—তুমি কিছু জানো না—ফুলের মতই সুন্দর  
নিষ্পাপ তুমি!

জাককে বৃকের মধ্যে টানিয়া ইদা বাব বার তাহাব  
মুখে চুষন করিতে লাগিল। সে আদরে জাকের সকল  
কষ্ট, সকল অভিমান নিমেষে দূর হইয়া গেল। মাব  
বুকে মুখ বাখিয়া আনন্দ-গদগদ স্ববে-জাক ডাকিল, মা—  
গাড়ী আসিয়া বাটার দ্বাবে দাঁড়াইল। দাসী কস্তা  
ছুটিয়া আসিল। জাককে দেখিয়াই তীব্র স্বরে সে কহিল,  
এ কি! তুমি কিরে এসেচো? নাঃ, ভাবী দুষ্ট হয়েছ,  
তুমি! পাহারওলা দিয়ে তোমাকে স্কুলে পাঠাতে হবে  
দেখছি। আর মাও অমনি তেমনই,—কিছু বলবেন না  
তো! আদব, খালি আদব!

ইদা কহিল,—না, না, কস্তা, ওর কোন দোষ নেই!  
তারা ওকে স্কুলে নিলে না যে—বুঝতে পাচ্ছিস?  
এমনভাবে অপমান করলে—

ইদার চোখ জলে ভরিয়া আসিল! সে ভাবিল, এমন  
কি অপরাধ সে করিয়াছে যে তাহাব ভাগ্যে এত দুঃখ,  
এমন লাঞ্ছনা!

জাককে বৃকেব কাছে টানিয়া কস্তা কহিল,—স্কুলে  
নিলে না, তাতে কি হয়েছে? আব কি স্কুল নেই?  
ভাবনা কি! কিন্তু আশ্পর্শা ছাখো একবার! এইসেদিন  
ডিক বলছিল, যেখানে কাজ করতো, ওর সেখানকার  
সেই মনিবের ছেলে এক স্কুলে পড়ে,—খাসা স্কুল সে,  
মাইনে কম। সেই স্কুলের আমি খোঁজ নিচ্ছি। দাঁড়াও  
তো!

ইদা বলিল,—সে কাল তখন ভেবে দেখা যাবে!  
এখন খাবার দে, জাকের কিদে পেয়েছে। অনেক ক্ষণ ও  
খায়নি। আহা, মুখখানি শুকিয়ে গেছে। জাক—

—মা—বলিয়া জাক মাব কাছে আসিল। মা জাকের  
মুখে চুষন করিয়া আবার ডাকিল,—জাক!

—কেন মা?

—বাবা—

ইদা দুই হাতে জাককে বৃকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।  
তাহার মুখে আব একটু কথা ফুটিল না! সে ভাবিতে-  
ছিল, পাণের কি এমনই তেজ যে এ-ভগতে তাহার জ্ঞান  
কখনও থামিবে না? এই সুন্দর অবাধ বালক, সে কেন  
অপরের জন্ত কষ্ট পায়? সে তো নির্দোষ, অকলঙ্ক, তবু  
মামুষের এমন বিচার, এমনি তাহার জ্ঞানের দণ্ড!  
জাক মাব দেহের উপর ভর দিয়াছিল—সে অত্যন্ত শ্রান্ত  
হইয়া পড়িয়াছিল—অল্প তন্দ্রাও আসিতেছিল। তন্দ্রার  
ঘোরে স্বপ্নে সে শুনিল, করুণ স্বরে যেন কে বলিতেছে,  
—আহা বেচার! বেচার ছেলেটি!

## দ্বিতীয় পরি

### নূতন স্কুল

পাবি সহবের এক প্রান্তে কতকগুলি জীর্ণ প্রাচীন  
অট্টালিকাব পশ্চাতে একটা সরু গলি বাকিয়া গিয়াছে।  
সেই গলিতে কয়েকখানা কুটার; কুটারগুলিতে কুলি,  
সহিস, কস্মাঘেবী ভৃত্য-সম্প্রদায় এবং দরজী ও শ্রমজীবীদের  
বাস। সকালে সন্ধ্যায় কুঞ্জী কদাকার বালকগুলাব  
খেলার দাপটে ভ্রমলোকের পক্ষে সে পথে চলা দায় হইয়া  
ওঠে। বড় গাড়ী সে গলিব পথে চলিতে পারে না, এবং  
এ পথে আসিবার প্রয়োজন তাহাদের বড়-একটা ঘটিয়া  
ওঠে না।

এমনই গলিব মধ্যে এক স্কুল-গৃহ। নাম, 'মোরোনুভা  
জিমনাজ'। বাড়ীটি যেমন জীর্ণ, অধিবাসীদের জীবনও  
তেমনই। প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় যখন নানা-  
বেশধাবী শীর্ণকায় কুংসিত বালকেব দল তাড়াইয়া স্কুলের  
অধ্যক্ষ গৃহে ফিরিত, তখন তাহাদের চাল-চলনে দর্পের  
যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও ভিত্তবকার দৈন্যটুকু কিছুতেই  
চাকা পড়িত না। কিন্তু পল্লীর মধ্যে সে দৈন্য বুঝিবার  
লোক ছিল না, ইহাই ছিল আশ্বাসেব কথা! মাদাম  
বারান্সি স্বয়ং আসিয়া যদি এ স্কুল-গৃহ প্রত্যক্ষ করিত,  
তাহা হইলে বেচার জাক কখনই এই অন্ধকার গহবরে  
নিষ্কিপ্ত হইত না! কিন্তু জাককে লইয়া ইদা আজ  
এখানে আসে নাই, জাকের সঙ্গে আসিয়াছিল, দাসী কস্তা!

বহির্দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ ছিল! সহসা দিবা  
দ্বিপ্রহরে সে দ্বারে কড়াঘাতের শব্দ শুনিয়া অধ্যক্ষ  
মোরোনুভা বিস্মিত হইয়া উঠিল! সে যেন উদ্ভ্রান্ত  
হইল! এ কি স্বপ্ন! কিং না, ঐ যে দ্বারে কে আবার  
ঘা দেয়! চাবির গোছা লইয়া মোরোনুভা দ্রুত দ্বারের  
দিকে চলিল।

ঘর মুক্ত হইলে কস্তা ও জাক ভিতরে প্রবেশ করিল।

নদীতে জোয়ার আসিলে ভিতরের জল যেমন স্রোতের বেগে কাঁপিয়া ওঠে, সারা স্কুলগৃহে তেমনি একটা আনন্দের স্পন্দন বহিয়া গেল।—ডুয়িং-কমে আগুন আনো—শব্দে স্কুলগৃহ সহসা কাঁপিয়া উলিয়া উঠিল। জাক ও কস্তাকে আনিয়া মোরোন্ডা ডুয়িং-কমে বসাইল। এক কুক্ষকায় কাফ্রি বালক আসিয়া আগুন জালিয়া দিল।

বেশিতে দেখিতে ভিড় ভমিয়া গেল। বহুদিন পবে জীর্ণগৃহের সংস্কার হইলে চাৰিধার যেমন একটা নূতন স্রীতে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, সকলের মুখে তেমনই একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল।

কস্তার সহিত মোরোন্ডার কথাবার্তা আবস্ত হইল। ‘জিম্-নাজ্ মোরোন্ডা’র নাম শুনিয়া ছেলেটি বাহাতে মাহু হইয়া, এই ভরসায় জাককে মোরোন্ডার তত্ত্বাবধানে রাখিবার জন্ত তাহার আগমন হইয়াছে।

মাদাম মোরোন্ডা অত্যধিক আত্মীয়তা দেখাইবার লোভে বলিয়া উঠিল,—ছেলেটির চোখহুটি দেখেচো! একেবারে ছবছ মার মত।

একটা তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টি মাদামের মুখে স্থাপিত করিয়া জাক বলিল,—ও আমার মা নয়—ও ঝী!

মাদাম মোরোন্ডা অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল।

তখন দর-দস্তুর চলিল। মোরোন্ডা কহিল,—এখানে বেশী ছেলে নেওয়া হয় না। নম্বরে বেশী হলে ছেলেদেব তেমন তদ্বির হয় না—লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয়। তা ছাড়া এখানে মন আর শরীর দুয়েরই শিক্ষা দেওয়া হয় কি না, সে জন্ত দাম একটু বেশী পড়ে। বহুবে একশ’ কুড়ি পাউণ্ড দিতে হবে—তা ছাড়া কাপড়-চোপড় বা লাগে।

তার পর স্কুলের অপূর্ব পবিচয় দেওয়া হইল। উচ্চারণ দুরন্ত করিতে এবং সর্বপ্রকারে আদব-কায়দা শিখাইতে এমন স্কুল আর হুটি নাই! আর স্নেহ-যত্ন! ছাত্রেরা স্কুল-গৃহটিকে ঠিক বাড়ীর মত মনে করে! স্কুল ছাড়িয়া নড়িতে চাহে না! মোরোন্ডা কহিল,—এক রাজপুত্রের আবার এখানে পড়ছে!

চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া কস্তা কহিল,—রাজপুত্র?!

মোরোন্ডা কহিল,—হাঁ, রাজপুত্র! বুঝলে জাক, রাজার ছেলের সঙ্গে তুমি পড়বে, এখানে! দাহমির রাজপুত্র! মাহু যখন সে রাজ্যের রাজা হবে, তখন এখানকার শিক্ষার জন্ত চিরকাল সে কৃতজ্ঞ থাকবে!

কথাটা শুনিয়া জাক একটু আনন্দিত হইল! রাজপুত্র! মার কাছে সে কত পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প শুনিয়াছে। রাজপুত্রকে দেখিবার জন্ত কত দিন তাহার সাধ হইয়াছে, কিন্তু কখনও দেখা মিলে নাই।

এখানে সেই রাজপুত্রের সহিত সে একত্র পড়িবে! না জানি, কোন্ পরীকল্পার স্নিগ্ধ সরস প্রেমের স্তম্ভের নির্মল ধারায় এই রাজপুত্রের হৃদয়টুকু অভিযুক্তিত!

কস্তা বলিল, তা হলেও একটা ছোট ছেলের জন্ত বহুরে এত টাকা!

মোরোন্ডা বাধা দিয়া বলিল,—তাব জন্ত তাড়া কি! এক কিস্তিতে না পারো, দু কিস্তিতে টাকাটা দিলেও চলবে।

কিন্তু তাড়া যথার্থই ছিল!

সমস্ত বাড়ীখানাই সে কি-এক করুণ সুরে সাহায্য চাহিতেছিল। ভগ্ন টেবিল-চেয়ার, জীর্ণ দেওয়াল, ছিন্ন মলিন কার্পেট, মোরোন্ডার দারিদ্র্য-জীর্ণ বিস্ত্রী পোষাক, অর্দ্ধপূর্ণ অন্নের পাত্র দারুণ দুঃখে আশ্রয় মাগিতেছিল। এ দৈন্ত ঘুচাইবার উপায়ও ছিল না। যেমন করিয়া হউক, যেখান হইতে হউক, চাই, চাই, সাহায্য চাই, ভিক্ষা চাই!

এই জীর্ণ গৃহ, শিক্ষকগণের দীন-মলিন বেশ, চারিধারে এই বিষম নিবানন্দ ভাব দেখিয়া জাকের প্রাণ কেমন আতঙ্কে শিচরিয়া উঠিল! তাহার বরাবর মনে পড়িতেছিল, সেই স্কুল-বাড়ীর কথা—যেখানে মার সহিত সেদিন সে গিয়াছিল। শিক্ষকদের সম্মিত প্রফুল্ল মুখ, স্তম্ভের সম্মিত বাড়ী, সঙ্গী ছাত্রগণের মুক্ত স্বচ্ছ আনন্দ-কোলাহল, সে কি মধুর! কেন সে সেখানে থাকিতে পাইল না?

মোরোন্ডা তখন একখানি বাঁধানো মোটা খাতা লইয়া কি লিখিতে বসিল। কস্তা মাদাম মোরোন্ডার সহিত কথা কহিতে কহিতে জাকের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। কস্তার কথা শুনিতে শুনিতে মাদাম মোরোন্ডা বলিতেছিল,—আহা, বেচারী, বেচারী ছেলেটি!

বেচারী ছেলে! ইহারাও বলে, সেই কথা! কেন,—কেন? সে কি কবিয়াছে যে পৃথিবীর সকল প্রাণীর নিকট আজ সে এতখানি করুণার্থ হইয়া পড়িয়াছে! এ অবাচিত করুণা, এই অনাহুত সহায়ভূতি জাক চাহে না! তবু কেন এ বিড়ম্বনা!

কস্তা পকেট হইতে নোটের তাড়া বাতির করিয়া মোরোন্ডার হাতে দিল। চারিধারে শিক্ষকগণের চক্ষু হইতে একটা লোলুপ অধীর দৃষ্টি নোটগুলার উপর যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। কস্তার সহিত শিক্ষকগণের আলাপ-পরিচয় হইল। ইনি আচার্য্য লাবান্ত্রাজ্ সঙ্গীত-শিক্ষক! ইনি ডাক্তার হার্ভজ্ বিজ্ঞানের অধ্যাপক,—মুখখানা কুকুরের মত দীর্ঘ; কুঞ্জী, চক্ষু চশমার আবরণে মগ্নিত, শীর্ণ দেহ! ইনি আর্জান্ট—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কবি, নিভৃতে শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন—সাহিত্যের অধ্যাপক।

দলের মধ্যে দেখিতে যদি কেহ স্ত্রী থাকে, তবে সে এই আজ্ঞাস্ত! কিন্তু ইহাকে দেখিয়া জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল! তাহার চোখে যেন হিংসার তরল প্রবাহ বহিতেছে! জাকের মনে হইল, এ যেন কোন ভীষণ শত্রু—পরী-কাহিনীর সেই দৈত্যের সম্মুখে সে আসিয়া পড়িয়াছে!

হায়, জীবনের কত দুর্দিনে তাহাকে এই আজ্ঞাস্তর চোখের বিষে জর্জরিত হইতে হইবে! সুদূর ভবিষ্যৎ ক্ষিপ্ত একটা বিদ্যুৎচুম্বকের মত জাকের সমস্ত অন্তর চিরিয়া তাহার রেখাপাত করিয়া গেল!

মোরোনভা জাকের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ডাকিলেন,—তাহলে এসো জাক!

কস্তা! যাইবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে উঠিতে দেখিয়া জাকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল! কস্তার উপর তাহার এতটুকু টান ছিল না, কিন্তু তবু জাকের মনে হইতেছিল, কস্তা! বাড়ী যাইবে। সেই বাড়ী,—যেখানে মা আছে, কত আদর-স্নেহেব সম্ভার লইয়া মা বসিয়া আছে, কস্তা! সেই মার কাছে ফিরিয়া যাইবে! কিন্তু সেই মার কাছে যাইবার তাহার আজ আর কোন পথ নাই! সে স্নেহ-ভরা ভবনেব দ্বার তাহার সম্মুখে আজ রুদ্ধ! সে আনন্দ-উল্লাসের সহিত সকল সম্পর্কই তাহার ফুরাইয়াছে! আহা, সে যদি জাক না হইয়া কস্তা! হইত। এখানে মিষ্ট কথা বলিতে কেহ নাই, আদর করিতে কেহ নাই! চারিদিকেই বিচারকের অপ্রসন্ন অকরণ মুখ—না আছে ভালোবাসা, না স্নেহ!

কস্তার হাত ধরিয়া জাক বলিল,—কস্তা! মাকে আসতে বেলো—

—তা বলবো। মা আসবেন। কিন্তু তাই বলে তুমি কেঁদো না, জাক!

জাকের চোখে বান ডাকিয়াছিল। কিন্তু এতগুলি লোক ব্যগ্রভাবে তাহার দিকে চাহিয়া আছে—ইহাদের বিজ্ঞপ ও হীন কৌতুকের মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিবে, এ কথা মনে হইতে আপনাকে সে সতরণ করিল। কস্তা! চলিয়া গেল।

বাহিরে অবিশ্রাম তুষার বর্ষণ হইতেছিল।

মোরোনভা আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া নিতাই আদালতে যাইত, কিন্তু মক্কেলের সহিত সাক্ষাৎ-লাভ তাহার বড়-একটা ঘটনা উঠিত না! একদিন সহসা এক মক্কেল আসিয়া মোরোনভার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। প্রাণপণে পবিত্রম করিয়া কাগজ-পত্র ও বক্তব্য ঠিক করিয়া হাকিমের সম্মুখে উঠিয়া যখন সে বক্তব্য শুরু করিল, তখন হাকিম ও সহযোগী উকিলের দল তাহার

অভূতপূর্ব ভঙ্গী দেখিয়া কৌতুকে হাসিয়া এমন শ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, পরদিন হইতে আদালতের ভূমি স্পর্শ করিতে মোরোনভার সাহসে কুলাইল না! তার পর সহসা সে একদিন সাহিত্য-সেবা দ্বারা নাম ও অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সে পক্ষও নিতান্ত কঠিন দেখিয়া ত্যাগ করিতে হইল! তাহার পর কি করিবে ভাবিয়া যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, তখন একটা ছোট স্কুলে তাহার শিক্ষকতা জুটিল।

দে কস্তেয়ার বংশের তিন ভগ্নীর পরিচালিত এক স্কুলে আসিয়া একদিন সে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিল এবং অচিরকাল-মধ্যে কনিষ্ঠাটির প্রেমে পড়িয়া তাহাকে বিবাহ করিয়া বসিল। বিবাহেব পব অপর দুইটি ভগ্নী স্কুলের সম্পর্ক ত্যাগ করিলে মোরোনভা ও মাদাম মোরোনভা স্কুলেব স্বত্বাধিকার পাইল। স্কুলেব নাম হইল, জিম-নাজ্ মোরোনভা। ক্রমে জীর্ণ দেওয়ালে রঙ ফিরাইয়া, বিজ্ঞাপনেব জমক লাগাইয়া স্কুলেব উন্নতি-সাধনে তাহার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। মোরোনভার কয়েকটি পূর্ব-পরিচিত বন্ধু,—কবি-বৈজ্ঞানিকের দল আসিয়া ক্রমে সে স্কুলে যোগ দিল। জানজিবাব, মবক্কো প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর ছাত্র বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া জিম-নাজ্ আসিতে লাগিল। কিন্তু জিম-নাজ্‌র পরিচয় যখন একটু প্রসারিত হইল, তখন ছাত্রের দল আবার কমিতে লাগিল; এবং কমিয়া শেষে ক্রমে আটটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই আটটি ছাত্র লইয়া স্কুল যখন আর চলিতে চাহে না, ঠিক এমনই দুর্দিনে জাক আসিয়া মুম্বু স্কুলে নবজীবনের সঞ্চার করিল।

মোরোনভা কহিল,—নূতন ছেলের খাতিরে আজ ছুটি! রাত্রে ভোজ।

করতালি ও আনন্দধ্বনির সহিত সকলে নূতন ছাত্রের মঙ্গল কামনা করিল।

সে রাত্রে আলোকের নিষ্কণ্টক ঔজ্জ্বল্যে ও আহাবের প্রাচুর্য্য-ঘটায় স্কুল-গৃহে যে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল, তাহার স্পর্শে বহুদিন-সঞ্চিত দৈন্তের কালিমা নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। জিম-নাজ্-বাসী বহুদিন এমন আহার, এমন আনন্দের স্বাদ পায় নাই!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভাগ্যচক্র

প্রকাণ্ড একতলা বাড়ী—কোথাও একটা জানালা নাই—উপরে কাঁচের শাশি-ঘেরা আলোক-পথ—এইটিই ছিল, জিমনাজ্ মোরোনভার ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের পার্শ্বে ভাড়াটিয়া গাড়ী-বোড়ার এক আস্তাবল। দিবারাত্র

তথায় ঘোড়ার পায়ে শব্দ উঠিতেছে—মুহূর্ত্ত বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে উতলা বাতাসে একটা উৎকট হুগুগ ভাসিয়া আসে। ঘরটার পূর্বে এক ফটোগ্রাফারের আড্ডা ছিল, এখন জিম-নাজ্ মোরোন্ভার অধ্যক্ষগণের হাতে পড়িয়া ইহা এক অপূর্ণ শিক্ষা-নিকেতনে পরিবর্তিত হইয়াছে। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে বৌদ্ধের তেজ এবং শীতের বাত্রে হিমের উৎপাত, ইহার কোনটা হইতে নিষ্কৃতি ছিল না! ছাত্রের দলকে দুইটা অসুবিধা সমানে ভোগ করিতে হইত। উপায়ান্তর ছিল না।

এই ঘবে কুড়িখানি খাটিয়া পাতা, তাহার মধ্যে দশটিতে বিছানা পড়িয়াছে। ঘাবেব নিকট একখণ্ড জীর্ণ কার্পেট বিছানো! মোরোন্ভা বলিত, ইহাব অধিক ব্যবস্থা ঠিক হইবে না, কাবণ, ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন কবাই সম্ভব।

কিন্তু এতখানি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য বালকদের স্বাস্থ্যেব পক্ষে অমুকূল দাঁড়াইল না। সাংসারিতে ঘবে পোকা-মাকড়ের যথেষ্ট উপদ্রব ছিল। তাহাব উপব চিম ও বৌদ্ধের নিববচ্ছিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। বাত, কাদি, জ্বব ছাত্রদের শরীরে লাগিয়াই আছে—তাহাব উপব ঘোড়াব খুবব শব্দে স্নানদ্রাবও উপায় ছিল না। অসহায় ছাত্রের দল এসকল কষ্ট নীরবে সহ করে।

প্রথম বাত্রে জাকের চোখে ঘুম আসিল না। বাড়ীতে তাহার সেই শীতাতপিত স্ব-উষ্ণ আলোকোজ্জ্বল সজ্জিত ছোট ঘরখানি! তাহাব তুলনায় এ যেন অন্ধকাবময় এক ভীষণ গহবর।

বালকের দল শয়ন করিলে এক কাক্ত্রী বালক আসিয়া কক্ষের আলো লইয়া গেল। সকলে ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল, কিন্তু জাকের চোখে ঘুম আসিল না।

তুষারকণা-পবিবাপ্ত কাচের মধ্য দিয়া যেটুকু স্নীণ আলো আসিতেছিল, তাহারই সাহায্যে জাক দেখিল, পাশাপাশি খাটিয়াতে কতকগুলো যেন কঞ্চলেব পুঁটুলি পড়িয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে নিখাস ও নাসিকার ধ্বনি এবং থাকিয়া থাকিয়া কাসির শব্দ জাগিয়া উঠিতেছে। সে যেন মানব-জীবনের এক করুণ কাহিনীর শোচনীয় পৃষ্ঠা।

জাকের শীত বোধ হইতেছিল। এই অনভ্যন্ত জীবনের প্রবেশ-দ্বারে এক বিচিত্র কোঁতুল তাহাকে কেমন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দিনের ঘটনাস্তলা তাহার যেন স্বপ্নের মত মনে হইতেছিল! মোরোন্ভার সাদা টাই, হার্ড্জের প্রকাণ্ড চশমা এবং মলিন জামা, এবং সর্বোপরি 'শত্রু' সেই গরিত বিষদৃষ্টি—জাকের প্রাণ-টাকে ত্রাসিত করিয়া তুলিল। মার কাছে ছুটিয়া বাইবার জন্ত প্রাণ তাহার অধীর আকুল হইয়া

উঠিতেছিল। এমন সময় দূরের ষড়িতে এগারোটা বাজিল। মা এখন কি কবিত্তেছে? নিশ্চয় এখন থিয়েটারে। না, বোধ হয় নাচে। কিন্তু এখনই ফিরিয়া আসিবে—গলায় সেই কারের বেটনী, মাথার টুপিতে লেশের ঝালর।

বাত্রে গৃহে ফিবিয়া জাকের বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া মা ডাকিত,—জাক, ঘুমিয়েছ!

কি মিষ্ট, মধুর, সে স্বব! নিদ্রাতেও মার উপস্থিতি কেমন সহজে বুদ্ধিতে পারিত! মার স্পর্শে তাহার যেন দিয়া দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিত—এব স্বপ্ন-জাগরণে মার কোমল স্তন্যর মুখখানি তাহার চোখেব সমুখে জাগিয়া থাকিত। মা চলিতেছে-ফিরিতেছে, চতুর্দিকে যেন দীপ্ত ঔজ্জ্বল্য, বাল-সুখের একটা স্নিগ্ধ রশ্মিচ্ছটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। স্বর্গ হইতে যেন কোন্ দেবী নামিয়া আসিয়াছে! কিন্তু আজ?

দিনেব বেলা অধ্যক্ষ ও শিক্ষকগণের অতিরিক্ত মনোযোগ ও অনর্থনাব ঘটায় বাড়ীব অভাব জাককে ততখানি কাতব করিতে পারে নাই। তাহাব উপর নূতন সহচবগণের সহিত খেলা-ধূলায় সময়টুকু বেশ কাটিয়া গিয়াছে।

এখন একটা কথা জাকের মনে পড়িল। রাজপুত্র,—দাহমির বাজপুত্র! কোথায় সে? ছুটিতে বাড়ী গিয়াছে কি? রাজপুত্রের সহিত একবার দেখা হইলে জাক তাহার সহিত তখনই ঘনিষ্ঠতা করিয়া ফেলিবে—বন্ধুত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে আপনাকে ধরা দিবে। বিছানায় শুইয়া জাক কেবলই ভাবিতেছিল, কোথায় এই রাজপুত্র!

কক্ষ বাটার অপর কক্ষ হইতে মধ্যে মধ্যে বাতের একটা ঝঙ্কার উঠিতেছিল! লাবাস্ত্রান্দ অর্গিণ বাজাইতেছে—পার্শ্বে অশ্বের খুরোখিত শব্দে ঘরের দেওয়াল অবধি কাঁপিয়া উঠিয়াছে। জাক বিছানায় শুইয়া তাহাই শুনিতেছিল। ক্রমে চারিধার নিস্তব্ধ হইয়া আসিল!

এমন সময় সেই কাক্ত্রী বালক লণ্ঠন-হস্তে কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিল। জাক মাথা তুলিয়া দেখিতেই কাক্ত্রী বালক কহিল,—এ কি, তুমি ঘুমাও নি?

মুহু নিখাস ফেলিয়া জাক বলিল,—না, ঘুম আসছে না!

বিজ্ঞের মত সুরে কাক্ত্রী বালক কহিল,—নিখাস ফেলচো! নিখাস ফেললে হুং অনেকটা ক্রমে বটে। গরীব লোকে যদি এই নিখাসটুকু না ফেলতে পারতো, তা হলে হুংখে বোধ হয় তাদের বুকখানা কেটে যেত!

লণ্ঠন রাখিয়া কাক্ত্রী বালক জাকের শয্যার পার্শ্বে একটা কঞ্চল বিছাইল, পবে তাহাতে বসিয়া সে কহিল,—উঃ, বাইবে কি ভয়ঙ্কর বরফ পড়ছে!

জাক কহিল,—তুমি এখানে শোবে? ঐ শুধু কঞ্চলের উপর? চাদর?

কাকী বালক উত্তর দিল,—না—আমি কালো মাহু।  
চামরের দরকার নেই।

কথাটা বলিয়া কাকী বালক মুহু হাসিল। পরে  
বুকের মধ্য হইতে হস্তদস্ত-নির্ধৃত ছোট একটি কৌটা  
বাহির করিয়া সসন্ত্রমে সেটিতে চুখন করিয়া সে শুইয়া

জাক কহিল,—বাঃ—মেডেলটা তো তারি মজার  
দেখতে।

কাকী বালক কহিল,—এ মেডেল নহ্ন—এ আমার  
প্রিথি।

“প্রিথি”র অর্থ জাকের ঠিক বোধগম্য হইল না। সে  
ভাবিল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন করিবার জন্ত বৃষি কোনরূপ  
একটা মন্ত্র-পুত মাহুলি।

বালক কহিল, দেশ ছাড়িয়া আসিবার সময় পিশি  
ক্যারিকা তাহার কণ্ঠে এই মাহুলি পরাইয়া দিয়াছে।  
পিশি ক্যারিকা—তাহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড সে থাকিতে  
পারিত না—যে ক্যারিকা মাতৃহীন কাকী বালককে  
একান্ত স্নেহে বুকের মধ্যে পুরিয়া রাখিয়াছিল—এবং  
আবার একদিন লেখাপড়া শেষ করিয়া এই ক্যারিকার  
কাছেই সে ফিরিয়া যাইবে।

জাক কহিল,—আমিও মাঝে ফিরে যাবো।

মুহূর্তের জন্ত উভয়ে নিস্তব্ধ হইল। উভয়েই ক্যারি-  
কার কথা ভাবিতেছিল। কি স্নেহশীলা এই নারী—  
তিনি এখন কোথায়? কি করিতেছেন? প্রবাসী বালকের  
কুশল মাগিতেছেন, নিশ্চয়।

জাক বলিল,—তোমার দেশ খুব ভালো, না? সে  
এখান থেকে কতদূর? সে দেশের নাম কি?

কাকী বালক উত্তর দিল,—দাহমি।

জাক বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, সাগ্রহে কহিল,  
—ওঃ! তাহলে—তাহলে তুমি তাকে নিশ্চয় জান! তার  
সঙ্গেই বৃষি তুমি ফ্রান্স এসেছ?

—কার সঙ্গে?

—রাজা—দাহমির রাজপুত্রের সঙ্গে।

—আমিই সে। বলিয়া কাকী বালক আবার হাসিল।

জাক বিশ্বাসে অভিভূত হইয়া পড়িল। রাজা!  
রাজপুত্র! বাহাকে সে সারাদিন নানা ফরমাস খাটিতে  
দেখিয়াছে, বাঁটা লইয়া চারিধার বে পরিষ্কার করিয়াছে,  
টেবিলে খাবার পরিবেষণ করিয়াছে, প্লেট, গ্লাস, সব সাফ  
করিয়াছে, সেই ভৃত্য—এই কালো কাকী বালক—  
দাহমির রাজপুত্র। আশ্চর্য্য। কিন্তু না, কথাটা  
তামাসা নয় তো। বালকের চোখে-মুখে কেমন একটা  
বন্ধ সরল ভাব ফুটিয়া রহিয়াছে। সে বৃষি কোন্  
স্বপ্ন দেশের স্বপ্নর অভীতের স্বপ্নের দিনগুলির কথা  
ভাবিতেছে।

জাক বিশ্বাসের সহিত কহিল,—কি রকম?

কাকী বালক কহিল,—এই রকম! বলিয়াই সে খড়-  
মড়িয়া উঠিয়া আলো নিবাইয়া দিল, কহিল,—সারা রাত  
আলো জ্বললে কাল রাত খেতে হবে আবার। তার পর  
নিজের বিছানা জাকের বিছানার কাছে টানিয়া আনিয়া  
বলিল,—তুমি ঘুমোবে না? দাহমির কথা মনে পড়লে  
আমার ঘুম আসে না—আজ আর ঘুম আসবে না।  
দাহমির গল্প শুনে তুমি?

—শুনবো।

তখন সেই নিস্তব্ধ রাতে অনিবিড় অন্ধকারে কাকী  
বালক জাককে তাহার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতে  
লাগিল। উৎসাহে তাহার চোখ হইতে যেন একটা  
আনন্দের দীপ্তি ঠিকরিয়া পড়িতেছিল। শ্রোতার প্রাণ  
আগ্রহে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বালকের নাম মাহু। বিখ্যাত বোদ্ধা বাক-মাহু  
ঘেজোর সে একমাত্র পুত্র।

বাক-মাহু ঘেজোর বীরত্বের কথা কে না জানে!  
তাহার অসংখ্য স্ত্রবহং কামান, অগণ্য বীর সৈন্য, ভী-  
ষ্ম প্রভৃতি নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র, সুশিক্ষিত রণহস্তী,  
বাঘকর, পুরোহিত, নর্তকী, দুই শত স্ত্রী—এ সকলই  
বাক-মাহুর বিপুল ঐশ্বর্যের চূড়ান্ত পরিচয়। তাহার  
উচ্চ প্রাসাদ শাগিত বর্ষায় সুরক্ষিত, বিচিত্র শঙ্খ-বজ্র  
খচিত, অসংখ্য নব-কপালে সজ্জিত। এই প্রাসাদে  
মাহুর জন্ম হয়। সুর্যের কিরণে চারিধার তখন ঝলমল  
করিতেছিল—প্রাসাদ-চূড়ার পতাকা-শ্রেণী অধীর পবনে  
মুদু-মন্দ কাঁপিতেছিল। শৈশবে মাহুর মা তাহাকে  
ছাড়িয়া গেল। পিশি ক্যারিকা ছোট মাহুকে বুকে  
তুলিয়া লইল। মাহু যেন মাকে আবার ফিরিয়া  
পাইল। ক্যারিকার হৃদয়ে যেমন স্নেহ, বাহুতে তেমনই  
শক্তি। হাতে-পায়ে তবলকীর মালা আঁটিয়া মুক্তকেশী  
ক্যারিকা মস্তকে হরিণের শৃঙ্গ-রচিত মুকুট লাগাইয়া যখন  
রণক্ষেত্রে নামিত, তখন বলবান শত্রুর হৃদয়েও ত্রাসের  
সঞ্চার হইত। সেই ক্যারিকার আদরে লালিত মাহু  
যখন একটু বড় হইল, তখন তাহার বিজ্ঞা-শিক্ষার ব্যবস্থা  
করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। দেশে সে সুবিধা নাই  
—কাজেই তাহাকে বিদেশে আসিতে হইল।

দেশে সে কি সুখে দিন কাটিত! ক্যারিকার সহিত  
মাহু বনে শীকারে বাহির হইত। কি নিবিড় জঙ্গল!  
গাছের পাতায় কোথাও ফাঁক নাই! আকাশ দেখা যায়  
মা,—কোনো দিক দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না, মাথার  
উপর আগাগোড়া কে যেন পত্ৰরচিত সুবিস্তৃত চাদোয়া  
খাটাইয়া রাখিয়াছে! কথা কহিলে প্রতিধ্বনি গভীর  
স্বরে রণিয়া ওঠে। ফল-ফুলের অস্ত্র নাই—বর্ণে-গন্ধে সে  
এক অপকল্প লীলা। কোথাও পায়ের কাছ দিয়া নিরীহ

সাপ সরিয়া বাইতেছে, কখনও কাহাকে আঘাত করে না। পাখীর দল নানা সুরে গান গাহিতেছে, বানরগুলি এ-গাছে ও-গাছে লাফাইয়া বেড়াইতেছে, ফুলগাছের আশে-পাশে জমরের দল ঘুরিয়া ফিরিতেছে! কোথাও প্রকাণ্ড পুষ্করিণী—আকাশের এতটুকু ছায়া তাহার বুকে প্রতিবিম্বিত হয় না, যেন বনদেবীর স্রুহৎ দর্পণের মত পড়িয়া রহিয়াছে,—যেন সবুজ রঙের প্রকাণ্ড একখানা খোলা কাচ!

জাক বলিল,—বাঃ, বেশ!

—হ্যাঁ, সুন্দর।

তার পর মাহু শৈশবের কথা বলিতে লাগিল—অতি-যুগ্মনের ফলে কাহিনীটি পরীর দেশের কাহিনীর মত সুন্দর উপভোগ্য হইয়া উঠিল। গল্প বলিতে বলিতে মাহু অতীতের দিনগুলিকে এক নূতন চক্ষে দেখিতেছিল। অতীত কালের মধ্য দিয়া দেখিলে বাহিরটা যেমন বিচিত্র বর্ণের রঞ্জিত বলিয়া মনে হয়, অতীতের এই দৃষ্টটুকুও তেমনই বিচিত্র মধুর রঙে ভরিয়া উঠিল।

দল বাধিয়া সকলে শীকারে বাহির হইত। বনের মধ্যে চারিধারে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড আলিয়া তাহারই মধ্যে বসিয়া দুর্দান্ত পশুর আক্রমণ হইতে সকলে আত্মরক্ষা করিত। কি সুখ! সে কি আনন্দ! তাই মাহুকে এ-সব ছাড়িয়া যেদিন ফ্রান্সের সুবিখ্যাত বনফিলের স্থলে আনা হইল, সেদিন তাহার প্রাণটা হাহাকাব করিয়া উঠিল! এ যেন গহবরের মধ্যে কে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে! কোথায় গেল স্বাধীনতার সে অপূর্ণ আনন্দ, সরল সঙ্গিবর্গের সে প্রাণ-খোলা উল্লাস চীৎকার!

এখানে বাঁধা নিয়মে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়াশুনা করিতে হয়। সকলের সঙ্গে দলে মিশিয়া পরিমিত আহার, ভ্রমণ, খেলা—হুই দিনেই এ সব তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। শেষে মাহু একদিন সকলের অজ্ঞাতে স্কুল ছাড়িয়া চম্পট দিল।

কিন্তু বেচারার ভাগ্য অপ্রসন্ন ছিল। তাই সে চট করিয়া ধরা পড়িয়া গেল। আবার স্কুলে ফিরিতে হইল। এবারে কড়া পাঠ্যার বসিল। নিত্য সেই বই খুলিয়া বি, এ—বে; বি আই—বাই করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, পড়ার চেয়ে বুদ্ধি মৃত্যুও ভালো। নীল আকাশের দিকে মাহু চাহিয়া থাকিত—এই আকাশ তাহার দেশও ঠিক এমন! পাখী উড়িয়া বাইতেছে দেখিয়া মাহু ভাবিত, সে হয়তো দাহমিতেই চলিয়াছে! সে যদি মাহু না হইয়া পাখী হইত তো কঠিন দেওয়ালের আড়ালে বসিয়া এমনভাবে ছুখে পিষিয়া তাহাকে মরিতে হইত না—শিশি ক্যারিকার কাছে কবে সে উড়িয়া বাইত!

একদিন সকলে মিলিয়া সমুদ্রের তীরে জাহাজ দেখিতে গিয়াছিল। জাহাজে উঠিয়া মাহুর মনে হইতেছিল, এক

দিন এই স্রুহৎ জলের পাখীটা পিঠে তাহাকে বসাইয়া যেমন এখানে বহিয়া আনিয়াছে—আজ আবার তেমনই ফিরাইয়া লইয়া বাইতে পারে না কি? সকলের চোখ এড়াইয়া জাহাজের খোলে সে লুকাইয়া বসিয়া রহিল। তার পর যখন জাহাজ বহুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে ক্ষুধার কাতর মাহু তখন আর লুকাইয়া থাকিতে পারিল না! জাহাজের কাপ্তেন পুরস্কারের লোভে মাহুকে বনফিলের হাতে তুলিয়া দিয়া গেল। বনফিল তখন আপনার নিকট তাহাকে রাখা নিরাপদ নহে ভাবিয়া মাহুকে জিম-নাজ মোরোনডায় ভর্তি করিয়া দিল।

প্রথম-প্রথম এখানে তখন সে কি আদর, কি অভ্যর্থনা! জাকের আদর-অভ্যর্থনার চেয়ে ঢের বেশী! রাজপুত্র আসিয়াছে—চারিধারে একটা ধূম বাধিয়া উঠিল! মোরোনডার সহিত এক টেবিলে বসিয়া মাহু আহার করিত, অপর বালকের দল ঈর্ষার তাহার পানে চাহিয়া থাকিত! মোরোনডা প্রায়ই বলিত,—মাহু যখন রাজা হবে, স্কুলটা তখন দাহমিতে উঠিয়ে নিয়ে যাবো, সরকারী বৃত্তিতে সেখানে আর কোন ছুঃখ-কষ্ট থাকবে না—মনের মত করে লেখাপড়া শিখিয়ে দাহমিকে স্বর্গ বানিয়ে ছাড়বো।

হারুজও তখন চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনাব প্রতিভা খেলাইতে পারিবে! নূতন ঔষধ আবিষ্কার করিলে তাহার পরখের কোন স্রুবিধা এখানে নাই—ঔষধ খাইয়া যদি কেহ মরিয়া যায় তো পুলিশের টানাটানি, প্রাণ যাইবার উপক্রম! মাহুর রাজ্যে সে নিত্য নূতন ঔষধের পরীক্ষা চালাইবে, পুলিশ তখন কিছু করিতে পারিবে না!

লাবাস্ত্রাজ্ সন্মুখত করিবে দাহমির বর্কর সঙ্গীত-শাস্ত্র! সকলেই ভবিষ্যতের আশায় মাহুকে আদর করিত, সম্মান করিত। সকলেই আশা করিয়া বসিয়াছিল, মাহু একবার রাজা হইলে হয়—চক্ষের পলকে সব ছুঃখ ঘুচিয়া বাইবে! এখন তাহাদের প্রতিভার আলো অন্ধার ঘেঁষের ভয়ে যেমন প্রচ্ছন্ন আছে, তখন অমুকুল পবনে সে ভয়েষ রাশি উড়িয়া গেলে কি তীব্র তেজে তাহা জলিয়া উঠিবে!

এমন সময় সহসা সংবাদ আসিল, আশান্ত্রিরা দাহমি অধিকার করিয়াছে, মাহুর পিতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছে, শিশি ক্যারিকা নিরুদ্ধিষ্ট! লোক-মুখে শিশি শুধু একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিল, মাহু যেন মাহুলিটিকে সন্মুখে রক্ষা করে, তাহারই সাহায্যে নষ্ট রাজ্য আবার সে ফিরিয়া পাইবে,—দৈবজ্ঞের দল এ-কথাটা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছে।

এ সংবাদের পর মাহুর আদর একটু কমিলেও তেমন কিছু অস্রুবিধা তাহাকে ভোগ করিতে হইল না। কিন্তু যখন এক বৎসর, দুই বৎসর কাটিয়া গেল, মাহুর হইয়া

কেহ অর্থ দিল না, তখন স্কুলের ছাত্রটিকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল। ছাত্রের ব্যয়-নির্বাহ রীতিমত কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল—এবং সেই ছাত্রের স্থান অধিকার করিল, রাজপুত্র মাহু! মাহুকে একেবারে বিদায় দেওয়া হইল না; কারণ, তাহা হইলে “রাজপুত্র এখানে পড়িতেছে” বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউবে না!

এ অপমানে মাহু কিন্তু সার দিল না। তাহার সমস্ত অস্তর বিক্রোহী হইয়া উঠিল। নানা ভাবে সে কুখ্যাত্তে লাগিল, এতখানি হীনতা সে সহ করিবে না! কিন্তু বেতের ঘায়ে নিত্য জর্জরিত হইয়া অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া সে-দাসঘে সে নামিয়া পড়িল। কোথায় রহিল তখন অত আদব, অত যত্ন! কপূরের মত যেন সব উবিয়া গেল।

এখন ভোরে উঠিয়া মাহু বাজার করিতে যায়, ঘব পরিষ্কার করে, অর্থাৎ ভূতা ও পাচকের সকল কাজ তাহার দ্বারা সারিয়া লওয়া হয়।

হায় ক্যারিকা—শিশি ক্যারিকা—কোথায় তুমি? তোমার কত সাধের, কত আদরের মাহু—আজ এখানে অধম ভূতা হইয়া দিন কাটাইতেছে! একবার যদি সে রাজ্য ফিরাইয়া পায় তো, মনের যত কিছু আক্ৰোশ—কিন্তু না, খুব মিষ্ট কথায় আদর-অভ্যর্থনা করিয়া জিম-নায়েব এই দলটিকে সে দাহমিতে লইয়া যায়! তার পর এই মোবোনভা-হাবুয়েব দলকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতিয়া এ দারুণ অপমানের প্রতিশোধ লয়।

এই ভীষণ লাঞ্ছনা! থাকিয়া থাকিয়া মাহুব বুকখানা যেন জ্বলিয়া ওঠে। এই আগুনে মোবোনভার দলকে যদি সে পুড়াইয়া মারিতে পাবে, তবেই মনের ঝাল মিটে! ভগবান কি সে দিন দিবেন না?

মাহুর চোখ দুইটা বাঘের চোখের মত জ্বলিতেছিল। জাকের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। মাহুর কাহিনী শুনিয়া তাহার দুঃখ হইতেছিল! আহা, রাজপুত্র মাহু—সামান্য চাকরের মত আজ সে খাটিয়া সাবা হইতেছে! হুর্ভাগ্য, নিতান্তই সে উপায়হীন, অসহায়!

মাহু কহিল,—তোমাব মা বেশ বড় লোক, না? অনেক টাকা আছে তাঁর?

জাক কহিল,—হ্যাঁ।

মাহু কহিল,—তাই এরা তোমায় এত আদর করছে! টাকা না থাকলে এরা ভারী অত্যাচার করে। দেখছ তো, আমাদের।

জাক কিছু বলিল না। তখন দুই নূতন বন্ধুতে মিলিয়া আরও কত গল্প করিল। গল্প করিতে করিতে শেষে কখনও উভয়ে ঘুমাইয়া পড়িল, কেহই তাহা জানিতে পারিল না। স্বপ্নের মধ্যে জাকের মুখে প্রসন্নহাসি ফুটিয়া উঠিল। সে স্বপ্ন দেখিল, মাহুকে লইয়া যেন সে মার কাছে কিরিশা গিয়াছে, মা মাহুকে কত আদর করিতেছে!

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহিত্যিক মজলিস

মাহুব ঠেকিয়া শিথিতে চায়, দেখিয়া নয়। শিশু-প্রকৃতিতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নাই।

মাহুব কাহিনী শুনিয়া জাকের প্রথমটা ভারী ভয় হইয়াছিল, কিন্তু মোবোনভার আদরে আর শিক্ষকদের সুমধুব ব্যবহারে সে ভয় দুঃস্বপ্নের মত মিলাইয়া গেল।

প্রথম কয়েক মাস জাক এতখানি আদর-সোহাগ ভোগ কবিল যে সে ভুলিয়া গেল, অভাগা মাহুর ভাগ্যেও একদিন এমনি আদর-সোহাগ ঘটয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন রহে নাই।

লাবাস্তাজ্, হারজ্, আর্জান্ড্ সকলেই জাকের সুখের জন্ত শশব্যস্ত! জাকের টেবিলে মোবোনভার পার্শ্বে তাহার আসন! ছাত্রের খেলা-ধুলা করে, গান গাহে, সে সব শুধু জাকের তৃপ্তির জন্ত!

জিমনাঙ্-বাস কাজেই জাকের সহিয়া গেল।

জাকের এই অবস্থা দেখিয়া মাহুব ভারী দুঃখ হইত। জাকের পানে মাঝে মাঝে কেমন এক ককণ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকিত! সে চাহিনির অর্থ, হারে অবোধ, এ সুখ, এ সোহাগ, কয় দিনের জন্ত? এমন আদর-বৃত্ত আমিও একদিন পাইয়াছিলাম, কিন্তু আজ।

এমনই ভাবে কয় মাস কাটিয়া গেল।

জাকের মা প্রায়ই জাককে দেখিতে আসিত। সে সময় ইদার কি থাকিত! তাহাব তুচ্ছ একটা কথা জিম-নায়েবের সকলে নিবিষ্ট মনে শুনিতেন বসিত!

সহিসেব ছেলেরা সেদিন দল বাঁধিয়া খেলা করিতে-ছিল। ঘরের মধ্যে জানালার ধারে বসিয়া জাক সেই খেলা দেখিতেছিল। এমন সময় মোবোনভা আসিয়া ডাকিল,—জাক্, জাক্, তোমার মা এসেছেন!

মা! জাক লাফাইয়া মোবোনভার নিকট আসিল, সাগ্রহে কহিল,—কোথায় মা?

সুবেশা ইলা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটি ছোট খুড়ি—মিষ্টানে পরিপূর্ণ। ইলা ছাত্রদিগকে ডাকিয়া পাঠাইল! শীর্ণকায় জীর্ণবেশ বালকের দল সম্মুখে আসিলে ইলা মুঠি ভরিয়া সকলকে বিস্কুট-কেক প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিল! ছাত্রের দলে আমোদের ঘটা পড়িয়া গেল। মার কোলের কাছে ঠাড়াইয়া জাক অপূর্ব গর্বোজ্ঞাসে এই বিরাট ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছিল।

এমনই ব্যাপারে যখন-তখন ইলা অত্যন্ত অর্থ ব্যয় করিত। মোবোনভার সারা দেহ ক্ষোভে জ্বালায় রি-রি করিতে থাকিত। অনর্থক এই সব বাজে খরচ! এই অর্থ যদি কোন সুযোগ্য সদাশয় ব্যক্তির হস্তে—যেমন



মোরোনভা এক জন—তুলিয়া দেওয়া হইত, অবশ্য তাহার ইচ্ছামত ব্যয়ের জন্ত! বেচারার মাথায় সন্ধ্যা ও সদমুষ্ঠানের কত কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! শুধু টাকার অভাব বৈ তো নয়!

অনেক সময় মোরোনভার ইচ্ছা হইত, মনের ভাবটা ইদাকে সে খুলিয়া বলে। কিন্তু সাহসে কুলাইত না! তাহার চোখেমুখে সে ভাব দিব্য ফুটিয়া থাকিত। তাহাই যে ইদার বুঝিবার পক্ষে কেন যথেষ্ট হইতেছে না, ইহা সে স্থির করিতে পারিত না। পারিত না বলিয়া মোরোনভার কেমন রাগ হইত!

বহু দিন হইতে মোরোনভার সাধ—একখানি মাসিক-পত্র বাতির করে। নিজেদের দলের একখানা কাগজ না থাকিলে কি স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করা যায়! না, পাঁচজনের কাছে পরিচিত হওয়া যায়!

বন্ধু-বান্ধবদের কাছে প্রায়ই মোরোনভা এই কাগজ বাতির করিবার কথা পাড়িত। শুনিয়া সকলেই তাহাকে উৎসাহ দিত,—বেশ কথা বলিয়াছ! একখানা কাগজ বাহির করিতে পারিলে চমৎকার হয়! কত নূতন ভাব, নূতন চিন্তা নিত্য সকলের মাথায় আসে—এ পর্য্যন্ত যাহা কাহারও মাথায় ধরা দেয় নাই—প্রকাশ করা দূরের কথা। আহা, শুধু নিজেদের একখানা কাগজের অভাবে শুধু সে সব ভাব চাপা পড়িয়া নষ্ট হইতেছে।

মোরোনভাব মনে একটা ধারণা কেমন বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল—যদি তাহার কাগজ বাহির করে তো তাহার ব্যয়-ভার জাকের মা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ইদাব নিকট মোরোনভা চট করিয়া কথাটা তুলিতে পাবিল না। তাহার মংলবটা যদি ইদা কোন-রূপ সন্দেহের চক্ষে দেখে। তাহা হইলে সব মাটা। ধীরে ধীরে সে আপনার কাজ গুছাইয়া লইবে, স্থির করিল।

মোরোনভার দ্বী নানা কথার পর ইদাকে ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিল,—মোরোনভার একটা অমুরোধ আছে। কিন্তু কথাটা তুলতে তিনি একটু কুণ্ঠিত হইলেন—

ইদা সাগ্রহে বলিল,—কি? কি কথা?

ইদার স্বরে এতখানি আগ্রহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল যে, মোরোনভার ইচ্ছা হইল, কাগজের জন্ত একেবারে কিছু টাকা চাহিয়া বসে! কিন্তু সে বিলক্ষণ চতুর, ভবিষ্যতের বিষয় ভাবিয়া তবে কাজ করে। সুতরাং আসল কথার কিছুই সে আপাততঃ ভাবিল না, ইদাকে শুধু কহিল,—আমাদের একটা সাহিত্য-সভা আছে, এই রবিবারে তার একটা অধিবেশন হবে, আপনি যদি অনুগ্রহ করে আসেন—

ইদা জিজ্ঞাসা করিল,—সভায় কি হবে?

—প্রবন্ধ-পাঠ, আবৃত্তি, গান—

—আর কে কে আসবেন?

মোরোনভা একটু কাশিয়া উত্তর দিল,—আরও অনেক ভক্তলোক আসবেন। বিস্তর মহিলারও নিমন্ত্রণ হয়েছে।

ভক্তসমাজে যিশিবার একটা উৎকট বাসনার এনিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে ইদা এক মুহূর্ত ইতস্তত করিল না।

মোরোনভা অত্যন্ত খুশী হইল। সভাগৃহ সাধ্যমত ভাল করিয়া সাজানো হইল। ফটকের সম্মুখে দুইটি রঙিন আলোর ব্যবস্থা হইল। বাতিদান করটা মাহু ঘসিয়া-মাজিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিল। কক্ষের সমস্ত আসবাব-পত্র অবধি মাহু যথাসাধ্য মার্জিত করিল। রাত্রি আটটার মজলিস বসিবে।

মোরোনভার জীবনে আজ এক মহা উৎসব। তাহার পরিচিত যত ব্যর্থ কবি, ব্যর্থ শিল্পী সকলেই প্রায় নিমন্ত্রিত হইয়াছে।

আটটার সময় বালকের দল বেঞ্চে আপনাদিগের আসনে আসিয়া বসিল।

নির্দিষ্ট সময়ে নিমন্ত্রিত লোকেরাও দলে দলে উপস্থিত হইতে লাগিল। সে দলে কবি, শিল্পী, চিত্রকর, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক সকলেই আছে, তবে ভাগ্যলক্ষ্মী যে কাহারও প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই, তাহা তাহাদের মূর্তি দেখিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না! বাণীর যত অনাদৃত উপেক্ষিত পুত্র! নিতান্ত বেচার! তাহাদের সীর্ণ দেহ, জীর্ণ বেশ, কোটর-গত চক্ষু, বিবর্ণ ভাব দেখিলে সত্যই দুঃখ হয়। প্রতিভাসম্পন্ন লোকে যে তাহাদের কদর বুঝিল না, এই দুঃখ যেন তাহাদের হাড়ে হাড়ে বিধিয়া বহিয়াছে!

সকলে আসিয়াছে। কিন্তু জাকের মা ইদা কৈ? যাহার জন্ত মোরোনভার আজ এত আয়োজন!

ইদার বিলম্ব দেখিয়া মোরোনভা বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল; দলের সকলে ক্ষুণ্ণ হইল।

সকলের কাছে গিয়া মোরোনভা চুপি-চুপি বলিতে লাগিল,—কাউন্টেন্সের জন্তই একটু অপেক্ষা করছি শুধু, না হলে সময় হয়েছে ঠিক।

অবশেষে অনেক দেবী হইয়া গেলে ইদার আসিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আর্জান্তকে তাহার কবিতা পাঠ করিতে অমুরোধ করা হইল।

আর্জান্ত তখন এক বিচিত্র ভঙ্গীতে স্ব-রচিত কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল। রচনা যেমন জঘন্স, আবৃত্তির ভঙ্গী ঠিক তাহার অমুরূপ। কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়। ঘন ঘন করতালি-বুড়ি হইতে লাগিল! কেহ বলিল,—বাহবা! কেহ বলিল,—চমৎকার।

এইরূপে প্রশংসিত হইয়া আর্জান্ত আরও উৎফুল্ল চিত্তে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল।

এমন সময় ধীরে ধীরে ইদা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।



আর্জাস্ত'র দৃষ্টি তখন উর্কে, কোন্ অনির্দিষ্ট কাব্য-লোকে—কাজেই ইদাকে সে লক্ষ্য করিল না! কিন্তু ইদা তাহাকে দেখিল—নূতন চোখে, নূতন দৃষ্টিতে। সেই মুহূর্ত্তে ইদার ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, যেন তাহার সারা জীবনের সকল সাধ, সকল কামনা আজ ঐ মানুষটির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এক মুহূর্ত্তে ইদা আপনাকে তাহার পায়ে সঁপিয়া দিল।

ইদাকে দেখিয়া জাক ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মোরোনভা শশব্যস্তে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল। আর্জাস্ত' ছাড়া কক্ষস্থ সকলেরই চিত্ত ইদার সে মধুর লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু ইদা কাহারও পানে চাহিল না; সে শুধু তন্ময় হইয়া আর্জাস্ত'কে,—তাহার জীবনের স্বপ্ন—স্বপ্নের সাধের স্বপ্ন, কবি আর্জাস্ত'কে দেখিতেছিল।

মোরোনভা ইদাকে কহিল,—আপনার জন্তই আমরা এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম……সময়টা নেহাৎ আড়ষ্ট ঠেকবে বলেই কাউন্ট আর্জাস্ত'র কবিতা শোনা যাচ্ছিল।

ইদা আনন্দে শিহরিয়া উঠিল—কাউন্ট! বাঃ!

সলজ্জ বালিকার মত তরল কণ্ঠে ইদা আর্জাস্ত'কে কহিল,—থামলেন যে আপনি! বেশ হচ্ছিল।

আর্জাস্ত' কিন্তু সন্মত হইল না। কবিতার শ্রেষ্ঠ অংশটি আবৃত্তির সময় ইদার আগমনে বাধা পাইয়া সে মনে মনে অত্যন্ত চটিয়াছিল। আর্জাস্ত' কহিল,—আর নেই। শেষ হয়ে গেছে।

ইদার প্রিয় কবি ইদার পানে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া অজ্ঞাত লোকের সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইদা মরমে মরিয়া গেল। প্রথম দর্শনেই সে তাহার প্রিয়তম কবির বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে। ইদার মুখখানা এতটুকু হইয়া গেল।

তার পর সভায় কত কাজ হইয়া গেল—ইদার কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। সে শুধু তাহার কবিকে দেখিতেছিল।

কি সুন্দর ঝাঁড়াইবার ভঙ্গী! কি উদাস, আহা, তাহার চোখের দৃষ্টি—কবির যোগ্য বটে। এ জগতে যেন তাহার মন নাই। কোন্ সুদূর কল্পনা-স্বর্গে তাহার চিন্তা-চকোর কি অপার্থিব সুধার আশায় তখন ঘুরিয়া ফিরিতেছে। আর্জাস্ত'র প্রতি ইদা ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তাহার পর কখন যে সভায় প্রবন্ধ-পাঠ, গান প্রভৃতি বিধি-অনুযায়ী হইয়া গেল, ইদা তাহা বুঝিতে পারিল না। তখন আবার আর্জাস্ত'র পালা আসিল।

ইদা তৃপ্ত চিন্তে শুনিতে লাগিল। শুনিতে শুনিতে মুগ্ধভাবে সে মোরোনভার পানে চাহিল।

মোরোনভা বিজয়-গর্বে ঈষৎ হাসিল। ইদা

মোরোনভাকে কহিল,—এমন লোক আপনার সভায় সভ্য? আপনি ভাগ্যবান!

আবৃত্তি শেষ হইলে ইদা জিজ্ঞাসা করিল,—কোন্ কোন্ কাগজে এঁর কবিতা ছাপা হয়?

—কোথাও নয়। কেউ ছাপে না। কেন ছাপবে? হিংসেয় সব সারা হয়ে যাচ্ছে। এঁদের কবিতা ছাপলে তাঁদের গুলি আর বাজাবে বিকোবে না।

ইদা ঠিক একেবারে মোরোনভার মর্মে আঘাত করিয়াছে। মোরোনভার ভারী স্তমোগ মিলিয়াছে। বর্তমান রুচির সে অজ্ঞান নিন্দা করিল; আরও কহিল,—সাহিত্যের আশ্রয়কাল এমন দুর্দশা হয়েছে যে ভালো লেখা এখন আর সম্পাদকদের পছন্দ হয় না। যত পঢ়া লেখার আদর! প্রতিভার যুগ চলে গেছে। এখন শুধু সুপারিশ আর তোষামোদ, এই বৈ নাই! সকলে দল পাকিয়ে বসে আছে, বাইবের কারুকো মাথা তুলতে দেবে না।

কথাটা শেষ করিয়া মোরোনভা একটা নিশ্বাস ফেলিল। হায় রে, আজ যদি নিজেদের একখানা কাগজ থাকিত!

ইদা কহিল,—আপনাদের নিজেদের একখানা কাগজ থাকা খুব দরকার কিন্তু।

—নিশ্চয়ই!

—বার করেন না কেন?

কাঠ হাসি হাসিয়া মোরোনভা কহিল,—টাকা কোথায়?

—টাকার ভাবনা কি? সে যেমন করে হোক ছোঁগাড় হবে! এমন সুন্দর জিনিষগুলো তা বলে চেপে রাখা ঠিক নয়!

—কখনই নয়!

মোরোনভা ভাবিল, আর ভাবনা নাই, এইবার সে কাজ বাগাইতে পারিবে!

মোরোনভা তখন আর্জাস্ত'র সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া ইদার চিন্তকে লুপ্ত করিবার চেষ্টা করিল। মুগ্ধ চিন্তে ইদা আর্জাস্ত'র কথা শুনিতে লাগিল। এমন সময় জাক ডাকিল,—মা—

মা বিরক্ত হইল, বলিল,—আঃ ছি, চুপ করো—জাক,—দুটু মি করো না!

আর্জাস্ত' প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই যে তাহারই বিষয় লইয়া মোরোনভার সহিত ইদার কথা এমন জমিয়া উঠিয়াছে। যখন তাহা জানিল, তখন আপনাকে আরও জাহির করিবার সজ্জা সে আকুল হইয়া উঠিল। অপরের সহিত যখন সে কথা কহিতেছিল, তখন তাহার দিকে ইদার দুই তৃপ্ত নেত্র যে মস্তমুগ্ধের ন্যায় আকৃষ্ট रहিয়াছে, এ-টুকু বেশ লক্ষ্য করিল।

ইদাও এখন এটুকু বুঝিয়াছে যে তাহার উপর আর্জান্তর মোটেই লক্ষ্য নাই, এমন নহে !

আর্জান্তর কথাবার্তা ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সকলেই বলাবলি করিতেছিল,—সুন্দর ! এমনটি আব দেখা যায় না ! আর ইদা ? সে কি ভাবিতেছিল ? সে অভাগিনী তখন আপনাকে বিকসিত করিয়াছে ।

সে দিন অনেক রাত্রে সভাভঙ্গ হইল ।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহলিসের ঘেব

পরদিন মোরোন্ডার নিকট মাদাম বারাসির এক চিঠি আসিয়া হাজির । তাহার গৃহে সস্ত্রীক মোরোন্ডার নিমন্ত্রণ । চিঠির তলায় ছোট একটি ‘পুনশ্চ’তে কবি আর্জান্তকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জ্ঞাপন বিশেষ করিয়া অনুরোধ করা হইয়াছে ।

নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া আর্জান্ত কহিল,—আমি তা বলে যাচ্ছি না, সেখানে !

মোরোন্ডা একটু বিবস্ত্র হইল, জিজ্ঞাসা করিল,—সে কি ! যাবে না কেন, শুনি ।

—ও রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমি রাজী নই—বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ খাওয়া দূরের কথা ।”

—নাঃ, তুমিই দেখচি আমাব সব মতলব মাটা করবে ! নিমন্ত্রণে যেতে দেখ কি ! মাদাম ছাড়া বাবাসিকে তুমি যা ভেবেচ, তা নয়, আব যদি তাই হয়, তবু আমার খাতিরে তোমায় যেতে হবে ! বুঝছে তো—কাউন্টেকে না বাগাতে পারলে আমাদের কাগজখানা বার করার কোন সম্ভাবনা নেই ।

অনেক বলা-কহার পর আর্জান্ত যাইতে বাজী হইল ।

হার্জের উপর জিম-নাজের ভার দিয়া মোরোন্ডা সস্ত্রীক ইদার বাসাব উদ্দেশে যাত্রা করিল । কবি আর্জান্ত বলিল,—তোমরা এগোও, আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হবো !

মোরোন্ডা জিজ্ঞাসা করিল,—ঠিক যান্ধ ?

—হাঁ ।

সাতটার সময় আর্জান্তর পৌঁছবার কথা ! সাতটা বাজিয়া গেল, তথাপি তাহা দেখা নাই ! ইদা অস্থির হইয়া উঠিল ! মোরোন্ডাকে বার বার সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—ঠিক, এখনও এলেন না যে ! অসুখ-বিসুখ হল না তো তাঁর ? যে শরীর !

মোরোন্ডারও বিশেষ ভাবনা হইয়াছিল, আর্জান্ত না আসিলে কাগজের কথা তোলা যাইবে না !—নাঃ, আর্জান্ত সব মাটা করিল !

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় আর্জান্ত আসিয়া উপস্থিত !

তাহাকে দেখিয়া ইদার প্রাণের মতো কি এক অপূর্ণ আনন্দ উথলিয়া উঠিল । মোরোন্ডা বলিল,—এত দেবী হল যে ?

—হঠাৎ একটা কাজে দেরী হয়ে গেল ।

ইদার বাজী দেখিয়া আর্জান্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল—বেশ সাজানো ঘরগুলি ! ঘেবেব আসবাব-পত্র দেখিয়া মোরোন্ডার মত মুখে অজস্র প্রশংসা না কবিলেও আর্জান্ত মনে মনে ঈশ্বর খুশী হইল এবং পূর্বের মত গম্ভীরভাবে বসিয়া না থাকিয়া দুই একটা করিয়া কথা-বার্তা ক্রমে শুরু করিয়া দিল ।

কথাবার্তায় আর্জান্ত যে নিতান্ত অপটু, তাহা নহে, কিন্তু নিজেব কথা ছাড়া আর-কিছু কহিতে তাহার বড় ভালো লাগে না । ইদার আবার এমনই স্বভাব যে কাহাবও আত্মকথা বড় অধিকক্ষণ সে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে পারে না । শ্রোতাব এই বিষয় অধৈর্য্যে আর্জান্ত আরও বিষম চটিয়া যায় ! আর্জান্তর কথার মাঝে ইদা অনেক বার আপনাব অজ্ঞাতে তাহাকে বাধা দিয়া ফেলিল । আর্জান্ত এক প্রকার বিরক্ত দৃষ্টিতে ইদার পানে চাহিল । ইদা সঙ্কুচিত হইয়া গেল, ভাবিল, আর্জান্ত অমন করিয়া চাহিল কেন ? বিরক্ত হইয়াছে কি ?—কেন ? ইদার বুকের মাঝে এক ঝলক রক্ত উথলিয়া উঠিল । আর্জান্তর বিরক্তি আজ ইদার কাছে মৃত্যুরও অধিক । ইদার ইচ্ছা হইতে লাগিল, ডাক ছাড়িয়া সে কাঁদিয়া ওঠে !

ভোজনান্তে সুসজ্জিত বৈঠকখানায় গিয়া সকলে বসিল । মোরোন্ডা ভাবিল, কাগজের কথাটা তুলিবার পক্ষে এইটাই ঠিক সময় ! সে বলিল,—দেখুন কাউন্টেকে, আপনি যে সেই একখানা কাগজ বার করার কথা বলে-ছিলেন, সে সম্বন্ধে আমি ভেবে দেখেছি । খরচ বত পড়বে, ভেবেছিলুম, ততখানি ঠিক লাগবে না !

অগমনস্বভাবে ইদা উত্তর দিল,—হ্যাঁ ।

—তা দেখুন, এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা খুব দরকার হয়ে পড়েছে !

কথাটা ইদার কানে পৌঁছিল কি না সন্দেহ ! সে আর্জান্তর কথা ভাবিতেছিল । কেন কবি অমন চিন্তিত-ভাবে পাশ্চাৎ করিতেছে !

ইদার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া মোরোন্ডা তাহার পত্নীর পানে চাহিয়া একটু হাসিল । এ হাসির অর্থ, ইস্, একেবারে বিভোর !

এদিকে ইদা ভাবিতেছিল, কি করিয়া সে আর্জান্তর মন পাইবে । কেমন করিয়া ? সহসা একটা মতলব তাহার মাথায় আসিল ! ইদা আর্জান্তকে কহিল,—দয়

করে আপনার সেই কবিতাটা একবার শোনাবেন—  
আমার বড় ভালো লেগেছিল!

আর্জান্ট'র চিন্তা টলিয়া গেল। এমন কথায় কোন্  
কবির না টলিয়া থাকে? সে বলিল,—বলুন, কোন্  
কবিতাটা আপনি শুনতে চান। অসংখ্য কবিতা  
লিখেছি কি না—তাই—

—সেই যে, যে কবিতাটি জিম্নানাঞ্জে পড়েছিলেন—  
প্রথম লাইনটা তার, কি, ঐ যে—

—প্রেম বিভূষিত পূজার যোগ্য! সে নহে ক্ষুদ্র, হীন!

আর্জান্ট তাহার এই একনিষ্ঠ ভক্তটির প্রতি প্রসন্ন  
না হইয়া থাকিতে পারিল না। সে বলিল,—আমার  
কবিতার লাইন পর্য্যন্ত আপনি মনে রেখেছেন, দেখছি—  
ধন্যবাদ!

আনন্দে ইদার মুখে ক্ষণেকের জন্ত কথা ফুটিল না।  
মুহূর্ত্ত-পরে আশ্চর্য-ভাব সংঘত কবিয়া ইদা কহিল,—সে  
কবিতাটি আমার বড় ভালো লেগেছিল—ভালো কবিতার  
লক্ষণই হচ্ছে, পাঠক বা শ্রোতার মনে একেবারে  
যেন গঁথে যায়।

ইদার এই অতিরিক্ত প্রশংসায় আর্জান্ট'র সমস্ত মুখে  
একটা গৌরব-দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। সে একটা ছোট  
নিশ্বাস ফেলিল। তাহার অর্থ—তবু সম্পাদকের দল  
তাহার লেখা ফিরাইয়া দেয়, কাগজে ছাপে না!

জিম্নানাঞ্জে ফিরিবার পথে মোরোন্ডা আর্জান্ট'কে  
বলিল,—ভাখো, যদি আমাদের একখানা কাগজ বেরায়,  
তবে তোমাকে তার সম্পাদক হতে হবে!

মোরোন্ডা ভাবিয়াছিল, আর্জান্ট'কে সম্পাদকীর  
লোভ না দেখাইলে তাহার ততটা চাড়া হইবে না, আর  
আর্জান্ট' ছাড়া কাউন্টেন্সের নিকট হইতে টাকা বাহির  
করিবার সাধ্য কাহারও নাই!

মোরোন্ডাভাব কথায় আর্জান্ট' কোন উত্তর দিল না!  
কাগজের কথা সে একটুও ভাবে নাই। তাহার জীবনে  
নিমেষের মধ্যে যে একটা প্রকাণ্ড পরিবর্তনের সম্ভাবনা  
দেখা দিয়াছে, সে তাহারই বিষয় চিন্তা করিতেছিল। এ  
পর্য্যন্ত কোন নারী তাহার মনে এতটুকু রেখা টানিতে  
পারে নাই। কিন্তু সহসা আজ এই নারী কি করিয়া  
তাহার মনের বাঁধন এমন সহজে শিথিল করিয়া দিল?

সেই দিন হইতে ইদার প্রতি বাহিরে কোনরূপ ভাবা-  
স্তুর না দেখাইলেও তাহার হৃদয়ের নিভৃত পটে যে এক-  
খানি নারীমূর্ত্তি দিন দিন ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল,  
আর্জান্ট' নিজের তাহা বেশ বুঝিতে পারিল!

আর্জান্ট' জাককে নানা কথার মধ্য দিয়া তাহার  
মায়ের কথা, বাড়ীর অনেক কথা নিতাই প্রায় জিজ্ঞাসা  
করিত। আর্জান্ট'র আদরে জাক গলিয়া গিয়া তাহা-  
দের গাড়ীর ছোট-খাট সকল কথাই একে একে তাহাকে

বলিয়া বাইত! এক দিন জাক কথায় কথায় বলিল,  
—আমার বন্ধু আমার খুব ভালো বাসেন।

আর্জান্ট' জিজ্ঞাসা করিল—বন্ধু!—তিনি কে?

জাক আশ্চর্য্য হইল।—বন্ধুকে আপনি চেনেন না?  
...তা চিন্বেন কেমন করে? তিনি তো এখানে কখনও  
আসেন নি!

—তিনি কত বড়? কি নাম?

—কি নাম, তা জানি না। আমি তাঁকে বন্ধু বলে  
ডাকি। তিনি ঢের বড়—আপনার চেয়েও বড়। আর  
তার অনেক টাকা!

—তোমার মা তাঁকে কি বলে ডাকেন?

—মা?—মাও কৈ তাঁর নাম ধরে ডাকে না—ম্যসিয়ো  
—ম্যসিয়ো কবে।

—তোমাকে ভালবাসেন তিনি?

—খুব ভালবাসেন! যখন-তখন আমাদের দেখতে  
আসেন, মাঝে মাঝে থাকেন। আব যখন আসতে না  
পারেন, তখন কত ফল-টল পাঠিয়ে দেন। আমিও তাঁকে  
খুব ভালবাসি!

—তোমার মাও তাঁকে ভালবাসেন?

—বাসে বই কি!

জাক সরলভাবেই উত্তর দিল। কিন্তু এই কথায়  
ভরিয়া আর্জান্ট'র মনে কে যেন খানিকটা তীব্র বিষ  
ঢালিয়া দিল। সেই দিন হইতে বন্ধুর কথা আর্জান্ট'র  
মোটে ভাল লাগিত না। তাহার বন্ধুর উপর আর্জান্ট-  
স্ত'র কেন এমন ভাব হইল, জাক তাহা কিছুতেই বুঝিয়া  
উঠিতে পারিল না। আর্জান্ট'কে জাকও ক্রমে আর  
দেখিতে পারিত না! ইহার উপর জাকের মা আবার  
আর্জান্ট'র সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিতেছে দেখিয়া  
জাক জলিয়া বাইত! ক্রমে আর্জান্ট' জাকের চক্ষুশূল  
হইয়া দাঁড়াইল।

ছুটির সময় জাক বাড়ী আসিলে ইদা জিজ্ঞাসা করিত,  
—তার মাঠাব-মশায় আর্জান্ট' তোকে ভালোটালা  
বাসেন রে?

জাক মুখ ভার করিয়া বলিল,—হাই!

মাসে দুইটি বৃহস্পতিবার জাক হাফ-ছুটি পাইত।  
সেই দুই দিন সে মায়ের কাছে থাকিত, খাওয়া-দাওয়া  
করিত। একটা বৃহস্পতিবারে জাক দেখিল, খাইবার  
ঘরটি বেশ সাজানো হইয়াছে—ফুলদানীগুলি বিচিত্র বর্ণের  
ফুলে ভরা! ঘরে তিন জনের খাইবার আসন। জাক  
মহা আনন্দিত হইল। সে ভাবিল, বুঝি, বন্ধু আজ  
তাহাদের সঙ্গে ভোজন করিবেন।

এমন সময় মাকে দেখিয়া জাক জিজ্ঞাসা করিল,—মা,  
আর একটা জায়গা কায় হয়েছে?

—বল দেখি—যদি বলতে পারো—তবে তোমার

একটা খুব ভাল খেলনা দেব। বলো দেখি, কে আজ আমাদের সঙ্গে খাবেন?

জাক ভাবিয়াছিল, সে ঠিক বলিতে পারিবে! তাই সে ঠোঁট দুইটি ঝঁক ফুলাইয়া মায়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—বলি? বন্ধু আসবেন!

জাকের মা হাসিতে হাসিতে বলিল, হলো না—তোমাদের মাঠার মশায় আর্জান্ত!

আর্জান্ত!

পলকে জাকের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। ইদা ভাবিল, পুরস্কার-পাতে হতাশ হইয়া জাকের মুখ অমন হইয়া গেল! সে জাককে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল, না—না—খেলনা পাবে!

তার পর তিন জনে খাইতে বসিল। আজ জাকের মনে এতটুকু সুখ নাই! ইদা ও আর্জান্ত গল্প করিতে করিতে খাইতে লাগিল। তাদের কোন কথা জাকের কানে গেল না। তাহা আর এক দণ্ড সেখানে থাকিবার প্রবৃত্তি ছিল না! তাহার প্রাণ কেমন শিররিয়া উঠিতেছিল! এ কোথা হইতে কে আসিয়া তাহার সর্ব্ব্ব আজ লুটিয়া লইবার উদ্ভোগ করিয়াছে!

আহার শেষ হইলে ইদা ও আর্জান্ত দুই জনে বসিয়া নানা গল্প আরম্ভ করিল। আর্জান্ত তাহাব অতীত জীবনের যত সুখ-দুঃখের কাহিনী বলিয়া যাইতেছিল, আর ইদা তন্ময় হইয়া তাহা শুনিতেছিল। বেচারা জাক দূরে একখানা ছবির বচি খুলিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে ঝঁক তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িল।

ইদা কহিল,—যাও জাক,—এখানে যুমিও না—কনস্টাকে ডাকো।

জাক করুণ দৃষ্টিতে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার ইচ্ছা, আর একটু সে মায়ের কাছে থাকে!

ইদা কহিল,—ছি, যাও। কথা শোনো। না হ'লে মাঠার মশায় বন্ধুবেন!

জাক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতৃ-আজ্ঞা পালন করিল।

ইদার সহিত আর্জান্তের ঘনিষ্ঠতা যত গাঢ় হইতে লাগিল, ততই জাক আর্জান্তের চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইল। ইদা আর্জান্তের জন্ত সব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু জাক—তাহার আদরের জাক—আহা, তাহার লাজনা ইদার বুকে শেলের মত আবাস্ত করে! জাককে ছাড়িয়া বরং সে থাকিতে পারে, কিন্তু জাকের কষ্ট চোখে দেখা—অসহ্য!

আর্জান্তের বিষ-দৃষ্টি হইতে জাককে দূরে রাখিবার ইচ্ছায় ইদা একদিন স্পষ্টই আর্জান্তকে কহিল,—চল, আমরা অগ্ন কোথাও যাই। আমার নগদ কিছু আছে, তা ছাড়া আমি খাটতে পারব।

আর্জান্ত সম্মত হইল না। সে বলিল,—এত শীত! না, আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর। আমার এক আশ্বীয়া আছেন, তাঁর যাবার সময় হয়ে এসেছে—শীতই কিছু দাঁও মারা যাবে! বুঝলে কি না।

ইহা বলিয়া আর্জান্ত ভবিষ্যতের এক মিলন-চিত্র আঁকিতে বসিল। ইদা মুগ্ধ হইল।

এইরূপে শীত কাটিয়া গেল!

একদিন জাক গ্লান-মুখে জানালার পাশে বসিয়া বসন্তের নীল আকাশের পানে চাহিয়া আছে। সেদিন বৃহস্পতিবার। জাক আর বড়-একটা স্কুলের বাহির হয় না! বসন্তের বাতাসে শীতের জড়তা কাটিয়া গিয়াছে। দলে দলে লোক রাস্তার বাহির হইয়াছে। জাক ভাবিতেছিল, এই সময় অগ্ন কোথাও যদি সে যাইতে পাইত!

এমন সময় হঠাৎ কে ডাকিল,—জাক!”

জাক ফিবিয়া দেখে,—তাহার মা। তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রের ধাবে বেড়াইতে যাইবে বলিয়া আসিয়াছে!

জাকের আশ্চর্য দেখে কে! সে তাড়াতাড়ি সব গোছগাছ করিবার জন্ত তাহার ঘরে যাইতেছে, এমন সময় হঠাৎ মাহুর সঙ্গে দেখা।

মাহুকে দেখিয়া জাক ইদাকে কহিল,—মা, মাহুকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল না!

ইদা কহিল,—মাহুকে কি এঁরা যেতে দেবেন?

—হাঁ মা, তুমি বললেই দেবে!

জাকের নিতান্ত ইচ্ছা দেখিয়া ইদা প্রস্তাব করিল। মাহু যাইবার অনুমতি পাইল। জাক তখন অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া উঠিল, বলিল,—মাহু, মাহু, শীগ্গির সব ঠিক কবে নাও।

গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে জাক জিজ্ঞাসা করিল,—কেমন মাহু, বেশ, না?

মাহু চারি দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল,—বেশ!

সমুদ্র-ধারের একটা হোটেলের আহালাদি করিয়া ইদা বলিল,—চল, এখানকার চিড়িয়াখানা দেখে আসা যাক!

শুনিয়া জাক আনন্দে লাফাইয়া উঠিল,—বাঃ—বাঃ, বেশ! মাহু কখনও চিড়িয়াখানা দেখে নি—তায়ও দেখা হবে!

এতক্ষণ মাহু জাকের খাতিরে পড়িয়া বসিতেছিল, তাহার আমোদ হইতেছে। কিন্তু চিড়িয়াখানা দেখিয়া বাস্তবিক সে শ্রীত হইল! কত দেশের কত শত পশুপক্ষী বন্দী হইয়া রহিয়াছে। কেন?—শুধু মাহুয়ের সুখের জন্ত! চিড়িয়াখানার উচ্চ প্রাচীর দেখিয়া জিম্-নাজের উঁচু দেওয়াল তাহার মনে পড়িল। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। মাহু ভাবিল,—তাহার অবস্থাও এই সকল জন্তর মত! সেও মাহুয়ের হাতে বন্দী—ইহাও

তাই! অসহায় পশু পক্ষীর নীরব বেদনাটুকু মাহু অন্তরে-অন্তরে অনুভব করিল।

হঠাৎ মাহু দেখিল, এক প্রকাণ্ড হাতীর পিঠে চড়িয়া কয়টি নরনারী মাহুর দিকে আসিতেছে! সূর্য্যের স্বর্ণাভ কিরণ পড়িয়া তাহাদের ভারী সুল্লর দেখাইতেছিল।

হাতী দেখিয়া দেশের কথা মাহুর মনে পড়িল। স্বদেশের স্মৃতির সঙ্গে অতীত সৌভাগ্যের কথা মাহুর মনে আসিল। অতীতের স্মৃতি মাহুর বর্তমান দুঃখবাহার কথা যেন আরও জাগাইয়া তুলিল। মাহু কেমন হইয়া গেল। জাক বলিল,—মাহু—মাহু, কি হয়েছে তোমার?

মাহু কোন উত্তর দিতে পারিল না। তার পর যখন সে শুনিল, সেও ইচ্ছা কবিলে হাতীব পিঠে চড়িয়া চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে পারে, তখন তাহার মুখের বিষম ভাব কতকটা কাটিয়া গেল।

জাক বলিল,—হুমি তবে হাতীতে চড়, আমি মার কাছে থাকি।

মাতা-পুত্র দুই জনে মাহুর হাতীব পিঠে চড়া দেখিতে লাগিল। কি স্বাভাবিক ক্ষিপ্তগতিতে মাহু হাতীর পিঠে উঠিয়া বসিল!

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহু মেজাজে ফিরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে যেন আবার দেশে ফিরিয়া গিয়াছে—তাহার নিজের রাজ্যে! পলকে চোখেব সম্মুখে দাঃমির রাজপ্রাসাদ ছবিব মত ফুটিয়া উঠিল—রণবাণ যেন কাণে আসিয়া পৌছিল। সে যে মোরোন্ডা-জিম-নাঃজেব একজন লাক্ষিত ছাত্র, এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেল।

হাতীর পিঠে চড়িয়া মাহু অনেকক্ষণ বেড়াইল।

ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। হাতী হইতে নামিতে হইল। আবার যে মাহু—সেই মাহু!

বাড়ী ফিরিবাব সময় হইল; জাকের মনে আব সে আনন্দ নাই! ইদাও বিমর্ষ-চিন্ত। কি যেন সে বলিবে-বলিবে করিতেছে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিতেছে না। এমনইভাবে কিছুক্ষণ কাটিল।

অবশেষে ইদা ডাকিল,—জাক!

জাক মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—কি—মা?

ইদা জাকের মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিল। পরে বলিল,—তোমার একটা কথা বলবো। শুনে তোমার দুঃখ হবে। কিন্তু...

জাক শব্দবাস্তে বলিয়া উঠিল,—না মা, ...তবে থাক—বলো না।

—না জাক, আমার বলতেই হবে। কথাটা হচ্ছে,—কিছু দিনের জন্য আমার একটু দূরে যেতে হবে। বিদেশে—

—কোথায়?

—ছি—কৈদো না! আমি তোমাকে চিঠি লিখবো—আর বেশী দিনও থাকবো না? বলিয়া ইদা জাককে সান্ত্বনা দিল।

জাক শুধু পাষাণের মত আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল; চোখের দুই কোণে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সমগ্র বিশ্ব যেন এক মুহূর্তে অন্ধকারে ঢাকিয়া গেল। চারিদিক স্তব্ধ হইয়া আসিল।

ইদার কোলেব কাছে বসিয়াও জাকের মনে হইতে লাগিল, আজ সে জগতে মাতৃহীন, একা, নিতান্ত অসহায়!

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রাজপুত্র

ইতাব কিছুকাল পবে জিম-নাঃজেব মোরোন্ডাব নামে আর্জান্টর এক পত্র আসিল।

মোরোন্ডাকে 'বন্ধু' সম্বোধন করিয়া কবি লিখিয়াছে,—অক্ষয় এক আত্মীয়ার মৃত্যু হওয়ায় তাহাব অবস্থাব পবিবর্তন ঘটয়াছে। কাজেই আব স্কুলে অধ্যাপনার কার্য কবা তাহার পক্ষে সুবিধা হইবে না। এজন্য নিতান্ত দুঃখের সতিত এ পবিত্র ব্রত পালন কবিত্তে সে অক্ষম হইতেছে ইত্যাদি। পত্রের নীচে 'পুনশ্চেব' ধেব ছিল। তাহাতে কয়েক ছত্রে লেখা ছিল, মাদাম বারাল্জিও সহসা পারিতে চলিয়া আসিয়াছেন, পুত্র জাককে পিতাব মত স্নেহপরাষণ অধ্যক্ষ মোরোন্ডার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, এমন বিশ্বাস মাদামের আছে। মোরোন্ডা যে জাককে পিতার মত স্নেহ করিবেন, মাদাম এ আশাও বাখেন। জাকের অসুখ-বিসুখ হইলে সে সংবাদ আর্জান্টকে দিলেই চলিবে, আর্জান্ট তখনই সে সংবাদ মাদাম বারাল্জিকে প্রেরণ কবিত্তে এতটুকু বিলম্ব করিবে না।

পিতার মত স্নেহপরাষণ! কি অসম্ভব বিক্রম! আর্জান্ট কি মোরোন্ডাকে জানে না? জাকের মা এ দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে,—জাকের তরফ হইতে একটি কপর্দক পাইবার সম্ভাবনা যখন ফুটাইয়াছে, তখন মোরোন্ডার নিকট জাক কেমন ব্যবহার পাইবে, তাহা আর্জান্ট বিলক্ষণ বুঝে! তবুও সে এ কথা লিখিয়াছে। বিক্রম!

পত্র পাঠ করিয়া বোবে স্কোভে মোরোন্ডার আপাদ-মস্তক জলিয়া উঠিল। সে অনলের তাপ জিম-নাঃজ-বাদী সকলেই সে দিন অল্লাধিক অনুভব করিল।

মাদাম চলিয়া গিয়াছে? সেই ভিখারী কদর্য লোক-টার সহিত চলিয়া গিয়াছে? লোকটার না আছে বুদ্ধি,

না আছে নিজের এতটুকু সামর্থ্য! একটা দান্তিক, মূৰ্খ অপদার্থ জীব! আর সেই নারী? সে এতটুকু বিধা করিল না! স্বচ্ছন্দে ছেলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। কি স্বদয়-ভীনা, পাষাণী!

পত্রখানা ভাঁজ করিয়া পকেটে বাথিতে রাখিতে মোরোন্ডা একটা ক্রুর হাসি হাসিল, ভাবিল, বাপের মত যত্ন করিব আমি! বটে! বাপের মত যত্ন! হুঁ!

সম্ভাবিত মাসিক-পত্রের সকল আশা লুপ্ত হইল বলিয়াই যে মোবোন্ডাব এতখানি আক্রোশ হইয়াছিল, তাহা নহে। এ আক্রোশের প্রধান কারণ ছিল, হিংসা! অর্জাস্ত ও ইদা,—এ দুইটি প্রাণী প্রথম সাক্ষাৎ-অবধি আপনাদিগকে যেমন একান্ত ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তেমনই উভয়ের চতুর্দিকে তাহারা এমন একটি দুর্দৃশ্য অস্তুরাল রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, যাহার মধ্য দিয়া ভিতরকার এতটুকু গোপন বহন্ত মোরোন্ডাব সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নাই! এমন কবিতা চতুর মোরোন্ডাব চক্ষু উভয়ে ধূলি নিক্ষেপ করিবে এবং এত শীঘ্র—মোবোন্ডা তাহা কল্পনা কবে নাই!

আর জাক! সে জিম-নাজেই থাকিবে! কিন্তু তাহার টাকা জোগাইবে কে? টাকা! মোরোন্ডা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সংবাদ লইতে গিয়া কনুস্তার মুখে শুনিল, মাদাম বারালি এখানকার বাস একরূপ উঠাইবাইট সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহাব ফিরিবার সম্ভাবনা বড়-একটা নাই!

জিম-নাজে ফিরিয়া আসিয়া মোবোন্ডা স্থির করিল, আর একটা মাস শুধু জাক এখানে স্থান পাইবে। টাকা আসে, ভালো—নহিলে উদার আকাশের তলে সে আপনার আশ্রয় খুঁজিয়া লউক।

সে দিন জাক আতাবের সময় মোবোন্ডাব পাশে স্থান পাইল না! আহাৰ্য্য যাহা মিলিল, নিতান্ত নিকৃষ্ট ধরণের। জীবনে এমন আহাৰ্য্যের সহিত জাকের কখনও পরিচয় ঘটে নাই। তাহাব উপর মোরোন্ডাব দৃষ্টি আজ কি ক্রুর, কি ভীষণ!

মাহুব কাছে আসিয়া জাক ডাকিল,—মাহু!

মাত্র তখন আপনার মনে কি ভাবিতেছিল। জাক কহিল,—তুমি গান গাইচো না কি, মাহু?

মাহু কহিল,—না—একটা কথা আমি ভাবছিলুম!

জাক মাহুকে তখন আপনার কাহিনী খুলিয়া বলিল। তাহার মা,—যে মা ছাড়া জগতে সে আর কাহাকেও জানে না,—সেই মা তাহাকে এখানে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আর কিরিবে কি না, তাহার কোন স্থিরতা নাই!

বন্ধুর নিকট মাহু তখন আপনার মতলব খুলিয়া বলিল। এতক্ষণ ভাবিয়া এই মতলবই সে ঠিক করিয়াছে।

মাহু স্থির করিয়াছিল, সে জিম-নাজ ত্যাগ করিবে। নিশ্চয়! অনেক দিন হইতে কথাটা সে ভাবিয়া আসিতেছিল, কিন্তু এতখানি দৃঢ়সঙ্কল্প পূর্বে হইতে পারে নাই। অন্ধকার জীবনে এখন সূর্য্যোদয়ের ঈষৎ সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। এক কষ্ট, এ দাসত্ব আর সহ্য হয় না। সেদিন চিড়িয়াখানায় গিয়া সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে। মুক্ত বায়ুর সে স্পর্শ কি স্নিগ্ধ, কি মধুর! সে স্পর্শে প্রাণ তাহার নূতন চেতনা লাভ করিয়াছে! বাহিবেব মিষ্ট বায়ু সেদিন যাহা ভোগ করিতেছিল, পিঞ্জরবন্ধ বেচারী পশুগুলা তাহা হইতে বঞ্চিত ছিল। নিয়মিত সময়ে পবিমিত আহাৰ, সে কি কষ্টের! তাই সে স্থির করিল, যেমন কবিতা পাবে, দাৰ্জমিতে ক্যারিকার কাছে সে ফিরিয়া যাইবে। চেষ্টাব অসাধ্য কি আছে? জাক যদি রাজী হয়, তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মাহু প্রস্তুত। পথে কোন ভয় নাই, গ্রি-গ্রিও প্রসাদে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।

জাক কিন্তু রাজী হইল না! প্রথমে সূর্য্যকিরণে তপ্ত মাহুব সে বনের গৃহেব চেয়ে দুঃখ-দারিদ্র্য-ঘেবা জিম-নাজেব এ বায়ু ও আলোক-হীন ঘরও টেব ভালো।

মাহু কহিল,—বেশ, তুমি তবে এখানেই থাকো। আমি একলাই যাবো।

জাক কহিল,—কখন যাবে, তুমি?

মাহু কহিল,—কাল ভোরে।

পদদিন বেলা অধিক হইলে জিম-নাজে একটা বব উঠিল। ভোবে মাহু বাজাবে গিয়াছে; বেলা এগাবোটা বাজে, এখনও তাহাব দেখা নাই। এখনও কেহ খাইতে পায় নাই। মাদাম মোবোন্ডা কহিল,—নিশ্চয় পথে তাব কোন বিপদ ঘটেছে।

মোরোন্ডা কিছু বলিল না। দীর্ঘলাঠি হাতে অধীর আগ্রহে মধ্যে মধ্যে জিম-নাজেব দ্বারে আসিয়া মোবোন্ডা দেখিতেছিল, কখন সে কাফ্রীটা ফিরিয়া আসে!

কিন্তু কাফ্রী ফিরিল না। মাদাম মোরোন্ডা অবশেষে নিকটেব একটা দোকান হইতে আহাৰ্য্য আনিয়া জিম-নাজকে আসন্ন মৃত্যুব হাত হইতে রক্ষা করিল। আহাৰাদির পর মোরোন্ডা কহিল,—তাব কাছে টাকাকড়ি কত ছিল?

—পনেরো ফ্রাঙ্ক!

—পনেরো ফ্রাঙ্ক! তা হলে নিশ্চয় সে পালিয়েছে।

ডাক্তার হারুজ কহিল,—পনেরো ফ্রাঙ্কে তো আর দাহমি যাওয়া যায় না!”

মোরোন্ডা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া মাথায় টুপি উঠাইয়া ধানায় চলিল।

যেমন করিয়া ইউক, এই মাহুকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। মার্শেল অবধি যেন সে না যায়। বনফিলদের কাণে যেন এ কথা না ওঠে। ছুনিয়ার চারি দিকে

কেবল ঈর্ষা, কেবলই গভীর বড়বন্দ। রাজপুত্র জিম-নাভের নিন্দা করিলে নিকর্যা সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ। এখনই কুকুরের মত চীৎকার করিয়া উঠিবে। জিম-নাভের প্রতিপত্তি নিমেষে অমনি টুটিয়া যাউবে! কাজেই সকলের মুখে চাপা দেওয়া দরকার! ভিতরকার বহন্য এতটুকুও না প্রকাশ হইয়া পড়ে!

পুলিশের নিকট মোবোনভা যে বিবরণ লিখাইল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—মাতৃ অনেক টাকা-কড়ি লইয়া জিম-নাভ হইতে পলাইয়াছে, কিন্তু সেদ্ধম্ম মোবোনভা কাতর নহে। হতভাগা, বিদেশী রাজপুত্র,—আহা, বয়সে বালকমাত্র,—পথে কত বিপদে পড়িতে পাবে। তাই—কথাটা বলিয়া মোবোনভা ক্রমালে চোখ মুছিল। ইনস্পেক্টর আশ্বাস দিল,—ভাবনা কি, মাসিয়ো, নিশ্চয় আমরা তাকে খুঁজে বার করবো!

মোবোনভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ইনস্পেক্টরের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল,—তাকে খুঁজে দাও। বেচারি রাজপুত্র! চিরদিন তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

চালিধারে সন্ধান চলিতে লাগিল। পারি সহবের সমুদয় ফটকে প্রহরীর দল সতর্ক রহিল। কষ্টমেব কক্ষ-চারীও কাছে কাফী বালকের আকৃতির পুখারুপুখা বিবরণ লিখিয়া পাঠানো হইল। জিম-নাভের বালকের দলকে লইয়া মোবোনভা-হার্জ স্কালে-সন্ধ্যায় নানা পথে ঘুরিয়া বেড়াইল। কিন্তু কোন ফল হইল না।

রাত্রে ঘরে ফিরিয়া জাক ভাবিতে লাগিল, মাতৃ এতক্ষণে কত—কত দূর গিয়াছে! তাহাব মাথার উপর এই যে অসীম অনন্ত আকাশ, মাতৃ মাথার উপরও সেই একই আকাশ! আকাশ তাহাদের দুইজনকে দেখিতেছে, অথচ মাতৃ ও জাকেও মধ্যে কি অলজ্ঞা ব্যবধান! কহ কতাকে দেখিতে পাইতেছে না।

রাত্রে মাতৃর শূন্য বিছানা দেখিয়া জাক ভাবিল, মাতৃ পলাইয়াছে। এখনও চলিয়াছে! কে জানে, কোন্ পথে! সে পলাইতেছে! পলাও, পলাও, মাতৃ—প্রাণপণে ছুটিয়া পলাও!

তার পর জাক নিজের কথা ভাবিতে লাগিল। মা—কোথায় মা? আর কি কখনও জীবনে মা'র দেখা মিলিবে না? দারুণ দুঃখে তাহার বুক ভবিয়া উঠিল। চোখে অশ্রুর সাগর বহিল।

এমন সময় কক্কড় শব্দে বাহিরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল। ঝম ঝম করিয়া মুখলপারে বৃষ্টি নামিল। শিলা ও ঘন তুষারপাতের বিরাম নাই! জাক ভাবিল, আহা, এই জলে পথে মাতৃর কতই কষ্ট হইতেছে! পরে মাতৃর কথা ভাবিতে ভাবিতে জাক কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না। ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখিল, কি সতর্ক সজ্জিত গতিতে মাতৃ পলাইতেছে—ঐ

মাতৃ, ঐ যায়! সহসা এক বিকট উল্লাস-চীৎকারে চমকিয়া জাক জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া সে শুনিল, বাহিরে একটা বিপুল কলবব উঠিয়াছে! জাক বিছানা ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একজন কহিল, মাতৃকে পাওয়া গেছে, জাক!

জাকে বুকটা ধক্ কবিয়া উঠিল। ধরা পড়িয়াছে—এ্যা! বেচারি মাতৃ! আহা, নিতান্ত অভাগা।

জিম-নাভের ছাত্রের দল সার দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অধ্যাপকের দল বসিয়া, আর মোবোনভার সম্মুখে কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়াইয়া বেচারি মাতৃ! তাহার চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, মুখ শুষ্ক, পোষাক কাদা-মাখা, স্থানে স্থানে হিঁড়িয়া গিয়াছে! এই মাতৃ! কয়দিনে তাহার কি পরিবর্তন হইয়াছে!

মাতৃ জাকে পানে চাহিল! উভয়ের চোখে নীবব বেদনার কি ভাষা যে ফুটিয়া উঠিল, তাহা তাহাবাই বুঝিল। সে ভাষা বুঝিবার অপর লোক জিম-নাভে ছিল না।

পুলিশের লোক চলিয়া গেলে মাতৃর শাস্তি আবস্ত হইল! তীব্র তিরস্কারেব সতিত পৃষ্ঠেব উপর মোবোনভার কশাব ভীততব আঘাত পড়িল,—এক, দুই, তিন, চার। মাতৃ মুচ্ছিত হইয়া ভূমে লুটাইয়া পড়িল। জাক কাঁপিতে কাঁপিতে দেওয়ালে ভর দিয়া কোনমতে আপনাকে সামলাইয়া বাসিল।

পরদিন জাক মাতৃকে আর একটি বারও দেখিতে পাইল না। রাত্রে তাহারই পাশে বিছানায় মাতৃ শুইয়া-ছিল; নিকটে মোবোনভা, মাদাম মোবোনভা ও ডাক্তার হার্জ।

মোবোনভা কহিল,—অসুখটা কি বড় বেশী, ডাক্তার? মাদাম কহিল,—ভয় আছে?

হার্জ কহিল,—ভয় আবার কি! এ কাফী-ব্যাটারের প্রাণ লোহার মত শক্ত!

তাহাবা চলিয়া গেলে, জাক আসিয়া মাতৃর পাশে বসিল, ডাকিল,—মাতৃ—

কে? জাক—

জাক কহিল,—হাঁ, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে, মাতৃ! অসুখ করেছে কি?

মাতৃ আর বাঁচবে না, জাক। তার খি-খি কোথায় হারিয়ে গেছে।—

জাক স্থির অবিচল নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মাতৃ ডাকিল,—জাক!

—কেন, মাতৃ?

—দাঁগমিতে আর আমার যাওয়া হলো না!

এক ফোঁটা গরম জল মাতৃর কপালের উপর পড়িল।

মাতৃ কহিল,—জল পড়লো কোথা থেকে? তুমি কাঁদচো জাক?

—না ভাই, ঘুমোও মাতৃ। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দি! কেমন? জাকের স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। চোখ সজল হইল।

—না, না,—তুমি যাও জাক! মোরোন্ডা যদি দেখে, তোমাকেও আস্ত রাখবে না! এদের তুমি চেনো না—এরা মাহুষ নয়, রাক্ষস!

সকালে মাতৃর অবস্থা আরও খাবাপ হইল। চेतনা কেমন থাকিয়া থাকিয়া লোপ পাঠিতেছে—ভুল বকুনি শ্রুত হইয়াছে। ডাক্তার হারুজ নিজের মৌলিকতা জাহির করিবার জন্ত মাতৃর চিকিৎসায় নূতন ব্যবস্থা নির্দেশ করিল। বাগানে গাছের তলায় মাতৃর জন্ত খড়ের বিছানা পড়িল। তাব পর হারুজের নানাবিধ উদ্ভট ঔষধ-প্রক্রিয়া চলিতে লাগিল। কিঞ্চ তাহাতে কোন ফল পাওয়া গেল না। শেষ রাত্রে মাতৃর সকল দুঃখের অবসান হইল! মাতৃ মরিয়া ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল।

মোরোন্ডা আদেশ দিল, খুব ঘটা কবিতা কবরের ব্যবস্থা করিতে হইবে!

এমন ঘটা সে দরিদ্র পল্লীতে কেহ কখনও চক্ষে দেখে নাই!

অজস্র সাদা ফুলে কফিন ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অধ্যাপক ও ছাত্রের দল শবের পশ্চাতে নত মস্তকে মিছিল করিয়া পথে বাহির হইল। এ শব রাজপুত্রের। তাই শোক-যাত্রার আয়োজনও সাধ্যাতিরিক্ত হইল! মিছিলের চটকে বিজ্ঞাপন জাহির করা যাইবে যে। সারা নগর প্রদক্ষিণ করিয়া এক নিভৃত বন-প্রান্তে মাতৃর দেহ সমাহিত করিয়া সন্ধ্যার সময় সকলে জিম-নাজে ফিরিল।

ফিরিবার সময় পথে জাক ইচ্ছা করিয়া পিছাইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার যখন নিবিড় হইয়া আসিল, তখন একটা গলির মোড় বাঁকিবার সময় সকলের অলক্ষ্যে সে সেই অন্ধকারে কোথায় মিশাইয়া গেল!

তীর ছাড়িয়া অনাদৃত অসহায় বালক জগতের বিপুল কর্কশত্রেতে বাঁপ দিল। সে স্রোতের বেগে ভাসিয়া সে কোথায় যাইবে, সে কথা মুহূর্তের জন্ত সে ভাবিয়া দেখিল না।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতৃ-সান্নিধ্যে

দৌড়িলে পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে, এই ভয়ে জাক দৌড়িল না, ধীরে ধীরে চলিল।

গতি ধীর হইলেও কিছুমাত্র বিঘ্নের আশঙ্কা দেখিলেই যাত্রাতে ছুটিয়া পলাইতে পারে, সে বিষয়ে কিন্তু সে সতর্ক রহিল। খানিকটা পথ এইরূপে চলিয়া তাহার মনে হইল, এইবার একবার সে ছুট দেয়! ধীরে চলিবার পক্ষে যে ধৈর্যের প্রয়োজন, তাহা আর বশ মানিতেছিল না। উষ্মেগে অধীরতা ক্রমেই অসহভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল। তবু সে ছুটিল না, ধীরেই চলিল। গৃহের পানে সে চলিয়াছিল।

সেখানে গিয়া কি দেখিবে? শূণ্য—শূণ্য ঘর! মা নাই! তাহা হইলে সে কি করিবে? মার সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে! কি কবিলে পাওয়া যাইবে!

না পাওয়া যাক, তবু জিম-নাজে সে আর ফিরিবে না! ফিরিবার উপায়ও সে রাখিয়া আসে নাই! সেখানে ফিরিবার কথা, মুহূর্তের জন্ত তাই জাকের মনে উদয় হইল না। যদি বা হইত, মাতৃর পৃষ্ঠে কশাব সেই তীব্র আঘাত, মাতৃর সেই সত্যতর ক্রন্দন, প্রচণ্ড শাস্তি—সে কথা মনে পড়িতে তাহার দেহ রোমাক্ষিত হইয়া উঠিল।

ঐ সে বাড়ী—আলো জলিতেছে! মা তবে আছে! খোলা জানালায় মধ্য দিয়া বিচ্ছুরিত আলোক-বশি বাহিরে পথে পড়িয়াছিল। তাহা দেখিয়া জাকের চিত্ত আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। মা না থাকিলে গৃহের প্রতি কক্ষে এত আলো জলিবে কেন? তবে মা আছে! নিশ্চয় আছে! কিন্তু যদি এখনই কেহ বলে, বাহির হইয়া যাও? জাক দ্রুত বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

এ কি! বাড়ীতে এত ভীড় কেন? চেয়ার, টেবিল, সোফা, কৌচ, ছবি, আলনা প্রভৃতি হল-ঘরে বিক্ৰিপ্ত স্তূপাকারে রাখা হইয়াছে। ব্যাপার কি? নানা লোকে নাড়া-ঢাড়া করিয়া জিনিষপত্র লইয়া—ও কি করিতেছে! ভিড় ঠেলিয়া জাক একেবারে ভিতরের ঘরে প্রবেশ করিল। মার শয্যা, খাট, এ-সবের এমন অবস্থা কেন? তাহার নিজের বিছানাও মাথায় বহিয়া কে ও বাহির হইয়া যায়?

জাক তাহার হাত ধরিল, সবেগে কহিল,—আমার বিছানা কোথায় নিয়ে যাচ্ছ! এ আমার বিছানা! জাক বিছানা ধরিয়া টানিল।

লোকটা সবিস্ময়ে জাকের মুখের পানে চাহিল। এমন সময় কনকর্ণা আসিয়া কহিল, এ কি, জাক যে! তুমি কোথা থেকে? স্থূল থেকে বুধি? কার সঙ্গে এলে?



মা কৈ, কনস্তুঁ? নম্র স্বরে জাক জিজ্ঞাসা করিল,  
মা—?

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা আশঙ্কা স্রুতি ছিল। উত্তরে  
না জানি, কি শুনিবে?

মা এখানে নেই, জাক! তা বুঝি তুমি জানো না?

মা কোথায়? এরা কি কচ্ছে? কারা এরা?

দিনের বেলায় এ-সব নিলেম হয়ে গেছে—তখন  
যারা জিনিষ-পত্র নিয়ে যেতে পারেনি, এখন তারা  
এসে নিয়ে যাচ্ছে। এসো, তুমি ভিতরে এসো,  
স্নানঘরে এসো। সেইখানেই কথা হবে।

রান্নাঘরের পথে পুতান ভৃত্যের দল জাককে ঘিরিয়া  
ফেলিল। পাছে ইতারা তাকে ধরিয়া জিম নাজে  
বাধিয়া আসে, এই ভয়ে জাক কাহাকেও খুলিয়া বলিল  
না যে, সেখান হইতে সে পলাইয়া আসিয়াছে। সে  
বলিল, ছুটি পাইয়া মাকে একবার দেখিবার জন্ত সে  
বাড়ী আসিয়াছে।

কনস্তুঁ কহিল,—মা এখানে নেই—কোথায় গেছে,  
তা—

—কথা বাধিয়া গেল। কনস্তুঁ আবাব বলিল,—  
আহা, এমন ছেলে ফেলে চলে গেল! এর কাছে  
লুকোতে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছে! না, না, জাক,  
মা কোথায় গেছে,—বলছি। পারি ছাড়িয়ে এতিয়োল্  
বলে যে গাঁ আছে—মা সেইখানে।

—সে কি অনেক দূরে?

—হ্যাঁ। এখান থেকে প্রায় বাবো ফোশ।

এতিয়োল্—এতিয়োল্! জাক মনে মনে বাবাব  
ঐ নাম উচ্চারণ করিল। এতিয়োল্! নামটা সে  
মুখস্থ করিয়া ফেলিল।

কনস্তুঁ কহিল,—ছোট-খাটো কতকগুলো বাগান  
আছে—তাবই কাছে ছোট একখানি বাড়ী। স্কন্দর  
বাড়ীটি,—বাড়ীর নাম আরাম-কুঞ্জ। মা সেইখানে আছে।

একান্ত আগ্রহে জাক কথাগুলি শুনি। এখান  
হইতে যে পথ ব্যার্সি গিয়াছে—সেই পথ ধরিয়া চলিয়া  
ব্যার্সি, শারান্ত, বিলেহুভ-স্যাং-জর্জ পার হইলে একটা  
বড় পার্ক দেখা যাইবে। তাহারই বায়ে লায়নের পথ—  
সে পথে না গিয়া ডাহিনে যে পথ করবেই গিয়াছে, সেই  
পথ ধরিয়া সিন্ নদীর ধাব দিয়া বরাবর গেলে সেনার্টের  
জঙ্গল; সেই জঙ্গল পার হইলেই এতিয়োল্!

দূরত্বের কথা শুনিয়া জাক ভয় পাইল না। সারা  
পথ সে হাঁটিয়া যাইবে। আজ রাত্রে সে চলিতে  
আরম্ভ করিবে। এখনই। আজ সারা রাত্রি, তার পর  
কাল সারা দিন চলিলেও কি এতিয়োল্ পৌঁছানো যাইবে  
না? পথে কত লোক চলিতেছে—অনাথ, আতুর,  
ভিখারী—তাহাদের ত গাড়ী চড়িবার পরদা মিলে

না, হাঁটিয়া তাহারা দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া বেড়ায়। তবে  
জাকই বা কেন হাঁটিয়া এতিয়োলে পৌঁছিতে পারিবে  
না? যেমন করিয়া হউক, এতিয়োলে সে যাইবেই, মাকে  
সে দেখিবেই! কিসেব ভয়!

জাক বলিল,—তবে আমি স্কুলে চললুম, কনস্তুঁ।  
আব-একটা কথা জানিবার জন্ত প্রাণ আকুল হইয়া  
উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, একবার সে জিজ্ঞাসা  
কবে, সেই আর্জান্ত ও কি এতিয়োলে আছে? সেই  
শব্দটাই কি মাতা-পুত্রের মধ্যে এ ব্যবধান ঘটাইল?  
কিন্তু কথাটা জাকের মুখে বাড়িয়া গেল—বাতির হইল  
না।

—তবে, এস জাক,—বাত হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে কেউ  
যাক, না হয়!

—না, না, কোন দরকার নেই।

বালকের মনে একটা দুর্জয় অভিমান জাগিয়া  
উঠিয়াছিল! একটা দারুণ দাহ। মা—যে মাব জন্ত  
জাকের মনে এতটুকু শাস্তি নাই! যে মাকে দেখিবার  
জন্ত জাকের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, যে মার সংবাদ  
একদণ্ড না পাইলে জাকের বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়  
না—সেই মা, তাকে ভুলিয়া, তাহার কোন সংবাদ  
না লইয়া দিব্য নিশ্চিন্ত আরামে বহিয়াছে। জাক  
ভাবিল, মার কাছে গিয়া মার কোলে মাথা রাখিয়া যদি  
সে এখন মরিতে পারে, তবেই মাব এই অবহেলা-  
অনাদরের চূড়ান্ত গোণ লওয়া যায়! তাহাবও অশাস্ত  
প্রাণ চিরদিনের জন্ত জুড়াইয়া বাঁচে। আঃ, কি সে  
গভীর তৃপ্তি!

কনস্তুঁ ও ভূতাবর্গের নিকট বিদায় লইয়া জাক পথে  
বাহিব হইল।

চারিধাব তখন কুয়াশার ভরিয়া গিয়াছে। সেই ঘন  
কুয়াশাব মধ্যে পথেব আলোগুলা উষাব আকাশে দীপ্তি-  
হীন পাণ্ডু নক্ষত্রের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছিল।  
এক অজানা ভয়ে জাকের বুক মাঝে মাঝে কাঁপিয়া  
উঠিতেছিল! কত—কত দূর—তাহাকে যাইতে হইবে!  
কত পথ চলিতে হইবে! উপায় নাই! চলিতেই  
হইবে! না হইলে সেই দুর্দান্ত মোরোন্ডাব হাতে  
পড়িলে আর রক্ষা থাকিবে না! প্রতি মুহূর্তে তাহাব  
আশঙ্কা হইতেছিল, এখনই বুঝি ধরা পড়ে! পথে কোনো  
কনষ্টেবলের লঠন দেখিলে জাকের বুকটা ধক্ করিয়া  
ওঠে, বুঝি, সন্ধান পাইয়া তাহাকেই সে ধরিতে  
আসিতেছে। দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর শুনিলে জাক  
কাঁপিয়া ওঠে—মনে হয়, কে যেন তাহাবই সন্ধান বলিয়া  
দিতেছে। জাক উর্ধ্বে আকাশের পানে চাহিল। মনে  
হইল, সারা আকাশ নিস্তব্ধভাবে যেন তাহাবই গতি লক্ষ্য  
করিতেছে। দেখি, কোথায় যায়! যেমন সে বিশ্রাম

কবিত্তে বসিবে, অমনই সকলে মিলিয়া তাহাকে ধরিয়া ভ্রিম-নাঞ্জে চালান করিয়া দিবে! নিস্তন্ধ বাড়ীগুলো, নিস্তন্ধ আকাশ, নিস্তন্ধ প্রকৃতি,—সকলে মিলিয়া যেন তাহারই বিরুদ্ধে এক গভীর বড়বয় আঁটিতেছে! এ না কে বলে, ধরো, ধবো, জাককে ধরো—এ সে পলায়!

সারারাত্রি ধরিয়া জাক পথ চলিল। যখন ভোর হইল, তখন দেখ তাহাব অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তবু বিরাম নাই। চলিয়াছে, সে চলিয়াছে! এ দীর্ঘ পথে একটা যন্ত্রের মত শুধু সে চলিয়াছে! উদাস দৃষ্টি, শুষ্ক মুখ—যেন প্রাণহীন, মনহীন একটা পুতুলকে দম দিয়া কে পথে ছাড়িয়া দিয়াছে!

পথে আবও কত লোক চলিয়াছে। কণ্ঠ-চক্রেব ঘর্ঘর-রবে চারিদিক মুখরিত। সে শব্দে সকলেই নিজের মনে দিশাহারা ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহাদেব সকলের দৃষ্টি যে জাক এড়াইয়া চলিবে, তাহা আব বিচিত্র কি! জাকেব শুক মুখেব দিকে ফিবিয়া চাচিবাব অবসবও কাহারও ছিল না।

ক্রমে বোঁজ পড়িয়া আসিল। এখন নদীর ধার দিয়া পথ—জাক সেই পথে চলিল। অপবাহুর বায়ু তখন সূর্য্যেব শেষ বশ্মিকগাঙলিকে উড়াইয়া ছড়াইয়া ছুটিয়া ফিরিতেছে। দিনেব গান শ্রান্ত হইয়া থামিয়া আসিতেছিল! কর্ম্ম ক্রান্ত ধরণীর তপ্ত নিশ্বাস নদীর জলে মিশিয়া লাইহেছিল! প্রকৃতি যেন মূর্ছাতুর হইয়া পড়িয়াছে। আলোকের বেখাব উপর ধীরে ধীরে কে একখানি সূক্ষ্ম কালো পর্দা টানিয়া দিতেছিল। ক্রমে চারিদিকে আঁধার নামিল।

দীর্ঘ সারা বাক্তি, সাবা দিন ধরিয়া জাক পথ চলিয়াছে। এখন যেন পা ছুইখানা আব চলিতে চাহে না! অবশ হইয়া আসিয়াছে! জাকেব মনে হইল, আব না,—এইবার ভূমিতে দেহভাব লুটাইয়া দি, জন্মেব মত এ পথ-চলার বিবাম হইয়া যাক! কিন্তু না। মা—মা—কোথায় মা! মাকে দেখিতে হইবে!

বিশ্রাম কবিত্তে বসিলে এখন চলিবে না—বিলম্ব হইবে! যেমন করিয়া হটুক, মাব কাছে পৌছিতে হইবে। যদি মৃত্যু আসিয়া দেখা দেয়? না, না, এখন নয়,—ওগো জীবন, মার কোলে হুঁচকা বালককে একটিবার শুধু টানিয়া লইয়া চলো গো। তার পব ছাড়িয়া দিয়ো! হে বন্ধু, আব কিছুক্ষণ সঙ্গে থাকো!

তখন গভীর বাক্তি। গ্রামের পথে ক্ৰটিং আলো দেখা যায়! অন্ধকারে চারিধার ভরিয়া গিয়াছে! গ্রামের পথে জন-মানবের চিহ্ন নাই, সে-ই শুধু চলিয়াছে। একবার সে বসিল; বসিয়া আকাশের পানে চাহিল। তাহাব জ্বিত শুকাইয়া আসিয়াছিল—পা ছুইটা বিবম ভারী বোধ হইতেছিল! এ ভার টানিয়া লইয়া যাইবার

শক্তি বৃষ্টি ফুরাইয়াছে! এমন সময় সহসা সে দেখিল, ছুইটি আলোক-বশ্মি তাহারই দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে!

আলোক-বশ্মি ক্রমে সম্মুখে আসিল। একখানা গাড়ী।

জাক চীৎকার করিয়া ডাকিল,—মশায়—

তাহাব জ্বিত জুড়াইয়া গিয়াছিল। স্বব প্রথমে বাহিব হইল না। প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া জাক আবার ডাকিল,—মশায় গো, একবার গাড়ী থামান।

গাড়ী ঈষৎ অগ্রসর হইয়াছিল; থামিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল,—কে তুমি?

—আমায় গাড়ীতে নিন, আমি আর চলতে পাচ্ছি না। সাবা রাত হেঁটেছি। আর পাচ্ছি না।

—কোথায় যাবে তুমি?

—সেনার্টে!

—বেশ। এসো আমাব সঙ্গে—আমি এতিয়ালে যাচ্ছি! পথেই সেনার্ট।

গাড়ীতে উঠিয়া আবোহীব প্রশ্নে জাক শুধু এইটুকু বলিল, সে একটা স্থলের বোর্ডিংএ থাকে। সেনার্টে মার অন্তর হইয়াছে গুনিয়া প্রত্যাখের প্রতীক্ষায় থাকিতে না পারিয়া ইটিয়াই সে সেখানে চলিয়াছে! মা ছাড়া জগতে তাহাব আর কেহ নাই।

লোকটি কহিল,—আমার বাবাব পথেই সেনার্ট, তার পর একটা জঙ্গল পাব হয়েই এতিয়োল। আমি এতিয়ালে যাণো। তোমায় সেনার্টে নামিয়ে দিয়ে বাবো'খন, এস।

জাকেব মনে অহুতাপ হইল। কেন সে মিথ্যা বলিল? সত্য করিয়া কেন সে বলিল না, যে সে-ও এতিয়ালে যাইবে! সেনার্টে তাকে নামাইয়া দিলে আবাব বাকী পথটুকু ইটিয়া যাওয়া কি তাহাব পক্ষে সম্ভব হইবে? সে শক্তি তাহার নাই। হায়, হায়, কেন এ দুর্বল হইল? সে ভাবিল, এখন শুধরাইয়া লইয়া, সত্য কথাটা বলিবে কি? কিন্তু না! তাহা হইলে ইহার মনে সন্দেহ হইবে। কি জানি, তখন বাণ করিয়া আবাব যদি নামাইয়া দিয়া যান! সত্য বলিবাব সাহস—না, জাকেব আজ তাহা নাই! কি হুঁচকা সে!

গাড়ী চলিতেছিল, জমাট অন্ধকার ভেদ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা জাক গুনিল,—এই তোমার সেনার্ট—নামো।

জাকেব মনে হইল, কে যেন তাহাকে নিরাপদ আশ্রয়-নীড় হইতে টানিয়া সহসা এক অন্তল গহ্বরে নিক্ষেপ করিল। কি ভয়ঙ্কর! এবার নামিতে হইবে! হাঁ, নামিতেই হইবে। অন্ধকারে জাকেব নামাইয়া দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল।

অবসন্ন চিত্তে পথের প্রান্তে সে বসিয়া পড়িল। গাড়ীর আলো ক্রম ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে মিলাইয়া গেল! শীতল বায়ু বহিতেছিল। স্নগভীর ক্লান্তিতে জাকের অমুভব করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল। তাহার মনে হইল, তাহার চারি পার্শ্বে সুবিশীর্ণ ক্ষেত্রগুলি নিবিড় জঙ্গলে ভরিয়া রহিয়াছে! গাছেব পাতা কাঁপাইয়া বায়ু বহিতেছে—নৈশ প্রকৃতির বিরাট গানে প্রাস্তব মুখবিত—ইহাব মধ্যে বসিয়া জাক কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতে পারিল না!

সহসা ভীষণ শব্দে চমকিয়া সে জাগিয়া উঠিল। অন্ধোন্মীলিত নেত্রে চাহিয়া সে দেখে, একটা সুদীর্ঘ আলোকপুচ্ছ-ধারী রাক্ষস সশব্দে অদূরস্থ বনপথ দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার দীপ্ত লোহিত চোখ দুইটা আগুনের মত জ্বলিতেছে! পরক্ষণে বাঁশীর শব্দ শুনিয়া সে বুঝিল, না, ওটা রাক্ষস নহে, অদূরে লৌহ-পথ দিয়া একগানা ট্রেন সবেগে চলিয়া গেল!

এখন কয়টা বাজিয়াছে? সে কোথায়? কতক্ষণ ঘুমাইয়াছে? কিছুই জানে না! ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন দেখিয়াছে, মাদুর কবরের উপর মাথা রাখিয়া যেন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। মাতৃ তাহার শ্রান্ত শিরে হাত বুলাইতেছিল। সেই হিম-শীতল স্পর্শে তাহাব দেহেব সমস্ত বস্ত্র জমিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছিল। মাদুর দিকে ফিরিয়া চাঙিতে চটকরিয়া তাহাব মনে পড়িল, এ কি,—মাতৃ না মরিয়া গিয়াছে! ভয়ে কাঁপিয়া তাই সে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই নিস্তব্ধ অন্ধকার বাত্রে মাদুর কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায় জাকেব ভয় বাড়িয়া উঠিল। এখন নিদ্রা গেলে স্বপ্নে মাতৃ আসিয়া যদি আবাব দেখা দেয়! মাদুর সে মূর্তি মনে কবিত্তে অঙ্গ তাহাব শিহরিয়া উঠিল।

আবার সে চলিতে আরম্ভ করিল। আরও কত পথ চলিলে বনেব শেষ মিলিবে! কি সুদীর্ঘ যাত্রা এ,—অফুরান পথ!

এমন সময় অদূবে একটা মোরগ ডাকিয়া উঠিল। আকাশের পিছনে উষা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহারই ভূষণেব হেমচ্ছটা আকাশের কালো পর্দা ভেদ করিয়া ঝিক্-ঝিক্ করিতেছিল। সমস্ত প্রকৃতি স্তব্ধভাবে উষার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কোথায় উষা? এসো তুমি, তোমার কিরণে জগতের এ নিবিড় অন্ধকার দূর করিয়া দাও! শ্রান্ত অসহায় বালককে আশা ও উত্তাপ দিয়া এ হিম হইতে পরিত্রাণ কর! তোমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্ত সে দুই বাহু বাড়াইয়া আকুল হইয়া রহিয়াছে।

সহসা সম্মুখে এতিয়ালের পথে দুই হাতে আঁধারের পর্দা ঠেলিয়া উষা আসিয়া জগতে দেখা দিল। প্রথমে

সুদীর্ঘ স্তম্ভ একটা পীত রশ্মি তুলির মত দেখা গেল। তাহাব পর কে যেন সেই রঙ্গিন তুলিটা আকাশের গায়ে চতুর্দিকে বুলাইয়া দিল! কুয়াশার আবরণেব মধ্য দিয়া তখন এক বিচিত্র বর্ণ ঝলমল কবিয়া ধরণীর বুকে গড়াইয়া পড়িল।

প্রকৃতি তখন জাগিয়া উঠিতেছে। তাহাব স্তম্ভ কোমল নিখাস ধীবে ধীরে বহিয়া গেল। ক্রমে পাখীর গানে স্তব্ধ প্রকৃতি সাজা দিয়া উঠিল।

সম্মুখেই জাক চাহিয়া দেখে, পরিচ্ছন্ন একখানি ক্ষুদ্র গৃহ। গৃহের একটি বাতায়ন মুক্ত হইতেছে—বাতায়নের মধ্য দিয়া আন-মনে-গাওয়া কাহাব মুহু সঙ্গীতের স্বর ভাসিয়া আসিল। পরিচিত কণ্ঠে পরিচিত গান, ও কে গায়? জাক চাহিয়া দেখিল।

বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া, কে, ও? এ কি স্বপ্ন! না, না! জাক দুই হাতে চোখ মুছিল, আবাব চাহিয়া দেখিল—না, এ স্বপ্ন নয়! স্বপ্ন নয়! মা! মা-ই ত!

জাক ডাকিল,—মা!

তাহাব ক্ষীণ স্বব বাতাসে মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পার্শ্বে বমণী বিশ্বয়ে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল! তাহাব কণ্ঠের মুহু সঙ্গীত থামিয়া গেল—পথেব ধাবে সে চাঙিয়া দেখিল।

তখন সবেমাত্র সূর্যোদয় হইতেছে! রমণী দেখিল, সূর্যেব লোহিত আলোক-বাগে স্নাত এক বালক বাতায়নের নিম্নে সোপানেব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া। বালকের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু কোটবে ঢুকিয়াছে। বমণীর দেহ মুহূর্ত্তেব জন্ত কাঁপিয়া উঠিল—সমস্ত শিরার মধ্য দিয়া একটা তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল! সে চীৎকার করিয়া ডাকিল,—জাক!

সোপানেব নিম্নে জাকেব শ্রান্ত শরীর ঢুলিয়া পড়িতে-ছিল, ইদা আসিয়া তাহাকে আপনার বুকে চাপিয়া ধবিল—মাতৃ-হৃদয়ের সযত্ন-সঞ্চিত স্নেহেব তাপে হিম-শীতল মুমূর্ষু পুঞ্জকে সে সঞ্জীবিত কবিয়া তুলিল। একটা স্নগভীর আরামের নিখাস ফেলিয়া মার বুকে মাথা রাখিয়া জাক ধীরে ধীবে চক্ষু মুদিল।

## অষ্টম পর্নিচ্ছেদ

আরাম-কুঞ্জ

—না জাক, তোমার এখন কোন ভয় নেই। আর তোমাকে হিম-নাঙ্গে পাঠাবো না—কখনও না! তারা তোমার গায়ে হাত তোলে—এমন আশঙ্কা! বেশ করেচো তুমি পালিয়ে এসেচো! হি, এখনও কি কান্দতে আছে? ভয় কি! আর কখনও তোমার আমি কাছ-ছাড়া করছি

না। এ বেশ দেশ—এখানে কোন গোলমাল নেই—না গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, না লোকজনের ভিড়। কিছু না। বাড়ীতে আমি কত কি পুবেছি দেখেখান—পায়রা, খর-গোশ, মুরগী, ছাগল, গাধা। ভালো কথা, এখনও তারা খাবার পায় নি আজ। আমি সব ভুলে গেছি। তোমাকে দেখে আর কিছুই মনে নেই। তুমি স্করুয়া খেয়ে একটু ঘুমোবে, চলে। সাবা বাস্তা হেঁটে তোমার বড় কষ্ট হয়েছে। আহা, কাল যখন আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছিলাম, তখন বাছা আমার সেই অন্ধকার রাত্রে কোথায় পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েচো! কি ভয়ঙ্কর কথা, জাক! ঐ শোনো, পায়বাগুলো ডাকছে—আমি তাদের খাওয়াইগে। তুমি স্করুয়াটুকু খেয়ে এখন একটু ঘুমোও। কেমন?

ইদা চলিয়া গেল।

জাকেব চোখে ঘুম আসিল না। একটু বিশ্রাম,—তার পর স্নান শেষ কবিয়া পাচিকা আর্শার হাতেব তৈয়াবী স্করুয়া পান কবিত্তে তাহার ক্লাস্তি যেন অনেকখানি ঘুটিয়া গেল। মাকে পাইয়া, নূতন দেশ দেখিয়া কিশোর হৃদয় সহজে প্রফুল্ল হইল। গত রাত্রের সমস্ত ক্লেশ নিমেষে সে ভুলিয়া গেল। মুক্ত নেত্রে সে দেখিল, কি অপূর্ণ শান্তি, অভাবনীয় বিরাম এখানে চাৰিধার ভরিয়া রাখিয়াছে!

তাহার ছোট ঘবটি সূর্য্যের কিরণে ঝলমল কবিত্তে—ছিল! বাহিরে পল্লীর কি সরল, অনাড়ম্বর শোভা! বৃক্ষের শ্রেণী চলিয়াছে! তাহার পত্র-ঘন শাখায় বসিয়া পাখীর ঝাঁক কাকলী তুলিয়াছে, ছাদে অসংখ্য পাখাবতের কলরব—সকলেব উপব মাতার মিষ্ট কণ্ঠস্বর,—চারিদিকেই বিপুল মাধুরী নির্ঝরেব মত সহস্র ধারে ঝরিয়া পড়িতেছে! চারিধারে যেন কি এক মহা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিয়াছে! জাকের চিত্ত এক পরম নিশ্চিন্ত আবারে বিভোর হইয়া উঠিল।

কিন্তু এ আনন্দেও বিঘ্ন ঘটিল! সহসা সে দেখিল, মাতার শয়ন-কক্ষে দেওয়ালের গায়ে আর্জান্ট'ব এক স্তম্ভবৎ তৈল-চিত্র ঝুলিতেছে! মুখে সেই বিকট দম্ভ, চোখে হিংসার জলন্ত বহি—শত চেষ্টাতেও চিত্রকর এগুলো চাকিত্তে পারে নাই।

জাক ভাবিত্তে লাগিল, কোথায় সে? এই শয়তান,—সে কি এইখানে থাকে? তবে দেখা নাই কেন? অবশেষে ছবিখানার সম্মুখে দাঁড়ানো অসহ্য বোধ হওয়ায় জাক মার কাছে গেল।

ইদা তখন মুরগীগুলোকে আহার দিতেছিল। অল্প-দায়িনী সেবা-পরায়ণা নারীর মুখ কি এক মহিমার আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জাক সগর্বে মার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

আর্শা আসিয়া কহিল,—এইটি ছেলে? বেশ ছেলেটি! বাঃ!

নয় আর্শা? আমি বলেই ছিলুম।

“ছেলেটি ঠিক মার মত হয়েছে—বাপের মত কোন-খানটাই নয়। যেমন মুখ-চোখ, গড়নটুকুও তেমনই নধর নিটোল!

বাপের মত! কথাটা শেলের মত জাকের প্রাণে ঝিলি! বাপ! কে বাপ?

—ঘুম হলো না, বৃষ্টি, জাক? তবে এসো, সব দেখবে, এসো। বলিয়া ইদা জাককে লইয়া ঘব-দ্বার দেখাইতে চলিল।

গ্রামের প্রান্তে ছোট বাড়ীখানি,—ছবিব মতই সুন্দর। চাৰিধারে. ছোট-খাট বন। অদূরে একটা ক্ষীর্ণ নদী বহিয়া চলিয়াছে। জানালা দিয়া তাহারই ক্ষীণ স্রোত কপালি স্রুতার মত দেখা যায়। নদীব পূর্বপারে ঝোপেব মধ্য দিয়া সব পথ জাগিয়া বহিয়াছে—সে যেন কোন্ অজানা স্বপ্নবাজ্যের সীমানার গিয়া মিশিয়াছে!

একটি সজ্জিত কক্ষে প্রবেশ কবিয়া ইদা কহিল,—এই ঘবে উনি কাক-কক্ষ কবেন।

উনি! উনি কে? যিনিই হোন, পরিচয় লইবার জ্ঞান জাক কিন্তু এতটুকু ঔৎসুক্য জানাইল না। শুধু তাহার মর্ম্মস্থল হইতে একটা তপ্ত দীর্ঘ-শ্বাস ইদার অজ্ঞাতে বায়ু-তরঙ্গে নীবেবে মিলাইয়া গেল।

মুহু স্বরে ইদা কহিল,—উনি বেড়াতে গেছেন। নানা দেশে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। শীঘ্রই ফিবেন। আমি তাঁকে তোমার আসাব কথা আজই লিখব। শুনে তিনি ভাবী খুশী হবেন। তাঁব মেজাজটা একটু কক্ষ হলেও এ-ধারে লোক তিনি বড় ভালো। তোমায় তিনি খুবই ভালোবাসেন। তুমিও তাঁকে ভালোবাসো, জাক! বাসবে তো? তোমাদেব দুজনেব মধ্যে ভালো-বাসা না হলে আমার মনে একতিল স্থিতি থাকবে না।

কথাটা বলিয়া দেওয়ালে লব্ধিত আর্জান্ট'ব তৈল-চিত্রখানার দিকে ইদা একবার চাহিয়া দেখিল; তার পর কহিল,—বলো জাক, তুমি এঁকে ভালোবাসবে? বলো, তা শুনেলে তবে আমি ঠাণ্ডা হবো। বলিয়াই ইদা সহসা জাককে আপনার বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল।

ইদার কণ্ঠস্বরে মিনতির এক করুণ 'স্বর বাজিয়া উঠিয়াছিল। জাক সরিয়া মার মুখের দিকে চাহিল, ধীর স্বরে কহিল,—বাসবো।

তার পর উভয়েই সে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সেদিনকার প্রফুল্ল উজ্জ্বল আকাশ হইতে মেঘের এই কৃষ্ণবিন্দুটুকুকে কোনোমতে মুছিয়া ফেলা গেল না।

সন্ধ্যার সময় বৃহৎ রিডাল বেড়াইতে আসিল।

এতিয়োল গ্রামেব প্রবীণ ডাক্তাব বিভাল। গ্রামের ইতর-ভদ্র সকল শ্রেণীর লোকই বিভালেব সদাশয়তায় তাহার গুণমুগ্ধ। বিভাল আসিয়া জাকের সহিত আলাপ করিল; তাহার পিঠ চাপড়াইয়া স্নেহে কত কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্নেহের ভিখারী বালক বুদ্ধেব ব্যবহাবে চমৎকৃত হইয়া গেল।

ডাক্তাব চলিয়া গেলে গৃহেব দ্বাব রুদ্ধ হইল। তার পর যাত্রা যখন ঝিল্লী গানে চারিধাব ঝঙ্কত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন জাককে বিছানায় ঘুমাইতে পাঠাইয়া ইদা আর্জান্তকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। জাক আসিয়াছে—সে সংবাদ দিয়া, জাকের প্রতি আর্জান্ত'ব একটু স্নেহ ও সহানুভূতি সে কাতরভাবে ভিক্ষা চাহিল। বেচারী জাক—তাহার জ্ঞান আব কিছু নয়—শুধু একটু ককণা। এতটুকু স্নেহ। সে নিতান্ত অভাগা! তাকে দেখিবাব কেহ নাই।

দুই দিন পরে পত্রের উত্তর আসিল।

সে উত্তরে মাতাব দুর্দশতার প্রতি বক্র ইঙ্গিত ও তদ্ভ্রম তিবন্ধার; এবং বালকের শিক্ষার অভাবেব কথা মোটেই বাদ পড়ে নাই। তবু ইদাব মনে হইল, ইহাতে কটুতা নাই। আর্জান্ত' লিখিয়াছে, মোবান্ভাব স্কুলে অনর্থক কতকগুলো অপ্রবায় চইতেছিল। কাবণ, স্কুলের দশা আর তেমনটি নাই। তথাপি সেখান হইতে জাকের পলাইয়া আসা কোনমতে সমর্থন কবা যায় না—কাজটি খুবই গর্হিত হইয়াছে। বাকু, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাব আব চাবা নাই! তবে বালকের ভবিষ্যতের ভাব আর্জান্ত' লইতে প্রস্তুত আছে। এতিয়ালে ফিবিয়া—আর এক সপ্তাহ পরেই সে ফিবিবে—এ সম্বন্ধে আর্জান্ত' কর্তব্য নির্ণয় কবিয়া ফেলিবে।

এই সাতটি দিন জাকের যেক্রপ স্নেহে কাটিয়াছিল, ভবিষ্যতে তাহার সমস্ত জীবনে—এমন স্নেহ অদৃষ্টে আব কখনও মিলে নাই। গৃহে মাতার সঙ্গ, বাহিবে বন, বাগান, নদী—ঘবে-বাহিবে যত ইচ্ছা, ঘুরিয়া বেড়াও! সর্বত্র সমান অধিকার! বাহিবে মুক্ত আনন্দে ছুটিয়া বেড়ানো, গৃহে মার প্রচুর স্নেহ! সহস্র আদর-আবদারে ডুবিয়া থাকা, প্রাণ খুলিয়া হাসির তুফান তোলা! জাকের জগতই যেন পৃথিবীর যত কিছু আনন্দ-উল্লাস বিধাতা উদার হস্তে চারিধারে আজ ছড়াইয়া দিয়াছেন! শুধু তুলিয়া লইলেই হয়!

আর্জান্ত'র নিকট হইতে আর একখানি পত্র আসিল—কাল সে এতিয়ালে আসিয়া পৌঁছাবে।

জাককে স্নেহ ও সহানুভূতিব চক্ষু দেখিবে বলিয়া আর্জান্ত' পত্রে স্বীকার করিলেও ইদার মন কিন্তু একদণ্ড স্থির ছিল না। ষ্টেশনে যাইবার সময় ইদা জাককে

সঙ্গে লইয়া গেল না, পথে কাতব অহুনয়ে একবার সে আর্জান্ত'র মন ভিজাইবাব চেষ্টা কবিবে! সহসা জাককে দেখিলে যদি আর্জান্ত' জলিয়া ওঠে—এই ভয়ে শুধু জাককে গৃহে বাখিয়া আর্জান্ত'র অভ্যর্থনাব জ্ঞান ইদা গাড়ী লইয়া একাকী ষ্টেশনে গেল। জাককে সে বলিয়া গেল, “তুমি বাগানে থেকো—কশ্ কবে ওঁর সামনে এসো না। আমি ডাকলে তবে এসো। কি জানি—”

কথাটা শেষ না কবিয়াই ইদা চলিয়া গেল।

মার কথা শুনিয়া জাক দমিয়া গেল। তাহার পর কখন যে গৃহ-দ্বাবে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে, তাহা সে জানিতে পাবে নাই। সহসা সে মাণ স্বব শুনিল,—মা ডাকিতেছে,—জাক, এদিকে এসো!

জাকের বুক কাঁপিয়া উঠিল। এইবাব! কক্ষে প্রবেশ কবিয়া কোনমতে আর্জান্ত'কে অভিবাদন কবিয়া জাক স্থিব হইয়া দাঁড়াইল। আর্জান্ত' তাহাব বক্তৃতা-টুকু সংক্ষেপে সাবিয়া লইল। বক্তৃতায় উপদেশের সহিত যে একটু স্নেহ মিশানো না ছিল, এমন নহে।

আর্জান্ত' কহিল,—জাক—তোমাকে মানুষের মত হতে হবে, কাজ করতে হবে। বুঝলে? কাজ! কাজ ছাড়া মানুষের থাকা চলে না। জীবনটা ধুলোখেলা নয় তো! তবে বেশী কিছু করতে হবে না তোমায়। শুধু আমি বা বলবো, তাই কবে যাবে, সেই হলে আমিও ভালোবাসবো, বুঝলে! আর সকলেই তাহলে বেশ নিষ্পত্তাটে থাকতে পারবো। আমি এখন এইটুকু চাই—আমাব নিজের যথেষ্ট কাজ আছে—অবসর খুবই কম—তবু তোমাকে মানুষ করে তোলবাব জ্ঞান তোমার দিকে একটু মন আমাকে দিতেই হবে। হুঁশুটা আমি তোমার জ্ঞান খবচ করতে পারি, আর করতে হবেও, দেখছি—তোমার শিক্ষাব ব্যবস্থার জ্ঞান। যদি আমাব মতে চলতে পারো—তবেই একদিন আমাব মত কাজের লোক হতে পারবে—সমসারের সঙ্গে যুদ্ধ কববার শক্তি হবে! নাহলে যেমন অপদার্থ আছ, চিরকাল তেমনই থেকে যাবে! কোন উন্নতি হবে না।

—শুনছ জাক? শোন! পুত্র-স্নেহাতুরা মঙ্গলা-খিনি মাতা সাগ্রহে সানন্দে কহিল,—তোমাব জ্ঞান উনি নিজের কত ক্ষতি করছেন, বুঝছ তো, জাক?

—হাঁ, মা।

—খাম, শার্লৎ—আর্জান্ত' কহিল,—আগে আমি জানতে চাই—আমাব কথা থাকবে কি না! আমি বেণা-বনে কথা ছড়াই না। অবশু আমি বাধ্য করছি না যে এ-রকম ভাবে চলতেই হবে।

—বলো, জাক, পারবে তো?

মাকে আর্জান্ত' শার্লৎ বলিয়া ডাকিল দেখিয়া জাক কেমন উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িল! সে তাই চট কবিয়া

কথাটা ব কোন উত্তর দিতে পারিল না। সহসা চমক ভাঙ্গিলে সে বলিল,—পাবব। বলিয়াই কক্ষ তাগ করিয়া দ্রুত সে নীচে নামিয়া গেল। তাহার বৃকের মধ্যে কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছিল, মাথা ব ভিতর যেন আগুন জ্বলিতেছিল। নীচে আসিয়া একটা শূণ্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া হুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে বসিয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে নিদ্রা ভাঙিলে জাক দেখিল, তাহার ঘরের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধা একটা কাগজ ঝুলিতেছে। কাগজে কবির আঁকাবঁকা অক্ষর ছড়ানো বহিয়াছে। নিকটে আসিয়া জাক দেখিল, খুব মোটা অক্ষরে লেখা আছে,—

### রুটিন

নীচে তাহার জীবনের একটা গণ্ডী নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পড়া-শুনা কাজ-কর্মে ধায়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। দিনের মুহূর্তগুলিকে টুকরা টুকরা কবিতা ভাগ করা হইয়াছে—ছয়টা যশা-তাগ।

ছয়টা হইতে সাতটা—প্রাতর্ভোজনাদি।

সাতটা হইতে আটটা—পড়া।

আটটা হইতে নয়টা—ইত্যাদি।

প্রাচীর-গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র কবিলে সেই সকল ছিদ্রেব মধ্য দিয়া বায়ু যেমন প্রচুবল্যাবে প্রবেশ কবিত্তে পারে না, আলোক-প্রবেশেও যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে, তেমনই-ভাবে দিনটাকে যেন অসংখ্য টুকরায় ভাগ করা হইয়াছে। ল্যাটিন, গ্রীক, বীজগণিত, জ্যামিতি, দেহতত্ত্ব, ব্যাকরণ প্রভৃতির নামে সে টুকরাগুলো পবিপূর্ণ। সকল বিষয়েই শিক্ষা লাভ কবিত্তে হইবে। তাবপর এই বিক্ষিপ্ত টুকরা-গুলোকে হৃদয় কোন সূত্রের শুভ মুহূর্তে এক অগুণ্ড জ্ঞানের স্তূপে পবিগত করিয়া তুলিবে। জাক একেবাবে সর্ক-শাস্ত্রে বিশাবদ হইয়া উঠিবে।

কিন্তু এ ধরা-বাঁধা নিয়মে চলা বালকের পক্ষে হুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এত জিনিষ ধবিবার মত স্থান ছিল না। কাজেই তাহার চিন্তা ক্ষুঃর্ষি বভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

অপরাত্তে রৌদ্রেব তাপ কমিয়া আসিলে যখন সে বইয়ের বাশির মধ্যে আপনাকে মগ্ন রাখিত, ছাপার অক্ষরের দিকে কেবলই বৃদ্ধিয়া চাহিয়া থাকিত্তে থাকিত্তে সেগুলো ক্রমে তাহার চোখেব সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিত, তখন বাহিরে মুক্ত বায়ু ও আনন্দ লাভের জগৎ চিত্ত তাহার নিতান্তই কাতর অস্থির হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, একবার যেমন জিমনাজ হইতে পলাইয়াছিল, আবার তেমনই করিয়া সে কোথাও পলাইতে পারিলে বাঁচ।

ঝোলা জানালাব মধ্য দিয়া বসন্ত তাহার অজস্র

পুষ্পেব স্নিগ্ধ স্রাবভি বহিয়া আনিত, প্রকৃতি আপনাব মস্তুর আসনখানি বিছাইয়া কোল পাতিয়া শ্রান্ত বালককে সম্মুখে যেন আহ্বান কবিত, জাক তখন বহি বন্ধ করিয়া চোখ মেলিয়া শুধু বাহিরেব পানে চাহিয়া থাকিত। কখনও দেখিত, কোমল পুচ্ছ তুলিয়া কাঠবিড়ালীর দল এ-গাছে ও-গাছে মহানন্দে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই-তেছে। বাহিরে সারা বন যখন অজস্র ফুটন্ত গোলাপে ভরিয়া লালে-লাল হইয়া গিয়াছে, তখন ঘরেব মধ্যে বন্ধ থাকিয়া, “Rosa—The Rose—গোলাপ” এ নীরস পাঠ মুখস্থ করা দারুণ কষ্টকর। আব কোন কথা তখন জাকের মনে জাগিত না—শুধু সে ভাবিত, কেমন কবিতা এই মুক্ত বোঁদ্রালোকে, অজস্র বায়ুতে আপনাকে অবাদে সে ছাড়িয়া দিবে।

কিছুদিন পরে “অপদার্থ—বোকা” বলিয়া আর্জান্ট জাকের হাল ছাড়িয়া দিল। ইদা করুণ দৃষ্টিতে জাকের পানে শুধু একবাব চাহিল, মুখে কোন কথা ফুটিল না। জাক হাঁক ছাড়িয়া বাঁচিল। এতদিন যেন কয়েদী ব মত গাবদে সে বন্দী ছিল—আজ ছাড়া পাইয়াছে। মুক্তি। মুক্তি। সে আজ মুক্ত, স্বাধীন।

ছাড়া পাইয়া জাক বনেব দিকে ছুটিল। পাখীব গানে আকাশ তখন ভরিয়া গিয়াছে,—ফুলেব গন্ধে চারিদিক মাতিয়া উঠিয়াছে—নদীতে নৌকা ছুটিয়া চলিয়াছে,—প্রজাপতির দল বিচিত্র পাখা মেলিয়া ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়াইতেছে, জাক নৌকা দেখিয়া প্রজাপতি ধবিয়া পবম স্বচ্ছন্দ নিকষেগে সময় কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিবিলে গৃহেব নিস্তরুতার প্রথমটা যেন তাহার নিশ্বাস বোধ হইয়া আসিল। ইদা তাড়াতাড়ি আসিয়া মুহূঃ স্ববে বলিল,—চুপ, গোল কবো না যেন। উনি কাজ কবচেন। বই লিখছেন।

অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত দ্বাব বন্ধ কবিত্তে গিয়া জাক শব্দ করিয়া ফেলিল, ছোট টেবিলটা সঙ্গে সঙ্গে উল্টাইয়া গেল। ইদা আসিয়া বিরক্তভাবে বলিল, আঃ, শাস্ত হয়ে থাকো জাক—শব্দ কবো না।

হী, খুব সাবধান। আর্জান্ট বহি লিখিতেছে—জাক করিতেছে। গোল হইলে এখনই সব মাটি হইয়া বাইবে। প্রতিভা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবে।

প্রকাণ্ড খাতা লইয়া প্রথম পৃষ্ঠার গ্রন্থের নাম “কষ্টের কল্পা” সুরূহৎ অক্ষরে আঁকা-বাঁকা ছাঁদে লিখিয়া ভাব-সংগ্রহের জগৎ আর্জান্ট কক্ষমধ্যে উদ্বিগ্ন চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এত করিয়াও এক ছত্র লেখা বাহির হয় না। কি বিড়ম্বনা! জানালাব ধারে আসিয়া আকাশ, মাঠ, বাগান, নদী প্রভৃতির পানে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া থাকিত্তে থাকিত্তে তাহার হৃদয় ভাবেব বস্তার কাণায় কাণায় ভরিয়া ওঠে, কিন্তু কলমটি যেমনই হাতে লয়,

অমনই সে বিপুল ভাবশ্রোত কোথায় বে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার কোন সন্ধান মিলে না! খাতাব পৃষ্ঠ! যেমন শূন্য, তেমনই শূন্য থাকে! জীবনের চাবি ধারে কি প্রচুর কাব্য মুঞ্জরিত রহিয়াছে—কিন্তু তাহাদের কঠিন পণ, আর্জান্তর সহিত যেন তাহার শক্ততা সাধিয়া বসিয়া আছে, কোনমতে তাহাব কাছে ধরা দিবে না।

গ্রামেব প্রান্তে লতা-পাতা-ঘেবা এমন কুটীরে থাকিয়াও যদি গ্রন্থ লেখা না যায় তো সে ছুঃখ রাখিবার বে ঠাই নাই।

ইদা আসিয়া বলিল,—কি লিখলে? কতখানি হলো?

আর্জান্তর বলিল,—এসেছ তুমি। বেশ হয়েছে!

আচ্ছা, বসো চুপ করে।

ইদা কহিল,—হাঁ, আমি জানতে এলুম, নভেলটা কতখানি লেখা হলো। পড়বার জগ্গ মনটা এমন উতলা হয়ে রয়েছে!

ফষ্টেব কণা? ওঃ! তুমি জান, ফষ্টখানি লিখতে গেটের কত বছর লেগেছিল। দশটি বছর। একেবারে পাক্কা দশ বছর! তবু তিনি যে যুগে বাস করতেন, সেটাকে কাব্যের সত্যযুগ বললেও বলা যায়! লোকের মনে তখন এতটুকু নীচতা ছিল না, হিংসা ঘেব কাকে বলে, তা কেউ জানত না—সত্যমুভূতিতে সকলের মন ভরা ছিল। আব এখন? চাবিধাবে সকলে যতদূর করে বসে আছে, প্রতিভাশালী নতুন লেখকদের মাথা তুলতে দেবে না, যেন লাঠি উচিয়ে আছে। যেমন কবে তোক, নিষ্ঠুর সমালোচনা করে, ঠাট্টা করে, উৎসাহ না দিয়ে—একদম দমিয়ে দেবে!

খাতা খুলিয়া আর্জান্তর ভাবেব সন্ধান না পাওয়াশেষে খপবেব কাগজ পড়িতে বসিল। এমনই সে নিত্য কবিয়া থাকে। নিত্য এই এক আয়োজন। একই অমুযোগ। কল্পনা যেন তাহাব সহিত নিষ্ঠুর ছলনা করিয়া ফিবে। কল্পনের কালি কল্পমে শুকাইয়া যায়—ভাবেব একটা কণা সে ঝরাইয়া তুলিতে চাহে না। সংবাদপত্র পাঠ করিতে বসিয়া কবি তাহার প্রথম ছত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্রাকরের নামটি অবধি—কোন কথা বাদ দেয় না। যেরূপ আগ্রহের সহিত সে তাহাতে মনোনিবেশ করে, সহসা দেখিলে মনে হয়, যেন কবি তাহাব অপ্ৰকাশিত উপজ্ঞাসের সমালোচনার সন্ধান কবিতোছে, কিম্বা কল্পিত নাটকের চবিত্ত্রানুশীলন পাঠ করিবার জগ্গ উদ্গীৰ্ব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সংবাদপত্র পাঠ করিয়া তাহার অসন্তোষ বাড়ে বই কমে না! দেশেব এই লক্ষীছাড়া কাগজপত্রগুলো এত লোকের সংবাদ দিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না, শুধু তাহার সন্ধান লইতে হইলেই সকলের সর্বনাশ ঘটে! সন্ধান বাখিবার জগ্গ আগ্রহ কাহারো এতটুকু নাই!

এ জগতে সকলে স্মৃখী, সকলে ভাগ্যবান! তাহাদের রাশি রাশি নাটক রদ্বয়কে অভিনীত হইতেছে—অথচ কি কদর্য সব নাটক! তাহাদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে,—তাহাবও হাজাব হাজাব পাঠক জুটিতেছে! অথচ—কি-ই বা গ্রন্থ! শুধু তাহারই গ্রন্থগুলো চিবদিন অপ্ৰকাশিত থাকিয়া যায়! শুধু কি তাই? কোন একটি ভাব তাহাব মাথাব মধ্যে দেখা দিয়া যখনই প্রকাশের অবসর খুঁজিয়া ফিবে, তখন অপরে কি না সেই ভাবেব সহিত কোনমতে পবিচয় ঘটাইয়া অবাধে গ্রন্থ ছাপিয়া ফেলো প্রকাশ করিয়া কাহাবও নিকট সে আপনাব ভাবেব কথা না বলিলেও লোকগুলো তাহাব মন হইতে ভাবগুলোকে কেমন কবিয়া যে ছিনাইয়া লইয়া যায়, ইহা গরিয়া সে ব্যথিত হইয়া উঠিত! কোন বই পড়িতে বসিলে তাহাব মনে হইত, হায়, হায়, এই কথাগুলো তাহাবও মনে যে উঁকি দিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল! শুধু তাহাব লিখিবার অবসর ঘটে নাই! আর ইহারা—এই সব নির্লজ্জ গ্রন্থকাব—সেই কথাগুলোই মন হইতে কখন আত্মসাৎ করিয়া বই ছাপাইয়া বসিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে সে দেখিত, তাহারই মনেব কথা, মনের যত নূতন ভাব কেমন করিয়া জানিয়া ফেলিয়া এই সকল হতভাগা গ্রন্থকাব দিব্য আসর জমাইয়া তুলিয়াছে—নাম জাহিরের ব্যবস্থা কবিয়াছে!

সে একদিন ইদাকে কহিল,—জাখ, কাল ফ্রাঙ্ক থিয়েটারে এক থানা বইয়ের অভিনয় দেখে এলুম,—হবচ্ একেবারে সেটা আমার “আত্মলান্ধার আপেল” নাটকখানাব নকল।

—কি ভয়ঙ্কর। তোমাব বই চুবি করেছে। লা তোমাব বইখানা গেল কোথায়? নালিশ কবে দাও।

—এখনও অবশ্য সেটা লেখা হয় নি—ভাবটা সেবেমাত্র মাথায় আসছিল,—লিখব লিখব, ভাবছিলুম—তা,—নাঃ, লিখতে আব এবা দিলে না দেখছি, আমায়।

নিফল আক্ৰোশে যখন নির্লজ্জ গ্রন্থকারদের দুঃসহ চৌর্যবৃত্তিব প্রাবল্য ও ঈর্ষাপরায়ণ সমালোচকগুলার কটুক্তির উল্লেখ করিয়া আর্জান্তর আপনাব প্রতিভা-ক্ষুব্ধের সহস্র বিদ্রোহ কথায় ভোজন-অবসবটুকু সরগরম কবিয়া দেয়, ইদা তখন একান্ত অসহায় ককণভাবে তাহার প্রিয় কবির মুখের পানে চাহিয়া থাকে, এবং জাক নত মুখে নিঃশব্দে আপনাব ভোজন ব্যাপাব শেষ কবিয়া যায়। কিন্তু সে সময় দৈবাৎ যদি কখনও আর্জান্তর দৃষ্টির সহিত জাকের দৃষ্টি মিলিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় সে শিহরিয়া উঠিত। নিফসতাব দারুণ অক্ৰোশে কবির ঘোষের মাত্রা যখন উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তখন জাক একদিন ল্পাষ্ট



বুঝিল, তাহাকে দৃষ্টি করিবার জ্ঞান এ অগ্নি জলিবার আর বড় বিলম্ব নাই। সামান্য একটু ছল পাইলেই তাহা ভীষণভাবে জলিয়া উঠিয়া, পুড়াইয়া তাহাকে ছাই করিয়া ফেলিবে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় বহিল না।

## নবম পরিচ্ছেদ

বন্ধু-লাভ

সেদিন অপরাহ্নে অলস অবসর-বাপনের অল্প উপায় না দেখিয়া অর্জাস্ত্র ও ইদা করবেই বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। আকাশে তখন একটু একটু কবিয়া মেঘ জমিতেছে। ক্রমে সেই মেঘ বাড়িয়া উঠিয়া সমস্ত আকাশ ছাইয়া ফেলিল। আকাশ যেন তামাব বর্ণ ধারণ করিল। ঝড় আসন্ন বুঝিয়া জাক বনের দিকে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া আশীর কাছে আসিয়া বসিল, বলিল,—একটা গল্প বলো না, আশী।

আশী গল্প বলিতে আরম্ভ করিল। গল্প বলিতে বলিতে জাকের কৌতুহল-প্রসঙ্গে আশীর বৈধাচ্যুতি ঘটিলে নিরুত্তি-লাভের উদ্দেশ্যে আশী বলিল,—ওহো, তাই তো জাক, বৃষ্টি নামতে এখনও পেরো আছে—তুমি দৌড়ে দোকান থেকে খরগোসগুলোব জ্ঞান যদি কিছু খাবাব কিনে এনো তো ভাল হয়। আমার মনে ছিল না, আহা, কাল সমালে বেচাবাবা কি খাবে, তাব ঠিক নেই। আমি বুড়ো মানুষ, অত তাড়াহাড়ি আনতেও পারবো না—পথেই বৃষ্টি এসে পড়বে হয়তো—তুমি যদি যাও! লক্ষ্মীটি! আমি ততক্ষণ বাড়ীর দ্বিনিব-পত্নবগুলো তুলে ফেলি—জানলা-টানলাগুলো বন্ধ কবে দি।

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ছোট একটা ঝড় লইয়া জাক দোকানের দিকে ছুটিল।

ঘন পাতার ছায়ায় ঢাকা শ্রামল পথে নিবিড়তর হইয়া তখন আঁধার নামিতেছে। পথে লোক-চলাচল একেবারে বন্ধ। আসন্ন ঝড়ের হাত হইতে পবিত্রাণ-লাভের জ্ঞান গ্রাম্য কৃষকের দল পূর্বাহ্নেই সব বাসার ফিরিয়াছে। জন-কোলাহল-হীন পথ নিবালা। জাক দোকান হইতে গৃহের দিকে ফিরিতেছিল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা অপূর্ণ আনন্দ ফুটিয়া উঠিতেছে। এমন সময় অদূরে সে শুনিল, ফিরিওয়ালা হাঁকিতেছে,—টুপি—চাই ভালো টুপি!

পশ্চাতে ফিরিয়া জাক দেখিল, অসংখ্য টুপির বোঝা পিঠে ফেলিয়া এক ফিরিওয়ালা—বোঝার ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—সেইদিকে আসিতেছে। শ্রান্তিতে বোঝার স্বর ভাঙিয়া গিয়াছে—ললাট হইতে ঘর্ষবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে—মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—হারিদ্র্যের সঘন মলিন

যেখা তাহার মুখে-চোখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে! জাক থমকিয়া দাঁড়াইল। ফিরিওয়ালা তাহার নিকটে আসিয়া হাঁকিল,—টুপি—চাই ভালো টুপি!

জাক দাঁড়াইল। এ কোথায় চলিয়াছে? এই হুঁযোগেব বাত্রে কোথায় তাহার আশ্রয় মিলিবে—? কোথায়ই বা একটু ঘুমাইয়া বেচাবা দিনের ক্লান্তি ঘুচাইবে! এই বোঝা বহিয়া কত পথই না সে ঘুরিয়াছে—কাতার জগাই বা এ নির্জন পথে এ সময় এখন চাঁৎকার করিয়া ফিরিতেছে! কে তাহার টুপি কিনিবে? শুধু গতিহীন প্রাণহীন দূরব-নির্দেশক পাষণ-স্তূপগুলো দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—আব বৃক্ষ-শাখায় পাখীগুলো নিতান্ত নির্জীবের মত ঝড়ের ভয়ে স্তম্ভিত হইয়া বহিয়াছে। এখানে কে তাহার টুপি কিনিবে?

টুপিওয়ালা একটা বৃক্ষতলে আসিয়া বোঝা নামাইয়া বসিল। জাক তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। টুপিওয়ালা মুহূর্তে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আব কতদূর গেলে গাঁ মিলবে, বলতে পারো?

আকাশেব বৃক্ষ চরিয়া সশব্দে একটা লোহিত বিদ্যুৎ-শিখা ছুটিয়া গেল। পথেব ধূলি উড়াইয়া কেমন যেন একটা কম্পন ফুটিল—গাছগুলো সে শব্দে শিররিয়া উঠিল।

জাক কহিল,—আর পনেরো মিনিট হেঁটে গেলেই পাবে।

—পনেরো মিনিট! তবেই মুঞ্চিল দেখছি। তাহলে আব গাঁয়ে পৌঁছতে পাবা যাবে না—টুপিগুলো সব ভিজে মাটা হয়ে যাবে—তাই তো! এতগুলো টুপি!

কক্ষণ সহানুভূতিতে জাকের চিন্তা ভরিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমাদের বাড়ী এই কাছেই। সেখানে তুমি আসবে?

হতভাগ্য টুপিওয়ালা যেন অকূলে কূল পাইল। কৃতজ্ঞতায় সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

উভয়ে দ্রুত চলিল। টুপিওয়ালা কষ্টে পথ চগিতো-ছিল। জাক কহিল,—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, না?

—হাঁ—এই পায়ে কি কম লাগছে! হয়েছে কি, জানো, আমার পা হচ্ছে বড়। জুতো—তা সে যে জুতোই কিনি, পায়ে কেমন কসা হয়। পরস্যা তো আর নেই যে, বায়না দিয়ে ঠিক পায়ের মাঁপে এক জোড়া জুতো তোয়ের করাবো।

বকিতে বকিতে টুপিওয়ালা জাকের সঙ্গে চলিল। গৃহে পৌঁছিয়া জাক টুপিওয়ালাকে ভোজন-কক্ষে বসাইল; কহিল,—বসো তুমি। আগে কিছু একটু খাও! আমার পাবে।

টুপিওয়ালা রাজী হইল না, কহিল,—না, না। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কিন্তু জাক ছাড়িবার পাত্র নহে। আশী এই অসভ্য



লোকটাকে দেখিয়া বিষম চটিয়া গিয়াছিল—তবু মুখের কথায় সে বিরক্তি প্রকাশ করিল না। জাকের আদেশে মদ ও কিছু খাবার সে লইয়া আসিল।

জাক বলিল,—খানিকটা মাংস দাও তো আর্শা।

আর্শা কহিল,—মাংস বেশী নেই! তা ছাড়া জাক, বুঝলে, কর্তা এ সব পছন্দ করেন না—জানুতে পারলে বকবেন!

—আচ্ছা, সে যখন বকবেন, তখন দেখা যাবে। এখন তো তুমি দাও!

নিভাস্ত বিরক্তির সহিত আর্শা এক টুকরা মাংস লইয়া আসিল।

জাক কহিল,—কেমন খাচ্?

টুপিওয়াল কহিল, চমৎকার। খাসা।

চারিধার কাঁপাইয়া আবাব বজ গর্জিয়া উঠিল। ভীষণ শব্দে ঝড় নামিল। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি! মুহলধারে বৃষ্টি।

জাক কহিল,—তোমাকে অনেক দূর ঘুরতে হয়, না?

—হাঁ। আমি নাষ্টে'য় থাকি—আমার বোনের বাড়ী সেখানে। সেইখানে আমি থাকি। মস্তাঞ, অর্গিন, তুবে', আঁজু, সব জায়গায় ঘুরতে হয়। বাড়ীতে খেতে পরতে অনেকগুলি লোক—বুড়ো বাপ, বিধবা বোন, চার-পাঁচটি ভাই—সকলেব আহার জোগানো সোজা ব্যাপার নয়!

—তোমার বড় কষ্ট হয় তাহলে?

—হয় বৈ কি—তা কষ্ট যা কেবল ঐ জুতোর জঙ্গে। জুতোজোড়া খুলে ফেললে তবে একটু আবাম পাই! কিন্তু তবু ঐ যে বললুম, আরামই বা কোথা? রাত্রে বিছানায় শুয়ে যখন ভাবি যে আবাব সকালে সেই জুতো পায়ে দিয়ে বেরুতে হবে, তখনই আবাব প্রাণটা কেঁপে ওঠে।

জাক কহিল,—তা তোমার ভয়ের বা বেরোয় না, কেন?

—তার কারণে কি! সব যে ছেলেমানুষ! এত ঘুরতে পারবে কেন? আর এমন কিছু আমার কষ্ট নয়—তবে যদি ঠিক এই পায়ের মাপে একজোড়া জুতো পেতুম।

এমন সময় বহির্দ্বারে গাড়া আসিয়া খামিল। জাক স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল। টুপিওয়াল কহিল,—কি হলো?

—ওরা এসেছে!

বাহিরে আর্জান্ত'র গলা শুনা গেল! আর্জান্ত' কহিল,—এস লোলি, একেবারে খাবার ঘরে এসো! আর্শা, খাবার দাও!

আর্জান্ত' ভিতরে প্রবেশ করিয়া ব্যাপার দেখিয়া গর্জিয়া উঠিল,—কি এ সব? কি হচ্ছে?

জাকের মনে হইল, এই মুহূর্তে যদি তাহার মাখায় বজ্রপাত হয় তো সে বাঁচিয়া যায়! ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া

জড়িত অস্পষ্ট স্বরে সে যে কি বলিল, আর্জান্ত' তাহা শুনিয়াও শুনিল না!

আর্জান্ত' কহিল—দেখে যাও লোলি, তোমার জাক বাহাদুরের কাণ্ড দেখে যাও। তিনি এখানে আসার স্তমকে বসেছেন। বন্ধু নিয়ে দরবার করছেন!

ইদা আসিয়া সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া তিরস্কারপূর্ণ স্বরে কহিল,—এ-সবের মানে কি জাক?

টুপিওয়াল নিভাস্ত অপ্রতিভভাবে কহিল,—এঁকে কিছু বলবেন না, ঠাকুরণ। আমি নিজেই—

আর্জান্ত' ক্রোধে কাঁপিতেছিল, সশব্দে দ্বার খুলিয়া ভীত স্বরে কহিল,—চুপ করে থাক, বোম্বাদব, অসভ্য কোথাকার—লোকের বাড়ী চড়াও হবার মজা টের পাও-যাচ্ছি তোকে! বেরো, এখনই এখান থেকে বেরো!

দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া টুপিওয়াল উঠিয়া দাঁড়াইল! এমন ব্যবহার—তাহার নিকট মোটেই নূতন নয়! এমন লাঞ্ছনা আরও কত স্থানে তাহার অদৃষ্টে মিলিয়াছে! ইহাতে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না।

আপনার টুপি বোঝা পিঠে তুলিয়া লইয়া জাকের পানে একবার সে কৃতজ্ঞভাবে চাহিয়া দেখিল। জাক নত মস্তকে বসিয়া ছিল—ভয়ে মুখ তাহার সারা হইয়া গিয়াছে! তাব পর সেই বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে টুপি-ওয়াল পথে বাহির হইয়া গেল।

জাকের চৈতন্য যেন লোপ পাইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সহসা সে শুনিল, বাহিরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দূরে কে হাকিতেছে,—টুপি—চাই ভালো টুপি।

জাক ভাবিল, আতা, বেচারী—বেচারী টুপিওয়াল! এই জলে যথাসর্ব্বস্ব তাহার ভিজিয়া নষ্ট হইয়া গেল!

আর্জান্ত' কহিল—ওঃ, আমি দেখিনি। হাম—হাম খাওয়ানো হচ্ছিল বন্ধুকে।

ইদা কহিল,—কিন্তু ওটা সে খায়নি, বোধ হয়!

আর্শা কহিল,—তখনই আমি বারণ করেছিলুম—তা কি শুনলে? বললুম, সব রাগ করবেন, তা গ্রাহ্য করলে না! যাই হোক, ছেলেমানুষ না বুঝে একটা কাজ করেছে!

—খামো তুমি। আর্জান্ত' গর্জিয়া উঠিল।

জাক এতক্ষণে বুঝিল, সে কি দুঃসাহসের কাজ করিয়াছে। উঠিয়া গাঢ় স্বরে সে কহিল,—এবারটি আমার মাপ করুন—আর কখনও এমন কাজ করবো না—

—মাপ? বটে! বলিয়া আর্জান্ত' জাকের হুই হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিল, কহিল,—এত বড় আশ্পর্ক তোমার! তুমি জানো, ও জিনিয়ে তোমার কোন অধিকার নেই! যে বিছানায় তুমি শোও, যে খাবার তুমি খাও, সে সমস্ত তোমাকে শুধু অমুগ্রহ করে ব্যবহারের জন্ত দেওয়া হয়েছে! তোমাকে দয়া

কথা আমার অজ্ঞান হয়েছে দেখছি! কে তুমি আমার? কেউ নও—কোথাকার নোঙরা পথের কুকুর! তোমার ব্যবহার দেখে আমি বিসম অবাক হয়ে পড়েছি! ছোটলোক, পাজী।

ইদার করুণ দৃষ্টি, কাতর অন্বয়ে আজান্ত্র জাককে সেদিনকার মত কমা কবিল।

পরদিন আর্জান্ত্রের প্রবল জ্বর দেখা দিল। পাড়া কঠিন ব্রিটিশ ইদা অস্থির হইয়া উঠিল। তখন আরাম-কুঞ্জে ডাক্তার রিভালের ডাক পড়িল! প্রত্যহ দুইবেলা ডাক্তার রিভাল আসিয়া বেগী দেখিতে লাগিলেন। ইদা কহিল,—ডাক্তার, কবিকে তুমি শীঘ্র আরাম করে দাও—কবির লেখাপড়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—সমস্ত জগতের যে কি ক্ষতি হচ্ছে।

—কোন ভয় নেই—মাদাম আর্জান্ত্র, তবে দুদিন সময় লাগবে! রোগীর মন ভালো বাখো। জাক কোথায় গেল? তাকে ডেকে দাও দেখি।

—না, না—এখনই সে গোল কববে!

—আহা, কবক একটু গোল! ছেলেরা—তাদের গোলমালে তো আর বিরক্তি ধরে না, বরং সে ভালোই লাগে! বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে! বাপের অসুখ হলে ছেলে-পিলের মন ভালো থাকে কখনও। তুমি তাকে ডেকে দাও দেখি। বেশ ছেলেটি—আমাব সঙ্গে ইতিমধ্যে সে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছে। আমাকে দাদা-মশায় বলে ডাকে—কে তাকে শিখিয়ে দিলে, বলো? সে জানে, যখন আমাব পাকা চুল আর পাকা দাড়া আছে, তখন আমি দাদামশায় না হয়ে বাই কোথায়।

বিভাল তখন বসিয়া আপন দৌহিত্রী সেসিলের কথা বলিল—জাকের চেয়ে সে দুই বৎসরের ছোট। তাহার দৌরাণ্যে বৃদ্ধের এক মুহূর্ত বিশ্রাম লইবার অবসর ঘটে না। আবার এ দৌরাণ্য বৃদ্ধের এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে কোন দিন তাহা বাদ পড়িলেও একটা দাক্ষ অস্বস্তি ঘটে! তাহাব মন ভিজাইয়া মান ভান্ডাইয়া নুতন করিয়া দৌরাণ্যের সৃষ্টি করাইতে হয়।

ইদা কহিল,—তাকে একদিন এনো না ডাক্তার, জাকের সঙ্গে খেলা কববে বেশ!

—না—সেটি হবাব জো নেই! তার দিদিমা তাকে চোখের আড় করত চায় না। একদণ্ড কাছ-ছাড়া হলে বুড়ী অমনি অস্থির হয়ে ওঠে। সে দুর্ঘটনার পর থেকে বুড়ী ওকে নিয়েই কোনমতে আপনাকে খাড়া রেখেছে কি না।

কস্তার যত্ন-ঘটনার ইঙ্গিত করিয়াই বৃদ্ধ দুর্ঘটনার কথা তুলিলেন। একমাত্র কস্তা মাদ্রীনা যেদিন শিশু সেসিলকে রাখিয়া পৃথিবী ত্যাগ করিল, সেদিন বৃদ্ধের জীবন কি ভীষণ অন্ধকারে ভরিয়া গিয়াছিল! আলোর

কণাটুকু পাইবাব আর কোন আশা ছিল না! কিন্তু সেসিল আবার নুতন করিয়া সে অন্ধকারে ছোট একটি দীপ জালিয়া দিয়াছে! সেসিলকে পাইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা সে দুঃখ আবার ভুলিতে বসিয়াছে! সে দুঃখের কথা শুধু আশী জানে, আর কেহ না।

আর্জান্ত্রকে আনন্দ দিবার জন্ত, তাহাব সম্মতি লইয়া ইদা এক মিলনীব আয়োজন কবিল। পুরাতন বন্ধ ছিল—লাবাস্ত্রান্স, মোবোন্ডা ও ডাক্তার হারজ্জ। তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হইল।

একদিন প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করিয়া জাক দেখিল, বাড়ী সাজাইবাব ঘুম পড়িয়া গিয়াছে। চীনা লঠন, বিচিত্র বর্ণের ফুল, কাগজের নিশান বাশি রাশি আসিয়া পড়িয়াছে। ব্যাপার কি?

ইদাব গা বেঁধিয়া আসিয়া জাক কহিল,—মা, কি হবে মা?

ইদা তখন গৃহসজ্জাব আয়োজনে বাস্তব। সে কহিল, চুপ, লক্ষ্যী হয়ে থাকো। দরপটপনা করো না—বাড়ীতে আজ অনেক বড় বড় লোক আসবেন। ভোজ আছে।

সন্ধ্যাব কিছু পূর্ব হইতে দুই একজন করিয়া অতিথি দেখা দিতে লাগিল। আপনাব শয়ন-কক্ষের দ্বার ভেজাইয়া তাহাবই ফাঁক দিয়া জাক দেখিল, মোবোন্ডা ও ডাক্তার হারজ্জের দল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভয়ে তাহার শরীরের রক্ত শিম হইয়া উঠিল। এই শত্রুগুলা যদি আবার তাহাকে টানিয়া জিম-নাজে লইয়া যায়। কি হইবে? তাহা হইলে সে কি করিবে?

ক্রমে সন্ধ্যাব সময় যত সখের থিয়েটারের ম্যানেজার, নাট্যকার, অভিনেতা ও প্রযুক্তপ্রকাশক, সকলে দল বাঁধিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোট বাড়ী সরগরম হইয়া উঠিল। বন্ধনশালা হইতে বিবিধ ভোজ্যের বিচিত্র স্রবতি উথিত হইয়া ক্ষুধাতুর নিমন্ত্রিতগণকে মুহুমুহু উত্তেজিত করিয়া তুলিল। জাক মাতার পাশে থাকিয়া কফি, চা প্রভৃতি প্রস্তুত কবিত্তেছিল। মাঝে মাঝে লাবাস্ত্রান্স ও হারজ্জের বীভৎস চীৎকার এবং হাস্যের শব্দে তাহার শির অবধি ঝন্-ঝন্ করিতেছে।

অবশেষে ডাক্তার রিভাল আসিলেন। রোগীর প্রসন্ন মূর্তি দেখিয়া রিভাল ইদাকে কহিলেন,—দেখচো, আমোদ-আহ্লাদে আর্জান্ত্রের চেহারা অবধি ফিরে গেছে।

ডাক্তার হারজ্জ কহিল,—আপনি ডাক্তার?

আর্জান্ত্র তখন উভয়ের পবিত্র করাইয়া দিল।

নানা গল্পে, হাস্ত-কৌতুকে সে রাত্রিটা বেশ আনন্দে কাটিল। ইদারও প্রফুল্লতার সীমা ছিল না। আর্জান্ত্রের আনন্দেব মধ্যে একটু তীব্র বিষ মিশানো ছিল। আপনাব ঐখ্যের চাকচিক্যে প্রতিভার এই দরিত্র হতভাগ্য বরপুত্রগণের মনে সে যে একটা তীব্র

বিভ্রম জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহা সে বুঝিল। মোবোন্ডা-হারজের দল সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া একটু ঈর্ষান্বিত হইল। আহাধোব বৈচিত্র্য ও ঘটা দেখিয়া তাহারা ভাবিতেছিল,—আর্জাস্ত তো তোফা আছে। দিবা বাগিয়েছে। অবস্থা খাশা ফিরিয়ে ফেলেছে।

গভীর রাত্রে মজলিস ভাঙ্গিলে অভ্যাগতের দল গৃহে ফিরিতে আরম্ভ করিল। মোবোন্ডা-হারজের দল একটু অস্থিরতা অনুভব করিল। এমন পরিপাটি আবাস ছাড়িয়া কোথায় এ রাত্রে হিম-জর্জব পথে বাহিব হইবে! তাহার পর জিম-নার্জের সেই ছিন্ন শয্যায় অপ্রচুর গবম কাপড়ে কঁপিতে কঁপিতে বাত্রি পোচাইতে হইবে,—ইহা ভাবিয়া যখন তাহাদের বন্ধু জমিয়া উঠিবাব উপক্রম হইল, তখন আর্জাস্ত কহিল,—এত রাত্রে আব কোথায় সব ফিববে, আজ? হুদিন এখানে থেকে আমোদ-আহ্লাদ কবো,—তারপর যোগো। কেউ তখন ধবে বাথবে না।

কি অভয়-প্রদ, নিশ্চিন্ত ও আশাস! হাব্জের দল তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

## দশম পর্বচ্ছেদ

সেসিল

পরদিন গির্জা হইতে জাককে লইয়া ইদা যখন গৃহে ফিরিতেছিল, তখন ফটকের নিকট ডাক্তার বিভালের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। একটি ছোট মেয়েব হাত ধরিয়া বিভাল দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেয়েটির রঙ গোলাপের মত রাঙা—চোখেও বেশ একটি শান্ত দীপ্তি ফুটিয়া রহিয়াছে! ললাটের উপর প্রভাতের সূর্য্য-কিবণ আসিয়া পড়িয়াছে, বায়ু-স্পর্শে কুঞ্চিত অলকেব কয়েকটি গুলু সেই সূর্য্য-কিবণে কখনও লুটাইয়া পড়িতেছে, কখনও বা আবাব সরিয়া যাইতেছে! মেয়েটিকে দেখিলেই কেমন ভালোবাসিতে ইচ্ছা হয়।

ইদা কহিল,—ডাক্তার, এটি বুঝি তোমার নাতনী?

মেয়েটিকে কোলেব কাছে টানিয়া ডাক্তার বিভাল বলিল,—হাঁ—এই হচ্ছে, সেসিল আমার দিদি। এ দিকে এসো জাক, সেসিলের সঙ্গে ভাব কব!

তারপর কয়জনে মিলিয়া পথটুকু হাঁটিয়াই চলিল! গৃহ বেশী দূরে নহে। বিভাল কহিল,—সেসিল আর কোথাও বড়-একটা যায় না—বাড়ীতেই থাকে। শুধু এই গির্জায় তার দিদিমার সঙ্গে রবিবাব সকালে একবার করে যা আসে। আজ ওর দিদিমা আসতে পারে নি, কাজেই আমাকে নিয়ে আসতে হয়েছে।

এখানে আসিয়া অবধি সমবয়সী সাথী না পাইয়া জাক কেমন একটা নিঃসঙ্গ বিজনতা বোধ করিত! আশাব সঙ্গে গল্প করিয়া, বনে কাঠুরিয়া বা কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়া তাহার অন্তরেব ক্ষুধা মিটিত না, নিতান্ত তৃপ্তি চিত্তে এমন একজন সঙ্গী বলাব সে অনুভব করিতেছিল, যাহাব সহিত দুই দণ্ড প্রাণ খুলিয়া সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া বাঁচে! কিন্তু এমন সঙ্গী মিলিবাব কোন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই তাহার মনের দুঃখ মনেই থাকিয়া যাইত।

গৃহে বৃদ্ধ মাতামহ, মাতামহী ও দাসী ভিন্ন সেসিলও কাহারও সহিত মিশিতে পাইত না। রবিবার প্রভাতে একবার করিয়া গির্জায় আসিয়া বাহিবে বালক-বালিকা-গণেব এই অচঙ্গ হাশ্ম-কৌতুক দেখিয়া সে এক অজানা স্বপ্নবাহ্যের পবিচয় পাইত! উহার কি কথা কয়, কেন হাসে, জানিবাব জ্ঞান অনভিজ্ঞ বালিকাব মনে যে কৌতুহল জাগিত, তাহার তৃপ্তি কোন আশা না দেখিয়া সে কেমন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। তাই আজ জাক ও সেসিল যখন দুই জনে প্রথম মিশিতে পাইল, তখন জাকের মনে হইল, বনে সে পক্ষিশাবক ধরিয়া সানন্দে যে মুঠি ভরিত, এ হস্তের স্পর্শও ঠিক তেমনই মধুর, তেমনই কোমল!

ইহার পর হইতে জাককে যখনই বাড়ীতে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, তখন বনের দিকে আর কেহ তাহার সন্ধান লইতে ছুটিত না। সকলে বৃদ্ধিত, ডাক্তার বিভালের গৃহে হয় সে সেসিলের সহিত বসিয়া ডাক্তার-গৃহিণীর নিকট গল্প শুনিতেছে, নয় সেসিলের জ্ঞান কাগজের ফুল, নৌকা প্রভৃতি তৈয়ার করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

গ্রামের প্রান্তে একটা বাগানের ধারে ডাক্তারের গৃহ। গৃহখানি একতলা, নিতান্তই সাদা-সিধা দরণের। বাহিরে একটা পিতলের পাতে ডাক্তারের নাম লেখা। লেখাগুলো কতক অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে। সেই পিতলের পাতের পাশেই ‘রাজি-ঘণ্টা’ বুলানো! গৃহটি পুরাতন। নূতন কেতায় যে তাহাকে গড়িয়া তুলিবাব এককালে চেষ্টা হইয়াছিল, স্থানে স্থানে তাহাব চিহ্ন বর্তমান। দ্বারের সম্মুখে গাড়ী-বারান্দা। তাহার খামঙলা শুধু খাড়া রহিয়াছে, উপরে ছাদ বসিলেই কাজটুকু সারা হইয়া যাইত, কিন্তু ছাদ আব হইয়া ওঠে নাই! ফটক হইতে গৃহের প্রবেশ-দ্বার অবধি পথটায় এক সময় কঁকর-ফেলা হইয়া-ছিল, কিন্তু গৃহস্বামীর অমনোযোগে সেই কঁকর-ফেলা পথে মধ্যে মধ্যে এখন প্রচুর ঘাস জন্মিয়া উঠিয়াছে। সে ঘাস আর তুলিয়া ফেলা হয় নাই, স্থানে স্থানে আগাছায় পথের কঁকর ঢাকিয়া গিয়াছে। হুই-একটা দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর,—নূতন শাশি ঝড়ঝড়ি বসাইবার আয়োজন হইতেছিল, পরে আর তাহা বসানো হয় নাই! যদি কেহ বলিত, কাজটুকু শেষ হইয়া যাক, তাহা হইলে

তাহার উত্তরে মুহূ হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বুদ্ধ বলিত—  
আব দরকার কি, এ সবে ?

গ্রামের লোক গৃহস্থামীর এ উদ্দামোত্তর কারণ  
জানিত। বুদ্ধ ডাক্তার বড় সাপেই জীর্ণ বাটীর সংস্কারে  
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন—বাড়ীখানিও বেশ ছবির মত  
সজ্জিত স্তম্ভের হইয়া উঠিত, যদি না সেই দুর্ঘটনা বুদ্ধের  
জীবনকে একেবারে দলিত চূর্ণ করিয়া দিত! একমাত্র  
কল্লার মৃত্যুতে বুদ্ধের সংসারের সকল সাধ মিটিয়া গেল!  
ডাক্তার-গৃহিণী এ শোক ভীষনে ভুলিতে পারিলেন না।  
সেই দুর্ঘটনার পর হইতে গৃহিণী বাহিরের পৃথিবীর সহিত  
সকল সম্পর্ক চুকাইয়া বসিলেন। সকলে ভাবিল, বুদ্ধ  
এ শোকের বেগে বৃষ্টি সামলাইতে পারিবেন না! তাহাই  
ঘটিত, যদি সেসিল সহসা এ মংসারটিকে নব আশ্বাসের  
বাণীতে মুখবিত করিয়া না ভুলিত!

বাহিরে কর্ণ-কোলাহলের সংস্রবে আসিয়া ডাক্তার  
মাথা তুলিয়া দাঁড়াইলেন বটে—কিন্তু পূর্বেকার সে সহজ  
প্রকল্পতাটুকু তাহার হৃদয় হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করিল।  
সারাদিন রোগী দেখিয়া পীড়িতের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা  
করিয়া গৃহে ফিরিয়া বুদ্ধ আপনাকে সেসিলের হাতে সম্পূর্ণ-  
ভাবে সঁপিয়া দিতেন! সে বাসা করিয়া যেমন করিয়া  
সুখ পায়, বুদ্ধ তাহাই কবেন। সেসিলের সহিত এইরূপ  
খেলা-ধূলা করিয়াই বুদ্ধ কল্লাব শোক ভুলিবাব সঙ্কল্প  
করিলেন।

এই বিষয় গৃহে শোকের মধ্যে থাকিয়া সেসিল যেন  
কি এক দাক্ষণ বিজনতা অনুভব করিত। তাহাদের ছোট  
গৃহখানি কবরের মতই শুষ্ক, রুদ্ধ! বাহিরের কোন  
কোলাহল এখানে পৌঁছিতে পারে না—বাহিরের সহিত  
তাহার কোন সম্পর্কও নাই! ঐ আকাশ, এই বাতাস,  
ঐ পাখী, এই ফুল—ইহারাই তাহার সর্বস্ব, ইহাদের  
লইয়াই তাহার সমস্ত পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে! বাহিরের  
লোকজন—সে যেন কোন স্বপ্নের দেশে তাহাবা থাকে—  
তাহাদের সহিত সেসিলের কি সম্পর্ক! এই নিঃসঙ্গতাব  
মধ্যে অহর্নিশ বাস করায় সেসিলের মুখে এমন একটা  
করুণ বিষণ্ণ বেথাপাত হইয়া গিয়াছিল যে সেটুকু সহজেই  
লোকের চোখে পড়িত।

জাক ও সেসিলকে লইয়া রিভাল যখন গৃহে  
পৌঁছিলেন, তখন জাককে দেখিয়া গৃহিণী কহিলেন,—এ  
ছেলেটি কে ?

রিভাল কহিলেন,—আর্জান্টের ছেলে। বেশ  
ছেলেটি! সেসিল বেচারী একলা থাকে—ও-ও একলা থাকে,  
দুঃখের একসঙ্গে খেলা করবে, তাই আমি নিয়ে এলাম।

গৃহিণী গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—কিন্তু ওরা—ঐ  
আর্জান্ট'র কেমন লোক, তা কে জানে! কোথায় বাড়ী-  
ঘর, তাও কেউ জানে না।

—ওরা বেশ লোক। আমি নিজে জানি! কর্তাটি  
কেবল খামখেয়ালি—একটু বদমেজাজী। তা সে লোকটা  
হলো কবি—কবিটবি হলে মেজাজ এমন হয়ে থাকে!  
এব মা কিন্তু বড় ভালো মানুষ, আহা, নেহাৎ বেচারী।  
তবে ওরা যে বেশ ভদ্রলোক, তার আর পরিচয় নেবার  
দরকার করে না—সে ওদের ব্যবহারেই বোঝা যায়।

গৃহিণী মাথা নাড়িলেন। স্বামীর নিশ্চিন্ততায় তাহার  
কেমন বিশ্বাস ছিল না। গৃহিণী কহিলেন,—কিন্তু তুমি  
জানো তো—সেবার—

নিভান্ত অপরাধীর মত রিভাল সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি-  
লেন; পবে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,  
—কোন ভাবনা নেই তোমাব। জাক ছেলে মানুষ,  
তোমাব সেসিলও তাই। কোন ভয়ের কারণ নেই।

অবশেষে গৃহিণী নিরাপত্তিতে জাককে দৌড়িত্রীর  
ক্রীড়া-সঙ্গিৎ গ্রহণ করিলেন। জাক সেসিলের সঙ্গে  
খেলা কবিবার অধিকার পাইল।

তখন জাক জীবনে এক মধুর পবিবর্তন অনুভব  
করিল। প্রথমটা এই পবিবারে খাপ খাইতে জাকে  
কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল—সে সঙ্কোচ শীঘ্রই  
কাটিয়া গেল; এবং জাক নিত্য এখানে অতিথি হইতে  
লাগিল। ক্রমে এমন হইল, যে বাত্রে শয়ন ও আহাৰের  
সময় ভিন্ন সর্বক্ষণই সে রিভাল-গৃহে থাকিয়া সেসিলের  
সঙ্গে খেলা কবিত, গল্প করিত। বাড়ীর কথা তাহার  
আর মনে পড়িত না।

একদিন রিভাল-গৃহিণী কহিলেন,—জাক, তুমি স্কুলে  
যাও না ?

—না।

—পড়া-শোনা করো না ?

বালক আপনাকে সামলাইয়া লইয়া কহিল,—আমি  
—আমি বাত্রে বাড়ীতে মা'ব কাছে পড়ি।

বেচারী শাল! লেখাপড়া শিখানো কি তাহার  
কাজ! এ ঝক্কি কি তাহার পোষায়!

রিভাল-গৃহিণী স্বামীকে কহিলেন,—ওরা ছেলেটাকে  
আদর্শে দেখে না—সারাদিন এখানে খেলা করে বেড়াই,  
দেখি।

ডাক্তার কহিলেন,—উপায় নেই! ছেলেকে ওরা  
এঁটে রাখতে পারে না, তা ছাড়া জাকের মাথা তেমন  
নেই।

—বুঝি। ছেলেটির বুদ্ধিগুণ তেমন ধারালো নয়  
—আর ও-ও নিজের বাপ নয় তো। আহা! মার প্রথম  
পক্ষের ছেলে। এমন জায়গায় ছেলেদের প্রায়ই কোন  
বৃত্ত হয় না!

রিভাল কহিলেন,—দ্যাখো, আমার মাথায় একটা  
মতলব আসছে।

—কি ?

—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার কাছে দুঃখনেই ওরা একটু-আধটু পড়ুক !

—বেশ তো ! ডাক্তার-গৃহিণী সম্মত হইলেন ।

পরদিন জাক ও সেসিলের পাঠের ব্যবস্থা হইল । রিভাল-গৃহিণীর কাছে উভয়ে পড়িতে আরম্ভ করিল । এমন আদব, এতখানি যত্ন করিয়া জাককে পূর্বে কেহ কখনও পড়ায় নাই ! পড়িতে বসিলে সে কেমন অক্লম্ব হইয়া যাইত । পঠিত বিষয় মনে থাকিত না—পূর্বে এ দোষের জন্ম তিরস্কার ও প্রহারের অন্ত ছিল না । প্রহার থাইয়া সে আরও কেমন অক্লম্ব হইয়া পড়িত ; ভয়ে তাহাব স্বব ফুটিত না ! তিরস্কারের তীব্রতায় সব কেমন গোল হইয়া যাইত—সহজ কথা মনে থাকিত না ! এখানে রিভাল-গৃহিণীর সঙ্গের অধ্যাপনার গুণে জাকের পড়াশুনা শুধু যে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহা নহে ; পড়াশুনার দিকে মনটা ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল ।

রিভালের সহায়ত-পূর্ণ মিষ্ট ব্যবহারের সমস্ত গ্রামের লোক তাঁহার বশীভূত ছিল । জ্ঞান হওয়া অবধি জাক জীবনে কখনও বাহিরে লোকের মুখে এমন মিষ্ট কথা শুনে নাই, সুতরাং সে যে রিভালের একান্ত বশীভূত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি ?

বুদ্ধ ডাক্তার যখন আপনার ছোট টমটমখানি জুতিয়া বোগি-দর্শনে বাহির হইতেন, তখন জাক ও সেসিল তাঁহার সঙ্গে যাইত । পথে পাখী দেখিয়া সেসিল বলিত,—ওটা কি পাখী, বলো তো জাক,—জাক সঠিক উত্তর দিতে পাবিত না । সেসিল হাসিয়া তাহার ভুল শুধরাইয়া দিত । পথের পাশে বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে কে যেন সবুজ শপ্পেব শয্যা পাতিয়া বাখিয়াছে,—বায়ুস্পর্শে শস্যশীর্ষ ঈষৎ আন্দোলিত হইত । দেখিলে মনে হয়, মাঠের গা বেড়িয়া যেন একটা সবুজ ঢেউ ছুটিয়াছে । তাহা দেখিয়া সেসিল জিজ্ঞাসা করিত,—কি গাছ বল দেখি,—জাক,—ধান, না যব না গম ? জাক আবার ভুল করিয়া বলিত,—সেসিল হাসিয়া সে ভুল ঠিক করিয়া দিত ।

এমনই নিত্য সাহচর্যে, শৈশবেব সরল হাসি-খেলার মধ্য দিয়া বালক-বালিকা পরস্পরে পরস্পরকে প্রাণ ঢালিয়া ভালো বাসিতেছিল । শৈশবের সে ভালবাসা যেমন অনাবিল, তেমনই স্নিগ্ধ, স্মরন !

বুদ্ধ বোগীর বাড়ী বোগী দেখিতে যান—বালক-বালিকা গাড়ীতে বসিয়া থাকে । বুদ্ধেরই অমুগত পল্লীর দুই-চারি জন ব্যক্তি আসিয়া তাহাদিগকে কত ফুল-ফল দিয়া যাইত—বুদ্ধ তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন । বুদ্ধের গাড়ী কোন পল্লীতে আসিলে সহজে সে স্থান হইতে মুক্তি পাইত না । রাজ্যের লোক আসিয়া

সেখানে জমায়েৎ হইত । বুঝি, কোন সম্রাট আসিলেও তাঁহাকে দেখিবাব জন্ম এত লোক ছুটিয়া ঘবের বাহির হয় না ! ইহাদের সকলেই প্রায় নানা অনুযোগ-আন্দার লইয়া আসিত । কেহ বলিত,—আমার মেরেটি আব কত-দিনে সেরে উঠবে ডাক্তার ? কেহ বলিত,—ছেলেটি আমার আজ একটু ভালো আছে, কাশি কম—সেই ওষুটাই কি আবার দেবো ? তা হলে বিকেলে গিয়ে নিয়ে আসতে হয় । আবার কেহ-বা বলিত, যে গুঁড়োটা দিয়েছেন, সেটা খাওয়াতে হবে—না, গায়ে ঘসবার জন্ম ?

ডাক্তার সকলেব কথা আগ্রহেব সহিত শুনিতেন, সকলেব ঔষধ-পথ্যাদির যথোচিত ব্যবস্থা করিতেন, সকলকেই হাসিমুখে আশ্বাস দিতেন,—কেহ কখনও নিরাশ হইয়া দিবিত না । পরে ডাক্তার গাড়ী হাঁকাইয়া দিলে দুই হাত ডুলিয়া সকলে বলিত, বঁচে থাকো বাবা, দীন-দুঃখীর মা-বাপ, তুমি—ভগবান তোমার ভালো করুন ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া জাকের কন্ড মনের দ্বার খুলিয়া গিয়াছিল । কাজেই লেখাপড়ায় তাহার অমুরাগ ক্রমশ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল । গৃহে মাতার নিকট সে বহির পাতা খুলিত না—বিভালের গৃহে পড়াশুনার কথা মাকে সে কোন দিন জ্ঞানিতে দেয় নাই । আপন ইচ্ছা-মত সে গৃহে আসিত, আশার কাছ হইতে খাবার চাহিয়া আহার করিত,—আবার কখন বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, কেহ তাহাব সন্ধান বাখিত না ।

ইতিমধ্যে আবার একদিন আরাম-কুঞ্জে ভোজেব ধূম বাধিল । বাড়ী সাজানো দেখিয়া আশ-পাশের লোকের মনে কৌতুহল জাগিয়া উঠিল । আবার তারা সব আসচে রে !

শাল' আসিয়া আর্শাকে কহিল,—শীঘ্র নাও আর্শা, অনেক ভক্তলোক আসছেন আজ রাতে । আর একটা খরগোস মারো । একটা ? না, না, দুটো—কতকগুলো মমলেট তৈরি করা চাই ।

বৈকালে আবার লাবাস্ত্রাঙ্ক হারজের দল আসিয়া দেখা দিল । অর্জাস্ত্র বিজয়-গর্কে মাতিয়া উঠিল । রীতি-মত বড়মামুখি কেতায় সকলকে সে অভ্যর্থনা করিল । হারজের দল জমক দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল ।

তার পর প্রতি সপ্তাহে এমন ভোজ, এমনই সমা-বোহ চলিতে লাগিল । প্রতি সপ্তাহে নব স্নাত, নব আনন্দ, নূতন লোক । তবে—লাবাস্ত্রাঙ্ক ও হারজ প্রতি ভোজেই উপস্থিত থাকিত । তাহাদের নিমন্ত্রণ কখনও বাদ পড়িত না ।

ডাক্তার রিভাল প্রথমটা এই ব্যয়-বাহুল্য দেখিয়া ভাবিতেন, এত কেন ? পরে তাঁহার রীতিমত বিরক্তি ধরিল ! একদিন তিনি কহিলেন,—ছেলেটাকে দেখবার

এদিকে এতটুকু অবসর হয় না, দিবারাত্রি শুধু আমোদ আর মজলিস চলেছে।

অভ্যাগতের দল একদিন জাককে দেখিয়া কহিল,—ছেলেটির পড়া শোনা হচ্ছে কেমন? শালতের মন পাইবার আশায় একজন জাককে হুই-চারিটা বানান ও গণিতের সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। জাক যখন তাহার নিতুল উত্তর প্রদান কবিল, তখন অর্জাস্ত্রও বিস্মিত হইয়া গেল। ডাক্তার বিভাল কহিলেন, জাখো, ছেলেকে আমি কেমন শিখিয়েছি, এই ক’দিনে। কথাটা বলিয়া ইদার মুখের পানে ডাক্তার একবার চাহিলেন। ইদার মুখে কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতার একটা রেখা পড়িল, ডাক্তার তাহা স্পষ্ট লক্ষ্য কবিলেন।

হুই-চারিজন তারিফ কবিয়া কহিল,—বাঃ, বেশ ছেলেটি? চমৎকার বুদ্ধি-শক্তি!

লাবাস্ত্রাঙ্গ কহিল,—বাগানে ঐ বাদাম গাছটাব ডালে একটা কি কল পাটানো দেখলুম। ওটা কি?

জাক তাড়াতাড়ি বলিল,—ও, ওটা কাঠ-বিডালী ধরবার জন্ত।

লাবাস্ত্রাঙ্গ কহিল,—বটে! কে তৈরি কবলে?

—আমি। বিজয়-উল্লাসে জাকের চোখ জলিয়া উঠিল।

সকলে বলিয়া উঠিল,—এ্যা, তুমি! চমৎকার হয়েছ তো! খাশা মাথা!

লাবাস্ত্রাঙ্গ কহিল,—তাইত! ওকে তা হলে কল-কারখানার কাজ শেখাও হে, কল-কারখানার কাজ শেখাও। কবিকুরিতে ওর বেশ মাথা খেলবে।

ডাক্তার বিভাল উচ্চ হাস্য কবিয়া উঠিলেন। তারপর মজলিস ভাঙ্গিলে ধীবে ধীরে তিনি প্রস্থান কবিলেন।

অর্জাস্ত্র কহিল,—ঠিক! আমি আজ এক বছর ওব ভাবগতিক লক্ষ্য কছি—পড়া-শোনায় মোটে ওকে বাধ্য করিনি। ভাবছিলুম, কোন্ দিকে ওর ঝোঁক আছে, দেখি। তা, ঠিক বলেছ তুমি, লাবাস্ত্রাঙ্গ, কল-কজা তৈরি করার ওব মাথা বেশ খেলবে বটে!

তখন কারখানার মিস্ত্রীর উজ্জল ভবিষ্যতের আলোচনায় লাবাস্ত্রাঙ্গের দল অনেকখানি সময় ও কথা ব্যয় করিয়া ফেলিল। সমস্ত পৃথিবী যে আর পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে এই সকল মিস্ত্রীর অমুগ্ধের উপর আপনাব অস্তিত্ব ও উন্নতির জন্ত নির্ভর করিবে, তাহার সূচনা দেখা দিয়াছে! যদি সমগ্র পৃথিবীর আর্থিক উন্নতি হয় তো সে উন্নতি সাহিত্য, বিজ্ঞান, কাব্য বা ধর্মের দ্বারা সম্পাদিত হইবে না, সে উন্নতির মূলে জানিয়ে, কারখানার মিস্ত্রীসমূহের অমুগ্ধ কৌশল ও অপূর্ণ মস্তিষ্ক-বল!

অর্জাস্ত্র কহিল,—আমি ওকে কারখানায় কাজ শিখতে পাঠাবো বলেই ঠিক কয়েছি তো। তবে তেমন

ভালো কারখানার সন্ধান পাচ্ছি না, এইজন্তই পাঠানো হচ্ছে না।

লাবাস্ত্রাঙ্গ কহিল, তাহলে ছেলেটির উন্নতি আর দেখতে হয় না। এদিকে ওর বেশ প্রতিভা আছে।

অর্জাস্ত্র কহিল,—এই। প্রতিভা আছে। প্রতিভা! প্রতিভা কি সকলের এক বকম হয়? না, এক বিষয়ে খেলে? কারও সাহিত্যে, কারও বিজ্ঞানে, কারও বা এই সব প্রতিভা ফুটে ওঠে!

লাবাস্ত্রাঙ্গ কহিল,—তবে ওকে কারখানাতেই দাও। আমার জানা বেশ ভালো কারখানা আছে। বলা যদি তো আমি সন্ধান নিতে পাবি।

—বেশ—অর্জাস্ত্র কহিল,—তুমি আজই সেখানে চিঠি লিখে দাও, সন্ধান নাও। আর দাবী করা ঠিক নয়। যত শীঘ্র কাজে ঢোকানো যায়, ততই ওর ভালো!

শালত কহিল,—কিন্তু ওব শরীর তেমন মজবুত নয়। একে ভারী রোগ। ছেলে—তাব উপর এই ময়স! সেখানকার কষ্ট সহ্য করতে পাবে বেন?

হার্জ কহিল, খুব সহ্য হবে! কেন? ওর শরীর তো মন্দ নয়!

অর্জাস্ত্র কহিল, মেয়েদেব—ঐ তো দোষ! ভারী অবস্থা সব! কিসে কার ভাল হবে, তা বুঝবে না—ছেলেদেব কোলে বসিয়ে রেখে দেখে শুধু—কাজেব জন্ত ছেড়ে দেবে না! তোমাব চেয়ে ডাক্তার হার্জ শরীর-সম্বন্ধে ঢের বেশী বোঝেন, নিশ্চয়। তোমরা শুধু মানুষেব উন্নতির পথে বাধা দাও বই তো নয়!

অপ্রতিভ হইয়া শালত শুধু জাকের পানে চাহিয়া দেখিল! এই বালক,—এত গুরু শ্রম, তাহাব শরীরে সহিবে কেন? তাহার চোখে জল আসিল। কিন্তু কি করিবে সে? এতগুলি লোকের তর্ক-জালের সম্মুখে তাহার কাতর অশ্রু টিকিবে কেন? সে যে অসহায়, নিতান্ত অসহায়!

জাক মার সাকাতব নয়নের দৃষ্টি সহিতে না পাবিয়া ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ কবিল।

কি এক অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় প্রাণ তাহাব কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। মনটাকে সুরক্ষিত করিবার আশায় জাক বিভালের বাড়ীর দিকে ছুটিল।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

‘এ জীবন নহেক স্বপন’

ইহার কয় দিন পয়ে সহসা এক সন্ধ্যায় কবি অর্জাস্ত্রর নিকট জাকের ডাক পড়িল। সে আসিল। শালত তখন পাশে বসিয়া একখানা কাগজে কি লিখিতে-ছিল। অর্জাস্ত্র বলিল,—জাক, তোমাকে অনেকবার

আমি বলেছি, এ জীবন ধূলখেলা নয়। কবিও কি বলেন, জানো, 'এ জীবন নহেক স্বপন।' জীবনটা শুধু সংগ্রাম, শুধু যুদ্ধ! দেখচো তো আমাকে,—কি বকম যুদ্ধ করছি! কখনও একটু কাবু হয়েছি? কখনও না। জয়ের সম্ভাবনা এবার দেখা দিয়েছে। এখন তোমার পালা। তুমি এখন আর ছেলেমানুষ নও—বড় হয়েচো!

জাকের বয়স এখন বারো বৎসর মাত্র। হতভাগা বালক!

আর্জান্ট বলিতে লাগিল,—এখন তুমি মানুষ হয়েছ। শুধু মাথায় আর চেহারাতেই যে বেড়েচো, তা নয়, তোমার ভিতরটাও বেড়েছে—এটা কাজ-কর্মেও তোমার এখন দেখাতে হবে। এতদিন তোমার মনকে স্বাধীনভাবে গড়ে ওঠবার জগ্গ আমি যথেষ্ট সুরোপ দিয়েছি। প্রকৃতির বিশাল ক্ষেত্রে তুমি শিক্ষা পাবে বলেই আমি পড়াশুনার জগ্গ একটুও ধবা-বাঁধা কবিনি। কটন মেনে চললে মানুষের মন, স্বাভাবিক ক্ষুধা পায় না, কাছের তার গড়ে ওঠবার অবকাশও তেমন ঘটে না, আমি জানি। বৃক্ষে পাচ্ছ, এইজগ্গই শুধু তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলুম আমি—কোন কথা কইনি, তোমাকে কোন বাণী দিইনি। এখন তুমি বেশ গড়ে উঠেছ—ঠিক আমাব মনের মত দাঁড়িয়েছ। কর্মক্ষেত্রে চোকবাব পক্ষে এইটাই হচ্ছে তোমার এখন উপযুক্ত সময়।

ডাক্তার হাবুজ্ ও লাবাশ্চান্দ্র আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। একখানা চিঠি বাহির কবিয়া লাবাশ্চান্দ্র কহিল,—এই ছাখো, আমার সেই বন্ধু কদিক চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে যে, জাককে তার কারখানায় কাজ শেখাবার জগ্গ সে নিতে পারে, শুধু আমার খাতিরে! ওবা কি বাইরের লোককে কাজ শেখাতে চায়, সহজে? শুধু আমাব খাতিরেই সে জাককে নেবে, লিখেছে। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই জাককে তা হলে আঁজের যেতে হয়! সেখানেই তার প্রকাণ্ড কারখানা কি না!

জাকের বুকখানা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। এ সকলের অর্থ কি? তাহার মনে পড়িল, শৈশবে সে একবার দেখিয়াছিল, তাহারই পালিত ক্ষুদ্র একটি মেঘ-শিশুকে কশাইবা যখন কিনিয়া লইয়া যাইবাব জগ্গ আসিয়াছিল, তখন সেই অসহায় মেঘ-শিশু আপন মাতার পানে কি করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল—নিষ্ঠুর কশাই কিন্তু সে দৃষ্টি গ্রাহ্য না করিয়া অকাতর চিন্তে মেঘ ও শাবকের মধ্যে দারুণ ব্যবধান ঘটাইয়া দিল। জাকের মনে হইল, আজ তাহারও অবস্থা, সেই মেঘ-শাবকেরই মত! তেমনই অসহায়, সে তেমনই নিরুপায়!

মার বুক হইতে ছিনাইয়া কোথায় তাহাকে ইহার লইয়া যাইবে? জাক মার দিকে চাহিল। শালৎ লেখা

বন্ধ রাখিয়া কখন গিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছে, সেতাহা লক্ষ্য করে নাই। মার দৃষ্টিটুকু বাহিরের দিকে নিবদ্ধ,—যেন একান্ত আগ্রহে কি মহা-দর্শনীয় পদার্থই সে লক্ষ্য করিতেছে! জাক বুঝিল, এ চাহিয়া থাকার আর কোন অর্থ নাই, শুধু অন্তরেব বিপুল বেদনাকে কোন-মতে চাপিয়া রাখিবার জগ্গ এ একটা ছিল! আচ্ছ, জগতে কেহ যদি আপনাব জন থাকে তো সে মা। কোথাও যদি নিরাপদ স্থান থাকে তো সে মায়ের কোল! সেই মায়ের কাছ হইতে ইহার তাহাকে কাড়িয়া লইবে? সে কি আর তাহা হইলে একদণ্ড বাঁচিবে? না, না, সে যাইবে না! কখনও না! যাইতে পারিবে না সে!

আর্জান্ট কহিল,—শুন্হ জাক, তোমার বরাত ভালো, তাই কদিকদেব কাবখানায় তুমি ঢুকতে পাচ্ছ! চার বছর পরে তুমি দেখবে, কি মস্ত পাকা কারিকর তুমি হয়ে উঠেচ। কি মহান, উচ্চ পদ! এই দাসত্ব আর পরনির্ভর-তার যুগে তুমি স্বাধীন, আত্ম-বলে-বঙ্গীয়ান এক মহিম-ময় পুরুষ হবে। শেষ দিকটা বলিবার সময় আর্জান্ট'ব চোখ ছটা আবেশে মুদিয়া আসিল!

কারিকর! কারখানা! এ সব কি কথা? বাজের হুঙ্কারেও বুঝি বালক এতখানি কাঁপিত না। পারিসে থাকিতে সে কত কারিকর দেখিয়াছে,—কালি-ঝুলি-মাখা যত কুৎসিত লোক, তৈলগিস্ত ছিন্ন জামা গায়ে দিয়া দল বাঁধিয়া পথে চলিয়াছে। সুরা-ভ্রিত কর্কশ তাহাদের চাঁৎকাবে চারিধার মুখরিত! কি কদর্য্য বীভৎস লোক সব! জাক তাহাদেরই মত সেই লক্ষ্মীছাড়া কারিকর হইবে। কি ভয়ানক কথা!

লাবাশ্চান্দ্র কহিল,—সাত দিনের মধ্যেই তাহলে সেখানে যেতে হবে। এর ভিতর সব গোছ-গাছ করো, আমিই না হয় গিয়ে রেখে আসবো। বলে-কয়ে আসতে হবে তো অমনি—যেন একটু বিশেষ বদ্ধ করে শেখার!

বালক সভয়ে প্রশ্ন করিল,—আমাকে যেতে হবে?

আর্জান্ট কহিল,—হাঁ! যেতে হবে বৈ কি! আব সাত দিনের মধ্যেই!

জাকের চোখের সম্মুখে সমস্ত আলো মুহূর্তে নিবিয়া গেল! আব এক দণ্ড সে সেখানে দাঁড়াইল না—একেবারে ছুটিয়া ডাক্তার-বিভালের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

বিভাল কহিলেন,—কি? ব্যাপার কি, জাক? এমন কবে ছুটে আসছ যে! কি হয়েছে? ইঁপাচ্ছ যে তুমি। ইং, বসো, বসো! ছি, পড়ে যেতে যদি, তাহলে কি হতো বল দেখি! এমন করেও ছোটো!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দম লইয়া জাক বিভালের নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। আর্জান্ট'র উপদেশ, লাবাশ্চান্দ্রের অগ্রহ, কোন কথা সে গোপন রাখিল না।

শুনিয়া বিভাল কহিলেন,—কারিকর হবে তুমি! ওবা



তোমার কারখানায় পাঠাবে? এই বুদ্ধি শেষ মতলব করেছে! সেদিন একটা কথা শুনেছিলুম বটে,—আমি ভেবেছিলুম, তামাসা! তোমার সমস্ত ভবিষ্যৎকে এমনভাবে ওরা মাটি করে দেবে,—ক'জনে মিলে? এ্যা? না, কখনও না! আমি তা হতে দেবো না। এখনই গিয়ে এ বিষয়ে আমি কথা কইবো, জাক! কারিকর হবে তুমি? কারখানার ছোটলোক কারিকর! এই চেহারা, এই বুদ্ধি নিয়ে? না, না, কখনও তা হবে না।

ডাক্তার আব মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আরাম-কুঞ্জে ছুটিলেন। পথে ডাক্তারের গতিব ক্ষিপ্ততা দেখিয়া পথিকের দল ভাবিল, কাহারও বুদ্ধি কোন কঠিন পীড়ার কথা শুনিয়া ডাক্তার ছুটিয়া দেখিতে চলিয়াছেন, তাই এখন আর কোন দিকে চাহিয়া দেখিবাব তাঁহার অবসর নাই!

রিভাল আসিয়া যখন আর্জান্ট'র কক্ষে উপস্থিত হইলেন, তখনও কবি-সভার মজলিস ভাঙ্গে নাই।

রিভাল কহিলেন,—মাসিয়ো আর্জান্ট', একটা কথা আমি জানতে চাই—

আর্জান্ট' কহিল,—বসো, বসো ডাক্তার। হাঁপাচ্ছ যে একেবারে! একটু চা খাবে? আর্শা, চা—

—না, না, চা নয়। কিছু খাবো না। খেতে আসিনি আমি। শোনো, তোমরা না কি ঐ দুধেব ছেলেটাকে কারখানায় ছোটলোকগুলোব সঙ্গে ইতর কাজ শেখাবার জন্ত পাঠাচ্ছ? ভদ্রলোকের ছেলেব যোগ্য কি সে সব কাজ, না, সে স্থান? যত কুৎসিত সঙ্গ, লক্ষ্মীছাড়া কাজ! ছি, ছি, এমন চমৎকাব বুদ্ধি-শুদ্ধি ওর, সে সব এমন করে নষ্ট কবে দিতে হয়?

আর্জান্ট' কহিল,—কেন, এমন কিছু অভদ্র কাজ তো নয়। এঁরা সব জানেন—

—জানেন? কিছু জানেন না—না হয় ছেনেও গোপন করেছেন!

ডাক্তারের স্বরে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। চট্ করিয়া কেহ উত্তর দিতে পারিল না। শাল'২ তখন কথা কহিল; সে কহিল,—কিন্তু আর্জান্ট', আসল কথা হচ্ছে কি—জাক—

—শাল'২! আর্জান্ট'র স্বরের তীব্রতায় ইদা চূপ করিয়া গেল।

আর্জান্ট' কহিল—বলো ডাক্তার, কি বলবে তুমি, বল।

রিভাল কহিলেন,—জাক আমার বলছিল, তোমরা না কি ওকে কারখানায় পাঠাতে চাও,—কারিকর হতে! যত কামারের কাজ, ছোট লোকের কাজ, এই সব শেখাবার জন্ত! একথা কি সত্য?

—হাঁ।

—সত্য! কি বলচো, আর্জান্ট'! ওর বংশ, ওর শিক্ষা, এ সব কি ওকে কামারের কাজের যোগ্য করে গড়েছে? এমন বুদ্ধি—আরও বিশেষ ওর স্বাস্থ্য! ওর শরীরে এ-সব সহ হবে কেন?

ডাক্তার হার্জ' কহিল,—কেন, শরীর ওর বেশ মজবুত!

রিভাল তাহার কথার কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। পরে ইদার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—তুমি শোনো, তুমি মা, তোমাকে বলি। তোমার ছেলেব শরীর তেমন মজবুত নয়। সেখানে বড় কষ্ট। সে কষ্ট ওব সহ হবে না। ও মাঝা যাবে—এ আমি বলে বাখছি! শরীরের কষ্ট যদি ছেড়ে দি, তা হলেও মন। মনের কষ্ট—ভদ্রলোকের ছেলে, সেই সব ছোট লোকের সঙ্গে বেড়াতে হবে, তাদের দলে মিশে কাজ কবতে হবে—এতে ওর মন একেবারে ভেঙ্গে যাবে। তা ছাড়া সেই সংসর্গ থেকে তুমি মা তোমার এ জাককে আর ফিরে পাবে না। এ নিশ্চয় জেনো। কিছু দিন তাদের সঙ্গে বাস কবলেই জাক যা হবে, তা দেখে, তুমি ত মা হচ্ছ, লজ্জায়, ঘৃণায়, তুমিও তোমার ছেলের দিকে চাইতে পারবে না। শক্ত হাত, কালো কর্কশ চেহারা, মুখের কথা নিতান্ত অভদ্র, মনের গতি কদর্বা, নীচ—এ সব নিয়ে তার মার কাছে এসেও সে মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না!

আর্জান্ট' ক্রোধে ফুলিতেছিল। সে কহিল,—ডাক্তার, এ সব অনধিকার চর্চ্কা করবাব তোমার কোন দরকার দেখি না আমি। আমার যা খুশী, আমি তাই করবো। আমার বাড়ীতে আমিই কর্ত্তা। আর কারও কর্ত্তামি এখানে আমি সহ করবো না, তাব প্রশ্রয়ও দেবো না। তোমার পরামর্শ আমি চাইতে যাইনি, তবে তোমার এ মাথা-ব্যথা কেন?

রিভাল তীব্র স্বরে কহিলেন,—তোমার আমি কোন কথা বলতে আসিনি, আর্জান্ট! জাক তোমার কে? কেউ নয়! তার ভালে-মন্দে তোমার কি এসে-যায়? কিছু না! আমি তার মাকে বোঝাতে এসেছি, জাকের মাকে। তাকে শুধু সাবধান করে দিচ্ছি যে, রাক্ষসদের মতে সাহ দিয়ে ছেলেটাকে ঘেন জবাই না করে। সে মা, মাকে আমি তার ছেলে হারাতে দেবো না—তাই তার কাছে এ কথা আমি বলতে এসেছি, তোমাকে নয়। তুমি চূপ করে থাকো।

আর্জান্ট' কহিল,—বটে! এতদূর স্পর্ধা! আমার বাড়ীতে এসে আমারই দিকে চেয়ে তুমি চোখ রাঙাও! ডাক্তার, এ সব আমি সহ করবো না। এখনই এই দণ্ডে তুমি আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।...বাও।



—চলে যাবো? তাই যাবো, আর্জান্ট-সাহেব, এখানে আমি থাকতে আসিনি। ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে একবার আর্জান্টের পানে চাহিলেন, পবে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—চলেই যাচ্ছি—তবে যাবার আগে জাকের মাকে আর একবার আমি বলে যাই,—সাবধান মা, এমনভাবে ছেলের সর্বনাশ করো না, করো না! ওর এমন বুদ্ধি, এই বয়স, এমন কবে তার সমস্ত জীবনটাকে নষ্ট করে দিগে না।

কথাটা শেষ কবিয়া রিভাল গভীরভাবে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু কোন ফল হইল না। জিনিষ-পত্র গুছানো চলিতে লাগিল। জাককে যাইতে হইবে। যে দিন তাহার যাইবার দিন স্থির হইল, তাহার পূর্বে-সন্ধ্যায় জাক আসিয়া মাকে জড়াইয়া ধরিল, ককণ সুরে কহিল,—মা, আমি কারখানায় যাবো না, যাবো না মা। কারিকর হতে পারবো না আমি! আমায় এমন কবে তাড়িয়ে দিগে না, মা। আমি তোমাদের খেতেও চাই না, পরতেও চাই না—শুধু একটি কোণে পড়ে থাকবো। তাতেও কি তোমরা—? জাকের স্বর কষ্ট হইয়া আসিল; সে আর কিছু বলিতে পারিল না।

—জাক—ইদার স্ব কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আর কোন কথা বাহির হইল না।

—মা—। বলিয়া জাক কাঁদিয়া ফেলিল।

ইদা কহিল,—শোন, জাক। ছি,—কথার অবাধ্য হইয়া না, বাবা। আমি কি সাধ করে তোমাকে দেখানে পাঠাচ্ছি? তুমি মানুষ না হলে আমার যে একদণ্ড সায়ান্তি নেই, জাক। কেন, কারিকরের কাজ মন্দ ক?

—তবে তুমিও আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে যাও, মা?

—ও কি কথা, জাক? বালাই। আমি তোমায় গড়িয়ে দেবো! কেন? তা কি সম্ভব? আমি না তোমার মা? তুমি কাজ শিখে মানুষ হও, তোমারই ভালো হবে। আমি জানো না, জাক,—এখনও সব কথা জানবার তোমার যস হয়নি—তুমি ছেলেমানুষ! এর পর এক দিন সব বুঝতে পারবে তুমি! কি হুখে তোমাকে পাঠাচ্ছি, তখন বুঝবে। তোমার জন্ম-কথা—সে এক গুঁচ বহুশ্রে ঢাকা! ড় হলে সব জানতে পারবে। আমার যে কি হুখ, সে দিন তুমি বুঝবে! কেন তোমাকে প্রাণ ধরে আমার গাছ থেকে দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আমার প্রাণ কি বকম গাছে—সেই দিন তুমি জানতে পারবে, জাক! আজ বার কিছু বলবো না, বুঝবে না তুমি। তবে শুধু এইটুকু জেনে রেখো যে, যত দিন না তুমি মানুষ হতে পারছ, যত দিন না তুমি আপনায় পায়ে ভর দিয়ে ঝাঁড়াতে পারছ—তত দিন আমার এ কষ্ট কিছুতে যাবে না! আমার

সুখের জন্ত কি এ কষ্টটুকু তুমি সহ্য করবে না জাক? তুমি মানুষ হলেই আমার সব হুখ ঘুচে যাবে। কারখানায় গেলে চার বছরেই তুমি মানুষ হতে পারবে, কিন্তু লেখা-পড়া শিখে মানুষ হতে সে অনেক দেরী! এই চার বছর আমার মুখ চেয়ে—তোমার মার হুখ ঘোচাবে, শুধু এই ভেবে তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে না? ইদার চোখে জল আসিল।

জাক মার বুকে মুখ রাখিয়া বলিল,—না মা, কেঁদো না, তুমি! কেঁদো না, মা। তোমার কষ্ট যাবে? কিন্তু বলো মা, এর পর আমায় দেখে তুমি ঘৃণা করবে না—এমনই আদর করেই আমাকে বুকে টেনে নেবে? বলো—এমনই ভালোবাসবে?

জাক—জাক—তোকে আমি ভালোবাসব না! এ তুই কি বলছিস? তুই ছাড়া পৃথিবীতে আমার আর কে আছে, জাক? ইদা জাককে হুই চোখে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল!

অবশেষে ষাইবার দিন আসিল। ষাইবার পূর্বে জাক রিভালের সহিত একবার দেখা করিতে গেল। এক সপ্ত দিন সে দিকে সে মোটে পা দেয় নাই। মা বারণ কবিয়া দিয়াছিল। জাকও মাঝ নিষেধ অমান্য করে নাই।

জাক বলিল,—দাদামশায়, আমি যাচ্ছি!

রিভাল কহিলেন,—যাচ্ছ, দাদা! ওরা শুনলে না? কিছুতে শুনলে না! তোমাকে যেতেই হলো! কি করবে, বলো, দাদা? তবে এসো, ভাই। কিন্তু একটা জিনিস তোমাকে আমি দিচ্ছি—সেটি যত্নে রেখো! তোমার পড়বার জন্ত এক বাস্তু বই আমি বেছে বেছেছি, জাক! জেনো, এমন বন্ধু জগতে আর কেউ নেই! এমন সুখ কেউ দিতে পারে না। হুখে-শোকে এই বইয়ের মধ্য থেকে তুমি আশ্চর্য্য সাহসনা পাবে। সে সাহসনা মানুষকে মানুষ দিতে পাবে না, জাক! এই বইগুলিকে যত্নে রেখো, পড়ো। সেখানকার নীচ লোকগুলোর সঙ্গে মিশো না—তাদের কুৎসিত আদর্শ-আহ্লাদেও কখন যোগ দিগে না। যেটুকু অবসর পাবে, তাতে বইগুলি পড়ো। যদি সব বুঝতে না পাবো, ক্ষতি নেই—তবু পড়ো। পড়তে পড়তে এক দিন সব বুঝতে পারবে, জাক! কেমন, বলো, পড়বে?

—পড়বো, দাদামশায়।

—ঐ যে বাস্তু—একবারে ভরা আছে। এই নাও চাবি। এগুলি তুমি সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি লোক দিয়ে বাস্তুটা তোমাদের বাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি। ই, সেমিলের সঙ্গে যাবার আগে তোমার একবার দেখা হলে না! সে তার দিদিমার সঙ্গে পাহাড় দেখতে গেছে, তা আমি তাকে সব বলবো'খন!

—তবে আসি, দাদামশায়। সেমিলকে বলে, দেখা হলো না বলে সে যেন রাগ না করে!

সাগ্রহে রিভাল বালককে আলিঙ্গন করিলেন। বুদ্ধের অন্তরের মধ্যে বেদনা-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছিল! এ নিষ্ঠুর দারুণ বিচ্ছেদ-দুঃখে বুক তাঁহার তোলপাড় করিতেছিল। জাকের ললাটে চুষন করিয়া রিভাল কহিলেন,—তা হলে এসো, দাদা।

জাক চলিয়া গেল। আরাম-কুঞ্জের সম্মুখে তখন গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিনিস-পত্র বোঝাই হইতেছে। জাক মার কাছে গেল। ইদা জাককে বৃকের মধ্যে ঢাপিয়া দখিল। এমন সময় বাহির হইতে ডাক পড়িল,—এসো, জাক। দেবী কিসের?

বাহিরে গাড়ীর নিকট লাবান্ত্রাঙ্গ দাঁড়াইয়াছিল। জাক বাহিরে আসিল। ইদা লাবান্ত্রাঙ্গকে কহিল,—তাদের বলে দেবেন, জাককে যেন তাহা খুব বড় কবে! নেহাৎ ছেলেমানুষ ও, কিছ্ বোঝে না!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! সে কথা আবার বলে দিতে হবে, আমাকে?

—জাক—

—মা—

শার্লৎ কোনমতে আর উথলিত অশ্রু ঢাপিয়া রাখিতে পারিল না! জাকের চোখেও একবিন্দু অশ্রু ছিল না —আপনাকে সে কঠিন দৃঢ় করিয়া ফেলিয়াছিল। মার দুঃখ ঘুচাইতে চলিয়াছে সে, ইহাতে কি গোঁবব, কি সুখ! কাঁদিবে কেন? এ বিচ্ছেদ-কষ্ট ত ক্ষণিকের! তারপর? সে মানুষ হইয়া ফিরিলে মার যে আর কোন কষ্ট থাকিবে না! ইহাতে কি তাহার ক্রন্দন শোভা পায়! জাকের মনে একটা গর্ষ হইতেছিল—মার জন্ত সে আজ আপনাকে বলি দিতে চলিয়াছে! ধন্য সে। সার্থক তাহার জীবন! গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ইদা কহিল,—জাক, চিঠি লিখো, আমাকে।

মোড় বাঁকিয়া গাড়ী যখন অল্প পথে পড়িল, তখন জাক পিছনে ফিরিয়া দেখিল, দূরে ঐ লতা-গুয়ের অন্ত-বালে তাহাদের বাটীব জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক নারী! জাক নিম্নে তাহাকে চিনিল—সে তাহার মা ইদা।

## তীয় অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### অঁর্যাদ্রে

অদূরে কলকারখানার গগনম্পর্শী চূড়া দেখিয়া উচ্ছ্বাসভবে হুই বাহু বিস্তার করিয়া দিয়া লাবাস্ত্রাঙ্গ জাককে ডাকিয়া কহিল,—দেখেচো জাক—চাপিবার কি চমৎকার দেখাচ্ছে।

উভয়ে তখন নৌকারোহণে লয়াব নদী পার হইতেছিল। ল্যাবান্ত্রাঙ্গের স্বরে কৃত্রিমতা থাকিলেও সম্মুখেই অঁর্যাদ্রেব কলকারখানা একটা অক্ষুট কলববের সহিত জাকের চক্ষে এক অপরূপ নূতন স্বর্গ ফুটাইয়া তুলিল।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলিয়া পড়িতেছে—তাহারই ক্ষীণ রশ্মি তরল রক্ত-ধারাব মত নদী-বক্ষে অরিয়া পড়িয়াছে! বাতাসে একটা কাঁপন লাগিয়াছে! সেই কম্পিত বায়ুতরঙ্গের অন্তবালে সম্মুখস্থ নগরীকে কুহেলিকাচ্ছন্ন মায়াপূরীর মত মনে হইতেছিল।

নদী-বক্ষে অসংখ্য সীমার, নৌকা। কোন সীমার ময়দার বস্তা বহিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে—তীরের নিকট জেটিতে বাঁধা কোন সীমায়ে লবণ বোঝাই হইতেছে, পুরুষ ও রমণী কুলিদিগের বিচিত্র পোষাকে লবণের টুকরা

লাগিয়াছে, তাহাতে নৌদ্র-কিরণ পড়ায় সেগুলি চুমকির মত ঝিকঝিক করিতেছে। বাঁশী বাজাইয়া জাকের নৌকার পাশ দিয়া কত সীমার চলিয়া গেল! চারিদিকেই একটা ব্যস্ততা বসাড়া!

জাক কহিল,—আর কতদূরে—অঁর্যাদ্রে?

এই তো অঁর্যাদ্রে।

নৌকা তীরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। অল্পষ্ট তীর স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল! জাক দেখিল, সম্মুখে বড় বড় বাড়ী, তাহাতে চিমনির সারি। চিমনিগুলো হইতে কয়লাব ধূম নির্গত হইয়া সারা আকাশকে কালো করিয়া তুলিয়াছে। লোহা-পেটার শব্দ, কলের ষড়ষড়ানি, লোকের চীৎকার, সীমারের বাঁশী, সমস্ত মিলিয়া একটা বিরাট কোলাহল বাধাইয়া দিয়াছে!

ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। ঘাটে একজন লোক দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া লাবান্ত্রাঙ্গ চীৎকার করিয়া উঠিল,—আরে, রুদিক যে!

—এই যে, লাবান্ত্রাঙ্গ, এসেচো!

লাবান্ত্রাঙ্গ ও রুদিক—হুই ভাই। হুজনের মুখে অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও রুদিকের দেহ পুরুষ ও বলিষ্ঠ, লাবাস্ত্রাঙ্গ স্ত্রী না হইলেও তাহার অবয়ব কতকটা কোমল ধরণের।

লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌ কহিল,—বাড়ীর খপর কি? ক্লারিস্‌, জেনেদ, সব ভালো আছে?

—সবাই ভাল আছে। এটি বুঝি সেই ছোকরা—  
কাজ শিখতে এসেছে? এর শরীর তেমন শক্ত নয় তো!

কে বললে, নয়? দেখতে এমন রোগা হলে কি হয়—পারিব ডাক্তারবা অবধি বলেছে, শরীর ওর ভাবী মজবুত!

—তা হলেই ভালো! নইলে আমাদের ঘে-রকম কাজকর্ম—তাতে শরীর বেশ মজবুত না হলে চলে না মোটে! এসো এখন। তোমার নাম কি, বাবা?

জাক কহিল,—আমার নাম জাক!

“জাক! বাঃ, বেশ নাম! এস জাক, এস লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌, এখনই কারখানায় গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে নি, তারপরে বাড়ী যাওয়া যাবে। পথেই ম্যানেজারের আপিস।

সকলে কারখানার দিকে চলিল। দুই ধারে ছোট, বড়, মাঝারি, নানা আকারের গাছ—তাহারই মধ্য দিয়া সক পথ। দুই ধারে কারখানা-বাড়ীর বিভিন্ন ঘর, মাঝে মাঝে দূবে-অদূবে কোথাও জানালায় জামা শুকাইতেছে, কোথাও বা শিশুর ক্রন্দন, মাতার ঘুমপাড়ানি গান শুনা যাইতেছে! এগুলো না থাকিলে জাকের মনে হইত, এ যেন এক পরিত্যক্ত জন-মানব-হীন গ্রামপ্রান্তে সে আসিয়া পড়িয়াছে। পথে একটিও লোক চলিতেছিল না।

লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌ চাঁৎকার করিয়া উঠিল,—এ যে নিশেন নামানো রয়েছে! ওঃ, আগে এই নামানো নিশেন দেখলে কি ভয়ই না হতো!

জাককে তখন নিশান নামাইয়া রাখার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইল। কারখানা খুলিবাব পূর্ব পাঁচ মিনিট অবধি নিশান তোলা থাকে, তারপূর্ব নামাইয়া দেওয়া হয়! নিশান নামানো হইলে আর কোন কারিকরকে কাবখানার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কারিকরদের বিলম্ব হইলেই বিপদ—প্রথম অপবাধে সেদিনকার হাজিরা লওয়া হয় না, পবে আর দুই-একবার কারখানায় আসিতে বিলম্ব ঘটিলে তাহাকে একেবারে ছাড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকলে ইতিমধ্যে কারখানার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাক দেখিল, এ যেন লৌহ-নির্মিত এক বিরাট নগর। কত লোক কাজ করিতেছে। বড় বড় লোহার গম্বুজ পড়িয়া রহিয়াছে—কোথাও একটা এঞ্জিনের চারি ধারে বসিয়া অসংখ্য কারিকর এঞ্জিনের অতিকার্য দেহে ছোট বড় পেরেক আঁটিতেছে। মৃত্যুর দূত অসংখ্য পুরাতন মরিচা-ধরা কামানের সারি মেরামতের জন্ত পড়িয়া রহিয়াছে!

এই সকল দেখিয়া জাক কেমন স্তম্ভিত হইয়া গেল।

কি বিরাট ব্যাপার! অসাময়িক কাণ্ড! এ যেন গল্প-শ্রুত সেই কোন দৈত্য মহা-সমারোহে নরমেধ-বজ্র-সম্পাদনের জন্ত লৌহ-কটাং ও শ্রুতাদি নির্যাতনে অসংখ্য কারিকর নিযুক্ত করিয়া দিয়াছে! জাক দেখিল, একপাশে একটা প্রকাণ্ড অন্ধকার ঘর—ভিতরে মধ্যে মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিতেছে,—যেন দৈত্যের ক্ষুধাতৃব লোল রসনা আহার মাগিতেছে! আর সেই ঘরের মধ্যে কতকগুলো ছোট ছোট দৈত্য কি এক মহা ষড়যন্ত্রে সূঁকিয়া পড়িয়াছে। রুদ্ধ কহিল,—এই ঘরে লোতা পেটা হচ্ছে।

অবশেষে একটা ঘরের সম্মুখে আসিয়া রুদ্ধ কহিল,—এইটে হলো ম্যানেজারের ঘর। এসো, যাওয়া যাক—পবে লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌র দিকে চাটিয়া কহিল,—তুমিও আসছ তো?

—আমি। আচ্ছা, চলো—একবার বুড়োব সঙ্গে দেখা করা যাক। সে তো আমায় বলেছিল, আমাব দ্বারা কারখানার কাজ-কর্ম চলবে না! এখন শুধু গান গেয়েই আমাব অবস্থা কেমন হয়েছে, তাকে একবার দেখিয়ে তারিক আদায় কর্তে দেখ কি! গর্বে লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌র চোখ দুইটা জলিয়া উঠিল।

তিন জনে ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল,—কে—কদ্দিক! খবর কি?

কদ্দিক কহিল,—আজ্ঞে, সেই ছেলেটিকে এনেছি—এখানে সে কাজ শিখতে চায়!

—বটে! বলিয়া ম্যানেজার তাকে দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, পবে কহিল,—এর শরীর তেমন মজবুত দেখছি না। এসো। কি, তুমি কাবখানায় কাজ শিখবে? বেশ।

কদ্দিক কহিল,—না—ও বেশ শক্ত আছে।

লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌ কহিল,—বেশ শক্ত।

ম্যানেজার তাহার দিকে ফিবিয়া কহিল,—এই যে, তোমায় চিনি-চিনি বোধ হচ্ছে যেন!

লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, এবার সে পরিচয় দিবে। ছয় বৎসর পূর্বে অযোগ্য বলিয়া এখান হইতে যাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলে, এই ছয় বৎসরে শুধু গান গাহিয়া সে কেমন প্রভূত বশেব অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে,—প্রতিভা তাহার কেমন বিকাশ লাভ করিয়াছে, একবার চাহিয়া দেখো! কিন্তু ম্যানেজার তাহার প্রতি আর লক্ষ্য কবিল না। লাবাস্‌য়ান্দ্র্‌র রাগ হইল। একি অবজ্ঞা!

ম্যানেজার রুদ্ধকে কহিল,—তোমার ছাত্রকে তাহলে আজ তুমি নিয়ে যাও, রুদ্ধিক! তোমাব হাতেই ওর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, জেনো। ওকে মাঝে কবে তোলা। ছেলেটি ভালো ঘরের—চেহারা দেখে বুঝি।

তারপর তিনজনে গমনোত্তর হইলে ম্যানেজার রুদিককে আহ্বান করিল। তখন নিভূতে দুইজনে কি কথা-বার্তা হইল। পরে রুদিক বাহিরে আসিলে লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ কহিল,—কি বললে ম্যানেজার? আমাব সন্ধ্যা কোন কথা হলো না কি? বাই বগো, লোকটার কিন্তু ভারী অহঙ্কার।

রুদিক কহিল,—না, না, তোমার কথা কিছু হয়নি। ও আমাদেব চালির কথা হচ্ছিল। সবাইকে সে ভারী কষ্ট দিচ্ছে কি না! চালি রুদিকের খুড়তুতো ভাই, বয়সে রুদিকের চেয়ে অনেক ছোট।

লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ কহিল,—চালি কষ্ট দিচ্ছে! কেন, ব্যাপার কি?

“ব্যাপার গুরুতর। খুড়িমা মারা যাবার পর থেকে সে একেবারে উচ্ছন্ন গেছে। জুয়া খেলে, মদ খেয়ে বিস্তর দেনা করেছে। ডিজাইনের কাজও বেশ জানে। দু'পয়সা তাতে বেশ পায়। ডিজাইনের কাজে এ সহরে ওর তুল্য লোক আব একটিও পাবে না তুমি! তা হ'ল পয়সা আনলে কি হবে—যা পায়, সবই নেশায়-জুয়ায় ফুঁকে দেয়। তাকে শোধরাবাব জ্ঞান ম্যানেজার, তবে গে, আমি, আমাব স্ত্রী, আমরা কম চেষ্টা কবেছি! ও শুধু কাঁদে, আর বলে, আর কোন বকম বদখয়ালি করবে না—তার পর যেমন আবার মাইনে পাওয়া, অমনি যেক সেই! ওব বিস্তর দেনা আমি শোধ করে দিয়েছি! কিন্তু কাঁহাতক আর পেরে উঠি, বলো? আমাব মেয়ে জেনেদ্ রয়েছে, বড় হয়েছে সে—তার বিয়ের জোগাড় দেখতে হবে,—তাতেও বেশ মোটা বকম খরচ আছে তো! এক সময় আমি ভেবেছিলুম, চালির সঙ্গেই ওর বিয়ে দেবো, কিন্তু এখন বুঝছি, চালিকে দেওয়া যা, মেয়েটার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দেওয়াও তাই! তা তো দিতে পারিনে! তাই আমরা স্থির কবেছি—কোনরকমে এ দেশ থেকে এই বদ সঙ্গীতুলোর কাছ থেকে ওকে যদি একবার দূরে পাঠাতে পারি তো ওর শোধরাবার কিছু আশা থাকে। তাই ম্যানেজার আমায় ডেকে বলছিলেন যে, নেভারে তার জ্ঞান একটা ভাল কাজের তিনি জোগাড় করেছেন—উপার্জনও এখানকাব চেয়ে ঢেব বেশী হবে। আমরা তো মাচার, এখন তুমি একবার ওকে বুঝিয়ে! দেখি—তোমার কথা শুনে হয়তো শুনতে পারে!

লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ সগর্বে উত্তর দিল,—নিশ্চয়, বোঝাবো বৈ কি! তাব জ্ঞান ভাবনা নেই!

সকলে মিলিয়া রুদিকের গৃহেব দিকে চলিল। পথে বিস্তর লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। লাবাস্‌য়ান্দ্ৰের পুরাতন সঙ্গীর দল পরিচয় পাইয়া অল্পান্ত্র কৌতুহল ও আগ্রহ লইয়া তাহার পানে চাহিয়া-চাহিয়া দেখিতেছিল—সে ছিল ইহাদের একজন। এখন হইতে ছিটকাইয়া গিয়া

শুধু প্রতিভার জোবে কেমন আজ অবস্থা ফিরাইয়া ফেলিয়াছে। আর তাহার...?

হায়, বেচারার কারিকরের দল! তাহার জানে না, লাবাস্‌য়ান্দ্ৰের স্বকণ মূল্য কি! তাহাব অবস্থা যে এই কাবিকবগুলার অবস্থার চেয়ে একটুও ভালো নহে, বরং—যাক সে কথা! কারিকরের অন্ন-চিন্তা নাই—কিন্তু লাবাস্‌য়ান্দ্ৰের তাহা বিলক্ষণ আছে! তাহার এই পরিচ্ছন্ন কায়েমী পরিচ্ছদের মধ্যে কি ভীষণ দৈন্ত্য রি-বি কবিতেকে, লাবাস্‌য়ান্দ্ৰের সৌভাগ্য, তাহা লক্ষ্য করিবে, কাবিকবগুলার এমন দিব্য দৃষ্টি ছিল না!

লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ ও জাককে আনিয়া রুদিক আপনাব গৃহ-সংলগ্ন ছোট বাগানটিতে বসাইল। বাগানটি ছোট হইলেও পরিচ্ছন্ন! তথায় এক ধারে একটি টেবিল ও তাহাব চাবি পার্শ্বে কয়েকখানা চেয়ার। একখানা চেয়ার দরিয়া এক স্ত্রী তরুণী দাঁড়াইয়াছিল। রুদিক কহিল,—এ আমাব স্ত্রী ক্লাবিস্!

পথেই রুদিক লাবাস্‌য়ান্দ্ৰকে বলিয়াছিল, তাহাব প্রথমা পত্নী জেনেদেব মাতাব মৃত্যু হইলে ক্লাবিস্কে সে বিবাহ করিয়াছে।

ক্লাবিস্ সুন্দরী। তাহার মুখে এমন একটি কমনীয়তা মাথানো আছে, যাচা এই কল্প ও দৈন্ত্য-পীড়িত পল্লী-সমাজে একান্ত দিবল। জাকের মনে হইল, এই নিবানন্দময় বীভৎস দৈন্ত্য-পূর্বব মণে ক্লাবিস্ যেন কাহিনী-বর্ণিত, দৈন্ত্য-গৃহে বন্দিণী সেই রূপসী পবী-কন্না। আকাশে সন্ধ্যা-সমাগমে এই যে দিব্য আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে যেন এই পবী-কন্নাব রূপছটা! বৃক্ষ-পত্র হুলাইয়া এই যে স্তম্ভ ধীর সমীর বহিয়া চলিয়াছে, সে যেন এই রূপসী পবী-কন্নার শাস্ত্র মুহ নিশ্বাস! রুদিক কহিল,—ক্লাবিস্কে দেখতে খাশা, নয়?

—চমৎকার—তোমার স্ত্রী-ভাগ্য এবার ভাল হয়েছে, দেখচি।

স্ত্রীর সহিত রুদিক সকলের পরিচয় করাইয়া দিলে যথারীতি অভ্যর্থনাদি হইল। পরে লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ গান ধরিল,—ওগো, পূত-শাস্তিভরা চারু নিবাস—

সঙ্গীত থামিবার পূর্বেই কে কহিল,—এই যে দাদা—তুমি কখন এলে!

সে চালি।

পরে চালি ও লাবাস্‌য়ান্দ্ৰের নানা বিষয়ে কথাবার্তা স্বক হইল। ক্লাবিস্ আসিয়া জাককে কোলের কাছে টানিয়া কহিল,—তোমাব নাম কি?

—জাক।

রুদিক কহিল,—জেনেদ্—জেনেদ্ কোথায়? জানো, লাবাস্‌য়ান্দ্ৰ জেনেদ্ এক দর্জীর দোকানে কাজ করছে।

জামা, জ্বক, এ সব সে এমন খাশ। তৈরি হুতে শিখেছে  
আর পারেও বেশ—মাহিনা মন্দ পাচ্ছে না!

মুহ হাসিয়া লাবাস্‌য়ান্দ্ কহিল,—বটে, কোথায় সে?  
ক্লারিস্ কহিল,—ঐ যে, আসছে!

ক্লারিসের কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে উজান-মধ্যে  
এক নারীমূর্তি দেখা দিল। এই নারী জেনেদ্।

জেনেদের শরীরখানি কিছু স্থূল—মুখে একটুও কম-  
নীয়তা নাই, গড়নও সুশ্রী নহে! চোখে কেমন একটা  
পরুষ ভাব! বাহ ও পেশীগুলি পুরুষোচিত কঠিন। তবে  
জেনেদকে দেখিলে মনে হয়, তাহার নিজের বেশ একটা  
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। কর্ণ-জীবনে সকল প্রকার বজ্র-  
ঝঙ্কার বিরুদ্ধে সবলভাবে দাঁড়াইবার সামর্থ্য তাহার  
বিলক্ষণ! তাহার পাশে তাহাব বিমাতা ক্লারিস্কে  
দেখিলে মনে হয়, ক্লারিস্ যেন একান্ত পরমুখাপেক্ষিণী!  
লতার মত সে কেবল আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়ায়! আশ্রয়  
নহিলে সে দাঁড়াইতে পারে না।

জেনেদ্ আসিয়া তাহার ছুঁচ-হুতা ও সেন্স-কাঁচিভরা  
ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিল; পবে চার্লিকে দেখিয়া  
কহিল,—এই যে চার্লি! তোমার ম্যানেজাব বলছিল,  
তোমাকে নিয়ে সে ভারী আলাতন হয়ে পড়েছে। তোমার  
বদখেয়ালি তুমি ছাড়বে না কিছতে!

চার্লি কহিল,—ম্যানেজার আমার হু'চক্ষে দেখতে  
পারে না।

বাধা দিয়া কদিক বলিল,—না, না, চার্লি, ম্যানেজারের  
কোন দোষ দিবে না! তিনি তোমায় যথেষ্ট ভালোবাসেন!  
তোমার জন্ত নেভারে একটা ভাল চাকরিব তিনি যোগাড়  
করেছেন, তা জানো?

—নেভাবে?

—হাঁ—নেভাবে! সেখানে তোমাব সব দিকে উন্নতি  
হবার সম্ভাবনা আছে।

—বেশ—যাবো! আমাকে এখান থেকে তাড়াবার  
জন্ত যখন তোমাদের সকলেব এত সাধ, তখন আমি  
যাবো।

কদিক কহিল,—তাড়ানোর কথা নয়। তোমার  
ভালোর জন্তই বলা। যা হোক, এখন রাত হয়ে আসচে,  
চলো ভিতরে গাই! ক্লারিস্, খাবাব তৈরী হয়েছে?

—হাঁ।

রাত্রে আহারে বসিয়া লাবাস্‌য়ান্দ্ কারিকরদিগের  
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুদীর্ঘ এক বক্তৃতা ফাঁদিয়া দিল।

লাবাস্‌য়ান্দ্ কহিল, “জাক, এখন তুমি একজন নগণ্য  
লোক, কেউ তোমায় জানে না, চেনে না—কিন্তু অদূর  
ভবিষ্যতে তুমি দেখবে, জগতে তুমি একজন সর্বো-  
স্বর্গ্য হইবে।”

হাসিয়া কদিক কহিল,—“হাঁ, সর্বো-স্বর্গ্য! হু'বেলা

পেট ভরে খেয়ে বুড়ো বয়সে মরবার সময় কিছু জায়গা-  
জমি যদি কেউ করে যেতে পারে তো, সে আপনাকে খুব  
ভাগ্যবান বলে মনে করবে! সর্বো-স্বর্গ্য! কি যে বলো  
তুমি, লাবাস্‌য়ান্দ্?... ক্লারিস্, খাওয়া হলে জেনেদের  
ঘরের পাশের ঘরটায় জাকের জন্ত বিছানা করে দিয়ো—  
কাল ভোরে পাঁচটার সময় ওকে আবার ডেকে দিতে  
হবে। ওর জন্ত ছোট-খাট পোষাক একটা জোগাড় করে  
দিতে হবে। আছে বোধ হয়,—একটা দেখে-ভুনে তুমি  
ঠিক করে বেখো। কাল ভোরেই ওকে কারখানায় নিয়ে  
যাবো।

আহারের পর আপনাব নির্দিষ্ট ছোট ঘরটিতে আসিয়া  
বিছানায় পড়িয়া জাকের মনে হইতে লাগিল, ঐ যে  
পথে আসিবার সময় অসংখ্য কুশ্রী কুৎসিত কারিকরগুলাকে  
সে চক্ষে দেখিয়াছে, সে-ও তাহাদের একজন হইবে!  
এই নির্বাসনে থাকিয়া কি হুঃসহ জীবনই না তাহাকে  
বহন করিতে হইবে! ইহার চেয়ে মোরোন্‌ভার স্থূল—  
সে-ও লক্ষণে ভালো ছিল। সেখানে কত সঙ্গী ছিল।  
মাদু,—আহা, সে যদি এখানে থাকিত!

জাক আবার ভাবিল, উন্নতি! তাহারই বা আশা  
কোথায়! এ কোথায় সে আসিয়া পড়িল! গৃহ  
হইতে কত দূরে! কত নদ-নদী পার হইয়া কোন  
অপবিচিত রাজ্যে সে আজ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! হায়  
মা—কোথায় মা!

মার কথা জাকের মনে পড়িল! সে কারিকর হইলে  
মার হুঃখ ঘুচিবে, মার আনন্দ হইবে। মার সুখের জন্ত  
এ কষ্টটুকু সে আব সহ্য করিতে পারিবে না? নিশ্চয়  
পারিবে! এ হুঃখ, এ কষ্ট, সে গ্রাহ্যও করিবে না!  
নিজের সুখের কথা,—সে আর ভাবিবে না।

তবু বিছানায় পড়িয়া বার বার মার কথা তাহার  
মনে পড়িতে লাগিল। মার মুখ, মার হাসি, মার স্নেহ!  
এ জীবনে আর কি সে-সব সে ফিরিয়া পাইবে? ভাবিতে  
ভাবিতে তাহার বুকের মধ্যে নিখাস যেন চাপিয়া  
আসিতেছিল।

বাহিরে লাবাস্‌য়ান্দ্ তখন উচ্চ কণ্ঠে গান ধরিয়াছে,

“চলো ধীর বায়ে নীরে তরী বেয়ে,

চলো গো ফ্রান্সে, গান গেয়ে গেয়ে!”

## দ্বিতীয় পর্নিচ্ছেদ

কদিক-গৃহে

কারখানায় আসিয়া জাক অস্থির হইয়া পড়িল।  
চারিধারে অবিরাম ভীষণ কোলাহল,—পাশের লোকের  
মুখের কথাটি শুনা যায় না। তিন শ' বর্ষ মুক্তরে  
যা পড়িতেছে, তাহার সহিত তিন-শ' লোকের

উৎসাহাঙ্গীপক উচ্চ চীৎকার,—ইহাব উপর কোনোখানে অবিশ্রাম গতিতে ষড়-ষড় করিয়া অসংখ্য চাকা ঘূর্ণিতেছে—কোনোখানে বাষ্প-নির্গমনের ভীষণ শব্দ—মুহূর্ত্ত সে-সবের বিরাম নাই !

কারখানার মধ্যে যত রুদ্ধকেশ মলিন-বেশ কুংসিত কারিকরের দল—কেহ চাকায় তৈল দিতেছে, কেহ চাকা ঘূরাইতেছে—কেহ-বা হাতুড়ি পিটিতেছে। ইহাদের সন্নিহিত একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়া ঘূর্ণিয়া ফিবিয়া জাক তাহাব জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করিল ! তাহার মাথা বহিয়া ললাট বহিয়া ঘাম বরিয়া পড়িতেছে—হাতে-মুখে কালি, বেশ-ভূষা নিতান্ত বিকী ! এই দুঃখের ব্যবধান ভেদ করিয়া শাল'তের দৃষ্টি যদি আজ জাকেব উপর এখন নিক্ষিপ্ত হয় তো সে আপনাব ছেলেকে চিনিতে পারিবে না ! এ সেই জাক ?

এক শীর্ণ মলিন বালক, হাতেব উপব ছিন্ন জামার আশ্রিত গুটানো, ঘর্ষাক্ত কলেবব, চোখ-দুইটা আফিমব ফুলের মতই লাল হইয়াছে, গলাব ভাঁজে ভাঁজে স্ফুট কয়লার গুঁড়া ! মনে হয়, কে যেন সেখানে কালির দাগ টানিয়া দিয়াছে ! জাকেব এ মূর্ত্তি দেখিলে শাল'ৎ নিশ্চয় শিহরিয়া উঠিবে !

জাকেব শিক্ষার ভাব পড়িয়াছিল, লেবেঙ্কো নামে এক সর্দার কারিকরের উপর। লেবেঙ্কোব প্রকৃতি ছিল উগ্র, কর্কশ ! জাকেব এই শাস্ত নিরীহ ভাব, কারখানার কঠোর ক্রান্তের পক্ষে তাহার এই অপটুতা, লেবেঙ্কোর প্রাণে সহ্যমূর্ত্তি ও করুণার পবিতর্কে শুধু ঘৃণা ও বিরক্তি জাগাইয়া তুলিত ! তাহার কঠিন পুরুষ দৃষ্টির সম্মুখে বালক যেন কেমন ভড়কাইয়া যাইত। তবু সে সাধ্যমত আপনাব কর্তব্য করিবার চেষ্টা পাইত। হাতে ফোকা পড়িয়া ছিঁড়িয়া গেলেও আদেশ-মত কার্য্য কবিতো সে কুণ্ঠিত হইত না। আপনাকে সে এই কারখানাব প্রকাণ্ড প্রাণহীন যন্ত্রগুলাব অংশ ভাবিয়া সেইকপে কাজ করিয়া যাইত। এই যন্ত্রগুলাব যেমন কোন স্রুথ, ছুঃখ, অনুরাগ বা বিরাগ নাই, মানুষেব আদেশ-মত ঘোবা-ফেরা করিয়া মানুষের কাজটুকু সুসম্পন্ন কবিয়া তোলাই তাহাদের ব্রত, কখনও কোন অনুযোগ-অভিযোগের ধাব ধারিতে হয় না, ধারিলেও কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবে না, তাহার অবস্থা ঠিক তেমনই ! তাহারও আজ আর নিজের কোন স্রুথ নাই, ছুঃখ নাই, সর্দারের আদেশ-মত ক্লত্র-বৃহৎ সকল প্রকার কার্য্যই তাহাকে করিয়া দিতে হয়। তাহার আবার অনুযোগ কি ? অভিযোগই বা কি থাকিতে পারে ?

দুর্জীবন জীবন ! বিশেষ গত দুই বৎসরের মুক্ত স্বাধীন জীবন-প্রবাহের পর কি একঠোর বন্ধন ! নিতান্ত অশঙ্ক ! হোক অশঙ্ক, তবু মুক্তি নাই—পরিত্রাণ নাই !

প্রত্যয়ে পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে রুদ্ধিক তাহাব ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিত, “সময় হলো, জাক, উঠে পড়ো।” নিদ্রিত নিশ্চক্ গৃহের দেওয়ালে-দেওয়ালে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত ! এক টুকবা রুটি দ্রুত নিঃশেষ করিয়া, ক্লারিসের দেওয়া জলে কোনমতে গলা ভিজাইয়া রুদ্ধিকের সন্নিহিত সে পথে বাহির হইয়া পড়িত। ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়া সূর্য্যের প্রথম রশ্মিছটা সবেমাত্র তখন জগতে নামিবার জন্ত পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে—ভোরের পাখী বাসা হইতে বাহিব হইবার আয়োজন করিতেছে ! চারিধাবে আকাশ, নদী ও নিখিলের বৃকে জীবনের স্পন্দন ধীরে ধীরে আবার অল্প সূচিত হইবাব উপক্রম করিতেছে ! অনূরে কারিকরদলেব শান্তি ভাঙ্গাইয়া প্রাণ কাঁপাইয়া কারখানাব ঘণ্টা ভীম বোল তুলিয়া তাহাদিগকে কর্তব্যে সচকিত করিয়া সাড়া দিতেছে !

কারখানায় নির্দিষ্ট হাজিরা-সময়ের দশ মিনিট পবে ফটক বন্ধ হয়—ঘণ্টা থামিয়া যায় ! এই সময়ের মধ্যে পৌছিতে না পারিলে প্রথম অপরাধে জরিমানা, দ্বিতীয়-বারে মাজিনা কাটয়া লওয়া হয়—তৃতীয়বার যে এ অপরাধ করে, তাহাকে কারখানা হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় ! জাকেব মনে হইত, অর্জাস্ত'ব নিয়ম যত কঠিন, যত নির্দয় হোক, ইহাব তুলনায় তাহা কিছুই নহে !

একটা বিষয়ে জাকেব বড় ভয় ছিল, পাছে কোনদিন ঠিক সময়টুকুতে কারখানায় সে হাজিরা দিতে না পারে ! সেজন্ত সময়েব কিছু পূর্বে—অপব কারিকরদেব সেখানে পৌছিবাব প্রাক্কালেই সে কারখানাব প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইত ! একদিন শুধু কয়টা কারিকরের হুটামিতে তাহাব দেবা হইয়াছিল। সেদিন ভোরে বাতাস বেশ একটু জোরে বহিতেছিল। পথে জাকেব টুপিটা হঠাৎ সে বায়ুর বেগে উড়িয়া যায়। পিছনে আর-কয়েকটা কারিকর আসিতেছিল—তাহারা মহোলাসে চীৎকার করিয়া টুপিটাকে লোফালুফি করিতে করিতে অনেক দূরে ফেলিয়া দিয়াছিল—বেচার জাক বহু কষ্টে টুপি উদ্ধার করিয়া ফিবিয়া আসিয়া দেখে, কারখানার দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সেদিন আর তাহার কষ্টের সীমা ছিল না। বেচার ফটকের সামনেই বসিয়া পড়িল। চোখের জল বাধা মানিল না। সে ভাবিল, সে কি করিয়াছে ? এই কারিকরগুলার কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, মনেও সে কখনও কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না, তবুও ইহারা তাহাকে লইয়া এত জ্বালাতন করে, কেন ? চারিধার হইতে অজস্র ঘৃণা, ঘেব, হিংসা, কেন তাহার শিরে বর্ষিত হয় ? সে যে নিতান্তই অভাগা, পরিত্যক্ত, ভাগ্যলব্ধীর একান্ত উপেক্ষিত, কাহারও অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না—কাহারও স্রুথের মাত্রা

হইতে তিলান্বিত ও বকুনী সে কামনা করে না—তবু কেন, হা ভগবান, ইহাদের বন্ধ দৃষ্টি হইতে তাহার পরিভ্রাণ নাই? এক শ্রেণীর তর্কলতা যখন আপনার জীবন-ধারণের জন্ত একান্তভাবেই উত্তাপের মুখাপেক্ষা করে, জাকও তেমনই আপনার জন্ত একটু স্নেহ, একটি মিষ্ট কথা বা আদর-বচনের মুখ চাহিয়া থাকে, সেটুকু না হইলে তাহার চলেই না! কিন্তু এখানে না আছে সে ভালবাসা, না আছে স্নেহ! একটি বিন্দুও নাই!

আসল কথা, কারখানার লোকগুলা জাককে বড় পছন্দ করিত না। এই নিরীহ, নম্র, শান্ত বালক তাহার নারী-সুলভ মুখখানি লইয়া এখানে কি করিবে? এখানে চাই, পরুষ বলিষ্ঠ দেহ, অশান্ত উগ্র প্রকৃতি! কিন্তু জাকের তাহা-কিছুই ছিল না, কাজেই তাহার পক্ষে কারখানার সহিত খাপ খাওয়া একান্তই অসম্ভব। প্রত্যহ তাহাকে লইয়া কাবির-দলে রীতিমত শ্লেষ-বিজ্ঞপ চলিত। অত্যাচার-নিষ্ঠ্যাতনও কি অল্প ছিল! একদিন একটা তপ্ত লোহণ্ড লইয়া এক সঙ্গী কাবির আসিয়া তাহাকে কহিল, “এইটে একবার ধর ত, জাক, আমার সর্দাব ডাকছে, চট করে শুনে আসি।” বেচারী জাক সরলভাবে সে অমুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া এমনভাবে হাত পুড়াইয়া ফেলিল যে, তাহার ফলে এক সপ্তাহ তাহাকে হাসপাতালে বাস করিতে হইল! তাহার উপর এমন দিন ছিল মা, যে দিন একটা ঘুসি বা চড় তাহার সঙ্গে কেহ বর্ষণ না করিত!

কিন্তু সপ্তাহে এক দিন ছিল, যে-দিন জাকের অদৃষ্ট ইহারই মধ্যে স্রষ্টাশ্রম ভাব ধারণ করিত, যেদিনটি তাহার ভাগ্যে আনন্দ ও বিশ্রাম বহিয়া আনিত,—সেদিন রবিবার। এই রবিবারে প্রাতর্ভোজন শেষ করিয়া ডাক্তার রিভালের দেওয়া বইয়ের গোছা হইতে দুই-একখানি বই বাছিয়া লইয়া সে নদীর ধারে চলিয়া যাইত। নিরালায় বসিয়া বই খুলিয়া তখন সে এক নূতন জগতের পরিচয় লাভ করিত! ভগ্ন জনহীন ঘাটের প্রান্তে সে বই খুলিয়া বসিত,—অদূরে ঘাটের পদতলে নদীর ঢেউ আসিয়া উছলিয়া পড়িতেছে—যেন কোন্ দেবীর স্নিগ্ধ সান্থনা-বাণী সে! জাকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইত, শীতল আশ্বাসে ডরিয়া উঠিত। আপন মনে সে বহির পাতা উলটাইয়া যাইত, কতক তাহার বৃক্ষিত, কতক বা বৃক্ষিতও না—তবুও অজানা জগতের অক্ষুট রহস্যলোকে সে কিসের সন্ধান পাইত, তাহা সেই-ই জানিত! ইহার মধ্যেই সে মাতার অকৃত্রিম স্নেহ, বন্ধুর অমল সৌহার্দ্যের পরিচয় লাভ করিত। বহি দেখিতে দেখিতে তাহার চিত্ত আবেশে ডরিয়া আসিত, মানস-চক্ষের সম্মুখে সমস্ত বহির্জগৎ মিলাইয়া যাইত—মার মুখের বাণী, ডাক্তার রিভালের আদরের স্বর, সেসিলের

সুমধুর কল-হাস্য, সমস্ত মিলিয়া জাকের প্রাণে এক আনন্দ-নির্ব্বয়ের সৃষ্টি করিত! নির্কাসিত উপেক্ষিত বালক সেই দুর্লভ সুখাম্পর্শে সন্তোহের অতীত ছয়টা দিনের সকল ক্লান্তি সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইত। আপনাকে অপূর্ণ স্তখে স্নখী ভাবিয়া সে পবন নিশ্চিন্ত হইত।

অবশেষে বর্ষা নামিল। হিম-শীতল বায়ুর বেগ বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিপাত! তখন নদী-তীরস্থ শান্তি-কুঞ্জ এই মহাতীর্থে আসিবার তাহার আর কোন উপায়ই রহিল না! রবিবারের অবসর-মুহূর্ত্তগুলা নিতান্তই নিরানন্দে কাটাইতে হইবে ভাবিয়া অগত্যা সে রুদিক-গৃহেই বহি খুলিয়া বসিল।

বালকের শাস্ত প্রকৃতিতে কদিক তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ক্লারিস জেনেদও তাহাকে ভাল-বাসিত। সকল বকম ফরমাস খাটিয়া সে জেনেদের হৃদয়টিকে ভাল করিয়াই আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। এই নিরীহ বালকটির উপর রুদিক-পরিবারের প্রকৃতই একটা মায়া পড়িয়াছিল। সকলেই তাহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। জাকের কণ্ঠ-সঙ্গীগুলা তাহার অক্ষমতা লইয়া যখন কদিকের নিকট অমুরোধ করিতে আসিত, রুদিক তখন মৃদু হাসিয়া জাকের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিত, “বড় ভালমানুষ, আহা, বেচারী!”

কদিক ভাবিত, লেখাপড়া লইয়া থাকিতেই বালক ভালবাসে—এ সব কঠিন কাজ উহাৎ শক্তিতে কুলাইবে কেন? কারখানায় না আসিয়া সে যদি স্কুলের মাষ্টার কি পাঞ্জী হইবার চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এ লেখাপড়া ছিল ভাল! কিন্তু কারখানার কাজ করিয়াই যখন তাহাকে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, তখন এ লেখাপড়ার অমুরোধ কিছু কমাইলেই ভাল হয়! জাককে একবার এ বিষয়ে সে আভাসও দিয়াছিল, জাক তাহাতে কাতর দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া কল্পণ স্বরে বলিয়াছিল, “আমি ত আব কোন সময় বই পড়ি না, শুধু ছুটির দিন একটু পড়ি—মার জন্ত মন কেমন করে তাই—” জাকের স্বর ভাঙ্গিয়া গিয়া তাহার বক্তব্যটিকে শেষ করিতে দিল না। কদিকের প্রাণে সে কাতর দৃষ্টি, সে কণ স্বর, তীক্ষ্ণ ছবির ফলার জ্বায়ই বিধিয়া ছিল! ইহার পর জাককে সে আর দ্বিতীয়বার গ্রন্থ-পাঠ হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা পায় নাই।

সেদিন বর্ষার মেঘে-ঢাকা রবিবার যখন দ্বান বেশে আসিয়া দেখা দিল, চারিধারে একটা নিরানন্দ অবসাদ ফুটিয়া উঠিল, তখন ক্লারিস আসিয়া জাককে কহিল, “ওখানা কি বই পড়ছ, জাক?”

জাক বলিল, “এ একটা গল্প!”

“চোঁচিয়ে পড় না—আমি শুনি।”



জাক তখন তাহার এই নবাগত শ্রোত্রীটির চিত্ত-বিনোদনের জন্ত গল্প পড়িয়া যাইতে লাগিল। কত বিচিত্র, সে হর্ষ-বেদনার কাহিনী—কত আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া, কত প্রমোদ-স্বপ্ন, যৌবন-গীতির অপূর্ণ উদ্গাদনা বহিয়া চলিয়াছে। গল্প শেষ হইলে জাক দেখিল, কাহিনী-বর্ণিত নর-নারীর দুঃখে শ্রোত্রী তাহার কাঁদিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

ইহার পর হইতে যখনই জাক বহি পড়িত, তখনই ক্লারিস্ আদিয়া সাগ্রহে তাহাব বহি শুনিতে বসিত। এই যুগ্মা অমরজ্ঞা শ্রোত্রীটির উপর জাকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। পূর্বে সে বহি পড়িত, শুধু নিজের স্রবের জন্ত—এখন হইতে ক্লারিস্কে গল্প পড়িয়া শুনাইয়া তাহার যে সুখ হইতে লাগিল, তাহা অপূর্ণ।

ক্লারিসের প্রকৃতিতে কেমন একটা স্বাভাব্য ছিল। রুদিক-গৃহ যেন ঠিক তাহার বাসের যোগ্য স্থান বলিয়া জাকের মনে হইত না। সে যেন কোন্ স্বপ্নলোক হইতে এই রুদ্র তপ্ত কর্ণলোকে তারার মত ঝরিয়া পড়িয়াছে। এখানকার এই পরুষতার মধ্যে তাহাব কান্ত কোমল স্ত্রী দেখিলে মনে হইত—সে যেন এখান-কার কেহ নহে। তাহার পরিচ্ছন্ন সূত্রী বেশ, কমলীয় হাব-ভাব-কেমন এক বিশেষত্বে মগ্নিত। ইহা লইয়া পল্লীর অলস সমাজে একটা কাণাঘূষা চলিত। নিম্নকের দল রুদিককে একটু করুণাব চক্ষেও দেখিত—ভাবিত, আঁহা, বেচারী রুদিক! যে স্ত্রীকে একান্ত বিশ্বাস করিয়া আপনার ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, সেই স্ত্রী—

নিম্নকের কথাগুলার কি কিছু সত্যও নিহিত ছিল? কে জানে! নিম্নকের নিম্নায় ক্লারিসের সহিত শেষে চালির নামটাও জড়াইয়া পড়িয়াছিল। এ নিম্না রুদিকের কাণে আসিয়াও পৌছিয়াছিল; কিন্তু সে সরল বিশ্বাসী বচিতে এতটুকুও নাড়া দিতে পারে নাই।

ক্লারিসের স্বপক্ষে এইটুকু শুধু বলা যাইতে পারে, যে, সে নাস্তিকে বিবাহের পূর্বে হইতেই চিনিত। পরস্পরের মধ্যে বেশ একটু স্নেহ-মধুর বন্ধনেরও সৃষ্টি হইয়াছিল। ক্লারিসের পিতৃ-গৃহে নাস্ত্, নিত্য অতিথি ছিল—তাহার বহু অলস অবসর এককালে ক্লারিসের সহিত স্রব-দুঃখের গল্পে কাটিয়া গিয়াছে; এবং রুদিক যদি আজ তাহাকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না করিত, তাহা হইলে নাস্তের সহিত তাহার বিবাহও যে না হইতে পারিত, এমন নহে। কিন্তু রুদিকের সহিত ক্লারিসের বিবাহের পূর্বে নাস্ত্ ঠিক বুঝিতে পারে নাই, ক্লারিস্ এমন সুলক্ষী! নাস্ত্ পূর্বে দেখে নাই, ক্লারিসেব সজ্জিত সুলক্ষ দেহে এমন লাভ্যের রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে! সে দেহে এত মাধুরী! কি অন্ধ, নির্বোধ, হতভাগা সে।

বিবাহের পর ক্লারিস্ ও নাস্তের বন্ধুত্ব হ্রাস না মানিয়া

বাড়িয়াই চলিয়াছিল। রুদিক নিশ্চিত হইলে কত অমান জ্যোৎস্না-রাত্রি দুইজনে বসিয়া গল্প করিয়া কাটাইয়া দিয়াছে। পাড়ার লোকে রুদিকের কাণে এ কথা তুলিলে রুদিক বলিত, “দোষ কি! নাস্ত্ আমার ভাই!” পাড়ার লোক হাসিয়া মুখ ফিরাইত, পরস্পরের গা টিপিয়া বলিত, “নেহাং আহাম্মক রে!”

নিম্নকের নিম্নায় একজন শুধু বিচলিত হইয়াছিল, সে জেনেদ্! জেনেদ্ অলক্ষ্যে উভয়ের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিত। তাহার সমস্ত প্রাণ একটা দানবী হিংসায় জলিয়া উঠিত। নিম্নফল আক্রোশে প্রাণের জ্বালা প্রাণের মধ্যেই সে চাপিয়া রাখিত, ভাবিত, “কি এ গ্রহ—এ কি পাপ!”

তাই যখন ম্যানেজারের চেষ্টায় নাস্ত্ এ গৃহ ছাড়িয়া দেশান্তরে চাকরি করিতে গেল, তখন সর্বাপেক্ষা আনন্দ হইল, জেনেদের! বিজয়ীর গর্ব অমুভব করিয়া জেনেদ্ তখন মনে মনে ভাবিল, চমৎকার হইয়াছে। তাহার পিতার গৃহ এ নিলজ্জ যুগিত প্রেমলীলার হাত হইতে এবার নিস্তার পাইল! কি আনন্দ!

সেদিন রবিবার। জাক কাব্য পাঠ করিতেছিল। এবার ক্লারিস্ একেলাই শুধু তাহার শ্রোত্রী ছিল না—রুদিক ও জেনেদ্ও বসিয়া কাব্য শুনিতেছিল। দুই-এক ছত্র শুনিতে না শুনিতেই রুদিক ঢুলিয়া পড়িল। ক্লারিস্ ও জেনেদ্ একান্ত আগ্রহে নিম্পন্দ মনোযোগে কাব্য শুনিতেছিল। সেদিন পড়া হইতেছিল, ফ্রান্সেসকারিমব করুণ গাথা! জাক যখন পড়িতেছিল,—

“দুঃখ এসে বন্ধ চোখে ধবে,

প্রতি শিরা গ্রস্থি উঠে দহি!

পূর্ব স্রবের মধুরে যে স্মৃতি,

সে দুঃখ হায়, কেমন করে বহি!”

ক্লারিসের প্রাণ তখন শিহরিয়া উঠিল,—ঠিক কথা! দুঃখ কোনমতে সহ হয়, কিন্তু দুঃখের দিনে অতীত স্রবের স্মৃতিগুলি যখন প্রাণের মধ্যে তোলপাড় করিয়া উঠে, তখনকার সে দুঃখ—কি দিয়া তাহা রোধ করি? সে যে একান্ত অসহ!

জাক পড়িয়া চলিয়াছিল। কবির ছত্র হইতে যেন আগুন ঠিকরিয়া বাহির হইতেছিল। এই যে বাসনার তীব্র উজ্জ্বল, নিরাশার ভগ্ন তান জাকের কণ্ঠ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল, ক্লারিসের মনে হইতেছিল, সেওলা শুধু কথা নহে—সেওলা যেন জীবন্ত, অসল অনল-কণা,—গৃহের চারিধাযে যেন তাহারা দারুণ দাহ ছড়াইয়া ঘুরিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে!

ক্লারিসের চোখ ফাটিয়া ঝব ঝব করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। প্রেবের এই করুণ কাহিনী তাহার চিত্তকে একেবারে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। কাহিনী শেষ হইলে



জেনেদ্ কহিল, “কি বদ্ ঐ মেয়ে মানুষটা—এঁয়া! এমন করে নিজের পাপের কথা প্রকাশ করতে এতটুকু লজ্জা হল না—সতেজে বলে গেল।”

ক্লারিস্ কহিল, “আহা, বদ্ হোক, যাই হোক, বড় দুঃখী সে।”

জেনেদ্ কহিল, “দুঃখী! ও কথা বলো না মা। এই ফ্রান্সেস্কার জন্ত তোমার দুঃখ হয়? আপনার স্বামীর ভাইকে ভালবাসে সে—এত বড় পাপ—”

“কি করবে বল সে! কোন উপায় ছিল না বেচাবীর! বিয়ের আগে থেকেই হুজনের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছিল যে,—জীব করে মা-বাপ শুধু আর-একজনের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলে বই ত না! অত ভালবাসা—”

“চুপ কর, জোর করে হোক, যে করেই হোক, যখন বিয়ে হয়ে গেল, তখন সেই মুহূর্ত্ত থেকেই মেয়েমানুষ তার স্বামীর দাসী—স্বামীকেই সে ভালবাসবে! বইয়ে আছে, তার স্বামী বুড়ো,—বুড়ো বলেই ত স্ত্রীর উচিত, স্বামীকে আরও বেশী ভক্তি করা, ভালবাসা, যাতে অপরে তার জন্ত তার স্বামীকে কোন বকম কুৎসিত কথা বলবাব সুযোগ না পায়! তাব জন্ত তার স্বামীর মাথা হেঁট না হয়! বুড়ো স্বামী হুজনকে মেয়ে ফেলে বেশ কাজ করেছে। তাদের পাপের ঠিক শাস্তি হয়েছে। ষিচারিণী স্ত্রী, বিশ্বাস-ঘাতক ভাই,—হিঃ! স্ত্রী তার নিজের কর্তব্য প্রেম, ভালবাসা, এমন করে ছ’ পা দিয়ে খেঁৎলাবে! কি ভীষণ প্রবৃত্তি! শুধু রূপ আব বোবনেব মোহেই এত বড় নিলজ্জ পাপ কববে! এ যে উমানক কথা!”

ক্লারিস কোন উত্তর দিল না। জানালা দিয়া বাহিরের পানে সে চাহিয়া বহিল। সহসা কদিকের নিম্না ভাঙ্গিয়া গেলে সে বলিয়া উঠিল, “বাঃ, খাসা গল্প—চমৎকার!”

জাক এক বিচিত্র মোহে বিভোর ছিল! তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার এক প্রাচীন কবির গাথায় এ কি সুব আজ জাগিয়া উঠিয়াছে! কোথায় পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তে অবস্থিত, দবিত্তের এক ক্ষুদ্র কুটীর—তাহারই নিরালা কোণে সহসা এ কি সত্য আজ সাড়া পাইয়া উঠিয়াছে! ধৃগ কবির নিপুণতা,—রচনার সার্থকতার কি অপূর্ব্বে প্রমাণ এ! কোন্ বহু অতীত যুগের অন্তরাল হইতে ভবিষ্যতের স্ববনিকা তুলিয়া কবি সত্যের এক অশল্প ছবি অঁকিয়া গিয়াছেন। নির্মল রাত্রি সুদূর আকাশে বসিয়া ঠান্ডা যেমন পৃথিবীর নর-নারী, পথ-ঘাট, গৃহকোণটি অবধি আপনার অবাধ অকল্প ক্রিয়ণে উজ্জ্বল করিয়া তোলে, কবিও তেমনই কোন্ এক গোপন অন্তরালে বসিয়া তুলির একটি রেখাপাতে নরনারীর মনের ভিতরকার লুকানো হর্ষ-বেদনা ও ভাবরাশি কি বিচিত্র উজ্জলবর্ণে স্ফুটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই

উদ্গার-স্পর্শে এখানে এতগুলি প্রাণী আজ বিহ্বল অভিন্দিত হইয়া পড়িয়াছে!

সহসা জাক উঠিয়া দাঁড়াইল। “নিশ্চয় সে—” বলিয়া সে দ্রুত রাস্তার দিকে ছুটিল। তখন বাহিরে পথে কে ইঁকিতেছিল, “টুপি—চাই ভাল টুপি!”

জাক পথে আসিতে বহির্দ্বারের সম্মুখে দেখিল, ক্লারিস গৃহমধ্যে ফিরিতেছে! ইহার মধ্যে ক্লারিস বাহিরেই বা আসিল কখন? আশ্চর্য! কেনই বা আসিল সে?

টুপিওয়ালা তখন খানিকটা পথ চলিয়া গিয়াছে; জাক দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ডাকিল, “বেলিসেয়ার, ও বেলিসেয়ার।”

টুপিওয়ালা জাকের পূর্ব্বে পরিচিত—তাহার নাম বেলিসেয়ার। বেলিসেয়ার ফিদিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “কে, মাষ্টার জাক বে!”

জাক কহিল, “হাঁ, আমি! তুমি এখানে এলে কোথা থেকে?”

“আমি এই টুপি বেচে দিন-গুজরাণ করি কি না! এখানে এই কিছুকাল হল এসেছি! ভগ্নীপতির অন্ত্র হল—সে দেশে বোজগারও তেমন সুবিধা-মত হচ্ছিল না—তাই এখানে চলে এলাম! তা এখানে দুপয়সা হচ্ছে, মন্দ নয়! মোদা, তুমি এখানে যে—!”

জাক তখন আপনার কথা খুলিয়া বলিল। বেলিসেয়ার কহিল, “তুমি কারখানায় কাজ শিখছ! এঁয়া! এমন সস্তার বাড়ী তোমাদের, অত পয়সা, আর তুমি শেষে কি না কারিকর হবে?”

জাক কি উত্তর দিবে তাবিয়া পাইল না! লজ্জায় সে যেন মাটিতে মিশিয়া যাইবার মত হইল। বেলিসেয়ার তাহা লক্ষ্য করিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিবার মানসে বলিল, “সে রাত্রে হামটা বেশ ছিল—আর তিনি, সেই মেয়েমানুষটি, তিনি তোমার মা, না? তোমার মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের বেশ মিল আছে, আমি ঠিকই অঁচ করেছি,—কেমন, না?”

মার নাম শুনিয়া জাকে চিত্ত বিষন্ন হইল। জাকের ইচ্ছা হইল, বেলিসেয়ারকে লইয়া কিছুক্ষণ সে গল্প করে। বেলিসেয়ার কহিল, “আজ আমি আসি, কাজ আছে। আর একদিন এসে তখন গল্প করব। এখন তুমি এখানেই আছ ত। প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হবে, ভাবনা কি!”

উভয়ে কবকল্পন-করিয়া বিদায় লইল। বেলিসেয়ার চলিয়া গেলে জাক গৃহ-মধ্যে ফিরিল।

দ্বারের নিকট উৎসেগাকুল হৃদয়ে ক্লারিস দাঁড়াইয়া-ছিল। জাক ফিরিতেই অধীর আগ্রহে সে প্রণয় করিল, “ও কি বলছিল তোমার জাক?”

ক্লারিসের স্ববে অনেকখানি আশঙ্কা জড়ানো ছিল।

সম্মত আনন্দের উচ্ছ্বাসে জাক তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

জাক কহিল, “আমার সঙ্গে ওব এতিয়ালে জানা-শোনা ছিল, অনেকদিন পরে দেখা হল—তাই কে কেমন আছে, জিজ্ঞাসা করছি।”

জাকের দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিয়া ক্লারিস জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু বলেনি? আর কোন কথা, নয়? আমার সম্বন্ধে কোন কথা নয়?”

জাক সরলভাবে উত্তর দিল, “না, এ-ছাড়া আর কোন কথা হয়নি।”

পরম আশ্বাসে ক্লারিস নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ফেলুক নিশ্বাস, তবু সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া তাহার বৃকে যেন একখানা পাখর চাপিয়া রহিল। এক অজানা ভয়, নুতন ভাবনা! শত চেষ্টাতেও বৃকের সে পাখরখানাকে ক্লারিস ঠেলিয়া ফেলিতে পারিল না।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### কৌতুক

কারখানার লোকগুলা যখন এই রুদিক-পরিবার সম্বন্ধে বক্র ইঙ্গিত করিয়া কৌতুক-হাস্তে ফাটিয়া পড়িবার মত হইত, জাক তখন নীরবে শুধু একধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। এ সকল কুৎসিত রঙ্গ-রহস্য তাহার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর ঠেকিত। নিষ্ফল বোঝে শরীর তাহার জলিয়া উঠিত। নাস্ত ও ক্লারিসের অবৈধ প্রণয়-ব্যাপার কাহারও অগোচর ছিল না। ম্যানেজার এই কুৎসার মূল উৎপাতন করিবার মানসেই নাস্তকে লগ্নায়ে চাকুরি দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাই ক্রমে ক্লারিসের ক্রম পতনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

নাস্ত যতদিন অঁয়াজের ছিল, ততদিন ক্লারিসের মোহ একটা গম্বীর মধ্যে বদ্ধ ছিল। নাস্তের প্রতি আকর্ষণও তেমন প্রবল হইয়া উঠে নাই। প্রত্যহ দুই-চারিটা গল্প ও কৌতুক করিয়া ক্লারিস বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিত—সেটা নিত্যকার প্রার্থিত বস্তু ছিল। বায়ু ও আলোর মতই তাহা সহজ, অনায়াস-লভ্য—জীবন-যাত্রার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়াও মনে হইত। সে সম্বন্ধে যে কোথাও কোন অসুযোগ উঠিতে পারে—এ কল্পনাও তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই। কিন্তু আজ এই দূরত্বের ব্যবধান তাহার প্রাণে এক দারুণ অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিল। সন্ধ্যাব নিঃসঙ্গ অবসরগুলা এখন যেন আর কিছুতেই কাটিতে চাহে না। নাস্তের সহিত বসিয়া কত গল্প, কণিকের সে কত যান-অভিমান, কলহ-প্রণয়ের কত সে খেলা—বিচিত্র স্মৃতির তরঙ্গ

তুলিয়া এখন তাহার প্রাণটাকে বার বার নাড়া দিতে থাকে! উতলা বাতাসে মনটাও ছ-ছ করিয়া উঠে। আজ কোথায় নাস্ত! ক্লারিসের কর্মহীন সমস্ত অলস অবসরটুকু যে সে জুড়িয়া বসিয়া ছিল! তাই আজ জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া ক্লারিস যখন চন্দ্র-মধ্যে একটা দারুণ শূন্যতা অনুভব করে, অদূরে বৃক্ষশাখার অন্তরালে নাইটিংগেল মধুর সঙ্গীতে চারিধার ভরাইয়া তুলে, তখন নাস্তের অভাব অনুভব করিয়া ক্লারিস আকুল কাতর হইয়া উঠে! কোথায় নাস্ত—কোথায় সে? এ অভাব আজ কে মিটাইবে? এ শূন্যতা কে পূর্ণ করিবে?

অবশেষে এ বিচ্ছেদ ক্লারিসের অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে নাস্তকে চিঠি লিখিতে বসিল। নাস্তও বেশ গুছাইয়া-বানাইয়া সে চিঠির জবাব দিল। তাৎপর্য হইতে উভয়ের মধ্যে পত্র-ব্যবহার নিয়মিত ভাবেই চলিতে লাগিল—এবং ক্রমশঃ গোপনে উভয়ের সাক্ষাৎ হইবার পক্ষেও বিঘ্ন রহিল না।

বার্স'য়াজের উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হইত। বার্স'য়াজে অঁয়াজের অপর পারে অবস্থিত—মধ্যে একটি নদীমাত্র ব্যবধান। বার্স'য়াজে হইতে লগ্নার দুই ঘণ্টার পথ। ইচ্ছা করিলেই নাস্ত এক বেলায় ছুটি লইতে পারিত—সে বিষয়ে নিয়মের কোন বাধাবোধ ছিল না।

ক্লারিসও জিনিস-পত্র কিনিবার ছল করিয়া মধ্যাহ্নে নদী পার হইয়া বার্স'য়াজের আসিত।

অঁয়াজের ক্রমে এ সংবাদ আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না—এ বিষয় লইয়া স্পষ্টই সকলে জল্পনা জুড়িয়া দিল। মধ্যাহ্নে যখন রুদিক, জাক প্রভৃতি সকলে কারখানায় থাকিত, ক্লারিস সেই অবসরে পথ দিয়া স্টীমার-ঘাটের অভিমুখে চলিত। রাস্তার লোক-গুলার চোখে চোখে অমনি একটা ইসারার ঘটা পড়িয়া যাইত। তাহার দিকে চাহিয়া সকলেই একটু বক্র হাসি হাসিয়া লইত। গৃহ-বাসিনী রমণীরাও পরস্পরের গা ঠেলিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিত, “মাগীর কি মোটে লজ্জা নেই, হায়া নেই গা!”

সত্যি ক্লারিসের এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না! পথে রাজ্যের লোকের স্বগা ও অবজ্ঞা কুড়াইয়া অবাধে সে চলিয়া যাইত! সে যেন এক তুল্য শক্তির বলে চলিত, কোনমতে নিজেকে দমন করিতে পারিত না। কোন দিকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করিয়া শক্তিত ব্রহ্ম চরণে ধীরে ধীরে সে স্টীমারে উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত মুহূর্ত নিশ্বাস ফেলিয়া, স্নগন্ধি রুমালে ললাটের ঘর্ষ মুছিয়া পবপারের দিকে চাহিয়া থাকিত! রোজ মাঝরা রূপালি ডেউ তুলিয়া নদী তখন ছুটিয়া চলিয়াছে—বহু ঊর্দ্ধে আকাশের গায় দুই-চারিটা পারী ছোট কৃষ্ণ বিক্ষুব্ধ মতই ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে—তীরের কারখানার চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ছাইয়া ফেলিবার জো করিয়াছে! এ দৃশ্য-বৈচিত্র্যের প্রতি কিন্তু ক্লারিসের কোন লক্ষ্য থাকিত না—সে শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে পরপারে তীর-রেখার পানে চাহিয়া রহিত। মধ্যে মধ্যে এক অজানা শব্দার বৃক তাহার কাঁপিয়া উঠিত, তথাপি বাস্পাস্ত্রের যাইতে হইবে। মুক্তি নাই, মুক্তি নাই—দুর্বল চিত্তকে দমন করিবার এতটুকু শক্তিও তাহার নাই।

জাক এ সমস্তই জানিত। এই গোপন অভিসার-যাত্রা তাহার নিকট এতটুকু গোপন ছিল না। কাব্যানায় প্রবেশ করিয়া তাহার চোখ ফুটিয়াছিল। তাহার সম্মুখেই কারখানার লোকগুলা রুদিকের দুর্ভাগ্যব কথা লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিত। এ সকল ব্যাপার লইয়া রঙ্গ-রহস্ত তাহাদের নিকট পরম উপভোগের বিষয় ছিল।

জাক এ রঙ্গ-রহস্তে বোগ দিত না। নির্ভর-শীল সরল-হৃদয় পঙ্কিপ্রেমিক এই বৃদ্ধের চক্ষে প্রাণ তাহার সমবেদনায় ভরিয়া উঠিত। আর এই বৃদ্ধিহীন নারী—তাহার দুর্বলতায় সে একান্তই বেদনা বোধ করিত। তাহার মনে হইত, একবার সে ক্লারিসকে সতর্ক করিয়া দেয়,—সাবধান, সাবধান নারী, যে পথে তুমি চলিয়াছ, সে পথ ত্যাগ কর—নহিলে কোথায় কান্না নরকের অন্ধ গহ্বর-তলে নিজেই নিক্ষেপ করিবে, তাহার ঠিকানা নাই! আর নাস্ত? নাস্তের একবার দেখা পাইলে, তাহাকে সে বীতিমত শিক্ষা দেয়—তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বলে, দূর হ, পামর, এই দুর্বল! অভাগিনী নারীর সম্মুখে আর তোর এ কুহক-জাল বিস্তার করিস্ নে—তার সর্বনাশ করিস্ নে!

কিন্তু সব চেয়ে তাহার ক্ষোভ হইত, যখন সে দেখিত, তাহার বন্ধু বেলিসেয়ার প্রেমের এই পৈশাচিক লীলা-অভিনয়ে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে। এই ফিরিওয়াল! নাস্ত ও ক্লারিসের পত্র-বাহকের কাজ করিত। বেলিসেয়ারকে গোপনে বহুবার রুদিক-গৃহে সে আসিতে দেখিয়াছে; আসিয়া মাদাম রুদিকের হাতে পত্রও সে দিয়া গিয়াছে—তাহার পরিবর্তে যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা পাইয়াই সে চূড়ান্ত আপ্যায়িত! তাহার বন্ধু যে এই কদর্য পাপাচরণে সহায়তা করিতেছে,—ইহা ভাবিয়াই জাক কাতর হইয়া পড়িল। আতিথ্যের প্রশঙ্গ তুলিয়া বেলিসেয়ার জাকের মাতার প্রশংসায় প্রায়ই পক্ষমুখ হইয়া উঠিত, জাক কিন্তু সে প্রশংসায় তৃপ্তি পাইত না। সে ভাবিত, একবার বেলিসেয়ারকে স্পষ্ট সে শুনাইয়া দিবে যে, এরূপ গর্হিত কাজ করিয়া তাহার প্রীতি-আকর্ষণ করিবার এ চেষ্টা নিতান্তই মিথ্যা হইতেছে। কিন্তু মুখ দিয়া সে কথাটা কিছুতেই বাহির হইত না।

একদিন রুদিকের গৃহের সম্মুখে ক্লারিসকে দেখিতে না পাইয়া বেলিসেয়ার জাককে চুপি চুপি ডাকিয়া নিভৃত তাহার হাতে একখানি নীল খামে মোড়া চিঠি দিয়া বলিল, “মাদাম রুদিককে এখানা দিয়ে!—সাবধান, কেউ যেন ভানতে না পারে, আর কারও হাতে দিয়ে না যেন!”

জাক মোড়কের পানে চাহিয়া দেখিল,—উপরে মাদাম রুদিকের নাম—আর সে নাস্তেরই হস্তাক্ষর। দেখিয়া সে রোষে জ্বলিয়া উঠিল, বেলিসেয়ারের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া শাপিত বচনে কহিল, “খবরদার! আমাকে এখন নীচ মনে কবো না তুমি যে, তোমার এই হীন কাজে আমি একটুও সাহায্য করব? আমি যদি তুমি হতুম, তাহলে এ বকম হীন কাজ করে পরসী বোজগারেব কথা একদণ্ডের অশ্রুও আমার মনে উদয় হত না—এতে যদি আমার অনাহাবে মরতে হত, তবুও না।” বেলিসেয়ার বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

জাক কহিল, “তুমি জান বেলিসেয়ার, এ চিঠি কোথা থেকে আসছে—কে দিয়েছে—আর এ চিঠির মানেই বা কি! আমিও যে জানি না, তা ভেবো না—আমি কেন, এ কথা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে। এই বুড়ো মানুষের চোখে এভাবে ধুলো দিতে তোমার এতটুকু লজ্জা হয় না?”

বেলিসেয়ার জাকের দিকে চাহিল; অবচলিতভাবে কহিল, “এটা অশ্রু বলছ তুমি, মাষ্টার জাক! বেলিসেয়ারের নাড়ীনক্ষত্র যারা জানে, তারা হলপ করে বলতে পারে যে, সে জীবনে কখনও কারও সঙ্গে ঠাকামো করে নি—সে কথা তার মনেও কখনও ঠাঁই পায় না! আমার হাতে কতকগুলো কাগজ দেয়—আমি সেগুলো পৌছে দি—বাস্, খালাস! তাতে কি বৃত্তান্ত থাকে, সে আমি কি জানি? আমার তা জানবার দরকারই বা কি? তুমি আমার অবস্থা জান—তোমার কতবার বলেছি ত! বাড়ীতে অনেকগুলি পুথি—আমার বোজগারই তাদের একমাত্র ভরসা। তাদের মুখে অন্ন না দিয়ে ত আমি নিজে খেতে পারিনে। তার উপর আবার ভগ্নীপতিটির অসুখ—তার আর একটি পরসী বোজগার করবার সামর্থ্য নেই! টাকার বাজার কেমন, দেখছ ত! নিজের পায়েব মাপে এক জোড়া জুতো এ পর্য্যন্ত তৈরি করাতে পারলুম না। যদি ঠাকার ইচ্ছা থাকত জাক, তাহলে এতদিনে আমি একটা মস্ত লোক হয়ে যেতুম!”

বেলিসেয়ার বেশ দৃঢ়ভাবেই কথাটা বলিল। স্বরে এতটুকু কম্পন ছিল না—দৃষ্টিও চাকল্য-হীন। জাক তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, এরূপ চিঠি বহিয়া বেড়ানো অত্যন্ত গর্হিত কর্ম। রুদিকের স্ত্রী ও

নাশের মধ্যে এই যে গোপন পত্র-ব্যবহার চলিতেছে, তাহা একান্ত অস্বাভাবিক—তাহা পাপ! দ্বীপ উপর বৃদ্ধ কৃদিকের অগাধ বিশ্বাস—সে বেচারী জীকে এতটুকুও সন্দেহ করে না, এক্ষেত্রে যদি, ইত্যাদি। কিন্তু সকলই বার্থ হইল! বেলিসেয়ারের মাথায় এ সকল কথা কিছুতেই প্রবেশ করিবে না! টাকার বাজার অত্যন্ত দুর্শ্বল্য, গৃহে তাহার পোষ্য অনেকগুলি, ভগ্ন-পতির ব্যারাম, তাহার উপার্জনের উপরই সকলের অন্ন নির্ভর করিতেছে, এ যুক্তির বিরুদ্ধে জাকের কোন কথাই খাটিতে পারে না! সে জানে, সে কাহারও সহিত প্রতারণা করিতেছে না, কোন পাপেরই সহায়তা করিতেছে না,—সংক্ষেপে থাকিয়া গতর খাটাইয়া সে এ পরসী যোজ্ঞগার করিতেছে!

জাক তখন অনেক কথা ভাবিতে লাগিল। সে আজ কৃদিক-পরিবারেরই একজন! তাহার চোখে জল আসিল। বেলিসেয়ারকে আর কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে আসিয়া সে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল। কৃদিক যে এই ভীষণ ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানিত না, তাহাতে বিশ্বাসের কিছু ছিল না। সারা জীবনটা তাহার কারখানায় কাটিয়াছে। কারখানার সন্ধিবর্গ সকলেই এই বৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবিত ছিল। এমন স্নেহ-সরল আত্মভোলা লোক,—তাহার সম্মুখি বাঁচাইয়া তাহার অগোচরেই সকলে কানা-ঘুসা করিত। কিন্তু জেনেদ্—? জেনেদ্ ত সমস্তই জানে! সে কেন ইহার প্রতিকারে মনোযোগ অর্পণ করে না! সে কি এ-সকল কিছু দেখিতে পায় না? কোন ইঙ্গিত, কোন আভাস? সহসা কি সে অন্ধ হইয়া গিয়াছে? কোথায় সে? কৃদিক-গৃহ কি সে তবে ত্যাগ করিয়াছে?

না। জেনেদ্ কৃদিক-গৃহ ত্যাগ করে নাই। আজ এক মাস হইল, কাজে সে অবসর লইয়াছে। দৃষ্টি তাহার বেগই তীব্র ছিল, বরং সে দৃষ্টির উজ্জ্বলতা এখন আরও বাড়িয়াছে—একটা বিপুল স্বপ্নসম্ভাবনার সে দৃষ্টি সম্প্রতি উজ্জ্বলিত! তাহার বিবাহের দিন-স্থির হইয়া গিয়াছে! কষ্টম-হাউসের এক তরুণ কর্মচারীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। পাত্রের নাম মার্জ্যা। সবুজ রঙের পোষাক, দৈনিকের মত সুগঠিত দেহ ও দীর্ঘ গুঞ্জে মার্জ্যাব রূপ যেন উজ্জলিয়া উঠিয়াছে! কষ্টম-হাউসে এমন সুখী যুবা আর দুইটি দেখা যায় না—অবশ্য জেনেদের চক্ষে! তাহাকে স্বামিরূপে বরণ করিবার মৌভাগ্য জেনেদের মিলিয়াছে, ধন্য সে! সার্থক তাহার জীবন। বিবাহে পণের টাকা কিছু বেশী দিতে হইবে! কৃদিকের সঞ্চিত অর্থের সর্বস্বই প্রায় এ পণ গ্রাস করিয়া ফেলিবে! নগদ চারি হাজার দুই শত মুদ্রা! পণ কমাইতে গেলে মার্জ্যা সরিয়া পড়ে। দুর্শ্বল্য হইলেও মার্জ্যাকে চাই, নহিলে

জেনেদ্ স্বামী হইবে না! নগদ মূল্য পাইলেই মার্জ্যার চক্ষু জেনেদের কুংসিত দেহ অপকল্প লাভণ্যে ভরিয়া উঠিবে, জাম বর্ণ পরমোজ্জ্বল স্বর্ণের আভার উজ্জ্বলিত হইবে। এই পণের জন্তই শুধু অপরিণীতা সহস্র কিশোরীর পাণি পরিত্যাগ করিয়া জেনেদকে কৃতার্থ করিতে মার্জ্যা রাজী হইয়াছে। সারা আঁজ্ঞে ও নিকটবর্তী চতুর্পার্শ্বই কোন প্রদেশের কোন কস্তারই এ মূল্য-প্রদানে সামর্থ্য ছিল না! কৃদিক প্রথমে এ পণের কথা শুনিয়া বলিয়াছিল, “এত টাকা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। বুড়ো বয়সে খাব কি? আমি চক্ষু মুদ্রলে ক্লারিসের উপায়ই বা কি হবে? ক্লারিসের ছেলের মেয়ে হলে তাদেরই বা কি সংস্থান থাকবে?” শুনিয়া জেনেদের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। তাহার সে ভাব দেখিয়া ক্লারিস সাগ্রহে বলিল, “আমার জন্ত তোমার ভাবতে হবে না! এখনও তোমার যে শক্তি আছে, যোজ্ঞগার কর, বুঝে সংসার কয়ে আবার টাকা হতে কত দিন? মার্জ্যার সঙ্গেই জেনেদের বিয়ে দাও। দিতেই চাও। জেনেদ্ ওকে অত ভালবাসে, না হলে ও বেচারীর মনের সুখ চিরদিনের জন্ত উবে যাবে।”

ভালবাসা! কি কুহক মন্ত্র জান, তুমি! এই ভালবাসার পায়েই ক্লারিস আপনাকে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছে।

মাদাম মার্জ্যা হইবার আশা জেনেদের পক্ষে যখন আর হ্রাশা রহিল না, তখন সে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। নিভৃত বসিয়া সে সহস্র স্বপ্নের কল্পনা করিত,—মার্জ্যার হাত ধরিয়া নদীর তীরে বেড়াইতেছে, কত সুন্দরী কিশোরী লোলুপ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছে। ঈর্ষার সব জলিয়া যাইতেছে! নিভৃত কুঞ্জে বসিয়া মার্জ্যার বুক শির রাখিয়া সে কত দেশের গল্প শুনিতেছে! সন্ধ্যার পাখী বাসায় ফিরিতেছে! ক্রমে সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিল, চাঁদ উঠিল, চারি ধার শুদ্ধ হইয়া আসিল, সেই নির্জন-তার মধ্যে তাহারা দুই জনে বসিয়া,—জগতে যেন আর কেহ নাই, শুধু দুইটি নম-নারী—প্রাণের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছে! ভাবের রাশি আজ ছাড়া পাইয়া সাড়া দিয়া উঠিয়াছে,—কোথাও এতটুকু বাধা নাই, সঙ্কোচ নাই। এ কি সুগভীর পরিতৃপ্তি, বিশ্ব-প্রাণী সুখ! জেনেদ্ ভাবিত, সে কল্পনা! এই তুচ্ছ অর্থগুলার জন্তই শুধু সে মার্জ্যার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে—নহিলে সে কোথায় থাকিত। মার্জ্যা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না! তুচ্ছ অর্থটাই কি সর্বস্ব হইল? এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিবিড় প্রেম,—ইহার কি কোন মূল্য নাই! ইহার দিকে মার্জ্যা চাহিয়া দেখিবে না? নাই দেখিল—একবার শুধু মার্জ্যা তাহাকে গ্রহণ করুক, তার পর সে মার্জ্যাকে বুঝাইবে, তাহার প্রেমের মহিমা

কতখানি! মাজ্যাত তখন বুঝিবে, মণি-মাণিক্যের জ্যোতি ম্লান করিয়া কিরিত্ত তাহার বৃক সঞ্চিত রহিয়াছে! সে দিন জেনেদের কত স্মৃথ।

ক্লারিসের প্রতি জেনেদের শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সে যদি রুদিককে বুঝাইয়া এই পণে সম্মত না করাইত, তাহা হইলে—তাহা হইলে কি সর্বনাশ হইত! আর নাস্ত্ অ্যাঞ্জে ছাড়িয়াছে, বিবাহের সম্ভাবনা লইয়া সেও বীতিমত ব্যস্ত। এই সকল কারণেই ক্লারিসের প্রতি জেনেদের পূর্বেকার সে সত্যক দৃষ্টি এখন কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ক্লারিস আবার স্বহস্তে জেনেদের বিবাহের পোষাক তৈয়াব করিতেছিল। কাজেই ইদানীং ক্লারিসের প্রতি কৃতজ্ঞতায় জেনেদ ঈর্ষং আকৃষ্ট হইয়াও পড়িয়াছিল।

আর পনেরো দিন পরেই বিবাহ। আসন্ন সমারোহের একটা আভাস ইতিমধ্যেই রুদিক-গৃহটিকে ঘা দিয়াছে। আত্মীয়-বন্ধু ও অমুগতবর্গের নিকট হইতে প্রত্যহই কিছু উপহার আসিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আত্মীয়বন্ধুব আনাগোনার পরামর্শেরও ধুম লাগিয়াছে। কুরুপা হইলেও জেনেদকে অনেকে ভালবাসিত, কাজেই উপহারেরও ঘটা ছিল।

জেনেদকে তাহার এই শুভপরিণয় উপলক্ষে কি উপহার দিবে, তাহা ভাবিয়া জাক একটু ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ইদা তাহাকে এজন্ত আপনাব সঞ্চয় হইতে গোপনে বাট টাকা পাঠাইয়াছিল! কবি আর্জান্ত অবশ্য এ সংবাদ জানিত না।

ইদা জাককে লিখিয়াছিল, “তোমাকে আজ বাট টাকা পাঠাচ্ছি, জাক! এই টাকায় জেনেদের বিয়েতে তার জন্ত কিছু উপহার কিনে তুমি দিয়ো। কোন একটা ভাল পোষাক যদি কিনতে পার ত ভাল হয়! তুমিও বিয়েতে একটু ভাল সাজ-গোজ করো! তার জন্ত তোমার নূতন পোষাকও চাই, বোধ হয়? অনেক দিন ত তুমি পোষাক-টোষাক কিছু কেনোনি। যা ছিল, সেগুলোও এতদিনে পুনো হয়ে গেছে! নিজের জন্ত একটা ভাল পোষাকও তুমি কিনো! এ টাকা সম্বন্ধে আমায় চিঠিতে কোন কথা লিখো না। রুদিকদের কারও কাছেও এ টাকা পাঠানোর কথা বলা না। টাকাটা আমি তোমার লুকিয়ে পাঠাচ্ছি। ইনি এ টাকার কথা জানেন না, জানলে রাগ করবেন। এখানে এঁর শরীর এখন ভাল যাচ্ছে না, টাকারও বড় টানাটানি, কাজেই ঠর মেজাজটা কিছু রুক্ষ হয়েছে। সে জন্ত ভয় হয়, পাছে এ টাকার কথা শুনে তিনি বিরক্ত হন, বলেন, ‘এত নবাবি কেন?’ তাই তোমায় এত করে সাবধান করে দিচ্ছি। যদি কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলা, এ টাকা তুমি নিজের যোজগার থেকে জমিয়েছিলে।

আর দেখ, এ দেশের লোকগুলো কি হিংস্রকে। এঁর বিরুদ্ধে সবাই মহা ষড়যন্ত্র করে বসে আছে! কিছুতেই এঁকে মাথা তুলে সাহিত্য-সমাজে দাঁড়াতে দেবে না, অথচ এঁর লেখবার শক্তি কত!”

আজ দুইদিন জাক এই টাকা কয়টি পাইয়াছে। পাইয়া সে মনে মনে যথেষ্টই আনন্দ-গর্ক উপভোগ করিতেছিল। এ বিবাহে যে তাহাকে নিতান্তই উপহার-হীন রিক্ত হস্তে দাঁড়াইতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইতেছিল! আবেগে মার পত্রখানা সে বৃকে চাপিয়া ধরিল।

উপহারের জন্ত এখন সে কি কিনিবে? কাহার সহিতই বা সে বিষয়ে পরামর্শ করে? সন্ধ্যার পর বাগানে বসিয়া সেদিন সে শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিয়া সে স্থির করিল, জেনেদকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে, তাহার কি পছন্দ। সে জেনেদের খোঁজে চলিল।

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। যবে আলো ছিল না। যেমন সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, অমনই কাহার সহিত ধাক্কা লাগিয়া গেল। চমকিয়া মুহূর্তের জন্ত জাক দাঁড়াইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, “কে?” সে ব্যক্তি কোন উত্তর দিল না, নীরবে চলিয়া গেল। লোকটি ফটকেব নিকট আসিলে বাহিরের ক্ষীণ আলোকে জাক তাহাকে চিনিল,—সে বেলিসেয়ার।

জাক ডাকিল, “বেলিসেয়ার—”

কেহ উত্তর দিল না। জাক ফিরিয়া দেখিল, অদূরে ক্লারিস দাঁড়াইয়া আছে। পাশের ঘব হইতে একটা ক্ষীণ আলো আসিয়া পড়িয়াছে, সেই আলোয় জাক ন্পষ্ট দেখিল, ক্লারিস দাঁড়াইয়া একখানা চিঠি পড়িতেছে। তাহার মুখে গভীর উত্তেজনার চিহ্ন। জাকের চট্ করিয়া মনে পড়িল, নাস্ত্বেব কথা। কারখানায় সেই দিনই সে শুনিয়াছিল, জুরায় নাস্ত্, বিস্তর পয়সা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, আর তাহার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার শক্তি বা উপায় নাই। বোধ হয়, এ পত্রে নাস্ত্, ক্লারিসকে সেই সংবাদই জানাইয়াছে।

ভিতরের কক্ষে মাজ্যাত ও জেনেদ বসিয়া সাক্ষ্য অবসরটুকু নানা কথায়-গল্পে বীতিমত উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। কল্পার জন্য সার্টিকিফেট আনিবার জন্ত রুদিক সেদিন সহরে গিয়াছিল—পরদিন ফিরিবার কথা। কাজেই এমন সুন্দর সন্ধ্যা-হীন অবসরটুকু নবীন প্রণয়-যুগলের পক্ষে নিতান্তই অনায়াস-লভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। মাজ্যাত বসিয়া গল্প করিতেছিল। গম, কয়লা, নীল, কডলিভাব প্রভৃতির আমদানি-রপ্তানিতে মাতুলের হাব কত, ইহাই ছিল গল্পের বিষয়। ভাল না বুঝিলেও, কথাগুলি প্রণয়-কাকলীর মতই জেনেদের মিষ্ট লাগিত-ছিল।

ইহার কারণ আর কিছুই নহে। সেই দুজের অমহান শক্তি, প্রেম—সেই স্ফূর্ত কুহকীর অমোহন কুহকের ফাঁদে যে ধরা দিয়াছে, সেই জানে, প্রেমের কাছে সকল শক্তি, সকল তেজ কেমন অভিভূত হইয়া পড়ে! স্বাভাবিক বিসর্জন দিয়া কেমন করিয়া লোকে প্রেমের পায়ে সর্ব্ব সমর্পণ করিয়া বসে, বিশ্বের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তর হইতে অমর অক্ষরে সে তথ্য ক্ষোদিত রহিয়াছে! এই তুচ্ছ গল্পও তাই আজ জেনেদের কাছে এতখানি তৃপ্তি প্রদ!।

এমন সময় জাক আসিয়া দেখা দিল। ক্লারিসও আসিল, আসিয়া কহিল, “বেশী দেরি করে কাজ কি মাজ্যা? নটা বাজে, আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাড়ী যাও। যে মেথ করে আসছে—যদি ঝড়-বুড়ি নামে—”

জাক স্থির দৃষ্টিতে ক্লারিসের পানে চাহিল, মনে মনে ভাবিল, ইহার কোন উদ্দেশ্য আছে, নিশ্চয়! হায়, দুর্ভাগিনী নারী!

রাত্রি-ভোজনের পূর্ব মাজ্যা বিদায় লইলে ক্লারিস কহিল, “তোমরা শুয়ে পড়—বেশী রাত্তির জাগা ঠিক নয়, জেনেদ,—তাতে অসুখ হতে পারে! জাক, তুমিও সারাদিন খেটেছ খুটেছ, বাত্রে এখন শুয়ে একটু ঘুমোও—না হলে শরীর থাকবে কেন?”

তাহাদিগকে বিদায় দিতে পারিলে ক্লারিস যেন বাঁচে—এমনই ভাবখানা তাহার কথাবার্তার ভঙ্গীতে ঠিকরিয়া বাতির হইতেছিল; জাক সেটুকু লক্ষ্য করিল। সে ভাবিল, এ অধীরতার অর্থ কি!

জেনেদ বসিয়া মাজ্যার কথাই ভাবিতেছিল। সে এখন কতদূর গিয়াছে! বোধ হয়, নদীর তীরে নৌকার সন্ধান করিতেছে—না, বোধ হয়, এতক্ষণ নৌকায় উঠিয়াছে। নাচিয়া নাচিয়া নৌকা তীব্র ছাড়িয়া চলিয়াছে। মাজ্যা কি ভাবিতেছে? বোধ হয়, তাহারই কথা—জেনেদের এত প্রেম, এত ভালবাসা—জেনেদ কি মাজ্যার সমস্ত জন্মস্থানি এতদিনেও জুড়িয়া বসে নাই? কেন বসিবে না? জেনেদের হৃদয়ে ত এখন আর কোন চিন্তা নাই—সে যে আজ মাজ্যা-ময়। শয়নে স্বপনে মাজ্যা আজ জেনেদের সমস্ত মনটুকু অধিকার করিয়া বসিয়াছে! তবে জেনেদই বা কেন মাজ্যার হৃদয়ে এমন স্থান করিয়া লইতে পারিবে না! সে রূপহীন? ছাই রূপ! এত প্রেম—তাহার কাছে রূপ ত অতি তুচ্ছ! জেনেদ আবার ভাবিল, কত বাত্ৰি হইয়া গিয়াছে—বাহিরে কন্কনে শীত! না জানি, এ শীতে তাহার কত কষ্ট হইতেছে! আহ!।

ঘাড়তে দশটা বাজিল। ক্লারিস ডাকিল, “জেনেদ, এস শুইগে আমরা!”

অভ্যাস মত জাক সদর-দ্বার বন্ধ করিবার জন্ত

উঠিলে ক্লারিস ব্যস্তভাবে তাহাকে নিবারণ করিল, কহিল, “থাক, থাক, তোমার আর বেতে হবে না, দোর আমি বন্ধ করে এসেছি। সব ঠিক আছে। কোন ভয় নেই—চল, উপরে চল—সব শুয়ে পড়ি।”

জেনেদ তখনও মাজ্যার চিন্তায় বিভোর ছিল, জাককে কহিল, “মাজ্যাকে কেমন দেখলে, জাক? বেশ সুপুরুষ না? চায়ের মাগুল কত পড়ে, শুনেলে ত,—মনে আছে, তোমার?”

মাদাম ক্রদিক পুরুষ কণ্ঠে কহিল, “জেনেদ, শোবে, না, বসে বসে এমন পাগলামি করবে?” ঈর্ষ লজ্জিত হইয়া জেনেদ তখন উঠিল। ক্লারিস কহিল, “ওঃ, আমার এমন ঘুম পেয়েছে যে, মাথা তুলে বসতে পারছি না!”

জেনেদ নিজের ঘরে আসিল। জাক ভাবিল, পরামর্শ করিবার পক্ষে ইহাই এখন ঠিক ক্ষণ! দিনের বেলায় সময় অল্প, যেটুকুও বা পাওয়া যায়, তাহাতে পরামর্শ করিবার সুবিধা হয় না—বন্ধুবান্ধবের ভিড় লাগিয়া থাকে। তাই সে জেনেদের ঘরে আসিল। টেবিলের উপর অজস্র উপহার-সামগ্রী ছড়ানো বহিয়াছে। ফটো, সোণার কাঁটা-চামচ, চা-দানি, এসেজ, চিত্র-বিচিত্র করা রঙ্গিন চিঠির কাগজ, ইয়ারিং, আংটি, ঘড়ি, ব্রেসলেট, কড়ির খেলানা, কত বকমের অসংখ্য সামগ্রী! জাক আসিয়া টেবিলের পাশে দাঁড়াইল।

জেনেদ কহিল, “কি? সব দেখছ, জাক? এ’ত বাইরে যা আছে—বা ‘তুলে রেখেছি, তা’ও তোমার দেখাচ্ছি! দেখ একবার!”

জেনেদ তখন আলমারি খুলিয়া পোষাক-পরিচ্ছদ বাতির করিয়া দেখাইতে লাগিল। এইটা ফুলশয্যার পোষাক, অনেক দাম—তাহার দূরসম্পর্কীয় এক মাতুলানি উপহার পাঠাইয়াছে। এই ‘ট্রিসো’ তাহার সখী নেলির স্বতন্ত্র-রচিত স্রীতি-উপহার! এই স্বর্ণ-হার তাহার পিতার আশীর্বাদ!

পরে একটি ক্যাস বাস্র বাহিব করিয়া জাকের সম্মুখে জেনেদ তাহা খুলিয়া ধরিল। ভিক্টর স্বর্ণ ও রৌপ্য-মুদ্রায় চারি হাজার দুই শত টাকা—ইহাই তাহার যৌতুক! এ যৌতুক মাজ্যাকে উপহার দিতে না পারিলে তাহার পায়ে আজ জেনেদের স্থান হইত না! জেনেদ কহিল, “এই আমার বিয়ের যৌতুক! আমার সর্ব্বস্ব—আমার সাধনা! এরই সাহায্যে মাজ্যাকে পেয়েছি! নগদ চার হাজার দু’শ টাকা। বাবা আমার একেবারে বড়লোক করে দিয়েছে—এ যৌতুকের কথা মনে হলে আমার এমন আনন্দ হয়—”

এমন সময় বাহির হইতে দ্বারে কে আঘাত করিল; কহিল, “জেনেদ, জাককে কি তুমি আজ ঘুমোতে দেবে

না?—এঁ! এঁ কি হচ্ছে তোমার! দিনের বেলা এ-সব কথাবার্তা হতে পারে না? ও বেচারী সারাদিন খেটে খুটে এল—!”

এ স্বর ক্লারিসের—স্বর ঈষৎ কম্পিত। ক্লারিস কক্ষে প্রবেশ করিল।

লজ্জিত হইয়া জেনেদু তখন জাককে বিদায় দিল। জাকও গিয়া শয্যায় আশ্রয় লইল। জেনেদকে উপহারের কথা আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সমস্ত গৃহ গভীর নীরবতার আচ্ছন্ন হইল। বাহিরে তখন যুহু তুষার-বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই রাত্রের নিশ্চরতার অস্ত্র গৃহগুলির মত রুদ্ধ-গৃহও নিজার সমাচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু বাহিরের ছদ্মাবরণে মানুষ যেমন আত্মগোপন করিয়া অপরকে প্রতারণা করে, গৃহও যে সেরূপ প্রতারণা করিতে না পারে, এমন নহে। রুদ্ধ-গৃহ অজ্ঞাত গৃহগুলির মত রুদ্ধ দ্বার ও বাতায়ন লইয়া বাহির হইতে নিজাচ্ছন্ন বোধ হইলেও আজ সে আপনার বক্ষে এক দারুণ মর্ম্মভেদী নাটকের অভিনয় প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিল।

নিশ্চতলে আলোক-হীন এক ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া দুইজনে যুহু স্বরে কথা কহিতেছিল। সমুখস্থ চিমনির অন্তস্ত কয়লাস্তুপ হইতে অস্পষ্ট আলোক বিচ্ছুরিত হইতেছিল, সেই আলোর বেষ বৃথা বায়,—তাহাদের একজন পুরুষ, অপরটি নারী।

নারীর কপোল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। নারী ঝাঁড়াইয়া ছিল,—পুরুষ তাহার সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহার হাত আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

পুরুষ কহিল, “তোমার আমি মিনতি কছি,—যদি আমার ভালবাস, এক বিন্দুও ভালবাস—”

মিনতি! তবে সে কি চায়? ক্লারিসের দিবারই বা আর আছে কি? সে তাহার সর্বস্বই ত নাস্তের হাতে তুলিয়া দিয়াছে—আপনার কিছুই রাখে নাই! সে ত তাহারই—কায়মনোবাক্যে নাস্তেরই! একটি জিনিস শুধু সে ত্যাগ করিতে পারে নাই, স্বামীর গৃহ! সে আশ্রয়টুকু তাহাকে ছাড়িতে বলিয়া না, নাস্ত! বেচারী, বেচারী রুদ্ধ—সে কি অপরাধ করিয়াছে যে—

সেদিন সন্ধ্যার সময় নাস্ত পত্র পাঠাইয়াছিল, “দোর বেন খোলা থাকে, আজ রাত্রে আমি যাব—খুব দরকার আছে।” সে জানিত, রুদ্ধ সে রাত্রে গৃহে থাকিবে না।

ক্লারিস শুধু দ্বার খুলিয়া রাখিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না; গৃহের পরিজনবর্গকে ঘুম পাড়াইয়া অবধি রাখিয়াছে! সকলে ঘুমাইলে ক্লারিস আপনাকে স্থলর বেষজুয়ার

সজ্জিত করিল! যে পরিচ্ছদটি নাস্তের চোখে ভাল দেখায়, সেইটি সে পরিল। যেমন করিয়া কেশবিন্ধ্যাস করিলে নাস্তের ভাল লাগিবে, তেমনই ভাবে আপনার কেশবিন্ধ্যাস করিল। কোথাও কোন ঝুটি রাখিল না! আজ সে নাস্তের জন্ত নিতান্তই নিরাজ্জা নারিকার মত অপরূপ সাজে আপনাকে সজ্জিত করিল।

নাস্ত আবার কহিল, “এত করে মিনতি কছি, ক্লারিস, তবুও তোমার দয়া হচ্ছে না? শোন তবে—শুধু দুদিনের জন্ত—আমার সাড়ে তিন হাজার টাকার দরকার হয়েছে। দু হাজার দেনা আছে, সেইটে শুধে ফেলব—তার পর বাকীটা দিয়ে শেষবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখব—এই শেষ! দু-চার বাজি খেললেই সব একেবারে ফিরে পাব।”

ক্লারিসের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল,—নাস্তের হাত ছাড়াইয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া সে কহিল, “না, না, নাস্ত—এ আমি পারব না।”

“পারবে না? না পারলে হবে কেন, ক্লারিস? আমার যে সর্বনাশ হয়ে যায়!”

“না—এ হবে না, পারব না আমি। তার চেয়ে অল্প কোন উপায় বরং ঠাওরাও।”

“দার কোন উপায় ত দেখাচ্ছিনে, আমি!”

“শোন। শাতোব্রিয়ার আমার এক বন্ধু আছে—খুব বড়লোকের মেয়ে সে। স্কুলে দুজনে আমরা একসঙ্গে পড়তুম। আমি তাকে আমার দরকার বলে লিখে দিচ্ছি—সাড়ে তিন হাজার টাকা এখনই আমার চাই—দার অবস্থা—”

নাস্ত কহিল, “অসম্ভব। এ হতেই পারে না—কালই আমার এ টাকা চাই।”

ক্লারিস কহিল, “তা হলে বরং ম্যানেজারের সঙ্গে তুমি দেখা কর। তিনি তোমায় ভালবাসেন; সাহায্যও অনায়াসেই করতে পারেন—”

“ম্যানেজার! এ কথা জানতে পারলে ম্যানেজার সেই দণ্ডেই আমার চাকরিটুকু শেষ করে দেবে। এই লাভ হবে! আর আমি বা বলছি, তা কত সহজ, বল দেখি। কেউ জানতে পারবে না। দুদিন পরে নিশ্চয় এ টাকা আমি দিয়ে যাব। কোনমতে তার অস্ত্রথা হবে না।”

“তুমি বল কি নাস্ত—দুদিন পরে যে তুমি—”

“হাঁ—দেবই এ টাকা। এর আর নড়চড় হবে না—আমি শপথ করে বলতে পারি।”

ক্লারিস কোন কথা বলিল না। দুই হাতে সে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, দারুণ ঝড়! সে ঝড়ে তাহার চেতনা অবধি লোপ পাইবার উপক্রম করিল।



নাস্ত্ কহিল, “আমি গর্ভভ, তাই তোমার কাছে এত ভূমিকা ফাঁদতে বসেছি। তোমার না বলে নিজেই এ টাকা যদি বার করে নিয়ে যেতুম, তাহলে আর এত গোল হত না—”

ক্লারিস্ নাস্তের হাত চাপিয়া ধরিল, অশ্রুধ্বংস্বরে কহিল, “না, না, তুমি জান না, নাস্ত্, জেনেদ নিজে এখন তার বাস্তব খুলে বোজাই ঐ যোতুকের টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে—একে-তাকে দেখিয়ে বেড়াচ্ছে, কতবার করে গুণছে। আজ রাতেই সে জাককে নিজের বাস্তব খুলে দেখাচ্ছিল—”

“তাই না কি! জাককে দেখাচ্ছিল?”

“হ্যাঁ। আজ্ঞা দে সে একেবারে দিশেচারা হয়ে পড়েছে। এতে সে মরে যাবে, একদণ্ড বাঁচবে না। তা ছাড়া চাবি সে কোথায় রাখে, আমি জানিও না।”

কথার বাহুল্যে ক্লারিসের মুক্তিগুলা ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল, ইহা সে-ও বুঝিতেছিল! ক্রমে সে স্থির হইল! ক্লারিস্ নাস্ত্কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছিল, ইহাই ছিল আবও দুঃখের কারণ। এই বাক-যুদ্ধের অন্তরালে উভয়ের অধরে অধরে নয়নে-নয়নে যে ইঙ্গিত চলিতেছিল, তাহা রোপ কবিবার শক্তি ক্লারিসের মোটেই ছিল না!

—“তবে আব আমার কোন আশা নেই? উপায়ও নেই?” বলিয়া নাস্ত্ অবোধ শিশু মতই কঁদিয়া উঠিল।

ক্লারিসের চিন্তে করুণাবান ডাকিল! উপায় কি? উপায়? সে কি করিবে? কেমন করিয়া নাস্ত্কে আজ সে সাহায্য করিবে! সে যে দুর্বল নারী—তাহার কি শক্তি আছে? ভাবিয়া নিরুপায় চিন্তে সে মাটির উপর বসিয়া পড়িল।

চোখের জল মুছিয়া নাস্ত্ কহিল, “তা হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে না? বেশ! তবে চললুম, ক্লারিস্। আমি জানি, আমাব এখন এক পথ আছে—এক উপায় আছে, দেখি—”

“কি উপায়?”

“মৃত্যু! এ কলঙ্কের বোঝা নিয়ে লোকের সামনে মুখ দেখাব, ভেবেছ? আমি তা পারব না।”

নাস্ত্ ভাবিল, এবার সে ক্লারিসকে বিচলিত করিয়াছে—এবার—না, ক্লারিস কিন্তু তেমনই অটল রহিল। কিন্তু সে শুধু ঐ মৃত্যুর জগৎ।

পর-মুহূর্তেই ক্লারিস আগিয়া নাস্তের সম্মুখে দাঁড়াইল, কহিল, “তুমি আত্মহত্যা করবে? বেশ, আমারও এখন সেই এক পথ! এ জীবনে আমার আর কোন সাধ নেই। এ কলঙ্ক, এ মিথ্যা, এ পাপ, এই গোপনতা আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে! আর না—আমিও এ সব শেষ কর্তব্য দিতে চাই।” ক্লারিস্ ফোঁপাইতে লাগিল।

নাস্ত্ ক্লারিসের হাত ধরিল, কহিল, “সে কি? তুমি আত্মহত্যা করবে! কি ভয়ঙ্কর! এ দুর্বুদ্ধি আমার তোমার মাথার চাপল কেন? না, ক্লারিস—তুমি আত্মহত্যা করতে পাবে না। কেন করবে?”

নারীর দুর্বল চিত্ত সহসা আজ বিজ্ঞোহী হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া নাস্তের পক্ষে আত্মসম্বরণ করা দুঃস্থ হইয়া পড়িল। একটা পাপ-বাসনা তাহার মস্তিষ্কটাকে চূর্ণ করিবার উপক্রম করিতেছিল।

“অসম্ভব!” বলিয়া নাস্ত্ সিঁড়ির দিকে চলিল!

ক্লারিস্ তদগোঁই ছুটিয়া তাহার সম্মুখীন হইয়া বলিল, “কোথায় যাচ্ছ, তুমি?”

“যেখানেই যাই, বাধা দিয়া না, ক্লারিস্, টাকা আমার চাইই!”

ক্লারিস্ সঙ্কোচে নাস্তের হাত ধরিয়া কহিল, “না, না, আমার কথা রাখ—”

কি এক উদ্ভাদনা তখন নাস্ত্কে অধীর করিয়া উঠিয়াছিল। সে ক্লারিসের হাত ছাড়াইয়া লইল।

ক্লারিস্ কহিল, “সাবধান নাস্ত্—তুমি যদি আর এক পা উপবে ওঠ, তাহলে এখনই আমি চাঁৎকার করে সকলকে জাগাব।”

“জাগাবে? জাগাও তুমি। বেশ—সকলে স্পষ্টই আজ জাহ্নক, তোমার দ্যাওর নাস্ত্ তোমার প্রণয়ী—আর সেই প্রণয়ী চোর, চুরি কবতে এসেছে।”

কথাগুলো নাস্ত্ মূহ স্ববেই কহিল। উভয়েই মূহ স্বরে কথা কহিতেছিল—পাছে কাহাবও ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, সে বিষয়ে উভয়েই সতর্ক ছিল।

চিমনির আলোর তেজ-কমিয়া আসিতেছিল—সেই উজ্জল বস্ত্রিম আলোকে আজ নাস্তের প্রকৃত মূর্তি সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া ক্লারিসের চোখে ধরা পড়িয়া গেল! এই দুর্বৃত্ত দস্যুর জগৎ ক্লারিস ইহ-জগতের সমস্ত ধর্ম, পুণ্য, স্বামী,—সব ত্যাগ করিয়াছে! হা রে বুদ্ধিহীনা নারী,—এই পাপিষ্ঠকে তুই কাহার আসনে বসাইয়াছিলি? কদিক, সরল, প্রেমামুগ্ধ কদিক—কি বলিয়া ক্লারিস আজ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে? তাহার মত অভাগিনী কে আছে?

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছে—দুর্যোগ নামিয়াছে। এ অবৈধ প্রণয়-লীলা-অভিনয়ের পক্ষে এমন প্রলয়-বাত্তিই যোগ্য অবসর।

সহসা দারুণ অমৃত্যুতে ক্লারিসের সমগ্র চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিল। সে কি করিয়াছে—কি হারাইয়াছে? নাস্ত্ যখন সিঁড়ি বহিয়া সতর্ক পদে উপরে উঠিতেছিল, চির-পরিচিত গৃহে চোরের মতই নিঃশব্দে প্রবেশ করিতেছিল, ক্লারিস্ তখন হল-ঘরে সোফার উপর ঝটিকা হতা ছিন্ন লতার মতই লুটাইয়া পড়িল। তাহার



চৌধ ফাটিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সমস্ত বাধা ঠেলিয়া সঙ্কোচ ঠেলিয়া প্রাণ ভরিয়া সে আর কান্দিল। পাছে উপরকার পাপ-অভিনয়ের কোন সাড়া তাহার শ্রুতির মূল লাগিয়া এ ক্রন্দনে বাধা দেয়, অন্তরের এই আকুল অমৃতাপকে কালিমা-জর্জরিত করে, এই ভয়ে দাকণ দুঃখেও সে দুই হাত দিয়া আপনার কাণ দুইটাকে চাপিয়া রাখিতে ভুলিয়া যায় নাই।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসংঘ

তখনও ঘড়িতে ছয়টা বাজে নাই। অ্যাংলোব পথ-ঘাট তখনও অন্ধকারে আচ্ছন্ন। দুই-একটা রুটি ও মদের দোকানের সাশি ভেদ করিয়া ক্ষীণ আলোকছটা পথে পড়িয়াছে। একটা সবাইয়ে টেবিলের সম্মুখে কদিকৈব জাতা নাস্ত, ও জাক বসিয়াছিল। সম্মুখে টেবিলের উপর মদের বোতল ও গ্লাস।

নাস্ত কহিল, “এস মাষ্টার জাক, এক গ্লাস নাও।”

জাক সসঙ্কোচে কহিল, “আমায় ক্ষমা কর, ম্যাসিয়ো, আমি মদ খাই না। ছুঁতেও ভয় হয়।”

হাসিয়া নাস্ত কহিল, “আরে বাঃ! এমন ছেলে-মানুষও দেখিনে ত! সহরে ছেলে তুমি, মদ ছোঁও না? না, না, এক গ্লাস খাও। ওরে, এখানে আর একটা গ্লাস দিয়ে যা।”

কথামত ভৃত্য আর একটা গ্লাস রাখিয়া গেল। গ্লাসটা কানায় কানায় মত্তে পরিপূর্ণ করিয়া নাস্ত কহিল, “নাও, খেয়ে ফেল।”

জাক অসম্মতি জানাইতে সাহস করিল না। নাস্তের মত একজন মাতঙ্গের লোকেব অমুরোধ বারবার কি বলিয়া সে এড়াইবে? নাস্তকে জাক যে একটু সজ্জমের চক্ষে না দেখিত, এমন নহে! এই শিল্পীটি পূর্বে যখন রুদিক-গৃহে থাকিত, তখন জাককে ডাকিয়া একদিনের জন্তও সে তাহার সহিত কথা কহে নাই! নাস্তের স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্ত রুদিক-পরিবারের সকলেই কতখানি ব্যস্ত থাকিত, ম্যানেজারও নাস্তের মঙ্গলের জন্ত কতটা সচেষ্ট ছিল, জাক তাহা বেশই জানিত! সেই নাস্ত ডাকিয়া আনিয়া বারবার তাহাকে এতখানি অমুরোধ করিতেছে—সে অমুরোধ রক্ষা না করা ভাল দেখায় না! অগত্যা জাক আর স্বিকৃতি না করিয়া গ্লাসটি নিঃশেষ করিল।

জাকের পৃষ্ঠে কবাবাত করিয়া নাস্ত কহিল, “হাঁ, এই ত মানুষের মত কাজ। কেমন লাগল, বল দেখি! আর একটু নাও।”

জাক আবার নাস্তের অমুরোধ রক্ষা করিল! নাস্তকে তাহার মন্দ লাগিল না! বেশ আমুদে লোকটি! আহা, বেচারী নাস্ত! জুয়াখেলা ছাড়িয়া সংপথে আসিলে সে কি ভালই হয়। জাক ভাবিল, একবার সে অমুরোধ করিবে—নাস্ত যাহাতে জুয়াখেলা ছাড়ে।

আবার গ্লাস আসিল—নাস্তের প্রাণ স্তুর্ভিগে মাতিয়া উঠিয়াছিল। জাক কহিল, “আমার একটা অমুরোধ আছে, ম্যাসিয়ো নাস্ত—সে অমুরোধ রাখতেই হবে।”

“অমুরোধ? বল, কি তোমার অমুরোধ? রাখব বৈ কি,—কেন রাখব না?”

“জুয়াখেলা তোমায় ছাড়তে হবে! এতে ক্রমাগতই ত লোকসান হচ্ছে, দেখছ, এবার থেকে সাবধান হও।”

“এই কথা! খাসা বলেচ, মাষ্টার জাক!” নাস্ত, আবার জাকের পৃষ্ঠে মুহু করাঘাত করিল।

“আর একটা কথা—”

এমন সময় সরাইয়ের অধ্যক্ষ আসিয়া কহিল, “কারখানার ঘণ্টা বাজছে।”

জাক কহিল, “তাহলে আজ আসি, ম্যাসিয়ো—”

পকেট হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া জাক অধ্যক্ষের হাতে দিল। নাস্ত কহিল, “সে কি! তুমি দাম দিচ্ছ কি?”

‘এবারকার দামটা আমিই দিই, ম্যাসিয়ো—তুমি একটু খচর করলে।’

স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া অধ্যক্ষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। কারখানার একটা সামান্য শিকানবীশ ছোকরা—সে স্বর্ণমুদ্রা বাহির করে! নাস্তও বিস্মিত হইল। তবে কি জাকও জেনেদের যৌতুকের টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে না কি? তাহাদের বিশ্বয় বুঝিয়া জাকের আনন্দ হইল। সে কহিল, “অবাক হয়ে যাচ্ছ! এই দেখ, আরও কত মোহর আছে।” বলিয়া সে চারি-পাঁচটা স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিল। পকেটে সেংলা রাখিয়া সে আবার কহিল, “জেনেদের জন্ত একটা কিছু উপহার কিনে দিতে হবে।”

মুহু হাসিয়া নাস্ত কহিল, “বটে।”

অধ্যক্ষ মুদ্রাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল।

জাক কহিল, “চটপট—এখন বিদেয় কর! আমার এখন কারখানার যেতে হবে! ঘণ্টা বাজছে।”

যথার্থই কারখানার ঘণ্টা বাজিতেছিল। কর্তৃচাৰী-দিগকে সচকিত করিয়া ডাকিবার ঘণ্টা।

সরাইয়ের বাহিরে আসিয়া নাস্ত কহিল, “তাই ত জাক, এখনই তোমায় যেতে হবে! দুটো কথা কওয়া-হল না। তোমায় আমার বেশ লাগছিল। তোমার

অনুরোধ আমি রাখব—দেখে নিয়ো, ঠিক বলছি।”  
ক্রমে কথার কথার নাস্ত, জাককে নদীর তীর অবধি  
আকর্ষণ করিয়া আনিল। জাক কোন আপত্তি করিল  
না, বাধা দিল না। সরাইয়ের সেই বন্ধ উষ্ণ বায়ুর  
মধ্যে বসিয়া কেমন ক্লাস্তি ধরিয়াছিল, বাহিরের এই  
শীতল বায়ুর স্পর্শ দিব্য লাগিতেছিল। চলিতে চলিতে  
জাকের গতি মন্থর হইয়া পড়িল, পা কেমন জড়াইয়া  
আসিতেছিল। নাস্তের হাত ধরিয়া সে হাঁটিতেছিল।

কিয়দূর আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল, “এ  
কি, ঘণ্টা থেমে গেছে।”

“না।”

উভয়েই পিছনে ফিরিল। রাত্রির অন্ধকার হই হাতে  
সরাইয়া তখন দিনের আলো নামিতেছে। চিমনিগুলার  
মাথার উপর তপ্ত-কাঞ্চন বর্ণের একটা ডেউ খেলিতেছিল।  
কারখানার নিশান,—কৈ দেখা যায় না ত! আজ এই  
প্রথম জাক কারখানার পৌঁছিতে পারিল না। ভয়ে  
তাহার শ্রোণ কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নাস্ত, যখন করুণ  
স্বরে কহিল, “আমার দোষ। আমারই দোষ। আমারই  
দোষে শুধু এটা ঘটল, জাক। ম্যানেজারের কাছে  
আমি নিজে যাব—তাকে বলব যে, আমারই জন্ত তুমি  
সময় কারখানায় পৌঁছুতে পারনি।”

জাক কহিল, “বয়ে গেল। একদিন কামাই হলে  
আর কি এসে যাবে? লেবেক্সের সঙ্গে সে আমি  
বোঝাপড়া করে নেব এখন। চল, যখন বাওয়া হল না,  
তখন তোমার স্টীমারেই তুলে দিয়ে আসি।”

এই লেবেক্সের সহিত বুঝা-পড়া করাটাকেই জাক  
সব-চেয়ে ভয় করিত। কিন্তু আজিকার এই সস্ত-সস্ত  
আনন্দোন্মাদে সে ভয়ের উগ্রতাও সে ভুলিয়া গেল।

হুই জনে গল্প করিতে করিতে নদীর তীরে আসিয়া  
পৌঁছিল। তীরে তখন কে যেন কুয়াশার পর্দা বিছাইয়া  
রাখিয়াছে। পরপারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।  
স্টীমার-ঘাটের ক্ষুদ্র বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া হুইজনে বসিল।  
প্রাণটাকে জাকের আজ বড় লঘু মনে হইতেছিল।  
সে নানা কথা কহিতে লাগিল। জেনেদের বিবাহ,  
সরল ও সাধু-স্বদয় বৃদ্ধ রুদিকের অগাধ স্নেহ, কোমল-  
হৃদয়া ক্লারিস—কি এত বিবাদের ঘন ছায়া তাহার  
অন্ধর মুখখানিকে স্তান করিয়া রাখিয়াছে,—এমনই কত  
কথা।

জাক কহিল, “আজ সকালে ক্লারিসের মুখ এমন  
ফেঁকাশে হয়ে গেছে। মরার মত সাদা মুখ। আসবার  
সময় দেখলুম—”

কথাটা বলিবার সময় জাক লক্ষ্য করিল, নাস্তের  
দৃষ্টি সহসা কেমন স্থির হইয়া গিয়াছে। নাস্ত, কহিল,  
“তোমার ক্লারিস কিছু বলেছে আজ?”

“না।”

“কিছু না?”

“না। জেনেদ তাকে কি বলছিল, তা, তার সে  
কোন জবাব দেয়নি কিন্তু। বোধ হয় কিছু অসুখ  
করেছে—তার মুখ দেখে তাই মনে হল।”

“বেচারী ক্লারিস!” বলিয়া নাস্ত, এক সুগভীর  
নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জাকের মনে হইল, এইবার সে বেলিসেয়ারের কথা  
তুলিবে। কিন্তু নাস্তের মুখের ভাব দেখিয়া কেমন  
তাহার অমুকম্পা হইল। সে ভাবিল, “আজ থাক,  
আর একদিন বলব।” নাস্তের মুখে দুঃখের একটা  
ছায়া পড়িয়াছিল।

সহসা নাস্ত, কহিল, “জাক, তোমার কথা আমি  
রাখব। জুয়াখেলা ছেড়ে দেব।”

এমন সময় কুয়াশা ভেদ করিয়া বংশীর ধ্বনি উঠিল।  
স্যাং-নাজেয়ারের স্টীমার আসিতেছে। এবার বিদায়  
লইতে হইবে।

করকম্পন করিয়া নাস্ত, বিদায় গ্রহণ করিলে জাক  
নিঃসঙ্গতা অনুভব করিল। কারখানায় যাইতে তাহার  
আর ইচ্ছা হইল না। প্রাণের মধ্যে কেমন একটা  
আনন্দের উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিল,  
আজ যখন একটা দিন অবসর মিলিয়াছে, তখন জেনেদের  
উপহাট্টা কিনিয়া ফেলা যাক।

নৌকার নদী পার হইয়া জাক ষ্টেসনে আসিল।  
দুপুরের পূর্বে ট্রেন নাই। কি করিয়া এতখানি সময়  
কাটান যায়? ওয়েটিং রুমে কেহ ছিল না। বাহিরে  
বায়ুর প্রকোপ বাড়িয়াছিল, শীতল বায়ু বহিতেছিল।  
পথের পার্শ্বে ছোট একটা হোটেল ছিল, জাক গিয়া  
তথায় বসিল।

এই প্রভাতেই হোটেলের কারিকর ও কুলিদের ভিড়  
জমিয়াছিল। মদের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। উল্লাস-  
চীৎকারের বিরাম নাই। ভিতরে ঢুকিয়া জাকের  
বিরক্তি ধরিল। সে বাহিরে আসিবে, এমন সময়  
পিছন হইতে কে ডাকিল, “কি, মাষ্টার জাক বে!”

জাক কহিল, “কে? গান্ডা?”

গান্ডা, অ্যাঞ্চার কারখানায় কাজ করিত।  
অতিরিক্ত পানদোষের জন্ত পূর্নদিন কারখানা হইতে সে  
বরখাস্ত হইয়াছে। একটা টেবিলের ধারে বসিয়া  
তিন-চারিটা সদীর সহিত সে মদ খাইতেছিল।

গান্ডা, কহিল, “মাষ্টার জাক, পালাচ্ছ কোথা?  
আমাদের সঙ্গে দু’ এক গ্লাস খাবে, এস।”

এই পিশাচগুলার হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভের  
কোন উপায় ছিল না। তাহার সাগ্রেই সমস্ত জাতকে  
আপনাদের দলে টানিয়া বসাইল। পাত্রের পর পাত্র

আসিল। মদের প্রবাহ ছুটিল। পরে সকলে কহিল,  
“কিছু খাওরাও, মাষ্টার জাক!”

আহারাদির পর একজন সঙ্গী কহিল, “নৌকা চড়ে  
একটু বেড়ানো যাক—প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে। মাথা বেজার  
গরম হয়ে উঠেছে।”

তাহাই হইল। সকলে গিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিল।  
যুদ্ধ গতিতে নৌকা ভাসিয়া চলিল। উভয় তীরে অশ্রু  
ধারা-সীমা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তীব্র ধীরদিগের ক্ষুদ্র  
কুটার, রজক ও রাখালের মেলা,—চির-পরিচিত শাস্ত্র  
পল্লীজীতে মগ্নিত তটভূমি! জাকের কল্পনা-কাতর চিত্ত  
কাব্য ও সৌন্দর্যের আবেশে ভরিয়া উঠিল। মাথার  
উপর আকাশ কোথাও স্তম্ভ নীলিম, কোথাও বা চিমনির  
ধূমে গাঢ় কৃষ্ণ! হুই-চারিটা পাখী বিক্ষিপ্তভাবে উড়িয়া  
বেড়াইতেছে। তাহার মনে পড়িতেছিল, কাহিনী-শ্রুত  
রবিন্সন ক্রুসোর গল্প! সেও যেন জগতের সহিত,  
পরিচিতের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া কোন্ অজ্ঞাত  
অপরিচিত নবীন সৌন্দর্য-লোকের পানে ক্রুসোর মতই  
তরী ভাসাইয়া চলিয়াছে! পানোয়ন্ত সঙ্গীগুলো তখন  
বীভৎস কণ্ঠে চাৎকাব করিয়া গান ধরিয়াছে, সেদিকে  
জাকের মনোযোগ এতটুকুও আকৃষ্ট হইল না। দূরে  
অদূরে প্রকাণ্ড জাহাজগুলার গগনস্পর্শী মাস্তুলের চূড়া  
দেখিয়া কোন্ স্বপ্ন সৃষ্ট স্রুত মায়ালোকের কল্পনায় তাহার  
লুপ্ত চিত্ত বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে ধীরে ধীরে  
চক্ষু তাহার মুদ্রিয়া আসিল।

যখন নিস্ত্রা ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল, নৌকা তীরে  
লাগিয়াছে। সে কোথায় আসিয়াছে, কেন আসিয়াছে,  
কিছুই তাহার মনে ছিল না। অল্পে অল্পে তাহার জ্ঞান  
ফিরিয়া আসিতেছিল! জেনেদের পরিণয়-উপহার কিনিতে  
হইবে, তাহারই জজ্ঞ সে সফরে আসিতেছিল! তার পর—?  
একটা বিরাট অমুশোচনায় তাহার মর্মদাহ উপস্থিত  
হইল। এট নীচ সঙ্গীগুলার সহিত এমন নির্লজ্জভাবে  
মিশিয়া হীন আমোদে মাতিয়া সে আপনার সর্বনাশ-  
সাধন করিতে বসিয়াছে! সঙ্গীগুলার উপর পৈশাচিক  
ক্রোধে সে জ্বলিয়া উঠিল! কেমন করিয়া ইহাদের হাত  
হইতে এখন নিস্তার পাওয়া যায়!

সঙ্গীর দল তীরে উঠিল। জাকও তাহাদের অগ্রসরণ  
করিল। সঙ্গীগুলো তীরে বসিয়া আমোদের পরামর্শে মন  
দিল। কেহ বলিল, আর একটু মদ চাই, কেহ প্রতিবাদ  
করিয়া কহিল, না, কিছু খাবার! এইরূপ বাদামুবাদে  
মধ্যে জাক সতর্কভাবে নিঃশব্দে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ  
করিল। তাহার পা টলিতেছিল, মাথা দণ্ড-দণ্ড করিতে-  
ছিল। দেহটাকে টানিয়া বেড়াইবার এতটুকুও আর  
শক্তি ছিল না। একটু শুইতে পাইলে যেন বাঁচিয়া যায়।  
কিন্তু শুইবার স্থান কোথায় মিলিবে? যে দিকে দৃষ্টি

যায়, সেই দিকেই সে পা দুইখানা টানিয়া নিতান্তই  
লক্ষ্যহীন উদ্বেগহীনভাবে চলিতে লাগিল।

খানিকটা পথ সে চলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পাশ  
দিয়া কে ছুটিয়া গেল—লোকটা জাকের গায়েব উপর  
আসিয়া পড়িয়াছিল। সহসা আরও একজন ছুটিয়া  
আসিল। সে গাঙ্গু।

গাঙ্গু কহিল, “মাষ্টার জাক, সর্বনাশ হয়েছে—  
ঝগড়া-মারামারি করে একটা লোককে ওরা জলে ফেলে  
দিয়েছে, পুলিশ আমাদের পাছু নিয়েছে—এখন কোথায়  
পালাই! তুমি পুলিশকে কোন পরিচয় দিয়ে না,  
আমাদের। যদি তারা তোমায় জিজ্ঞাসা করে ত বলো,  
আমাদের মোটে চেনাই না তুমি।”

গাঙ্গু ছুটিয়া পলাইল।

জাক আবার চলিল। সহসা সে শুনিল, কে  
হাঁকিতেছে, “টুপি? চাই টুপি?” একটা সম্ভাবিত  
আশায় জাকের প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ক্ষীণ কণ্ঠে  
জাক ডাকিল, “বেলিসেয়ার—”

“কে? মাষ্টার জাক! তুমি এখানে!”

জাক কহিল, “হাঁ, আমার শরীর বড় খারাপ বোধ  
হচ্ছে, বেলিসেয়ার! আমার অ্যাস্ট্রেশ্যন ক্রুসোর বাজী  
কোনমতে তুমি শৌছে দিতে পার?”

“তাই ত! তা এস, মাষ্টার জাক—ষ্টেশন এই  
কাছেই। ভাগ্যে আমি এ পথে এসেছিলাম, না হলে কি  
হত, বল দেখি!”

জাককে লইয়া বেলিসেয়ার ষ্টেশনে আসিল। সন্ধ্যায়  
ট্রেন। অবসন্ন শরীরটাকে ষ্টেশনে প্রাটফর্মের বেঞ্চে জাক  
লুটাইয়া দিল। ধূমে তাহার চোখ ঢুলিয়া আসিয়াছিল।

কতক্ষণ সে ঘুমাইল, তাহার কোন ঠিকানা নাই।  
সহসা প্রবল ধাক্কায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাহিয়া  
সে দেখে, পুলিশের লোক তাহাকে ধাক্কা দিতেছে! জাক  
সভয়ে উঠিয়া বসিল, কহিল, “কি? কি হয়েছে? তোমরা  
কি চাও?”

পুলিশের লোক কহিল, “চাই,—তোমাদের হুজুরকে।  
ভারী চালাক হয়েছে! পুলিশের চোখে ধূলো দেবে?  
ওঠ—”

বেলিসেয়ার পাশেই ছিল। সে কহিল, “কোথায়  
যেতে হবে?”

“আপাততঃ অ্যাস্ট্রেশ্যন! তারপর জেলের ঘরে পাকা  
বন্দোবস্ত করে দেবখান।”

ভয়ে বেলিসেয়ার কাঁদিয়া ফেলিল। জাকের দুকণ্ঠা  
ধ্বক্ করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার প্রাণের স্পন্দনটুকুও  
খামিয়া বাইবার উপক্রম করিল! এ কি এ ব্যাপার?  
সে কি করিয়াছে যে, পুলিশ আসিয়া এমনভাবে লাহুনা  
করিতেছে?

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হুঃসংবাদ

পরদিন প্রভাতে যখন জাকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখনও তাহার শরীরের গ্রানি ঘুচে নাই। মদের এমনই পরিণাম! তীর তৃষ্ণায় জাকের বুক অবধি পুড়িয়া বাইতেছিল, শরীরের সর্বত্র অগভীর বেদনা, মাথায় যেন কে গুরু ভার চাপাইয়া রাখিয়াছে। তাহার উপর দাক্ষণ লজ্জা, তীব্র অমৃতাপ! মানুষ হইয়া পশুর মত ব্যবহার করা,—কি ঘৃণা, কি পবিত্রতাপের কথা!

এক অন্ধকার ঘরে জাককে রাত্রি কাটাইতে হইয়াছে। ক্ষুদ্র বাসুপথ দিয়া প্রভাতের আলো ক্ষীণ ধারে ঘরের মধ্যে উঁকি দিতেছিল। পাশে আর একজন কে ও পড়িয়া আছে! জাকের মনে পড়িল, সে বেলিসেয়ার! ঠিক, বেলিসেয়ারই ত!

জাক ডাকিল, “বেলিসেয়ার—”

গাঢ়স্বরে উত্তর হইল, “কেন?” সে স্বর গভীর হতাশে পূর্ণ!

জাক কহিল, “আমরা কি করেছি বেলিসেয়ার যে, এমন করে চোরের মত এরা আমাদের আটকে রেখেছে।”

“তুমি কি কবেছ না করেছ, তা আমি বলতে পারি না,—তবে আমি ত কিছুই করিনি—শুধু পথে টুপি বিক্রী কচ্ছিলুম! সেটা কি কবে দোষের হল, তা ত ভেবে ঠাওরাতে পারছি না।” তাহার পর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বেলিসেয়ার আবার কহিল, “টুপিগুলো কি আর আছে! সব নষ্ট হয়ে গেছে! তার দাম এখন কে দেয়? গরিব আমি, আমায় বোজগারের সর্বনাশ কবে দিলে! তুমি ওদের বলবে ত জাক যে, আমার কোন দোষ নেই,—তোমায় এতটুকু সাহায্যও আমি করিনি?”

“আমায় সাহায্য? কেন, আমি কি করেছি?”

“সে কি, ওরা যে বলছিল, তুমি শোন নি? তা ছাড়া তুমি নিজেকে জানছ, কি করেছ—”

“কিছু জানি না আমি, বেলিসেয়ার, যথার্থ বলছি! ওরা কি বলছিল, বল—”

“ওরা বলছিল, তুমি চুরি করেছ—”

“চুরি করেছি? কি চুরি করেছি?”

“কৃদিকের মতো জেনেদের বিয়ের টাকা।”

“কি ভয়ানক কথা, বেলিসেয়ার! তোমায় কি—”

জাকের কথা বাধিয়া গেল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।

বেলিসেয়ার কোন উত্তর দিল না। সারা সহরময় তখন রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে, জাক চোর! চুরি করিয়া অগ্ন্যস্ত্রে ছাড়িয়া সে পলাইতেছিল। সন্ধান করিয়া কাল দক্ষ্যাব সময় পুলিশ তাহাকে ধৈশনে ধরিয়া ফেলিয়াছে। চুরির কথা ভাবেই জেনেদ জানিতে পায়। তখনই

পুলিশে খবর দেওয়া হয়। চুরির বাক্সে জাক গৃহে ছিল, এবং ঠিক চুরির পর হইতেই সে অদৃশ্য হইয়াছে। সকালে কারখানাতো তাহাকে কেহ দেখে নাই। সমস্ত ঘটনাই জাকের বিরুদ্ধে তাহাব অপরাধ প্রমাণ করিতেছিল। তাহার পর অগ্ন্যস্ত্রে দুই-চারিজন কারিকর তাহাকে সরাইয়ে মদ খাইতে দেখিয়াছে, মদ খাইয়া অধ্যাক্ষের হাতে স্বর্ণমুদ্রা দিয়াছে সে, তাহাও সকলে দেখিয়াছে। তাহাব মত অবস্থার ছোকরা কোথা হইতে স্বর্ণমুদ্রা পাইতে পারে? তাহাব উপর কতকগুলো বদ সঙ্গী লইয়া নৌকায় সে মাতামাতি করিয়া বেড়াইয়াছে! জাক যদি চুরি করে নাই, তবে কে করিল? টাকার সন্ধান অপবে কোথা হইতে পাইবে? জাক জানিত, জেনেদের বিবাহের টাকা সে কোথায় রাখে। পূর্ব-রাতে জেনেদ স্বয়ং তাহাকে আলমারি খুলিয়া টাকার বাস দেখাইয়াছে! এবং পরদিন ভোবেই সে টাকা উড়িয়া গেল; অথচ টাকার ত ডানা ছিল না!

সে যে চুরি করিয়াছে এ বিষয়ে কাহারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। তবে একটা বিষয় ঠিক বুঝা যাইতেছিল না। সাড়ে তিন হাজার টাকা এক রাতে অদৃশ্য হইল, তাহার মধ্যে জাকের পকেটে কয়টারই বা সন্ধান মিলিয়াছে,—বাকী সে কোথায় লুকাইল? বেলিসেয়ারের স্বন্ধেও তাহার বিক্রীত টুপির মূল্য-বাবদ সামান্য পয়সাই পাওয়া গিয়াছে! এই অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা কোথায় তাহারা রাখিয়া আসিল?

যেখানেই রাখিয়া আসুক, সন্ধান করিয়া এই টাকা আদায় করিতেই হইবে।

ম্যানেজারের নিকট অপরাধী দুইজনের তলব পড়িল। জাকের তরুণ বয়স, ভদ্র বংশ ও নম্র শাস্ত প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ম্যানেজার পুলিশের কাছে অনুরোধ করিল, আসামীকে আদালতের হাতে না দিয়া তাহার নিকট আনিয়া দিলে সকল বিষয়েই সুব্যবস্থা হইতে পারে! ভেলে কয়েদীদের দলে পড়িলে জাকের আর শোধরাইবার কোন উপায় থাকিবে না। সারা জীবনটাই তাহার নষ্ট হইয়া যাইবে!

জাক ও বেলিসেয়ার ম্যানেজারের সম্মুখে আসিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইল। সে কক্ষে ম্যানেজার, কৃদিক ও পুলিশের দুইজন কর্মচারী ভিন্ন আর কেহ ছিল না।

ম্যানেজার কহিল, “শোন, জাক। তোমার বয়স অল্প, ভদ্র বংশেব ছেলে তুমি, আর তোমার শাস্ত স্বভাবের জন্য তোমার আমি ভালবাসতুম! সেজন্য আমিই অনুরোধ করে আদালতের হাতে তোমায় তুলে না দিই এখানে আনিয়েছি। এখানে অসঙ্কোচে তোমাব অপরাধ তুমি স্বীকার করতে পার, বাইরের লোক সে কথা

জানবে না। বেশী কথাবও দরকার নেই—শুধু বাকী টাকাটা—”

জাক মাথা তুলিয়া কহিল, “মিছে কথা—আমি টাকা চুরি করিনি—”

“চূপ কর, মিথ্যে বলো না, জাক। সাড়ে তিন হাজার টাকা যে তুমি নিয়েছ, এ বেশ জানা আছে। এক দিনে এত টাকা তুমি খরচ করতে পার না অশ্রু, আর তা কব-ওনি। কিছু কবেছ,—তা থাক! বাকী যা আছে, কেবত দাও। আমরা সকলেই তোমায় এবার মাপ কবব, তবে এবার পর এখানে আর তোমার থাক। সম্বন্ধে অল্প কথা—বাড়ীতে তোমার মাব কাছে ফিরে যাওয়াই এখন বোধ হয় ঠিক।”

“আমি কিছু জানি না, মশায়—” বলিয়া বেলিসেয়ার কাঁদিয়া উঠিল।

“চূপ কর, তুই পাচ্ছ—” ম্যানেজার পক্ষ কণ্ঠে কহিল, “তুইই যত নষ্টের মূল! এই ভাল মানুষ ছোকরা যে এ নোঙরা কাজ কবেছে, এ শুধু তোরই পরামর্শে, তাতে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই।”

বেলিসেয়ার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কম্পিত স্বরে ক্রুদ্ধিক কহিল, “আপনি ঠিক বলেছেন, মশায়। এরই সঙ্গে মিশ্র জাক খাবাপ হয়ে গেছে। না হলে জাকের মত শাস্ত ছোকরা কাবখানায় এব পূর্বে আমি ছুটি দেখিনি। আমাব স্ত্রী, আমাব মেয়ে, বাড়ীর সকলেই ওকে ভালবাসে। জাককে আমি নিজেব ছেলেব মত দেখি—শুধু এবট সঙ্গে মিশে যে জাক এই কাজ কবেছে, আমারও তাই বিশ্বাস।”

বেলিসেয়ার ভাবিল, না, তাহার আর কোন আশা নাই। কি অশুভ ক্ষণেই সে দিন সে টুপি বিক্রয় করিতে বাস্তব হইয়াছিল! যদি সে ক্ষুণ্ণাক্ষরেও ইহার আভাস পাইত!

জাক কহিল, “ম্যাসিয়ারে ক্রুদ্ধিক, এই গরীব টুপিওলার কোন দোষ নেই। কাল যখন পুলিশ আমায় ধরে, তার একটু আগেই পথে এর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমার শরীরটা খুব খারাপ ছিল বলে ওরই সাহায্যে আমি অ্যাঞ্জেয় ফিবব মনে করেছিলুম,—তাই ও শুধু আমার কথায় আমায় সাহায্য করতে এসেছিল! ও কোন দোষ করে নি।”

ম্যানেজার কহিল, “তবে তোমার একলাবই কাজ এ?”

“কিন্তু আমি ত কিছুই করিনি, মশায়। চুরি সম্বন্ধে কিছু জানি-ও না। আমি চোর নই।”

ম্যানেজার কহিল, “সাবধান জাক। এখনও বলছি, দোষ স্বীকার কর! বাকী টাকা ফিরিয়ে দাও, আমরা তোমায় ছেড়ে দেব। তোমার দোষ এত স্পষ্ট যে তা

প্রমাণের অল্প সাক্ষী-সাব্দের দরকার হয় না। সে রাজে শুভে যাবার সময় জেনেদ্ তোমায় তার টাকা দেখিয়েছিল ত, কেমন? টাকা সে কোথায় বাখে, তাও তোমায় বলেছে? কেমন, নয় কি? তার পর বেশী রাজে তুমি তাব ঘরে ঢুকে যখন আলমারি খোল, তখন জেনেদ্ জানতে পেরে তোমায় ডেকেছিল, তুমি কোন সাড়া দাওনি! বল, এ সব কথা ঠিক কি না! তুমি ছাড়া বাড়ীতে অল্প লোকও সেদিন আসে নি যে—”

বাগা দিয়া জাক কহিল, “আমি বেশী রাজে ও ঘরে যাই নি, আর এ চুরিও আমি করি নি, চুরির কিছু জানিও না।”

“চূপ কর নি তুমি! তবে রাস্তায় অত নবাবি বরে যে বেড়িয়েছ, তাব দরুণ টাকা, কোথায় পেলে তুমি?”

জাক বলিতে যাইতেছিল, সে টাকা তাহার মা পাঠাইয়াছিল,—কিন্তু সহসা মাব সে নিষেধ-বাণী মনে পড়িয়া গেল! মা লিখিয়াছে, যদি কেহ টাকার কথা জিজ্ঞাসা কবে, তাহা হইলে সত্য কথাটা যেন সে না বলে। শুধু বলে, এ টাকা সে জমাইয়াছে! নিজের উপার্জন হইতে জমাইয়াছে। জাক তাহাই বলিল। মা যদি বলিয়া দিত, বলিয়া, এ টাকা চুরি করিয়াছি, তাহা হইলে জাক সে কথাও নিঃসন্দেহ বলিতে পারিত। মাব উপর টান তাহার এমনই প্রবল!

ম্যানেজার কহিল, “জাক, এই কথা তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে বল? পাঁচ পেনী রোজের চাকরি থেকে আর এই অল্প সময়ে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছ তুমি, ব, মদের দাম দিতে মোহর বার কর! না, না, এ-সব চালাকি খাটছে না, জাক, মিথ্যা কথা বলো না, তাতে তোমাব বিপদই তুমি আরও ডেকে আনবে। তার চেয়ে মুক্ত কণ্ঠে নিজেব দোষ স্বীকার কর, আমরা তোমায় ক্ষমা করব!”

জাক কে'ন কথা বলিল না। কি বলিবে আর? নূতন করিয়া বানাইয়া কিছু ত বলিতে পারে না। তাই সে শুধু নীরবে নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

ক্রুদ্ধিক অগ্রসর হইয়া জাকের মাথার আপনায় কম্পিত শীর্ণ হাত রাখিল, কম্পিত স্বরেই কহিল, “জাক, বল, এ টাকা কোথায়, কার কাছে তুমি রেখেছ। কোন ভয় নেই! জেনেদের কথা ভাব একবার! তার সমস্ত জীবন ঐ টাকার উপর নির্ভর করছে। বিশ বছর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করে এ টাকা জমিয়েছি আমি! অনেক কষ্ট সহ্য করে, সব রকম ভোগ-বিলাস থেকে নিজেব বঞ্চিত রেখে জমিয়েছি! ঐ টাকার উপর আমার একমাত্র সন্তানের স্নেহ, জীবন—সব নির্ভর করছে। তা নিয়ে এমন নিষ্ঠুরতা করা না। তুমি ভাল মানুষ, শরীরে দয়া-মায়ো আছে—তুমি এ কাজ

করতে পার বলে এক দণ্ডের জন্তুও আমাব মনে হয় নি। কিন্তু পৃথিবীতে প্রলোভন বিস্তর, তার মায়া এড়াতে পাবে, এমন মানুষ অল্পই আছে। এক মুহূর্তের দুর্বলতায় একটা মন্দ কাজ দি করেই থাক, তাতে লক্ষ্য কি? সে দোষ গোপন করেনা, তা প্রকাশ করায়, স্বীকার করায় বরং মনুষ্যত্ব আছে। মুহূর্তের প্রলোভনে মন্দ কাজ করে ফেলা আশ্চর্য নয়—তা স্বীকার করলে লোকে ঘৃণা করে না, বরং সে মুক্তকণ্ঠতার জন্তু তাকে শ্রদ্ধাও করতে পাবে। এস জাক, বল, সে টাকা কোথায়! ও টাকা আমার বুকের রক্ত, পাজরাব হাড়। এ বুড়ো বয়সে আর উপার্জনেরও আমার শক্তি নেই। দাও, আমার টাকা দাও। না হলে জেনেদ মরে যাবে, আমি—”

কদিকেব চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এ কথা শুনিলে নিতান্ত নির্দম বে দস্যু, বুঝি, তাহাবও প্রাণ টলিয়া যায়। বেলিসেয়ার কহিল, “জাক, টাকাটা দিগে ফেল, বখার্বই এ টাকা বুড়ো মানুষের বুকের রক্ত।”

হতভাগ্য জাক! যদি তাহার নিজের টাকা থাকিত, সে সমস্তই এখনই সে কদিকেব হাতে তুলিয়া দিতে পারিত! কিন্তু সে কি করিবে—কি কবিয়া সে ইহাদের বুঝাইবে যে, সে চোব নয়, জেনেদের বিবাহের টাকা সে চুরি কবে নাই। চুরি যদি হইয়াই থাকে, তবে সে চুরির সে কিছুই জানে না। সে বলিল, “বখার্ব বলছি মশায়, আমি চুরি কবিনি। ভগবান জানেন—”

বোষে ম্যানেজার জলিয়া উঠিল, কহিল, “যথেষ্ট হয়েছে! আর ভগবানকে এর মধ্যে টেনে এনো না। কদিকেব এ কথা শুনেও বখন তোমার প্রাণ গলে গেল না, তখন বুঝি, একেবারে অধঃপাতে গেছ, তুমি! থাক, তবু তোমায় কিছু সময় দিলুম, আরও। ভেবে দেখ।” পরে কর্মচারীকে আজ্ঞা দিল, “এদেব উপরে রেখে এস কেউ। নিজের মনে বেশ করে সব ভেবে দেখ, জাক, দোষ স্বীকার করবে কি না। না হলে পুলিশ ত আছেই।”

পুলিশের বর্ষচরী কহিল, “তাহলে দুজনকে এক-সঙ্গে রাখবেন না, মশায়। এই টুপিগাটা ওকে বোধ হয় কোন বকম ইসারা করে দোষ স্বীকার করতে বাধ্য করে দিয়েছে।”

ম্যানেজার কহিল, “ঠিক কথা। দুজনকে দু'ঘরে রাখ।”

তাহাই হইল। দুইজনকে দুইটা ঘরে রাখা হইল। নির্জন ঘর। ঘরে আসিয়া জাক ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। এ যন্ত্রণা আব সহ্য হয় না। বিরামদায়িনী, বিশ্বতিদায়িনী নিদ্রা, কোথায় তুমি, হতভাগ্য বালককে

তোমাব কোলে তুলিয়া লও। সে নিশ্চিত হউক। আর ভাবও যায় না।

অপবাহু জেনেদ আসিয়া ডাকিল, “জাক!”

কাঁদিয়া তাহার চোখ দুইটা আফিমের ফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। জাক কহিল, “জেনেদ, তোমারও বিশ্বাস যে আমি চোব? তোমার টাকা চুরি করেছি?”

জেনেদ কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে কহিল, “জাক, আমার মত কুৎসিত দ্রলোক তুমি কখনও চোখে দেখেছ কি? আমি জানি, আমি কুৎসিত। আরনায় নিজের মুখ দেখে নিজের উপরই আমাব রাগ হয়। জগতে সবাই সুন্দর, আমিই শুধু বাজ্যের কদর্যতা নিয়ে বেঁচে আছি। জাক, আমার মত মন্দ বরাত এ জগতে আব কার? আমার মাজ্জা, আমার প্রিয়তম, আমার মত কুশ্রীকে বিয়ে করতে যে রাজী হয়েছে, সে শুধু ঐ টাকার জন্তু। ঐ টাকাই আমার সর্বস্ব, ঐ টাকাই আমাব রূপ, আমার প্রাণ, আমার ভালবাসা! ঐ টাকার জন্তুই শুধু আমি মাজ্জাব পায়ে ঠাঁই পাছি। যদিও আমার এ বিশ্বাস আছে, একদিন আমার ভালবাসায় মাজ্জাকে আমি বশ করব, একদিন আমি তাকে বোঝাব যে, আমার হৃদয়ের কাছে এ টাকার বাশি কত তুচ্ছ! কিন্তু তার আগে এই টাকা না হলে মাজ্জাকে পাবই না যে! সেই টাকা লুকিয়ে রেখে আমার পৃথিবীব সব সাধ, সব আশা কেড়ে নিয়ো না! জাক, ভাই, দয়া কর। আমার বিয়েব টাকা ফিরিয়ে দাও—তোমাব এ উপকার জীবনে কখনও আমি ভুলবো না!”

জাক কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দিবে সে? সে যে নির্দোষ, নিষ্পাপ, স্বপ্নেও এমন চিন্তা তাহার মনে কোন দিন স্থান পায় নাই, এ কথা কেমন করিয়া সে ইহাদের বিশ্বাস করাইবে? ডাগর চোখ দুইটিতে মিনতি ভরিয়া জাক জেনেদের পানে চাহিল। সে দৃষ্টির অর্থ, জেনেদ, একবার তুমি আমার মনের মধ্যে প্রবেশ কর—মনটাকে ঘাঁটিয়া-ঘুঁটিয়া দেখ, সেখানে শুভ ইচ্ছা ভিন্ন আব কোন চিন্তা স্থান পায় কি না! কিন্তু মুখে তাহাব কোন কথা ফুটিল না।

জাককে কাঁদিতে দেখিয়া জেনেদ কহিল, “কাঁদছ তুমি জাক? তাহলে দয়া হয়েছে? আমি ত জানি, তুমি নিষ্ঠুর নও! যে জেনেদের স্মৃতির সস্তাবনায় অত তুমি সহানুভূতি দেখিয়েছিলে, সেই জেনেদের সর্বনাশ তুমি করতেই পার না—জাক—” জেনেদ সন্মোহে জাকের হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল, তাহার নত মস্তক তুলিয়া ধরিয়া কহিল, “জাক, ভাই, টাকাটা তবে দাও—”

“কিন্তু জেনেদ, বখার্ব বলছি, আমি তোমার টাকা নিই নি!” জাকের দুই গাল বহিয়া অশ্রু নামিল।

“না, না, ও কথা বলো না, জাক। আমি মরে যাব, মরে যাব, তাহলে। বল, চুপি চুপি বল, কার কাছে বেখেছ। কিছু খরচ করে ফেলেছ,—তার জন্ত লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।”

“জেনেদ্, কি করে তোমাদের বিশ্বাস জন্মাবে? যথার্থ বলছি, আমি টাকার কথা কিছুই জানি না। আমি চুরি কবি নি! তোমরা ভুল করছ। আমি চোর নই। কি করলে তুমি বিবাস করবে, আমি চোর নই! তোমরা সকলে এমন নির্দয় নিষ্ঠুরভাবে কেন আমার চোর বলে সন্দেহ করছ?”

জেনেদ্ যেন উদ্ভাদের মত হইয়া উঠিল। সে কহিল, “দেখ, আমাব বিয়েব আশা নির্মূল হবে। তোমাব পায়ে ধরি জাক—”

জেনেদের নয়নে বর্ষার বজা নামিল। অচল মিনতি ও অশ্রুবোধে জাককে সে কাতর, পীড়িত করিয়া তুলিল। কিন্তু জাক—হতভাগ্য ছাক—সে কি করিবে। বতক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবোধ মিনতি করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন জেনেদ্ গজিয়া উঠিল, “এততেও তুমি স্বীকার করবে না! তবে সাজা পাও! জগতে সকলের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃসহ জীবন নিয়ে তুমি বেঁচে থাক—আমি তোমায় আজ এই শাপ দিলাম।”

জেনেদ্ তখন নামিয়া ম্যানেজারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ম্যানেজার কহিল, “কি হল?”

জেনেদ্ কোন উত্তর দিল না। তাহার দৃষ্টি হইতে হতাশার এমন একটা গভীর তাহাতাব ঝিকরাইয়া পড়িল যে, ম্যানেজার তাহা দেখিয়া সমস্তই বৃথিল।

ম্যানেজার কহিল, “জেনেদ্, স্থির হও, কেঁদো না। পুলিশের হাতে ওকে দেবার পূর্বে টাকা আদায়ের চেষ্টা একবার আমবা কবি। কদিকের কাছে শুনেছি, ওর মার হাতে অনেক টাকা আছে। তাকে সব ঘটনা খুলে লেখা যাক। যদি ভাল লোক হয় ত ছেলের এ কীর্তির কথা শুনে তোমাব টাকা নিশ্চয়ই তাহা দিয়ে দেবে।”

একখণ্ড কাগজ লইয়া ম্যানেজার তখন পত্র লিখিতে বসিল,

“মাননীয়শ্র,—

আপনার ছেলে জাক কদিকেব কন্ডার বিবাহ-পণের সন্ধিত সাড়ে তিন হাজার টাকা চুরি কবিয়াছে। পুলিশের হাতে এখনও তাহাকে সঁপিয়া দিই নাই। এই টাকার কতক সে খরচ করিয়াছে, বাকী কোথায় বাখিয়াছে, তাহা বহু চেষ্টাতেও কবুল করাইতে পারিলাম না। কাজেই আপনাকে লিখিতেছি, যদি এ টাকা আপনি পাঠাইয়া দেন, তবেই আপনার পুত্রকে কদিকবা ক্ষমা করিবে, নচেৎ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। এই টাকার উপরই বেচারার কদিকের একমাত্র

কন্ডার জীবন নির্ভর কবিতোছে। এই টাকা বেচারার বৃদ্ধ পিতার আজীবন পরিশ্রমের সঞ্চয়। তিন দিন আপনাদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকিব। ববিবার কিম্বা সোমবার বেলা দশটার মধ্যে যদি আপনার উত্তর না পাই, তাহা হইলে আদামীকে অগত্যা পুলিশের হাতে দিতেই বাধ্য হইব। ইতি ম্যানেজার।”

পত্রের নীচে ম্যানেজার নিজেব নাম সচি করিল।

বৃদ্ধ কদিক কহিল, “বড় দুঃখের কথা! এ চিঠি পড়ে মার বুক একেবারে ভেঙ্গে বাবে। আতা!”

জেনেদ্ বৃদ্ধ নিখাসে কহিল, “বাক ভেঙ্গে! তার ছেলে আমার সর্বস্ব নিয়েছে—মা এখন তা পুথিয়ে দিক!”

তায় ঘোঁরন। হাঃ প্রেমের অন্ধ নির্মমতা! পুত্র-কৃত এই দারুণ হৃদয়বে সংবাদ মার প্রাণে কতখানি আঘাত দিবে, সে ভাবনা মুহূর্তের জ্ঞাতও জেনেদের মনে স্থান পাইল না। বেচারী কদিকেব চিত্ত করুণা ও সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া আসিল—এমন সংবাদ শুনিলে কদিক যে কখনও প্রাণে বাঁচিত না, ইহা নিশ্চয়।

কদিকেব মনে এইটুকু শুধু আশা বহিল, এ চিঠি জাকের মার কাছে না পৌঁছিতেও পাবে! ক্ষুদ্র এক টুকরা কাগজ, কতটুকু তাহার জীবন! অসংখ্য কত চিঠি-পত্রের সহিত একত্র সে যাইবে—পথে কত বিঘ্ন, কত বিপদ ঘটিতে পারে! পৌঁছিবার সম্ভাবনা অল্পই! এমন কত-শত ক্ষুদ্র পত্র প্রায়ই ত পথে হারাইয়া যায়।

কিন্তু কদিক ভুল বুঝিয়াছিল। ম্যানেজার যে পত্র আজ ইদার নামে লিখিয়া পাঠাইল, অজ্ঞাত পত্রের সহিত সেখানি যাত্রা আরম্ভ করিবে, নিশ্চয়। পিয়ন পত্র বাছিয়া ব্যাগে পুথিবে। সেই ব্যাগ ষ্টীমারে উঠিয়া, ট্রেনে চড়িয়া বহু ব্যাগেব সহিতই ট্রেনের ডাক-কেরানীর হাতে পড়িবে। পরে বিস্তর পত্রের সহিত এ পত্র পোষ্ট-অফিসে গিয়া জমা হইবে—তার পর পারিতে পৌঁছিবে! সেখানে পত্রখানি কেহ ছিঁড়িবে না, হারাইবে না, পোড়াইবে না! ঠিকানায় মালিকেব কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্ত হর-করাব হাতে তুলিয়া দিবে। এ চিঠি নষ্ট হইবে না। হইতে পারে না—কারণ, এ চিঠি যে দুঃসংবাদ বহিয়া চলিয়াছে। দুঃসংবাদবাহী পত্রগুলাব জীবন আশ্চর্য্য টিকিয়া থাকে। পথে তাহাদের বিশাশ ঘটবার কোন আশঙ্কা থাকে না; বিশাশ ঘটেও না।

এ পত্র-সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই ঘটিল। ট্রেনে উঠিয়া ষ্টীমারে চড়িয়া কেরানীর হাতে ঘুরিয়া পিয়নের ব্যাগে কিরিয়া একদিন প্রভাতে এতিয়ালের পরিচ্ছন্ন কুটারে ম্যানেজারের পত্র আসিয়া পৌঁছিল। কুটার-সম্মুখে ফটকের প্রাচীরে একখানি ফলক,—তাহাতে লেখা আছে, “আত্ম-ম-কুণ্ড—” বৃষ্টিব জল ও রৌদ্র মাখিয়া অক্ষরগুলি শুধু ঈষৎ অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বহু ভেদ

আজিকার প্রভাতে “আগাম-কুঞ্জ” নামটি প্রকৃতই সার্থক মনে হইতেছিল। বহির্ভাগের সকল প্রকার অশান্তি ও কোলাহল হইতে বর্জিত, বিহঙ্গ কুজন-মুখরিত এই নির্জন পল্লীবাস-ভূমিকে আজ এ মৃদু নির্মল প্রভাতে সত্যি একখণ্ড মায়াশোক বলিয়া মনে হইতেছিল।

ইদা দ্রাক্ষাঙ্ক হইতে শুধু ফলগুলি বাছিয়া ফেলিয়া দিতেছিল। অতিথি ডাক্তার হাব্জের এখনও নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল, “চিঠি!”

“অ্যাড্রেস চিঠি” বলিয়া আর্জান্ত পত্রখানা সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া খপরের কাগজের মোড়ক খুলিল। চিঠিখানা ইদাকে দিল না। ইদা নিকটে আসিয়া লুব্ধ দৃষ্টিতে চিঠিটার পানে চাহিয়া বহিল।

আর্জান্ত তাহা লক্ষ্য করিল। চিঠিখানা ব্যগ্র ইচ্ছা সঙ্গেও যে ইদা শুধু তাহারই ভয়ে তাতে লইতে পারিতেছে না, ইহা সে বুঝিল। বুঝিয়া অন্তরে সে এক বিকট আনন্দ অনুভব করিল। কিন্তু সে ভাব চাপিয়া প্রকাশে সে বলিল, “আঃ, আবার এক একটা নতুন বই বেরল! ভিক্টর হিউগোব লেখা দেখছি! কি যে সব ছাই-পাঁশ লেখে, মানেও কিছু বোঝা যায় না! অবি-শ্রামই লিখে! এতে কখনও ভাল লেখা বার হতে পারে? কত ভেবে চিন্তে তবে একখানি বই লিখতে হয়! এই যে আমি আজ ক’বছর ধরে শুধু ভাবছি—এক ছত্রও লিখিনি। একেই ত বলে সাধনা!”

এ কথাতেও ইদার মনোযোগ আবৃত্ত হইল না। অ্যাড্রেস পত্র আসিলে তাহার মাতৃহৃদয়ের সকল গর্দন নিমেষে যেন দৃষ্ট হইয়া উঠে,—অপর কোন বিষয়ে আর লক্ষ্য থাকে না। আর্জান্তর কবি-বশের বিচিত্র স্বপ্নে তখন আর কিছুতেই তাহাকে ভুলানো যায় না। পুত্রের এক ছত্র হাতের লেখায় তাহার চোখে বাহুত্বগৎ একেবারেই মিলাইয়া যায়! এইটুকু আর্জান্ত কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। হিংসায় তাহার সর্ব শবীর জ্বলিতে থাকে! নানাভাবে কঠিন নিষ্ঠুর হইয়াও সে কিন্তু ইদাব মনের বেগ সামলাইতে পারে না। শুধু এই শুভ্রই জাককে সে দূরে—বহুদূরে পাঠাইয়াছে। নাহলে জাক লেখাপড়া শিখিল, কি কারখানার কারিকর হইয়া উঠিল, তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া-যায় না।

কিন্তু এই দুবছর ব্যবধান মার প্রাণখানিকে ছেলের প্রাণের আরও কাছে টানিয়া আনিয়াছিল। স্নেহের স্মৃগভীর আকর্ষণে বাহিরের সব ব্যবধান ঘুটিয়া

গিয়াছিল। অন্তরে বাহিরে, নিদ্রায়-জাগরণে জাক এখন অহর্নিশই মার মনে জাগিয়া থাকে।

জাক চলিয়া বাইবার পর ইদার প্রাণ অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। কেমন করিয়া সে প্রাণ ধরিয়া থাকিবে? আর্জান্তর দম্মখে ইদা জাকের নামও উচ্চারণ করিত না—কবি ইহাতে বিরক্ত হইত। কিন্তু আর্জান্ত সহস্র বাধা দিলেও ইদা জাককে একদণ্ডেও জ্ঞাত ও ভুলিতে পারিল না। ভিতরের অনুরাগ প্রবলতর হইয়াই উঠিতেছিল।

আর্জান্ত ইহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিল; এবং ইহাতেই জাকের প্রতি তাহাব বিরক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছিল। পরে যখন কদিক খপব দিল, কাজ-কর্মে জাকের তেমন মনোযোগ নাই, তখন একটা পৈশাচিক আনন্দে মাতার মর্মে আঘাত দিয়া সে বলিল, “দেখ, তোমাব কেমন তৈরী ছেলে! কোন ক্ষমতা নেই! কারখানাব কাজেও মাথা খেলে মা! এমন অপদার্থ!”

কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে! জাককে সে পদে পদে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইত। ইদাব চোখে জাকের অক্ষমতা ও অপদার্থতা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে তাহার আপহের যেন সীমা ছিল না। ইহাতে সে আনন্দ লাভ করিত। আজ শেবে অ্যাড্রেস চিঠি খুলিয়া পড়িবার লোভ-সম্বরণে অক্ষম হইয়া সেখানা খুলিয়া ফেলিল—খুলিয়া যাচা পাঠ করিল, তাহাতে আনন্দে তাহাব চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। পত্রখানা ইদার দিকে ছুড়িয়া আর্জান্ত কহিল, “দেখ, ছেলের কাণ্ডখানা দেখ! এ রকম যে হবে, তা আমি আগে থেকেই জানতুম!”

কি নিম্নম আঘাত! নিষ্ঠুর বেদনা এ! মাতার গর্ভে মাতার স্নেহে আঁত হইয়া বেচারী ইদা কাদিয়া ফেলিল! কম্পিত স্বরে সে কহিল, “কিন্তু তুমি, তুমিই এর জন্ত দায়ী! কেন তুমি তাকে তাড়িয়ে দিলে?”

যাক্, যেমন করিয়া হোক, জাককে এখন বক্ষা করিতেই হইবে। কাদিয়া ফল কি! কিন্তু, কি উপায়ে? কি উপায়ে বক্ষা করা যায়! এত টাকা সে কোথায় পাইবে? তাহার কোন সঙ্গতি নাই—সে যে একেবারে বিজ্ঞ নিঃশেষ! গৃহের আসবাবপত্র গাড়ী-বোড়া প্রভৃতি বেচিয়া যে টাকা পাওয়া গিয়াছিল, কবির সাহিত্যিক মহলস প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিতেই যে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

কে এখন অর্থ দিয়া তাহার জাককে উদ্ধার করিবে? অকস্মাৎ সেই ‘বন্ধুর’ কথা ইদার তখন মনে পড়িয়া গেল! বিদায়ের পূর্বে বন্ধু তাহাকে কিছু উপহার দিতে চাহিয়াছিল, সে তাহা গ্রহণ করে নাই। অতীত ভালবাসার স্মৃতিচিহ্নরূপ বন্ধু সাগ্রহে উপহার দিতে আসিয়াছিল, পাছে আর্জান্তর সম্মানে আঘাত লাগে, ইহা ভাবিয়াই প্রেমের সে



অবাচিত দান সে উপেক্ষা করিয়াছে। আজ ইদা নিঃশ্ব! দুই-চারিখানা অলঙ্কার বাহা আছে, তাহা বিক্রয় করিলেও এত টাকা মিলিবে না! কবিব নিকট এ চুঃখ নিবেদন করা, মিথ্যা! তাহার প্রকৃতি ইদার বেশই জানা ছিল। প্রথমতঃ কবি জাককে ঘৃণা করে, তাহার উপর সে মহা-কৃপণ! সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও হীন মাংসার্থ্যে তাহার হৃদয় ব্যাকুল, মাতৃহৃদয়ের এ আগ্রহ সে বুঝিবে না, বুঝিতে সে পারে না! তাই সে স্থির করিল, কবির কাছে কোন সাহায্যে সে চাহিবে না! তবে কে এমন স্তম্ভ আছে, কে এমন উদার পরোপকারী—?

আর্জান্তু কহিল, “ও ছেলেকে আর এখন শোধবাবার চেষ্টা কবা মিছে! এতদূর যে উদ্ভ্রম গেছে—”

কথাটা ইদা শুনিয়াও শুনিল না। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, একটা কথা! তিন দিনের মধ্যে টাকার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে—তিন দিনের মধ্যে না দিলে তাহার প্রাণের জাক ছেনে যাইবে।

আর্জান্তু আবার কহিল, “ছি, ছি, বন্ধুবান্ধবদের কাছে আমার মাথা হেঁট হল! লোকেব এত খোসামোদ করেছি, আমি, এই ছেলেকে মানুষ করে দেবার জন্য! আমার চূড়ান্ত শিক্ষা হল—”

ইদা কহিল, “এ তিন দিনের মধ্যে যেমন করে পারি, আমি এ টাকার যোগাড় করে পাঠাব—না হলে জাককে তারা ছেলে দেবে।”

আর্জান্তু কহিল, “এ কলঙ্কের তাত এটানো দবকাব বাটে। কিন্তু এত টাকা কোথায় পাবে তুমি, শুনি!”

“তুমি যদি দয়া কবে—”

আর্জান্তু বাধা দিল, বুঝিল, টাকা দিবার ভ্রান্ত ইদা তাহাকে অমুবোধ করবে। বাগে সে জলিয়া উঠিল, কহিল, “আমি দয়া করব? জানি, তুমি শেষ আমাকেই ধবেবে। আমার খবচটা ভাবী সামাগ্র কি না! আমার টাকার গাছ আছে! তুমি আমার অনেক টাকা দেখেছ, না? ছু বছর তাকে খাঁড়িয়ে আমার ষা খেঁচ হয়েছে, তা কোন সংস্কার্যো দিলে দেশের কত উপকার হত! একখানা বই ছাপালেও ভগতে একটা জিনিস থাকত! এখন আমি তার চুবির খেসারত দেব? চুবির সাড়ে তিন হাজার টাকা,—বড় সহজ জিনিস কি না!”

ইদার মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। দৃঢ় স্বরে সে কহিল, “তোমার কাছে এক পরসসও আমি সাহায্য চাইছি না—তোমার কিছু করতে হবে না, তার জন্য। শুধু—”

“তবে তুমি এত টাকা পাচ্ছ, কোথায়? কে এত টাকা দেবে?”

এতটুকু সঙ্কোচ-বাধা না মানিয়া ইদা তখন বন্ধুর নাম করিল। তান—তনি এ টাকা এখনই দিবেন। নিশ্চয়!

প্রেমে, স্নেহে ইদাকে পরম আদরে একদিন যে গ্রহণ করিয়াছিল—যাহার আশ্রয়, নিতান্ত দুর্ভাগিনী সে, মুহূর্ত্তের ভুলে ত্যাগ করিয়া এ পথে আসিয়াছে, তাহার সেই উদার-হৃদয়, উপেক্ষিত বন্ধুর নিকট গিয়াই সে কাঁদিয়া পড়িবে! যাহাকে নিতান্ত নিঃস্বভাবে পাপিনী সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, সেই বন্ধু এ বিপদে কখনও তাহাকে উপেক্ষা কবিত্তে পারিবে না। ইদা সেই বন্ধুর কাছেই যাউবে।

শুনিয়া আর্জান্তু শিরিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা বলিল না। অমুমানের সে ইতাই বুঝিয়াছিল।

ইদার অতীত জীবন গভীর রক্ত্রে সমাচ্ছন্ন ছিল। শাস্ত, সন্দর, ঐশ্বর্যশালী স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই। তাহার প্রাণ যৌবনের উন্মেষে যে উদ্দাম চপল প্রেমের তৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার স্বামীর পরিমিত আদর-ভালবাসায় তৃপ্ত লাভ করে নাই! স্বামীর এক কক্ষচায়ীর কুঠকে পড়িয়া অভাগিনী আপনার নারী-ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া বিপথ-গামিনী হয়! উদার-হৃদয় স্বামীকে সে মন্দবাহ, ইদা জীবনে ভুলবে না! তাহার করুণাবণ্ড কি সীমা ছিল! তিনি আর বিবাহ করেন নাই। তাব পর যে পাপিষ্ঠ ইদাকে দরনাশের পথে টানিয়া আনে, সে এখন তাহার গহনাপত্র, টাকাকাড় কাড়িয়া লইয়া ভিখাখিণী মত পথে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন এই বন্ধুই তাহাকে আশ্রয় দেন! স্বামীর সহিত মিলন সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইদা এই বন্ধুব নিকট হইতেও যে ভালবাসা লাভ কাবয়াছিল, অনেক স্ত্রীর ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। ইদা যাহাতে কোন কষ্ট না পায়, সে বিষয়ে বন্ধু বশুদ্র লক্ষ্য ছিল। দীর্ঘকাল বন্ধুর আশ্রয়ে কাটাইয়া ইদা তাহাকেও শেষে ত্যাগ করিল। তাহার পর নানা অবস্থার মধ্যে পাড়িয়া আর্জান্তুর সহিত নূতন কাব্য ইদা সংহার পাতিয়াছে—কিন্তু স্রবশাস্তি স্বামীর আশ্রয়ে সহিতই সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল! দুর্ভাগিনী নারী জীবনে আর কখনও সে স্রবের স্বাদ পায় নাই! পাইবার আশাও নাই আর! বিপথে একবার আসিলে মুক্তি নাই—মুক্ত নাই! গড়াইতে গড়াইতে কোথায় গিয়া শেষ তলাইয়া পড়িবে, তাহারও কোন ঠিকানা নাই!

আর্জান্তু কহিল, “তার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? এখন তুমি আমার—”

ইদা কাঁদিয়া ফোলল, কহিল, “কিন্তু তাঁর বন্ধুত্বের উপর একটু গুরু দাবী—”

আর্জান্তু কহিল, “বেশ, তাতে আমি বাধা দিচ্ছি না! তবে তুমি একলা যেতে পাবে না—আমি সঙ্গে যাব।”

ইদা সর্বাশ্রয়ে কহিল, “তুমিও যাবে! বেশ—তাহলে

ত ভালই হয়। ওখান থেকে বরাবর অমনি আমি অঁয়াঙ্গ্রেয় যাব, কেমন?”

আর্জান্ত জানিত, ইদা তুরেনে যাইবেই! বন্ধুর নিকট হইতে এ অর্থ ভিক্ষা করিতে সে এতটুকু দ্বিধা করিবে না। কোন বাধাই সে মানিবে না! তথাপি অতীত ইতিহাস তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। পুরাতন প্রেম যদি আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। ইদা সেখানে কত স্মৃতি, কত আদয়ে ছিল। যে ঐশ্বর্য্য-সম্পদ বহুদিন সে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, দাবিজোয় মধ্যে পড়িয়া, তাহারই বিচিত্র মোহ যদি ইদাকে আজ আবার লুপ্ত করিয়া তুলে! তাহারই মায়ায় ইদা যদি আর্জান্তকে ত্যাগ করে! এখানে পরুষ নির্ভর আচরণ ভিন্ন একটা মিষ্ট কথাও ত তাহার ভাগ্যে মিলে না। তাই ইদাকে একা যাইতে দিতে আর্জান্তের মন সরিল না।

এদিকে যে ইদাকে নতিলে আর্জান্তের চলেও না। তাহার এই দস্তে দপে সায় দিয়া যাইবে, এমন লোক ইদা ভিন্ন পৃথিবীতে আর ছুটি মিলিবে না! অক্ষম লেখকের গর্স-আফালন—এই নিবোধ মুগ্ধ ভক্ত ভিন্ন কেহই যে সহ্য করিবে না। তাহা ছাড়া তাহার মাথায় যে নূতন একখানা নাটকের কল্পনা সাড়া দিতে আবশ্য করিয়াছে, ভ্রমণে তাহা সম্পূর্ণ পবিপতি লাভ করিয়া নিমেষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে পাবে, এ আশাও তাহাব মনে বিলক্ষণ ছাগিতছিল।

ডাক্তার হার্জের উপর গৃহ-রক্ষার ভার দিয়া আর্জান্ত ও ইদা তুরেন যাত্রা করিল।

আর্জান্ত জিজ্ঞাসা করিল, “কি, টাকা পেলে?”

“হ্যাঁ। ইনি ঠিক করেছিলেন, জাককে একেবারে কিছু দান করবেন—নগদ দশ হাজার টাকা। এর বড় সাধ, জাক ফোঁড়ে ঢোকে! সে সংসারী হলেই দশ হাজার টাকা উনি তাকে দেবেন, এমনই ইনি ঠিক করেছিলেন। তা যখন দরকার, তখন আজই সে দশ হাজার টাকা ইনি আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। সাড়ে তিন হাজার ত অঁয়াঙ্গ্রেয় দিতে হবে, আপাতত। বাকীটা, ইনি বলছেন, জাকে বসাতে ভাল হয়, ভবিষ্যতে উন্নতি হয়, এমনভাবে যেন খরচ করা হয়।”

“বেশ হয়েছে। বাকী সাড়ে ছ’ হাজার আমি খাটিয়ে কারবারে দেব’খন। এখানে শুনছিলুম, অল্প বয়সে চুরি করে’ যে সব ভক্তলোকের ছেলে-পিলেরা গোলায় যায়, তাদের শোধরাবার জগ্ন, তাদের মানুষ করবার জগ্ন একটা সভা আছে, জাককে সেইখানে দি, কি বল? এতে পরে তার ভাল হবে।”

চুরি—চোর। কথাটা ইদার মরমে বিবিল। জাক চুরি করিতে পারে, এমন চিন্তাও যে তাহার মনে স্থান

পায় না! চোখে দেখিলেও যে ইহা বিশ্বাস হয় না! কিন্তু সেই চিঠিখানা—কি নির্ভর ভীষণ সংবাদই সে বহিয়া আনিয়াছে! সত্যই কি এ চিঠিখানা আসিয়াছে, না, এ একটা শুধু দুঃস্বপ্ন? ইদা স্বপ্ন দেখিতেছে?

ইদা কহিল, “সে ভেবে চিন্তে পরে স্থির করা যাবে। এখন ত আগে অঁয়াঙ্গ্রেয় যাওয়া যাক।”

আনন্দে গর্সে কবির চোখ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এতগুলো টাকার উপর আধিপত্য্য করিবে, সে—পথে সে জাকের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কল্পনা কাদিয়া বসিল। অতীতের ইতিহাস মন হইতে মুছিয়া জ্যাককে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে, কি উপায়ে,—তাহারই বিবিধ পন্থা নির্দেশ করিয়া সে রীতিমত বক্তৃতা দিয়া চলিল—ইদার অক্ষ মাতৃস্নেহের প্রতিও দুইচারিটা বক্তৃ ইঙ্গিত করিতে ছাড়িল না। ইদার দোষেই, ইদার স্নেহের আভিগম্যে, শাসনের অভাবেই শুধু জাক মাটি হইতেছে, বিবিধ তরু ও মুক্তি তুলিয়া এই কথাটা ই আর্জান্ত স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। পরিশেষে, “হয় তাকে এবাব আমি বশ, নয় চূর্ণ করব” এই কথা বসিয়া আর্জান্ত আপনার বক্তব্যের মাত্রা শেষ করিল।

ইদা কোন জবাব দিল না। পুস্তকে যে কাবার যন্ত্রণা হইতে সে মুক্তি দিতে পারিবে, ইহা ভাবিয়াই তাহার হৃদয়ে আনন্দ দবিতছিল না। আর্জান্ত ইদাকে বুঝাইল, সে একাই অঁয়াঙ্গ্রেয় যাইবে, ইদাকে সেই নীচ লোকগুলার বিক্রপ-দৃষ্টির সম্মুখে কিছুতেই সে দাঁড়াইতে দিবে না—দিলে, ইদার মর্যাদা রক্ষা কবা কঠিন ত হইবেই, তাহার উপর জাকও বিশেষ ফুরু হইতে পারে—হইবেও। সে দারুণ অপমান হয় ত বেচারার সহ্য করিতে পারিবে না! শেষে স্থির হইল, আর্জান্ত টাকা লইয়া ম্যানেজারের সহিত দেখা করিয়া জাককে মুক্ত করিয়া আনিবে,—ইদা ষ্টীমারে তাহাদের জগ্ন প্রতীক্ষা করিবে। এ ব্যবস্থায় ইদা সন্তোষেই সম্মত হইল।

সেদিন রবিবার। পথে ঘাটে বিশ্বাসের এক অপূর্ণ আনন্দ, বিরামের এক গভীর তৃপ্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল। নদীবক্ষে, ষ্টীমারে, নৌকায় নাবিকেব দল গান ধরিয়াছিল। তীর হইতে কুলি ও কারিকরদের হর্ষ-উল্লাসের উচ্ছ্বাসতরঙ্গ ভাসিয়া আসিতেছিল। আর্জান্ত নামিয়া গেলে ষ্টীমারে বসিয়া ইদা শুধু তাহার জাকের কথা ভাবিতেছিল। সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও জাক তাহার ছেলে! কত দুঃসহ মুহূর্তে জাক তাহার প্রাণে প্রথম শাস্তি বহিয়া আনিয়াছে, তাহার তপ্ত প্রাণ শ্রদ্ধা সরল স্নেহে জুড়ইয়া দিয়াছে, জগতে তাহার একমাত্র আপনার, জগতে তাহার সর্ব্বস্ব, সেই প্রাণাধিক পুত্র জাক—ইদা কি কখনও তাহাকে ত্যাগ করিতে

পারে? না। ইহজগতের সকল স্রুগ, সকল ঐশ্বর্যের  
বিনিময়েও জাককে সে ত্যাগ করিবে না, করিতে  
পারে না।

শৈশবের সেই গাল-ভরা হাসি, মার আদরে সেই  
প্ৰথম নিশ্চিন্ত নির্ভরতা—নিখুঁত একখানি ছবির মতই  
ইদার মনে আজ সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল। অজ্ঞানে  
সাইবাব সময় সেই কাতব নয়নের বাক্তীন বেদনা  
কাঁটার মতই আজ ইদার মধ্যে বিধিত্তেছিল। সেই  
জাককে নিখুঁত হ্রদে সে বিদায় দিয়াছে। কারখানার  
কঠিন কাজে জাকের স্বাস্থ্য, না জানি, কতখানি ভাঙ্গিয়া  
পড়িয়াছে। ডাক্তার বিভালের আশঙ্কা সত্যে পরিণত  
হইয়াছে। কেন সে জাককে দুই হাতে চাপিয়া বুকের  
মধ্যে পুঁথিয়া রাখিল না! কোন্ প্রাণে ছেলেকে সে  
মা হইয়া এখানে পাঠাইল। আজিকার কথা ইদা কি  
কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারিয়াছিল?

চারিদিককার এই অভয় উল্লাস-চীৎকাবে তাহার  
প্রাণ অস্থশোচনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। ইহাটাই জাকের  
কথাসঙ্গী—! ইহাদের সঙ্গেই জাক আজ দুই বৎসর  
বাস করিতেছে। মনটাকে বিক্লিপ্ত করিবার অভিপ্রায়ে  
ইদা অর্জাস্ত্র-কথিত সেই সভার ছাপানো বিবরণী-পুস্তক  
পাঠ করিতে লাগিল,—

“বালক-চরিত্র-সংশোধনী সভা

শাসন-আলয়। নির্জন কাবাবাস-ব্যবস্থায় দুই বালক-  
গণকে শিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন নির্জন ক্ষুদ্র গৃহে বন্দী  
রাখিয়া বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হয়। কেহ কাতারও  
মুখ দেখিতে পায় না—মেশা ত দুবেব কথা।

চড়াস্ত্র আয়োজন! পরীক্ষা প্রার্থনীয়!”

অর্জাস্ত্র ইতিমধ্যে তীরে নামিয়া রুদিক-গৃহের খোঁজ  
করিয়া তাহারই অভিমুখে চলিয়াছিল। আপনার ক্ষমতা  
দেখাইবার আজ তাহার কি চমৎকার সুযোগই না  
মিলিয়াছে! অপরাধীকে বক্তৃতার বাণীতে কিরূপ সে  
অভিভূত করিয়া ফেলিবে, ম্যানেজারের নিকট কি ভাষায়  
ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, পথে সে তাহা ভাবিয়া স্থির করিয়া  
ফেলিয়াছিল।

একজন বৃদ্ধা বয়সী অর্জাস্ত্রকে রুদিকের গৃহ  
দেখাইয়া দিল। তাহার নির্দেশ-মত অর্জাস্ত্র আসিয়া  
যখন রুদিক-গৃহের সম্মুখে পৌঁছিল, তখন সে শুনিল,  
ভিতরে গান চলিয়াছে। গান থামিলে কে হাঁকিল,  
“আবে, এদিকে এস, মাস্টার জাক—”

এ কি! জাক তবে হাজতে নাই—এখানে! কবি  
বিস্মিত হইল।

দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই কবি দেখিল,  
সম্মুখের ছোট দালানে রীতিমত মজলিস জমিয়াছে।

সাত-আটজন বালিকাব হাত ধরিয়া জাক মহাফুর্কিতে  
নৃত্য লাগাইয়াছে, এবং অদূরে দেওয়ালে পিঠ দিয়া  
টুলের উপর বসিয়া, এক দীর্ঘকায় নারী! এ আনন্দ-  
উৎসবের অর্থ কি? ব্যাপার—!

ব্যাপার বাহা ঘটয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—  
জাকের মাকে ম্যানেজার যেদিন পত্র লিখিল, তাহার  
পরদিন মাদাম রুদিক উত্তেজিতভাবে ম্যানেজারের  
অফিসের দিকে ছুটিল। বাহিরের কোন বাধা-বিজ্ঞপে  
বিচলিত না হইয়া একেবারে আসিয়া সে ম্যানেজারের  
সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক নিখাসে বলিয়া উঠিল, “মশায়,  
আমি জানি, বেচারী জাক কোন দোষে দোষী নয়।  
এ চুরির দোষ কিছুই জানে না—! জেনেদের টাকা সে  
চুরি কবে নি!”

ম্যানেজার চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল,  
“কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে!”

“প্রমাণ! কোথায় প্রমাণ। কে দিয়েছে, প্রমাণ?  
স্বামী সেদিন বাড়ী ছিলেন না, জাক একা ছিল,—  
এইতেই কি যথেষ্ট প্রমাণ হয়ে গেল? কিন্তু এ প্রমাণ  
আমি মিথ্যা বলে দেখাতে এসেছি। জাক একাই যে  
সেদিন বাড়ী ছিল, তা নয়—আর একজন লোকও  
ছিল—”

“আর একজন? কে—সে? নাস্ত্র—?”

“হা, নাস্ত্র!” ক্লারিসের স্বর এতটুকু কাঁপিল না।  
তাহার মুখে বিষাদের একটা গভীর ছায়া পড়িয়াছিল।

“নাস্ত্র ই তবে এ টাকা চুরি কবেছে?”

ক্লারিসের পাণ্ডু মুখে দ্বিধার একটা রেখা পড়িয়া  
মুহূর্ত্তেই তাহা সরিয়া গেল। অবিচলিত স্বরে সে  
কহিল, “না, নাস্ত্র চুরি করে নি! নাস্ত্র চোর নয়।  
আমিই তাকে এ টাকা নিজের হাতে চুরি করে এনে  
দিয়েছি!”

“হুর্ভাগিনী নারী—”

“সত্যি হুর্ভাগিনী! সে বল্লে, হুদিনের মধ্যেই এ  
টাকা সে শোধ কবে দেবে। আমি হুদিন অপেক্ষা  
করলুম—এ হুদিন আমার স্বামীর দুঃখ, জেনেদের  
চোখের জল, নির্দোষ বেচাবা জাকের লাঞ্ছনা, এ সব  
আমি এই চোখে দেখে সহ করেছি! সে কি কষ্ট!  
কিন্তু কৈ, নাস্ত্র এল না ত! কাল তাকে আমি চিঠি  
দিয়েছি, লিখেছি, আজ ভোরেই মধ্যে যদি সে টাকা দিয়ে  
না যায়, তা হলে সব কথা আমি প্রকাশ করে দেব—!  
তবু সে এল না—তাই আমি আপনার কাছে এসেছি।”

“তাই তুমি এসেছ। কিন্তু আমি কি করতে পারি?”

“কি করতে পারেন! যথার্থ যে চোর, যথার্থ যে  
দোষী, তাকে ধরিয়ে দিন, নির্দোষ যে, তাকে মুক্ত করে  
দিন!”

“কিন্তু তোমার স্বামী—বেচারি কৃদিক! এ কথা শুনলে সে মরে যাবে—”

“ভালই হবে! আমিও তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারব! আমার মত পাবণীর মরাত উচিত! পৃথিবীর পাপের ভার কম হবে।”

ম্যানেজার গম্ভীর স্বরে কহিল, “তোমার মৃত্যু হলেই যদি জেনেদের টাকা পাওয়া যেত ত, তোমার মরণ কামনোবাক্যে আমি প্রার্থনা করতুম। কিন্তু এ আত্মহত্যা নিজেই তুমি গুণ্য মুক্তি পাবে! ব্যাপার সমানই থাকবে। বরং আরও ভাষণ দাঁড়াতে পারে।”

“তবে কি কবব, বলুন।” উত্তেজনার ক্লারিস হাঁপাইতেছিল। তাহার মুখে-চোখে এ কয়দিনে কে যেন ঘন ঘন কাপীর একটা কালো দাগ টানিয়া দিয়াছে।

ম্যানেজার কহিল, “এ টাকার কিছু বোধ হয় এখনও তার হাতে পড়ে আছে—সেটা প্রথমত উদ্ধাব করতে হবে! সব বোধ হয় একেবারে খরচ হয়ে যায় নি?”

ক্লারিস ছাড নাড়িয়া জ্ঞানাইল, কে জানে! এই দুর্দমনীয় জুয়া-খেলায় নেশা নাস্তকে ভরের মত চাপিয়া ধরিয়াছে, তাই ভয় হয়—

ম্যানেজার একজন কর্মচারীকে ডাকাইল। সে আসিলে ম্যানেজার তাহাকে বলিল, “এখনই স্যাঁ-নাঙ্কের দ্ব-চাবজন লোক সঙ্গে করে তুমি মিজে যাও। নাস্তের সঙ্গে দেখা কর। নাস্তকে বলবে, এখনই যেন সে আমার কাছে আসে। তাকে না নিয়ে তোমরা ফিরবে না।”

কর্মচারী কহিল, “নাস্ত, ত অ্যাড্রেসেই আছে। এইমাত্র তাকে কৃদিকেব বাড়ীর কাছে আমি দেখে আসছি—”

“বেশ, তবে শীঘ্র যাও। মাদাম কৃদিক যে এখানে আছে, সে কথা তাকে বলো না—! সাবধান! সে যেন এতটুকু সন্দেহও না করতে পারে! যাও।”

কর্মচারী চলিয়া গেলে ম্যানেজার শূন্য মনে বাতিরের দিকে চাতিয়া বসিল। ক্লারিস স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল। বাহিরে কাবখানায় তখন কাজ চলিয়াছে। বাষ্প-নির্গমের শব্দেও যেন কখনও মিনতি, কখনও অম্লযোগেব সুর ধনিয়া উঠিতেছে! লোহপেটার হৃদয় ভীষণ শব্দ চলিয়াছে! কিন্তু ক্লারিসের অন্তরে আজ যে নানা ভাবের সংগ্রাম-কোলাহল উথিত হইয়াছে, তাহার কাছে বাতিরের এ কোলাহল কিছুই নয়!

দ্বার খুলিয়া নাস্ত ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই সে কহিল, “আমায় ডেকেছেন, আপনি?”

সহসা পার্শ্বস্থিত ক্লারিসের পানে নাস্তের নজর পড়িল। ক্লারিসের বিয়ল্ল স্নান মুখ, ম্যানেজারের রুদ্ধ দৃষ্টি—ব্যাপার বুঝিতে নাস্তের আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

ক্লারিস আপনার কথা বাখিয়াছে তবে,—ম্যানেজারের কাছে সই কথাই সে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে!

নিমেষের জগ্ন নাস্তের শবীরে একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল—একটা পৈশাচিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এখনই এই দুর্ব্বল নারীটাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া, ম্যানেজারকে তাহার এই অনধিকার-চর্চার সমুচিত শাস্তি দিয়া সে পলাইয়া যায়! কিন্তু ক্লারিসের রক্তহীন বিবর্ণ মুখের পানে আর একবার চাহিতেই সে প্রবৃত্তি তাহার অন্তর্হিত হইল। অমৃত্যুতে চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, “আমায় ক্ষমা করুন।” নাস্ত, চোখের জল রোধ করিতে পারিল না।

ম্যানেজার কহিল, “কান্না, ক্ষমা,—ও সব রেখে দাও, নাস্ত! কাজের কথা কও। এই জ্বালোক, গুণ্য তোমাব জগ্ন, তোমারই অম্লযোগে, আপনার স্বামী-কন্নার সর্ব্বশ চুরি করেছে। দুদিনের মধ্যে তোমাব এই টাকা দেবাব কথা ছিল—”

কৃতজ্ঞতায় নাস্ত অভিজ্ঞ হইয়া পড়িল। সে ক্লারিসের পানে আর একবার চাহিল। তাহাকে বক্ষা করিবার জগ্ন মিথ্যা বলিয়া ক্লারিস নিজেই এ চোয়ের অপবাদ মাথায় লইয়াছে! ক্লারিস নত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল—নাস্তের পানে মুগ্ধ তুলিয়া একবারও সে চাহিল না। সেই ভাষণ রাখে নাস্তের সহিত সকল সম্পর্ক সে চুকাইয়া দিয়াছে! আর নূতন করিয়া বন্ধনের কোন প্রয়োজন নাই!

ম্যানেজার কহিল, “কৈ, সে টাকা?”

“এই যে আমি এনেছি—”

ষথার্থই নাস্ত টাকা আনিয়াছিল। গৃহে ক্লারিসকে না দেখিয়া সে তাহারই সন্ধান করিতেছিল, এমন সময় ম্যানেজারের কর্মচারী গিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনে!

ম্যানেজার কহিল, “এতে পূর্বে তিন হাজার আছে?”

“না, চারশ কম—”

“বুঝেছি। এ চারশ টাকা আজ জুয়া খেলবার জগ্ন তুমি রেখেছ!”

“না, ষথার্থ না! এ টাকা আমি হেরে গেছি। কিন্তু শীঘ্রই তা দিয়ে দেব।”

“বেশ! আপাততঃ আমিই না হয় এ টাকা পূরিয়ে দিচ্ছি—পরে তুমি এ চারশ’ টাকা দিয়ে। বেচারী জেনেদের বিয়েরও আর দেবী নেই—তোমার অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। যাই হোক, কৃদিকে জানানো চাই, কেমন করে এ টাকা চুরি গেছে! এখানে বসে সংক্ষেপে তুমি আগাগোড়া সব কথা লিখে দাও—”

কি লিখাইয়া লইবে,—ম্যানেজার তাহাই ভাবিতে-ছিল। নাস্ত কোন কথা না বলিয়া বসিয়া কলম ধরিল। ক্লারিস একবার মথ্য তুলিল! সে ব্যাকুল হইয়া উঠিল!

কি পত্র লিখাইয়া লইবে, এ পত্রের উপর তাহার জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছে যে !

ম্যানেজার কহিল, “নাও, লেখো—ম্যানেজার মশায়, কদিকের আলমারিতে জেনেদেব যে যৌতুকের টাকা ছিল—তা থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা যা চুবি গেছে,—তা আমিই নিয়েছি। অগ্নি লোককে তার জ্ঞান দোষী করবেন না।”

নাস্ত্ একবার আপত্তি করিল, কিন্তু কদিকের তাহার ভয় ছিল। অথচ অগ্নি উপায়ও নাই। কাজেই সে ম্যানেজারের কথামত লিখিতে লাগিল,—

“এ টাকা আমি ফেরত দিলাম। রাখিতে পারিলাম না। এ টাকা আমার সমস্ত মনকে তাড়াইয়া তুলিয়াছে। এক মুহূর্ত্ত আমি শান্তি পাইতেছি না। যে নিরীহ, নির্দোষ বেচারাদেব উপর এই চুরির জ্ঞান নির্ধাতন চাপিতেছে, তাহাদিগকে এই দণ্ডে মুক্তি দিন। তাহাও চুরির কিছুই জানে না। কদিককে বলিবেন, তিনি যেন আমার ক্ষমা করেন। আমি কারখানা ত্যাগ করিলাম। লজ্জার তাহার সন্থিত দেখা করিতে পারিলাম না। যদি কখনও চরিত্র সংশোধন কবিত্তে পারি, ঐকান্তিক পরিশ্রমে কখনও যদি অর্থ উপার্জন কবিত্তে পারি, কবিয়া মাহুষ হই, তবেই আবার কবিয়া সাধু-চরিত্র কদিকের সঙ্গে দেখা করিব, অ্যাঁদ্রেস মুখ দেখাইব, নহিলে চির-শিদিয়া।”

লেখা হইলে ম্যানেজার কহিল, “নাও, সই কব।”

বিনা-বাক্য-ব্যয়ে নাস্ত্ পত্রের তলদেশে নাম স্বাক্ষর করিল। ম্যানেজার কহিল, “এখন তুমি যেতে পার। গোরগীতে যেতে পার—সেখানে আমি তোমার কাজেরও জোগাড় কবে দিতে পারি। মাহুষ হবার চেষ্টা কর, নাস্ত্। আর মনে রেখো, অ্যাঁদ্রেস যদি আর কখনও তোমায় কেটে দেখে, তবে সেই মুহূর্ত্তেই চোব বলে তোমায় ধরিয়ে দেব। তোমার এই চিঠিই তখন তোমার অপবাদের শাস্তি দেবে।”

নাস্ত্ চলিয়া গেল। ম্যানেজার কহিল, “ঘরে যাও, মাদাম কদিক। তোমার স্বামীর জ্ঞান শুধু এ কাজ করলুম আমি—সত্য কথা জানতে পারলে বেচারার প্রাণে দারুণ ঘা লাগবে—”

“সে ঘা না লাগুক! আমি আমার স্বামীকে এবার সমস্ত বেদনা থেকে মুক্তি দেব, স্থির করেছি—”

“তার মানে?”

“এ প্রাণ ত্যাগ করব। জীবনটাকে নানাভাবে আমি জড়িয়ে ফেলেছি—এ বাঁধন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সমস্ত বাঁধন কেটে তাকে আমি মুক্তি দিতে চাই।”

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ম্যানেজার একটা দারুণ আশঙ্কার চিন্তিত হইয়া পড়িল। আশ্বাসের স্বরে ম্যানেজার কহিল, “মাদাম কদিক, মনে সাহস আনো।

এ চিঠি কদিকের হাতে পড়লে তার মনে কতখানি কষ্ট হবে, ভাব দেখি! তার উপর যদি তুমি আশ্রয়তা কব ত, সে আঘাতের বেদনা কদিকের প্রাণে কতখানি বাজবে—তা ভাবছ কি? তাকে শান্তিতে জীবনের এ শেষ কটা দিন থাকতে দাও—আর অভিভূত করো না। যা হয়ে গেছে, তার আর চায়া নেই। ভবিষ্যৎটা যাতে ভালো করে গড়ে তুলতে পারো, তারই চেষ্টা কর। সকলকে সুখে রাখবার চেষ্টা কর—নিজে সুখ পাবে, শান্তিও মিলবে।”

“আপনার কথা রাখবাব চেষ্টা পাব—” বলিয়া মাদাম কদিক ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিল।

কদিক এ পত্র পাঠ করিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইল। নাস্ত্ চুরি কবিয়াছিল? নাস্ত্,—তাহার ভাই? সে চোর! অথচ তাহার পত্নী ক্লারিস এই নাস্ত্কে কত ভালবাসে! যৌতুকেব অর্থ ফিরাইয়া পাইয়া অত্যধিক আনন্দে জেনেদ্ তাহার সকল কষ্টই ভুলিয়া গেল।

আর জাক? বেচারী জাক? তাহার জয়ধ্বনিতে কদিক-গৃহ পবিত্র হইয়া উঠিল। ম্যানেজার স্বহস্তে জাককে নির্দোষিতার বিবরণ লিখিয়া কারখানার সর্বত্র সকলের নিকট তাহা পড়াইয়া শুনাইল। অগ্নায় লাঞ্ছনার জ্ঞান জাককে ডাকিয়া ম্যানেজার তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আর কদিক-গৃহের ক্ষমা ও আদরের আতিশয্যে জাক অভিভূত হইয়া পড়িল।

বেলিসেয়ার মুক্তি পাইয়া নিমেষেই কোথা অদৃশ্য হইয়া গেল।—কাহারও সন্থিত সে সাক্ষাৎ করিল না।

জাকের জ্ঞানই বিশেষ করিয়া আজ কদিক-গৃহে নাচের আসব বসিয়াছিল। কদিক সহস্রবার ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া কবিকে সকল কথা আভোপাস্ত্র ভুলিয়া বলিল। কয়েকটা প্রমাণ নিতান্তই জাকের বিকক্ষে ছিল—নহিলে মনের মধ্যে একবারও সে জাককে অপরাধী ভাবিতে পাবে নাই!

তথাপি আর্জান্ট শাসনের গভীর বাণীতে জাককে জীড়িত করিয়া তুলিল। বাছা বাছা কথা দিয়া যে বক্তৃতাটুকু সে ঠিক কবিয়া আনিয়াছিল, তাহার অব্যবহার ত হইতেই পাবে না। কাজেই আর্জান্টকে কোন-মতে নিরস্ত কবা গেল না। কদিক বারবার বলিতে লাগিল, “ওকে বলবার কিছু নেই—সাহেব। আমবা বারবার ক্ষমা চাইলেও আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।” তথাপি আর্জান্টের মুখে যখন ভাব ও ভাষার বান ডাকিয়াছে, তখন তাহাকে বোধ করে, এমন সাধ্য সেখানে কাহারও ছিল না!

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার একটা ছত্রও জাকের হৃদয়ঙ্গম হইল না—শুধু এইটুকু সে বুঝিল, ‘তাহারই মুক্তির জ্ঞান

কবি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, শুধু আসা না,— সঙ্গে টাকাও আনিয়াছে! এ অর্থ কে দিল, অর্জাস্ত? তাহা মোটেই ভাঙ্গে নাই। জাক ভাবিল, আপনার অর্থ দিয়া অর্জাস্ত? তাহার মুক্তি ক্রয় কবিত্তে আসিয়াছে! এমন হৃদয়বান লোককে বরাবর সে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে! কি অজ্ঞায় সে কবিয়াছে। সম্বন্ধে শ্রদ্ধার আজ অর্জাস্ত?র পায়ে জাকের মন লুটাইয়া পড়িল! অর্জাস্ত? এত মহৎ!

দুই ঘোড়াকে বশে আনিতে পারিলে সওয়ারের যেমন আনন্দ হয়, জাকের এই ভাব দেখিয়া অর্জাস্ত?রও ঠিক ততখানি আনন্দ হইল। সে ভাবিল, “এবার আমি ছোকরাকে বশ করেছি।”

পরে উভয়ে পথে বাহির হইল। মার সংবাদ পাইয়া জাকের প্রাণে আনন্দ যেন ধরিতেছিল না। অর্জাস্ত?র প্রতি তাহার বিশ্বাস আজ এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, জাক কহিল, “কারখানাব কাজ আমার মোটে ভাল লাগে না! কারিকব হতে পারব না, আমি! এই নির্জনতার মধ্যে থেকে, কাককে না দেখে, মাকে না দেখে, আমার মন কেমন ভার হয়ে থাকে, কাজ করতে মোটেই ভাল লাগে না! কাজ যে খুব শক্ত, তানয়, তবে যাতে মাথা খাটানো যায়, এমন কাজই আমার পছন্দ। এখানে যে কাজ, এ সব গায়ের ছোবের— নিতাস্তই কলের কাজ! মোটে মাথা খেলাতে হয় না, এতে সুখও এতটুকু নেই—”

গভীর নিশ্বাসে জাক অর্জাস্ত?র হাতখানি আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। অর্জাস্ত? হাত টানিয়া লইল। সে ভাবিতেছিল, ইদা এখানে আসিয়াছে, এ সংবাদ জাককে সে দিবে কি না! মাতা-পুত্রে সাক্ষাৎ—? কিন্তু না, কিছুতেই তাহা ঘটতে দেওয়া হইবে না। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ইদা জাককে বুক চাপিয়া ধরিল। জগতে জাক ছাড়া ইদা কাহাকেও তেমন অন্তরের সহিত চাহে না! সাক্ষাৎ হইলে অর্জাস্ত?র কথা ইদা একবারও মনে করিবে না— জাককে লইয়াই সে অস্থির হইয়া উঠিবে। আব টাকার কথাও বাহির হইয়া পড়িবে। এ আনন্দ অর্জাস্ত?র প্রাণে সহ হইবে না। ঈর্ষায় তাহার চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। তাহা হইলে এই যে মহত্বের নিশানটা উড়াইয়া দেওয়া গেল, তাহার দশা কি হইবে। সত্য কথাটা জাহির হইলে তখনই সে নিশান ছিঁড়িয়া যাইবে যে! তাই সে স্থির করিল, না, ইদার সহিত জাকের সাক্ষাৎ ঘটতে দেওয়া কিছুতেই বুদ্ধির কাজ হইবে না!

জাকের কথার উত্তরে অর্জাস্ত? কহিল, “তোমার এ কথা শুনে তোমার মার মনে বড় কষ্ট হবে। তাঁর বড় সাধ, তুমি কারিকর হও। যেমন করে পায়, যত কষ্টই

হোক, কারিকর হওয়া তোমার চাই-ই! তোমার ত কতবার বলেছি, জাক—এ জীবন নহেক স্বপন!— কথাটা চিরদিন মনে রেখো, তাহলে ভবিষ্যতে কখনও কষ্ট পাবে না।”

প্রায় একঘণ্টা ধরিয়া উভয়ে পথে পায়চারি করিয়া বেড়াইল। হতভাগ্য জাকের প্রাণ মাকে দেখিবার জগা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে জানিল না—আর কয়েক পদ দূরেই তাহার মা একান্ত উদ্বেগাকুল হৃদয়ে তাহারই মুখখানি দেখিবার জগা অস্থির ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহ, ইঙ্গিতেও যদি এ বখা সে জানিতে পারিত!

ষ্টীমারে প্রতীক্ষা কবা অসহ্য হইয়া উঠায়, ইদা তীব্র নামিয়া ব্যাকুলভাবে জাকের পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল! আজ দুই বৎসর পরে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! আঃ! এমন সময় অর্জাস্ত? ফিরিয়া আসিল! ইদা ভিজ্জাসা কবিল, “জাক?”

অর্জাস্ত? কহিল, “কোন ভাবনা—নেই। সে ছাড়া পেয়েছে। লজ্জায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে না—এত বললুম আমি। আর লজ্জা তার হতেও পারে, —এ রকম একটা অজ্ঞায় করে ফেলেছে! ছাড়া পেয়েই কোথায় যে ছুটে পালিয়ে গেল! তারপর আমিও ভাবলুম, তোমার সঙ্গে দেখা হলে হয়ত মন খারাপ হতে পারে, কাজে মন বসতে আবার কিছুদিন লাগবে—এখন দেখা করতে চাচ্ছে না! বখন, তখন থাক না হয়! কাজেই আর পেড়াপেড়ি করলুম না,—সন্ধানও নিলুম না—”

ইদা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। একটা অসহ্য বেদনায় তাহার বুক ভরিয়া গিয়াছিল, মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

আজ এত কাছে আসিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর পরেও, পুত্রের সহিত দেখা হইল না! এত কাছে, যে, একবার চীৎকার করিয়া ডাকিলেই শুনা যায়! কে জানে, কবে আবার দেখা হইবে! মাতার অতৃপ্ত হৃদয়ের কাতর দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল। ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### সমুদ্র-যাত্রা

দুঃখের দিন দীর্ঘ বোধ হইলেও, কোনমতে কাটিয়া যায়। জাকের দিনও কাটিয়া যাইতেছিল।

উক্ত ঘটনার পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। জেনেদ বিবাহেব পব স্বামীর গৃহে গিয়াছে। এ দুই বৎসরে জাক আপনার দুর্বল বাহু দুইটাকে কারখানার কাজে দড় করিয়া তুলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে।

তাহার শিক্ষানবীশীর যুগ কাটিয়া গিয়াছে। এখন সে কারখানায় কাজ করিয়া বেতন পায়। বেতন সামান্য—কাজের অনুরূপে অপর কারিকবেব মত জাক হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিতে পারে না; হাতুড়ি পিটিতে পিটিতে অঙ্গলক্ষণের মধ্যেই তাহার হাত ভারিয়া যায়, সর্ব্ব দেহ হইতে ঘাম ঝরিয়া পড়ে। কাজ করিয়া তাহার করতল দুইটা কঠিন পকষ হইয়া উঠিয়াছে; হাতে কড়া পড়িয়াছে। দিনের শেষে দেহটাকে কোনমতে টানিয়া সে কদিকের গৃহে ফিরে, তার পর আতাবাদি করিয়া শুইয়া পড়ে। আবার ভোবেই গাত্রোথান করিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। কাহারও সহিত মিশিতে বা গল্প করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। জীবনটা নিচাস্তই ক্ষুণ্ণিত, লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কদিক-গৃহেও ইদানীং কেমন-একটা স্তব্ধতা বিরাজ করিত। জেনেদ চলিয়া যাওয়ায় তাহার ঘর খালি পড়িয়া রহিয়াছে। মাদাম কদিকও আব ঘবেব বাহির হয় না, বা কাহারও প্রতীক্ষায় ঘবেব মধ্যেও সে বসিয়া থাকে না! পূর্ব্ব-গাত্র-নিঃসৃত নিষ্করীণী যেমন আপনার বেগে আপনাই বহিয়া যায়, কোনদিকে লক্ষ্য রাখে না, মাদাম কদিকের জীবনটাও তেমনইভাবে বহিয়া চলিয়াছিল। কোন দিকে আব তাহার লক্ষ্য ছিল না, জীবনে বৈচিত্র্যও ছিল না। কদিক আপনার কর্তব্য পথে তেমনই অচপল স্থির লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নির্বাহ করিতেছিল। এই শান্ত ক্ষুদ্র পরিবারটির উপর দিয়া সত্ত্ব যে একটা উদ্দাম ঝড় বহিয়া গিয়াছে, গৃহখানি প্রতি একটু মনোযোগ-দৃষ্টি স্থাপন কাবলে সহজেই তাহা বুঝা যায়।

জাকের জীবনে ইতিমধ্যে ছোট একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ঘটনাটি নিত্য সামান্য হইলেও প্রভাব তাহার যথেষ্ট ছিল। এবার শীতটা প্রচণ্ড পড়িয়াছিল, বর্ষাও বীতিমত নামিয়াছিল। সহরের পথ-ঘাট বহুদিন চলময় ছিল। কাজ-কর্ম তাহারই মধ্যে সাধা হইতেছিল।—সেই ঠাণ্ডা লাগিয়া জাকের অতিরিক্ত সর্দি-কাশি হইয়া পড়িল। সপ্তাহাধিক কাল জ্ব-গায়ে কারখানায় তাহাকে কাজ করিতে হইয়াছিল—তার পর একেবারে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারিল না। সামান্য জ্বর ও কাশি লাগিয়াই রহিল; মধ্যে মধ্যে বাড়ত। মাব কাছ হইতে পত্রাদিও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মার চিঠিতে জাক জানিয়াছিল, আর্জান্ট'ব কাজের ভিড়ে পত্র লিখিবার বিজন অবসব তাঁহার একরূপ দৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি জাকেব চিন্তা তাহার মনে অহরহই জাগিয়া আছে। জাক যেন পূর্ব্বের মতই নিয়মিত পত্রাদি লিখিয়া মাতার ভাবনা দূর করে! কবি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া “ফষ্টের কন্ঠা” নাটকের রচনা শেষ

করিয়াছেন। প্রকাণ্ড পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাটকখানি কয়েকটি থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকে দেখানও হইয়াছে, কিন্তু এই সব স্বার্থ-সর্ব্বস্ব দুর্য্যন্ত লোকগুলা আশ্চর্য্য স্পর্ধা দেখাইয়া বহিষ্কারি ফেরত দিয়াছে। কবি তাহাতে একান্তই কাতব মগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু প্রতিভার বাণী একবার বাহাব হৃদয়ে সাড়া দিয়াছে, এ সকল তুচ্ছ অবহেলা! কি কখনও তাহাকে বাধা দিতে পারে? কবি তাই মোরোন্ডা প্রভৃতির সাহায্যে এক অপূর্ব্ব সাধনায় ব্রতী হইয়াছেন। যেদিন সে সাধনার কথা জগতে প্রচার হইবে, সেদিন একটা অস্বাভাবিক কৌতূহলে শুধু সাধা পারির অধিবাসী নহে, সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত চকিত হইয়া উঠিবে! সে শুভদিনও আসন্নপ্রায়!

মোরোন্ডা, মাত, জিম-নাজ! সে আজ কতদিনের কথাই বা! তত দুঃখের মধ্যেও সে কি সুখে দিন কাটিত! জিম্নাজের জাক ও কারখানার জাক, দুইজনে কত প্রভেদ! জিম্নাজের জাক—সে এক শাস্ত, সুসভ্য কোমল ভদ্র বালক আর কারখানার জাক—হাড়গুলা উঠিয়া পড়িয়াছে, হাত কড়া কঠিন হইয়াছে, অগ্নিব তাপে থাকিয়া দেহের বর্ণ মলিন কদর্য হইয়া গিয়াছে। ডাক্তার রিভালের কথাই আজ বর্ণে বর্ণে ফলিয়া উঠিয়াছে! সামাজিক সম্পর্কই মানুষে-মানুষে বিভিন্নতা আনে, ব্যবধানের সৃষ্টি করে!

রিভাল গৃহের স্মৃতিতে সহসা জাকের চিত্ত আজ বেদনায় ভারিয়া উঠিল। আর্জান্ট'ব সহস্র নিবেদ-সন্তো ও রিভালকে সে ভুলিতে পারে নাই। জাকের জীবনের একাংশ বাহা কিছু শুভ্র উজ্জ্বল ছিল, তাহা রিভালের স্নেহ কিরণ-স্পর্শেই! প্রাতঃবর্ষের প্রথম দিনটিতে রিভাল-পরিবাবের শুভ কামনা করিয়া জাক রিভালকে পত্র লিখিত। তাহার উত্তরও আসিত। সে কি মধুর আশ্বাস-পরিপূর্ণ স্নেহের উজ্জ্বলিত বাণী! এ বৎসর কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই! কেন? তাহারা কুশলে আছে ত? কে জানে! আর সেসিল! সেসিলের নাম-মনে পড়িবামাত্র জাকেব নয়ন-পল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল!

এই শৃগভাব হতাশার মধ্যে একটি কথা শুধু জাকের প্রাণে শক্তির সঞ্চার করিত। সে তাহার মাতার কাতর অনুরোধ—মা লিখিয়াছিল, “জাক, আপনার দিন কিনিয়া নাও, মানুষ হও, রাজগার-ক্ষম হও। যেদিন তুমি আমার ভার লইতে পারিবে, সেই দিন আমি সুখী হইব—সেই দিন আমার সকল দুঃখ ঘুচিবে।”

কি করিয়া মার দুঃখ ঘুচাইবে সে? মাহিনা অতি সামান্য, কাজ করিবাব শক্তিও তাহার অল্প; হুতরাং বেতন-বৃদ্ধির আশা নিত্যই ক্ষীণ! শাস্ত নব্র প্রিয়দর্শন

হইলে কি হইবে! কাজ চাই! কাজ কর, মাহিনা মিলিবে, মাহিনা বাড়িবে। সেকপভাবে কাজ করিবার শক্তিই বা হুর্দল জাকের কোথায়! লাবাস্ত্রের আশাস-সংকেত জাক তেমন কর্তৃক হইয়া উঠিল না—সে সম্ভাবনাও মোটে ছিল না। এই সতেরো বৎসর বয়সে শিক্ষানবীশীর যুগ কাটাওয়া সে দৈনিক আর্থ ক্রাউনের বেশী উপার্জন করিতে পারিত না। এই আর্থ ক্রাউনের উপর নির্ভর করিয়াই তাকে বাসা-খরচ জোগাইতে হইবে, তাহার উপর কাপড়-চোপড় এবং রোগ হইলে পথ্যাদিও আছে! অসম্ভব! অসম্ভব! এ জীবনে উন্নতির কোন আশা নাই। মা আজ যদি সহসা লিখিয়া বসেন, “জাক, আমি তোমার কাছে যাইতেছি—?”

কদিক একদিন জাককে ডাকিয়া কহিল, “এ কাজে এসে তুমি ভাল কবনি, জাক! ভদ্রলোকের ছেলের কি এ কাজ পোষায়? উন্নতির আশা ত কিছু দেখছি না, তোমার। আমি হলে এখানে পড়ে না থেকে অল্প কোনরকমে চেষ্টা দেখতুম। এক কাজ করবে, জাক—” সিদু জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার সেদিন একটি লোকের কথা বলছিলেন—এঞ্জিনের জন্ম তাঁর একজন লোক চাই। দিনে পাঁচ সিলিং মাহিনা। সারা পৃথিবী ঘূবে,—খাওয়া-দাওয়াও আলাদা পাবে! কাজটা প্রথমে শক্ত বোধ হবে, কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ভবিষ্যতে উন্নতির এতে খুবই সম্ভাবনা আছে! চাই কি, একদিন জাহাজের কাপ্তেনও হতে পার। করবে, এ কাজ?”

সানন্দ চিন্তে জাক সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

মাসিক সাড়ে সাত পাউণ্ড মাহিনায় আরম্ভ! সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ! জাকের চিন্তা উল্লাসে ভরিয়া উঠিল। মাহুর নিকট হইতে অজানা কত দেশের কত বিচিত্র কাহিনী সে শুনিয়াছিল। শৈশবে দুই-চাৰিটা রূপকথায় পবীর দেশের স্মরণের স্বপ্নের কাহিনী শুনিয়া কি মোহে তাহার চিন্তা মাতিয়া উঠিত, আজ জাকের তাহাই মনে পড়িল। প্রথমে এঞ্জিনে কয়লা দিবার কাজ করিতে হইবে—তাহাতে কি আসিয়া যায়! পরিশ্রম এখানকার চেয়ে লঘু হইবেত। উন্নতিরও আশা আছে!

চার বৎসর পরে একদিন প্রভাতে মাদাম কদিকের কাছ হইতে বিদায় লইয়া কদিকেব সহিত জাক অ্যাঙ্গে ত্যাগ করিল। সেদিনকার প্রভাত কি স্নিগ্ধ স্মরণ স্মৃতিতে জাগিয়া উঠিয়াছিল!

ছোট শীমারের ডেকে দাঁড়াইয়া জাক চাষিধারে অপূর্ণ দৃষ্ট দেখিতে দেখিতে চলিল। নদীর জল ফুলিয়া ফুলিয়া শীমারের বিপরীত দিকে চলিয়াছে। ক্রমেই তাহার বিস্তারিত দেহ চোখের সম্মুখে জাগিয়া উঠিতেছে। বায়ু নির্মল, জল পরিষ্কার, আকাশ বোঁদ্রে বজ্রিত! দূরে তীব্র-প্রাস্তে বৃক্ষগুলার উচ্চতা ক্রমেই হ্রস্ব হইতেছে, পর্বতের

ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া একটা দীর্ঘ শ্রামল দেওয়ালের মতই দেখাইতেছে। মাঝে মাঝে কবিত ক্ষেত্রের পর বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন জলাভূমি। কোথাও নদীর তীরে সারি সারি মিলেব চিমনি হইতে ঘন-কৃষ্ণ ধূম নির্গত হইয়া একদিক-কার আকাশটাকে মসী-নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে। বায়োস্কেপের ছবির মতই একটির পর আর একটি বিচিত্র দৃশ্য আসিয়া নয়ন-মনেব তৃপ্তি সাধন করিতেছে! নদী ছাড়িয়া শীমাব ক্রমে সাগরের মুখে আসিয়া পড়িল। তরঙ্গের কি এ উদ্দাম উদ্দাম নৃত্য! ভুবন্ত শিশুর মতই বায়ু সহর্ষে সে নৃত্যলীলায় যোগ দিয়াছে! জল লইরা মহানন্দে সে লোফালুফি স্রব করিয়াছে!

জাক পূর্বে কখনও সমুদ্র দেখে নাই। জল, জল! চারিধারে যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবলই জল! অনন্ত অসীম পাবাধার। তবঙ্গের পর তবঙ্গ ছুটিয়া চলিয়াছে—যেন বিপুল হর্ষ ঠিকরিয়া উঠিতেছে। ভ্রমণেব নেশা জাককে বিভোর উদ্দাম করিয়া তুলিল।

ক্রমে অদূরে দক্ষিণে পর্বতের ক্রোড়ে স্যাঁ-নাজেয়ারের গৃহ-চূড়াগুলি ফুটিয়া উঠিল। অগণিত মাস্তুল-শিব! দেখিলে মনে হয়, কে যেন আকাশের গায়ে কালিব অজস্র রেখা টানিয়া দিয়াছে। শীমাব আসিয়া একটা জেটিতে লাগিল। জেটির কাছে আশে-পাশে প্রকাণ্ড সব জাহাজ দাঁড়াইয়াছিল,—এক-একটা যেন বিবট দুর্গ, যেমন স্তম্ভব, তেমনি দৃঢ়।

কদিক ও জাক জেটিতে নামিল। সেখানে উঠয়ে শুনিল, সিদু জাহাজ সেই দিনই দুই-তিন ঘণ্টা পরে জেটি ছাড়িবে। জাককে লইয়া কদিক তখন ইঞ্জিনিয়ারের সহিত দেখা করিল। জাককে দেখিয়া ইঞ্জিনিয়ার কহিল, “ছোকরাটির শরীর তেমন মজবুত নয়, বোধ হচ্ছে, রোগা দেখছি ত।”

কদিক কহিল, “সম্প্রতি ওর জব হয়েছিল। জাহাজে থাকতে থাকতেই এটা সেবে যাবে। সমুদ্রের হাওয়ায় স্বাস্থ্যও ভাল হবে।”

“বেশ! বেশী কথা কবার এখন আর সময় নেই, কদিক! মাহিনার সম্বন্ধে কথা হয়ে গেছে ত? আপাততঃ পাঁচ সিলিং। আব কাজ—”

“হাঁ, সে সব কথা আমি বলেছি।”

“বেশ, ছোকরার নাম কি?”

“জাক!”

জাককে জাহাজে রাখিয়া কদিক বিদায় লইল। জাহাজ দেখিয়া জাক বিষয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অসংখ্য লোকজন! সকলেই দাক্ষণ ব্যস্ত! ভিতরে কল-কন্ডারও সংখ্যা নাই। কি, এ ব্যাপার!

জাককে সঙ্গে লইয়া ইঞ্জিনিয়ার অনেকগুলো সোপান অতিক্রম করিয়া নিম্নতলে এঞ্জিন-কক্ষে আসিল, একটা



কৃষ্ণগঙ্গার দেখাইয়া কহিল, “এখানে কয়লা আছে। এটা বয়লার, এতে কয়লা জোগাতে হবে। এই তোমার কাজ !”

বয়লাব ! চাহিয়া জাক দেখে, এ যেন এক সুদীর্ঘ অগ্নির হ্রদ ! অনলের লেলিহান রসন ! ভীষণ দৈত্য-রসনার মতই লক-লক করিতেছে ! সেখানে যাহারা কাজ করিতেছে,—তাহাদের মুখ, নগ্ন বুক ও পোষাক কয়লার গুঁড়ায় বিকট কালো ! দেখিয়া মনে হয়, ইহারা যেন একটা ভীষণ প্রলয়-সামনের চেষ্টায় এই নরকের মধ্যে গোপনে কি বড়বস্ত্র লাগাইয়া দিয়াছে।

সর্দারকে ডাকিয়া ইঞ্জিনিয়ার বলিয়া দিল, “এই ছোকরা তোমার এখানে কাজ করবে—এর নাম, জাক।”

সর্দার কহিল, “খুব সময়ে এসেছে—কয়লা দেবার জন্ম এখনই আমাদের একজন লোক চাই। এস জাক।”

জাক কাজে লাগিয়া গেল। বড় খোন্তার সাহায্যে ভস্ম-স্তুপের সহিত দক্ষ কয়লার বাশি বয়লার হইতে টানিয়া বাহির করিতে হইবে। পরে ঝোড়ায় বহিয়া, সেই কয়লা ডেকে উঠাইয়া আনিয়া, সেখান হইতে সাগর-বক্ষে তাহা ফেলিয়া দেওয়া,—এই তাহার কাজ ! কাজটি কঠিন। ঝোড়ায় বোঝাই যাত্রা দেওয়া হয়, তাহা রীতিমত ভারী, সোপান-শ্রেণীও দীর্ঘ এবং সক। তাহা ছাড়া উপরকার মুক্ত শীতল বায়ু ছাড়া এই অন্ধকূপে বন্ধ উত্তপ্ত বায়ুও মধ্যে নামিয়া আসিবার সময় নিশ্বাস যেন বন্ধ হইয়া আসে। এক বাব, দুই বাব জাক ঝোড়া বহিল। তৃতীয় বাব পা আর তাহার উঠিতে চাহে না। ঝোড়া তুলিতে না পারিয়া ক্লান্তভাবে সে বসিয়া পড়িল। ঘামে সর্দার ভিজিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস সজোবে বহিতেছে। একজন সহকর্মী আসিয়া কহিল, “নাও, একটু ব্রাণ্ডি খাও দেখি—”

জাক কহিল, “আমি ব্রাণ্ডি খাই না।”

“খাও না ? তবেই এখানে কাজ কবেছ, তুমি। এ খাটুনি তবে সবই, কি করে ? কখনও খাও না ?”

“না।” জাকের বেশীগুলো একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিল। চেষ্টা করিয়া কোন মতে সে কয়লার ঝোড়া পৃষ্ঠে তুলিয়া আবার উঠিল।

ডেকের শোভা তখন পরম বর্মণীয় হইয়া উঠিয়াছে। বিচিত্র বেশ-ধারী যাত্রীর দল ডেকে সমাগত হইয়াছে। তাহাদের আনন্দ দেখিয়া জাকে মনে হইল, এই প্রকাণ্ড জাহাজ যেন একটা ভূখণ্ড,—কত দেশের কত জাতির লোক এখানে একত্র আসিয়া মিলিয়াছে। কাহারও মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, কাহারও বা আসন্ন বিদায়-দুঃখে বিষন্ন, মলিন।

জাক তন্দ্রাবিষ্টের মত শূন্য ঝোড়া হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সম্মুখ দিয়া এক নারী সুলভ পরিচ্ছদে ভূষিত এক বালকের হাত ধরিয়া চলিয়া

গেল। দেখিয়া জাকে এক অতীত দিনের কথা মনে পড়িল,—যখন সে মার হাত ধরিয়া নির্মল প্রফুল্ল চিত্তে এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত ! নারীটি যেন তাহার মায় প্রতীবিশ্ব। আব এই বালক যেন অতীত দিনেরই সেই সজ্জিত সুন্দর জাক ! বালকের পরিচ্ছদ জাকের গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা দেখিয়া নারী বালককে ভৎসনা করিয়া উঠিল, “দেখে চলতে পারিস্নে। এখনই এই খালাশিটাব গায়ের সমস্ত কয়লা পোষাকে লাগিয়েছিল আর কি !”

মুহূর্ত্তে জাকের চেতনা হইল। নিম্নে সে দেখিল, কোথায় তাহার স্থান। তাহার স্পর্শও আজ কতখানি অবজার, কি চেয়ে। তায় দিক, এ তীন জীবনে !

জাহাজের ক্যাপ্টেন ডাকিয়া উঠিল, “দাঁড়িয়ে কি তামাসা দেখছ হে ছোকরা ? যাও, নিজের কাজে যাও।”

জাকে বুকটা ধক্ক করিয়া উঠিল। সে আপনার কাজে নীচে নামিয়া গেল। সেই আবর্জনারময় অনল-কুণ্ডই এখন তাহার যোগ্য স্থান !

জাকের জীবন-ইতিহাসে এ এক নূতন পৃষ্ঠা আজ খুলিয়া গেল। কালি-ঝুলমাখা সঙ্গীদের সহিত কালি-ঝুলি মাখিয়া এই অনল-গহবরে বসিয়াই তাহাকে জীবন কাটাইতে হইবে। অল্প উপায়ই বাকি আছে ? মিছা দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই। মনে শক্তি আনিয়া জাক কাজ করিতে লাগিল। কাছ করিতে করিতে তাহার মনে হইত, সে যেন অন্ধ বদির হইয়া গিয়াছে, জীবন-শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে ! শুধু একটা যন্ত্রের মত দম খাইয়া সে কাজ করিয়া চলিয়াছে ! অপরে যাহা কবে, তাহা দেখিয়া সেইরূপেই সে কাজ করিয়া যায় ! শ্রাস্ত হইলে সকলে একটা নলের ধারে গিয়া সবলে নলটা টিপিয়া ধরে এবং উপর হইতে বাহিরের মুক্ত বায়ু একটা ঝলক আসে। সেইটুকু পরম তৃপ্তির সহিত সকলে উপভোগ করে ! সেও সেইরূপ করিত ! ‘আঃ, কি সুন্দর ! সমস্ত শরীর যেন জুড়াইয়া যায়। তার পর ব্রাণ্ডি ! একটু পান না কাঁবলে চলে না, সত্যি ক্লান্তি ঘুচে না। অগত্যা জাকে ব্রাণ্ডি পান করিতে হইল। পান করিয়া সে যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

এই ঘনাক্ষর জীবনে আলোর ক্ষুদ্র বিস্মৃ মাঝে মাঝে অন্তবে তাহার জাগিয়া উঠিত। সে তাহার মার চিন্তা ! মাকে ইদানীং সে দেবীর মত আপনাব হৃদয়-মন্দিরে একান্ত ভক্তির সহিত প্রীতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা করিত ! মাকে স্মৃতি করিতে হইবে—ইহা ভাবিয়াই জাক আপনাব কষ্টকে বস্তু বলিয়া গ্রাহ করিতে না। মায় দুঃখ কিছূও যদি সে ঘুচাইতে পারে ত সে কি সুখ !

বন্দরে জাহাজ থামিলেই জাক একখানি করিয়া মার চিঠি পায় ! অমনই তাহার সকল শ্রাস্তি ঘুচিয়া

যায়। জাকের পত্র এক্ষণে স্বপ্ন ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া ইদা প্রায়ই অযুযোগ করিত। কিন্তু জাক সত্যই অবসর পাইত না। ইদাব পত্র আর্জান্টুর সংবাদেই পূর্ণ থাকিত। ইদা এতিয়োল ছাড়িয়া পারিতে গৃহ লইয়াছে। পারিতে বাস কবিবার প্রয়োজনও হইয়াছে। মোবোনভা প্রভৃতিব সাহায্যে একটি নূতন সাহিত্য-সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মোবোনভা প্রভৃতি তাহার তত্ত্বাবধান কবে। তন্নিম্ন ইদা লিখিয়াছে, “এতদিনে দেশের এক গুরুতব অভাব মোচন হল। বন্ধু-বান্ধবদের নিতান্ত আগ্রহে আর্জান্টুর একখানা মাসিকপত্র বার করছেন। কাগজখানা দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলোচনায় পূর্ণ থাকবে। নতুন প্রতিভাশালী লেখকদের উৎসাহ দেওয়াই এ পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য! যে সব বিখ্যাত মাসিক পত্র আছে, তাদের অহঙ্কার বড় বেশী, আব তা-ছাড়া তাদের সব সম্পাদকরা এমন পরশ্রীকাতর যে নতুন লেখকদের কোনরকম উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, তাদের দমিয়ে চুটিয়ে দেবার জগাই সর্ব্বনা সব প্রস্তুত। এতে কবিবরও একটা উপকার হবে। তাঁর লেখা এবার থেকে লোকে পড়বে, তাঁকে সবাই চিনবে! কি অমূল্য সম্পদ সাহিত্যে তিনি দান করছেন, এবার তাবা বুঝবে! আমিও এ বিষয়ে বতটুকু পাবি তাঁকে সাহায্য করছি। মোবোনভা বেশ একটি স্বন্দর প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি এখন “ফষ্টের কল্যা” নাটকখানা নকল করছি। কাগজ বেরুলেই তোমায় পাঠাব। তোমাকে অনেক দিন দেখিনি—বড় দেখবার ইচ্ছা হয়। সুবিধামত তোমার একখানা ছবি তুলিয়ে আমায় পাঠিয়ে—তা দেখেও আমার প্রাণ কতক ঠাণ্ডা হবে।”

ইতার কয়দিন পরে জাহাজ যখন হাভানায় আসিয়া নোঙর ফেলিল, তখন পোষ্ট অফিস হইতে জাক এক প্রকাণ্ড প্যাকেট পাইল। মোড়ক খুলিয়া জাক দেখে, একখানি দীর্ঘাকৃতি গ্রন্থ,—আর্জান্টুর সম্পাদিত মাসিক-পত্রিকার প্রথম সংখ্যা। লেখা আছে,

ভবিষ্য জাতির আলোচনা

মাসিক-পত্র

কবিবর আর্জান্টুর সম্পাদিত

সূচী

বিষয়	লেখক
আমরা বাচা আছি, এবং যাচা হইব	..
ফষ্টের কল্যা—নাটক—প্রস্তাবনা	কবি আর্জান্টুর
উপনিবেশে শিক্ষাবিস্তার	এভারিস্ত মোবোনভা
ভবিষ্য যুগের কারিকর	... লাবান্ত্রান্স
পুষ্প-স্বপ্নের সাহায্যে রোগ-চিকিৎসা	ডাক্তার হার্বুজ
অপেরা হাউসের ম্যানেজারের প্রতি	
একখানি পত্র	... এল।

জাক একবার পাঠাংশা উল্টাইয়া গেল। পড়িয়া সে কিছুই বুঝিল না। কতকগুলো হুর্কোথ কথার সমষ্টিমাত্র। কালির অক্ষরে কে যেন শুধু হেয়ালিব জাল বনিয়া গিয়াছে। কভারটা বেশ রঙ্গিন কালীতে পরিপাটি করিয়া চাপা হইয়াছে।

সূচীতে লেখকদের নাম পড়িয়া রাগে জাকের শরীর জলিয়া উঠিল। দারুণ অভিসম্পাতে লেখকগুলোকে অভিশপ্ত করিয়া অশ্রুট স্বরে সে বলিল, “লক্ষ্মীছাড়া, পাষণ্ড সব! আমার জীবনটাকে এরাই ক’জন মিলে একেবারে নষ্ট কবে দিলে!” তখনই তাহার মনে হইল, এ অভিসম্পাতে ফল কি? তাহাদেব ইহাতে এতটুকু ক্ষতি হইবে না—যত্নবায় শুধু তাহাবই বৃকের অস্থি-পঙ্খবগুলা চূর্ণ হইয়া যাইবে! মাসিক-পত্রখানা ছিঁড়িয়া পাকাইয়া সজোবে সে জলে ফেলিয়া দিল।

তার পব যত দিন বাইতে লাগিল, আপনাকে যতই নিরুপায় অসহায় বলিয়া জাক বুঝিতে পারিল, কাজের দিকে ততই তাহাব উৎসাহ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কোথা হইতে শরাবে শক্তিও আসিয়া জুটিতেছিল। কাজ করিতে করিতে ভবিষ্যতের এক শুখ-কল্পনায় সে বিভোর হইয়া উঠিত, তাহাব টাকা হইয়াছে, ছোট একখানি কুটাবে সে বাস কবে, মা আসিয়াছে,—আর,—আর একটি মুখের সুখ-মাখা কথায়, স্নেহ-হাস্ত-কিরণ-পাতে সে ঘরখানি মধুব উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে। সে মুখ সেসিলের!

এমনই স্বপ্নে জাহাজের সেই কল্প অন্ধ-কূপে একদিন যখন সে বিভোর ছিল, সহসা তখন এক প্রচণ্ড আঘাতে সমস্ত জাহাজ কাঁপিয়া জুলিয়া উঠিল। উপর হইতে একটা ভীত চকিত কোলাহল নামিয়া আসিল। তাহারই ক্ষণে প্রতিধ্বনি অন্ধকূপস্থ লোকগুলার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাকও তাহা শুনিল।

ব্যাপার কি বুঝিবার জগ্গ উদ্‌গীর্বভাবে সকলে উপরে উঠিয়া আসিবে, এমন সময় উপরে সোপানের সম্মুখেই—ইঞ্জিনিয়ারের বজ্রগম্ভীর বাণী ধ্বনিয়া উঠিল, “খবরদার, উপরে আসবার চেষ্টা করেছ কি, এই পিস্তলের গুলিতে মাথা উড়িয়েছি!” ইঞ্জিনিয়ারের তাতে পিস্তল।

ইপাইতে ইপাইতে একজন কহিল, “কি হয়েছে?”

“একখানা মার্কিন জাহাজ আমাদের জাহাজের উপর এসে পড়েছিল। ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে গেছে—ডুবছে। শীঘ্র যাও, কসে দম দাও—ডাক্তার দিকে যতটা পৌঁছতে পারি! ডাক্তারও বেশী দূরে নয়।”

সকলে আপন আপন স্থানে ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে কল চলিতে লাগিল। এঞ্জিন-কক্ষ ভয়ানক তপ্ত হইয়া উঠিল। কয়লা, কয়লা, কয়লা দাও! কয়লা দাও! আবার দাও! ক্রমে উত্তাপ অসহ্য হইয়া উঠিল। রক্তের মত লাল আগুন দাঁউ দাঁউ করিয়া

জলিতে লাগিল। চালাও কল, চালাও, পুরা দমে চালাও !

জাক ভাবিতেছিল, মরিতে হইবে, কিন্তু কি এ মৃত্যু! আকাশ নাই, বাতাস নাই, এই রুদ্ধ অনল-গহ্বরে বসিয়া কি শোচনীয় অসহায়ভাবেই মৃত্যুব হাতে আজ আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। দুই ধারে লৌহ-নির্মিত সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর—আত্মহত্যার চেয়েও যে এ মৃত্যু ভীষণ নিষ্ঠুর !

সব শেষ! পম্প্-আব চলে না। আগুন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে! লোকগুলার কাঁধ অবধি জ্বল উঠিয়াছে। জাহাজ দ্রুত জ্বল-গর্ভে নামিয়া পড়িতেছে—এমন সময় সোপান-সম্মুখ হইতে ইঞ্জিনিয়ার টাংকার স্বরে হাঁকিল, “ছুটে এস, উঠে এস, নিজের নিজের প্রাণ বাঁচাও।”

## অফিম পরিচ্ছেদ

### প্রত্যাবর্তন

পারিতো কে দে জোগীন্ত্যার মধ্য দিয়া যে দীর্ঘ সড় গলি গিয়াছে, তাহার দুই ধায়ে নূতন ও পুরাতন বিস্তব বট্টেঘর দোকান। সেই দোকানো সারির মধ্যে থাম-ওয়ালা এক প্রাচীন অট্টালিকায় “ভবিষ্য জাতিব আলোচনা” মাসিক-পত্রের কার্যালয়।

অনেক খুঁজিয়া বাছিয়া এই বাড়ীটিই কার্যালয়ের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছিল। এ পাড়ায় নূতন মাসিক-পত্রের কার্যালয় খাড়া করা পাবি সহরের চির-প্রচলিত রীতি। ইহাতে সুবিধাও বিস্তর। সহরের ঠিক বৃক্কের উপর নানা বিচিত্র অক্ষবে নব-প্রকাশিত গ্রন্থাবলির মন-জ্বলানো বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে গ্রন্থ-পিপাসু পাঠ-কেব সম্মুখে প্রলোভনের জাল পাতিয়া রাখিলে লাভের আশা বিলক্ষণ, তাই মোরোন্ডা-আর্জান্ত কোম্পানি পত্রিকার কার্যালয়স্থাপনের জগ্গ এই স্থানটিই নির্বাচন করিয়াছিল।

“ভবিষ্য-জাতিব আলোচনা” কর্তৃপক্ষগণ পুরোহিত। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-সভার দ্বার নূতন লেখকগণের সম্মুখে অবিরত ছিল। দেশের প্রাচীন মাসিকপত্রগুলার ক্রুর হিংসা ও অবজ্ঞার সহিত যাহাদের রচনা দূরে নিক্ষেপ করিত, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়াই মোরোন্ডা-আর্জান্ত কোম্পানির প্রধান ব্রত ছিল। কার্যালয়টি মাসিক-পত্রের গোবব-বোধবার পক্ষেও যথেষ্ট অহুকূল ছিল—বালি-ঝরা দেওয়াল, অপবিচ্ছন্ন ঘর-দ্বার, জীর্ণ মোটী থাম, সেন্টো জমি কাগজের একটা মিশ্র দুর্গন্ধ এবং সর্বপ্রকার পারিপাট্যের অভাব কাগজখানির সস্ত্রম-রক্ষার উপযোগী বলিয়া কর্তৃপক্ষের ধারণা থাকিলেও কাগজের গ্রাহক

জুটিতেছিল না। অক্ষম, বিতাড়িত লেখকগণের কোলাহলে কার্যালয় সাবাদিন গম্-গম্ করিত। “মশায় আমার পছটা কবে ছাপাবেন?” “আমার গল্প?” “আমার প্রবন্ধটা দেখবেন? পঁচিশ বছরের মধ্যে কারও মাথা থেকে এমন লেখা বেরোয়নি।” এইরূপ শব্দে সাবাদিন কার্যালয়-গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। মলিন মুখে, জীর্ণ বেশে, ছিন্ন পকেটে প্রকাণ্ড পাণ্ডুলিপি লইয়া কত শত লেখক যে কার্যালয়ে প্রবেশ করিয়া সম্পাদকের উৎসাহ-বচন-সুধাব স্বাদ-গ্রহণে ধগ্গ হইয়া ফিরিত, তাহার সংখ্যা ছিল না।

“ভবিষ্য জাতিব আলোচনা” স্বত্বাধিকারী ছিল দুইজন—জাক ও আর্জান্ত। জাকের অর্থে,—যে দশসহস্র মুদ্রা বন্ধু তাহাকে দান করিয়াছিলেন,—সেই অর্থে ও আর্জান্তের উচ্চোগে এই পত্রের প্রতিষ্ঠা হইল। শালংকে কবি বৃন্দাইয়া দিয়াছিল, এমন লাভের ব্যবসা আর দুইটি নাই! টাকাগুলো ব্যাঙ্কে ফেলিয়া রাখিলে কি-ই বা এমন মন্দ মিলিবে। তাহার চেয়ে এই মাসিক-পত্র বাহিব কবা যাক্—আশ্চর্য লাভ দেখাইয়া দিব। এত লাভের নাহিলে কি ইহাতে আমারও টাকা আমি ঢালি। জাকের দশ হাজার, আর আমার দশ হাজার, মূলধন এই বিশ হাজার। দেখ না, পাঁচ বৎসরে বিশ লক্ষে তুলিয়া তবে ছাড়িব।”

কিন্তু লাভের অঙ্কে শূন্য পড়িলেও, ছয় মাসে আর্জান্তের প্রায় বাবো হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গেল। বাড়ী-ভাড়া, লেখকদের পারিশ্রমিক, ছাপাখানার বিল—তাহারা ছাড়িবে কেন? কার্যালয়ের চতুর্থ তলে কবি আপনার বাসের জগ্গ ঘর লইয়াছিল। উপবের ঘর হইতে মুক্ত নিম্নল আকাশ—চাঁবিধায়ে নগরের বিচিত্র শোভা চক্ষু ভরিয়া দেখা যায়। একবার বসিয়া উদ্ভে কল্পনাকে ছাড়িয়া দিলেই হইল, সে অমনি ভাবের পাগড় বহিয়া ফিরিবে। কি সুন্দর আয়োজন! রচনার পব রচনা স্বরিয়া পড়িবে, মাসিক পত্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া সে রচনা নব-নারীর চিত্ত দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইবে। চূড়ান্ত হইয়াছে! বাঃ, চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছে! ছয় বৎসর ধরিয়া বিজন পল্লী নিভৃত বক্ষে বসিয়া এত মাথা বুটিয়াও যে গ্রন্থ শেষ হয় নাই, এখানে আসিয়া নিমেষেই সেই বড় সাধের “ফষ্টেব কল্লা” নাটকের “ঘবনিকা পতন” হইয়া গিয়াছে। তদ্বিন্ন অসংখ্য প্রবন্ধ, কবিতা ও ছোট গল্প নিত্য লেখা হইতেছে—যেন পাহাড়ের গা বহিয়া বিপুল বেগে খরতোয়া নদী ছুটিয়া চলিয়াছে। বিরাম নাই, বাধা নাই! আবার পাণ্ডুলিপিতে পৌঁছিয়াই সে রচনার গতি-রোধ হইতেছে না! ছাপাখানায় কম্পোজিটের দল তাহা দেখিয়া একটির পর একটি করিয়া অক্ষর বসাইয়া চলিয়াছে—কি তাহাদের বন্ধ, কি সে আগ্রহ!

মুজ্জাকব তাতা লইয়া ক্রত ছাপিয়া চলিয়াছে—দণ্ডবী সে রচনা গাঁথিয়া দিতেছে। ছাপার অক্ষবে জল-জলে হইয়া আর্জাস্ত্ব'র রচনা নক্ষত্র-পুঞ্জর মত কুটিয়া উঠিতেছে! এ কি কম স্তম্ভ!

নিত্য বহু রচনা লিখিতে হইলে আর একজনকে সাহায্য চাই। সে সাহায্যের লোক মিলিয়াছিল,—শাল'ৎ! আর্জাস্ত্ব' বলিয়া বাটত, আর শাল'ৎ পাশে বসিয়া তাতা লিখিয়া লইত। কবির এই সাহিত্য-সাধনার সে যে এতটুকুও সহায়তা করিতে পারিতেছে, ইহা ভাবিয়া অন্তরে সে বিরাট গর্ব অন্তর করিত। সার্থক তাতার জীবন। একদিন যখন আর্জাস্ত্ব'র সাহিত্য-সেবার ইতিহাস লিখিত হইবে, তখন সে পৃষ্ঠায় তাতার নামটিও যে স্থান পাইবে, তাতা নিঃসন্দেহ! কবাসী সাহিত্য, আর্জাস্ত্ব' ও শাল'ৎ—এই তিনটি নাম একসঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে গাঁথা থাকিবে। এ কি কম সৌভাগ্য!

যেদিন সন্ধ্যার সময় কবির প্রাণে ভাব আসিয়াছিল। টেবিলের উপর কাগজের বোঝা দেলিয়া শাল'ৎ লিখিতে বসিয়াছিল। কবি বাস্তব-পার্শ্বে ইচ্ছাচারে অঙ্কশায়িতভাবে অস্বস্তান করিয়া আকাশের দিকে ভাবোন্মাননায় চাহিয়াছিল। ভাব আসে-আসে আসে না। যেন কবির সচিত্র সে একটা লুকাচুরি খেলা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিষ্ঠুর খেলা!

সহসা কবি কহিল, “নাও—লেখ।—বড় কবে মাঝ-মাঝি লেখ—‘প্রথম পরিচ্ছেদ’—হল, প্রথম পরিচ্ছেদ?”

শাল'ৎ কহিল, “প্রথম পরিচ্ছেদ।” তাতার স্বর গম্ভীর, কঠোর। কবি বিবস্ত্র চিত্তে শাল'তের দিকে একবার চাহিল, পরে কহিল, “নাও, এবার আরম্ভ কর—‘পিরেণিসের স্তূর উপত্যকায়’—সহস্র কাহিনীর গৌরব-মণ্ডিত। পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—” একরূপ পৌনঃপুনিক উক্তিই আর্জাস্ত্ব'র রচনার বিশেষত্ব। ইহাতে রচনাটুকু একেবারে পাঠকের মর্মে গিয়া আঘাত করে—একটা বিরাট স্রবণের অভাস দেয়, ইহাই কবির ধাবণা।

কবি কহিল, “লিখলে, পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকাভূমে—”

“হাঁ—” বলিয়া শাল'ৎ সহসা ফুঁপাইয়া কাদিয়া উঠিল।

কবি কহিল, “ও কি, কান্দছ। নাঃ, জালালে তুমি! যেদিন আমার একটু লেখবার আগ্রহ হবে, সেই দিনই তুমি একটা-না-একটা গোল বাধাবে। এ সব মুহূর্ত চলে গেলে আর ফিরে পাওয়া যায় না। নাও, হল কি আবার? ওঃ,—সিঁদুহু জাহাজের খপর পাওনি, বুঝি, তাই? ও একটা বাজে গুজব শুধু—কোথায় কি, তার ঠিক নেই। খবরের কাগজগুলোরও যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—

একটা ডোঁড়া খপর নিয়ে পাঁতার পর পাতা ভরিয়ে দিচ্ছে! এ রকম ত হয়েই থাকে! জাহাজ-টাহাজের খপর এমন মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না—এত নিত্যকার ঘটনা! তা ছাড়া ডাক্তার হার্জ'নিজে কষ্ট করে আজ ওদের অফিসে গেছেন খপর আনবার জন্য। আগে তিনি ফিরুন—তার পর তাঁর মুখে যদি শোনো, কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে, তখন না হয়, যত পারো, কৈদো। নাও, এখন লেখো। কতটা হল? আবার খেই হারিয়ে গেল, আমার। আঃ, পড় দেখি, যতটা লিখলে!”

চোখের জল মুছিয়া আর্দ্র স্ববে শাল'ৎ পড়িল, “প্রথম পরিচ্ছেদ।”

কবি কহিল, “খাক্, ওটুকু আব পড়তে হবে না। তার পর থেকে যতটা লিখলে, পড়।”

শাল'ৎ পড়িল, “পিরেণিসের স্তূর উপত্যকাভূমে—সহস্র কাহিনীর গৌরব মণ্ডিত পিরেণিসের প্রশস্ত উপত্যকাভূমে—পিরেণিসের সেই সাধের উপত্যকাভূমে—”

কবি কহিল, “পড়ে যাও—খামলে কেন?”

শাল'ৎ কহিল, “আর ত নেই—এইটুকুই লেখা হয়েছে!”

“এইটুকু!” কবি বিস্মিতভাবে কহিল, “মোট এইটুকু লিখেছ। অতখানি যে আমি বলে গেলুম—”

কবির মনে হইল, এ কি চলনা! অন্তরে এতখানি ভাব জমিয়া গিয়াছিল—শুধু এইটুকু তাতার বাতির হইয়াছে! দুই ছত্র মাত্র!

না, এ শাল'তের দোষ। তাতার কলম কবির মনের ভাবের সহিত সমানে দৌড়িতে পারে না কেন!

কবির বিরক্তি ধবিল। উত্তেজিত কণ্ঠে সে কহিল, “শুধু তোমার দোষ! নিজেই ভাবতে হচ্ছে না, কিছু না—শুধু লিখে যাবে—তাও পার না, এ রকম করলে ত আর পারা যায় না।”

শাল'ৎ কহিল, “যেটুকু শুনেছি, সেইটুকুই লিখেছি। এমন ত নয় যে, ভুলে গেছি—”

কবি কহিল, “আবার তর্ক করছ! লজ্জা হচ্ছে না? মাথায় ভাবের একেবারে বান ডেকে গেল, আর আমি এইটুকু বললুম! জানো, কল্পনার পিছনে আবার কতখানি মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে! উঃ, তার উপর মাথাটাও আজ বেজায় ধরে আছে। কত ভাবব? নাঃ, আব পাও গেল না, দেখছি। আমারও হয়েছে যেমন, বেগা-বনে মুক্তো ছড়ানো!”

কবি উঠিয়া কক্ষমধ্যে পরিক্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তার হার্জ ও লাবাস্ত্রাজ্জ আসিয়া সকল দায় হইতে তাকে মুক্তি দান করিল।

শাল'ৎ ব্যগ্রভাবে কহিল, “কি—কি খপর, ডাক্তার হারুজ্ ?”

কবি আবার গর্জিয়া উঠিল, “আহা, লোককে একটু জিকতে দাও ! তোমরা ভারী স্বার্থপর। কেবল আপনাদের সুখটাই বোঝ !”

ডাক্তার হারুজ্ কহিল, “নতুন খবর কিছু নেই ! ঐ সেই একই কথা !”

“ওরা কি বলে ?”

“বলবে আর কি !” লাবান্ত্রাজ্ কহিল, “সিদমু জাহাজ ডুবে গেছে। বাদে'র কাছে আর একখানা জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা লাগে—সমুদ্রে'ব উপর ধাক্কা—সিদমু ডুবে গেছে, তার লোক-জনের কোন খপরই পাওয়া যাচ্ছে না—”

“এ্যা ! পাওয়া যাচ্ছে না !” শাল'ৎ কাদিয়া বাণবিদ্ধা হরিণীব মতই লুটাইয়া পড়িল। সেই জাহাজে তাহার জাক, তাহার সর্বস্ব জাক যে ছিল ! সে তবে কোথায় গেল ? কোথায় ? হা ভগবান, কাতার পাশে আজ এ সর্বনাশ ঘটিল ! জাক, জাক, ওরে বাছা আমার—কোথায় তুই ? শাল'তে'ব চোখে বান ডাকিল।

কবি কহিল, “অনেকক্ষণ ঘরে বসে পরিত্রাণ করা গেছে, একটু বেড়িয়ে আসা যাক !”

লাবান্ত্রাজ্ কহিল, “যাবে, কিন্তু ভয়ানক মেঘ কবেছে—ঝড়বৃষ্টি যা হোক একটা খুব দাপটে শীগগিরই নামল বলে !”

হারুজ্ কহিল, “কৈদে আর কি হবে, বলুন ? সবই ভবিষ্যৎ !”

এ সময় বাহিবে যাওয়াই মঙ্গল ! এই শোকাভূরা নারী এখনই কাদিয়া রসাতল বাধাইয়া তুলিবে ! কবি, লাবান্ত্রাজ্ ও হারুজ্ কক্ষ ত্যাগ করিয়া বাহিবে গেল। শাল'ৎ তখন প্রাণ খুলিয়া শোকের পশরা নামাইয়া দিল। তাহার জাক, শত দুঃখে শত কষ্টেও যে জাকের মুখ চাহিয়া সে সব সহ্য করিয়াছে, কবিতো'ছেও,—আজ তাহার এ কি হইল ? মা হইয়া শুধু পাঁচজনে'ব কথায় তাহাকে দেশান্তরে পাঠাইতে সে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, আর আজ সেই সন্তান কি না সমুদ্র-গর্ভে প্রাণ দিল ! না, না, ইহা কি সম্ভব ! জাক নাই—না, না, তাহা হইতেই পারে না ! তাহার জাক, প্রাণে'ব জাক ! ওরে বাছা আমার, অনাদৃত, অবহেলিত, উপেক্ষিত দুঃখী পুত্র আমার, কোথায় তুই ! আর জাক, ফিরিয়া আর, আর বুকে ফিরিয়া আর। আর তোকে দূরে পাঠাইব না, আর তোকে চোখের আড় করিব না, তুই ফিরিয়া আর ! ওরে আর, আর !

সহসা চারিধার কাঁপাইয়া প্রবল বেগে ঝড় বহিল ! ঝর-ঝর নড়িয়া উঠিল ! হা-হা হো-হো শব্দে মুক্ত

বাতায়ন-পথে বায়ু উদ্‌গম অষ্টহাস্ত কবিতা নাচিতে লাগিল।

বাত্মির আঁধার ক্রমে নিবিড়তর হইয়া আসিল ! মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। ঝিম্-ঝিম্-ঝিম্ ! সমস্ত চবাচর যেন একটা গাট বিপুল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শাল'ৎ তখনও বিছানায় পড়িয়া কাদিতে-ছিল ! আর জাক, নয়নের মণি আমার, হৃদয়ের আনন্দ আমার, আশা আমার, ভরসা আমার, ওবে সর্বস্ব আমার, ফিরিয়া আর !

এমন সময় কে ডাকিল, “মা !”

কে ও ? জাক কি তবে ফিরিয়া আসিল ? কিন্তু না, কোথায় কে ? মনের ভ্রম, শুধু ! এ স্বপ্ন !

আবাব কে ডাকিল, “মা !” স্ত্রীণ হইলেও স্পষ্ট স্বর !

শাল'ৎ ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল, উঠিয়া বাহিরে আসিল—সম্মুখেই সোপান নামিয়া গিয়াছে। পাশের দেওয়ালটুকু অবধি দেখা যায় না, এমন অন্ধকার ! শাল'ৎ আসিয়া আলো জ্বালিল ; লঠন হাতে লইয়া আবাব সে বাহিরে আসিল। সিঁড়ির রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া আলোর সাতায়ে সে দেখিল, একটা ছায়ামূর্তি দেওয়ালে পিঠ দিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। শাল'তের বুক কাঁপিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে সে ডাকিল, “জাক—”

“মা—”

হা, ঐ ত জাক ! তুল নয়, স্বপ্ন নয় ! সত্যই জাক ! আলো রাখিয়া শাল'ৎ ছুটিয়া গেল ; জাককে বুকে চাপিয়া ধরিল—জাকের অবসন্ন দেহ তখন সিঁড়ির কোণে দেওয়ালে'ব গায় লুটাইয়া পড়িতেছিল !

কথা নাই, আদব নাই—কিছু না ! জাকের মাথায় মুখ রাখিয়া শাল'ৎ কাদিতে লাগিল। আঃ—এ তপ্ত স্পর্শ আবাব যে ফিরিয়া পাইবে, ইহা কি সে স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল ?

রাত্রি ফিবিবাব সময় আজান্ত'র আশঙ্কা হইতেছিল, গৃহে ফিরিয়া আবার সেই কান্নাকাটির মধ্যে বৃষ্টি পড়িতে হয় ! কিন্তু ফিরিয়া সে দেখিল, শাল'ৎ বেশ স্থিৎ হইয়াই বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া শাল'ৎ দীর্ঘভাবে কহিল, “চুপ, গোল কাবো না—একটু ঘুমুচ্ছে ও—”

“ও ! ও কে ?”

“জাক। আমার জাক। সে ফিরে এসেছে ! আজ আমার কি সুখ হচ্ছে যে, তা আর কি বলব ? জাহাজ ডুবি হয়ে ওর খুব চোট লেগেছিল। অনেক কষ্টে উদ্ধার পেয়েছে। রায়োজেনিরো থেকে আসছে। সেখানে হুমাস হাঁসপাতাল পড়েছিল, এমন হয়ে গেছে যে, জাককে আমার চেনা যায় না মোটে !”

আজান্ত'র হৃদ হাসিল ; কহিল, “বাক, বাঁচা গেল ! জাক ফিরেছে—আঃ !”

সত্যই আর্জান্ট'র উল্লাস হইয়াছিল। জাকের প্রতি স্নেহ এ উল্লাসের কারণ নয়। জাক মরিসে শাস্ত্রের কান্নাকাটির মধ্যে সে কি দারুণ অশান্তিতে ঘরে বাস করিতে হইত! সেই অশান্তি যে ভোগ করিতে হইবে না, ইহা ভাবিয়াই তাহার আনন্দ হইল।

আবেগোচ্ছ্বাসের আতিশয্যে প্রথম কষ্ট দিন কাটিয়া গেলেও জাকের প্রতি আর্জান্ট'র ব্যবহার এবাব তেমন কঠিন হইল না। তাহাদের নিত্যকার সাহিত্যিক মজলিসে জাকেব জ্ঞাও এক কোণে একটি আসন নির্দিষ্ট থাকিত। নূতন অভাগত কেহ আসিলে শাস্ত্র সাগ্রহে পুস্তকের পবিত্র প্রদান করিয়া বলিত, “এই জাক! এই জাক! এটি আমার ছেলে, বেচারি বড় ভুগেছে। ওকে যে আবার ফিরে পাব, তা মনেই ছিল না।” সকলেই জাকের দিকে একটু করুণাব চোখে ফিরিয়া চাহিত।

জাক কোণের আসনে বসিয়া দেখিত, মজলিসে সব করটিই আসিয়া জমিয়াছে, জিমনাজেব সেই পুবানো দলটি! এই সকল ভক্ত উপাসক মণ্ডলী কর্তৃক পরিবেষ্টিত না থাকিলে আর্জান্ট'র চলেও না। সে বলে, “একসঙ্গে মিশে আমরা একটা দল করি, এস—” দলের প্রধান কাজ,—যে সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাহাদিগকে আমল দিতে চাহে না, ঘৃণার চক্ষে দেখে, সেই সব লেখকের ব্যক্তিগত কুৎসা-রচনা! যে সকল মাসিক-পত্রের সম্পাদক তাহাদের রচনা আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করে, তাহাদের নীচ ঈর্ষ্যা-প্রবৃত্তিকে অভিশাপ-দান ও সেই সকল মাসিকে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর বিকট সমালোচনা করা। সে কুৎসা-রচনা, সে সমালোচনাব ভঙ্গীই বা কি সে বিজ্ঞোচিত! আর্জান্ট'র কোম্পানি প্রকৃতই বুদ্ধিতে পারিত না, তাহাদের রচনা কেন এই সকল সম্পাদক ছাপিতে চাহে না—নিজেবা পাঠ করিয়া এমন মুগ্ধ হইয়া যায়—অথচ তাহাদের এতটা বিরূপ হইবার কারণ কি! কেহ বলিত, ‘আমাদের আমোল দিলে—আমাদের লেখাব তেজে ঠঁবা আব ঠঁদের রচনা যে একেবারে ছাই হয়ে যাবে!’ কেহ বা বলিত, ‘শুধু তাই নয়—ওদের একটি দল আছে—সেই দলে বাহিরের লোক ভিড়তে সাহসে কুলায় না।’ জাক এক পাশে বসিয়া এই সকল অলস জল্পনা কখনও শুনিত, কখনও বা সে আগাগোড়া আপনার জীবন-কাহিনী শ্রবণ করিয়া শিররিয়া উঠিত। এ সকল কথা তাহার কাণেও পৌঁছিত না। এমনভাবে তাহার জীবনটা নষ্ট হইয়া গেল। কেন, কাহার দোষে? ভাবিতে ভাবিতে তন্দ্রার ঘোরে সে ঢুলিয়া পড়িত। ভোজন-কাল আসিলে শাল'ও সন্মুখে তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিত, “জাক, জাক।” জাকের চমক হইত। বন্ধুগণ চাহিয়া দেখিত—আর্জান্ট'র দাঁতে দাঁত বসিয়া

বোব চাপিয়া মুহু কর্তে কহিত, “একটা আন্ত জানোয়ার যেন!”

কিন্তু না—জাক জানোয়ার নহে! বহু দিন পরে মাতার স্নেহ ও নির্মল বায়ুর স্বাদ পাইয়া তাহার প্রাণের রুদ্ধ কবাট আবার ধীরে ধীরে মুক্ত হইয়া আসিতেছিল, স্বাধীন বায়ুতে ধীরে ধীরে তাহার লুপ্ত চেহারা আবার সে ফিরিয়া পাইতেছিল। আর কেহ কথা কহিলে তাহার চিত্ত সে দিকে বড় একটা আকৃষ্ট হইত না। শুধু মার কথাগুলাই তাহার দৃষ্টি হৃদয়ে সঞ্চারিত স্থায়ী কাঙ্ক্ষ করিত। মার সহিত দুইদণ্ড নিরলায় কথা কহিতে পাইলে সে যেন বর্জ্য হইয়া যাইত। অদীর পিপাসিত ব্যক্তি যেমন আকুল আগ্রহে শীতল বারি পান করে, তেমনই ভাবে মার প্রতি কথাটি নিবিষ্ট চিত্তে সে পান করিত! এ যেন কোন নন্দনের বিম্বত সঙ্গীত, স্বর্গের স্মৃতি!

একদিন সে মাকে নির্জনে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ মা, ছেলেবেলার ঐকি কখনও আমি জাহাজে চড়েছিলুম?”

সহসা এ প্রশ্নে শাল'তের প্রাণটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে কহিল, “কেন জাক?”

“প্রথম যেদিন মা সিদ্ধু ছাহাজে আমি পা দিলুম—সে আজ তিন বছরের কথা, তখন আমাব কেমন-যেন কি মনে হল। মনে হল, এ সব যেন আমার কাছে নতুন নয়—কবে যেন কোথায় আমি জাহাজে চড়ে সমুদ্রে গিয়েছিলুম। হাঁ মা, সেটা কি স্বপ্ন তবে?”

“না, জাক, স্বপ্ন নয়, সত্য। তোমাব বয়স তখন তিন বছর—আমরা আলজিরিয়া থেকে আসছিলুম। তিনি মায়া গেলে আমবা তুবেনে ফিরছিলুম।”

“তিনি কে, মা? বাবা?”

“হাঁ জাক।”

“বাবার নাম কি ছিল মা?”

এ কি কৌতূহল! শাল'ও মুহূর্তের জন্ত বিচলিত হইল, পরে আপনাকে সঞ্চরণ করিয়া বলিল, “সে কথা এত দিন তোমায় বলিনি, জাক। পাশিনী আমি, ছেলের কাণে এ বিষ ঢালবো,—তাই কখনও বলিনি। কিন্তু তোমায় না বলা আমার অজ্ঞার। তিনি ফ্রান্সের একজন বিখ্যাত জমিদার ছিলেন; পিমবক্দের আত্মীয়। তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়ে আমি স্বামীর ঘর ছেড়ে অকুলে ভেসেছিলুম! সিদ্ধাপুরের রাজার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল, তাঁর সঙ্গেই আলজিরিয়ায় বেড়াতে গেছিলুম আমরা। সেইখানেই তিনি মায়া যান—”

“তাঁর নাম কি ছিল?”

“মার্কি দ্য লে পী।”

জাক তবে সস্তাস্ত পিতার পুত্র! বিপথগামিনী

মাতার পাপে—না, মা,—তাহার দুঃখিনী মা,—তাহার বিচার করিবার অধিকার জাকের নাই! কিন্তু এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র হইয়া জাহাজে সে সামান্য খালাসির কাজ করিয়াছে!

এমন সময় অর্জাস্ত আসিয়া কহিল, “শালং, একটা কথা আমি ভাবিছিলুম। জাক ত এখন ভালো হয়েছে—একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখা উচিত, ওব। এ বয়সে কুড়ের মত বসে থাকাটা ঠিক নয়—ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে যাবে, তা হলে। তা সীমাবে কাজ করতে বলছি না, আমি! রেল-এঞ্জিনের কাজে বিপদের তেমন ভয় নেই, তাই লাভাস্রান্ত বলছিল—”

আবার সেই লাভাস্রান্ত। জাক কোন কথা বলিল না। শালং পুত্রের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিষ্কপ করিয়া সসঙ্কোচে কহিল, “কিন্তু তুমি দেখছ ত, জাক এখনও কি রকম দুর্বল! চার তলার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতেই হাঁপিয়ে অবশ হয়ে পড়ে, রাত্রে ভাল ঘুমও হয় না। আর দেখেছ, কেমন খুঁকুকে কাশি হয়েছে, তা সে কাশিও ত কৈ কিছুতে সারছে না। তুমি বরং এই কাগজেরই একটা কাজ ওকে দাও! পারবে না? তাহলে বড় ভাল হয়।”

“বেশ। মোরোন্ডার সঙ্গে একবার পরামর্শ কবে দেখি, তাহলে।”

পরামর্শান্তে স্থির হইল, মন্দ নহে! জাকের দ্বারা কাগজের আর কোন উপকার না হউক, কাগজ মোড়া ও ভাঁজ, ছাপাখানার এবং দপ্তরীর তাগাদা করা, প্রভৃ বহা প্রভৃতি কাজগুলো ত চলিতে পারে। কাগজের আয় ত কিছুই নাই, ব্যয় প্রচুর, একটি মাত্র গ্রাহকের নিকট হইতে বার্ষিক মূল্য আদায় হইয়াছে! সে গ্রাহকটি আর কেহই নহে, শালংর পূর্ব-পরিচিত সেই বন্ধু, যাহাব দত্ত অর্থে কাগজের প্রতিষ্ঠা। এ ক্ষেত্রে কাগজের বৈতনিক বেহারাকে বিদায় দিয়া তাহার স্থলে জাককে নিযুক্ত করিলে একটু তবু ব্যয়-সংক্ষেপ হয়!

তাহাই ঘটিল। কাগজের স্বত্বাধিকারী জাক বেহাগর হীন কার্যে নিযুক্ত হইল। সে নিজে জানিত না যে, সে স্বত্বাধিকারী! শালং জানিলেও অর্জাস্তর নিকট সে কথা তুলিবে, এমন সাধ্য তাহার ছিল না।

সপ্তাহান্তে অর্জাস্ত বিরক্তভাবে কহিল, “নেহাৎ অপদার্থ! এ কাজও ওর দ্বারা চলবে না!”

শালং ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, “ক্রমে ক্রমে শিখতে পারবে না কি?”

অবজ্ঞার সহিত অর্জাস্ত কহিল, “দ্বার কবে পারবে? ভারী ত কাজ! আসল কথা হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে ও মোটেই খাপ খাবে না। দেখছ না, ওর ভাব-ভঙ্গী, আচার-ব্যবহার সব ছোটলোকের মত, কাষখানার

মিস্ত্রী-মজুরের ধরণের! তা ছাড়া ওর স্বভাব অবধি বিগড়ে গেছে। ও মদ খায়, দেখনি? ওর মুখে বিশ্রী মদের গন্ধ!”

শালং কানিয়া ফেলিল! সে-ও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল। কিন্তু তাহার দোষে জাক আজ ইতর হইয়াছে, মদ ধরিয়াছে! তাহাবাই কি ঠেলিয়া জাককে এই অধঃপতনের পথে গড়াইয়া দেয় নাই? জাকের দোষ কি!

অর্জাস্ত কহিল, “শোন শালং, এও আমি বুঝছি, আপাততঃ ওর যেমন স্বাস্থ্য, তাতে ওর কাজ-কর্ম করা পোষাবে না, এখন! আর কিছুদিন জিরুক। তা সহরের এই ভিড়ে না থেকে ও কেন এতিয়ালে থাকে না। আমাদের সে বাড়ীর কবুলতির মেয়াদও ত এখন দশ বছর বাকী আছে—সেখানে থেকে ও বাড়ীটা ভাড়া দেবার বন্দোবস্ত করুক। মাসে মাসে ওর খরচের টাকা এখান থেকে পাঠাবেন! সেখানে পাড়াগাঁয়ে ভালো হাওয়ায় নির্জনে কিছুদিন থাকলে শরীরে বলও পাবে, তা-ছাড়া বাড়ীটাও শুধু শুধু ফেলে রেখে ভাড়া গুঁড়ি কেন? তার জন্ত একটা ভাড়াটে ঠিক করে জাক আবার এখানে ফিরে আসবে! কি বল!”

শালং সমুদ্র চিন্তে এ প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

পরে এক দিন শরতের এক শান্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে জাক এতিয়ালে আসিল। শবতে সাগর প্রকৃতি সেদিন ঝলমল করিতেছিল। চারিধারে সবুজ প্রাচুর্যের ঘন শোভা। স্থলে জলে জীবনের যুগ সম্পন্ন! কোন কোলাহল নাই,—নিস্তরু শান্ত গ্রাম। সবুজ পাতার রাশিতে গাছ ভবিষ্য রহিয়াছে, ক্ষেত্র শস্য পাকিয়া উঠিয়াছে—যেন কে একখানি বিস্তীর্ণ হরিদ্রা বর্ণের আস্তরণ বিছাইয়া রাখিয়াছে। গাছের আড় হইতে পাখী গান গাহিয়া সাবা আকাশ-বাতাস মিষ্ট স্বরের প্রাবনে ভরাইয়া তুলিয়াছে। ফলে ফলে, নদীর জলে, পাখীর গানে পল্লী-জননী বসন্তধুর স্নেহ যেন উথলিয়া উঠিয়াছে। জননী যেন দুই বাহু বিস্তার করিয়া তাপ-দগ্ধ জাককে সাদরে আশ্রয় করিতেছেন, আর বাছা, আর, আমার কোলে আর! এখানে কোন কোলাহল নাই, কোন জ্বালা নাই, আমার শীতল স্নেহের স্পর্শে, আর, তোর সকল দুঃখ নিবারণ করি—সব দাঃ জুড়াইয়া দিই!

জাক যখন পরিত্যক্ত কুটীর-সম্মুখে আসিল, তখন কুটীর-গাত্র-সংলগ্ন লতায়-পাতায় রোজ-কিরণ ঝরিয়া পড়িয়াছে! সেই আলোক-স্পর্শে কুটীর-গাত্র-ক্ষোদিত ফলকটি পাতার মধ্য হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বর্ণ-বর্ণে তাহাতে লেখা রহিয়াছে, “আরাম-কুঞ্জ।” চারিধারে এই অমল শোভার মধ্যে দাঁড়াইয়া ফলকের অক্ষরগুলো জাক একবার পড়িল, “আরাম-কুঞ্জ।” সত্যই “আরাম-কুঞ্জ।” এখানে জাক সকল দুঃখ তুলিবে, বথার্থই সে আরাম পাইয়া বাঁচিবে।

## তৃতীয় অধ্যায়

### প্রথম পরিচ্ছেদ

সেসিল

“কি! আগাগোড়া তোমার নামে মিথ্যে কলঙ্ক রটিয়ে বেড়িয়েছে—আর তা-ও কি রকম মিথ্যে! চোর অপবাদ! পাঁচ বছর আমি এই খপর নিয়ে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছি। কি ভয়ানক লোক! তাই এত আগ্রহ কবে এ খপর আমার দিতে এসেছিল,—বটে! তার পর যখন তোমার নির্দোষিতা প্রমাণ হল, তখন ত কৈ সে খপরটুকু দিতে এল না। দাঁও ত দেখি, তোমার ম্যানেজারের সার্টিফিকেটখানা।”

“এই নিন, ডাক্তার বিভাল।”

“বা: চমৎকার! ম্যানেজারটিকে খুব ভাল লোক বলতে হবে। দেখে আমার বড় আনন্দ হল, জাক! আমি এ পাঁচ বছর ধরে কেবলই ভেবেছি,—আমার হাতে-গড়া জাক চোর হবে! টাকা চুরি করবে, সে! কখনও নয়। অসম্ভব! দেখ দেখি, হঠাৎ যদি আজ আর্শাঘোর এখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হত, তাহলে ত এ ভুল ধারণা, এ মিথ্যা সন্দেহ ত আমার মন থেকে কখনও দূর হত না!”

আর্শাঘোর ক্ষুদ্র কুটীর ডাক্তার বিভালের সহিত জাকের আবার বহুদিন পরে দৈবাৎ আজ সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

আজ দশদিন জাক এতিয়ালে আসিয়াছে। তপস্কার ত্রাঙ্কণের মতই এ কয়দিন নির্জনে সে নিঃসঙ্গ জীবন বহন করিতেছিল। প্রকৃতির বিশাল মুক্ত প্রান্তর শরতের ঐশ্বর্যে ঝলমল করিতেছে—চাষাধারের এই শান্ত শোভার মধ্যে অতীতেব স্মরণীয় স্মৃতিতে মগ্নিত থাকিয়া জাক ধীরে ধীরে হৃত স্বাস্থ্যসম্পদ ফিরিয়া পাইতেছিল। শ্রামল প্রান্তরের দিকে চাঙ্গিলে চোখ জুড়াইয়া যায়—স্বদয়ে শক্তি সঞ্চারিত হয়,—নৈরাশ্যের হাহাকার ঘুচে। মাথার উপর নির্মল নীল আকাশ, উজ্জল আলোক-রাশিতে পরিপূর্ণ—সে আলোকের স্নিগ্ধ বিমল ধারায় জাকের অন্তরের গ্রানি-পঙ্কিলতাও ক্রমে ধুইয়া মুছিয়া আসিতেছিল।

একদিন এই একান্ত নিঃসঙ্গতা নিতান্তই অসহ্য বোধ হওয়ার পুরাতন বন্ধু আর্শাঘোর কুটীরে সে বেড়াইতে আসিল। আর্শাকে দেখিলে জাকের মাকে মনে পড়ে। গৃহ-কর্মে মাতার সে সঙ্গিনী ছিল—তাই আর্শার কুটীরে আসিয়া পুরাতন স্নেহ লাভ করিয়া সে

বেন আবার তাহার অতীত দিনগুলিকেই জুড়াইয়া পাইল।

আজ জাক আর্শার বাটীতে আসিয়া দেখিল, আর্শাব স্বামী বাতের যন্ত্রণায় শয্যা গ্রহণ করিয়াছে। রোগীর পার্শ্বে শুভ্রশির এক বৃদ্ধ বসিয়া রোগীর দেহ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এই বৃদ্ধই ডাক্তার বিভাল। বহুদিন পরে এই নূতন দর্শনে উভয়েই একটু বিচলিত হইয়া পড়িল। জাক আপনার সামাজিক অধঃপতনের কথা ভাবিয়া সঙ্কচিত হইয়া গেল। ইহারই জন্ত সে কোনদিন ডাক্তারের বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। ডাক্তারের সঙ্কোচের কারণ, জাককে দেখিতেই রুদিক-গৃহের সেই চুরির কথা তাহার নূতন করিয়া মনে পড়িল। জাক আজ চোর—সেই জাক!

এখন জাকের কলঙ্ক-মুক্তির সংবাদ পাইয়া ডাক্তারের প্রাণ শান্ত হইল। ডাক্তার কহিলেন, “এখন তুমি এখানে এসেই যখন বাস করতে লাগলে, তখন আমাদের বাড়ী যাবার আর কোন সঙ্কোচ রেখো না। ওরা কল্পনে মিলে তোমার জীবনটা একেবারে নয়-ছয় করে দিলে! তোমার শরীর যা দেখছি, তাতে রীতিমত এখন যত্ন নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। আমাদের বাড়ী তুমি তেমনই ভাবে আবার আসা-যাওয়া কর, এই আমি দেখতে চাই। সবই সেই রকম আছে, জাক, কেবল আমার স্ত্রী শুধু নেই। আজ চার বছর তিনি মারা গেছেন! শোকেই বেচারী মারা গেল! সেসিল এখন আমার বাড়ীর গিন্নী। সে বেশ বড় হয়ে উঠেছে—তোমায় দেখলে ভারী খুসী হবে, সে। তোমার কথা প্রায়ই বলে। তুমি আসবে ত, জাক?”

জাক মুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। একটা দ্বিধায় তাহার কথা সন্নিবেশিত ছিল না! বিভাল তাহা বুঝিলেন! বুঝিয়া তিনি কহিলেন, “কোন সঙ্কোচের কারণ নেই, জাক। সেসিলকে কিছু বোঝাতে হবে না—কোন কৈফিয়ৎ নয়! রুদিকদের বাড়ীর চুরির কথা সে কিছু জানে না—শুধু আমিই এ খপরটুকু জানতুম। কাউকে বলিনি। কাজেই আসতে তোমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না। আসছ ত—বল? আজ আর থাক! কতক্ষণই বা থাকবে? রাত্রে আবার কুরাশ নামবে—কুরাশা লাগানোটা তোমার পক্ষে ঠিক নয়। কাল বয়ং এসো। আমাদের বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করবে—তোমার নিয়ন্ত্রণ রইল। কেমন, আসবে ত?”

কৃতজ্ঞতার জাক ডাক্তারের পানে চাহিল। সন্ধ্যা



জাকের বেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে ডাক্তার কহিলেন, “না এলে আমি গিয়ে ধরে নিয়ে আসব, তা কিন্তু বলে রাখছি।”

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সেদিন রাত্রে চিমনির ধারে বসিয়া জাক অনেক কথা ভাবিল। আপনার জীবন-নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠার উপর দিয়া সে দৃষ্টিটা একবার বুলাইয়া লইল। সেই মধুর কৈশোর-প্রারম্ভে ডাক্তারের স্নেহে সে কি এক বিচিত্র স্রবের অধিকারী হইয়াছিল! হাশু-কোঁতুকময়ী ক্রীড়া-সঙ্গিনী সেসিলের সহিত এককালে সে কি সোনার দিনগুলি কাটিয়াছে! তার পর কোন্ দৈত্যেব অভিযান লাগিল—জীবনটা একেবারে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল! সে ক্ষতের দাহ যেমন ভীষণ, তেমনই গভীর! সে ক্ষতচিহ্ন কি এ জীবনে কখনও মিলাইবে?

পরদিন দিবা বিপ্রহবে জাক আসিয়া বিভালের গৃহ-দ্বারে দাঁড়াইল। এক দাসী আসিয়া কহিল, “ডাক্তার সাহেব বাড়ী করেননি। মাদামোসেল একলা আছেন।”

দাসীটি নবাগতা; জাককে সে চিনিত না। ভিতরে একটা কুকুর ডাকিয়া উঠিল। নিমেষে কুকুরটা লাফাইয়া জাকের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। পুতান বন্ধুকে কুকুরটা দেখিয়াই চিনিল। জাকের পদলেহন করিয়া, তাহার গায়ে গা ঘসিয়া, ল্যাজ নাড়িয়া বাকুহীন পশু বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিল। দেখিয়া জাক অভিভূত হইয়া পড়িল। দুইদিন চোখের আড় হইলে বন্ধুকে মানুষ অনেক সময় চিনিতে পারে না, কিন্তু এই বাকুহীন ইতর পশু, সে হৃদয়-হীন নহে—স্নেহের মৰ্যাদা-রক্ষায় তাই তাহার কোনই ক্ষতি হইল না।

ভিতর হইতে স্নমধুর স্বরে কে ডাকিল,—“এস জাক।” যেন স্বর্গের বীণা বাজিয়া উঠিল। এ কণ্ঠ সেসিলের—কি মধুর, কি প্রাণারাম! জাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিশোরী সেসিল! যৌবন-স্পর্শে সেসিলের স্রুগঠিত তনুখানি লাবণ্যে ভরিয়া রহিয়াছে—পুষ্প-তরু যেন আজ কুসুম-স্রবকে সাজিয়া উঠিয়াছে! অমল তাহার শোভা, বিচিত্র তাহার বর্ণ!

সেসিল নিকটে আসিয়া জাকের হাত ধরিল। উভয়ে যাইয়া তখন ভিতরে বসিল। সেসিল কহিল, “তোমাব জীবনের উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে,—দাদা মশায়ের কাছে আমি শুনেছি, সব। আমাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেছে, জাক। দিদিমা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন! তোমার কথা প্রায়ই তিনি বলতেন।”

জাক কোন কথা কহিল না। তাহার বাকুশক্তি যেন লোপ পাইয়াছিল! এই পবিত্র দেবীমূর্তির সম্মুখে আপনার লাহিত শির তুলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, এই সৌন্দর্য ও মাধুর্যের

বিপুলতার সম্মুখে আপনার রিক্ত দৈন্তের কঙ্কাল-সার মূর্তিটা খাড়া করিয়া সে দাক্ষ্য স্পর্ধা প্রকাশ করিয়াছে! এই স্বর্গের সুখ-সমুদ্রেব তীরে পৃতিগন্ধময় নরকের আবর্জনা যেন সে টানিয়া আনিয়াছে,—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! এখান হইতে পলাইতে পারিলে সে যেন বাঁচিয়া যায়! হাত দুইটা কর্কশ, কঠিন দেহের হাড়গুলা অবধি বস্ত্রের আবরণ ভেদ করিয়া একটা কুৎসিত বীভৎসতা প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে। বসন্ত-শ্রীর পার্শ্বে হিম-জঙ্ঘর শুষ্ক প্রকৃতিব শীর্ণতা যেমন অবজ্ঞা ও ঘৃণার সৃষ্টি করে, সেসিলের পার্শ্বে জাকও আজ ঠিক তেমনই ভয়, ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য!

এমন সময় দাসী আসিয়া সেসিলের হাতে এক টুকরা কাগজ দিয়া কহিল, “ওখু চাই—লোক এসেছে।”

বিদ্যুৎ-শিখার মতই ক্ষিপ্ৰ গতিতে সেসিল কাগজ-হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। নিকটে টেবিলের উপর শিশিতে কয়টা বোতল ছিল। সে উঠিয়া ঔষধ তৈয়াব করিতে লাগিল। হাঁপ ছাড়িয়া জাক তখন একবার সেসিলকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার অবসর পাইল। কি সুন্দর—এই সেসিল। যৌবন তাহার বিচিত্র মায়া-তুলি বুলাইয়া সেসিলের দেহটিকে ললিত রাগে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। কোথাও এতটুকু খুঁত নাই! সজ্জিত সুন্দর বেশে, তাহারই অমূল্য ভাষার মূর্তি! অপূর্ব মধুরিমার চরম বিকাশ!

জাকের আত্মা আজ প্রবুদ্ধ হইতেছিল, অশ্রু স্রাব হইয়া নীরবে পবিত্রতায় ভারসা উঠিতেছিল,—সে নিজের তাগা বুঝিতে পারিল না। সে একবার ভাবিল, কেন এখানে আসিল! আসিল যদি ত, এখন পলাইবে কি করিয়া! এখানে তাহার অবস্থান যে একান্তই অশোভন, নিতান্ত বিসদৃশ! সেসিলের প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় জাকের চিত্ত আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ক্রমে দুই-চারি জন করিয়া লোক আসিতে লাগিল। ঔষধ চাই, পুরিয়া চাই, মালিশ চাই। সেসিলের অভ্যস্ত করে কোন কর্মই বাধিল না।

এক কৃষক-রমণী ঔষধ লইয়া চলিয়া যাইবার সময় জাকের সম্মুখে আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাঁহর করিয়া তাহাকে দেখিল। দেখিয়া কহিল, “বাঃ, এই যে রেজন্টদেব জাক সাহেব গো! এবার তবে ডাক্তারের নাতনীর বিয়ের ব্যবস্থা চল! এঁ্যা! পাস্তুর স্বয়ং হাজির—এতদিন ধরে জাক সাহেবের জন্ত ডাক্তার ‘হা-পিত্যেশ’ করে বসেছিল! এবার বাঁচল!”

জাক বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেসিল দেবী—জাক তাহাকে গ্রহণ করিবে, এমন স্পর্ধা নিমেষের জন্তও জাকের মনে উদয় হয় নাই! সেসিলও ঈষৎ বিচলিত হইয়া পড়িল! কোনমতে সে চাকলাটুকু গোপন করিয়া

সেসিল ডাকিল, “ক্যাথরিন, দাশ আসছে, খাবার তৈরি ত সব?”

যথার্থই ডাক্তার বিভাগ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি কহিলেন, “জাকের শরীরটা একে-বারে গেছে—দেখেছ, সেসিল, ওকে হঠাৎ দেখলে চেনা যায় না।”

সেসিল ডাক্তার-গৃহ হইতে বাহির হইয়া জাক যখন পথ চলিতেছিল, তখন যদি কেহ জাকের পানে চাহিত ত সে ভাবিত, তাহার গৃহে বৃষ্টি কাহারও সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইয়াছে, তাই ডাক্তারকে সংবাদ দিয়া ব্যস্তভাবে রোগীৰ শয্যাপার্শ্বে আবার সে দ্রুত ফিরিয়া চলিয়াছে। গতি তাহার এমনই অস্বাভাবিক চক্ৰ!

পথে চলিতে চলিতে সমস্ত জগতের উপর জাক চটয়া সারা হইল। কারিকর—কারিকর! সারা জীবনটা যেন কে কালো কালিতে দাগিয়া দিয়াছে! আজান্ত ঠিক বলে। অসত্য, বেয়াপব, আমি—আমার উচিত, আমার সমযোগ্য লোকজনকে সঙ্গে মেলা-মেশা—ভক্তসমাজে আমার ঠাই হইবেও না! উত্তেজনা জাকের প্রাণ আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছিল।

কিন্তু তরঙ্গাহত নদীর জল যেমন পরতে পরতে অজস্র চন্দ্রের ছবি আপনার বুকে প্রতিফলিত করে, তাহার শূন্য পীড়িত চিত্ত তেমনই চিন্তাব পরতে পরতে সেসিলের মধুর ছবিটিকেই বিব্রিত করিয়া তুলিতেছিল। সেসিল, সেসিল! পবিত্র, সুন্দর, নিখুঁত সেসিল! দেবী তুমি, অভাগা মলিন দীন জাককে পবিত্র নিখুঁত করিয়া তোলা! তোমাকে গ্রহণ করিবার যোগ্যতা বা শক্তি তাহার নাই—তাই বলিয়া তোমার করুণার কণা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া না, যেন! কৃষক-রমণীটা ও কিসের ইঙ্গিত করিল? সেসিলের সহিত জাকের বিবাহ! না, না,—অসম্ভব! দুই-রসনা নারী, এ বিষম কথা উচ্চারণ কবিতো তার জিত খসিয়া পড়িল না?

সেসিলের সহিত তাহার মিলনের কোন আশাই নাই,—কোন সম্ভাবনা নয়। এই একটি মাত্র চিন্তা জাকের সমগ্র চিত্তটুকুকে সেদিন প্রবলভাবে নাড়া দিতে লাগিল! অবশেষে সন্ধ্যার পর চারিধার যখন অন্ধকারে ছাইয়া গেল, তখন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া জাক আসিয়া বাতায়ন-পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ধ্যার বাতাস তাহার চিন্তা-তপ্ত ললাটে মাতার স্নেহাঙ্কলন মতই আরাম বহিয়া আনিল। নিকটে একটা চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল,—অল্পক গদগদ কণ্ঠে ডাকিল, ভগবান, ভগবান, আমাকে পাগল করিয়া দাও, চিত্তকে অবশ করিয়া দাও! এ অবৈধা, এ চাকল্য যে আর সহ হয় না, প্রভু।

সামাজিক সহন বিষয় আজ এ মিলনের পথে অন্তরায়!

সে কারিকর, নীচ কারিকর মাত্র, ছোটলোক,—ভক্ত সমাজে কি বলিয়া আজ সে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে? তাহার উপর মাতার চরিত্র-দোষ! না, অসহ্য, অসহ্য এ জালা! দারুণ যন্ত্রণা!

সেলফের উপর একটা বোতল ছিল। জাক তাহা হইতে একটা তরল পদার্থ গ্রাশে ঢালিল। পরে গ্রাশটা টেবিলের উপর রাখিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে আবার কি ভাবিতে বসিল—সমস্ত! চারিদিকে সমস্ত! এ বিপুল সমস্ত-সমাধানের কি উপায় আছে! কি উপায়! ভাবিতে ভাবিতে জাক ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন স্বপ্ন তাহার নিজাতুর চিত্তে কত বিচিত্র চিত্র ফুটাইয়া তুলিল। প্রকাণ্ড কারখানা—অজস্র লোকের কোলাহল! নদীর নীর,—নদীতে তরী বহিয়া সে চলিয়াছে! নদীর জল ছল-ছল করিয়া তবীর কাণে কাণে যেন কত কি গোপন কথা বলিয়া চলিয়াছে! কোথায়, যেন কে ঐ গান গায়—চালো, সুরা চালো, আবও চালো! বিন্মতি গভীর বিস্তৃতির সাগরে ডুব দাও—কিছু চাহি না—চাহিবার আর কিছু নাই! কোন কামনা নাই! শু বিন্মতি আনিয়া দাও!

ঐ যে তরল রূপ উছলিয়া উঠিয়াছে! ঢল ঢল নয়নে, ওরে পিয়ালা, চাহিয়া তুই ও কি দেখিতেছিস? শান্তি আনিয়াছিস? বিন্মতি আনিয়াছিস? কৈ, দে, দে, দে পিয়ালা! না, না, ও কে তুমি জ্যোতিষ্মতী দেবী,—সীমন্তে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, করে কনক-দণ্ড? এ যে সেসিল! মধুর সুরে ও কি গান গাহিতেছ, তুমি?—জাক, তুমি মদ খাও? ছি!

জাকের তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল! কোথায় কে! তরী, নদী, দেবী—কোথায় কি? কেহ নাই, কিছু নাই,—শুধু সেই পিয়ালাটা! সর্বদাশী, কুহকিনী, দূর হ', তুই!

সজোরে জাক স্বরাপূর্ণ কাচের গ্রাশটা বাহিরে ছুড়িয়া দিল! ঝন্ ঝন্ শব্দে গ্রাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! দুই হাতে চোখ মুছিয়া জাক তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। আকাশেব দিকে চাহিয়া সে কহিল, “তাই হবে, সেসিল, দেবী, তাই হবে। তোমার কথাই থাকবে! এ নীবনে জাক আর কখনও সুরা স্পর্শ করবে না!”

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### আরোগ্য-লাভ

তাহার পর জাক কতদিন রোগ ভোগ করিল, ডাক্তার হারজ্ আসিয়া তাহার চিকিৎসা-ভার লইয়া তাহাকে যত্নের দ্বার-সামিধ্যে আনিয়া ফেলিল, এবং কি করিয়া ডাক্তার বিভাগ আসন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়া, জোর

করিয়া জাককে আপনার গৃহে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা তাহাকে আরোগ্য দান করিলেন, সে সকল কথা বিশদভাবে বর্ণনা কবিবার কোন প্রয়োজন নাই।

আরোগ্য-লাভের পর জাক ডাক্তারের গৃহেই স্থান লাভ করিল। সেসিলের অক্লান্ত শুশ্রূষা, ডাক্তারের স্নেহ সেবা—কেবল ইহাবই গুণে জাক এ যাত্রা বক্ষা পাইল।

দুঃখ যেন তখন আবার চিরদিনের মত বিদায়-গ্রহণের উপক্রম করিল। মধুর সাহচর্য্যে শীর্ণ মনে স্বাস্থ্য ও শান্তিও ফিরিয়া আসিতেছিল। সেসিল বহি পড়িত, জাক শুনিত—কখনও বা জাক পড়িত, সেসিল শুনিত। এমনই উপায়ে জাক ও সেসিলের হৃদয় দুইটি এক অদৃশ্য বান্ধনে বাঁধা পড়িতেছিল। কে জানে, ইহাব পবিধা কি! ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিলেও তাহাতে বাধা দিলেন না। তাঁহার মনে কি গভীর উদ্বেগ প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনিই জানেন।

রিভালের গৃহে জাক বাস করিতেছে শুনিয়া আর্জান্ট রোষে জ্বলিয়া উঠিল। রিভাল,—বিভালের গৃহে—কেন? আর্জান্ট'র কি পয়সা নাই, না, গৃহ নাই? ইহাতে তাহাকে দস্তুরমত অপমান করা হইতেছে! তাহার মাথা হেঁট হইতেছে।

অগত্যা শাল'কে পত্র লিখিতে হইল। শাল'ও লিখিল, “তুমি ওখানে থাক, সেটা এ'ব পছন্দ নয়। লোকে মনে ভারতে পাবে, আমরা তোমায় কিছুই দিই না বা তোমাকে দেখি না। এতে আমাদের অপমান হয়।” তাহার প'ব, ‘পুনশ্চ’ বলিয়া লিখিত হইয়াছে—এটুকু কবিব হস্তাক্ষর,—কবি স্বয়ং লিখিয়াছে,—“তোমাব চিকিৎসাব জ্ঞান হাবজ্জ'কে পাঠাইলাম, কিন্তু নবাবিষ্কৃত, গবেষণাপ্রসূত, তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রণালী তোমার মনঃপূত হইল না। পাড়ারগায়ের একটা হাতুড়ে ডাক্তারই তোমার ইষ্টদেবতা হইল! তোমাব এ ব্যবহারে আমি যথেষ্ট বিরক্ত হইয়াছি—তাহার উপর, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করিয়াও শুনিতেছি, রিভালের বাড়ীতে আছ। এখন আর তোমার দেখানে থাকা ভাল দেখায় না। দুই দিনের মধ্যে তুমি নিজের বাড়ীতে আসিবে, নহিলে আমাদের সহিত তুমি সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাও, আমরা ইহাই বুঝিব। এখন বুঝিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয়, সেইমত কার্য্য করিযো। ইতি—”

তথাপি যখন জাক রিভাল-গৃহ ত্যাগ করিল না, তখন শাল'কে আসিতে হইল। ডাক্তার রিভাল সাদবে আর্জান্ট'গৃহীণীকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহার প'ব জাকের কথা উঠিলে ডাক্তার বলিলেন, “আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে ফিরতে দিইনি, মাদাম। ও'ব শরীর যে

রকম খারাপ, তাতে খুব কড়া তণাবকে ওকে না রাখলে তুমি ওকে কোনমতেই ধবে রাখতে পারবে না। হাবজ্জ' এসে কতকগুলো মৃগনাভি আর উগ্র বিব দিয়ে ও'ব মাথা গরম করে দিয়েছিল—সে অবস্থায় আব দু'তিন দিন থাকলে জাককে আর তুমি চোখেও দেখতে পেতে না! ভাগ্যে আমি সময়-মত ওকে নিয়ে এসেছিলাম! এখন বিপদটা কেটে গেছে বটে; তবে এখনও ও'ব অবস্থা সম্পূর্ণ নিবাপদ নয়। ওকে আব কিছুদিন আমার কাছে বেখে যাও। তার পর যখন আমি বুঝব, ও বেশ সেরে উঠেছে, তখন আমিই ওকে আরাম-কুঞ্জে পাঠিয়ে দেব—তাব জ্ঞান কোন কথা আব ওকে লিখতে হবে না। ছেলেকে বাঁচাতে চাও যদি ত, লোকের কথায় কাণ দিয়ো না।”

জাক কহিল, “মা, আমার তা হলে নিয়ে যাবে, তুমি?”

“না, না, জাক, যেখানে তুমি ভাল বোধ, সেইখানেই থাক। ডাক্তার বিভাল তোমার ধাত বোঝেন, তাঁ'ব চিকিৎসায় নিশ্চয় তুমি উপকার পাবে।”

মাকে ছাড়িয়া জাক যে কখনও স্থবী হইতে পারিবে, এখানে এই সেবা-শুশ্রূষার মধ্যে আসিবার পূর্বে জাক নিজেই তাহা ভাবিতে পারে নাই। এ স্ত্রের কল্পনাও তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই।

সেসিলকে আদর, ডাক্তারকে ধন্যবাদ ও পুজকে সাধুনা দিয়া দুইদিন পবে শাল'ও বিদায় গ্রহণ করিল। যাইবার সময় পুজকে একান্তে ডাকিয়া শাল'ও কহিল, “জাক, তুমি আমার নিম্ন-মত চিঠি লিখো। যখন কিছু চাইবার দরকার হবে, তখন পোষ্টমাষ্টারের ঠিকানায় আমার নামে চিঠি দিয়ো, আমি তা গোপনে পাবার ব্যবস্থা করব। অনেক সময় তোমাকে যে সব কথা লিখি, তা বাধ্য হয়েই লিখতে হয়—সে আমার মনের কথা নয়, জাক। উনি যা বলেন, সামনে বসে আমাকে তাই লিখতে হয়। এবার থেকে সে-রকম চিঠির তলার কোণে একটা লাইন টেনে দেব। লাইন-টানা চিঠি পেলে তুমি জেনো, সে চিঠি আমি ওঁর কথামতই শুধু লিখেছি। তার জ্ঞান মিছে মন খারাপ করো না।”

শাল'ও আপনাব অবস্থা আর গোপন রাখিতে পারিল না। এ দাসত্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাহা হইতে মুক্তি-লাভের এখন আর কোন উপায় নাই। কি ভার-গ্রস্ত জীবন! তবুও বহিতে হইবে,—গত্যন্তর নাই।

শাল'ও চলিয়া গেলে ডাক্তার একদিন বন-ভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল, জাক ও সেসিল প্রত্যুষেই যাত্রা করিবে, যোগী দর্শনাস্ত্রে ডাক্তার আসিয়া তাহাদের সতিত যোগ দিবেন।

সেদিন সমস্ত জড়তা ত্যাগ করিয়া পৃথিবী প্রভা'তে

তখন জাগিয়া উঠিতেছিল। পাখীর গানে, সূর্যের আলোয়, বামিনীর নিরানন্দ ভাব ঘূচিয়া চাবিধারে একটা আনন্দ বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল। এমনই সময়ে জাক ও সেসিল পথে বাহির হইল। গ্রামের পথ ক্রমে ফুরাইয়া আসিল,—মাঠের বৃক চিরিয়া সীঁথির মত সরু পথ চলিয়া গিয়াছে, জাক ও সেসিল ক্রমে সেই পথে চলিল। কৃষকের দল তখন ক্ষেতে চলিয়াছে, কারিকরের দল ব্যস্তভাবে কারখানার দিকে ছুটিয়াছে,—ধীরে ধীরে কর্ণ-কোলাহল জাগিয়া উঠিতেছে। ক্রমে তাহারা ক্ষেত ছাড়িয়া, পাড়া ঘুরিয়া নদীর ধার দিয়া নির্দিষ্ট স্থলে আসিয়া পৌঁছিল।

ফুলের বাণিতে বর্ণ-গন্ধ উৎসারিত, বিহঙ্গের কল-কাকলীতে চাবিধাব মুখরিত,—এ যেন দ্বিতীয় নন্দন! জাকব মনে হইল, বিধাতার সৃষ্টিব মধো জাক ও সেসিল ছাড়া কোথাও আর কোন নর-নারী নাই, তাহারা যেন সেই আদি-কালের আদম ও ইল। এ সৌন্দর্য্য, এ শোভা, যেন তাহাদেরই চিত্র-বিনোদনের ভঙ্গ। এমন স্থান, এমন ক্ষণ, এমন আবেশ-কল্পিত মিলন-প্রার্থী দুইটি তরুণ তুণিত প্রাণ! সেসিল মৃত দৃষ্টিতে জামল প্রান্তবের পানে চাতিয়াছিল। জাক ধীরে ধীরে তাহার হাত ধবিল—সমস্ত দেহে একটা বিদ্যৎ খেলিয়া গেল। গাঢ় কল্পিত কণ্ঠে জাক ডাকিল, “সেসিল—”

“জাক—”

কাহারও মুখে আব কথা সরিল না! জাকের দুই হাতের মধো সেসিলের হাত—উভয়ের হাতই কাঁপিতেছিল। কি এক আনন্দের মুচ্ছনায় উভয়েরই প্রাণ ত্ব-ত্ব কবিতা উঠিল। এ কি মোহ! প্রাণের ভিতর এ কি দারুণ উত্তেজনা! ভাবোচ্চল চিত্ত যেন আজ সকল বন্ধন ভিন্ন বিপর্যাস্ত কবিতা দিতে চাহে।

সেসিলের গৌর হস্তের কোমল অঙ্গুলিগুলির দিকে জাক চাতিয়া বহিল। কচি কিসলয়ের মত এই অঙ্গুলি যেন মোহন স্পর্শে কি তাহার বকের দারুণ ক্ষতের দাং শাস্ত হইবে না? ইহা কি নিতাস্তই দুর্ভাগ্য, ভগবান! একটা লালিমা ফুটিয়া উঠিয়া সেসিলের স্তম্ভব মুখখানিকে লাল-বস্ত্র, সজ-বিকশিত গোলাপের মতই ললিত মনোরম করিয়া তুলিল।

বহু চেষ্টায় সেসিলের মুখে কথা ফুটিল। স্বর গাঢ়, কল্পিত। সেসিল কহিল, “কেন জাক, বল—কি বলবে, বল। তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে?”

জাকের ললাটে খেদ-বিন্দু ফুটিয়া উঠিল। জাক কহিল, “কষ্ট! না, সেসিল, এ অপূর্ণ সুখ! এমন সুখ জীবনে কখনও আমি উপভোগ করি নি, কল্পনাও করি নি।”

তাহার পর আবার উভয়ে নীরব রহিল। এমনই

ভাবে বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা অদূরে ডাক্তারের কণ্ঠস্বর উভয়ের চমক ভাঙ্গিল! উভয়ে ত্রস্তভাবে কানন-কূটীবে আসিল।

তখন তিনজনে নানা বিষয়ে কথা হইল। স্তম্ভব দৃশ্য, চারিধারে অপূর্ণ পরিচ্ছন্নতা!

ভোজনের পর ডাক্তার কহিলেন, “তোমার কোন অসুখ কছে না ত জাক?”

অসুখ! না,—অসুখ নয়, তবে অস্বস্তি! এমন মধুর দিন—হাস, কেন ফুরায়? এমন স্বপ্নময় ভাবময় মুহূর্ত্ত অবিরাম নয় কেন?

জাক আজ স্পষ্ট বুঝিয়াছে, সেসিলকে সে ভালবাসে। কিন্তু এ ভালবাসার পরিণাম কি! তাহাদের উভয়ের মধো যে অলজ্ঞা ব্যবধান! কিন্তু সেসিল কি তাহাকে ভালবাসে? বাসে বৈ কি! নহিলে তাহারও মুখে কথা সরিতেছিল না, কেন? তবে কি সেসিলকে—?

না, তাহা হইবে না। সরল বালিকার সরল হৃদয়ের সহিত আব এ নিষ্ঠুর খেলা সম্ভব নহে! তাহার অদৃষ্টে যত দুঃখ আছে, পূর্ণ মাত্রায় সে তাহা ভোগ করিতে প্রস্তুত! কিন্তু বেচারী সেসিল—তাহার পায় কুশাহুরটিও সে বিধিতে দিবে না! সেসিলের সমুখে জাক আর মোহের জাল বিস্তার করিবে না! ভাল থাক, সুখে থাক, তুমি সেসিল, নন্দনের অপ্সরী, স্বর্গের দেবী,—তোমার কেশাগ্র স্পর্শ-করিতে-অযোগ্য, হতভাগা জাক আর তোমার সুরের পথে দাঁড়াইবে না। তোমার জীবনে সে কোন খড় তুলিবে না! সে এখান হইতে চলিয়া যাইবে, দূবে—দূবে—বহু দূরে চলিয়া যাইবে!

তাহাকে যাইতেই হইবে যেমন করিয়া হোক, সে চলিয়া যাইবেই!

একদিন প্রভাতে রিভালের নিকট আসিয়া জাক আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল।

রিভাল কহিলেন, “ঠিক বলেছ, জাক। এখন তুমি আরাম হয়েছ, কাজ করবাবও বল পেয়েছ, আর তোমার বসে থাকা উচিত নয়। পুরুষ-মানুষ,—একটা কাজ-কর্মের চেষ্টা দেখা দরকার।”

মুহূর্ত্তের জগ্ন জাক তত্ত্বভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তারের দৃষ্টিতে একটা দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া সে কেমন বিচলিত হইল!

সহসা ডাক্তার বলিলেন, “আমাকে আর কিছু বলবার নেই, জাক?”

জাকের মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল। তবে,—তবে কি ডাক্তার—? সে কহিল, “না, আর কিছু নয়—”

“কিন্তু জাক, আমার মনে হচ্ছিল, যেন আমাকে আরও কিছু তোমার বলবার আছে। আমি ছাড়া ত

সেসিলের আর কেউ নেই! তার সম্বন্ধেও কোন কথা আমাকে বলবার নেই? বল, সন্ধ্যা কিসের?”

জাক কোন কথা না বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল।

ডাক্তার স্নেহে কহিলেন, “কেন্দো না, জাক—কোন জিনিসই অসম্ভব বলে মনে করো না! বল!”

জাক কহিল, “তা কি সম্ভব দাদামশায়? আমাব মত একটা লক্ষ্মীছাড়া কবিকর—ছোটলোক—”

“এত অধীব হচ্ছ কেন, জাক? চেষ্টায় কি না হয়? পরিশ্রম কব, জীবনের গতি ফেরানো শক্ত নয়! যদি বল, কিসে আবার উঠতে পাববে—আমার মত চাও যদি—?”

বাধা দিয়া জাক বলিল, “না না, শুধু তা নয়—দাদামশায়! আপনি জানেন না, কি গভীর দুর্লভ্য ব্যবধান আমাদের দুজনের মধ্যে—। আমি—আমি—আমার মা—”

শাস্ত্র অটল অকম্পিত স্বরে ডাক্তার কহিলেন, “জানি জাক, সে আমি সবই জানি—”

“তবে,—তবে—?”

“তবে—! তবে আর এক নতুন কথা শোন, জাক! সেসিলের ভাগ্যও তোমারই মত,—না, বরং আবও মন্দ! তবে শোন, তার জন্ম-বৃত্তান্ত—সে এক শোচনীয় কলঙ্কে বম্বুভেদী ইতিহাস।”

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### পুরাতন কাহিনী

ডাক্তার রিভালের পড়িবার ঘরে উভয়ে আসিয়া বসিল—জাক ও ডাক্তার রিভাল। জানালা খোলা ছিল। তাহারই মধ্য দিয়া বহুব-বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তব দেখা যাইতেছিল,—শব্দেব শাস্ত্র উজ্জ্বল শোভায় ঝল-মল করিতেছে। প্রান্তরের শেষে গ্রামের জীর্ণ কবর-ভূমির প্রাচীন দেওয়াল মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঝড়ি গাছের উচ্চ শিরশা রৌদ্র-কিরণে রোপ্যমণ্ডিত বলিয়া মনে হইতেছিল। ভগ্ন দেওয়ালের অন্তরালে ছুই-চারিটা কবরের ক্রুণ-দণ্ড বিরট গাভীর্যের মূর্তি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রিভাল বলিলেন, “ঐ যে গোরস্থান দেখা যাচ্ছে, ওখানে বোধ হয়, তুমি কখনও যাওনি, জাক! গেলে দেখতে, একটা গোবের উপর একখণ্ড সাধা পাথরে শুধু ‘মাদুলীন’ নামটি লেখা আছে। মাদুলীন আমার মেয়ে—সেসিলের মা—ওটি তারই গোর। আমাদের বংশের আর কারও গোর ওখানে নেই।”

ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন, পবে বলিলেন, “সেই কথাই তোমায় সব বলছি, শোন।”

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, “মৃত্যুর পর তাহাকে যেন একান্তে নিভুতে কবর দেওয়া হয়, কাতরভাবে বার বার সে এই অমরোথ করিয়াছিল। রিভাল কি অপর কোন নামের সংস্পর্শ যেন তথায় না থাকে, শুধু লেখা থাকিবে, ‘মাদুলীন’। তাহার নাম-সংযোগে তাহার বাপের বংশে যেন এতটুকু কালিমা না লিপ্ত হয়! অভাগিনী কণ্ঠা আমাব! তাহাব আত্ম-সম্মান, তাহার নাবী-গর্ভ এ সঙ্কল্প অটল রাখিয়াছিল।

“সে কি দুঃখের দিন, জাক, যেদিন তাহার বিকচোগুথ নবীন জীবন অব্যালে পুষ্পের মতই ররিয়া গেল। আমবা তাহা সহ্য করিলাম,—এই নির্জনে মাটিতে শয্যা রচনা করিয়া তথায় তাহাকে শয়ন করাইলাম। হৃদয় না পাষাণ—রেখাই শুধু পড়ে, ভাঙ্গে না!

“সে কোথায় যাইবে? আজও আমার এই জীর্ণ অস্থিগুলার মাঝে, এই জীর্ণ বৃকে মাদুলীনের কোমল স্তন্যর মুখ যে জাগিয়া আছে—সে মুখ কি তুলিবার? কিন্তু সে কথা যাক! এ নির্জনবাস, মৃত্যুর পর এ দ্রুপিত নির্কাসন কেন? কিসের জ্ঞা? কি অপরাধ করিয়াছিল সে? কিছু না! যদি অপরাধ কাহারও থাকে, তবে সে আমাব! এই নির্কোষ, মূর্খ বৃদ্ধ—তাহার অপরাধের শাস্তি, অভাগিনী আপনার শিরে সে বহন করিল।

“একদিন,—সে আজ আঠারো বৎসরের কথা—এই নভেম্বর মাসেই হঠাৎ বাহিরে আমার ডাক পড়িল,—এখনই যাইতে হইবে! একটা দারুণ হৃৎটনা ঘটিয়াছে! একদল শিকারী আসিয়াছিল—এমন প্রায়ই আসে—তাহাদের মধ্যে একজনের বন্দুক ফাটিয়া পায় গুলি লাগিয়াছে—বুঝি বা প্রাণ-সংশয়।

“তখনই ছুটিলাম! আশীর গৃহে এক শয্যার উপর লোকটি শুইয়া ছিল—সুন্দর, স্ত্রী, তরুণ যুবক, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না! বেশ বলিষ্ঠ, স্রগঠিত দেহ, তরল চক্ষু, দীর্ঘ পশ্ম, নির্ভীক হৃদয়।

“গুলি বাহির করিলাম। আশ্চর্য অকম্পিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া রহিল! আমাকে সে ধস্তাবাদ দিল—বেশ পরিকার বিপুল করাসী ভাষায়! তেমন অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরিত কবা যায় না, বাজেই আশীর গৃহে সে রহিল। আমি প্রতাহ তাহাকে দেখিতে যাইতাম। ক্রমে আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। বন্ধু শিকারী-দেব নিকট হইতে তাহার নাম শুনিলাম, কাউন্স্ নাদিন—জাতিতে সে রুশ, সম্ভ্রান্ত-বংশীয়!

“মাঝাতটা কঠিন, তবে স্বাস্থ্য ভাল ছিল বলিয়াই নাদিন সে যাত্রা শীঘ্র সারিয়া উঠিল। আশীব সে কি সেবা-যত্ন! ক্রমে দুইএক পা করিয়া সে চলা শুরু

করিল। একদিন আমি বলিলাম, ‘এ নিরুজ্জ্বল একা থাকিতে কষ্ট হয় ত আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসিতে পার।’ সে সানন্দে ধন্যবাদ দিল।

‘রোগী দেখিয়া ফিরিবার সময় আমার গাড়ীতে তাহাকে উঠাইয়া লইতাম। আমাদের সহিত একত্রে সে ভোজন করিত। যেদিন বুষ্টি কি অন্তরিক্ত কুয়াণা নামিত, সেদিন রাতে এখানে সে থাকিয়াও বাইত।

সত্য বলিতে কি, এই পাপিষ্ঠটাকে আমি ভাল-বাসিতাম—তাহার প্রতি একটা প্রণা অমুরাগ জন্মিয়াছিল, একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা। বৃষ্টিতাম না, এত কথা, এত বিষয় সে কি করিয়া জানিল, কোথা হইতে শিখিল! কিন্তু সে যেন সব জানিত, সব বুঝিত! সে নাবিকের কাজ জানিত, সৈনিকের দলেও ছিল, সাধা পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছে, ঔষধ-পথ্যাদি লইয়াও আমার জ্বর সহিত তর্ক করিত—মাদলীনকে গান শিখাইত! এত বিদ্যা! এত জ্ঞান! একটা অক্ষ মোহে সে আমাদের সকলকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। আমার ত দ্বিতীয় চিন্তাই ছিল না, ঝড়-বুষ্টির মধ্য দিয়া অন্ধকার রাতে যখন গৃহে ফিরিতাম, তখন পথের কষ্ট মনেই আসিত না, শুধু দীপ্ত আশার বৃক ভবিয়া উঠিত, গৃহে ফিরিয়া দেখিব, আমার সহিত গল্প কবিতার জগৎ, আমারই পথ চাহিয়া নাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! দারুণ ছুরোগেও অশ্রের গতি বাড়াইতাম,—কখন পৌছিব, সপদিবারে বসিয়া নাদিনের গল্প শুনিব! এ বিষয়টি মোহ অমুরাগ দেখিয়া জ্ঞা প্রায়ই বকিতেন। একটা অপরিচিত বিদেশীকে লইয়া এতখানি মাখামাখি করা তাহার বড় মনঃপূত হইত না। থাকুক না প্রণয়, তাই বলিয়া এতটা বাড়াবাড়িই কি করিতে হয়! নিত্য একত্রে ভোজন, এক গৃহে শয়ন! এত কেন? আমি সে কথা উড়াইয়া দিতাম, বিক্রম করিয়া বলিতাম, মেঘমাছুষের এমনই ছোট মন! হুনিয়ার লোককে সন্দেহ, অবিশ্বাস,—ছিঃ! জ্ঞা আর কিছু না বলিয়া নীরব হইতেন, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা অশান্তি আগিয়া যে তাঁহাকে যথেষ্ট পীড়িত করিয়া তুলিত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম। বুঝিয়াও আমি সে দিকে মন দিতাম না!

‘ক্রমে নাদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল,—চলিতে ফিরিতে বেশ মজবুত। কিন্তু তাহার নড়িবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না! এই অনাড়ম্বর পল্লীগ্রামে তাহাকে মুগ্ধ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু শুধুই কি পল্লীগ্রাম, না, আর কিছু? সে প্রশ্ন মনেও উঠে নাই!

‘শেষে একদিন জ্ঞা আমার চোখ ফুটাইলেন! জ্ঞা বলিলেন, ‘ওগো, শুনছ?’

‘আমি বলিলাম, ‘কি?’

‘জ্ঞা বলিলেন, ‘দেখ, নাদিনের মতলব কি, তা সে স্পষ্ট খুলে বলুক! পাড়ার লোকে নাদিন আব মাদলীনের নামে কাণা-ঘুসা আরম্ভ করেছে—এত ভাল নয়!’

‘আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম,—কহিলাম, ‘কেন? মাদলীন আবার কি করেছে?’

‘আমার ধারণা ছিল, আমার সঙ্গে গল্প কবিতার জগৎ, আমারই সাহচর্য্য ভোগ কবিতার জগৎ নাদিন সুস্থ হইয়াও বিদায় লইতে পারিতেছে না, এখানে রহিয়াছে! আমরা যে সন্ধ্যার সময় একত্রে খেলা করি, গল্প করি,—সেই খেলা-গল্পের জগৎই শুধু! মুঢ় আমি! আমার কল্পা মাদলীনের দিকে কখনও চাহিয়া দেখি নাই। নাদিন আসিলে তাহার মুখ কি আনন্দে-উজ্জ্বল রাঙা হইয়া উঠিত, সবমে তাহার কথা ও গতি কেমন বাধিয়া বাইত, নাদিন না আসিলে মলিন মুখে আকুল নেত্রে পথের পানে সে চাহিয়া থাকিত, এ সকল লক্ষ্য কবিতার আমার অবসরই ছিল না, অথচ মাদলীনের এ ভাবান্তর দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হইয়া উঠিত, এতটুকু গোপন বহিত না—আমি অন্ধ, তাই কিছু দেখি নাই।

‘বাহা হউক, দেখিতে বিলম্ব হইল না। প্রমাণও মিলিল,—মাদলীন তাহার মাকে বলিয়াছে, নাদিনকে সে ভালবাসে, নাদিনও তাহাকে ভালবাসে—গভীর সে ভালবাসা, তাহা মুছিবার নহে, ভুলিবার নহে, মিলাইবার নহে! আমি কাউন্সেল নিকট ছুটিলাম—কি তাহার অভিপ্রায় জানিতে চাই! এখনই, আর বিলম্ব নহে!

‘নাদিন স্বীকার করিল—তাহার স্বরে এমন একটা আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিল যে, সে কথা মর্মে গিয়া বিধিল। নাদিন মাদলীনকে ভালবাসে, সে তাহার পাণি-গ্রহণে অভিলাষী। এ মিলনে বাধা কি, তাহাও সে খুলিয়া বলিল। অভিজ্ঞাত বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, পিতা জীবিত, বংশাভিমান তাহার অত্যন্ত প্রবল,—তাঁহার মন পাওয়া কঠিন ব্যাপার। মত না পাইবারই আশঙ্কা। তথাপি সে বলিল,—পিতার ক্রোধের ভয়ে সে হঠিবে না। মাদলীনকে না পাইলে সে বাঁচিবে না। সে সাবালক, নিজের কিছু বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছে—পিতার অর্থে বঞ্চিত হইলেও সুখে স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিবে, এমন সংস্থানও তাহার আছে! পরিপূর্ণ স্বচ্ছন্দতা না হইলেও মাদলীনকে কোন দিন কষ্ট পাইতে হইবে না। শুধু সে আমার মতাপেক্ষী—আমার উপর শুধু তাহার নহে—দুইটি প্রাণীর সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।’

ডাক্তার স্থির হইলেন। বাহিরে একটা বৃক্ষ শাখা হইতে বায়ুতাড়নে সহসা একটা শুক পত্র ছাত হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নামিয়া পড়িতেছিল, ক্রমে সেটি মাটিতে পড়িয়া গেল—ডাক্তার সেই পত্রটার প্রতি চাহিয়া মুহূর্তের জগৎ নীরব রহিলেন। জাক কহিল, ‘তার পর?’

ডাক্তারের যেন চমক ভাঙ্গিল ডাক্তার একটা নিখাস ফেলিয়া কহিলেন, “হ্যা—তার পর ভবিষ্যৎ জামাতার সমস্ত গৌরব আদর লইয়া, একদিন সে আমার গৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। আমার মনে হইতেছিল, কেমন চট করিয়া যেন সব হইয়া যাইতেছে, অত্যন্ত দ্রুতভাবে—আমার মাদলীনীর সমগ্র জীবনের সুখ ইহার উপর, এই বিবাহের উপর নির্ভর করিতেছে! স্ত্রী বলিলেন, ‘ও যা বললে, তাই মেনে নিলে! কোন খোঁজ-খবর নেবে না? বিদেশী লোক, কোথায় ঘর, কি বৃত্তান্ত; ঠিক নেই। মেয়েটাকে অমনি রাস্তার লোকের হাতে তুলে দেবে?’ তাহার-সন্দেহভাৱ আবার আমি হাসিলাম; লোকটির প্রতি আমার এমনই বিশ্বাস পাঁড়াইয়াছিল,—তবু একদিন ব-বিভাগের ম্যানেজারের নিকট কথাটা পাড়িলাম। তিনি বলিলেন, কাউন্ট নাদিনের সন্ধানে তিনি এমন কিছুই জানেন না—তবে শুনিয়াছেন বটে, সে বড় বংশে জন্মিয়াছে এবং লেখাপড়াটাও ভাল শিখিয়াছে। কিন্তু মেয়ের বিবাহ দিতে হইলে ক্রম রাজদূতের অফিসে সংবাদ লওয়া যে বিশেষ প্রয়োজন, একথাটাও তিনি বার বার আমাকে বলিয়া দিলেন, কারণ তাহাদের অফিসে বড় বড় বংশগুলির সন্ধানে সকল সংবাদই পাওয়া যাইবে।

“তুমি ভাবিতেছ, জাক, এক কথা শুনিয়া আমি রাজদূত অফিসে সংবাদ লইয়াছিলাম! না। সেদিকে আমার কোন চেষ্টাই ছিল না, এমনই অলস আমি! সারা জীবনে আমার এ বোগ সাবিল না—যাহা কবা উচিত মনে ভাবিয়াছি, তাহা অবদেহগুলাও যদি করিতাম! স্ত্রী পাঁড়াপাড়ি আরম্ভ করিলেন, ‘খোঁজ নাও, খবর নাও’—আমি মিথ্যা বলিয়া সকল দায় এড়াইলাম। স্ত্রীকে বলিলাম, ‘খোঁজ পাইয়াছি—নাদিনের কথা খাঁটি সত্য!’

“স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন। হায়, সরলা, বিশ্বস্তহৃদয়া মারী! কিন্তু একটা কথা এখন বুঝিয়াছি,—আমি পারিতে সংবাদ লইতে চলিয়াছি ভাবিয়া পায়ও কি ডয়াকুল হইয়া উঠিত! কিন্তু তখনও কিছু বুঝি নাই! ভবিষ্যতের সুখের কল্পনায় আমি বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার মাদলীনী সুখে থাকিবে! আরামে থাকিবে! আর কি চাই!

“স্নীতের শেষে কাউন্টের নিকট অসংখ্য পত্র আসিতে লাগিল। সেও পত্র লেখায় অসম্ভব মন দিল। শুনিলাম, পিতার সহিত তাহার উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিয়াছে। সে আমাকে পত্র দেখাইত, কতকগুলি চিত্র-বিচিত্র-করা ছব্বোধ বিদেশী ভাষা, আমি তাহার বিন্দুও বুঝিতাম না। যত না বুঝিতাম, বিশ্বাস ততই প্রবল হইতেছিল। কতকগুলি নাম শুধু বুঝিতাম, আইডানোভি, ষ্টিফানো-ভিচ—এমন কত নাম। মাদলীনী হাসিয়া কহিত,

তোমার এতগুলি নাম নাকি? তাহার নাম শুধু মাদলীনী রিভাল। হ্যা জাক—সে পাষাণের সত্যই অসংখ্য নাম ছিল। শেষে একদিন শুনিলাম, নাদিনের পিতা বিবাহে মত দিয়াছে। আমি যেন বাঁচিলাম। পিতার অভিশাপ ও রোষ মাথায় লইয়া নবীন জীবন আরম্ভ করিবে, এই চিন্তাটা কীটার মত আমার প্রাণে বিধিত ছিল। বিবাহে আপত্তি নাই! আমি মনে অত্যন্ত আনন্দ পাইলাম।

“বিনা আড়ম্বরে একদিন এতিয়ালে বিবাহ হইয়া গেল। ঐ গির্জাঘরে—এদিকে আসিতে ডাহিনে ঐ যে ছোট গির্জাটা! কি আনন্দ, সে কি সুখের দিন! শুধু পিতার প্রাণই সে আনন্দ বুঝিতে পারে। কম্পিত হস্তে কস্তার কম্পিত কর ধরিয়া তাহার দিকে চাহিলাম। আনন্দে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল! সেদিনকার গির্জার অর্গিনে যে সুর বাজিয়াছিল, তেমন সুর জীবনে আর কখনও শুনি নাই। সে যেন স্বর্গের বীণা—সে সুর এখনও আমার কানে লাগিয়া আছে!

“তার পর তাহারা হাসিমুখে বিদায় লইল। বিদায়ের সময় আমার বুক কি বেদনার ভাবে ভরিয়া উঠিয়াছিল! মুখে কথা ফুটিতেছিল না, চোখের কোণে শত চোঁতোতেও জল ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু মাদলীনীর মুখ সে বিদায়ের ক্ষণেও একটা অপূর্ণ হর্ষের দীপ্তিতে পূর্ণ, উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আমরা আশীর্বাদ করিলাম,—সুখী হও, সুখে থাক, বাছা আমার!

“তাহারা চলিয়া গেল। এমনভাবে যাহারা যায়, সত্যি তাহারা সব হাসি, সব আলো, সব আনন্দটুকুই সঙ্গে লইয়া যায়, রাখিয়া যায় শুধু বিষাদ, বেদনা, আর স্মৃতির দুর্লভ ভাবের রাশি। এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। সন্ধ্যার পর আমরা স্বামি-স্ত্রীতে শূন্য গৃহে দীপ জালিয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া তাহাদেরই কথা ভাবিতাম। গৃহের সে দারুণ নিঃসঙ্গতা, সে একান্ত অপরিহার্য নিঃসঙ্গতা, বিরাট লোহের মতই আমাদের বৃক্ক বাজিত! শুধু আমরা প-স্প-র দিক চাহিয়া থাকিতাম—কণ্ঠ কন্ড হইয়া আসিত, কথা ফুটিত না। তবু আমি দিনের বেলায় রোগী দেখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কতকটা অজমনক হইতে পারিতাম। কিন্তু স্ত্রী! এই ক্ষুদ্র নিরালা গৃহের প্রত্যেক কোণটি অবধি যেন অসহ বেদনা-ভার লইয়া বেচারীর বুক চাপিয়া ধরিত!

কস্তার বিরহ-দুঃখ যেন সজীব মূর্তি লইয়া তাহার আশে-পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। পরিভ্রমণের কোন উপায় ছিল না। নারীর ভাগ্যই এমন! তাহাদের সকল হর্ষ, সকল বেদনা গৃহকোণটিকে কেন্দ্র করিয়া গর্জিতে থাকে, চানিধারে অগ্নির দাহ জাগাইয়া তুলে—তাহারই মধ্যে পড়িয়া অভাগিনী নারীজাতি নিতা শু অসহায় নিকুপার



ভাবে সে দাহের যন্ত্রণা ভোগ কবে—নীরবে সব সহ্য করে। এই জানালা, ইহারই সম্মুখে মাদলীন দাঁড়াইত, এই চেয়ার—ইহাতে সে বসিত—এই খেলানা, ইহা লইয়া সে খেলা করিত—এই দোল, শিশু অবস্থায় ইহারই ক্ষুদ্র কোড়টিতে বসিয়া শুইয়া মাদলীন দোল খাইত। এই বই—সে পড়িতে ভালবাসিত—এই শয্যা, ঐ দেয়াল, এই পরদা, ঐ গাছপালা, প্রত্যেকটিতে তাহার কোমল হস্তের ললিত স্পর্শ যেন মাখানো রহিয়াছে। মাদলীন, মাদলীন, কোথায় তুমি! এস, এস, এ বিরহ যে আর সহ্য হয় না।

“কিন্তু এই দুর্বল মানুষ অসহ্য বেদনাও সহ্য করে। করিতে হয়। আমবাও ক্রমে সান্ত্বনালাভের চেষ্টা করিতাম। তাহারা এখন পিসায়, কাল ফ্লোবেজে যাইবে। তারপর—? শুধু প্রেম, শুধু প্রীতি সূর্য্যকিরণের মত তাহাদের পথ আলোকিত কবিতা রাখুক। পত্র আসিত, তাহারা কতদূর চলিয়াছে। ক্রমে তাহারা ফিরিবার সঙ্কল্প জানাইল। আমবা ঘর-দ্বার সাজাইতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম। এক একটি দিন যাইত, আমবা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম—তাহারা আসিতেছে।

“সেদিন রাত্রে রোগী দেখিয়া ফিরিতে বিলম্ব হইয়াছিল। স্ত্রী শয়ন কবিতাছিলেন। আমি একাই ভোজন করিতেছিলাম। সহসা বাহিরে বাগানে একটা ঘরিত পদশব্দ শুনিলাম। উদ্ভ্রান্তভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দ্বার খুলিয়া গেল। একে! মাদলীন! এ কি মূর্ত্তি! একমাস পূর্বে দেববালার মত অপূর্ণ কান্তিময়ী বেকজাকে হাসি ও অশ্রুর মধ্যে বিদায় দিয়াছি, এ কি সে-ই! বর্ণ মলিন, দেহ শীর্ণ, পাণ্ডু, উদ্ভাদের মত জীর্ণ বেশ, হাতে একটি ব্যাগমাত্র, চোখের কোণে কালির রেখা পড়িয়াছে, সারা দেহে শোকের এক করুণ ছবি! মনের উপর দিয়া যেন শ্রোণ্ড বহিয়া গিয়াছে,—কি এ মূর্ত্তি! করুণ স্বরে মাদলীন কহিল, ‘বাবা, আমি এসেছি।’

“আমি লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলাম, ব্যগ্রস্বরে কহিলাম, ‘ব্যাপার কি, মাদলীন? নাহিন কোথায়?’

“সে উত্তর না দিয়া চক্ষু মুদিল। সে কাঁপিতেছিল। কি ভীষণ কম্পন! আমি তাহার মাথার হাত রাখিলাম। আমার হৃৎক! তখন আমবা খাস রক্ত হইয়া আসিতেছিল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া বলিলাম, ‘বল, মাদলীন, তোমার স্বামী কোথায়?’

“আমার মুখের দিকে চাহিয়া কাতর স্বরে সে কহিল, ‘নেই। ছিলও না।’

“তাহার পর আমাবই পাশে বসিয়া সে আমার সব কথা খুলিয়া বলিল। সে এক ভীষণ, মর্মান্বজী কাহিনী—বিসাণের মতই তাহা গভীর, করুণ! সে কাউজ

নহে। তাহার নামও নাহিন নহে। দক্ষিণ কৃষ্ণবাগী একজন ইহুদী সে—নাম, রাস্ক। একটা হস্তভাগা জালিয়াত—কোন দিকে কোন উপায় না দেখিয়া জাল-জুয়াচুরি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিতেছিল। পূর্বে রিগায় একটা বিবাহ করিয়াছিল—সেন্টপিটার্সবার্গেও একটা,—তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। তাহার কাগজ-পত্র জাল—সে নিজের হাতে জাল করিয়াছিল। ক্রমে সে ইন্দোনিং নোট জাল করিয়া খাইত। তাহার নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইয়াছিল, টিউবিনে সে ধরা পড়ে।

“ভাব, জাক, আমার মেয়ের কথা,—একা, সেই বিদেশে—স্বামীর নিকট হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে বিচ্যুতা, পরিত্যক্তা মাদলীন, সহস্র ক্ষুণ্ণিত দৃষ্টির সম্মুখে একটা জালিয়াতের জীর্ণপে,—স্ত্রীই বা কোথা, জাক? ধরা পড়িয়া সব কথা নাহিন স্বীকার করিয়াছিল।

“একটা কথা তখন শুধু মাদলীনের মনে জাগিতেছিল,—জগতে তাহার যে একটি মাত্র আশ্রয় আছে, তাহার শিতার গৃহ, মাতার কোড, সেখানে সে ফিরিবে—যেমন করিয়া পারে। তাই অতি কষ্টে টেশনের এক তরুণ কর্মচারীর কুপায় কোনমতে সে গৃহে ফিরিয়াছে। সে পাপিষ্ঠ তাহাকে বাহা-কিছু দিয়াছিল, সব সে একটা হোটলে ফেলিয়া আসিয়াছে, কিছুই লইয়া আসে নাই। বলিতে বলিতে মাদলীনের চোখে বান ডাকিল। আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম, কহিলাম, ‘স্থির হও, মাদলীন, চুপ কর, তোমার মাকে ডাকি।’ আমার কঠিন চোখেও জল আসিয়াছিল।

“পরদিন স্ত্রী সব কথা শুনিলেন। তিনি তিরস্কার করিলেন না—শুধু আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে একবার চাহিলেন, বলিলেন, ‘গোড়া খেকেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল—এ বিষয়ে একটা কিছু অবতন ঘটবেই।’ লোকটাকে প্রথম দেখিয়া অবধি তাহার মনে কেমন এক আতঙ্ক জাগিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান লইয়া আমরা গর্ব করি। কিন্তু এই অশিক্ষিতা নারীর অন্তরে যে ভাব গুমরিয়া উঠিয়াছিল—যে ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিজ্ঞান,—তাহার কাছে আমাদের শিক্ষা-গর্ব লজ্জার মাথা হেঁট করে। আমার কজার প্রত্যাগমন-সংবাদ পাড়ায় পরদিনই রাষ্ট্র হইয়া গেল।

“সকলেই আসিয়া উঁকি দিল। ব্যাপার কি? তোমার মেয়ে ফিরিল যে। জামাই কোথা—খবর কি তার, ভাল আছে ত? জীবনে কখনও রক্ত হই নাই—কিন্তু সেই একদিন রক্ত স্বরে সকলকে বিদায় দিলাম। মাদলীন ও আমার স্ত্রী কখনও বাড়ীর বাহির হইতেন না—পল্লীর কৌতুহল দৃষ্টি হইতে আশানাগিকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রাখিলেন।

“তখনও আমি বিপদের সবটুকু জানিতে পারি নাই।



মাদলীন সে কথা আমাকে ধুলিয়া বলে নাই যে, এই হের মিথ্যা বিবাহ অভিনয়ের ফলে সে অন্তঃস্বপ্না! সে কি বিবাহে আমাদের মন আচ্ছন্ন হইল! জারজ সন্তান প্রসব করিবে—মাদলীন? হা ভগবান! মাদলীন নীরবে বসিয়া লেপ-কাঁধা সেলাই করিত, ছোট পোষাক তৈয়ার করিত সন্তানের জন্ত! হউক জারজ—তবু সে সন্তান,—মাতার সে আনন্দ, গর্ভ, গাভ্রনা! বেচারী দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল—তাহার মুখে দীর্ঘ পাণ্ডুতা বাড়িয়াই চলিয়াছিল! সর্বদাই সে কি ভাবিত!

“আমার স্ত্রী বলিলেন, ‘সারা দিন-রাত ও মন গুমরে থাকে, কাঁদে। সে লক্ষীছাড়াটাকে ও ভুলতে পারে নি, ভালও বাসে।’

“যথার্থই মাদলীন সে পাণ্ডু বর্ষরটাকে ভালবাসিত। আমার স্ত্রী তাহাকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে মাদলীন নিবারণ করিত। মৃদু ভাবে কম্পিত স্বরে শুধু বলিত, ‘কি হবে, আর ভেবে, মা! সব আমার অদৃষ্ট! কি করবে তোমরা?’ সে পাণিষ্ঠকে ভুলিতে পারে নাই বলিয়াই দারুণ অশুশোচনায়, লজ্জায়, ঘৃণায়, সে মরণের পথে চলিয়াছিল—এবং সেসিলকে আমাদের দীর্ঘ বৃকে তুলিয়া দিবার অল্পদিন পরেই সে একদিন আপনার দুর্ভাগ্য বেদনা-ভার হইতে মুক্তি লাভ করিল।

‘তাহার মৃত্যুর পর তাহার শয্যাভল হইতে একখানি পত্র বাহির হইল—পত্রখানি শত-ভাঁজে মলিন, ছিন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। সে পত্র নান্নিনের—প্রথম জ্ঞাপন করিয়া মাদলীনকে এই পত্র-স্বারাই পাণিষ্ঠ প্রলোভনের জাল পাতিয়াছিল। মাদলীন এই পত্রখানিকে কেবলই পড়িত—বৃকে করিয়া রাখিত! আহা, বেচারী! বেচারী মাদলীন!

“তুমি অবাক হইতেছ, জাক—একটা ক্ষুদ্র পল্লীর এক প্রচ্ছন্ন কোণে এত বড় একটা হৃদয়-ভেদী নাটকের অভিনয় হয়—ইহা কি সম্ভব! ইহাকেই বলে, অদৃষ্টের পরিহাস! লতাপাতার আড়ালে ঘেরা ক্ষুদ্র কুটারেও এ ঘটনা ঘটে। যুদ্ধের সময় মাঠের প্রান্তে কর্ণ-বত দরিদ্র হতভাগা কৃষক কিংবা স্থল-কিরতি কোন নিরীহ বালকের গায় সহসা বর্ণক্ষেত্র হইতে গোলা ছুটিয়া তাহাকে যেমন মৃত্যুর গম্বরে ঠেলিয়া দেয়, এও যেন ঠিক তেমনই—তেমনই শূন্য, তেমনই বর্ষর!

“সেসিলকে লইয়া সাধনা পাইলাম। গাঢ় অন্ধ-তাপের আলায় পলে পলে জলিয়াও সেসিলের মুখ দেখিয়া বাঁচিতে হইল। এহিলে মাদলীনকে হারাইয়া বাঁচিবার কথা নয়। আমাদের একমাত্র বন্ধু হইল, সেসিল যেন এ সব কথা জামিতে না পারে—এ বাজ তাহার বৃকে না পড়ে। এই জন্তই সেসিলকে কখনও পথে বাহির হইতে বা কাহারও সঙ্গে মিশিতে দিতাম না। তোমার সঙ্গে

মিশিতে দিতেও আমার স্ত্রীর আশঙ্কা জন্মিয়াছিল—পাছে তাহার মার মত সেও কোনদিন ভুল করিয়া বসে! কিন্তু যখন তোমার পরিচয় পাইলাম যে, তুমিও তাহারই মত দুর্ভাগা—তখন তোমাকে মানুষ্য করিয়া ভুলিতে আমারও ইচ্ছা হইল—যদি কোনদিন তোমার হাতে সেসিলকে সঁপিরা দিতে পারি। নহিলে আর কাহার হাতে দিব? যদি সেসিলকে সে অশ্রদ্ধা করে, সম্মানের চোখে না দেখে, এমনই ভাবে পরিত্যাগ করে! এই জন্তই তোমাকে যখন উহার কারখানায় পাঠাইতেছিল, আমি রাগে জলিয়া উঠিয়াছিলাম—মনে হইয়াছিল, তোমাকে উহার আমার বৃক হইতে হিনাইয়া লইতেছে—আমার নিতান্ত আপনার জন তুমি—তোমার উপর উহাদের কিসের অধিকার! তুমি আমার, তুমি আমার সেসিলের!

“তাহার পর হইতে বরাবর আমি এই দিনটিরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—কবে তুমি আসিয়া আমার হাত হইতে সেসিলকে চাহিয়া লইবে। সেসিল আসিয়া নতদ্বিধে কম্পিত ক্রম্ভভাবে বলিবে, দাদামশায়, জাককে আমি ভালবাসি! সে দিন আজ আসিয়াছে, জাক! ছুটি অভাগা তোমরা একসঙ্গে মিলিয়া সুখী হও। চুরির সংবাদে আমার মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল—কিন্তু তোমার কথায় যেদিন সে বহুস্ত ভেদ হইল, সেদিন যেন আবার আমি নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিলাম! জাক—এখন শোন, তুমি সেসিলকে ভালবাস, সেসিলও তোমার ভাল-বাসে। তাহাকে স্নেহ কর, বন্দী কর। এ দুইমাস তোমাকে আমি লক্ষ্য করিতেছি—এখন সুস্থ হইয়াছ, শরীরে বল পাইয়াছ। একটা মতলবও আমার মাথায় আসিয়াছে। তুমি পারিতে যাও—ডাক্তারী শেখো—চার বৎসর সময় লাগিবে! তার পর আমাদে জায়গায় তোমার বসাইব। সুখে স্বচ্ছন্দে তোমাদের দিন কাটিবে। প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় এখানে আসিবে—সেসিলকে দেখিবে, শক্তি পাইবে, আশা পাইবে। দিনে কাজ-কর্ম কর, রাত্রে পড়। চার বৎসর পরে মানুষ্য হইয়া উঠিবে, তখন সেসিলের ভার লইতে পারিবে। নাও জাক, খাটো—কাজ কর, সেসিল তোমার এ দীর্ঘ একনিষ্ঠ সাধনার পুরস্কার।”

কাহিনী শুনিয়া জাক অভিভূত হইয়া পড়িল। সে যাহা শুনিল, তাহা যেমন বিচিত্র, তেমনই মর্মভেদী!

কিন্তু একটা সংশয়, একটা আশঙ্কা তাহার মনে জাগিতেছিল। সেসিল হয়ত তাহাকে ভগ্নীর মতই ভালবাসে! তাহা ছাড়া চারি বৎসর প্রতীক্ষা করিতে কি সে সম্মত হইবে?

বিভাল কহিলেন, “সে বিষয়ে সেসিলের সঙ্গে তুমি কথা কও। সে উপরে আছে—যাও, তাকে বলগে।”

কাহাকে বলিবে! এ যে বড় কঠিন কাজ! হৃদয় একটা গভীর উত্তেজনার মুহূর্তে কাঁপিয়া উঠিতেছিল—বুঝি, এখনই বিদীর্ণ হয়।

উপরে ঘরে বসিয়া সেসিল কি একটা লিখিতেছিল। জঁকের চোখে সেসিল সেদিন অপরূপ মোহিনী-মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল! সেসিলের দেহে এত রূপ! সে রূপে এমন মোহ! কৈ, জাক আর কোনদিন ত ইহা লক্ষ্য করে নাই। কি এ স্তম্ভুর পরিবর্তন!

জাক কম্পিত স্বরে ডাকিল, “সেসিল—”

সেসিল মুখ তুলিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শাস্ত্র স্বরে কহিল, “কেন, জাক?” তাহার মুখ এক অজানা সরম-রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।

জাক কহিল, “আমি আবার যাচ্ছি, সেসিল, কাজ করতে, মানুষ হতে! এখন আমার জীবনে একটা লক্ষ্য স্থির করেছি,—অবলম্বন পেয়েছি। তোমার দাশামশায় আমার অনুমতি দিবেছেন—তাই, কোন দিন যা তোমার বলতে সাহস হয়নি, আজ তা বলতে এসেছি—”

“কি সে, জাক?” লজ্জায় সেসিলের নয়ন-পল্লব কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

“যে আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি, সেসিল। তোমাকে যাতে জয় করতে পারি, যাতে তোমার যোগ্য হতে পারি, তার জগ্গই আজ আমি কঠোর সাধনায় রত হতে চলেছি!”

জাকের স্বর কম্পিত হইতেছিল, থমকিয়া যাইতেছিল। তবু সে সব কথা বলিল। সেসিল সব কথা স্পষ্ট শুনিল। সে জানিত, এ প্রেমকে, বহু প্রতীক্ষা, বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়া গভীর স্মৃতি হইতে হইবে! জাকের কথা শেষ হইলে, আবেগে সেসিল জাকের হাত দুইটি আপনার হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিল। পরে দৃঢ় স্পষ্ট স্বরে সে কহিল, “জাক, আমি এ চার বৎসর তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকুব। চার বৎসর কেন, জাক? যদি চিরকাল, সারা জীবন আমার এমনই প্রতীক্ষা করে কাটাতে হয়, তা’ও কাটাব। জাক, প্রিয়তম আমার... এ তুমি নিশ্চয় জেনো!”

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### বেলিসেয়ার

তখনও সন্ধ্যা নামিতে কিছু বিলম্ব আছে। পারিষ এক প্রান্তে সিনেডেকের প্রকাণ্ড লোহার কারখানা। কারখানার লোকজন কোলাহল তুলিয়া পথে চলিয়াছে। কেহ সঙ্গীর পিঠে হাত রাখিয়া গাহিয়া—কেহ বা জনতার

পাশ কাটাইয়া সঙ্গিনীকে একান্তে টানিয়া হৃদয়ের গোপন বেদনার আভাষ দিতে দিতে চলিয়াছে! কালের মধ্য হইতে ছাড়া পাইয়া সকলেরই মন লঘু, উল্লসিত—তাহাদের চর্যকোলাহলে সারা পথ মুখরিত।

এই সকল লক্ষ্য করিতে করিতে জাকও পথ চলিয়াছিল। আজ তাহার মনে আর এতটুকু বেদনা নাই! ভবিষ্যতের আশায় প্রদীপ্ত চিত্ত লইয়া সে চলিয়াছিল! দৃষ্টিপথের দুই পাশের বাড়ীর দিকে,—যদি ভাড়ার জগ্গ কোনটায় খালি ঘর পাওয়া যায়!

কারখানার কিশোরী কারিকরগুলা মুগ্ধ দৃষ্টিতে জাকের স্মার মুখের পানে চাহিতে ভুলে নাই! “দেখ, ভাই—কেমন লোকটি—কেমন আপনা-ভোলা—বেশ, না?” পরস্পরের মধ্যে এমনই একটা অক্ষুট আলাপ চলিয়াছিল। জাকের কিন্তু সে দিকে কান দিবার অবসর ছিল না।

সহসা একটা জুতার দোকানে প্রকাণ্ড এক বুড়ির পানে জাকের নজর পড়িল—ঝুড়িটার অসংখ্য ছোট-বড় টুপি! বেলিসেয়ারের নয়ন ত! টুপির সহিত বেলিসেয়ারের সম্পর্কের স্মৃতি জাকের মনে এমন সুদৃঢ় রেখাপাত করিয়াছিল যে, দোকানের মধ্যে তখনই কোতুল দৃষ্টি পড়িল! বেলিসেয়ারই ত! খুব তন্ময় হইয়া সে জুতা-ওয়ালার সহিত একজোড়া ছোট জুতার দর করিতেছিল—তাহার পাশে একটি ছোট ছেলে দাঁড়াইয়া—বরস তাহাব পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না!

বেলিসেয়ার বলিতেছিল, “পায়ে লাগছে না ত? বেশ করে দেখ!” বেলিসেয়ারের কথায় জাকের হাসি পাইতেছিল। সে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, “কি, বেলিসেয়ার যে!”

“শ্রাব, মাষ্টার জাক! তুমি এখানে!”

“ভাল আছে, বেলিসেয়ার? তা এটি কে সঙ্গে? তোমাব ছেলে না কি?”

অপ্রতিভভাবে বেলিসেয়ার কহিল, “না, না, আমার ছেলে কেন? মাদাম ওয়েবারের ছেলে, এটি!” তার পর দোকানদারের দিকে চাহিয়া বলিল, “তুমি একবার দেখ দেখি, বেশ করে—পায়ে কোথায় আঁট হচ্ছে কি না। জুতা বরং একটু বড় হওয়া ভাল। ফোন্স হবার কোন ভয় থাকে না। কশা জুতোর দুঃখের চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই—বুঝেছ! আমি একজন ভুক্তভোগী কি না, তাই বলছি।”

কথাটা বলিয়া বেলিসেয়ার আপনার পায়ের পানে একবার চাহিল! কবে ঠিক নিজের পায়ের মাপে একজোড়া জুতা ফরমাস দিয়া তৈয়ার করাইবার সামর্থ্য তাহার হইবে?

পরে ছেলেটিকে প্রায় বিশ্বাস ধরিয়া প্রদ্ব করিয়

যখন বেলিসেয়ার জানিল, জুতা তাহার পায় আঁট হয় নাই, ঠিক খাপ খাইয়াছে, তখন আশ্চর্য চিত্তে পকেট হইতে একটি লাল রঙের ছোট খলি বাহির করিয়া জুতাওয়ারাল হাতে করেকটি যৌপ্যমুদ্রা গণিয়া দিয়া সে বাহিরে আসিল।

বাহিরে আসিয়া বেলিসেয়ার জাককে কহিল, “তুমি কোন্ দিকে যাবে, জাক?”

“কেন, বেলিসেয়ার?”

“কেন! তুমি যেদিকে যাবে, আমি ঠিক তার উল্টো পথে যাই আর কি তা হইলে! তোমার সঙ্গে এক পথে আর আমি পা বাড়াছি না। খুব শিক্ষা হয়েছে—হাঁ।”

জাকের মনে একটা আঘাত লাগিল। মনেব ভাব মনে চাপিয়া জাক বলিল, “আমি ঈসেনডেকের কারখানায় যাব—সেখানে আমি কাজ করব।”

“ঈসেনডেকেব কারখানায় ঢোকা বড় সহজ নয়! ভাল সাটিকিফিকেট চাই—না হলে ওরা ভর্তিই কবে না।” কথাটা বলিবার সময় বেলিসেয়ার জাকের পানে একটা বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

রিভালের মত বেলিসেয়ারও অ্যাড্বেসর সেই চুরির ব্যাপাব সম্বন্ধে জাকের প্রতি একটা ভ্রান্ত ধারণা পুষিতেছিল। জেনেদের টাকা জাকই চুরি করিয়াছিল বলিয়া বেলিসেয়ারের বিশ্বাস। কিন্তু জাক যখন তাহাকে সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল এবং আরও বলিল যে সে ঈসেনডেকের কারখানায় কাজ করিবে স্থির হইয়া গিয়াছে; নিবটেই একটা ঘর ভাড়া লইয়া তথায় সে বাস করিবে, তখন বেলিসেয়ারের সন্দেহ মন প্রশস্ত হইল। সে তাড়াতাড়ি উৎসাহের সহিত বলিল, “আবে তাই না কি! তাহলে এই সন্ধ্যার সময় আর কোথায় এখন বাড়ী খুঁজে পাবে, জাক? তার চেয়ে বৎ আমার সঙ্গে এস। আমার বাসায় প্রকাণ্ড ঘর—তাতে খুব ঠাঁই হবে’খন! তারপর আমার মাথায় একটা মতলব আছে। খাবার সময় বলব—এস, আমার বাসায় এস, জাক।”

পথে বেলিসেয়ার জাককে মাদাম ওয়েবারের পরিচয় দিল! মাদাম ওয়েবার এক বিধবা নারী—কুটি বেচিয়া দিন-গুজরান করে। এই একটি ছেলে শুধু তাহার সমস্ত দুঃখ ভুগাইয়া রাখিয়াছে। ছেলেটিকে সে ঘরের বাহির হইতেই দেয় না। বেলিসেয়ারের সঙ্গে বলিয়াই বেচারী ছেলেটি পথের বাহির হইতে পাইয়াছে। মাদাম ওয়েবার ভোর পাঁচটায় কুটি বেচিতে যায়; বেলা এগারো-বারটার সময় ঘরে আসে, তাহার পর আহাৰাদি সাতিয়া ‘বেকারি’তে যায়, কুটি তৈয়ার করিতে; সন্ধ্যার পর কাঁজ-কৰ্ম শেষ করিয়া আবাব গৃহে ফিরে—বেলিসেয়ার বাটীতে থাকিলে ছেলেটি তাহার কাছে থাকে, না হয় ত

পাড়ার কোন স্ত্রীলোক দয়া করিয়া ছেলেটিকে দেখে। যখন দেখিবার কেহ না থাকে, তখন চেয়ারেব সঙ্গে তাহাকে বাঁধিয়া মাদাম ওয়েবার বাহিরে যায়। কি জানি, একেলা থাকিলে যদি ছেলেমাছুষ দিরাশলাই লইয়া খেলা করিতে করিতে গায় আগুন লাগাইয়া পুড়িয়া মরে!

খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়া বেলিসেয়ার বলিল, “এই আমাদের বাড়ী!” জাক চাহিয়া দেখে, সম্মুখে দীর্ঘ ত্রিতল বাড়ী—দেওয়ালের গায় অসংখ্য ছোট জানালা—বাহির হইতে দেখিলে কতকটা পায়রার খোপের মতই বোধ হয়। জাক বেলিসেয়ারের গৃহে প্রবেশ করিল। মাদাম ওয়েবার তখনও ফিরে নাই।

তাহার ঘবে প্রবেশ করিয়া ছেলেটিকে একটা বড় চেয়ারেব সহিত বাঁধিয়া বেলিসেয়ার জাককে লইয়া পাশে আপনায় ঘবে আসিল। বাতি জালিতে জালিতে বেলিসেয়ার বলিল, “ভারী মজা হবে, জাক! ছেলের পায়ে নতুন জুতা দেখে মাদাম ওয়েবার একদম অবাক হয়ে যাবে! কে কিনে দিলে, বুঝতেও পারবে না! সে যা মজা হবে—হাঃ হাঃ—হাঃ!”

জাক কহিল, “তুমি একলা এখানে থাক, বেলিসেয়ার? আর তোমার বোন?”

বেলিসেয়ার কহিল, “না—বোনটি বিধবা হয়েছে! অত বড় পরিবার পোষা কি আমার কাজ! তা ছাড়া দিন-বাত বগড়া-কিচামচি! খেতে-খুটে এসে সে সব কি ববদাস্ত হয়! কাজেই এখানে বাস। নিয়েছি। মাদাম ওয়েবার আমার খুব সাহায্য করে—ঘরকল্লা দেখা-শুনা—বলতে গেলে আমার সবই সে করে দেয়। নৈলে কি আমার ঘাবা এ-সব পোষায়। বড় ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার। কোন ঝগড়া নেই, বালাই নেই—পরের জগ্গেই শুধু বেঁচে আছে! বাসার সকলেই মাদামের ভাবী বাধ্য,—ভারী বশ মাদামের!”

বলিতে বলিতে টেবিলের উপর সে একখানা খবরের কাগজ বিছাইয়া দিল, তাহার উপর কাচের থালা-বাটি আনিয়া রাখিল—এবং অতিথি জাকের জগ্গ খাবার লইয়া আসিল। পরে বলিল, “তোমাদের বাড়ী সেই যে ছাম খেয়েছিলুম, জাক, আঃ, জীবনে তার স্বাদ কখনও ভুলব না! বলব কি, অমন জিনিষ আমি আর কখনও খাইনি। চমৎকার! এ কি আর খাবার!”

বেলিসেয়ার যাহাই বলুক, জাকের কিন্তু এ আহাৰ মন্দ লাগল না। সিদ্ধ আলু অনেকগুলো ছিল, সবগুলোই সে প্রায় খাইয়া ফেলিল—রন্ধনটুকুও পরিপাটি! রন্ধনের সে সুখ্যাতি করিলে বেলিসেয়ার কহিল, “এ-সব মাদাম ওয়েবার নিজে বেঁধে বেধে গেছে! তার গুণ কখনও ভুলব না, আমি! আঃ, কি রাগাই রাঁধে! তার জগ্গ আমার ঘরকল্লা নিজেকে আর দেখতেও হয় না। সব সে

ঠিক কবে রাখে। এই জিনিষপত্তর বা দেখছ,—এর কতক ত মাদাম ওয়েবারেরই—আমায় ধার দেছে, ব্যবহার করব বলে। হুঁ, কটা দিনের জুতোই বা এ ধার! এর পরে ত সব আমাদের হুজুনেই হবে।”

কৌতূহল-চিন্তে জাক প্রশ্ন করিল, “তার মানে?”

“মাদাম ওয়েবারের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে যে—তা বুঝি জান না? হাঃ হাঃ হাঃ...” আনন্দের আতিশয্যে কথাটা বলিয়া ফেলিলেও ঈষৎ লজ্জায় বেলিসেয়ারের গাল দুটা তখনই লাল হইয়া উঠিল! “বিয়ের সংই প্রায় ঠিক। আমি ত বলছি, দেবী করে আব কাজ কি? তা মাদাম ওয়েবার বলে, না, এ আয়ে কুলাবে না। ভারী হিসেবী লোক কি না! সে বলে, একজন সঙ্গী পাও যাতে, তা দেখ,—এক-সঙ্গে থাকবে—বাড়ীর ভাড়া আর খাওয়াব জন্ম কিছু ধরে দেবে,—এমন লোক! তাইলে খরচেরও অনেকটা সাশ্রয় হয়। কথাটা খাঁটি বটে। কিন্তু এমন লোক যে পাচ্ছি না—বিয়ে হয়নি, কি, জী মারা গেছে, এমন একটি নিখর্দাত মানুষ পাই, ভাল বিশ্বাসী লোক হয়, তবেই না! মাদাম ওয়েবার ভারী কষ্ট পেয়েছে। তার প্রথম স্বামীটা বেজায় মাতাল ছিল—ভারী বদমায়েস! মদ খেয়ে এসে মাদাম ওয়েবারকে কি বকাই বক্ত। আবার কি তাই শুধু? বেদম মারতও! হাত তুলত জাক, সত্যি ওর গায়ে হাত তুলত! আশ্পষ্টতা বোঝ একবার! এমন ভাল লোক, মাদাম ওয়েবার, তাব গায়ে হাত তোলে—পাজী, বদমায়েস কোথাকার! আমি বলে দিচ্ছি, জাক, তুমি বরং দেখো, বিয়ে হয়ে গেলে কখনও ওর গায়ে আমি হাত তুলব না—কখনও না! বরং ও যদি তুলতে চায় ত আমি পিঠ বাড়িয়ে দেব। এখন আসল বিপদ হচ্ছে, কি জান? এই লোক নিয়ে—কোথায় যে পাই, এমন লোক,—বুঝছি কি না?”

“লোক বুঝছ তুমি? তা আমার রাখতে কোন আপত্তি আছে তোমার?”

বেলিসেয়ারের মনেও এই কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতেছিল; কিন্তু নিজে হইতে এ কথা পাড়িতে তাহার কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল। তাই সে একটু বিষয়ের ভাব দেখাইয়া কহিল, “হুমি! তুমি থাকবে, জাক?”

“হাঁ, আমি! আমিই থাকব। এতে আশ্চর্য্য হচ্ছে কেন, বেলিসেয়ার?”

“আমরা গরীব—তার উপর টানটানি করে ভাই, সংসার চালাই—খাওয়া-দাওয়া ত তেমন খুসই-গোছ নয়! তোমার ভাল খাওয়া অভ্যাস—তুমি—”

“না বেলিসেয়ার—আমি বেশ থাকব, এখানে। তোমাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে—”

“আপত্তি। এ’ত পরম সৌভাগ্যের কথা!”

“আমিও খরচ-পত্তর টেনেটুনে করতে চাই—আমিও বিয়ে করব কি না—”

“তুমিও বিয়ে করবে? আরে বাঃ—কবে? কবে বিয়ে কর্কে, শুনি।”

“সে এখন অনেক দেবী আছে, বেলিসেয়ার,—চার বছর দেবী। এখানে আমি দিনের বেলায় স্ট্রেনডেকের কারখানায় কাজ করব, আর রাত্রে পড়াশুনা করব! ডাক্তারী শিখব।”

এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনা গেল। বেলিসেয়ার কহিল, “মাদাম ওয়েবার আসছে!”

পরমুহূর্তে দ্বার খুলিয়া সহস্রা মুখে মাদাম ওয়েবার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। কোনদিকে না চাহিয়াই সে বলিল, “এ নিশ্চয় তোমার কাজ, বেলিসেয়ার, এই ছেলেটাকে জুতো কিনে দেওয়া—” সহসা তাহার দৃষ্টি নবাগত তরুণ লোকটির প্রতি পড়াতেই মাদাম ওয়েবার ধমকিয়া থামিয়া গেল। বেলিসেয়ার তখন জাকের পরিচয় প্রদান করিল। জাক যে অর্থ দিয়া তাহাদের বাসায় থাকিতে ইচ্ছুক, সে কথাও এক নিশ্বাসে সে বলিয়া ফেলিল। মাদাম ওয়েবার তাহা শুনিয়া জাককে কৃতজ্ঞ অন্তরের ধন্যবাদ প্রদান করিতে ফ্রুটি রাখিল না।

পরদিন সঙ্গীর বাসের সুবিধার জন্ম মাদাম ওয়েবার ও বেলিসেয়ার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। বড় ঘরের একধারে একটা বিছানা পড়িল। তাহারই পাশে একটা পুরাতন টেবিলের উপর মাদাম ওয়েবার রিভালের দেওয়া জাকের বইগুলি স্ত পাকারে সাজাইয়া রাখিল। কিছুদিন পরে তাহার নূতন বাসা ভাড়া করিবে—কারখানার নিকটেই বাসা লইবে, তাহা হইলে জাকের পথের কষ্টও অনেকটা লাঘব হইবে, এ আশাসও বেলিসেয়ার জাককে দিতে ভুলিল না!

রাত্রে মাদাম ওয়েবার শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করাইয়া জাকের গৃহে আসিয়া জাকের বাসন-পাত্র ঠিক করিয়া রাখিত, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ সাবান-জলে ধুইয়া সাফ করিয়া দিত, জাকেরই বাতির আলোর জাকের পাশে বসিয়া বেলিসেয়ার টুপি তৈয়ার করিত, আর জাক বহি খুলিয়া তাহারই মধ্যে আপনার সমগ্র চিন্তা একাগ্রভাবে নিক্ষেপ করিয়া দিত। এই অনলস পরিশ্রমী সচ্চরিত্র লোক দুইটির সঙ্গ তাহার মুহূর্তের জন্ম দুঃসহ ঠেকিত না! বরং তাহাদিগকে দেখিয়া তাহার অবসন্ন মন বিপুল শান্তিতে ভরিয়া উঠিত!

কিছুদিন পূর্বে যখন সে এতিয়ালে ছিল, তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, ‘হুজু লজ্জা ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সে এমন পরিপূর্ণ আগ্রহে আবার একদিন কারখানার কাজে হাত দিতে পারিবে! আজ নূতন করিয়া আবার যখন সে কারখানায় প্রবেশ করিল, তখন তাহার

চিন্তে আর এতটুকু বেদনা নাই, এতটুকু ক্লোভ নাই। এই নীচ সঙ্গ—সত্যই নীচ—কিন্তু এ নবক-যশস্বী ভোগ করিতে তাহার আজ আর কোন আপত্তি ছিল না। কারণ, নরকের এই পথের পরই ঐ যে দূরে স্বর্গলোকেব সুগভীর আনন্দ-মাধুরীর আভাষ পাওয়া যাউতেছে, আশ্বাস মিলিতেছে—সেই কাম্য স্বর্গে দেবী সেসিল জাকের গলে বিজয়-মাল্য দিবার জগ্গ অবীর প্রতীকায় বসিয়া আছে।

কারখানার কাজ কঠিন ছিল। সেই বায়ু-ভীন অগ্নি-গহ্বর! নিখাস বন্ধ হইয়া আসে—তথাপি সেসিলেব চিন্তা মুহূর্ত্তেই শত বেদনা ভুলাইয়া দেয়, পাণে নব শক্তি সঞ্চারিত কবে।

কারখানায় কাহারও সহিত সে মিশিত না। পুরুষ-গুলি কুৎসিত ব্যঙ্গ-বিদ্রোপেও জাকের গাঙ্গীর্ষ্য টলাইতে না পারিয়া শেষে তাহার বশ মানিয়াছিল। আর নারীর দল দীপ্ত বোঁবনের সহস্র প্রলোভনেও জাককে ভুলাইতে পারিল না। তাহাদের চটুল চাহনি, মুহূর্ত্তান্ত, সমস্তই এই কর্তব্য-কঠোর তরুণ যুবকের বুকে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিত—সকল চেষ্টাই তাহাদের বার্থ হইত। কারখানায় সকলে জাককে ‘হুজুর’ বলিয়া ডাকিত—জাক তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইত না। ঘরে-বাহিরে একান্তিক নিষ্ঠায় সে নিজের কাজ সারিয়া চলিয়াছিল।

কাজের পর কোথাও জাক মুহূর্ত্তের জগ্গ বিলম্ব না করিয়া বাসাঘ ফিরিত। পথ দীর্ঘ ছিল—তাব মনে হইত, সে উড়িয়া যায়! কতক্বে এই সব কালি-ঝুলিমাখা পোষাক খুলিয়া দূরে ফেলিয়া স্নানের পর পরিচ্ছন্ন ভদ্রবেশ পরিয়া নিজের অস্তিত্ব সে ফিরিয়া পাইবে। পাঠে আগ্রহ বাড়িয়াই উঠিত। কত রাত্রি একেবারে নিদ্রাহীন কাটিয়া গিয়াছে। সহসা চোখে প্রভাতের আলো লাগায় তাহার চমক ভাঙ্গিয়াছে। মাদাম ওয়েবার কত ভৎসনা করিয়াছে, “মাষ্টার জাক, সারা দিন কাজ, আর সারা রাত্রি পড়া—একদণ্ড ভিবেন নেই—চোখে এতটুকু ঘুম নেই—এমন হলে বাঁচবে কেন?” জাক শুধু তাহার পানে সহস্র দৃষ্টিতে চাহিত। কি বলিবে, এমন কথা সে খুঁজিয়া পাইত না। একবাব মনে হইত, সত্যই ত! এমন করিলে শরীর যে থাকিবে না! আবার তখনই মনে হইত, না, সাধনা—কঠোর সাধনা চাই—নহিলে সিদ্ধি মিলিবে কেন?

সপ্তাহে একদিন শুধু সে পৃথিবীর পানে ফিরিয়া চাহিবার অবকাশ পাইত; একদিন সে স্থায়ী হইত। সেদিন রবিবার। ভোর পাঁচটা বাজিলে সহস্র কাজ ফেলিয়া স্নান সারিয়া ভাল পোষাক পরিয়া তাহাকে সাজিতেই হইবে। দেহেব কালি ভাল

করিয়া ধুইয়া-মুছিয়া মনের ময়লা সাফ করিয়া মাদাম ওয়েবারের স্বহস্তে দেওয়া পোষাকে ভূষিত হইয়া জাক যখন এতিয়ালের পথে বাহির হইত, তখনকার তাহার সেট বেশ, সেই প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া কাবখানার কারিকরেরা ভাবিত, এ তাহাদের সে জাক নহে, যেন কোন রাজপুত্র। কোন পরী-কাহিনীর সৃষ্টি স্বরূপ রাজপুত্র—পরীর দেশে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙ্গাইয়া তাহার চিন্তা তরুণ কবিরে বলিয়াই এমন বেশে সাজিয়া চলিয়াছে!

তাহার জগ্গ এতিয়ালে সে কি স্বর্গ-সুখ সঞ্চিত আছে। রবিবারটি যেন অগ্নি দিনগুলার মত দগ্ধ-প্রহরে বিভক্ত নহে—সে যেন একটা অবিভক্ত, অখণ্ড শুভ মুহূর্ত্ত।

মলিন মর্ত্ত্যে স্বর্গের এক কোণ যেন খসিয়া পড়িয়াছে! বিভালের গৃহ কি এক বিচিত্র শোভায় সাজিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জগ্গই যেন হুই বাহ বাড়াইয়া আকুল আগ্রহে দাঁড়াইয়া থাকে! ডাক্তারের প্রসন্নতা, সেসিলের সরম-জড়িত সুগভীর আবেগ—এমন কাম্য সামগ্রী পৃথিবীতে আর কি আছে! সপ্তাহে জাক কতখানি পড়িল, বিভাল তাহার হিসাব লইতেন, নুতন পাঠ বলিয়া দিতেন, বুঝাইয়া দিতেন। তার পর অপরাহ্নে সকলে ভ্রমণে বাহির হইত। কোন-দিন নদীর ধারে, কোনদিন বা বনের দিকে! ডাক্তার আপনায় গতির বেগ কমাইয়া দিতেন—জাক ও সেসিল অনেকটা আগে চলিয়া যাউত! যাউতে যাউতে তাহাদের কত কথা হইত—কি করিয়া দিন কাটিতেছে, কেমন সব লোকজন! কিন্তু তাই বলিয়া, হৃদয়ের গোপন কোন কথার এতটুকু আভাষও কেহ দিত না। সে বিষয়ে দুইজনে সতর্ক থাকিত—কিন্তু কথা বলিতে বলিতে এমন ঘটত, উভয়েই সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িত। যে কথ’ চাপিয়া রাখিবার জগ্গ এত চেষ্টা, এই স্তব্ধ নীরবতা, তাহাই যেন মুখরিত করিয়া তুলিত! ব্যক্ত ভাষা যাত্রা ফুটাইতে পারে না, অনেক সময় নির্বাক নীরবতায় তাহা ফুটিয়া উঠে, প্রকৃতির ইহা এক বিচিত্র কৌশল সন্দেহ নাই!

সেদিন বনের পথে যাউতে যাউতে একটা উগ্র কটু গন্ধ সকলের নাসিকায় প্রবেশ করিল। ডাক্তার বিভাল কহিলেন, “নিশ্চয় ডাক্তার হান্জ্ এসেছে—সমস্ত বন পুড়িয়ে বিষেব সৃষ্টি করছে—নিশ্চয় এ ডাক্তার হান্জ্।”

সেসিল দ্রুত আসিয়া ডাক্তারের মুখ চাপিয়া ধরিল, “আঃ দাদা, আস্তে। শুনতে পাবে!”

সেসিলের হাত সরাইয়া ডাক্তার বলিলেন, “শুধুক না। ওকে কি আমি ভয় করি, সেসিল? জাককে যেদিন ওব হাত থেকে কেড়ে আনি, সেইদিনই ও আমার

পরিচয় পেয়েছে। এ বুড়ো হাড়ে কত বল, তা ও সেদিন খুব বুঝেছে।”

তথাপি ‘আরাম-কুঞ্জে’র সমুখ দিয়া চলিবার সময় জাক ও সেলিল উভয়েই নীবব হইত। তাহাদেব মনে হইত, ঐ বৃক্ষ ডাক্তার হাব্জ্ জ্ঞানালার অন্তরাল দিয়া তাহাদিগকে দেখিতেছে। অথচ কেন এ ভয়? জাক ত আর্জান্ত’র সহিত সব সম্পর্ক চূকাইয়া দিয়া আসিয়াছে। আজ তিন মাস কেহ কাহারও মুখ দেখে নাই। আর্জান্ত’র প্রতি জাকের ঘৃণা দিন দিন বাড়িয়াই উঠিতেছে। কিন্তু সে মাকে ভালবাসিত! তবুও যেদিন সে সেলিলকে ভালবাসিয়াছে, সেদিন সে বুঝিয়াছে, কি অমূল্য সম্পদ এই ভালবাসা। কি শ্রদ্ধা ও গৌরবের সামগ্রী, এই প্রেম! এই প্রেমের মর্যাদা বুঝিয়াছে বলিয়াই আর্জান্ত’র প্রতি ইদার এই নির্লজ্জ আত্মগত্যা, এই হেয় দাস্ত্রের কথা স্বরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন দারুণ লজ্জায় ভরিয়া উঠিত। হায়, অভাগিনী নারী, কি এ অন্ধ মোহ! এ কি বিরাট ভ্রমের মধ্যে পড়িয়াছ, তুমি। কিন্তু—এই ইদা, আবার ঐহার মা! তাই ইদার প্রতি ঘৃণার উদয় হইলেও করুণা ও অহুকম্পার মাত্রাটাই জাকের চিতে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিত

এই তিন মাসে ইদার সহিত জাকের কয়েকবার সাক্ষাৎও হইয়াছিল। ইদাকে জাক পত্র লিখিত, তাই ইদা তাহার সংবাদ পাইত। দুই একবার গাড়ী করিয়া কারখানার দ্বারে আসিয়া ইদা জাকের সহিত সাক্ষাৎও করিয়া গিয়াছে—সাক্ষাতে অপর কথা বত হউক না হউক, আর্জান্ত’র কবি-বশের দীপ্ত বর্ণনার ইদা পকুমুখ হইয়া উঠিত।

কারখানার দ্বারে এত বড় গাড়ী দাঁড়াইতে ও ছজুব জাককে সেই গাড়ীর আরোহিণী এক স্রবেশা স্তরুপা নারীর সহিত আসাপ করিতে দেখিয়া কারখানার কারিকরদের মনে জাকের প্রতি একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে যখন দুই-চারিটা কাণাঘুসা জাকের কানে পৌঁছিল, তখন সে মাকে নিবেদন করিয়া দিল—কারখানায় কাজের সময় বাহিরে আসিয়া সে আর দেখা করিতে পারিবে না—কারখানার কর্তৃপক্ষেরও তাহা মনঃপুত নহে, তখন কখনও সাধারণ উদ্ভানে, কখনও-বা গির্জাঘরে সন্ধ্যার সময় মাতা-পুত্র সাক্ষাৎ হইত।

একদিন এমনই ভাবে কথাবার্তা শেষ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ইদা জাককে বলিল, “জাক, আমি এক বিপদে পড়েছি। তুমি—” কথাটা ইদার মুখে বাধিয়া গেল।

জাক কহিল, “আমি কি? বল, মা।”

“না, এই বলছিলুম কি—এ মাসটার আমার এত বেশী খরচ হয়ে গেছে যে, হাত একেবারে খালি—কিছু

নেই, জাক! তাই বলছি কি—ঠেকে টাকার জঙ্গ কিছু বলতেও পারি না আমি, বিশেষ এখন ওঁর সময়টা বড় ভাল যাচ্ছে না—কাজেই মেসার্সও একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছে। তাই বলছিলুম, তুমি যদি দিন-কতকের জঙ্গ আমার কিছু ধার দিতে পার—ধার অবশ্য! এ টাকা শীঘ্রই আমি শোধ করে দেব।”

জাক বলিল, “শোধ দেবাব কোন দরকার নেই। তুমি মা, আমার কাছ থেকে টাকা নেবে তুমি, সে ত আমার ভাগ্য। আর কারও কাছ থেকে তুমি টাকা নিয়ে না, মা,—যখনই দরকার হবে, আমার বলো—যেমন করে পারি, আমি তোমায় দেব।” বলিয়া পকেটে সে কয়টি মুদ্রা ছিল, তাহার সমস্তই জাক ইদার হাতে দিল। সেদিন সে কারখানায় বেতন পাটয়াছিল।

ইদা কম্পিত হস্তে মুদ্রা কয়টি গ্রহণ করিল।

জাক কহিল, “মা, তোমার ওখানে অসুবিধা হচ্ছে, না? বল, আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে! তা যদি হয় ত, আমি আছি, মা—আমার ঘর আছে। এস, আমার সঙ্গে আমার ঘবে থাকবে, এস। তা হলে আমার যে কি স্থখ হবে—”

“না, জাক—ওঁর এখন সময় বড় খারাপ যাচ্ছে, এ সময় ঠেকে এমনভাবে ফেলে চলে আসা ঠিক হবে না—ভারী অধর্ম্য হবে।” বলিয়া ইদা কোচম্যানকে গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ দিল। গাড়ী চলিয়া গেল। জাক অভিভূতভাবে ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া রহিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### পুত্র-গৃহে

জুন মাস। উষার প্রাকাল। বাতি আলাইয়া জাক বহি পড়িতেছিল। বেলিসেয়ারেবও নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। উঠিয়া সে কালি মাখাইয়া আপনায় জুতা সাফ করিতেছিল। জুতা সাফ করিতে সে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল, পাছে তাহার শব্দে জাকের গ্রন্থ-মগ্ন চিন্তে কোন ব্যাঘাত লাগে।

জানালা খোলা ছিল। তাহার মধ্য দিয়া বাহিরের আকাশ দেখা যাইতেছিল। নীল আকাশের ভলে আলোর মুহু তরঙ্গ নাচিয়া নাচিয়া নীচে নামিতেছিল।

অনুরে দুই চারিটা মোবগ ডাকিয়া উঠিল। রাত্রির নিস্তরুতা ক্রমেই সরিয়া যাইতেছিল। সহসা পথে শুনা গেল, “ফুটি নাও গো, ফুটি!” এ স্বর মাদাম ওয়েবারের। মাদাম ওয়েবার আপনায় কটির বাজ লইয়া পথে বাহির হইয়াছে।

দরিদ্র পন্নীতে মাদাম ওয়েবাবের প্রথম অস্থানটি ঠিক ঘড়ির কাজ করিত। তাহার স্বর শুনিলেই সকলে ধড়মড়িয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িত। ঐ ডাক পড়িয়াছে! বিশ্রামের অবসর ফুয়াইয়াছে! এখনই আবার উদরের তৃপ্তি-সাধনের চেষ্টার জীবন-যজ্ঞে ছুটিতে হইবে, কাজেব সন্ধানে ঘুরিতে হইবে। আর আলস্য নয়! উদাস্ত নয়! ছুটিয়া চল, ছুটিয়া চল।

এ শুধু মাদাম ওয়েবাবের ডাক নয়; এ ক্ষুধার ডাক! উদরের ডাক! ফুয়াইয়া-থাকিলে উদর ছাড়িবে, কেন? সে তাহার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবে! যতক্ষণ তাহার দাবী না চুকাইবে, ততক্ষণ মুক্তি নাই। বিচার নাই। প্রভাতের আস্থানে শিতর দল জাগিয়া উঠিতেছে। আহার নাই। নহিলে তাহার অশান্তির রোল তুলিবে! ভাগ্যলক্ষীর উপেক্ষিত দুর্ভাগার দল তাই প্রভাতের সাড়া পাইলে শিরিয়া উঠে। অভাবের বিকট মূর্তি দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে—নিঃস্বপ্ন অনশন লোল জিহ্বা মেলিয়া নিভাস্তই অকারণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে!

বাতি নিবাইয়া বহি বন্ধ করিয়া জাক উঠিয়া জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পথ-পারে প্রকাণ্ড বাসাবাটীর জানালাগুলি একে একে মুক্ত হইতেছিল। ভিতরকার দারিদ্র্যও অমনই তাহার দারুণ জীবিতা লইয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছিল। কোন কক্ষে এক বৃদ্ধা নারী সেলাইয়ের কল লইয়া বসিয়া গিয়াছে, পাশে দাঁড়াইয়া ছোট নাটনীটি বস্ত্রখণ্ড অগ্রসর করিয়া দিতেছে! কোথাও কর্ণধ্বলে যাইবার জ্ঞান কোন কিশোরী চটপট পোষাক পরিয়া লইতেছে—আবার কোনখানে বা সেবা-রতা নারী দারুণ উষ্মেণে দীঘ রাত্রি বাপনের পর রোগীর শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া জানালার পাশে আসিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরে তপ্ত ললাট জুড়াইয়া লইতেছে!

গৃহ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া জাক চারিধার লক্ষ্য করিতেছিল। ব্যথিত পন্নীর কাতর দীর্ঘনিশ্বাস প্রভাতের বায়ু-তরঙ্গে নিঃশব্দে মিশিয়া যাইতেছিল। কি শাস্ত, করুণ সে দৃশ্য!

রবিবার আসিতে এখনও তিন চারিদিন বিলম্ব আছে। জাকের মনে পড়িল, সত্য-পাতা-ঘেরা এতি-রোলের সেই স্নিগ্ধ গৃহখানির কথা! ফটকের প্রাচীর জড়াইয়া আইভির লতা উঠিয়াছে—ইতস্ততঃ দুই-চারিটা ডালিম ও জাশপাতি গাছের অন্তরালে বজ্র গোলাপ ও হিন্তুকুলের ঝাড়। তাহা পার হইয়া গাড়ী-বারান্দার সম্মুখে দেওয়ালে ডাক্তারের ছোট ঘণ্টাটি ঝুলানো! আরাম যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা এতিয়ালের সেই শান্ত রম্য গৃহকোণটিতে। ভাবিতে জাকের চিত্ত উদ্ভাস্ত হইয়া উঠিল—পাঠ ও আগরণের ক্লাস্তি ঘুচিয়া গেল।

তাহার নেত্র-সমক্ষে ডাক্তার বিভালের গৃহ আপনার পরিপূর্ণ মাধুরী লইয়া জাগিয়া উঠিল এবং একটি পুষ্পিত দেহ-লতার স্নিগ্ধ স্মরণও বেশমণী কাপড়ে খসখস শব্দ নিমেষে তাহাকে সম্পূর্ণ আবিষ্ট করিয়া ফেলিল।

“ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও।” সহসা বেলিসেয়ারের স্বরে জাকের চমক ভাঙ্গিল। কফি তৈয়ার করিতে করিতে মাথা তুলিয়া বেলিসেয়ার কহিল, “ডান দিকে—ডান দিকে ঘুরোও।”

বাহিরের দ্বারে কে চাবি ঘুরাইতেছিল। আবার শব্দ হইল, খুট! খুট! খুট! খুট!

বেলিসেয়ার হাঁকিল, “ডান দিকে—ডান দিকে গো!” তবু চাবি বাম দিকেই ঘুরিল! কফি-দানটা হাতে লইয়াই অন্তরভাবে উঠিয়া বেলিসেয়ার দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বার-সম্মুখে এক নারী দাঁড়াইয়া ছিল।

বেলিসেয়ারকে দেখিয়া নারী কহিল, “মাপ করবেন! আমি ভুল ঘরে এসেছি।”

সে ঘরে জাক কিন্তু চমকিয়া উঠিল। দ্বারের দিকে চাহিয়াই সে অগ্রসর হইল, কহিল, “না মা, ভুল নয়। এ ঘর আমারই—”

সে নারী, ইদা।

জাককে দেখিয়া ইদা বড়ের মত বেগে কক্ষে প্রবেশ করিল। অত্যন্ত অধীর আবেগে সে জাককে বুকের মধ্যে চাপিয়া কম্পিত ঝলিত স্বরে কহিল, “জাক, জাক, আমার রক্ষা কর—আমার বাঁচাও! এত তাব আশ্রয়, এত দূর সাহস যে, আমার সে অপমান করে! যার জ্ঞান আমি সব ত্যাগ করেছি—আমার গর্ভ, আমার ধর্ম, আমার একমাত্র ছেলে—সব আমার—কারও পানে, কিছু পানে চেয়ে দেখিনি, সে—সেই পাশে আমার গায়ে হাত তুলেছে! হাঁ, জাক, সত্যিই সে আমার মেরেছে! হৃদয় হৃ-রাস্তির বাহিরে কোথায় কাটিয়ে, কাল শেষ রাত্রে যখন সে বাড়ী আসে, তখন আমি বিরক্ত হয়ে সেই কথাই বলেছিলুম, তাই, তাই সে আমার মেরেছে—মেরেছে, জাক! এই দেখ, আমার হাতে রক্ত জমে রয়েছে—গলার কাছে ছড়ে গেছে—এই তার নখের দাগ।”

অভাগিনী নারীর চোখে অশ্রুর সাগর বহিল। ইদা ফুঁপাইয়া কাদিতে লাগিল। অবস্থা বুঝিয়া বেলিসেয়ার কখন সন্নিহিত পড়িয়াছিল। পারিবারিক ব্যাপারে অনধিকার-প্রবেশের এতটুকু অসীতিকর সম্ভাবনা মাঝিয়াই সে চলিয়া গিয়াছিল।

মার মুখের পানে জাক করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কোভে রোয়ে তাহার সমস্ত প্রাণ গর্জিতে লাগিল। একটা দাক্ষ দাহে মন জলিয়া উঠিল। মাধার মধ্যে রক্ত যেন মাচিয়া ছুটিল। এত স্পন্দ! পাশেও, কাপুরুষ! দুর্বল



নারীর শরীরে আঘাত কর ! তাহার মনটাকে ত দলিত, ছিন্ন, মর্দিত করিয়া দিয়াছ—তাহাতেও তৃপ্তি পাও নাই, শেবে তাহার দেহও আঘাত করিয়াছ ! হৃর্কৃত ! নরাধম ! জাকের হাত নিষ্পিষ কবিত্তে লাগিল—একবার যদি তাহাকে কাছে পাওয়া যাইত ! একবার !

চোখের জল মুছিয়া ইদা কহিল, “এ দশ বছর আমি কি যত্নগা ভোগ করেছি ! পদে পদে অবহেলা, লাঞ্ছনা, কি না সহ্য করেছি ! কিন্তু রাক্ষস, রাক্ষস সে। প্রাণে তার এতটুকুও মম্ব্যত্ব নেই, জাক। হোট্টেলে সরাইয়ে বস নীচ সঙ্গী আর লক্ষ্মীছাড়া মামীব সংসর্গই তার মনের মত হয়েছে ! সেখানেই এখন তাদের কাগজের আড্ডা হয়েছে। তার ফল হাতে হাতে ফলছেও। গেল মাসের কাগজখানা যদি দেখতে, কি জঘন্ত হয়েছে ! যাক, বেশ হয়েছে ! শোন জাক, সে শয়তানের সব কথা খুলে বলি ! তুমি জান, ও অ্যাঞ্জেয় গেছল, সেই কলঙ্কের সময় ! আমিও সঙ্গে গেছলুম। আমায় সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয়নি, ছল করে নদীর ধারে ফেলে গেছল। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, এ ভাব সহ্য হত না। কি পিশাচ সে, ভাব একবার। তারপর এই বে টাকা নিয়ে কাগজ বের কবেছে, এ সব তোমার টাকা। বন্ধু তোমার দিয়েছিলেন। সেই সব টাকা সে কাগজ বাব করে উড়িয়ে দেছে, তোমায় বলে নি, আমাকেও বলতে দেয়নি। আমায় কি ভরসা দিয়েছিল, জান ? বলেছিল, কাগজের কারবারে ভারী লাভ। ঐ টাকার চারগুণ তুলে দেবে বলে সে আমায় লোভ দেখিয়েছিল ! আমারও বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, তাই সে শয়তানের কথায় বিশ্বাস করেছিলুম। আমার বাহ করেছিল সে, আমায় বাহ করে য়েখেছিল। তার অবহেলা কাল রাত্রে আমার অসহ্য বোধ হয়—তোমার টাকা চেয়েছিলুম কাল রাত্রে, তা সে কি বললে জান, জাক ?”

ইদা মুহূর্তের জন্ত স্তব্ধ হইল। পরে উত্তেজিত দেহভার সম্মুখস্থ দেয়ালে বক্ষা করিয়া আবার সে বলিতে আরম্ভ করিল, “সে এক ফর্দ আমায় সামনে ফেলে দিলে, লঙ্ঘাফর্দ। দিয়ে বললে, তোমার পিছনে সেই টাকার দেড়গুণ তার থবচ হয়েছে। এতিম্বোলে আর কৃদিকদের ওখানে তোমার ঠাই অংগ খোরাক-পোষাকের জন্ত এই টাকা থরচ হয়েছে। তোমার টাকাত্তে তার সব শোধ না হলেও বাকীটা আমার খাতিরে মাণ করতে তার আপত্তি নেই, তা-ও সে বলেছে। এই সব অজ্ঞায় কথায় আমাব রাগ বেড়ে উঠল। বেশ কড়া ছ-চারটে কথা আমিও তাকে শুনিয়ে দিলুম—কথায় তার জবাব দিতে পারলে না, সে—তাই আমায় মেরেছে, মেরেছে সে !”

জাক ডাকিল, “মা—”

ইদা কহিল, “তাই আমি কোমার কাছে এসেছি,

জাক। আমায় আশ্রয় দাও। আর আমাকে আছে, কার কাছে বাব, বল ? কে আমায় ঠাই দেবে ?”

ইদার বুক মুখ রাখিয়া জাক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। পরে মাথা তুলিয়া সে কহিল, “বেশ করেছ, মা, তুমি আমার কাছে এসেছ। আমার জীবনে এই এক দুঃখ ছিল, এক অভাব,—সে এই যে, তোমায় পাই নি। আজ আমার সে দুঃখ ঘুচে গেছে—তোমায় পেয়েছি ! তুমি এসেছ ! এখানেই থাক—আর কখনও আমায় ছেড়ে য়েয়ো না। বতদিন আমি আছি, তোমার জাক বেঁচে আছে, ততদিন তোমার কোন অভাব হবে না, কোন দুঃখ নয়—এ তুমি ঠিক জেনো। কিন্তু আর তুমি সেখানে য়েয়ো না যেন, কখনও না।”

“আবার যাব। আমি ! সেখানে ! তার কাছে ! না, জাক ! এখন শুধু তুমি আর আমি ! এই আমাদের জগৎ, আর কেউ নয়—তৃতীয় প্রাণীটি নয়। তোমার বলেছিলুম, জাক, মনে আছে, একদিন এমন দিন আসবে, যেদিন তোমার কাছে আসব ? আজ সেই দিন এসেছে !”

পুত্রের অভয় স্নেহে নীড় পাইয়া ইদার চক্কল প্রাণ শান্ত হইল। ইদা কহিল, “তুমি দেখো, জাক—তোমার আমি কত ভালবাসি ! আমার এত স্নেহ, এবার তা সব তৃপ্ত করব। তোমার কাছে আমি স্বামী আছি, জাক, এবার সে স্বামী শোধ করব !”

জাক কহিল, “না মা, ও কথা বলে না ! তুমি আমার কাছে স্বামী নও। স্বামী আমি,—ছেলে ! মার স্নেহের জন্ত ছেলে যদি কখনও আপনার স্নেহ, আপনার প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে, তবেই তার মাতৃস্বামী শোধ হয়। ছেলের কাছে মার আবার স্বামী কি ! ছেলের জন্ত কষ্টকে কষ্ট বলে মানে না, অসহায় ছেলেকে মায়াব করে তোলে, কে ? সে মা ! সে-ই মা, স্বামী—? তা কি কখনও হতে পারে, মা ?”

জাকের কথা ইদার কানেও গেল না। চাহিয়া ইতিমধ্যে সে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল ! ইদা কহিল, “চমৎকার থাকব, এখানে দুই নায়ে-পোয়ে চমৎকার থাকব। তবে ঘরটা বড় বিক্সি, জাক, যেন আঁস্তাকুড় হয়ে আছে। ছোট্ট, আলো নেই, হওয়া নেই, কি এ ! এখানে থাকলে তুমি বাঁচবে কেন ? আমি যখন এসেছি, তখন আর কোনখানে কোন খুঁত রাখছি না !”

ঘবটি ছোট হইলে কি হয়, বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবারের কতখানি স্নেহ-বস্ত্র এ ঘরে মাখানো রহিয়াছে ! মার মুখে সেই ঘরের নিশা শুনিয়া জাকের প্রাণে ঈর্ষ্য বেদন বোধ হইল। এই ঘরখানির উপর বেচারী বেলিসেয়ারের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে !



কারখানায় বাইতে জাকের আর আধখণ্টা বিলম্ব ছিল—ইহার মধ্যে মাতার সুখ-স্বাস্থ্যের বন্দোবস্ত কি করিয়া হইয়া উঠিবে, তাহা ভাবিয়া জাক কাতর হইয়া পড়িতেছিল। ইদাকে ঘরে বসাইয়া রাখিয়া সে বেলিসেয়ারের কাছে গেল—বেলিসেয়ারকে সব কথা খুলিয়া বলিল, “মা ত এখানে থাকতে চান, বেলিসেয়ার। কি রকম বন্দোবস্ত এখন করা যায়, বল দেখি।”

কথাটা শুনিয়া বেলিসেয়ার চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাই ত! সে ভাবিল, তবেই ত জাক আর তাহাদের সহিত এক-থরচে থাকিবে না, স্বতন্ত্র বাসা লইবে। তাহার বিবাহের দিনও বৃষ্টি আবার কোন্ স্তম্ভ ভবিষ্যতের অন্তরালে সরিয়া পড়ে! কিন্তু আপনার নৈরাজ্যের বেদনা গোপন করিয়া সে জাককে সাহায্য করিতে তৎপর হইল। তাহাদের ঘরটি ছিল বড়—সেইটাই জাক ও তাহার মায় জগা ছাড়িয়া দিয়া জাকের ছোট ঘরে তাহারা আশ্রয় লইবে, ইহাই স্থির করিয়া সে জিনিস-পত্র টানিতে সুরু করিয়া দিল।

জাক বেলিসেয়ারকে মাতার নিকট পরিচিত করিয়া দিল। বেলিসেয়ার ইদাকে সহজেই চিনিতে পারিল—এতিম্বালের সেই পরিচ্ছন্ন গৃহটির পরিচ্ছন্ন কত্রী-ঠাকুরাণী!

এখন অতিরিক্ত একটা শয্যা, দুইখানা চেয়ার ও জলের পাত্র প্রয়োজন। জাক ড়ার খুলিয়া মূল্য বাহির করিয়া বেলিসেয়ারের হাতে দিয়া ইদাকে কহিল, “রাগাটা তা হলে মাদাম ওয়েবারই করে দেবে, কি বল, মা? বড় ভাল লোক, এই মাদাম ওয়েবার।”

“না, না, জাক, তাকে কষ্ট দেবাব কি দরকার? আমিই বাঁধব। তার জগা ব্যস্ত হইয়া না, তুমি। বেলিসেয়ার আমার দোকান দেখিয়ে দিক—আমি নিজে গিয়ে বাজার করে আনছি—নিজেই বাঁধব। কেন, শুধু শুধু কতকগুলো বাজ্রে খরচ করবে? তুমি কিবে এসে দেখবে,—সব ঠিক থাকবে।”

জাক পোষাক পরিয়া কারখানায় চলিয়া গেলে ইদা গায়ে একখানা শাল ফেলিয়া বেলিসেয়ারের সহিত বাজারে বাহির হইল।

মাতাকে আপনার গৃহে আপনার আয়ত্তে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিয়া জাকের প্রাণ আজ উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইতেছিল, আজিকার জগৎ যেন সেই চিরদিনকার পরিচিত পুরাতন জগৎ নহে—নূতন আনন্দ-পরিপূর্ণ। আজিকার প্রভাতে আনন্দের যেন এক বিচিত্র সুর জাগিয়া উঠিয়াছে—আকাশে বাতাসে অপূর্ণ রাগিনী! নিজীব প্রকৃতি যেন কাহার ললিত স্পর্শে সজীবিত হইয়া উঠিয়াছে। কাজের মধ্যেও সে আজ নূতন আনন্দ পাইল—অন্তদিন কারখানার কাজ শুধু

সে কর্তব্যের দ্বারা করিয়া বাইত মাত্র; তাহার হাত-পা নড়িত, প্রাণহীন যন্ত্রের মতই সে চলিত, ফিরিত। কাজের মধ্যে আজ প্রথম তাহাব প্রাণটা সাড়া দিয়া উঠিল। দ্বিগুণ উৎসাহে সে কারখানার কাজ চালাইল। তাহার সে উৎসাহ সঙ্গী কারিকরদিগের দৃষ্টি এড়াইল না। সকলে কাণামুখা করিল, “হজুরের আঁচ একবার ফুটিটা দেখেছে হে! প্রাণের ধন মিলেছে বৃষ্টি, আজ!”

জাক হাসিয়া উত্তর দিল, “ঠিক ধবেছ, বটে।”

কাজের শেষে লম্বু চিত্ত লইয়া জাক গৃহে ফিরিল। না, গৃহে নহে, মাঝ কোলে! মা গৃহে আছে? তাই? ইদার সঙ্কল্প বত দূত হউক, চিত্ত তাহার অত্যন্ত চপল! কে জানে ইহার মধ্যে আবার যদি তাহার মতেব পরি-বর্তন ঘটয়া থাকে? যদি সে আবার সেখানে ফিরিয়া গিয়া থাকে! জাক চিন্তিত হইয়া পড়িল।

গৃহে পৌছিয়া আপনার কক্ষের দ্বার-সম্মুখে দাঁড়াইতেই জাক স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। তাহার সেই ছোট আঁস্তাকুড়, এক পরিপাটি সজ্জার সুন্দর শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে!

বেলিসেয়ারের মোট-ঘাট সরাইয়া ফেলা হইয়াছে! একধারে শুভ্র কোমল শয্যা। মধ্যে ছোট একটি টেবিলে সুদৃশ্য ফুলদানি, তাহাতে নানা ফুল-পল্লবে রচিত সুবৃহৎ তোড়া! আর এক কোণে, বড় টেবিলে কাচের প্লেট-গ্রাস প্রভৃতি সজ্জিত! ঘরের কোণে সুদৃশ্য হোয়াটিনটে উৎকৃষ্ট মদের বোতল ও বিবিধ আসবাব। ইদার বেশটিও দিয়া পরিচ্ছন্ন।

জাককে দেখিয়া ইদা কহিল, “কি জাক, ঘর কেমন সাজানো হয়েছে?”

“চমৎকার হয়েছে, মা!”

“বেল আমার খুব সাহায্য করেছে অবশ্য—আমাদের বেলিসেয়ার। খাসা লোক, বেল।” জাকের আনন্দ হইল। বেলিসেয়ার মাতার এতটা প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার নামের সাদব সংকিপ্ত সংস্করণ অবধি বাহির হইয়া গিয়াছে!

ইদা কহিল, “আমি বাজ্রে ওদের নিমন্ত্রণ করেছি। বেল আর মাদাম ওয়েবার হুজনেই এখানে থাকে।”

“কিন্তু এত ডিসপাবে কোথায়, মা?”

“তার জন্তে ভেবে না জাক, কতকগুলো কিনে এনেছি, আর কিছু লেভ্যান্ডারের কাছ থেকে ধার পাবে!”

লেভ্যান্ডারের প্রতিবেশী। ইদা আসিয়া ইতি-মধ্যেই তাহার সহিত আলাপ করিয়া লইয়াছে!

“তা ছাড়া আরও শোন, জাক। খাবার-দাবারও চমৎকার হয়েছে। কেঁক-টেকগুলো প্লা দি লা বো থেকে এনেছি। সেখানে দরে সাত পেনি সস্তা পেয়েছি।

অনেক দূরে দোকান, কাজেই আসবার সময় গাড়ী ভাড়া করতে হয়েছিল, আমাকে ! আঠারো পেনি ভাড়া।”

জাক হাসিল। ইদার যোগ্য কাজেই বটে ! সাত পেনি দাম বাঁচাইবার জন্য আঠারো পেনি গাড়ীভাড়া ! তবে জিনিষ-পত্র যাহা আনা হইয়াছে, সমস্তই উৎকৃষ্ট। রোলগুলি ভিয়েনা, বেকারির, কফি ও অগ্নাঙ্ক জিনিষও প্যালে রোয়াইয়াল্ হইতে আমদানি !

জাক কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ইদা তাহা লক্ষ্য করিল।

ইদা কহিল, “বড় খরচ করে ফেলেছি, না, জাক ?”

“না, না। কে বললে, মা ?”

“তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি বিরক্ত হয়েছ। কিন্তু কি করব বল, জাক ? কিছুই ত ব্যবস্থা ছিল না। এত কষ্ট করে তুমি থাকবে, মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি তা দেখি, বল। যাহোক, ভবিষ্যতে সাবধান হব। এত খরচ আর হবে না।”

পরে সন্ধ্যা একখানা খাতা টানিয়া ইদা কহিল, “একটা খরচের খাতাও কিনে আনলুম। খরচ-পত্রের হিসেব না রাখলে সব বড় এলোমেলো হয়ে পড়ে। নয় কি ? হিসেবটা রাখা ভারী দরকার। লেভেকের দোকান থেকে খাতা আনলুম—এই পাশেই তার দোকান। ওর একটা লাইব্রেরী আছে—তাতেও কিছু চান্না দিয়েছি—বইটা-কাগজটা পড়তে পাব। মাসিক সাহিত্যেব সংগ্রহটা আমি রাখতে চাই—না হলে চলে কখনও ? টেকা বাবে কেন ? তুমিও একটু আধটু পড়ো।”

এমন সময় বেলিসেয়ারের আগমনে মাতা-পুত্রের হিসাব-নিকাশে বাধা পড়িল। বেলিসেয়ারের পক্ষাতে পুত্র-কোড়ে মাদাম ওয়েবারও আসিয়া উপস্থিত হইল। ইদা তখন অকুণ্ঠিতভাবেই আদেশ-অমরোপ করিয়া তাহাদের দ্বারা গৃহ-সজ্জার অবশিষ্ট ক্রটিগুলি সারিয়া লইল।

এই বিধাহীন তৎপরতার ইদার বীতিমতই অভ্যাস ছিল, কাজেই তাহার এতটুকু অপ্রতিভ হইবার কারণ ছিল না—জাক কিন্তু মার ব্যবহারে মরমে মরিয়া যাইতে-ছিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার বেকপ সন্তোষের সহিত ইদার ছোটখাট আদেশগুলি পালন করিতেছিল, তাহাতে অবশ্য জাকের সন্ধ্যা কাটিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিল না।

তাহার পর বথাসময়ে টেবিলে কাপড় বিছানো হইল। প্লেট-কাটার সংমিশ্রণে, আহাৰ্য্যের স্বাসে ও টেবিলের পার্শ্বে উপবিষ্ট নব-নারী-চতুষ্টয়ের আনন্দ-কলরবে একটা উৎসবের রাগিণী বাজিয়া উঠিল। বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার জীবনে কখনও এমন সুখান্তে বসনা ভূপ্ত করিবার সুযোগ পায় নাই। মাতার পার্শ্বে ভোজনে

বসিয়া শৈশবের ক্ষীণ স্মৃতি জাকের মনটিকে আজ উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছিল। এ অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্বাদ পাইয়া অতীত বহু দুর্দিনের কথা বেচারী তুলিয়া গেল। এক উজ্জল শুভ মুহূর্ত জাকের মলিন জীবনটাকে ক্ষণপ্রভার বিপুল দীপ্তিতে আজ ভরাইয়া দিয়াছে ! হে শুভ, হে উজ্জল, অভাগা জাককে আর তুমি ত্যাগ করিয়ো না। জাকের জীবন-নাট্যের শেষ অঙ্কগুলো এমনই মধুর আলোকরশ্মিপাতে সমুজ্জল রাখিয়া যবনিকা নিক্ষেপ করিয়ো—আর দুঃখ নয়, ভাবনা নয়, দ্বন্দ্ব নয় !

আহারাদির পর বেলিসেয়ার ও মাদাম ওয়েবার বিদায় গ্রহণ করিলে ইদা শয্যা বচনা করিল। জাক কহিল, “তুমি শোও, মা।”

“আর তুমি ?”

“আমি পড়ব।”

ভোজন-টেবিলের উপর বাতি খাড়া করিয়া জাক বহির গোছা নামাইল। ইদা কোঁতুহল-চিত্তে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, “এ সব কি বই, জাক ? কি হবে পড়ে ?”

“আমি ডাক্তারী পড়ছি, মা। ডাক্তার হব, তখন সব দুর্দশা ঘুচে যাবে—আর লোহা পিটে বেড়াতে হবে না।”

তখন সেই বাতির অমুজ্জল আলোকে বসিয়া জাক মাতার নিকট আপনায় সঙ্কল্প বিবৃত করিল—আশা ও আনন্দে পরিপূর্ণ স্বপ্নের ভবিষ্যতের পরিচয় দিল। জীবনে তাহার লক্ষ্য মিলিয়াছে—সেই চরম লক্ষ্যের অভিযুখে অবিচলিত চিত্তে সে আপনায় জীবনতরীধারী এখন বাহিয়া চলিয়াছে ! কোন বাধাই বাধা বলিয়া আর সে মানিবে না। বিপদের কোন তরঙ্গ তাহাকে ভীত, চ্যুত করিতে পারিবে না ! সেসিল তাহার জীবনের লক্ষ্য, কাম্য ! সেসিল তাহার প্রবৃত্তি ! সেই সেসিল যেদিন দুঃখ-দুঃখ-ভাগিনী হইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, সেদিন তাহার সকল কষ্ট সকল শ্রম চরম সার্থকতা লাভ করিবে !

এ কথা এতদিন সে মার কাছে প্রকাশ করে নাই। যদি মা সে কথা আর্জান্টের কাছে বলিয়া ফেলে ! আর্জান্টের দল যে সেসিলের প্রেম লইয়া বিজয়-কাঁতুকে মাতিয়া উঠিবে, এ কথা মনে করিতেও তাহার মাধার রক্ত চমকু করিয়া উঠিত। জানিলে বর্ষের দল এ সুখে বাধা না দিয়া কখনও ক্ষান্ত থাকিবে না ! এই কষ্টটা বর্ষেরে মিলিয়াইত তাহার জীবনটাকে এই বিপথে ঠেলিয়া দিয়াছে, আজ যখন সুযোগ পাইয়া সে পথ হইতে ফিরিয়া প্রপথ্য সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে, তখন এ পথ হইতে আর সে হটিবে না—সহস্র মুগ্ধ প্রলোভনেও নহে !

তাহার পর গগনদ ভাষায় জাক আপনায় প্রেমের

কাহিনী বলিয়া চলিল। ইদা শুধু থাকিয়া থাকিয়া বীতিমত সাহিত্যিক ধরণে, “বাঃ, চমৎকার ত! ঠিক যেন সেই গল্পের নায়ক-নায়িকার মতই। বাঃ!” বলিয়া টিপ্তনীর দিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে জাকের কাহিনীর মুক্ত প্রবাহ বাধা মানিল না। বিপুল উচ্ছ্বাসে বীধ-মুক্ত তটিনীর মতই সে আপনার কাহিনী বলিয়া চলিল। যখন তাহার কাহিনী শেষ হইল, তখন ইদা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “সত্যি জাক—এ নিয়ে বেশ একখানা নভেল লেখা যায়। ঘটনা-গুলো খাসা জমে এয়েচে তা।”

## মঠ পরিদেচ্ছদ

ইদার হুঃখ

মাতা-পুত্রে মিলিয়া একদিন এতিয়োল-ভ্রমণে আসিল। মনে আনন্দ হইলেও, একটা দুশ্চিন্তা ক্ষণে ক্ষণে জাকের মস্তিষ্কে বিঁধিতেছিল। মাকে যে সম্পূর্ণ আপনার আশ্রিতে ফিরিয়া পাইয়াছে, ইহাতে মাঝে মাঝে অন্তরে গৰ্ব্বও সে অনুভব করিত, কিন্তু মাতার প্রকৃতির সহিত তাহার যেটুকু পরিচয় ছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিলে বিপদেরও আশঙ্কা আছে। মা হইলে কি হয়, এমন চটুলভাষিনী প্রগল্ভা নারী জাক জীবনে দুইটি দেখে নাই। কোন্ কথটা বলিলে কি ফল হয়, কোন্ কথায় কি মূল্য, ইদা তাহাব কিছুই বুঝিত না।

জাকের ভাবনা হইল, এই প্রগল্ভতায় মাতার সম্বন্ধে সেসিল কি ধারণা করিবে! হয়ত ইদার প্রতি একটা তীব্র অবজ্ঞায় সেসিলের শ্রোণ ত্বরিত উঠিবে! তাহাব উল্লেখ্য চিন্তে সহসা দাক্ষণ বাধা পাইয়া হঠাত ভবিষ্যতের সুখের আশার সে একান্ত সঙ্কটচিন্তা হইয়া পড়িবে! তখন জাক কি লইয়া মাতার গৰ্ব্ব করিবে? মাতার নামের উল্লেখই যে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিবে! কিন্তু উপায় নাই! মাকে সেসিলের সহিত মিশিতে দিতেই হইবে। সে স্থির করিল, যখনই সে মাকে উদ্দাম গল্পে উদ্ভত দেখিবে, তখন যেমন করিয়াই হউক সেই উদ্দাম গল্পের শ্রোতা সে বাধা দিবে!

সেসিলের সহিত প্রথম আলা মা তাহাকে কতটা সন্মোদন করিল দেখিয়া জাক কতকটা আশস্ত হইল। কিন্তু তাহার কথার মধ্য দিয়া বিলাস-কৌতুক-প্রাবিত সমাজের সুরই ধ্বনিয়া উঠিতেছিল, তাহা যে শুধু আড়ম্বর-প্রিয় সর্ব-সারল্যবর্জিত মজলিস-সভার ক্ষৌণ প্রতীক, জাকের কাছে তাহা ধবা পড়িতে মুহূর্ত বিলম্ব ঘটিল না।

ইদা যে সকল গল্প বলিত, সেগুলি অত্যন্ত চমকপ্রদ, কাজেই শ্রোতার চিত্ত বিপুল কৌতুহলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। ভোজের টেবিলে কথার কথায় পিরেনিসের প্রশঙ্গ উঠিলে ইদা বলিল, “আহা, পিরেনিস! পাহাড়ের গা বহিয়া গলিত তুষাবের ধাবা ছুটিয়াছে! কি সুন্দর সে স্থান! পনের বৎসর পূর্বে সে পিরেনিস ভ্রমণে গিয়াছিল, সঙ্গে ছিল, স্পেনের একজন ডিউক। লোকটার পয়সা অগাধ থাকিলে কি হইবে—মস্তিষ্কের বিকার ছিল; উদ্ভাদ বলিলেও চলে। চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকাইয়া উভয়ে পাশাড়ে উঠিয়াছিল। সে কি আমোদ! গাড়ীতে অসংখ্য স্ট্রাম্পেনের বোতল ছিল। বোতল হটা নিঃশেষ করিয়া ডিউক ত ক্ষেপিয়া ঘাইবার মত হইল! পরে কাণ্ড যাহা ঘটিল—ইত্যাদি।

সেসিল সমুদ্রের প্রশঙ্গ উদ্ভাপন করিলে ইদা বলিল, “সমুদ্র! ঠিক বলেছ মা—কিন্তু ঝড়ের সময় সমুদ্রের মূর্তি যে কি দাঁড়ায়, তা ত জান না। আমি জানি। পামার কিছু দূরে অগাধ সমুদ্রে তখন আমাদের জাহাজ ছুটেছে। হঠাৎ ঝড় এল। কি সে ঝড়—ভয় হল, বুঝি বা সব ধায়, প্রলয় উপস্থিত। কোন মতে একটা কেবিনে মুখ গুঁজড়ে পড়ে রইলুম। কাপ্তেন এসে আমার সেবার লেগে গেল। যেমন মেঘের ডাক, তেমনি বিহ্বলের চমক! জাহাজে ছিল কোথাকার,—বুঝি পিনাসের—রাজা। রাজা নিজে আমার মুখে ব্রাণ্ডির পর ব্রাণ্ডি ঢেলে যত মুছাঁ ডাকায়, ততই আবার ঘন ঘন মুছাঁ! ওঃ, কি কবে যে রাত কাটল, তা কিছুই জানতে পারলুম না।”

এই সকল অসম্বন্ধ গল্পগুলার স্রুজ জাক অজ্ঞানানাবিধ প্রশঙ্গ তুলিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিতেছিল। তথাপি সেই সকল গল্পের খণ্ডিত অংশগুলো বিখণ্ডিত সর্পদেহের মতই নাচিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতেছিল। খণ্ড হইলেও তাহাব প্রত্যেকটা ঘেন জীবন্ত, পরিপূর্ণ। সেসিল নিঃশব্দে সমস্ত কথা শুনিয়া ষাইতেছিল। জাকের আকস্মিক বাধা-দান লক্ষ্য করিলেও তাহার অর্থ সে ঠিক বুঝিতে পারিল না।

অপরাহ্নে বই খুলিয়া জাক ডাক্তার বিভাগের সম্মুখে পড়িতে বসিলে সেসিল ইদাকে কহিল, “এস মা, আমরা বাগানে একটু বেড়াই গে।” সর্হর্ষ সন্মতি দান করিয়া ইদা সেসিলের অনুসরণ করিল। জাক চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার পাঠ-বত মনও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এখনই মা না জানি কি অসম্বন্ধ গল্প জুড়িয়া দিবে—মায় তারল্য এখনই সেসিলের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাড়াতাড়ি বহি বন্ধ করিয়া সে ডাক্তারকে কহিল, “পড়াটার আজ কেমন মন লাগছে না—একটু বেড়ানো যাক্, দাঃ।!”

ডাক্তার কহিলেন, “বেশ!”

জাক বাহির হইল। আসিয়া সেসিলের একখানা হাত সে আপনার হাতে চাপিয়া ধরিল। মধুর স্পর্শ! এ স্পর্শে যেন কি যাহু আছে! জাকের সকল দুঃখ—সকল অবসাদ এ স্পর্শে নিমিষে কোথায় ঝরিয়া যায়! পাল তুলিয়া দিলে অল্পকূল বায়ুর মুখে বোঝাই নৌকাও যেমন নদীর খর বেগ কাটিয়া অনায়াসে চলিয়া যায়, সেসিলের স্পর্শে তাহাবও ভাবগ্রস্ত চিত্ত তেমন সকল বাধা-বিপত্তি, দুশ্চিন্তা-অনিশ্চিততার বেগ কাটিয়া সমুজ্জল সিদ্ধি-ভবনের অভিমুখে ক্ষিপ্ত ছুটিয়া চলে। আশাব উদ্গাদনায় প্রাণ ভরিয়া উঠে—কানের কাছে কে যেন মৃদুস্বৰ্ণ আশ্বাস দেয়, ভয় নাই, ভয় নাই! সমস্ত দুঃখ-যাতনা নির্ভয়ে দলিয়া যাও। কঠিন সিদ্ধি মধুর বাঁধনে ধরা-দিবে রে, ধরা দিবে!

আজ মা উপস্থিত ছিল বলিয়া জাকেব আনন্দ কেমন বাধা পাঠেছিল। জাক ও সেসিলকে লক্ষ্য করিয়া ইদা ডাক্তারকে বলিল, “দুটিতে যেন ঠিক সেই পরীর গল্পের নায়ক-নায়িকা!” কথাটা জাকেব কানেও পৌছিয়াছিল—ডাক্তারের মুখের ভাব দেখিয়া সে বৃশ্চিল, কথাটা তাহাব বড় কটিকর ঠেকে নাই! তথাপি কোলাহলজনী নির্জন বনে সেসিলের সাতচর্য্যে জাক একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। বনে কোথাও নানা বর্ণের অজস্র ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। তাহারই দলে মৌমাছি ও প্রজাপতির বিচিত্র সভা বসিয়াছে! কোথাও ওকের শাখায় বসিয়া একটা পাখী সুরের ফোয়ারা ছড়াইয়া দিয়াছে। চারিধারেই আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন! তাহার মধ্যে এটী সকল শোভা, সকল বর্ণ, সকল সুরের বাণী সেসিল তাহার পার্শ্বে! আলোকের এমন বিপুল সমারোহের মধ্যে অন্ধকার কোথায় রহিবে! কাজেই জাকেব চিন্তাকাশ আজ মুক্ত, নিশ্চল, উজ্জল!

বেড়াইতে বেড়াইতে চারিজন আশীর কুটীরে আসিল। অভ্যর্থনা করিয়া আশী সকলকে বসাইল। পুরাতন মনিব ইদাকে আতিথেয় আপ্যায়িত করিবার উদ্দেশ্যে সে সাধ্যমত আয়োজন করিল। ইদা কিন্তু নাসা কুণ্ঠিত করিয়া তাহাব এক টুকরা স্পর্শ করিল মাত্র—দেখিয়া জাক ঈষৎ বিবল হইল। তাহার পূর্ব সকলে ‘আরাম-কুঞ্জ’ দেখিবার জন্ত উঠিল।

কুঞ্জ-গৃহের চূড়ান্ত বৃক্ষলতায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহের আপাদ-মস্তক আইভি লতায় ছাইয়া ফেলিয়াছে! চারুশ্ৰু, এখন এখানে ছিল না, আর-জানালা সমস্তই বন্ধ! ফটকের সম্মুখস্থ সব পথটি বহুকাল মাহুষ্য-চরণ-স্পর্শ-লাভে বঞ্চিত থাকায় আগা-ছায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইদা গৃহের সম্মুখে মুহূর্তের জন্ত দাঁড়াইল। পুরাতন সহস্র স্মৃতি তাহার

চিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চারিদিককার এই মুক প্রস্তরখণ্ডগুলি যেন সহসা মুখর হইয়া উঠিয়া তাহার কর্ণে কত কথা কহিয়া গেল। চারিধারে অজস্র ক্রিমেটিসের গাছ—নক্ষত্রের মত সহস্র শাখা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে। ক্রিমেটিসের একটা পুষ্পিত শাখা ছিঁড়িয়া লইয়া ইদা তাহা নাসিকায় ধরিল, পবে ধীবে ধীবে চক্ষু মুদ্রিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

জাক জিজ্ঞাসা করিল, “কি হয়েছে, মা?”

“কিছু না, জাক! মনের একটা খেয়াল, এ শুধু! আর কিছু নয়—ওঃ, আমার জীবনের অনেকগুলো দিন এখানে ঘুমিয়ে পড়ে আছে।”

সত্যি চতুর্দিকে সৃষ্টির একটা সূনিবিড় নীরবতা বিবাজ করিতেছিল। দ্বার-পার্শ্বে ফুলকে লাটিনে লিখিত আরাম-কুঞ্জের অক্ষরগুলি লতা-পাতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নিস্তর গৃহটিকে উচ্চ স্তম্ভ-শোভিত কবরের মতই স্তব্ধ-গম্ভীর মনে হইতেছিল। ইদা ধীবে ধীবে ক্রমালে চোখ মুছিল। তাহার সকল স্রবের সীমায় সে-দিনকার মত কে যেন পরদা ঢাকিয়া দিল। অতীতের চিন্তায় মন একান্ত ভাবগ্রস্ত বোধ হইল—বৃকের উপর কে যেন পাষণ চাপিয়া ধরিল। সেসিল শুনিয়াছিল, দুর্ঘাৎহারে ইদা স্বামীর গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কাজেই সে এই বিমর্ষতা দূর করিবার জন্ত সহস্র চেষ্টা করিল—জাক মাতার সম্মুখে ভবিষ্যতের উজ্জল চিত্র বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ধরিল; তথাপি সকলই বৃথা হইল।

অগত্যা সকলে সে স্থান ত্যাগ করিল। পথে ইদা জনান্তিকে সেসিলকে কহিল, “দেখ মা, এবার থেকে যখন তোমরা এখানে আসবে, আমার আর সঙ্গে নিয়ে না। আমার মন কেমন অস্থির হয়ে ওঠে। তোমাদেরও আমোদের ব্যাঘাত হয়।” ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

ইতর পক্ষর মত তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছে, ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পক্ষে সবলে যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছে, এখনও সে পাপিষ্ঠকে ইদা তবে তুলিতে পাবে নাই, ভালবাসে! হা রে দুর্ভল-দুঃখী নারী!

ইহার পর অনেকগুলি রবিবার আসিল, গেল—ইদা আর এতিয়ালেন পথে পদার্পণ করিল না। কাজেই জাক ছুটির অবসরগুলি ভাগ করিয়া লইল; অর্দ্ধেক অবসর সে সেসিলের সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইত এবং সন্ধ্যার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলি বনে প্রান্তরে ভ্রমণে কাটাইবার পরিবর্তে পারি ফিরিবার পথে ট্রেণেই তাহার অতিবাহিত হইত! সারাদিনের আনন্দ-প্রমোদের স্মৃতিতে পরিপূর্ণ চিত্ত লইয়া টেণের শূন্য কক্ষে সে দেহভাব এলাইয়া দিত —পাণিপার্শ্বস্থ কুটীর-বাসী নর-নারী বা পাহাড়জনের আনন্দ-কলরবের একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুধু তাহার

কর্ণে আসিয়া পৌঁছিত—চারিধারেই হর্ষেব তরল স্রোত ছুটিয়াছে—সদিকে দূকপাতমাত্র না করিয়া সে এতিয়োল ছাড়িয়া মার কাছে ফিরিয়া আসিত। আসিয়া সে প্রায়ই দেখিত, মা ঘবে নাই, হয় লেভ্যান্ডের কুটারে, নয় লেভেকের লাইব্রেরীতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে।

এত অবজ্ঞা-সাহসনাতেও ইদার মনে এতটুকু পরি-বর্তন ঘটে নাই। স্থান, কাল বা পাত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নারী একটা ভুল্জ ইঙ্গিতে আপনার হৃদয়ের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিত—এবং বিদ্রোহ বা গান্ধি আশঙ্কা কিছুমাত্র না রাখিয়া ধন-ঐর্ধ্যের নাড়ঘর বর্ণনায় ও চটুল আনাপে আসব মাতাইয়া তুলিত। লেভ্যান্ড-গৃহিণীর অবস্থা তেমন গুচ্ছল ছিল না—লোকের ছিন্ন বস্ত্রাদিতে তালি দিয়া রিপূ কবিতা তাহার দিন-গুজরায় হইত, সে বেচারী যৎকিঞ্চিৎ-প্রাপ্তিব আশায় একান্ত বৈধে আগ্রহে ভাগ করিয়া ইদার কাচিনী শুনিত। এমনভাবে মন জোগাইয়া চলিলে যদি কোন দিন ইদা অকস্মাৎ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনিয়া দেয়। কিন্তু সত্তরই সে বুঝিল, ধন-ঐর্ধ্যের আড়ম্বর মুখের বাণীতে যত সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, হাত হইতে তেমনভাবে কখনই বাহির হয় না। মুখ এতখানি বকিলে কি লাভ, হাত যে অত্যন্ত কুপণ। যথের মত সর্বদা সে চাপিয়া আঁটিয়া বসিয়া আছে, তাহাকে ভুলানো দুঃসাধ্য ব্যাপার। তথাপি জাকের গৃহে লেভ্যান্ড-গৃহিণীর ভোজের নিমন্ত্রণটা মধ্যে মধ্যে বাদ পড়িত না, সেইটাই ছিল তাহার পক্ষে পরম লাভ। তাই তাহার বৈধ উৎসাহিত হইলেও উদ্বাস্ত হইবার সে কোনই লক্ষ্য দেখাইল না। এমন নিমন্ত্রণ না পাইলেও লেভেক কিন্তু মন্ম গুচ্ছাইয়া লয় নাই। ইদার মত উৎকৃষ্ট বসন-ভূষণ-পরিহিতা নারী যে তাহার লাইব্রেরীতে পদার্পণ কবিতা গৃহ ও গৃহস্থানীটিকে কৃতার্থ করিতেছে, ইহাতে পল্লীর পাঠক-পাঠিকামহলে লাইব্রেরীর প্রতি সম্মম বাড়িয়া গিয়াছিল; এবং তাহারই ফলে ছিন্ন মলিন গ্রন্থ ও পুরাতন স্মলভ সংবাদপত্রে পবিপূর্ণ লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র জীব গৃহ আপনার আর্থিক অবস্থাও কতক ফিরাইয়া লইয়াছিল।

এই সঙ্গ হইতে মাতাকে বিচ্ছিন্ন করিবাব জ্ঞান জাকের সমস্ত চেষ্টাই নিফল হইল। কণ্ঠস্থল হইতে ফিরিয়া জাক প্রত্যহই প্রায় দেখিত, জানালার পার্শ্বে ইদা এক-খানা বহি লইয়া বসিয়া গিয়াছে। সে বহি উত্তেজক ঘটনাপূর্ণ কোন ডিটেক্টিভের কাহিনী, নয়, প্রেমের বর্ণনা-বহুল কোন অপাঠ্য উপন্যাস! বহির পৃষ্ঠায় মলিন হস্তের সহস্র ছাপ—কানখানে বা মাখনের দাগ—পেন্সিলের ঘন রেখার বহুল কণ্টকিত—পার্শ্বে বিচিত্র ছাঁদেব অক্ষরে নানাবিধ মন্তব্য। ইতিপূর্বে যে গ্রন্থখানি

বহু অসঙ্গ কারিকর ও নারীব হস্তে ফিরিয়াছে, তাহারই সহস্র নিদর্শন বহিখানির মারা অবয়বে স্পষ্ট স্মৃতিত বহিয়াছে!

একদিন সে মাকে বহির পৃষ্ঠায় একান্ত নিবিষ্ট-চিত্তা দেখিয়া লগাটের উপর পতিত আপনার কেশের রাশি সরাইয়া মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। মাথার উপর পল্লী নিখল আকাশে গোবুলির স্বর্ণরশ্মিরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে—শান্ত মৃদু বায়ু লতায়-পাতায় দোল দিয়া বহিয়া চলিয়াছে—এমন সময় ইদা অসমভাবে কতকগুলি কদম্ব বচনা পড়িয়া সময় কাটাতেছে। বাহিরের পানে চাহিলে চিত্ত জুড়াইয়া যায়, মনে শান্তি আসে—বিধাতার কি বিরাট বিচিত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা সম্মুখে উন্মুক্ত পড়িয়া রহিয়াছে—বিবিধ রসে পবিপূর্ণ। সে গ্রন্থ অবহেলা কবিতা অক্ষুপ্যবাসী কোন অক্ষম লেখকের দম্য-জর্জরিত কদম্ব বচনার রসাস্বাদ ইদা গ্রহণ করিতেছে।

জাক একবাদ ইদার পানে চাহিল। ইদা তখন বই বন্ধ করিয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিল। দিনেব আলো স্নান হইয়া আসিয়াছে—বহির পৃষ্ঠার অক্ষর ভাল লক্ষ্যও হয় না। ইদা একটা দৌর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে কি ভাবিতেছিল। কি ভাবিতেছিল সে! কবি কোথায়? কি করিতেছে? আশ্চর্য—তিন মাস দেখা নাই, তবু একখানা চিঠিও কি তাহার লিখিতে নাই? ইদা সেই কথাই ভাবিতেছিল। সহসা বহিখানা তাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। ইদার চমক ভাঙ্গিল—বহিখানা কুড়াইয়া লইয়া সে দেখিল, ওধারে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া, জাক! জাক ইদার পানে চাহিয়া ছিল। তাহা চোখ দুইটা যেন বাঘের চোখের মতই জ্বলিত-ছিল। এ কি ইদা—? না, অভিমান? না, আর-কিছু?

ইদা কহিল, “আমার শরীরটা আজ ভাল ঠেকছে না, জাক। তোমার জন্ত রান্নাবান্নাও হয়ে ওঠেনি। কি করি—তাই ত!”

জাক নিমেষে বুঝিল, এ পীড়া কোথায়! শরীরে নহে, এ পীড়া মনে! যে কীট ইদার মনে আশ্রয় লইয়াছে, সে তবে মরে নাই—দিনে দিনে বেশ সে বাড়িয়া উঠিতেছে! দেহ-মন সে বিধে জর্জরিত হইলেও ইদার আজ মুক্তি নাই! করণ সমবেদনায় জাকের শ্রোণ ভরিয়া উঠিল। অভাগিনী, অভাগিনী ইদা!

জাক বলিল, “কেন মা, তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না, আমার কাছে? কি কষ্ট হচ্ছে, বল!”

“না জাক, এ কিছু নয়—শুধু একটু মাথা ধরেছে। তুমি ভেবো না! তোমাকে বুক করে রয়েছে, আর আমার কিসের দুঃখ থাকতে পারে, জাক?”

ইদা উঠিয়া জাককে আপনার বুক চাপিয়া ধরিল—

তাহার শিরে চুখন কবিতা কহিল, “তুমি ভেবে না, জাক, একিছু নয়!”

“তবে চল মা, বাহিরে কোথাও খেয়ে আসিগে!”

ইচ্ছা না থাকিলেও আপত্তি কবিত্তে ইদাব সাহস হইল না। তখন মাতা পুঞ্জ হোটেলের অভিমুখে চলিল। জন-বহুল পথ। ভিড় ঠেলিয়া উভয়ে চলিল। পথে কেহ কোন কথা কহিল না। কথা কহিবার জ্ঞান উভয়ের অন্ত-বহি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু কি কথা প্রথমে কহা যায়? বহু বর্ষের বিচ্ছেদ মাতা-পুঞ্জের মধ্যে সত্যিই একটা অগভীর ব্যবধান রচনা কবিতাছিল। উভয়ের জীবন-গতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পথে গিয়াছিল। একদিকে আনন্দ, বিলাস, প্রমোদ, অপর দিকে কাজ, কাজ, কাজ—তাঁহাও যত অভিন্ন নীচ সঙ্গীর দলে মিশিয়া! জাক কয়দিনে এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মার মনে পূর্বেরকাব মত অসন্তোষ স্থান-লাভের আশা তাহার পক্ষে এখন দুঃশামাত্র! ইদা এখন তাহার শত্রু আর্জান্টের ভাবে এমনই অহুপ্রাণিত হইয়া বসিয়াছে যে, তাহার স্বাভাব্য একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে! তাহার জীবনের রহ, তাহার স্ত্রের কণ্টক আর্জান্ট ইদাকে আপনার ছায়ায় এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে যে, কোন নিপুণ ভাস্করও বুদ্ধি কোমল সূতিকার সাহায্যে এমন মূর্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না! দান্তিক কবির যত মিথ্যা দর্প ও দন্ত আজ ইদার মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছে! ইদা এখানে যেন আর্জান্ট বহি একটা প্রতিবিম্ব-মাত্র!

একদিন সন্ধ্যায় ইদাকে লইয়া জাক ভ্রমণে বাহির হইল। সন্ধ্যার পক্ষতের নিম্নেই বিস্তীর্ণ কানন-প্রান্তর, —কুঞ্জ, ক্রীড়া-পর্বত, সেতু, বাগ-বেদী প্রভৃতি সকল অল্পষ্টানে তাহা স্পষ্টজিত! কাননের সীমা বেড়িয়া সূর্যদীপ দেবদাক শ্রেণী চলিয়াছে! কানন দেখিয়া ইদার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। বাগ-বেদীতে সঙ্গীত দল নানা বাগিনীর সাহায্যে ঐক্যতান জাগাইয়া তুলিয়াছে। দেবদাকর শিব বস্তুচ্ছটায় রাঙাইয়া তুলিয়া সূর্য্য এই কিছুক্ষণ অন্ত গিয়াছে—আকাশের গায় লাল আভাটুকু তখনও সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই। একটা বেঞ্চে বসিয়া ইদা ও জাক ঐক্যতান সঙ্গীত শুনিতেছিল। সহসা কাকাকে দেখিয়া জাক উঠিয়া দাঁড়াইল। এ যে মাসিখো রুদিক!

সত্যিই রুদিক! দেখ বাঁকিয়া গিয়াছে, বাক্তিকা ঘনাইয়া আসিয়াছে! রুদিকের পার্শ্বে তাহারই হাত ধরিয়া এক বালিকা এবং পশ্চাতে একটি বালক! বালিকার মুখে কে যেন জেনেদের মুখখানি অবিকল বসাইয়া দিয়াছে! সহসা তাহাকে দেখিলে মনে হয়, জেনেদই যেন আবার বালিকা-মূর্তি ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কথা কহিবার জ্ঞান যেমন জাক অগ্রসর হইবে, অমনিই তাহার দৃষ্টি জেনেদের প্রতি পতিত হইল। জেনেদ

ও মার্জ্যা পবম্পরে হাত ধরাধরি করিয়া কদিকের পশ্চাতে আসিতেছিল। রুদিকের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না—জেনেদ নিমেষে জাককে চিনিয়া তাহাকে নিকটে আসিতে মৃদু ইঙ্গিত করিল। জাক আসিলে জেনেদ কহিল, “একসঙ্গে একটু বেড়ানো যাক, এস। অনেক কথা আছে—বলব। বাবাকে একটু এগিয়ে যেতে দাও। উনি কে?”

“আমার মা!” বসিয়া জাক মাকাব সহিত জেনেদের পরিচয় করাইয়া দিল।

মার্জ্যা ইদাকে কহিল, “এরা দুজনে পুতানো বন্ধু; নিজেদের সব কথা কবে। আমি আপনার সঙ্গে বেড়াই আসুন।” মার্জ্যা ও ইদা একত্রে চলিল। জাক ও জেনেদ গতি মুহূর্তকরিয়া পিছাইয়া পড়িল।

জাক প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল, বিবাহিত জীবনে জেনেদ অভীষ্ট স্ত্রের অধিকাংশী হইয়াছে কি না। উত্তরে জেনেদ কহিল, এত স্মৃতি যে পৃথিবীতে পাওয়া যাউতে পারে, ইহা তাহার ধারণাই ছিল না। তাহার স্বামী মত স্বামী আব কাহার ভাগ্যে মিলিয়াছে! যেমন গভীর প্রেম, তেমনিই অসীম উদার তাঁহার হৃদয়। জেনেদ তাঁহার সদয়ে স্থান পাইয়াছে—এ স্থানের বিনিময়ে সে আজ স্বর্গকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে! মার্জ্যা তাহার সেবায় স্ত্রী—সে নিজে বলিয়াছে, জেনেদের এত গুণ আছে পূর্বে জানিলে তুচ্ছ যৌতুকের জ্ঞান মার্জ্যা এতটুকুও লোভ করিত না—বিনা যৌতুকেই তাহাকে আপনার বুকে সে তুলিয়া লইত। এ স্বামীর ভালবাসায় জেনেদের আজ কোন দুঃখ নাই—কোন অভাব নাই। তাহার দুই সন্তান—একটি পুত্র, একটি কন্যা! দুইটিই রত্ন!

জেনেদের স্ত্রের কথা শুনিয়া জাকের মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল! দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি, তাহা ইহার। যেমন বুঝিয়াছে, এমন যদি সকলে বুঝিত!

জাক কহিল, “আর সব খবর কি? মাদাম ক্লাবিস্—”

জেনেদ কহিল, “মায়া গেছেন, আজ দু বছর হল—লয়ার নদীতে ডুবে মায়া গেছেন! ভারী বিপদেব কথা সে।”

“ডুবে! সে কি?”

“আমরা মুখে বলি, ডুবে গেছেন, অবশ্য সে শুধু বাবাকে ভোলাবার জ্ঞান—আব উনিও তাই জানেন। কিন্তু আসলে তা নয়! তিনি আত্মহত্যা করেছেন! নাস্তের সঙ্গে দেখা বন্ধ হয়ে গেল—কাজেই—! যাক—তাঁর মত অদৃষ্ট যেন কারও না হয়! এ যে কি বদ নেশা, লোকে একেবারে বুদ্ধিগুণ মান-সম্মান সব হারিয়ে ফেলে!”

নেশাই বটে! কথাটা জাকের মর্মে গিয়া বিধিল! কিন্তু জেনেদ তাহা লক্ষ্য করিল না।

জেনেদ বলিতে লাগিল, “আমরা ভেবেছিলুম, এ শোকের পর বাবাকে আর বাঁচাতে পারব না। আসল কাণ্ড যে কি, তা উনি এখনও জানেন না। তার পর ইনিও পারিতে বদলি হলেন, বাবা একলাটি কাব কাছে থাকেন, তাই ওঁকে এখানে নিয়ে এলুম। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে গল্প-সল্প কবে তবু যাহোক শোক একটু ভুলে আছেন। শব্দ কি হয়ে গেছে, দেখছ ত! আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বড় একটা কন না। তুমি কাল এস, জাক—তোমায় দেখলে হয়ত একটু ভাল থাকতে পারেন। তোমাকে ভালও বাসেন, প্রায়ই তোমার কথা বলেন। চল, এখন ওঁর কাছে বাই, বেশীক্ষণ আবার দেখতে না পেলে ভাববেন, বুঝি আমরা ওঁ'র কথা কচ্ছিলুম।”

ইদা মাজার সহিত রীতিমত উৎসাহে গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল। সে বলিতেছিল, “চমৎকার লোক! যেমন কথায় বার্তা, তেমনি আমোদে! প্রতিভাবান পুরুষ বটে!” জাক ও জেনেদ আসিয়া পড়ায় সে কথা বন্ধ হইল। আকস্মিক রসভঙ্গে ইদা ঈষৎ বিবর্তিত বোধ করিল। ইদার কথার শেষ অংশটুকু জাকের কানে গিয়াছিল। সে মুহূর্তে বুঝিল, মাজার সহিত ইদার আর্জী-স্তর সম্বন্ধেই কথা হইতেছিল। দিক, নির্লজ্জা নারী।

সত্যই আর্জীস্তর কথা হইতেছিল।

মাজা ইদার নিকট হইতে তাহার স্বামীর সংবাদ জানিতে চাতিয়াছিল—এবং ইদাও উচ্ছৃঙ্খলিত আবেগে আপনাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। কবির প্রতিভা, অপূর্ব নীচ হিংসা ও বিবেকের সহিত তাহার অকান্ত সংগ্রাম, সাহিত্য-জগতের কত উচ্চে তাহার আসন এবং তাহার মস্তিষ্কে নাটক, উপন্যাসের কি বিচিত্র আখ্যান গুণময়ীরা মবিতছে, সে সমস্ত কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার ইদা এতটুকু ক্রটি রাখে নাই। কোন বিষয়ে মনস্তত্ত্ব হওয়ার কিছুদিনের জন্ত তাহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিবে, সেই জন্ত শুধু উভয়ে সাব করিয়া এ বিচ্ছেদ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। দীর্ঘ মিলনের অন্তরালে ক্ষুদ্র একটু বিরহ রচনা করিলে প্রেম গভীরতর হয়, এমন মন্তব্যও বাদ পড়ে নাই। এমন সময় জাক আসিয়া কাহিনীর কোন্ অসমাপ্ত ছত্রে ছেদ টানিয়া দিল।

জাক ভাবিল, ইহাদের সহিত মাতার যে আলাপ হইল, তাহাতে মঙ্গলবয়স সম্ভাবনা। সেভ্যাক্স-লেভেকের দল ছাড়িয়া এই সকল সরল আড়ম্বরহীন বান্ধবের সঙ্গে প্রকৃতই ঈপ্সিত। ধর্মপরাধী জেনেদ, ব্রহ্মার্জী-হৃদয় মাজা—ইহাদের সঙ্গে মিশিলে ফিরিলে একটা স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সংস্পর্শে মাতার অন্তরের মলিনতাও ঘুচিতে পারে, ইহা ভাবিয়া জাক আনন্দ বোধ করিল। কিন্তু দুই-চারি দিন পরেই সে বুঝিল, এই প্রমথীলা ধর্মপরাধী

জেনেদের সংসর্গ ইদার তেমন মনঃপূত নহে—পুত্রের কথায় ভ্রষ্টীতে যেমন একটা অসভ্য সমাজের গন্ধ পাওয়া যায়—জেনেদ প্রভৃতির সংসর্গও ঠিক তেমনই দুর্গন্ধ ভাসিয়া উঠে। কেমন একটা অভদ্র ভাব!

জাকের গৃহেও সেই গন্ধ—চতুর্দিকেই কেমন একটা কদর্যাতা! এই সকল নীচ কারিকণদের দলে কোথাও এতটুকু শ্রী বা পারিপাট্য নাই! দারিদ্র্য তাহার নিরানন্দ মূর্তি লইয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার জীর্ণ কপালগুলি চতুর্দিকে খটখট করিয়া নাচিয়া ফিরিতেছে! পথে ঘাটে কোথাও পলাইয়া দুইদণ্ড হাঁফ ছাড়িবার উপায় নাই। সর্বত্রই কুশ্রী বীভৎসতা,—আবর্জনার স্তুপ। তথা হইতে অশ্লীল একটা দূষিত বাষ্প উথিত হইতেছে। দারিদ্র্যের এ দুর্গন্ধে ইদা আর তীর্থাহঁতে পারে না! তাহার বুক যেন কে সবলে চাপিয়া ধরিতেছে। আর সহ্য হয় না! ইদার প্রাণ মুক্তির জগৎ আত্মকাতর উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। মুক্তি চাই! এ নিরানন্দময়তার মধ্য হইতে মুক্তি চাই। ইহার মধ্যে বাস করার চেয়ে আত্মহত্যাও লক্ষণে ভাল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

কাহাকে?

একদিন সন্ধ্যার গৃহে ফিরিয়া জাক লক্ষ্য করিল, ইদার চিত্ত অত্যন্ত অধীর চঞ্চল, মুখে-চোখেও কেমন একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদিনকার সে স্নান বিমদ ভাব কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে! জাককে দেখিয়া ইদা ক্ষিপ্ত স্বরে কহিল, “আর্জীস্তর আমায় চিঠি লিখেছে, জাক!” পরে সজোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া ইদা আবার কহিল, “সত্যই শেষে চিঠি লিখেছে! চারমাস কোন খবর-বার্তা না পেয়ে আর চূপ করে সে থাকতে পারল না—দেখলে, কৈ, আমি ত আকারে-ইঙ্গিতেও একটা সাড়া দিলুম না! সে পারবে কেন, থাকতে? আমি ত তাকে চিনি। আমার কাছে লুকাবে কি? কি লিখেছে, জান, জাক? লিখেছে, সে খুব খানিক বেড়িয়ে-চেড়িয়ে পারিতে ফিবেছে, আমার ইচ্ছা হলে আমি এখন তাব ওখানে যেতে পারি।”

শঙ্কিত চিত্তে জাক প্রশ্ন করিল, “তুমি কি ঠিক করলে? যাবে?”

“যাব! আমি! তুমি যে কি বল, জাক! আমার এখানে কিসের দুঃখ? কিসের অভাব? কষ্ট বরং তাই! ভারী অবস্থা, সে,—আপন-ভোলা লোক! একটা কাজও নিজের কববার ক্ষমতা নেই—একলা



থাক্তে পারবে কেন, সে ? ভারী এলোমেলো লোক  
বে ! কিন্তু একজন উঁচু দরের আটি'ষ্ট বটে !"

"তুমি তার চিঠির কি জবাব দেবে ?"

"জবাব দেব ! যে অসভ্য আমার গায় হাত তুলেছিল,  
তার চিঠির আবার জবাব দেব ? তুমি তাহলে আমাকে  
আজ্ঞাও চেন নি ! আমার একটা মান আছে, ইজ্জত  
আছে, তা খোঁয়াব ? কখনও না ! আমি তার চিঠির  
সবটা পড়িও নি—এ অবধি পড়েই ছিঁড়ে ফেলেছি—  
একেবারে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি ।  
এমন মেয়ে আমি নই ! তবে একবার বড় দেখতে সাধ  
হয়, কি বকম কাজ-কর্ম চলছে তার, কেমন কবে সে  
ঘর-গেরস্থানী করছে ! বেশ বুঝছি, সব একেবারে জঘন্য  
একাকার করে তুলেছে ! তবে—না, তাই বা কি কবে  
হবে ? আমি আর এ জীবনে সে জায়গা মাড়াছি না ।  
এই ত সে এত ঘুরেছে, কি দেশটায় ভালো—" বলিতে  
বলিতে ইদা অগমনস্বভাবে পকেট হইতে আর্জান্ট'র পত্র  
বাহির করিল ! সে-ই পত্র, যে পত্র এইমাত্র সে বলিল,  
টুকরা-টুকরা কবিতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে ! চিঠি দেখিয়া  
ইদা কহিল, "এই যে, রয়াতে গেছল ! দেখ একবার  
বুদ্ধিখানা ! সেখানকার জল-হাওয়া সহিবে কেন ? যাই  
হোক, না—তাহা বা ইচ্ছা, তাই সে করুক—আমার অত  
মাথা-বাখায় কান কি !"

মাতাকে নিলজ্জভাবে এই অকাব্য মিথ্যা বলিতে  
দেখিয়া জাক লজ্জায় মরিয়া গেল । এ অসবলতা, এ ভাগ  
আচরণে কি প্রয়োজন ছিল ?

এই কথাটিই সেদিন সারা সন্ধ্যা ধরিয়া জাকের মনকে  
বিপন্ন পীড়িত করিয়া তুলিল । ইদা আজ আবার পূর্বের  
মত প্রফুল্ল হইয়াছে, গৃহের ছোটখাট কাজকর্মগুলোয়  
হাতও দিয়াছে । তাহার গতি, ভঙ্গীও আজ বেশ সহজ  
লঘু হইয়া উঠিয়াছে ! জাক যখন বহিঃ পৃষ্ঠা খুলিয়া মার  
কথা ভাবিতেছিল, পাঠে বিন্দুমাত্রও মনোনিবেশ কবিত্তে  
পারিতেনি না, সহসা তখন ইদা আসিয়া তাহার ললাটে  
চুষন করিয়া কহিল, "বেশ জাক—খুশী তোমার সাহস,  
আর মন কিন্তু ! পড়াশোনায় কি চাও ?"

কিন্তু ইদানীং জাকের সে অমুরাগ নিখিল হইয়া  
আসিয়াছিল, একাগ্রতায় নিষ্ঠুর বাধা লাগিয়াছিল ! এই  
সহজ প্রফুল্লতাব মধ্য দিয়া ইদার সমগ্র অন্তরখানি আজ  
পরিষ্কার ধরা পড়িয়া গিয়াছে—জাকের চোখ আছে, সে  
তাহা লক্ষ্যও করিয়াছে !

জাক ভাবিল, এ চুষন কাতাকে ? কেন ? ইহার  
অর্থ কি ! যে অতীত আপনার সমস্ত ক্ষীণ স্মৃতি লইয়া  
মিলাইয়া যাইতেছিল, সেই সমস্ত অতীত আজ আবার  
নিমেষে প্রবলভাবে সাড়া দিয়া উঠিল । পূর্বপ্রেম  
আবার পরিপূর্ণ আবেগে জলিয়া উঠিয়াছে—

নারীর দুর্বল হৃদয় আবার সে কুহকে ধরা দিয়াছে । গুণ  
গুণ করিয়া ইদা আর্জান্ট'র রচিত একটা গানের ছত্র সুর  
করিয়া গাহিতেছিল,—

"নাচ বে নাচ, বনের লতা,

নাচ বে নাচ গাছের পাতা—"

জাক স্তম্ভিত হইল । এ কি নিলজ্জতা ! সে  
এখানে বসিয়া রহিয়াছে, ইদার তাহাতে ক্রক্ষেপও নাই ?  
এতটুকু সঙ্কোচও নাই ? আশ্চর্য্য । জাকের চোখের  
কোণে জল আসিল । যে ভগ্ন তরীখানিকে অসীম বলে,  
অপূর্ব্ব কৌশলে সে তীব্র দিকে টানিয়া আনিতেছিল,  
সহসা তাহা একটা দমকা বাতাসের ঘায় এমনই ভাবে,  
কুলের কাছে আসিয়াও ডুবিতে চলিয়াছে—আর রক্ষা  
নাই, উদ্ধার নাই ! বিলাসের তুচ্ছ একটা উপকরণের  
মত, আজম বিলাসীর মুহূর্ত্তের খেয়াল-নিবৃত্তির জন্তই  
ইদা জীবন-ভার বহিয়া বেড়াইবে ? যতক্ষণ খেয়াল,  
ততক্ষণই আদব,—সে খেয়াল নিবৃত্ত হইলেই দুবে যাও !  
তবুও ইদা মন যোগাইয়া সেই বিলাসীরই পিছনে  
কিবিবে ? কোনদিনই কি তাহার জ্ঞান হইবে না ?  
বঙিন ফায়সের মত সাজিয়া বেড়ানোতেই কি নারী-  
জন্মের চরম সার্থকতা ?

আবার পরক্ষণেই জাকের মনে হইল, মূর্খ অবোধ  
হইলেও এই নারী, তাহাব মা ! মাকে শ্রদ্ধা করিয়া  
সন্মান করিয়া সে তাহাবও অন্তরে শ্রদ্ধা ও সন্মান  
জাগাইয়া তুলিবে । মায়েব দুর্বলতার সমালোচনা  
করিবার অধিকার তাহাব নাই ! মাকে এ বিপদ হইতে  
উদ্ধার করিবে সে—কবিত্তেই হইবে ! ভাগ্য-গগনের  
এক কোণে কৃপা মেঘের একটি বিন্দু আবার দেখা  
দিয়াছে । সে মেঘকে জমিতে দিলে ঝটিকা আসন্ন হইয়া  
উঠিবে ! সহস্রভূত ও ব্রহ্মেব স্নিগ্ধ যুগ্ধ পবনে সে  
মেঘটুকু সবাইয়া দিতে হইবে, শ্রদ্ধার কিরণে সে কালিমা  
বুটাইতে হইবে, নহিলে ঝড় উঠিলে সকলই ধ্বংস হইয়া  
যাইবে !

জাক স্থির করিল, সতর্কভাবে সে মাতার ভাব-ভঙ্গী  
লক্ষ্য করিবে ! দুর্বল-হৃদয়া নারীর দল আপনাদিগের  
অলস কক্ষহীন জীবনগুলোকে প্রায়ই একটা মিথ্যা  
আদর্শে পিছনে ছুটাইয়া লইয়া বেড়ায় । 'ইদাও অলস,  
কাজ-কক্ষে তিলমাত্র তাহাব ঝুটি নাই, নিলজ্জনে বসিয়া  
কি অন্ধ মায়াব রাজ্য যে সে গড়িতে থাকে, তাহা সে-ই  
জানে । আর্জান্ট'র কবি-প্রতিভার প্রতি এক অদ্বুত শ্রদ্ধা  
যে ইদার হৃদয়কে এখনও সবলে আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছে,  
জাকের তাহাতে এতটুকুও সন্দেহ ছিল না । তাই প্রতি  
মুহূর্ত্তেই তাহার আশঙ্কা হইত, কখন তাহার প্রতি  
মমতায় এ ক্ষীণ আভাবটুকু চকিতে মিলাইয়া যায় !



মনের এ আশঙ্কা খুলিয়াও কাহারও কাছে বলা যায় না—ইদা তাহার মা! মার দুর্বলতার কথা সে কাহাকে বলিবে? ইহাই ছিল জাকেব আরও দুঃখ। কাহারও কাছে এ দুঃখের কথা বলিতে পারিলে বৃষ্টি, তাহার বৃকের ভার অনেকটা লাঘব হইবারও সম্ভাবনা ছিল! কিন্তু এক কথা বলা চলে না! তাই জাক এ বিপুল দুঃখের ভার আপনার বৃকে পুরিয়া মনে মনেই গুমরিতে থাকে!

আর্জান্তর পত্র পাইয়া ইদাকে সহসা আজ কাজ-কৰ্মে অতিরিক্ত অমুরাগ প্রদর্শন করিতে দেখিয়া জাক ঈর্ষে আশান্বিত হইল। সে ভাবিল, ইদা নিজের দুর্বল হৃদয়ের এ বিপুল উত্তেজনা, চাক্ষুস্যে উজ্জ্বাসটুকু বৃষ্টিয়া ফেলিয়াছে, এবং বৃষ্টিয়া তাহা বোধ করিতেছে! এটুকু যে দুর্বলতা, তাহা সে বৃষ্টিয়াছে এবং বৃষ্টিয়াছে বলিয়াই তাহা বোধ করিবার জগ্গ ইদার আজ এতখানি আয়াস! কত গল্পে জাক বহু হতভাগ্য স্বামীর করুণ কাহিনী পড়িয়াছে,—যাহারা চপলা পত্নীর হৃদয়-সংশোধনে অহরহ সতর্ক চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে! নিপুল উপন্যাস-কারগণেব ইঙ্গিতে জাক তাহা নিব্যা বৃত্তিত! এই যে ইদা আর্জান্তর প্রসঙ্গ ভুলিয়াও তাহার সম্মুখে উপাধন করে না, এই যে কাজ-কৰ্মে নিবিষ্ট থাকিবার জগ্গ সর্বদা সে চেষ্টা করিতেছে—এ কেন? জাক ভাবিত, ইহার অর্থ, শুধু তাহাকে ভুলাইবার প্রয়াস। পাছে পুত্রের মনে এতটুকু সন্দেহ জন্মে! আর্জান্তকে ইদা যে এখনও ভুলিতে পারে নাই, জাক তাহা বুঝিল। সে স্থির করিল, এ বিষয় লইয়া মনের মধ্যে আর সে কোনকপ দ্বন্দ্ব-বিরোধ জাগাইবে না, অদৃষ্টে যাহা আছে, ঘটুক—ভবিষ্যৎ বোধ করিবার চেষ্টায় আর সে ভাবিয়া মরিবে না।

একদিন কারখানা হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার অম্পষ্ট আলোকে জাক দেখিল, উত্তার হারুজ ও লাবাশ্চাঙ্ক তাহাদের গলির মোড় বাকিয়া সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল! এদিকে কোথায় তাহারা আসিয়াছিল? কি কাজে?

গৃহে ফিরিয়াই জাক মাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেহ আসিয়াছিল কি না! উত্তরে যাহা শুনিল, তাহাতে সে অম্পষ্ট বুঝিল, তাহার বিরুদ্ধে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলিয়াছে—পাছে তাহার নিকট কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এ জগ্গ গৃহেও একটা সতর্ক আয়োজন আপনা হইতে গড়িয়া উঠিয়াছে! চারিদিকেই গোপনতা! ইহাও সে আজও নূতন কবিতা লক্ষ্য করিল।

রবিবার এতিয়োল হইতে গৃহে ফিরিয়া জাক দেখিল, ইদা নিবিষ্ট চিত্তে কি একটা পাঠ করিতেছে! সে যে আসিয়া ইদার পাশে ঝাঁড়াইয়াছে, ইদা তাহা জানিতেও পারে নাই। অসার উপন্যাস-পাঠে মাতার অসাধারণ অমুরাগের কথা জাকেব অবিদিষ্ট ছিল না—তাই সেদিকে জাকেব কোঁতুল মোটেই উজ্জিত হইল না! কিন্তু সহসা

যখন ইদা জাকেব দেখিয়া বহিখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, “ওঃ, জাক, তুমি! আমি এমন ভয় পেয়ে-ছিলুম! ভেবেছিলুম, কে এস!”

জাক কহিল, “ওটা কি পড়ছিলে তুমি?”

“ও কিছু না, একখানা বাজে বই। ভাল কথা—ওদের সব খপর কি, বল ত! ডাক্তার বিভাল কেমন আছেন? আব সেসিল? তুমি সেসিলকে আমার ভালবাসা জানিয়েছিলে ত?”

কথাটা বলিবার সময় ইদার গা-টা যে ছম ছম করিয়া উঠিল, তাহা জাকেব দৃষ্টি এড়াইল না। ইদা বুঝিল, জাকেব চোখে এখন ব্লা দিবার চেষ্টা করার লাভ নাই জাকেব মনে একটা সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, নিশ্চয়! তাহার চেয়ে ব্যাপারটা প্রকাশ করিয়া বলাই সম্ভবত বৃষ্টিয়া ইদা কহিল, “ও, এ বইখানা কি, তুমি জিজ্ঞাসা করছ! দেখ না—”

ইদা বইখানি জাকেব সম্মুখে টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল। চক্চকে মলাট দেখিয়া জাক নিমেষেই বহিখানি চিনিল! এ সেই মাসিক-পত্র, যাহার প্রথম খণ্ডের সহিত সিদ্ধ জাহাজে তাহার পরিচয় হইয়াছিল। এখন মাসিকখানির কলেবর অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—পত্রের সংখ্যাও প্রথম খণ্ডের অর্ধেক! ভিতরের কাগজও অত্যন্ত পাতলা, মলিন। যে সকল মাসিক-পত্রের গ্রাহক জুটে না, অথচ প্রচারিত হইতে যাহাদের বিদ্যুন্মাত্র লজ্জা বা দ্বিধা নাই, এখানি অবিকল তাহাদেরই দোসর! প্রবন্ধগুলিও উদ্ভট বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ—শুধু একটা অবজ্ঞাব হস্ত উদ্ভেক করে! গুরু-গম্ভীর নামের আবরণে দান্তিক লেখকগণেব অক্ষম লেখনী-নিঃসৃত উজ্জ্বাস-গদ্যগদ্য, যুক্তি-হীন, অসার সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক সন্দেহ, এবং ছন্দ ও ভাবহীন কবিতায় পত্রিকার শীর্ণ কলেবর ভরিয়া বহিয়াছে। হস্তরসের এই অপূর্ণ ভাণ্ডে হস্তাপন কবিবার জগ্গ জাকেব এতটুকুও আগ্রহ হইল না, কিন্তু সহসা তাহার দৃষ্টি স্টাট-সন্নিবিষ্ট একটা বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিষয়টি একটি কবিতা, নাম “প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ”—তাহার লেখক, কবিবর আর্জান্ত স্বয়ং! কবিতাটি এই,—

“কি! বলিল না হায়, একটি বাণীও

বিদায়-কণ্ঠে—

পিছনে বারেক চাহিলও না সে

নয়ন-কোণে!

হারিয়ে হৃদয়—”

ইত্যাদি।

এমনই ভাবে দুই শত ছত্র ব্যাপিয়া প্রাণহীন ছন্দের মালা দীর্ঘ অজগরের মতই গা মেসিয়া পড়িয়া

আছে! পাছে শালৎ কবিতার মর্ম গ্রহণ করিতে না পারে, এ জগৎ প্রতি চাপি ছত্রের শেষে শালৎের নাম উল্লিখিত হইয়াছে! জাক বোষে জলিয়া কাগজ-খানা সজোর দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “কি স্পষ্ট! তোমাকে এ কাগজ পাঠাতে তার সঙ্কোচ হল না!”

ইদার বুকটা চ্যাপ করিয়া উঠিল। একটা ঢোক গিলিয়া সে কহিল, “না, সে ত পাঠায় নি! নীচেকার ঘরে আজ দু-তিন দিন ধরে কাগজখানা পড়েছিল। কে ফেলে গেছে, জানি-ও না।”

মুহূর্তের জগৎ কক্ষ নিম্নরূপ হইল। কাগজখানা কুড়াইয়া লইবার জগৎ ইদা কাতর হইয়া উঠিল, কিন্তু লইতেও তাহার সাহস হইতেছিল না। অবশেষে সে অস্বাভাবিকভাবে কাগজখানার নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইল। জাক তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল, “ও কাগজখানা আবার তুমি পড়ছ! ফেলে দাও, ফেলে দাও; বেখো না। ও পত্রটা ভারী কদম্ব, বোভংস।”

ইদা কহিল, “কৈ, আমার ত তা মনে হল না।”

“বল কি! এ কোথাও না আছে ভাব, না আছে মানে। একে তুমি কবিতা বল? এ পুড়িয়ে ফেলা উচিত।”

“জাক—” ইদার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। ইদা কহিল, “মিছে তর্ক করো না, জাক। আর্জাস্ত কেমন লোক, তার দোষ-গুণ কি, তা আমি যেমন জানি, এমন আর কেউ নয়। আমার সে অনেক কষ্ট, অনেক যন্ত্রণা দিয়েছে, মানি। আর মানুষটার সম্বন্ধে আমি কিছু বলছি না, তবে মানুষ এক, তার কবি-প্রতিভা আর—সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ। আর্জাস্ত মানুষ হিসাবে যেমন লোকই হোক না, তার কবিতা যে অসাধারণ, তাতে সন্দেহ নেই! তার কবিতায় এমন একটা আবেগ আছে, তেজ আছে, যা ফাল্গে আব-কারও কবিতায় নেই! যথার্থই যাকে বলে আবেগ-কম্পন! এই আবেগ-কম্পন, মুসের লেখায় ছিল, কিন্তু মুসের কবিতায় এমন মাধুর্য ছিল না! আর্জাস্তের “প্রেম-বজ্রাণে”র মত কবিতার বই ফরাসী ভাষায় আর নেই, যদিও তেমন আব-একখানি বই আমি দেখিনি! কেন, এই ‘প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ’ কবিতাটাই কি ফেল্‌না! চমৎকাব! আহা, নাবী চলে গেল! তার প্রিয়তমের সমস্ত প্রেম উপেক্ষা করে, তার পানে না চেয়ে নিষ্ঠুরভাবে সে চলে গেল! সুন্দর ভাব!”

জাক তীব্র স্বরে কহিল, “কিন্তু এই নাবী যে তুমি! তা বুঝ না! তুমি যে-ভাবে চলে এসেছ, তা তুমি ভুলে গেলে?”

ইদা কহিল, “জাক, এ কথা বলে আমার অপমান করো না তুমি। কবিতা কারও নিজের কথা নয়—এ আটের ব্যাপার। এ বিষয়ে তোমার চেয়ে চর্চাও আমি

করেছি বিস্তর! আর্জাস্ত আমার উপর যত অত্যাচারই ককক, সে যে একজন খুব উঁচু দরের কবি, সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনদিন এতটুকুও সন্দেহ উঠবে না। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে আর্জাস্তও একজন! আজ দেশের লোক তাকে বুঝছে না—কিন্তু একদিন এমন সময় আসবে, যখন তার পরিচিত বন্ধুর দল গর্ব করে বলতে পাবে যে, আমি কবি আর্জাস্তকে জানতুম, তার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খেয়েছি।”

কথাটা বলিয়া ইদা বাহিরে চলিয়া গেল। মাদাম লেভ্যান্সের কাছে বাইয়া দুইটা গল্প করিয়া প্রাণের ভার লঘু করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। জাক কিয়ৎকণ ধরিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রহিল; পরে একটি দাঁঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া টেবিলের ধারে আসিয়া বহি খুলিয়া বসিল। পাঠে মন লাগিতেছিল না—নানা চিন্তা, নানা কথা তাহার মাথার ভিতর বণোন্মত্ত সৈন্ত-দলের মতই চলা-ফেরা করিতেছিল। সহসা একটা পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। জাক অধৌ আগ্রহে দ্বারের পানে চাহিয়া রহিল। সম্মুখে একটা ছায়া পড়িল। জাক উঠিয়া দ্বারের নিকট আসিল। এ কি—স্বপ্ন! না—এ যে শত্রু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত! আর্জাস্ত! জাকের আপাদ-মস্তক শঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। সে কম্পিত স্বরে কহিল, “কে?”

“আশ্চর্য হয়ো না, জাক। চমকে উঠো না। আমি আর্জাস্ত, কবি আর্জাস্ত।”

নির্মম আঘাত! জুর পরিহাস! অদৃষ্টের কি এ বক্র ইঞ্জিত! জাক ভাবিয়াছিল, ইদা বুঝি ফিরিয়া আসিল! কিন্তু তাহা না হইয়া এ কি—কে আসিল?

শীকারকে আয়ত্তের মধ্যে অতিক্রান্তভাবে দেখিলে প্রথম মুহূর্তেই বাঘ যেমন একটা উত্তেজনায় সহসা চকল হইয়া উঠে, জাক ঠিক তেমনই চকল হইয়া উঠিল। আজ তাহাব চিরশত্রু তাহারই দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। আজ জাক উল্লে, আর্জাস্ত নিয়ে। আর্জাস্ত জাকের আয়ত্তের মধ্যে! দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জাক স্পষ্ট দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে কেন তুমি? কি চাও?”

কবি আর্জাস্তের মুখখানা সহসা রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখেই কথা বাহিব হইতে গিয়া বাধিয়া গেল। কষ্টে বল সংগ্রহ করিয়া সে বলিল, “আমি ভেবেছিলুম, তোমার মা এখানে আছে!”

“হা! আছেন, এখানেই আছেন! আমি এখন তাঁর অভিভাবক—তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা-সাক্ষাৎ ঘটতে দেওয়া না দেওয়া আমার ইচ্ছা! আমি তা ঘটতে দেব না!”

বলিবার ভঙ্গীতে কথাটায় এমন যুগা ও অবজ্ঞা বাজিয়া

উঠিল যে, আজ্ঞাস্ত তাহা লক্ষ্য করিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। সে কহিল, “জাক, আমাদের দুজনের মধ্যে মস্ত একটা ভুল চলছে! ববাববই চলে আসছে। এখন তুমি মাহু হইবে, জীবনের গভীর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছ, সুতরাং এখন আর এ ভুলটুকু চলতে দেওয়া ঠিক নয়। এস, আমি তোমার হাতে হাত বেখে বসছি, আজ থেকে আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকবে না, আমরা দুজনে দুজনের বন্ধু হব, সবল আত্মিক অকপট বন্ধু—”

আজ্ঞাস্তকে তাহাব কথা শেষ কবিতো না দিয়া জাক কঠিন পক্ষ স্বরে কহিল, “এ প্রহসন অভিনয়ের কোন প্রয়োজন দেখছি না, আমি। তুমি আমায় ঘৃণা কর। আমিও তোমায় ততোধিক ঘৃণা করি।”

“কিন্তু কতদিন ধরে আমাদের মধ্যে এ ভাব চলে আসছে, জাক?”

“কত দিন! বোধ হয়, প্রথম যে দিন তোমায় দেখি, সেই দিন থেকেই। যাই হোক, সে সব কথার আলোচনায় কোন লাভ নেই। আমার এ ঘৃণা কখনই দূর হবে না! তুমি আমার শত্রু, চিরদিন শত্রুই থাকবে। তোমায়-আমায় বন্ধুত্ব অসম্ভব! আমার সারা জীবনের অভিশাপ, আমার সব সুখের কটক তুমি—আজ এসেছ কি না বন্ধুত্ব স্থাপন করতে! আমার লজ্জা, আমার ঘৃণা, আমার সকল দুর্দশা, সকল দুর্ভাগ্যের মূল তুমি—”

“কিন্তু শোন, জাক—এতদিন যথার্থই আমরা পবম্পরের প্রতি একটা মিথ্যা আচরণ করে এসেছি। এখন বন্ধুত্বের একটা সুযোগ দাও। জানই ত, কবি বলে গেছেন, এ জীবন নহেক স্বপন। আমরা একটা ভাব নিয়ে ত বাস করতে পারি না—”

জাক আবার বাধা দিয়া কহিল, “ঠিক বলেছ তুমি, এ জীবন নহেক স্বপন। সত্যই তাই। জীবন একটা সত্য, ভাষণ কঠোর সত্য। আমাব সময়েব দাম আছে। তোমাব সঙ্গে বাজে তর্ক, বাজে গল্প করে তা নষ্ট করতে পারব না। সংক্ষেপে আমাব বক্তব্য শেষ করি, শোন। দশ বছর ধরে আমার মা তোমাব বাদীগিবি কবে এসেছে—বাদী কি—বাদীরও নিজের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, আমাব মা তাকে ছিলা না—তিনি ছিলেন, যেন তোমার তৈজসের মত। এ দশ বছর আমি যে কষ্ট সহ করেছি, তা আমিই জানি, কিন্তু থাক্ সে কথা! তোমাব কাছে এখন কাঁহুনি গাইতে চাই না। গাইতে ঘৃণা হয়। এখন আমার মাকে আবার আমি ঘিরে পেয়েছি—তীর উপর এখন আমার সম্পূর্ণ অধিকার। যেমন করে পারি, এ অধিকার এখন বজায় রাখব। তাঁকে আব তোমার কাছে আমি যেতে দেব না—কিছুতেই না। কেন দেব? তোমারই বা তাঁকে আর কিসের প্রয়োজন? তাঁর মাথাব চুল আজ শাদা হয়ে গেছে—চোখের জল মুখে কালিব

ছাপ টেনে দিয়েছে, যৌবনের সে লাবণ্য সব ঝবে গিয়েছে—তোমাব বিলাসের খোরাক তিনি আর জোগাতে পারবেন না! এখন তাঁকে তোমার মনেও ধরবে না, আব। আজ তাঁর আর কেউ নেই—শুধু আমি আছি। তিনি আমার মা—শুধু মা, আর কারও কেউ নয়। আমার সেই মাকে আমি কাছে কাছে রাখব—ছাড়ব না, কিছুতেই ছাড়ব না।”

আজ্ঞাস্ত জাকের ভাবটা সম্যক হৃদয়ঙ্গম কবিতো না পারিলেও বলিল, “বেশ, তা তিনি তোমাব কাছেই থাকুন। আমি শুধু একজন পুর্বোনা বন্ধুর মত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। যদি আমাব দ্বারা কোন উপকার হয়—”

“কিছু না—কিছু না—কোন দরকার নেই। আমার একলাব পারশমই চূড়ান্ত। সব অন্য ভাবে মিতে যায়—কিছু বাকী থাকে না।”

আজ্ঞাস্ত কহিল, “তোমার কিছু অহঙ্কার হয়েছ, দেখছি, জাক। আগে ত কৈ তুমি এমন কড়া কথা বলতে পারতে না।”

“ঠিক বলেছ, কবি আজ্ঞাস্ত। যদি বুঝে থাক, তবে এটুকু আরও জেনে রাখ যে, আমার বাড়ীতে অনেকক্ষণ তোমায় বন্দান্ত করেছি, আব করব না। এখন শোন তুমি, সহজভাবে যদি বিদায় না নাও, তাহলে মানে মানে তা পাবে বলে আমার ভরসা হয় না। কারণ, এখানে তোমার হাজিবি থাকাটা আমাব সহের গীমা অতিক্রম করেছে; বুঝলে?”

জাকের কণ্ঠস্বরে এমন একটা অমানুষিক তীব্রতা, দৃষ্টিতে এমন তেজ বিকীর্ণ হইতেছিল যে, তাহার কথার উত্তর দিতেও আজ্ঞাস্তের আর সাহস হইল না। সে দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না কবিয়া ধীর পদে নীচে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহার জুতার শব্দ শুনা গেল, জাক উৎকর্ষভাবে তথায় দাঁড়াইয়া বহিল। পরে সে শব্দ মিলাইয়া গেল। জাক আপনাব কক্ষে আসিয়া বসিল; আসিয়া দেখিল, ইদা একটা চেয়ারে বসিয়া আছে; তাহাব কেশরাশি বিস্তৃত, চক্ষু অস্বাভাবিক রাঙা। ইদা কাঁদিতোছিল।

জাককে দেখিয়া চোখ মুছিয়া ইদা কহিল, “আমি এখানে বসে সব কথা শুনেছি, জাক, সব কথা, যে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি, যে, আমি—” জাক মাতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাব হাত আপনাব হাতে তুলিয়া লইল। পরে মাতার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, “এখনও সে বেশী দূর যাবার্ন—ডাকব তাকে, বল?”

হাত ছিনাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জাকের স্বন্ধে মাথা রাখিয়া ইদা কহিল, “না, না, জাক—তুমি ঠিক

বলেছ। আমি তোমার মা, শুধু মা, আর কারও কেউ নই আমি, কিছু হতেও চাইনে আর।”

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক রাতে ডাক্তার বিভালকে জ্বাক এক দীর্ঘ পত্র লিখিতে বসিল। সে লিখিল,

“আমার বন্ধু, আমার পিতা, আমার গুরু, আমার সব কর্তব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। মা চলিয়া গিয়াছে, তাহারই কাছে গিয়াছে। সে যেন একটা ভীষণ চক্রান্ত! কিন্তু না, সে জন্ত মার কোন দোষ দিই না—কুৎসার আশ্রয় লইতে সেইজন্তই আমি এত নাবাক্ত।

“কাহাবই বা দোষ দিব? ছলেবেলায় এক কাফ্রীও ছেলে ফুলে আমার সঙ্গী ছিল। সে বলিত, ‘গবীব হতভাগার দল যদি একটা দীর্ঘনিশ্বাসও না ফেলিতে পেত ত দম বন্ধ হয়েই তারা মবে যেতে।’ কথাটার অর্থ আজ যেমন বুঝিতেছি, পূর্বে কোনদিন এমনটি বুঝি নাই। আজ যদি আপনার কাছে এ তপ্ত খাস ফেলিতে না পাইতাম, সব কথা খুলিয়া বলিতে না পারিতাম, তাহা হইলে বুকের এ অসহ ভারে আমি বোধ হয় মরিয়া বাইতাম! দুর্ব্বহ এ ভার! রবিবার পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিব না—সে এখনও অনেক দেরী। কিন্তু সেসিলের সহিত কোন্ মুখেই বা এখন আমি দেখা করি?”

“আপনাকে বলিয়াছিলাম আর্জান্ট’র সহিত আমার দেখা হইয়াছিল—তাহার সহিত স্পষ্ট সব বুঝা-পড়া করিয়াছিলাম। সে দিন হইতে মার মুখে আর হাসি দেখি নাই, বুঝিয়াছিলাম, তাহাব মনে এতটুকু স্মৃতি নাই, স্বাচ্ছন্দ্য নাই। মন অহনিশি সেইখানেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! দুর্ব্বল নারী কি করিয়া মন বাধিবে—তথাপি মনকে বাধিবাব জন্ত মা যে রীতিমত একটা চেষ্টা করিতেছিল, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই জন্তই আমি এ বাসা বদলাইবার চেষ্টায় ছিলাম, যদি স্থান-পরিবর্তনে মন কিছু শান্ত হয়। মার উপর দৃষ্টিও বেশ সতর্ক রাখিয়াছিলাম, বাসাও ঠিক হইয়াছিল। এ বাসা মার পছন্দ ছিল না। চারিধারে ছোটলোক ও কারিকরের বাস—নূতন বাসাব কথা মাকে জানাই নাই! গোপনে সব ঠিক করিয়াছিলাম। বাসা নূতনভাবে সৌখীন রকমেই সাজাইতেছিলাম। সব ঠিক হইয়াছিল, ভাবিয়াছিলাম, একেবারে মাকে সেখানে বেড়াইবার ছলে লইয়া গিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিব। আকস্মিকতার জন্ত মার মনটা খুবই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে—তাহারও ফল মন্দ দাঁড়াইবে না। কদিকদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।

“আমি নূতন বাসাতে গিয়া বেলিসেয়ারকে পাঠাইয়াছিলাম, মাকে লইয়া আসিতে। সন্ধ্যার পরও মা আসিল না, বেলিসেয়ারও ফিবিলা না। আমি অস্থির

হইয়া উঠিলাম। শেষে অধীরভাবে নিজেই সন্ধান লইতে বাইব স্থির করিতেছি, এমন সময় বেলিসেয়ার ফিরিয়া আসিল—একা, সঙ্গে মা নাই। বেলিসেয়ার আমার হাতে মা ব চিঠি দিল। ছোট একখানি চিঠি—শুধু লেখা আছে, আর্জান্ট’র অত্যন্ত অসুখ, এ সময় তাহাকে না দেখিলে ধর্ম্ম থাকিবে না, এইজন্তই চঠাৎ তিনি পাবি যাইতেছেন; আর্জান্ট’ সারিলেই আবার ফিরিয়া আসিবেন। অসুখের কথাটা আমার খেয়ালে আসে নাই, নহিলে আমিও নিজে অসুখের ভান করিয়া বিছানার পাড়িয়া থাকিতাম। তখন দুইজনকে লইয়া মার ননে একটা দ্বন্দ্ব চলিত।

“সে পাপিষ্ঠ খুব ফন্দী বাহিব করিয়াছে। সত্যি কি তাহার অসুখ? না, কখনই নয়—এ শুধু সে একটা ফাঁদ পাতিয়াছে। যদি অসুখ সত্যি হয় ত পূর্বেকার মত, আপনি যেমন এতিয়ালে দেখিতেন, তেমনই! তবু মা এ কথা বিশ্বাস করিল! আমার অসুখ হইলে কি মা এতটা করিত? আমার সন্দেহ হয়। আর্জান্ট’র সঙ্গে আমার যুদ্ধ চলিয়াছিল—আজ সে জয়ী হইয়াছে, আমার সব কৌশল সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। আজ আমার স্তম্ভিত পরাজয়—নিষ্ঠুর পরাজয়!

“আর সেই নারী—আমার মা। কি নিষ্ঠুর তার হৃদয়, কি পাষণে তার হৃদয়টা গড়া! আমার কথা একবারও যে ভাবিল না! আমার এ নীবব নির্জ্ঞান সাধনার মর্ম্ম তাহার মনে একবারও ঠাঁই পাইল না? আশ্চর্য্য! অথচ এই নারী, আমার মা—এই নারীর গর্ভে আমি জন্মিয়াছি!

“আমি এখানে আর একদণ্ডও থাকিতে পারিতেছি না। চারিধারে বাতাস অবধি তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্বাস লওয়া যায় না। আমি আপনার কাছে যাইতে চাই—আমায় সামান্য দিন, আশ্বাস দিন, নহিলে আমি পাগল হইয়া বাইব। আমাব এত সাধ, এত কল্পনা, এত আশা, সব ভাসিয়া চূর্ণ হইয়া গেল—খুলায় লুটাইল!

“এখন আমাব শুধু একটি অনুরোধ আছে, এ চিঠি আপনি পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবেন—সেসিলকে দেখাইবেন না। সে দেখিলে আমার আর লজ্জার সীমা থাকিবে না। এ কথা শুনিলে আমার ভালবাসাতেও সে সন্দেহ করিতে পাবে। হয়ত সে আর আমায় ভাল না বাসিতেও পাবে। যদি এমন দুর্দ্দিন আসে, আমার ভয় হয়, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে! সেসিল ছাড়া এখন আমার আর কেহ নাই। তার প্রেমে, স্নেহে আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। আজ এ শূণ্য ঘবে বসিয়া শুধু ভাবিতেছি, ‘সেসিল! আমার সেসিল! এই সেসিল যদি আমায় ত্যাগ করে?’ সে কথা ভাবিতেও পারি না! ভ্রগতে আসিয়া

কেবলই প্রতারণিত হইতেছি—সকলের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছি, একমাত্র শুধু সেসিলের উপরই বিশ্বাস আছে। সেই সেসিল,—সেও যদি আমায় ত্যাগ কবে? না। তাহা কখনও হইতে পারে না। সে নিজে আমায় আশ্বাস দিয়াছে—সে আশ্বাস কখনও সে ভাদিবে না! সেসিল দেবী—জগতের জীব নয়। সেসিল আমাকে কখনও ত্যাগ করিবে না, ইহা আমি জ্ঞানি। আমার এ বিশ্বাস চিরদিন অটুট থাকিবে, সন্দেহ নাই।”

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### পরিবর্তন

মা ফিরিয়া আসিবে, এ আশাটুকু জাক সহজে ত্যাগ করিতে পারিল না। কতদিন সকালে সন্ধ্যায় এবং নিশ্চর নিশীথে বইয়ের পাতায় মনটাকে অতিবিক্তভাবে ঢালিয়া দিয়াও সচরা সে চমকিয়া উঠিত, ঐ বুঝি মা আসিল! ঐ যে তাহার পায়েব সূঁচ ধ্বনি! পোষাকের সতর্ক খস্পসু শব্দটা না ঐ শুনা বাইতেছে। অদূর আগ্রহে সে প্রতীক্ষা করিত, কখন আসিয়া মা ডাকিবে, “জাক!” কিন্তু হায়, কোথায় মা?

রুদ্ধিকদের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় সে ভাবিত, আজ নিশ্চয় ঘরে ফিরিয়া দেখিবে, মা আসিয়াছে। রবিবার রাত্রে এতিয়োল হইতে ফিরিবার পথে মন তাহার হৃদয় খোঁড়ার মতই অস্থির হইয়া উঠিত, গাড়ী বড় ধীরে চলিতেছে। কতক্ষণে বাড়ী পৌঁছিয়া সে মার মুখেব কথা শুনিতে পাইবে! কিন্তু এ আশা নিতাই তাহার বার্থ হইত। মা আসিল না, আসিবার লক্ষণও কিছু দেখা গেল না।

মাকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, “তোমার এখানে থাকিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমি নূতন বাড়ী ভাড়া লইয়াছি। বাড়ীখানি একেবারে সহবেব প্রান্তে—পল্লটিও বেশ শান্ত, নীরব। ঘরগুলি তোমার মনের মত সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। তোমার যখন ইচ্ছা হইবে, তুমি ফিরিয়া আসিয়ো। কিন্তু সে চিঠি কোন উত্তর আসিল না। ইহা জাককে একখানিও চিঠি লিখে নাই। জাক ভাবিত, এ বিচ্ছেদ তবে চিরদিনের জগাই। কি দারুণ, নির্ধম, এ বিচ্ছেদ!

জাকের বেদনাব সীমা ছিল না। মাতার হস্ত যে বেদনা দান করে, বিধাতার নিষ্ঠুর অবিশ্রামের মতই তাহা আসিয়া বৃকে বাজে—নিতান্তই তাহা অনৈসর্গিক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেসিলের যেন দৈবশক্তি ছিল। এ দারুণ বেদনা-উপশমের মন্ত্র সে জানিত, তাহার হামির করণে সকল কষ্ট জাক নিমেষে ভুলিয়া যাইত। সেসিলের

নিষ্ঠ কথায় কি আশ্বাস, দৃষ্টি চটতে কি স্রুধা যে করিত হইত, ভাগ্যদেবীর হস্ত-নিষ্কিপ্ত অনল-বর্ষা শরগুলি তাহার কাছে নিতান্তই বার্থ হইয়া ফিরিত। ইহাব উপর জাকের ছিল, অজস্র অবিরাম কান্ন, —মাতার কঠিন গায়ে চৈকিয়া বিশ্বের সমস্ত কঠোর দুঃখ, গভীর বেদনাও ঠিকিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। এই কাজই হৃদয় জাককে দারুণ দুর্দিনে আপনাব বিরাট দেহাবরণে ঢাকিয়া তাহার দুঃখ ভুলানিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কতদিন মা কাছে ছিল, সম্পূর্ণ অনিচ্ছা ও সতর্কতা-সম্বন্ধে কত দিন সে জাকের পড়াশুনায় অকারণ ব্যাঘাতের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহার অপূর্ণ গোল, বিভিন্ন সখ জাকের গল্প-নিবন্ধ চিত্তকে কতবার আসিয়া নাড়া দিয়া গিয়াছে! বিদ্য নিবারণ করিতে গিয়াও কতদিন ইদা কত বিদ্য ঘটাইয়া ভুলিয়াছে! এখন সেই মা কাছে নাই—জাক তাই বইয়ের পাতায় আবার অতিবিক্ত মনঃ-সংযোগ করিয়া অতীত দিনের সমস্ত অবহেলা-কটিকারিয়া লইতে উজোগী হইল। প্রতি বিবাহবৎসন সে এতিয়োলে আসিত, ডাক্তার বিভাল তাহার পাঠের পবীক্ষা গ্রহণ করিতেন। পবীক্ষা লইয়া সহজেই তিনি বুঝিতেন, জাকের জ্ঞান বেশ পরিপক্বতা লাভ করিতেছে! আর একটি বৎসর মাত্র—তাহার পরই একটা পরীক্ষা দিয়া জাক উপাধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে, চিকিৎসার ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দিবে—তাহার সকল দুঃখের অংসান হইবে।

উপাধি-লাভের সন্ধান। জাকের প্রাণের ভিতর হইতে একটা অসহ উল্লাস সাড়া দিয়া উঠিল! উপাধি! লোহার তাড়ুড়ি পিটিয়া নীচ জবজ্বা কারিকরগুলার সাহ-চর্যেই তাহার জীবনের দিন কাটিয়া যাইতেছে, সেই জাক ডাক্তার হইবে! সম্ভ্রান্ত সমাজে আবার তাহার জগা আসন মিলিবে। ইহা কি সম্ভব, ভগবান!

বাসায় ফিরিয়া বেলিসেয়ারের নিকট জাক যখন ডাক্তার বিভালের আশাব কথা খুলিয়া বলিল, বলিল যে, আর এক বৎসর পবেই সে ডাক্তার হইবে, তখন সেই নিবীচ টুপিওয়ালার বুকখানা গর্কে হুলিয়া উঠিল। জাক ডাক্তার এবং বেলিসেয়ার তাহার বন্ধু!

গাড়ী চড়িয়া জাক পাড়ায় পাড়ায় রোগী দেখিয়া বেড়াইবে—অসংখ্য আতুর নর-নারী তাহাদের স্বাস্থ্য ও প্রাণের জগা জাকের করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে ফিরিয়া দাঁড়াইবে—কি সুন্দর স্বর্গীয় সে দৃশ্য! বেলিসেয়ার মুহুর্তেই জগা কল্পনা-নেত্রে ভবিষ্যতের সে সুমধুর চিত্রখানা একবার দেখিয়া লইল! জাকের প্রতি শ্রদ্ধাও তাহার সেদিন হইতে অনেকখানি বাড়িয়া গেল।

ডাক্তার বিভাল ছাত্রের জ্ঞানবুদ্ধি হইতেছে দেখিয়া

আনন্দিত হইলেও তাহাব শরীরেব অবস্থা দেখিয়া তিনি শিরিয়া উঠিলেন। কয় মাসের অতিরিক্ত পরিশ্রমে জাকের দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তাহাব সেই পুরাতন কাশিটুকু আবার দেখা দিয়াছে, চোখেব সে দীপ্তি কোথায় গিয়াছে। চোখ কোঠের ঢুকিয়াছে, কণ্ঠেব নীচে হাড় ছানা ঠেলিয়া উঠিয়াছে! মধ্যে মধ্যে যে একটু লাগণ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহাও আবার কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! সারা দেহ কেমন কাগজেব মত সাদা হইয়া গিয়াছে!

ডাক্তারের ললাটে একটা চিন্তার বেখা পড়িল। জাকের তপ্ত হাতখানা আপনাব হাতে ধরিয়া তিনি কহিলেন, “এ ভূমি ভাল কছ না, জাক। শরীরটাব দিকে মোটেই মন দিছ না। খাটুনি খুব পড়েছে, তার উপব তোমাব মনের অবস্থাও এখন ভাল নয়। পড়ার বোঁকটা কিছু কমাও না হয়, আর এক বছব বেশী সময় লাগবে, তাতে কি! শরীরটাকে আগে রাখা চাই ত! সেসিলও কিছু কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।”

না। সেসিল যে পলাইবে না, এ কথা সত্য! জাক তাহা ভাল করিয়াই জানে। বরং তাহাব প্রতি সেসিলের অমুরাগ-যত্ন ইদানীং বাড়িয়াছে। ইহাব পূর্বে সেসিল কখনও জাকের সম্মুখে স্নেহ, প্রেম, করুণা ও মহামুভূতিতে পরিপূর্ণ হৃদয়-পাত্রটি এমন করিয়া কানায় কানায় ভরিয়া ধরে নাই! সে পাত্রের স্নিগ্ধ মধুর বস জাক এখন প্রচুরভাবে পান করিতে পায়! তাহাব মত উপেক্ষিত দুর্ভাগাব জ্ঞাত পৃথিবীতে এত সুখ সঞ্চিত থাকিতে পারে, ইহা সে কখনও পূর্বে ধারণা করিতে পারে নাই! সেসিলের এই অবাচিত করুণার অজস্র ধারায় স্নান করিয়া সে এক অপূর্ণ বলে বকীযান হইয়া উঠিল। কোন পরিশ্রমই তাহাব কাছে আত্ম অতিরিক্ত বা অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না। অনর্গল খাটিয়াও এতটুকু ক্লান্তি কোনদিন সে অনুভব করে নাই। আবাম, নিদ্রা, এ সব কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। সারা দিন-রাত্রির মধ্যে সতেরো ঘণ্টা কাজ ও পড়াশুনা লইয়াই সে বাস্তব থাকিত—তাহাব জ্ঞাত এতটুকু আশ্চর্য্য নাই! ঈসেনডেকের তপ্ত কারখানায় সারাদিন যে লোহার মুণ্ডব তাহাকে পিটিতে হইত, তাহাও তাহাব কাছে লেখনীর মত হালকা বোধ হইত।

মানুষের দেহে এত শক্তি থাকিতে পারে—জাক তাহা বুঝিত না। বুদ্ধের মত সে যেন কঠোর সাধনায় রত ছিল। ইষ্টলাভের জ্ঞাত তেমনই অক্লান্ত তপ! দেহের কষ্ট? সে কথা ভাবিবার অবসরও তাহাব ছিল না। দীর্ঘ গৃহের জীর্ণ ষাট-জানালা—তাহাব মধ্য দিয়া অজস্র হিম আসিতেছে—সে হিমে আশ্রিত জ্বালাইয়া লইবারও অবসর নাই—শুধু পড়া, পড়া, পড়া! তাহাব পর দিনের

আলো দীপ্ত করণে কুটিয়া উঠিলে কোনমতে মুখে কিছু আহার গুঁজিয়া কারখানায় ছুটিতে হয়। সেখানে শুধুই কাজ, কাজ, কাজ—তাহাব পব ছুটি হইলে দ্রুত গৃহে ফিরিয়া আবার সেই বই লইয়া বস। এতটুকু বিলাস নাই, আবাম নাই, আমোদ নাই! ছইটা খোস-গল্প? না, তাহাবও সময় নাই! কবে এই এক বৎসর পূর্ণ হইবে—উপাধি মিলিবে—তপস্তার বিরাট ফল করায়ত্ত হইবে! তখন আরাম, তখন বিলাস, তখন গল্প—সবই হইবে। এখন নয়। বাহিরে কখন শীতের শেষে বসন্ত আসিল, আবার বসন্তকে ঠেলিয়া গ্রীষ্ম আসিয়া দেখা দিল, এ সকলের সন্ধান রাখিবারও জাকের মুহূর্ত্ত অবকাশ ছিল না। এ যেন সেই প্রাচীন কালের আর্থা স্বর্ষির একনিষ্ঠ সাধনা! অমিত-তেজা বিশ্বামিত্রের বিরাট উগ্র তপস্তা!

এমনইভাবে জাকের ষত্ন দিন কাটিতেছিল—রিভালের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও এ সনাতন নিয়মে এতটুকু সে ক্রটি ষটিতে দেখে নাই, তখন সহসা একদিন কারখানা হইতে বাসায় ফিরিয়া সে রিভালের এক পত্র পাইল। তাহাব বুকটা ধক্ক করিয়া উঠিল। দারুণ উদ্বেগে সে পত্র খুলিল। মাথাটাও দপ্ দপ্ করিতেছিল। পত্রে শুধু একটিমাত্র ছত্র। লেখা আছে,—

“কাল এখানে আসিয়ো না, জাক! এক সপ্তাহ আমরা এখানে থাকিব না।

রিভাল।”

সেদিন শনিবার। এতিয়ালে যাইবে বলিয়া জাকের সর্বোৎকৃষ্ট জামাটি ইন্দ্ৰি করিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সব-মাত্র তখন জাকের কক্ষে প্রসন্ন মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আসিয়া জাকের মুখের ভাব দেখিয়া তাহাব সে প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হইল। হাতের জামা হাতে রাখিয়া চমকিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

জাকেব বৃকের মধ্যে দারুণ ঝড় উঠিল—কেন এ পত্র? ডাক্তার কোথায় যাইতেছেন? সেসিল সব কথা খুলিয়া লিখিল না, কেন? সে কেমন আছে, তাই বা কে জানে? হঠাৎ এ সঙ্কল্প কেন? শুধু একটি মাত্র ছত্র! আর কিছু খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই? কেন? কেন? সহস্র আকুল প্রশ্ন তাহাব অন্তরের মধ্যে ছ-ছ করিয়া গর্জিয়া উঠিল।

জাক ভাবিল, কাল বোধ হয় সেসিলের পত্র আসিবে, তাহা হইতে সকল রহস্তই তখন জানা যাইবে। কিন্তু পরদিন কোন পত্র আসিল না। সেসিল বা ডাক্তার, কাহারও নহে। সারা সপ্তাহ ধরিয়া জাক চিঠির আশায় অধীরভাবে পথ চাহিয়া রহিল, তবু কোন চিঠি আসিল না। ভয়ে ও ভাবনায় তাহাব চেতনালোপের উপক্রম হইল। কেন চিঠি আসে না? কি হইয়াছে? কি?

কি? মনকে বাববার প্রাণ করিয়াও জাক এ সমস্তার  
এতটুকু সমাধান করিতে পারিল না। বেচারী, বেচারী  
জাক! সহসা তাহার জীবন-আকাশে আবার এ কি  
মেঘের উদয় হইল! এ মেঘের আড়ালে পড়িয়া  
বেচারীর এত সাধের, এত আশার সজোখিত আলোক-  
রশ্মিটুকু একেবারেই যে ঢাকিয়া যায়। একটা দাক্ষিণ  
গঙ্গার তাহার অন্তরের মধ্যে করুণ হাহাকাব গুমরিয়া  
উঠিল।

ডাক্তার বিভাল বা সেসিল সেদিন গৃহেই ছিলেন।  
সহসা সেদিন সেসিলের মুখ হঠাৎ বাজের মত যে নিষ্ঠুর  
কথাটা বাহির হইয়াছে, তাহার আকস্মিক আঘাতে জাক  
শাছে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, এই ভয়েই ডাক্তার  
তাহাকে কিঞ্চিৎ অবসর দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।  
সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে এমন আশাও একটু ছিল, ইতিমধ্যে  
সেসিলেব এ মত তখন আবার পরিবর্তিত হইতে পারে।  
এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত! ডাক্তার নিজেও ইহার  
জ্ঞাত এতটুকু প্রস্তুত ছিলেন না! ইহা কি সম্ভব হইতে  
পারে যে সেসিল জাককে পরিত্যাগ করিবে—তাহাকে  
বিবাহ করিবে না? বিশেষ তাহাকে এত দিন পরিয়া  
এতখানি আশা দিবার পরও?

সেসিলের মুখখানা সেদিন অত্যন্ত বিষন্ন দেখিয়া  
ডাক্তার কারণ-অমুসন্ধানে ব্যস্ত হইলে সেসিল কহিল,  
“জাক এ রবিবার এখানে আসবে?”

ডাক্তার কহিলেন, “তা ত আসবে—কিন্তু সে কথা  
হঠাৎ যে!”

সেসিল কহিল, “কারণ আছে। আমার ইচ্ছা নয়,  
সে আর আসে!”

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন। এ কি আবার নূতন  
কথা! নূতন খেয়াল! তাঁহার মুখে সহসা কোন কথা  
যোগাইল না। সেসিল আবার কথা কহিল—তাহার  
শ্বর কাঁপিতেছিল! সে কহিল, “এখানে যেন আর কখনও  
সে না আসে!”

ডাক্তার স্তম্ভিতভাবে কহিলেন, “কেন? কি  
হয়েছে, সেসিল?”

“না, আমার তা ইচ্ছা নয়!”

“তোমার ইচ্ছা নয়! কেন, হঠাৎ হল কি? ঝগড়া  
না অভিমান?”

“না দাদামশায়, ঝগড়া কি অভিমানেব মত ছোট  
কথা নয় এ!”

“কি তবে কারণ, শুনি?”

“গুরুতর কারণ আছে, খুব গুরুতর কারণ! আমি  
ভেবে দেখলুম, আমাদের এ বিয়ে হতেই পারে না—”

“কোন বিয়ে?”

“এই আমার সঙ্গে জাকের বিয়ে।”

“সে কি!”

“হা! এ বিয়ে হতেই পারে না, দাদামশায়। না,  
এ বিয়ে একেবারে অসম্ভব!”

“কেন?”

“আমার ভুল হয়েছিল। এ বিয়ে—আমি ঠিক বুঝতে  
পারিনি আগে। আমি জাককে ভালবাসি না।”

“ভালবাস না? সে কি কথা, সেসিল? বুঝেছি,  
হৃৎনে ঝগড়া হয়েছে,—নিশ্চয়! আমার খুলে বল  
দেখি, ভাই—বুড়ো হলেও তোদের এ ঝগড়াটুকু মিটিয়ে  
দেবার সামর্থ্য অবশি যে আমি হারিয়ে ফেলেছি, তা  
ভাবিসনে দিদি। লজ্জাটুকু, কি হয়েছে, বল! আমি  
সব মিট-মাট করে দিচ্ছি! দেখ!”

“না দাদামশায়, এ তা নয়। সত্যি বলছি, আমি  
তামাসা করছি না! ছেলে-মামুনি ঝগড়ার আঁটির কথা  
নয়, এ। জাককে আমি বোনের মত ভালবাসি—অন্ত-  
ভাবে নয়। এখন তা বুঝতে পেরেছি। অবশ্য অল্প  
বকম বাসবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু পাবলুম না।—জাক  
আমার ভাই, আমি তার বোন। তাকে অল্প বকম  
ভাবা আমার পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়, দাদামশায়।”

সহসা পথে সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকিয়া  
উঠে, ডাক্তার সেইরূপ চমকিয়া উঠিলেন। কণ্ঠা মান্-  
লীনের কথা তাঁহার মনে পড়িল—সেসিলের মার কথা!  
তিনি সেসিলকে কহিলেন, “এ সবার মানে কি? তবে  
তুমি আর কাকেও ভালবেসেছ বুঝি?”

লজ্জায় সেসিলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল! ঘাড় না  
তুলিয়া কম্পিত অথচ দৃঢ় স্বরে সে কহিল, “না, না, তা  
নয়। আর কাকেও আমি ভালবাসি না—বাসবও না,  
কখনও! আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়, এই শুধু  
আমার কথা!”

ডাক্তার সেসিলকে বহু প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু তাহার  
শুধু সেই এক উত্তর, “আমি বিয়ে করব না, দাদামশায়,  
বিয়ে করবই না।” স্বর তাহার যেমন দৃঢ়, তেমনই  
স্থির, অচঞ্চল!

তখন সেসিলের সম্মানের প্রতি ডাক্তার ইঙ্গিত  
কবিলেন। পাভার লোকে কি বলিবে? এই নিরীহ  
শান্ত যুবকের সহিত তাহার বিবাহের কথা যে পাকা  
হইয়া গিয়াছে। এ কথা পাভায় যে কাহারও  
অজানা নাই! এখন সেসিলের এ আকস্মিক নূতন  
সঙ্কল্পে নিন্দকের রসনায় লক্ষ কুংসা নিমেষে উচ্ছৃ-  
সিত হইয়া উঠিবে! বৃদ্ধ বয়সে তাঁহারও গ্লানির সীমা  
থাকিবে না! আর বেচারী জাক! এ সংবাদ ছুরির  
ফলার মত তাহার বুকে বাজিবে যে! আগুনের মত  
প্রাণটাকে তাহার পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিবে! তাহার  
শেষ সম্বল, শেষ আশাটুকু সেসিল এমন নিষ্ঠুরভাবে

চূর্ণ করিয়া দিবে! কেন? কেন? কি তাহাব দোষ?

সেসিলের অন্তরেও কে যেন তাঁহা ছুঁয়া আঁচড় টানিতেছিল। মনের ভাব সে আর সামলাইতে পারিল না। তাহার হৃদে চোখে অশ্রু ফুটিল। ডাক্তার তাহা লক্ষ্য করিয়া সেসিলের হাত আগনার হাতে মধ্য চাপিয়া ধরিলেন। কম্পিত স্বরে ডাকিলেন, “দিদি—”

“দাদামশায়—” সেসিল বৃক্ষে বৃকে মুখ ঢাকিল। সম্মুখে সেসিলের মুখ তুলিয়া বিভাল করিলেন, “সেসিল, দিদি, শোন—চট করে এমন একটা সঙ্কল্প কবে ফেলো না। আরও একটু দিন না হয় ভেবে দেখ—জাককেও না হয় আমি সে কথা বলি। তাব পব—”

“না দাদামশায়, তা অসম্ভব, একেবারেই অসম্ভব! আমি ভেবেছি, চের ভেবেছি। এক কথা জাককে এখনই জানান উচিত, একটুও দেরী করা নয়! আমি জানি, এক কথা শুনে বুক তার ভেঙ্গে যাবে—তাব—” সেসিলের স্বর বাধিয়া যাঠিতেছিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সেসিল আবার বলিল, “সে বড় কষ্ট পাবে—সহ্যই তাব শেষ আশা নিশ্চল হয়ে যাবে, দাদামশায়, হয় ত সে সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে যাবে, মরে যাবে—” সেসিল দাঁড়াইতে লাগিল।

ডাক্তার আগনার বৃকের মধ্যে আবার তাহার মুখখানি চাপিয়া ধরিলেন। তাহাও চোখে জল আসিয়াছিল। তিনি ডাকিলেন, “সেসিল—”

মুখ তুলিয়া সেসিল কহিল, “কিন্তু যতদিন এই আশা নিয়ে সে বসে থাকবে, ততই তার কষ্ট বাড়বে বই আর কিছু হবে না। আমারও ইচ্ছা নয়, মিথ্যে আশা নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। তাকে আমি মিথ্যে আশায় ভুলিয়ে রাখতে চাইনে, দাদামশায়, তাহলে তাব সঙ্গে বিশ্বাস-যাতকতা করা হবে—ভারী নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা।”

ডাক্তার রিভালের দাগ হইল! কষ্ট স্ববেই তিনি কহিলেন, “তবে কি এখনই তাকে সাক জবাব দিয়ে দেব—সাক জবাব—যে, জাক, তুমি অগত্যা যাও—সেসিল তোমার চায় না—কোনদিন সে চায়ও নি—তুমি ভুল বুঝেছিলে? চূপ করে বইলে কেন? বেশ—তাই হোক! কিন্তু উঃ, ভগবান, এরা কি! কি দিগে তুমি এদের গড়েছ—এই সব ছুরল স্বার্থপর স্ত্রীলোকের মন—”

সেসিল ডাক্তারের পানে চাহিল—কি করণ বিষয় মান, সে দৃষ্টি! তাহাব চোখের পাতা ভিজিয়া রহিয়াছে, রিভাল তাহা লক্ষ্য করিলেন। এমনই তাহাব সমস্ত বাগ নিমেষে অন্তর্হিত হইল। তিনি কহিলেন, “না দিদি, রাগ করিনে আমি! একবার শুধু অভিমান হয়েছিল, তোমার কোন দোষ নেই, দোষ আমারই! তুমি ছেলে-মাছ, কিছু জান না। কিন্তু আমার বোঝা উচিত

ছিল—! ওঃ, নির্দোষ, মূর্খ আমি—জীবনে কতবার এরকম ভুল করব!”

কিন্তু জাককে এ সংবাদ দিতেই হইবে! উপায় নাই! দুই-তিনবার কাগজ ছিঁড়িয়া লিখিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে চতুর্থবারে ডাক্তার সংক্ষেপে শুধু লিখিলেন, “জাক, যাহু আমার, সেসিল তার মত বদলাইয়াছে।” আর একটি কথাও কলমের মুখে বাহির হইল না। সেসিল তার মত বদলাইয়াছে? লিখিয়া তিনি ভাবিলেন, না, মুখেই তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলা ভাল! লিখিয়া কাজ নাই! কাগজখানা আবার তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পরে আর একটু সময় লইবার আশায় এবং জাককে এ নিদাকণ সংবাদ-গ্রহণের জগৎ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে এক মগ্নত জাককে এখানে আসা স্থগিত রাখাই তিনি সম্মত হিব করিলেন। এই সাত দিনে সেসিল যদি ভাবিয়া আবার নিজেই প্রকৃতিস্থ করিতে পারে! তাহি তিনি জাককে শুধু একটা রবিবার এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া পরে গিয়াছেন।

এই সাতটা দিন ডাক্তার ও সেসিল কেহই এ সম্বন্ধে একটা কথাও তুলিলেন না। আবার শনিবার আসিল। ডাক্তার তখন সেসিলকে ডাকিয়া কহিলেন, “সেসিল, কাল ত রবিবার। জাক এখানে আসবে। তোমার মত সম্বন্ধে তুমি আর একবার ভাল কবে ভেবে দেখেছ কি? মত বদলেছ?”

সেসিল দৃঢ় স্বরে কহিল, “না।”

“তোমার সঙ্কল্প তবে অটল, স্থির?”

“হাঁ।”

সেদিনও এ বিষয় লইয়া উভয়েব মধ্যে আর কোন কথা হইল না। পরদিন রবিবার। জাক তাহার চিরপ্রথমত প্রভাতেই বিভাল-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেদিন সে দাকণ উদ্বেগ বঞ্চে লইয়া সাবা পথ অতিক্রম করিয়াছে। রিভাল-গৃহেব ঘাবে পৌঁছিতেই তাহার বৃকের স্পন্দন কেমন অস্বাভাবিক বাড়িয়া উঠিল, নিশ্বাসরোধ হইবার উৎক্রম হইল, পা কাঁপিতে লাগিল।

স্বাভ-সম্মুখে দাসীস সহিত জাকের সাক্ষাৎ হইল। দাসী সংবাদ দিল, ডাক্তার জাকের জগৎ বাড়ি পশ্চাতে বাগানে অপেক্ষা করিতেছেন। বাগানে? সে কি! জাক থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাব সঙ্কল্পবীর কাঁপিয়া উঠিল। বাগানে কেন? বুঝি, কি বিপদ ঘটয়াছে! চাবিধারের সে প্রফুল্ল ভাবই বা কোথায় গেল? সে চিন্তিত হইল—কোনমতে আপনাব কম্পিত দেহটাকে টানিয়া ডাক্তারের সম্মুখে সে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া ডাক্তার রিভাল বিচলিত হইলেন। চল্লিশ বৎসর বোগীর শয্যার পাশে বসিয়াও যে হৃদয় এতটুকু কাঁপে নাই—সে হৃদয় আজ এই তরুণ শাস্ত্র যুবককে দেখিয়



কাঁপিয়া উঠিল। জাক কহিল, “দাদামশায়, সেসিল কি এখানে নেই?”

“না ভাই—তাকে সেখানেই রেখে এসেছি, যেখানে গেছলুম। কিছুদিন সেখানে থাকুক, সে। কোথাও ত যায় না, কখনও।”

“অনেক দিন কি সে সেখানে থাকবে?”

“হাঁ—আপাতত কিছুদিন এখন থাকবে, এমনই ত স্থির হয়েছে।”

“আমার কাছে আর আসবে না সে, দাদামশায়—কখনও আর আসবে না?”

ডাক্তার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার স্বর ফুটিল না। জাক শব্দটিকে আর খাড়া রাখিতে পারিল না। মাথা তাহার ঝিম ঝিম করিয়া উঠিল, দেখে এতটুকু বল নাই। নিকটে একটা বেঞ্চ ছিল। থপ্ করিয়া সে তাহাতে বসিয়া পড়িল।

শীতের কুয়াশার মধ্য দিয়া দিনের স্বচ্ছতা অপূর্ব রাগে তখন দেখা দিয়াছে! অদূরে সমুদ্রতট ঘনিত কলাইয়ের ক্ষেত হরিদ্রাবর্ণের অজস্র ছোট ফুলে আলো হইয়া বহিয়াছে। বড় গাছেব পাতার ফাঁকে কুয়াশার আড়ালে অগ্নিক্রের মত লাল গৃহ্য উঁকি দিতেছে। জাক সকলই দেখিল। এক বৎসর পূর্বেকার কথা তাহার মনে পড়িল! সে ও সেসিল যখন পাতাড়ের ধারে নদীর তীরে বেড়াইতে গিয়াছিল, প্রকৃতি তখন কি অপূর্ব শোভায় ঝলমল করিতেছিল। সেই অজস্র শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাহার চিত্ত সেসিলের প্রতি কি অসহভাবে আকৃষ্ট হইল! তার পব সেসিলের স্মৃধ্বর আশ্বাসে সে আকর্ষণ আজ একান্ত নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। দিনে দিনে সে আকর্ষণের বেগ কি গভীর বাড়িয়া উঠিতেছিল—কিন্তু সহসা এ কি—! কোন বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে সে আকর্ষণ সহসা চকিতে আজ এমন স্তম্ভিত রুদ্ধ হইয়া গেল!

ডাক্তার জাকের স্বক্ষে হাত রাখিয়া কোমল স্বরে কহিলেন, “জাক, হতাশ হয়ো না। এখনও তার মত বদলাতে পারে। ছেলেমানুষ—কি রকম এ একটা খেয়াল শুধু, না হয় তামাসা!”

“না দাদামশায়, আপনি তাহলে সেসিলকে জানেন না! খেয়াল বা তামাসা কাকে বলে, সেসিল তা জানেও না! শুধু খেয়ালের ঝোঁকে একটা বুক সে ভেঙ্গে চুবুয়া করে দেবে—? না, না, তা হতেই পারে না। এ সঙ্কল্প জানাবার আগে এ বিষয়ে রীতিমত সে ভেবেছে, জানবেন। সে জানত, জানেও, যে, তার ভালবাসা, —আমার কাছে কি তার মূল্য! আমার জীবনের উপর কি তার শক্তি! সেই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হলে, আমার জীবনটা একেবারেই উবে যাবে! তবু যদি তাই সে ঠিক করে থাকে, তাহলে সে তা কর্তব্য ভেবেই

করেছে। আমারও আগে এটা বোঝা উচিত ছিল। এত সুখ আমার অদৃষ্টে ঘটবে—এ কি সম্ভব, দাদামশায়? আপনি জানেন না, আমার নিজেই সব সময় এটা ঠিক বিশ্বাস হত না! এত সুখ আমার বরাতে সইবে কেন? চিরকাল যার দুঃখে কষ্টে, দারুণ দুর্দশায় কেটে এসেছে, এমন স্বর্গ-সুখ তার কপালে? পথের ভিগারী রাজ-সিংহাসনে বসবে! তা কি হতে পারে, দাদামশায়?”

জাকের চোখ কাটিয়া জল বাহ্য হইবার উপক্রম করিল। সবলে তাহা সে যোধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার রিভাল তাহার দুই হাত আপনার হাতে চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, “জাক, আমায় ক্ষমা কর, তুমি। এ আঘাতের জ্ঞান আমিই দায়ী! আমি ভেবেছিলাম, হৃদয়েই তোমরা এতে স্তব্ধ হও। কিন্তু ভুল, ভুল ভেবেছিলাম, আমি। মাহুয় গড়ে, বিধাতা ভাঙ্গেন, এ কথাটা তখন আমি ভাবিনি।”

“না দাদামশায়, আপনি তাব জ্ঞান দুঃখ করবেন না। অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে। সোসল—সে স্বর্গের দেবী—আমার ভালবাসা অণু উঁচুতে তাব কাছে পৌঁছুবে কেন? আমার উপর তার অসাদৃশ্য করুণা ছিল, তাই আমি ভুল কবেছিলাম ভুল বুকে ছলুম। এখন আমি তার কাছ থেকে দূরে আছি—সোসলও ভাল করে সমস্তটা বুঝে দেখাব অবকাশ পেয়েছিল—বুঝে সে দেখেছে, এ বিষয়ে হতে পারে না। তার জ্ঞান আপনি দুঃখ করবেন না, দাদামশায়। তবে হাঁ, একটা কথা—সেসিলকে বলবেন, এ আঘাত আমার বুকে বহুই বাজুক, তার উপর আমার এতটুকু রাগ বা বেথ নেই। চিরদিন আমি তার মঙ্গলই প্রার্থনা করব! সে আমার কাছে যেমন দেবী ছিল, আজীবন তেমনই দেবী সে থাকবে!”

পরে মাথার উপর আকাশ, পাশে ক্ষেত, বন প্রভৃতির দিকে চাহিয়া জাক আবার কহিল, “আর বছর ঠিক এমনই সময়ে সেসিলকে আমি প্রথম এক নতুন চোখে দেখতে স্কর করেছিলাম—আমার মনে হয়েছিল, সোসলও বুঝি আমায় তেমনই ভালবাসে। তার পব থেকে আমার এই বাকী দিনগুলো যে কি সুখে কেটেছে, তা আমিই জানি! তেমন সুখ পৃথিবীতে মিলতে পারে বলে আমার ধারণা ছিল না! সেদিন আমি যেন নতুন করে জন্ম নিলুম,—আর আজ? আজ আমাব মৃত্যু হল! এই এক বৎসর যে অতুল সুখ আমি ভোগ করেছি, তা শুধু আপনার আর সেসিলের দয়ায়! জীবনে আমি তা কখনও ভুলব না!”

তাহাব পব দীর্ঘ ধীরে জাক রিভালের কম্পিত হস্তে বন্ধন খুলিয়া লইলে ডাক্তার কহিলেন, “তুমি চলে যাচ্ছ, জাক? এখানে আমাব সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করবে না?”

“পারব না, দাদামশায়! আমার ক্ষমা করবেন,— আমার মনের অবস্থা ভারী খারাপ। আহাৰে রুচিও নেই! আমার ক্ষমা করুন।”

জাক চলিয়া গেল। কোন দিকে একবারও সে ফিরিয়া চাহিল না, নত দৃষ্টিতে চলিয়া গেল। কিন্তু গাছের ফাঁক দিয়া ঘরের জানালার পানে একবার যদি সে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, সেই খোলা জানালার পাশেই সেসিল দাঁড়াইয়াছিল। কি বিবর্ণ পাণ্ডু তাহার মুখ! চোখ অশ্রু-পরিপ্লুত! কম্পিত শীর্ণ দেহ! সেসিল জাককে দেখিল—দেখিল, সে ধীর পদে নত দৃষ্টিতে চলিয়া বাইতেছে। যেন একটা প্রাণহীন দেহকে কোন অনৈসর্গিক শক্তি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে!

পরেব কয়টা দিন বিভাল-গৃহ যেন এক নিরবচ্ছিন্ন শোকের রাগিণীতে ভরিয়া রহিল। এমনই নিবানন্দভাবে দিন কাটিতে লাগিল। গত কয়মাস ধরিয়া যে আনন্দ-ধারা সারা গৃহে বসন্ত বায়ুর মতই ছুটিয়া গিয়াছে, সহসা আশ্চর্য্যে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে দাবার শেষ স্রোতটির সহিত গৃহের প্রাণটুকুও যেন বিদায় লইয়া গিয়াছে!

বিভাল বিষয় চিন্তে সেসিলের ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করিতেন। এখন আব তাহার কাছে সে বড় একটা আসে না, নিৰ্জনে থাকে, কখনও বা বাগানের প্রান্তে নিজের মনে ঘুবিয়া বেড়ায়। তাহার মার ঘব, এত দিন যে ঘর একরূপ বন্ধই ছিল, তাহা সে আবার খুলিয়াছে। সেই ঘরে অতীত দুঃখের যে সহস্র স্মৃতি নীরবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সেসিল আবার তাহাদের সাদা দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। যে জানালা খুলিয়া বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া মাদুলীন বসিয়া থাকিত—এবং তাহার অশ্রু-বিন্দু নয়নের সম্মুখে চারিধার অস্পষ্ট হইয়া ক্রমে মিলাইয়া যাইত, ঠিক সেই জানালাটির পাশেই সেসিল তেমনই ভাবে বসিয়া থাকে। রোগী দেখিয়া বিভাল গৃহে ফিরিলে দৈবাৎ যদি কোন দিন সাদা পাইয়া সেসিল ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে ত দাদামশায়ের সহিত অত্যন্ত মৃদু কম্পিত স্ববে দুই চাবিটা মাত্র কথা কহিয়াই সে ভোজের টেবিলে গিয়া বসে। যেদিন সাদা না পায়, সেদিন তাহা হুঁসও থাকে না।

সেসিলকে খুঁজিয়া না পাইয়া ডাক্তার নীরব চরণে মাদুলীনের ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিতেন, “সেসিল—”

সেসিল ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িত, নতমুখে দাদামশায়ের সম্মুখে আসিত। তাড়াহাড়িতে চোখের জল মুছিবায়ও তাহাব অবকাশ মিলিত না। তাহার সিন্ধু পশ্চিমে ডাক্তারের কাছে স্পষ্ট ধরাইয়া দিত। বৃদ্ধ বিভাল বলিবার মত একটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেন না। কি বলিবেন তিনি? কিসের সাঙ্খ্য দিবেন? কি জানি,

নাড়া পাইলে সেসিলের সারা চিন্তা যদি সহসা আবার দারুণ শোকে ঝরিয়া পড়ে!

ডাক্তার অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ব্যাপার কি? এ যে মাদুলীনের অবস্থার সহিত জ্বল্ জ্বল্ সব মিলিয়া বাইতেছে। তেমনই বিশৃঙ্খলা! অশ্রুর নিৰ্ঝর তেমনই উৎপলিয়া উঠিয়াছে! তবে কি সেসিলও বৃদ্ধকে ফাঁকি দিয়া পলাইবে? কেন? তাহাব এ দুঃখ, কিসের জন্ত? জাককে যদি সে আর ভাল নাই বাসিবে, তবে কিসের এ বেদনা? নিৰ্জনে থাকিবার জন্ত অহরহ কেন এ প্রয়াস? আর যদি ভালই বাসে, তবে কেন তাহাকে এভাবে সে বিদায় দিল? ডাক্তার ভাবিলেন, নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা গূঢ় রহস্য আছে! কিন্তু কি সে রহস্য—? কি সে? তাহা কি এমনই গোপনীয় যে দাদামশায়ের নিকটও অসঙ্কোচে খুলিয়া বলা চলে না? কিন্তু সেসিলকে এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করিতেও তাহার সাহস হইত না।

সেসিলের দুঃখে জাকের কথা বিভাল একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বেগীর বাড়ী নাড়ী দেখিতে গিয়াও মাঝে মাঝে তাহার কেমন গোল বাধিত, দুই-একটা ভুল হইয়া যাইত! তাহার সেই হস্তময় প্রসন্ন ললাটে ঘন কালো রেখা পড়িয়াছিল। তবু এ রহস্য মীমাংসাব কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছিল না।

সহসা এক গভীর বাত্রে ডাক্তারের ঘণ্টায় সঘন রব উঠিল। কোন রোগীর গৃহে ডাক পড়িয়াছে! ডাক্তার উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বৃদ্ধা সেল-গৃহিণী ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, ডাক্তারকে দেখিয়া সে কাঁদিয়া পড়িল, তাহার বৃদ্ধ স্বামীকে বুকি আর বাঁচানো যায় না। মৃত্যুর সহিত কয়দিন ধরিয়া কঠিন সংগ্রাম চলিয়াছে—কিন্তু এবার বুকি মৃত্যুরই জয় হয়! বৃদ্ধার অদৃষ্ট নন্দ, তাই সে গরিবের মা-বাপ দয়াল বিভালের কাছে না আসিয়া অপরের উপর নির্ভর করিয়াছিল। এখন একবার তাহাকে বাইতেই হইবে, নহিলে বৃদ্ধা এখানে বিভালের পায় পড়িয়া প্রাণ দিবে।

বৃদ্ধের প্রাণ গলিয়া গেল। তখনই তিনি সেল-গৃহিণীর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। দারুণ শীতের রাত্রি—ঠাণ্ডা বাতাসের অত্যাচারের অভাব ছিল না—হাড অবধি ঝন্ঝন্ করিয়া উঠে, তবু আশ্রয়ের আহ্বানে বৃদ্ধ অবিচলিত চিন্তে ছুটিয়া চলিলেন।

আরাম-কুঞ্জের পার্শ্বেই সেলের কুটীর। সেখানে পৌছিয়া ডাক্তার দেখিলেন, শীতল ভূমির উপর ছিন্ন মলিন শয্যায় একখানা শীর্ণ কঙ্কাল পড়িয়া রহিয়াছে। ঘরে মুছ আলো জলিতেছিল—ঘরটাকে দারুণ শীতের হাত হইতে উদ্ধার করিবার ক্ষীণ চেষ্টায় এককোণে কয়েকখানা কাঠে আগুন জালায়া দেওয়া হইয়াছে।

তথাপি সে ক্ষুদ্র গৃহে মৃত্যুর হিম বায়ু ছ-ছ করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। সহসা একটা উৎকট দুর্গন্ধ ডাক্তারের নাসাবন্ধুটাকে যেন জ্বালাইয়া দিল! তিনি কহিলেন, “কিসের গন্ধ এ, মাদাম সেল?”

একটা ঢোক গিলিয়া সেল-গৃহিণী কহিল, “ঐ ডাক্তার দিয়েছিল—কতকগুলো পাতা খরে জ্বালাবার জগ—”

“ডাক্তার—? কোন ডাক্তার?”

“ঐ যে, ও বাড়ীতে ছিল—হার্জু না কি নাম!”

রিভাল তাহাই অমুমান করিয়াছিল। হার্জুকে সম্প্রতি পথে একদিন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, বটে! সে-ই তবে এই নিরীহ বৃদ্ধ কৃষককে মৃত্যুর পথে এমন করিয়া ঠেলিয়া আনিয়াছে! পাবির আদালতে দুইবার জরিমানা দিয়াও তাহার এ দুশ্রুত্ব দূর হইল না। করবেইয়ের কয়েকজন মূর্খ কৃষককে মৃত্যুর প্রাসে ফেলিয়া একবার সে জেলও ঘুরিয়া আসিয়াছে, তবুও নিবৃত্তি নাই! চৈতন্ত ফিরিল না!

বৃদ্ধ সেলের নিকট গিয়া ডাক্তার ডাকিলেন, “সেল!”

“এই যে—এই যে, আপনি এসেছেন। আমি আর বাঁচব না। বেশী দেরীও নেই—বেশ বুঝছি, আমি। বুকের ভিতর জলে-জলে উঠছে। জ্বিত খসে যাচ্ছে—”

রিভাল সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, “ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ভয় কি? কি কষ্ট হচ্ছে, বল, আমি ব্যবস্থা কচ্ছি!”

“আর ব্যবস্থা? কিছু না—কিছু না! ঠিক শাস্তি হয়েছে আমার। যেমন লোভ, তেমনি শাস্তি!”

“কি হয়েছে, তোমার? এ-রকম বকছ কেন?”

“কেন? কেন বকছি? শুনুন, শুনুন, তবে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। এমন দেবতার আমি সন্ধান করিছি। কেন? কেন? শুবু ছুটো টাকার লোভে!” পরে পত্নীর দিকে চাহিয়া সেল কহিল, “বল, সব কথা খুলে বল, নিজের মুখে সব পাপ স্বীকার কর—না হলে মরেও আমি নিশ্চিত হব না। বল, বল, খুলে বল। কিছু লুকোস নে!”

তখন সেল-গৃহিণী চক্ষু মুদিয়া ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বাহা বলিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই—বৃদ্ধ সেল বহুদিন হইতে যোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়ায় সংসার অচল দাঁড়াইয়াছিল। এমন সময় দৈবাৎ একদিন ডাক্তার হার্জু, এক প্রস্তাব লইয়া তাহাদের সম্মুখে আসিল। একটা সংবাদ যদি তাহার ডাক্তার রিভালের নাতিনী সেসিলের কর্ণগোচর করিতে পারে, তাহা হইলে বৃদ্ধ সেলকে ত সে আরোগ্য করিয়া দিবেই, তাহার উপর কুড়ি ফ্রাঙ্ক বংশিশও মিলিবে! এ প্রস্তাবে প্রথমে তাহারা রাজী হয় নাই। কিন্তু উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, —যোগে, অনাহারে মতিবও স্থিরতা ছিল না—তাহার উপর এই অসহায় অবস্থা! দারিদ্র্যে পড়িলে লোকের

বুদ্ধি একেবারেই লোপ পায়! কাজেই সে প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া তখন আর উপায়ান্তর ছিল না। তাই তাহারা সেসিল ঠাকুরাণীকে সে নিষ্ঠুর সংবাদ দিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সেই অবধি মনে তাহাদের শাস্তি নাই—যোগে রীতিমত বাড়িয়া উঠিয়াছে! বৃদ্ধ সন্ধ্যায় বিভালের উপর অত্যাচার ভগবান সাহেবন কেন? সে পাপের চূড়ান্ত শাস্তি ভোগ হইতেছে—তবু ডাক্তারকে ডাকিয়া এ পাপের কথা না শুনাইলে মরণেও জ্বালা জুড়াইবে না, তাই তাঁতাকে এ রাত্রে তাহারা কষ্ট দিয়াছে—সেলের চিকিৎসার জন্ত নহে।

ডাক্তার স্তম্ভিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিন্তু কি? কি সে খবর?”

সেল-গৃহিণী কাদিতে কাদিতে বলিল, “সেই সন্দেশে কথা, সেসিল ঠাকুরাণীর মা-বাপের কথা!”

“পাশও সব—” দপ্ করিয়া রিভালের অন্তর দাক্ষণ বোবে জ্বলিয়া উঠিল। বৃদ্ধার শূণ্য হাত দুইটা ধরিয়া প্রবলভাবে তাহাকে নাড়া দিয়া রিভাল কহিলেন, “এ কথা বলেছ তুমি? তাকে বলেছ? বল।” সে স্বরে যেন বিদ্রোহ ঠিকরিয়া পড়িতেছিল।

“টাকার লোভে এ পাপ করেছি শুধু,—তুচ্ছ টাকার লোভে ইহকাল পরকাল সব হারিয়ে বসেছি। এ সব কথা আমরা কিছু জানতুমও না বাবা, সেই ভতভাগা ডাক্তারই সব বলেছিল।”

“বুঝছি সব।” ডাক্তার সেল-গৃহিণীর হাত ছাড়িয়া দিলেন; পরে অশ্রুট স্বরে কহিলেন, “এমন করে সে শোধ নিলে! কিন্তু এ-সব কথা কার কাছ থেকে শুনলে সে। জানলে কোথা থেকে?” রিভাল চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সারা রাত্রি ধরিয়া বৃদ্ধ সেলের জন্ত নানা ব্যবস্থা করিয়াও রিভাল সেলকে বাঁচাইতে পারিলেন না। উষার প্রাক্কালে বৃদ্ধ সেল অমৃতপু হৃদয়ের সমস্ত বেদনা হইতে যখন মুক্তিলাভ করিল এবং বৃদ্ধা সেল শবের পার্শ্বে কাদিয়া লুটাইয়া পড়িল, ডাক্তার রিভাল তখন ধীরে ধীরে কুটার হইতে বিদায় লইলেন।

একটি রাত্রি তাহার দেহে ও মনে অদ্ভুত পরিবর্তন আনিয়া দিল। তাহার শুধু মনে হইতেছিল, এমন চক্রান্ত, এমন নিষ্ঠুর হীন ষড়যন্ত্রও মানুষের মাথায় উদ্ভব হইতে পারে!

ডাক্তার গৃহে ফিরিলেন; পথে আরাম-কুঞ্জের দিকে একবার চাহিয়া দেখিতে ভুলিলেন না। তখনও তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিতেছিল! ডাক্তার হার্জুর সৌভাগ্য যে সে পূর্বেই সরিয়া পড়িয়াছিল—নহিলে আজ বৃদ্ধের হস্তে পরিত্রাণ-লাভে তাহার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহে ফিরিয়া প্রথমেই তিনি সেসিলের ঘরে প্রবেশ

করিলেন। সেখানে কেহ নাই! রাত্রে কেহ শয্যা শয়ন করিয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না। তিনি ডাকিলেন “সেসিল”—কেহ সাড়া দিল না। তাঁহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি ডাক্তারখানায় গেলেন। কৈ, সেখানেও ত সেসিল নাই। তবে কোথায় সে? কোথায়? ডাক্তার মাদলীনের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অতীত শোকের স্মৃতি যেখানে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া বহিয়াছে, সেই বিবট সমাধি-মধ্যে,—ঐ যে সেসিল। কোঁচের উপর মাথা রাখিয়া সেসিল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চোখে কোণে জলেব দাগ শুকাইয়া গিয়াছে। তাহারই কালো ছাপ মুখে-চোখে তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে সেসিলের মাথায় হাত রাখিলেন। সেসিল চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, “দাদামশায়—”

“বুঝেছি সেসিল—এই সব লক্ষ্মীছাড়া ততভাগ্য দল, এরাই তোমার সব কথা বলে গেছে, যে কথা এত বড় কবে এতদিন ধবে তোমার কাছ থেকে আমরা গোপন করে রেখেছিলুম। ভগবান—এত চেষ্টা, সব মিছে হল। এ বাজ সে সলেব বুকে পড়লই! সে বাজ আবার এই সব নাবকার হাত থেকে!”

বৃদ্ধ মাতামহের বুকে সেসিল মুখ লুকাইল; বলিল, “না দাদামশায়, বলো না, আমায় কিছু বলো না। আমাব নিজের মনে কি লজ্জা, কি দারুণ দিক্কার জমে রয়েছে!”

“তবু আমায় বলতেই হবে, সেসিল। আমি যদি একটু আগেও বুঝতে পারতুম—কেন, তুমি জাককে বিদায় দিলে! এই জগত শুধু—না?”

“হাঁ।”

“কেন, শুনি। আমায় বল, দিদি!”

“মাব এ কলঙ্কের কথা আমার মুখ থেকে বেরবে না, কখনও না! তবু, যে আমায় বিয়ে করবে, আমি যাব স্ত্রী হবে, এ ঘটনা কিছুই সে জানবে না? তাকে এত বড় কথা প্রকাশ করে না বলা আমার অজ্ঞায়—শুধু অজ্ঞায় নয়, পাশও! অদৃষ্ট নিজের মার এই কলঙ্কের কথা—! তা-ও বলা যায় না। কাজেই আমাব এক পথ ছিল—আমি সেই পথ নিয়েছি।”

“তবে এখনও তুমি তাকে ভালবাস? বল, বল সেসিল।”

“বাসি, বাসি, দাদামশায়—সারা প্রাণ দিয়ে, মন দিয়ে ভালবাসি। জাকও আমায় তেমনই ভালবাসে—এ বিয়ে যদি না হয়, তবুও সে আমায় ভুলবে না, কখনও না, দাদামশায়। আমিও তাকে ভুলতে পারব না! কখনও না! তবু এ ত্যাগ আমায় স্বীকার করতেই হবে। নাম-তীনা এক কলঙ্কিনীর মেয়েকে সাধ কবে কে কবে ঘরের পুঁহী করে, দাদামশায়?”

“তুমি ভুল করেছ, সেসিল, মস্ত ভুল করেছ। তোমায়

বিয়ে করতে জাকের কতখানি সাধ! এ বিয়েতে শুধু যে সে সুখী হত, তা নয়, গর্বও বোধ করত—তবু সে এ-সব কথা জানত। আমি নিজেই তাকে সব কথা খুলে বলেছিলুম।”

“দাদামশায়—”

“সেসিল, আমায় যদি তুমি সব কথা তখন খুলে বলতে, তা হলে আজ তিনজনকে এ কষ্ট ভোগ করতে হত না!”

“জাক জানে দাদামশায় যে, আমি কে,—আমার পরিচয়?”

“জানে, সব জানে। আমিই তাকে বলেছিলুম—সে আজ এক বছরের কথা। যেদিন প্রথম সে এসে আমার বলে, তোমায় সে ভালবাসে, সেইদিনই তার কাছে তোমার পরিচয় আমি খুলে বলি।”

“তবুও সে আনায় বিয়ে করতে রাজী হল?”

“সে যে তোমায় বড় ভালবাসে, সেসিল। তা-ছাড়া তারও অদৃষ্ট তোমারই মত। তারও বাপ নেই, পরিচয় নেই। ইদা কুলত্যাগিনী—ইদার কুলত্যাগের পর জাকের জন্ম হয়। তবে তফাৎ এই, তোমাব মা ছিলেন দেবী, আর তার মা—”

ডাক্তার বিভাল তখন সেসিলের নিকট জাকেব ইতিহাস খুলিয়া বাললেন। এই শাস্ত্র নিরীহ বালকের জীবনের উপর দিয়া কি মহাবড় বহিয়া গিয়াছে, কি গভীর ছুঁখ-কষ্টে আপনাকে সে গড়িয়া তুলিয়াছে! শৈশবে দারুণ উপেক্ষা, যৌবনে নির্ভর নির্বাসনের মধ্য দিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—সে সমস্ত কথা বিভাল সেসিলের নিকট খুলিয়া বলিলেন। বলিতে বলিতে অতীত-বর্তমানে মিলিয়া কাহিনীট করুণ বেদনার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সব কথা ডাক্তারের নূতন কবিতা যেন মনে পড়িয়া গেল। তিনি বাললেন, “এখন বুঝেছি, সেসিল, এ কথা কোথা থেকে প্রকাশ হল। এ তার কাজ, জাকের মার—তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। সেই—সেই প্রগল্ভা নাগীর রসনাই তোমাদের মধ্যে এ বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে। যে কথা কখনও তোমায় খুলে বলব না স্থির করেছিলুম, সে কথা তারই মুখ থেকে বেরিয়েছে! অহা বেচারী, বেচারী জাক! তার মা তাকে জীবনে কোন দিনই সুখী হতে দিলে না,— চিরদিন তার স্মৃতি ব্যাঘাত দিয়ে আসছে।”

সেসিলের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। দারুণ নৈরাশ্রে সমস্ত ভাবব্যংগ সঘন অন্ধকারে সে আচ্ছন্ন দেখিল। কি করিলে এখন এ আঁধার কাটে? সব যেমন ছিল, আবার তেমন হয় জাক! বেচারী জাক আমাব! একবার তুমি ফিরিয়া এস। সেসিল তোমার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে! তুমি ছাড়া সেসিলের আর কে

আছে, জাক! কেত নাই—আব কাহাকেও সে চাহে না! কোন দিনই চাহে নাই! তুমি এস, এস জাক—সেসিল তোমার দাসী, তাহাকে তোমার চরণ-প্রান্তে আশ্রয় দাও। সেসিল কাঁদিয়া ফেলিল।

রিভাল কহিলেন, “জাক বেচারী তোমার কথাই বড় কষ্ট পেয়ে গেছে—”

“সে আর কোন চিঠি লেখে নি, দাদামশায়?”

“না। কিন্তু তোমার সঙ্গেও কি সে মোটে দেখা কবে নি, সেসিল?”

“না। আব কখনও সে এখানে আসবে না, দাদামশায়।”

“তবে চল, সেসিল, আমরাই তার কাছে যাই। সে বেশ হবে। আজ রবিবার, তার ছুটি আছে—বাসাতেই তাকে পাব’খন—নিশ্চয়। হুজনে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে এখানে নিয়ে আসি, চল। যাবে দিদি?”

“যাব—এখনই চল, দাদামশায়।”

তখন সেসিলকে লইয়া রিভাল অবিলম্বে পারি যাত্রা করিলেন।

ইতার ঠিক আশ ঘণ্টা পরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে একটি লোক আসিয়া রিভাল-গৃহের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতেছে, সারা দেহ ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে—পৃষ্ঠে টুপির প্রকাণ্ড বোঝা। টুপির বোঝা নামাইয়া ধারের সম্মুখে আসিয়া চক্ষু কৃক্লিত করিয়া পিতলের পাতে ক্ষোদা লেখাটুকু অর্থাৎ কষ্টে বানান করিয়া সে পড়িল, “—ডা—ক্কা—রে—র—ঘ—টা।”

“এই যে—” বলিয়া সে দাঁড়াইয়া লগাটের ঘণ্টা মুঁছিল। পরে ঘণ্টায় ঘা দিল। একজন দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিল, “কি চাই?”

“ডাক্তারকে—”

“তিনি বাড়ী নেই।”

“তার একটি নাতনীও এখানে থাকেন, না?”

“তিনিও নেই।”

“কখন ফিরবেন?”

“জানি না।”

ভিতর হইতে দ্বার আবার সশব্দে বন্ধ হইল। লোকটি ফটকের সম্মুখে কিছুক্ষণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; ভাবিল এখন তবে উপায় কি? তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল। চোখের জল মুছিয়া কপালে হুই হাত চাপড়াইয়া অশ্রুট ধরে সে কহিল, “হা ভগবান! এমন করে বিনে চিকিৎসাতেই কি বেচারী তাহলে মারা যাবে!”

একটা কাতর দীর্ঘনিশ্বাস তাহার মধ্য ভেদ করিয়া উখিত হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল।

## নবম পরিচ্ছেদ

হাসপাতালে

সেনিন সন্ধ্যা হইতেই “ভবিষ্য জাতির আলোচনার” সম্পাদক-গৃহে সাহিত্যের আসর জমিয়া উঠিয়াছিল। উপেক্ষিত অনাদৃত সাহিত্য-রত্নভাণ্ডার সকলেই তথায় উপস্থিত ছিল। শুক মুখ, দীর্ঘাক্ষরিত দৃষ্টি—প্রান্তভার হতভাগা পুস্তকের দল ছিন্ন মসিন বেশে সাধ্যমত পারিপাট্য সাধন করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই আর্জাস্ত-গৃহে সমবেত হইয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলেই মনে হয়, আর্জাস্ত নিমন্ত্রণ-পত্র কাঁটার মত এই সমস্ত জ্ঞানালকে কাঁটাইয়া এক জায়গায় জড় করিয়া দিয়াছে।

ইদা আজ ফিরিয়া আসিয়াছে। কবি-প্রিয় কবির বাহু-বক্ষনে আবার আসিয়া ধরা দিয়াছে, সেই জন্তই আজ এ “পুনর্নির্লনোৎসবের” আয়োজন। উৎসবে আর্জাস্ত-রচিত বিরাট বিবহ-কাব্য “প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ” পঠিত হইবে।

ইদা ফিরিয়া আসিয়াছে, এখন এ বিবহ-গানের সার্থকতা কি! তাহারই সম্মুখে তাহার অদর্শন-জ্ঞানিত বেননার ভার এমনভাবে ছড়াইয়া দিলে, কাহার মধ্যই বা তাহাতে উদ্বেলিত হইবে? সার্থকতা নাই থাকুক মধ্য উদ্বেলিত নাই হোক,—ঘটনা-চক্রের সাক্ষাতক আবর্তনে এমন একটা বিরাট কাব্য তাই বলিয়া ত মাটি হইয়া যাইতে পারে না! বিষয়টা লইয়া বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আর্জাস্ত’র বিস্তর জল্পনা-কল্পনা চলিয়াছিল। কেহ বলিল, “ব্যাপারটা হাস্যকর হবে। প্রিয়র পাশে বসে প্রিয়র অদর্শনে হা-ছত্যাশ—এমন নাজ কৈ আর কেউ করে নিত।”

আর্জাস্ত কহিল, “নাই করুক। প্রান্তভা কখনও গতানুগতিক পথে চলতে পারে না।” তাহার মুখের কথা লুফিয়া একজন ভক্ত—সে বেচারী তিন দিন অনশনে কাটাইয়া আর্জাস্ত’র প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় আসিয়াছিল—সে গার্জিয়া উঠিল, “বয়ে গেল! স্বাী ফিরে এসেছে, তাতে কি। তার জ্ঞান আটকে ত মেয়ে ফেলা যায় না!” আর্জাস্ত কহিল, “ঠিক ত—এই ত সমজদারের কথা। বিবহ চুলোয় থাক—আট আট।”

এই আটের বাতিরেই আর্জাস্ত’র গৃহ আজ স্রবাস্তের। অশ্রু মধুর গঞ্জে ভাবিয়া উঠিয়াছে, সাহিত্যিক মহারথিবৃন্দেব কল-কোলাহলে পূর্ণ হইয়াছে! সন্ধ্যার বাত জ্বাললে কার্য্য আরম্ভ হইল। প্রকাণ্ড একটা টোবলের এক পার্শ্বে আর্জাস্ত ও ইদা—তাহাদিগকে ফিরিয়া লাবান্তাজ্-মোরোনভার দল বসিয়া গিয়াছে। লাবান্তাজ্ পিয়ানোতে বা দিয়া বানিকটা চীৎকার করিল। সে থামিল আর্জাস্ত বিচিত্র ভঙ্গীতে কাব্য-পাঠে কণ্ঠ খুলির দিল।

সে এক অগুরু কৌতুককর ব্যাপার। কবি তাহার প্রচার অদর্শনে বাধিত চিত্তের বিলাপ উদ্ভাস মূর্ত করিয়া দিয়াছে। সেই প্রিয়া কি “নির্দ্রবা,” “হৃদয়শীনা,” “পাখাণী,” “হুঠা”! অভিধান হইতে অভিযোগের সাংস্ফোজন-গুলিকে টানিয়া আনিয়া এ কাব্যে আসন দেওয়া হইয়াছে। গোলাপী ফিতায় কোণ-কোঁড়া পকাণ্ড গাতাব মধ্য হইতে আড়া-উত্তর দ্বারা অজ্ঞপ্ত ধাবে করিয়া পড়িষেছিল। শুনিয়া ইদাব কাণ মাথা কাঁ। কাঁ। কবিত্তে লাগিল—ভক্তের দল যে কাব্য-সুধাপানে বিভোর হইয়া উঠিল। কাব্যের শেষে আবার একটু ‘উপসংহার’ ছিল—নুতন কয়েক ছত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কবি পড়িল, “—সেই শয়তানী নারী ফিরিয়া আসিয়াছে—সেই দাসী আজ আসিয়া আবার এই পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছে—এই সেই হুঠা দাসী, আমার চরণ-তলে!” ভক্তের দল কবচালি দিয়া বলিয়া উঠিল, “কয় কয় কবি, তোমারই কয়!”

কবচালির দাক্ষণ ঘটাতো কবির চিত্ত ভূপ্তি মানিল না। পত্রিকাখানি আজ হৃদিশার চরণ সৌম্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এমন প্রতি মাসের পবিত্র বৎসরে দুই-চারিবারমাত্র দৈবাৎ তাহা প্রকাশিত হয়। পাংগা দীর্ঘ কাগজ—কালির রেখায় ভাঙ্গা অক্ষরে পূর্ণাঙ্গলি পবিপূর্ণ, শুধু বাহিরের মঙ্গলটি জমকালো বদ্যারে লাল কালিতে ছাপা—মধ্যে কৈফিয়, আঁটি—ছাপাখানার গোলযোগে প্রকাশে বিলম্ব হইল। সঙ্গে সঙ্গে এই অপবিত্রার্থী কটির জ্ঞা পাঠক-পাঠিকার নিকট ক্ষমা চাহিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে, ছাপাখানার গোলযোগ কোন-মতে কাটিয়া গিয়াছে; এবার হইতে ঠিক নিরূপিত সময়েই পত্রিকা বাহিন হইবে।

কিন্তু এ আশ্বাসও এতটুকু লাভ ছিল না। পত্রিকা তাহার শেষ নিখাসটুকু ছাড়িয়া বজ্র শুধু একটা অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। এমন দিনে শালং ফিরিয়া আসিয়া কবির হাতে আপনাকে সমর্পণ করিয়া কহিল, “এসেছি, ওগো কবি, আমি এসেছি—আজ থেকে আমি তোমার, তোমারই শুধু!”

আর্জাস্ত নির্কোষ বা শয়তান বাহাই হোক—এই ছব্বল নারীর উপর তাহার প্রভাব অসাধারণ ছিল। আপনাব পুরুষ-আক্ষালনের স্বয়ং-স্বরূপ এই নারীকে না পাইলে তাহার চলেও না—ইদাকে তাহার চাই-ই। এই অনাদৃত কবিরেবতাটি সহস্র নির্ধাতনে তাকে গীড়িত ব্যথিত করিলেও ইদার তাহাতে স্থাথ ছিল না। এত বড় কবির সম্ম-স্ব-সাভে এতদিন বক্তিতা থাকিয়া কবির প্রতি তাহার অহুসাগ এবার বেন ষিগুণভাবে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। আহা, অনাদৃত উপেক্ষিত কবি,—বাহিবের সহিত প্রবল সংঘর্ষে কাতর হইয়া পড়িতেছে, তবুও তাহার সাধনাব বিরাম নাই! বাহিরের লোকগুলা কোন মায়াবলে

কবির অন্তরেব লাভবাণি কোনমতে জানিয়া লইয়া ছন্দে নাটিকায় উপাখ্যানে জন-সমাজে তাহা প্রচার করিয়া দেশেব লোকের বাহবা লইতেছে! আর তাহার প্রিয় কবিতা এই নিহৃত নীড়ের মধ্যে বসিয়া দাক্ষণ দীর্ঘার বিয়ে শুধু ভজ্জবিত হইয়া মরিতেছে! দুর্ভাগা কবির প্রতি এই ভক্ত নারীর এতখানি সমবেদনার ইহাই এক প্রশ্নান কাবণ ছিল। ইদাই শুধু এ দুঃসময়ে কবির চিত্তে প্রতিভার দাপটিকে নিবিত্তে দেয় নাই—হুই হাতে নিরাপদ অন্তবাল রচনা করিয়া দীর্ঘার প্রলয়-বাক্য হইতে তাকে রক্ষা করিয়া দালাইয়া রাখিয়াছে। একবার শুধু একটু অবসর পাইলে হয়! আর্জাস্তর প্রতিভার দাপ অমনি দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠিলে,—নিশ্চয় জলিবে। সে আলোর উজ্জল রেখার বিধেব লোক মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া দেখিবে—কি দেখিবে? শুধু কি তাহাদের কবিতিকে দেখিয়াই শাহারা চরিতার্থ হইবে? না! তাহাব পার্থে কবির প্রতি না-দীপে বৈল-দান-বত্যা এই নারীকে? কি তাহারা এতটুকু রতজ্ঞতা ছাপন করিবে না? একটি মাত্র ভাষা শুধু ইদাকে শত নিখণতনেও কান্দ কবে নাই!

এই যে দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত সংগ্রাম চলিয়াছে—প্রতিভাকে চাড়া দিয়া দাঁড় করাইবার জ্ঞা এই অকাতর পবিত্রম—যে সংগ্রামে কবির অপব সঙ্গীর দল,—কেত কেত হইতে ধরিয়া বিয়ান্তরে মনোনিবেশ করিয়াছে, কেত-বা কেত-প্রান্তে মূমূর্ষ অবস্থায় পড়িয়া আছে—ইহার মধ্যে—এই বিরাট বিশৃঙ্খলাব মধ্যে একমাত্র কবির শুধু বিজয়-গর্বে মেবারের রাণা প্রতাপসিংহেব লায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে! অগাধ জলরাশির মধ্যে ক্ষুদ্র ছাপ-খণ্ডের মত ভাগিয়া গিয়াছে—প্রলয়-পয়োদি কিছুতেই তাকে নিমজ্জিত কবিত্তে পারে নাই!

কাব্য-পাঠ তখন শেষ হইয়া গিয়াছিল। ভক্তের দল কাব্য-সৌন্দর্যেব মোহটুকু তখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই; ইদাব চোখের কোণে অশ্রুর রাশি আসিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল, বহু চেষ্টায় ইদা তাহা ঝরিতে দেয় নাই, এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, একটা লোক মানাম আর্জাস্তর সহিত দেখা কবিত্তে চাহে! তাহার কি ভ্রূরি প্রয়োজন আছে!

কে যেন মধু-চক্রে ঘা দিল। সকলে দাঁড়াইয়া উঠিল—“কে?” “কি চায়?” “কেন এসেছে?” হ-হ কবির প্রশ্নের ঝড় বহিয়া গেল।

দাসী কহিল, “একটা লোক।”

“কে লোক?”

“লোকটা যেন পাগল! মানামের সঙ্গে সে দেখা করতে চায়। আমি বললুম, এখন দেখা হবে না—মানাম ব্যস্ত আছেন—তবু সে সুনবে না—বলছে, দেখা না করে কিছুতেই সে এখান থেকে নড়বে না। সে বলছে, তার

ভাবী দরকার। এই বলে সে চৌকাঠের উপর বসে পড়েছে—কিছুতে উঠছে না।”

শালতৈব বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল, “যাই, আমি দেখে আসি।”

আর্জাস্ত’ তাহার হাত ধরিয়া একটা ঝটকা দিল, কহিল, “না, না, তোমার যাওয়া ততই পাবে না। লাবাঙ্গান্দ্র, তুমি দেখে এস ত ত, ব্যাপারখানা কি।” লাবাঙ্গান্দ্র একটা রাগিণীর কথা ভাবিতেছিল। নিশ্চয় দিতে দিতে উঠিয়া গেল।

কবি তখন আপন কাব্যের ব্যাখ্যা কবিত্তে উন্নত হইল। কিন্তু বাধা পড়িল। লাবাঙ্গান্দ্র ফিরিয়া আসিয়া কবিকে একান্তে ডাকিল। কবি স্তম্ভিতভাবে প্রশ্ন করিল, “ব্যাপার কি?”

“ব্যাপার আবার কি! সেই চৌকাঠটা একে পাঠিয়েছে—তার অস্তিত্ব করেছে।”

“চৌকাঠ! কে চৌকাঠ? জাক—না!”

“তানাত্ত আবার কে! লোকটা বলছে, জাকের বড় অস্তিত্ব।”

হঁ! মস্ত ঢাল চলেছে, ছোকরা! চল আমি একবার যাচ্ছি।” আর্জাস্ত’ বাটবে আসিল। আর্জাস্ত’কে দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। সে বেলিসেয়ার।

আর্জাস্ত’ কহিল, “তোমাকে সে পাঠিয়ে দিয়েছে, বুঝ? ‘না মশায়, কেউ জানায় পাঠায় না। আমি নিজেই এসেছি। তাব কি কথা বলবার শক্তি আছে যে পাঠাবে?’ আজ তিন হাতী সে শাণিত। এমনকি আর—একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে।”

“বোগটা কি?”

“বুকের অক্ষর। বুকে—বাঁ বাঁ, বুক কন কন করছে। ডাক্তাররা ভয় পেয়েছে, বলছে, আর এক হস্তাণ্ড থেকে কি না সন্দেহ। তাই আমবা ভাবলুম—আমবা মানে, আমি আর আমার স্ত্রী—ভাবলুম, তার মাকে একবার বপরটা দেওয়া উচিত। তাই আমি এসেছি।”

“তুমি কে?”

“আমি? আমি বেলিসেয়ার। জাক আমায় আদর করে ‘বেল’ বলে ডাকে; তার মাও আমার চেনেন। ‘বেল’ বললেই তিনি বুঝতে পারবেন। তিনি আমাদের খুব জানেন।”

“শোন, বেল মশায়,” কবির ঘরে একটা বিদ্রোহের সুর জাগিয়া উঠিল। কবি কহিল, “পুত্রসে বেল মশায়, বারা তোমার পাঠিয়েছে, গিয়ে তুমি তাদের বলো, এ ঢাল তারা যা চলেছে, চমৎকার! কিন্তু এসব ঢাল নেহাৎ পুরোনো হয়ে গেছে। নতুন ঢাল ঢালতে বলো, তাতে যদি কার্খোঙ্কার হবার সম্ভাবনা থাকে!”

“ঢাল কি মশায়?” বেলিসেয়ার কবির বিকল্প ঠিক বুঝতে না পারিয়া কহিল, “ঢাল, কি বলছেন? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, আপনি?”

বেলিসেয়ারের কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই আর্জাস্ত’ নশকে দ্বার বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার হস্তবুদ্ধিভাবে পথের ধারে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল—পবে সে-ও ধীরে ধীরে সে স্থান ত্যাগ করিল।

আর্জাস্ত’ ফিরিয়া আসিয়া ইদাকে কহিল, “ও একটা বাজে লোক ভুল করে এ বাড়ীতে এসেছিল!” তখন আবার কাব্যালোচনা চলিল।

কুয়াশা-মণ্ডিত, ক্ষণ-আলোক-বিচ্ছুরিত পথ ধরিয়া বেলিসেয়ার বাসায় চলিল। পথে সে শুধু ভাবিতেছিল, তাহার বন্ধুর কথা—জাকের কথা! না জানি, বিছানায় পড়িয়া কি অস্থির ভাবেই সে ছটফট করিতেছে! এতিয়োল হঠাৎ ফিরিয়াই সে জবে পড়িয়াছিল। গা আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছিল, চোখ দুটো আফিমের ফুলের মতই টকটকে লাল। কপালের শির ফুলিয়া দপ দপ করিতেছিল। তবুও জাক কাহাকেও সে কথা খুলিয়া বলে নাই।

সেই অর-গায়েত পুনরিন সে কারখানায় গেল। শেষে দুই দিনের পর যখন একদিন একান্ত কাতরভাবে বিছানায় পড়িয়া সে ছটফট করিতেছিল, তখন বেলিসেয়ারের স্ত্রীই তাহার এ অস্থিরতা প্রথম লক্ষ্য করে। জাকের গায়ে হাত দিয়া সে দেখে, গা শুষ্কতা যাইতেছে। তখনই ডাক্তার আনা হইল। বহুক্ষণ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার লম্বাট বুদ্ধিত কাঁপা সংবাদ দিল, অস্ত্রণ বড় শব্দ। না—সারিবারই সম্ভাবনা—মদি সারে, তাহা হইলে জাকের পুনরিত্য হইবে!

সেই অবধি জ্বরের আর বিরাম নাই। বেগটা কামলেও জ্বব একেবারে ছাড়ে না, বারে আবার বাড়ি। সেই জ্ববল জ্বরে জাক কতকি বকে! কখনও তৃষিত ক্ষদ্রে সে মাকে ডাকে, কখনও বা সেসিলের নাম করিয়া শুধু অশ্রু বষণ করে।

মাদাম বেলিসেয়ার আসিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি বেলিসেয়ারকে কহিল, “ভগা, আমি ত গতকি বড় ভালবুছি না—জাকের মাকে একবার খপর দাও। যেমন করে পার, তাকে একবার তুমি নিয়ে এস! মাকে দেখলে ওর প্রাণটা শবু কতক বোবতম স্থি হতে পারে! জান হলে ও গো ওর মার নাম কবে না, বোগের ঘোরেই শুধু কবে, এই থেকেই আমি বেশ বুঝছি, জিবারাও ও শুধু ওর মার কথাই ভাবছে।”

তাই বেলিসেয়ার নানা সন্ধান করিয়া সেদিন হৃদার বাটীতে গিয়াছিল। কিন্তু ইদা আসিল না—কোন সংবাদও সে পাইল না। নিতান্ত নিরাশ চিত্তে বেলিসেয়ার গৃহে

ফিরিয়া আসিল। বেদনার প্রাণ তাহার ফাটিয়া বাইতেছিল।

বেলিসেয়ার যখন ফিরিয়া জাকের কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন ঘরে মুহূর্ত্ত আলো জলিতেছিল। অশ্লীল আলোকে সে দেখিল, জাকের বিছানার পার্শ্বে মাদাম বেলিসেয়ার ও লেভ্যান্স-গৃহিণী চুপি চুপি কথা কহিতেছে—আর থাকিয়া থাকিয়া জাকের দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সমস্ত ঘরে যেন একটা বিভীষিকার ছায়া পড়িয়াছে। তাহাকে একা ফিরিতে দেখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার উঠিয়া আসিয়া চুপি চুপি কহিল, “একলা যে?”

তখন বেলিসেয়ার, বাহা ঘটিয়াছিল, আত্মপূর্নিক সব খুলিয়া বলিল। শুনিয়া মাদাম বেলিসেয়ার শিহরিয়া উঠিল, “মাগো, কি সব রান্ধস, শরতান! ছেলেটা মরে, তবু একবার উঁকিটি মারবে না। আর তুমিই বা কেমন লোক—সে বাধা মেনে দিবি চল এলে। শরীরে কিছু হায়া নেই। তুমি চীৎকার করে বললে না কেন, যে মাদাম, তোমার ছেলে জাক বুঝি মরে!”

বেলিসেয়ার বসিয়া পড়িল। গৃহে যে তিরস্কার মিলিবে, একথা সে বিলক্ষণ জানিত। কিন্তু উপায় কি? সেই অত লোকের ভিড়ে কি করিয়া সে ভিতরে প্রবেশ লাভ করিত? অজ্ঞান গলাধাক্কা দিয়া সেখান হইতে ঠেলিয়া সকলে যে তাহাকে পথে বাহির করিয়া দিত।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “এর চেয়ে যদি আমি যেতুম, তা হলে বোধ হয় কাজ হত।”

বেলিসেয়ার মাথা তুলিয়া নম্র স্বরে কহিল, “কিন্তু ভিতরে জায়া যে ঢাকতেই দিলে না আমাকে।”

“ধাক্কা দিয়ে চল যেতে হয়—একবার কোন মতে খপরটা দেওয়া, তার পর যা তাদের মন যেত, তাই না হয় করত।”

লেভ্যান্স-গৃহিণী কহিল, “কিন্তু তুমি ত জান না দিদি, এই সব মেয়েমাছুদের প্রাণ কি রকম শক্ত, পাথরে গড়া।”

লেভ্যান্স-গৃহিণীর বাগ হইয়াছিল। ইদার প্রতি এখন আর তাহার এতটুকুও মমতা ছিল না। অত করিয়া তাহার মন যোগাইয়া খোসামোদ করিয়া সে বেচারী আশা করিয়াছিল, ইদা তাহাকে অর্থ-সাহায্য-দানে তাহার ব্যবসায়ের শ্রী-বন্ধনে সাহায্য করিবে—তা কোথায় সে সাহায্য! বসন-ভূষণে অর্থ ব্যয় করিতে এতটুকু যাহার কৃপণতা নাই, গরীবকে কিছু দিতে গেলেই কি তাহার সেই অর্থের আশুনা লাগিয়া যায়। কাজেই ইদার প্রতি তাহার ক্রোধের কারণ যথেষ্টই ছিল। আজ সেই ঘোষের খানিকটা প্রকাশ করিতে পাওয়ায় তাহার হৃদয়ে যেন একটু বাতাস লাগিল।

মাদাম বেলিসেয়ার সে কথার কর্ণপাত না করিয়া কহিল, “থাক গে, ও সব কথা! এখন বারি কি? এ

অবস্থায় ত ওকে আর ফেলে রাখতে পারিনে! বিনা চিকিৎসায় কি শেষ মায়া বাবে? অথচ চিকিৎসা করাতে পরস্যাও বড় অল্প লাগবে না—অত পরস্যা বা আমার পাই কোথা?”

লেভ্যান্স-গৃহিণী কহিল, “তুমি আর কি করবে বল, দিদি? যা না করবার, তোমরা তাই করচ। পরের জ্ঞান এমন কে করে করে থাকে? তবে আমার পরামর্শ যদি শোন ত বলি—”

“কি?”

“ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। সেখানে তদারকের অভাব হবে না।”

“চুপ, চুপ—কি বল, তুমি? জাক কি আমার পর—ওকে আমি আমার পেটের ছেলের মত দেখি যে! আহা, বাছাকে কি রোগে যে পেলে—” বেলিসেয়ার-গৃহিণীর চোখে জল আসিল। তাহা মুছিয়া সে বিছানার পানে চাহিল—বিছানাটা বঁট করিয়া একবার নড়িয়া উঠিল। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জাক পাশ ফিরিল।

মাদাম বেলিসেয়ার চুপি চুপি কহিল, “দেখ দেখি, ও বোধ হয় শুনেছে। ও রকম পড়ে আছে বলে তুমি কি মনে কর ওর জ্ঞান নেই? জ্ঞান বেশ আছে।”

“তাতে আর হয়েছে, কি? আমি কি মন্দ কথা বলেছি? বলি, তুমি যাই ভাব না কেন গো, ও ত আর সত্যিই কিছু তোমার পেটের ছেলে নয়, মার পেটের ভাইও নয়! তোমারও তেমন কিছু অর্থ-বল নেই। হাসপাতালে দিলে তবু ওর চিকিৎসা হবে, তাই আমার বলা।”

বেলিসেয়ার কহিল, “কিন্তু ও যে আমার মিতো।” এতক্ষণ সে কোন কথাই কহে নাই। লেভ্যান্স-গৃহিণীর কথায় সেও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

লেভ্যান্স-গৃহিণী ব্যাপার বুঝিয়া বিলায় গ্রহণ করিল।

জাক সমস্তই শুনিয়াছিল। পাশে কে কি কথা বলে, সে সমস্তই তাহার কানে যায়। সে শুধু নিরুপায় চক্ষু মুদ্রিয়া থাকে। বুকের মধ্যে যে অসহ্য যাতনা অগ্নয়-গিরির বিরাট লাহের মত অহর্নিশ জলিয়া উঠিতেছে, তাহার জ্বালায় কথা কহিবার প্রবৃত্তিই তাহার খোটে থাকে না। চক্ষু মুদ্রিয়া সে শুধু আপনার জীবন-নাট্যের প্রতি অন্ধ প্রতি দৃষ্ট পথ্যালোচনা করে। কি বিচিত্র ঘটনার স্রোত-প্রতিস্রোত চলিয়াছে! ভাবিতে ভাবিতে বুকের বেদনা যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখন সে নীরবে শুধু পড়িয়া থাকে। পড়িয়া থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি! প্রকাশ হইয়া পড়িলে এখনই বেলিসেয়ার ও তাহার গৃহিণী অস্থির হইয়া উঠিবে। এই সবল গ্রাম্য নর-নারীর স্রুগভীর স্নেহ ও অবিদ্যম দেবার তাহার প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। কি করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া



ায়—ভাবিয়া সে কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিত না। আজ সেভ্যাস্ট-গৃহিণীর কথায় সে বেন অকুল পাখারে কুলের সন্ধান পাইল! হাসপাতাল? ঠিক বলিয়াছে। সেখানেই সে বাইবে! তাহাতে আরোগ্য না মিলুক, এই নিরীত লোক দুইটিকে মুক্তি দিয়া স্বস্তি ও তাহার মিলিবে। কিন্তু কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? সে যে বহুদূরে। অথচ তাহার এক পা চলিবারও সামর্থ্য নাই!

দেওয়ালের দিকে চাহিয়া শুধু সে এই কথাই ভাবিতে ছিল। এই দেওয়ালের দিকে চাহিয়াই সে শুইয়া থাকিত, চক্ষু মুদিত না। মুক দেওয়াল যদি সে চোখের ডাড়া বুঝিয়া কথা কহিতে পারিত ত সে নিশ্চয় বলিত, সে চোখে শুধু পরিপূর্ণ হাস ও নীমাহীন নৈরাশ্রের কাহিনী গভীর অক্ষরে কে রচিত্য রাখিয়াছে!

একাই সে আপনাব বেদনার বোঝা বহন করিত, কাহাকেও তাহার অংশ দিত না। মাদাম বেলিসেয়ারের কথায় অধরে হাতেরেখা স্মৃতি করিয়া তুলিবার সে চেষ্টা করিত, কিন্তু জলের বেখার মতই সে হাসি নিমেষে মুছিয়া বাইত, এবং মুখের সেই দারুণ শুষ্কতা তৈর করিয়া রোগের শীর্ণ ছায়া চারিধারে ছড়াইয়া পড়িত।

এমনই ভাবে তাহার বোগতপ দিনগুলো কাটিয়া বাইতেছিল। বাহিরে প্রমজীবি-দলের কথ-কোলংল ধনিয়া উঠিত, জাকের চিত্ত সে শব্দে কাতর হইত। কেন, তাহাকে দুর্বল বোগতপ কবিতা রাখিয়াছে, ভগবান। কেন সে আর সকলেরই মত কার্যক্ষম, সজ্জ, সবল নহে? জীবনের জটিল গ্রন্থিমোচনে, কাজ-কর্মের মধ্যে কেন আজ তাহার হাতদুটিকে নিযুক্ত রাখ নাই?

কাজ! কিন্তু কাহার জন্য জাক আজ কাজ করিবে? কিসের আশায়? মা তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, শেষে সেসিগও তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে! এখন তবে কাহার মুখ চাহিয়া, কাহার স্রুতের জন্ত সে কাজ করিবে, মাফ হইবে? তাহার আজ আর কে আছে, কি আছে, যাহার আশায় অঙ্গ স্কন্ধ চিত্তটাকে উত্তেজনা আশার রাগিণীতে সে মাতাইয়া তুলিবে? আজ তাহার কেহ নাই, কিছু নাই। তবে আর এ জীবনে সংগ্রাম করিয়া লাভ কি? জয়ের প্রয়োজন নাই, মুক্তির প্রয়োজন নাই—গা এলাইয়া দিয়া বিপুল পরাজয়ের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও। ক্ষতি কি।

পরিদর্শন-প্রত্যয়ে মাদাম বেলিসেয়ার জাকের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে, দেওয়ালে হাতের ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জাক বেলিসেয়ারের সহিত কি তর্ক করিতেছে। সে সবিস্ময়ে কহিল, “এক জাক, তুমি উঠেছ যে! শুয়ে পড়, শুয়ে পড়—এখনও তুমি ভাবী তরুণ। দাঁড়ানার মেনন সহ হইবে কেন?”

বেলিসেয়ার কহিল, “দেখ ত! কিছুতে ও কথা শুনবে না, দাঁড়াইবে। ও বলছে, ও হাসপাতালে যাবে, এখানে থাকবে না।”

মাদাম বেলিসেয়ারের বুকের ডিওরট ‘অসহ্য বেদনার টনটন’ করিয়া উঠিল। চোখের কোণে অশ্রুর বেগ চৈলিয়া আসিল। কোন মতে তাহা থাম করিয়া সে কহিল, “কেন জাক? এখানে তোমার কি বসে আছে, বল। বল জাক, তোমার কি চাই?”

“না, না, মাদাম বেলিসেয়ার—কষ্ট কিছুই নয়। তোমরা আমার জন্ত যা কচ্ছ, মা—শাপও বুঝি এমন করে না। এমন শেহ আর কখনও আমি পাই নি! বাপ কেমন, তা ত জানিই নে। তোমাদের এ শেহের স্বপ্ন স্বপ্ন রিসেও শোধ হয় না। কিন্তু আর আমার ধরে যেখো না—হেড়ে দাও। না, রাখবার চেষ্টাও করো না, আর। আমি মিনতি করি, আমার যেহে দাও। আমি যাবই না।”

“কিন্তু কি করে যাবে তুমি? হেঁটে যে যেতে পারবে না—বড় কাহিলি যে। আর চেয়ে একটু বল পেলে বরং যেয়ো। তখন আমার ব্যবস্থা করব না।”

“না, না, আমি এত কাহিলি হই নি এমনও; বেশ যেতে পারব। আজ্ঞে আজ্ঞে যাব। বেলিসেয়ার সাহায্য করবে—ওর হাত ধরে যাব। কেমন বেলিসেয়ার, আমাকে নিয়ে যাবে না? সেই একদিন নাস্তুর আমি চলেতে পাচ্ছিলুম না—গা টলছিল—তোমার কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছিলুম—মনে পড়ে, বেলিসেয়ার? সেই রকম করে যাব। তা ছাড়া আকাশ, পৃথ, এ সব দেখবাম জন্ত আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। আর এ বজ্র ঘরে অন্ধকারের মধ্যে থাকা যায় না।”

এমন অসুচ যাহার সঙ্কল্প, তাহাকে বাধা দেওয়া কঠিন। নদীর জল যখন স্রোতের বেগে ছুটিতে থাকে, তখন সহস্র বাধাও সে স্রোত আঁচিয়া রাখিতে পারে না। জাককেও কোন মতে ধরিয়া রাখা গেল না। মাদাম বেলিসেয়ারের লগাটে চুষন করিয়া বেলিসেয়ারের অন্ধ ভর দিয়া জাক ঘরের বাহির হইল, ধীরে ধীরে দীর্ঘ সোপান অতিক্রম করিল এবং অবশেষে মুক্ত পথে বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া বাড়ীটার পানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ সে দাঁড়াইয়া রহিল। যে গৃহে তাহার এতদিন কাটিয়াছে, আশার আশ্রয়ে যে গৃহ পরিপূর্ণ ছিল, যে জায়গার প্রতি ইষ্টকথণ্ডে তাহার জীবনের সহস্র উজ্জ্বল স্মৃতি মিশিয়া রহিয়াছে এবং যে গৃহে তাহার সমস্ত আশাও সমাধিও হইয়া গিয়াছে, সেই গৃহ হইতে বিদায় লইবার সময় তাহার নমন-পলক এখন সজল হইয়া উঠিল। বিদায়, বিদায়, চির-বিদায়, হে আশা-নিরাশা-মগ্নিত গৃহ, বিদায়। তাড়াহাড়ি সমস্ত দুঃসমতা ব্যাধিয়া ফেলিয়া বেলিসেয়ারের দৃষ্টি তর দিয়া সে স্রোতের হইল।

অত্যন্ত ধীর মুহূর্তে পদে পদে চলিল। খানিকটা পথ হাঁটিয়া কিংবা বিশ্রাম—এমনই ভাবে চলিতেছিল। মাথার চুল দীর্ঘ হইয়া মুখে-চোখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘামে চুল ভিজিয়া গিয়াছে,—কপাল হইতে টুং টুং করিয়া ঝাম ঝরিয়া পড়িতেছে। মাঝে মাঝে চোখে চারি-বার কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে, আবার পরক্ষণে সব দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে। আলো ও ছায়ার যে এক চকিত লীলাভিনয়! জনতার মধ্য দিয়া এই দুই জন লোক চলিয়াছে; জাক ও বেলিসেয়ার। বাহিরের কোলাহল, বাহিরের বৈচিত্র্যের প্রতি তাহাদের লক্ষ্যও ছিল না। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যেন পারিষদ পণ্ডবলের সহিত সংগ্রাম করিয়া একটি প্রাণী বিধ্বস্ত হইয়াছে; অপরটি তাহাকে জীবন-সংগ্রামের সেই নিষ্ঠুর ক্ষেত্র হইতে অত্যন্ত সাবধানে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে—ক্ষেত্রের বাহিরে কোথাও যদি তাহার ক্ষয় একটু শাস্তি, একটু আশ্রয় মিলাইতে পারা যায়!

জাককে লইয়া বেলিসেয়ার যখন হাসপাতালে গৌছিল, তখন এনো পড়িয়া গিয়াছে। হাসপাতালের তদাধী বারান্দায় দাঁড়াইয়া বসে অসংখ্য লোক বসিয়া। সকালে বিকালে এমন জনতার বিরামনাই! কেহ শুনিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ-বা সাহস দিতেছে। চারিদিকে সম্মুখের মুহূর্ত-স্বপ্ন! সকলের মুখেই দীর্ঘ উদ্বেগের চিহ্ন। জাক আসিয়া সেই দলে যোগ দিল।

জনতা সক্রিয় ছিল না। সকলেই স্থব-ত্বের আলোচনা করিতেছিল—বেদনার রাগিণী অতল স্রবের মুচ্ছনায় ভাসিয়া গিয়াছিল। জাক নিকটবর্তী চিত্তে বসিয়া সেই সকল আসোনা উল্লেখিত।

সম্মুখে দাঁড়াইয়া বসিল। ডাক্তার আসিল। এমনই চারিদিকে একটা স্তব্ধতার আবরণ পড়িয়া গেল। পরক্ষণেই স্বয়ং চাকল্য। ডাক্তার আসিয়া রোগীদের রোগ পরীক্ষা করিতে লাগিল। রোগীর হাত টানিলেই বুকটা হঠাৎ ধক্ক করিয়া উঠে। না জানি, কি উল্লেখ হইবে। হয় আরোগ্যের সম্ভাবনা, নয়, গৃহীত হইতে বিদায় লইবার সঙ্কেত! রোগীর নিশ্বাস ফুলিয়া ফুলিয়া বহিতে থাকে, স্বয়ং কাঁপিয়া ভাসিয়া পড়ে। রোগের যাতনায় উপর একটা বিভীষিকার কম্পন খেলিয়া যায়।

এক নারী একটি বালককে কোড়ে লইয়া ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। বালকের বয়স বারো বৎসর হইবে। ডাক্তার নারীর হাত বরিয়া কহিল, “কি—? কি হয়েছে?”

“আজ্ঞে, আমার কিছু নয়, বাবা—অস্থির হইলেটির।”

“হুঁ। ডেলের? কি—কি হয়েছে? দেখি—চটপট দেবী না—দেবী না।”

“এই যে—ও কাণে একটু খাটো আছে, বাবা,—আমি বলছি—”

“কাণে খাটো? কোন্ কাণ?”

“হুঁ কাণেই, বাবা।”

“হুঁ কাণেই? আচ্ছা, দেখি—”

“এই যে—দাঁড়াও ত এছার, দাঁড়াও—কোন্ কাণে শুনে পাও না, বল।”

“আচ্ছা, ওম্ব পাবে!”

“তোমার কি?”

জাককে লইয়া বেলিসেয়ার ডাক্তারের সম্মুখে দাঁড়াইল। জাক কহিল, “অসহ্য বেদনা।”

“কোথায়?”

“বুকে। বুক যেন সর্বদা জ্বলে।”

বেলিসেয়ার কহিল, “আব জ্বর!”

ডাক্তার ছুঁবার দিল, “হুনি খাম।” জাককে কহিল, “হুঁ—হুনি মদ খাও—”

“আজ্ঞে না, আগে এক সময় মাঝে-মাঝে খেয়েছি।”

“হুঁ—তাই বল। আর কখনও খেয়ো না—বুঝলে।”

“আজ্ঞে না, আর কখনও খাব না।”

“দেখি, কিছু দেখি—কিছু—” জাক জিজ্ঞাসা করিল।

ডাক্তার কহিল, “এয়া বুকটা দেখ। তোমার বোতাম খোল।” জাক বোতাম খুলিল। ডাক্তার যন্ত্র বসাইল। পাচ মিনিট ধরিয়া যন্ত্র নাড়িয়া, বুক-পিঠে টোকা দিয়া যন্ত্রগতীয় কার্য ডাক্তার কহিল, “তাই ত—”

বেলিসেয়ার কহিল, “কেমন দেখলেন?”

“ভাল না। বারাপ। যুবক—বারাপ। একে কি দ্বারা গুথ হাঁটিয়ে এনেছ?”

“হাঁ, গাড়ীভাড়ার পরমা পাব কোথায়, বসুন—”

“অজায় করেছ, ভারী অজায় করেছ! এই শরীরে হাঁটাটা ভাল হয় নি।” তখনই ডাক্তার আদেশ দিল, “ফুলি আন!”

বেলিসেয়ার কহিল, “রোগটা কি?”

ডাক্তার মুহূর্তে কহিল, “রোগ আর কি! ক’দীর ব্যামো। মাঝে দুধর! দেখা যাক চেষ্টা করে।”

ফুলি আসিল! জাককে ফুলির সাহায্যে হাসপাতালের সঁত-দিডিউ বিভাগে পাঠানো হইল। এ বিভাগটি বঙ্গা রোগীদের জন্মস্থান খোলা হইয়াছিল। জাককে আনিয়া একটি বিছানায় শোয়ানো হইলে নার্শ আসিয়া কহিল, “এ, এ যে খালি কতকগুলো হাড়-পাঁজরা একটা চামড়ার খোলে পুরে নিয়ে এসেছ! কতদিন অস্থির হয়েছে?”

বেলিসেয়ার নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, “তা আজ্ঞে, খুব বেশী দিন নয়।”

জাক কোন কথা কহিল না। পথের পরিমাণে চোখ তাহার ঘূমে ভরিয়া আসিয়াছিল। মুক জানালা দিয়া স্নিগ্ধ বায়ু ঘবেব মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। সেই বাতাস যেন মার মতই জাকের শ্রান্ত লগাটে ধীরে ধীরে স্নেহ-হস্ত বুলাইয়া দিল। জাক ঘুমাইয়া পড়িল, ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দোখল।

—এক স্তম্ভীয় পথ—কোথায় গিয়া সে পথ শেষ হইয়াছে, কিছুই বুঝা যায় না—সীমাহীন, অসুখান পথ! সেই পথে অসংখ্য লোক চলিয়াছে! সেও চলিয়াছে! কোথায় চলিয়াছে, তাহা সে জানে না! পথের আরম্ভটা যেন কতক সেই এতিয়ালের পথের মতই! তবে এতিয়ালের পথ এতখানি দীর্ঘ নহে! ঐ দূরে তাহার অগ্রে ও কাহারো চলিয়াছে? এ কি—তাহার মা—আব ও—? সেসিল। ইদ! ও সেসিল অগ্রে চলিয়াছে—এই পথেই! জাক পড়িল, “না,”—“সেসিল”। কেহ সাড়া দিল না, কিরিয়ও কেহ চাহিল না। চলিয়াছে ত চলিয়াছেই। জাকও চলিতে লাগিল। সহসা কতকগুলি গাছপালার আড়াল পড়িল। মা ও সেসিলকে আর দেখা গেল না। জাক তখন আপনার গন্ধির বেগ বাড়িয়া দিল। ঐ যে আবার যায়। ঐ সে মা আর সেসিল! সহসা আবাব মধ্যে প্রকাণ্ড অন্তরাল রচিত হইয়া উঠিল। কল ও বংশল যন্ত্রাদির বিরাট ব্যবধান! জাহাজ, বেল ও এঞ্জিন তাহাদের বিপুল দেহ লইয়া এক হুলস্থল প্রাচীর সৃষ্টি কবিয়াছে। জাক সেই প্রাচীর লঙ্ঘনের চেষ্টা করিল। ঘর্ষন বন করিয়া কলেব ঢাকা ঘুরিতেছে। জাকের পা গাহাতে বাধিয়া গেল! তাহাব দেহ চূর্ণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। মাংসগুলি দেহ হইতে টুকরা টুকরা খসিয়া পড়িল। শীর্ণ কঙ্কালটা ঢাকার মধ্য হইতে ছিটকাইয়া পড়িল। তাহাব পর নিমেষে দৃশ্য পবিত্রিত হইল।

—চারিধারে অগ্নিকুণ্ড! দাউ দাউ কবিয়া আগুন জলিতেছে—বুঝি এখনই তাহাকে গ্রাস করিবে! সঙ্গে সঙ্গে একটা উৎকট গন্ধ—উঃ, অসহ্য! জাক পলাইয়া বাঁচিল।

—আবাব নূতন দৃশ্য। জাক যেন দশ বৎসরের ছোট ছেলেটি। মাদাম সেলেব গৃহ হইতে বাহির হইয়া বনে সে পাখীর সন্ধানে চলিয়াছে। গলি বাকিতেই সম্মুখে সে দেখে, এক ডাইনী বুড়ী। কাঠের বোঝা রাখিয়া বুড়ী তাহার উপর বসিয়াছিল—যেন সে কাহাব প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া জাক যেমন পলাইবে, অমনই বুড়ীটা তাহাকে ধরিবার জন্ত উঠিল। জাক ছুট দিল; বুড়ীও তাহাব পশ্চাতে ছুটিল। অবিরাম গতিতে জাক ছুটিতে লাগিল; বুড়ীরও ছুটের বিরাম নাই। শেষে অবসন্ন হইয়া জাক বসিয়া পড়িল। বুড়ী আসিয়া

তাহাকে বসিয়া ফেলিল। তখন দুইজনে যুদ্ধ চলিল, ভীষণ যুদ্ধ। জাকের পরাস্ত হইল। বুড়ী জাককে তাহার কাঠের বোঝার সহিত ঘাঁটিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। জাকের বুকে খচ, খচ, কবিয়া কতকগুলি কাঠের খোঁচা ফুটিয়া গেল। যন্ত্রণায় সে চাঁৎকার করিয়া উঠিল, “মা গো!”

চমকিয়া জাকের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে, তাহার বিড়ানাব পাশেই নাস। নাস কহিতেছে, “নাও, এষ্ট অশুভটা খেয়ে ফেল ত!”

জাক ক্যান্স ফাল্ কারিয়া নাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। এ ত স্বপ্ন নয়! তবুও বুকের উপর এ কিসেব বোঝা চাপিয়া বহিয়াছে—অসহ্য এ ভার! তাহাব চাপে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে।

## দশম পরিচ্ছেদ

### প্রেমজিত

জাক বালিসে ভর দিয়া বসিল। ঐদধ পান করিল। নাস কহিল, “তোমাব নাম কি?”

“জাক।”

“কি কাজ কর, তুমি?”

“আমি কবিকবি।”

“তোমাব কেউ নেই—বাদেব দেখতে চাও?”

“না” বলিয়া জাক একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

নাস আর কোন কথা কহিল না। জাকের দীর্ঘনিশ্বাসে সে বুঝিল, তাহার চিত্তের তাবে সে একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়া ফেলিয়াছে, তাই এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে সে কহিল, “এবার তোমায় কিছু খেতে হবে। কাল সারারাত্রি ঘুমিয়েছ। এটা ভাল লক্ষণ অবশ্য।”

জাক সবেমাত্র কিছু আহার করিয়াছে—এমন সময় ডাক্তার ও তাহাব পশ্চাতে এক দল ছাত্র আসিয়া জাকের সম্মুখে দাঁড়াইল। ডাক্তার জাকের বুকে যন্ত্র রাখিয়া কাণ পাতিয়া তাহাব মধ্য দিয়া বুকের বিচিত্র ধ্বনি শুনিল—পরে ছাত্রদিগের হাতে যন্ত্র দিয়া কহিল, “কি কি পাচ্ছ, বল সব” ছাত্রের দল একে একে আঙুড়াইয়া গেল—“সোঁ, সোঁ, ক্‌ড়িক্‌ ক্‌ড়িক্‌, ঘড়-ঘড়! ফুস্‌ফুসের মধ্যে হাওয়া ঢুকছে—খষা!”

ডাক্তার জাককে কহিল, “আজ রবিবার। কেউ তোমাকে দেখতে আসবে কি?”

জাক কহিল, “না।” ডাক্তার ও ছাত্রের দল চলিয়া গেল। অবূরে বেলিসেয়ার ও মাদাম বেলিসেয়ার দাঁড়াইয়াছিল; তাহাব তখন নিকটে আসিল। নোড়ক খুলিয়া, কয়েকটি আঙুর লইয়া জাকের হাতে দিয়া,

বেলিসেয়ার দান্য বাহির করিতে করিতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “এখন কেমন আছ, জাক? একটু ভাল বোধ হচ্ছে?”

বেলিসেয়ার জীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। ডাক্তার বলিয়াছে, রোগ ভাষণ, ধরোগে জাকের পরিচয় নাই। তবে যে কয়টা দিন সে বাঁচিয়া থাকে, তাহাই পূর্য্য লাভ। দারুণ যক্ষ্মার হাতে কোন দিনই কোন লোক পরিত্রাণ পায় নাই—জাকেরও সেই দারুণ যক্ষ্মা হইয়াছে। কোনমতে অস্ত্রের বেদনা অন্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মাদাম বেলিসেয়ার সশকভাবেই জাকের সতিত কথাবার্তা করি। কিন্তু জাক কোন উত্তর দিল না; শুধু স্নান নখন সে তাহার মুখের পানে চাতিয়া রহিল।

বেদনার কয়টা দান্য জাকের মুখে দিয়া তাহার দীর্ঘ কেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “জাক, তোমার মাকে খবর দিয়ে আনিব কি?”

জাকের স্নান চক্ষু সঙ্গী দীর্ঘ হইল, পাণ্ডু অধরে হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল। আহা, ইহাই ত সে চায়! মাকে শুধু একবার দেখিবার সাধ হয়। সমস্ত প্রাণ আজ মাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু মাকি আসিবে? যদি মা জানিতে পাবে যে, জাক সঙ্গিতে বসিয়াছে, আর বাঁচিবে না—তাহা হইলে—? এতাই হইলে কি একবার না আসিয়া মা থাকিতে পারিবে? না, না, মা ত নিষ্ঠুর নয়। মা যদি আসে, তবে জাকের এ বুকের বেদনাও বুঝি কিছু শান্ত হয়।

মাদাম বেলিসেয়ার বলিল, “আমি তাঁকে নিয়ে এখনই আসব, জাক।” মাদাম বেলিসেয়ার চলিয়া গেল। বেলিসেয়ার চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার বন্ধু, তাহার মিত্র, তাহার সঙ্গী জাক—! সেই জাক চিরদিনের জন্য তাহারিগকে ছাড়িয়া চলিয়াছে! বেলিসেয়ারের হৃদয়ের মধ্যে একটি বেদনা স্বর্গের মতই গেলিয়া ফুলিয়া গাঙ্গুরা উঠিতেছিল।

মাদাম বেলিসেয়ার বার্জাস্ত্রের গৃহে গিয়া কাহাকেও খবর দেখিতে পাইল না। ভৃত্য কহিল, সকলে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে—কখন ফিরবে, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। কথাটা মাদামের বিশ্বাস হইল না। এই শীতের দিনে গ্রামে বেড়াইতে গিয়াছে? না! এই নোবে, অজস্র তৃদার-বধের মধ্যে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে? কখনও না! অসম্ভব! কিন্তু কি করা যায়? মাদাম বেলিসেয়ার নিতান্তই নিরাশ চেষ্টে ফিরিয়া আসিল।

তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া জাক যখন কহিল, “কি? মা এল না! আমি জানতুম, মাদাম বেলিসেয়ার, মা আসবে না।” তখন কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে, মাদাম বেলিসেয়ার এমন একটি কথাও খুঁজিয়া পাইল না।

জাক তখন চক্ষু মুদ্রিয়া আর-এক কথা ভাবিতে

লাগিল। সে কথা বড় ভাল লাগে। সেসিলের কথা! সেসিল, কোথায় তুমি? তোমার জাকের যে আজ প্রাণ বাহির হইয়া যায়! একবার আসিয়া দেখিবে না, সেসিল? জাকের চোখের কোণ বহিয়া একটি দ্রুতটি করিয়া অক্ষর বিন্দু গড়াইয়া পড়িল।

মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “কৈদো না জাক, আমি আবার যাচ্ছি। যেমন করে পারি, তাকে আমি নিয়ে আসবই! দেখি, সে কত বড় পাষাণী মা।”

“না, না, কাজ নেই—সে আসবে না, মা আসবে না, মাদাম বেলিসেয়ার।”

কিন্তু মাদাম বেলিসেয়ার সে কথা কাণেই তুলিল না—ইদার সন্ধানে আবার সে বাহির হইয়া গেল।

শালৎ ও অর্জাস্ত্র সবে মাএ তখন বাড়ীর দ্বারে গাড়ী হইতে নামিয়াছে, এমন সময় উদ্ভাদিনীর মত ছুটিয়া আসিয়া মাদাম বেলিসেয়ার তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। রাখে তাহার সর্কশবীর জ্বলিতোছিল। তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে সে ইদাকে কহিল, “মাদাম, তুমি এখনই আমার সঙ্গে এস।”

ইদা চমকিয়া উঠিল। “এ কি—মাদাম বেলিসেয়ার।”

“হাঁ, আমি। তোমার ছেলে জাক—তার ভাবী অস্থখ। বুঝি সে আর বাঁচে না—একবার তোমায় দেখবার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে।”

অর্জাস্ত্র কহিল, “বেরো মাসী, ঢংপেয়েজিস্ বটে! রোজ রোজ ঢালাকী! অস্থখ করে থাকে—বেশ, আমরা ডাক্তার পাঠাচ্ছি—তা বলে একে যেতে হবে, এমন কোন কথা নেই।”

মাদাম বেলিসেয়ার কাদিয়া ফেলিল; কাদিয়া কহিল, “ওগো, ডাক্তারের কোন ভাবনা নেই গো—অনেক ডাক্তার তাকে দেখছে। সে এখন হাসপাতালে।”

“হাসপাতালে?” ইদার স্বর ক্রুদ্ধ হইয়া গেল।

“হাঁ, হাসপাতালে। কিন্তু আর বড় বেশীক্ষণ থাকতে না। যদি তুমি দেখতে চাও ত মিছে কথা-কাটাকাটি না করে এখনই চলে এস।”

অর্জাস্ত্র ইদার ভাব লক্ষ্য করিয়া কহিল, “এস, এস, শালৎ,—ওর কথা শোন কেন? হঠাৎ এমন গুরুতর অস্থখ হল যে—”

তাহার কথার বাধা দিয়া মাদাম বেলিসেয়ার কহিল, “ওগো, বাজে কথার সময় নেই, এখন। তা ছাড়া আমি তোমার জন্য আসিনি এখানে, শুধু বোঁচরা জাকের বড় সাধ, তোমায় দেখে—তার সেই শেষ সাধ যদি মিটতে পারি, তাই আমি এসেছি। ওঃ ভগবান, ভগবান, এমন রাক্ষসী মার পেটেও তুমি ছেলে দিয়েছিলে!”

ইদার আর সহ্য হইল না! সে বলিল, “চল, চল, আমি এখনই যাব।”

আর্জান্ত হাঁকিল, “ইদা—” তাহাব স্বব রুট, তাব।

ইদা কহিল, “না, না, আমায় ক্ষমা কর। আমার জাককে শুধু একটি বাব আমি দেখে আসি। একটি বাব, একটি বাব আমায় ছুটি দাও—”

মাদাম বেলসেয়ারের হাত ধরিয়া ইদা তখনই গাড়াতে গিয়া উঠিয়া বাসিল। গাড়া ছুটিল।

মাদাম বেলসেয়ার যখন হাসপাতাল হইতে আর্জান্তের গৃহের দিকে যাত্রা করিল, ঠিক তাহাব পর মুহূর্ত্তে এক কিশোরীর হাত ধরিয়া এক বৃদ্ধ হাবপাতালে জাকের কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবনায় উভয়েরই বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল। কে জাক? কেনন আছে সে?

নিমেষে জাকের শব্দ-প্রাপ্তে আসিয়া তাহাব দাঁড়াইল। কিশোরী জাকের তপ্ত ললাট স্পর্শ করিয়া ডাকিল, “জাক, জাক,—দেখ, চেয়ে দেখ, আমি এসেছি, আমি—সেসিল!”

সেসিল। সত্যই সেসিল! সত্যত সে আসিয়াছে। জাক চোখ মেলিল। এই যে, সেই স্বন্দর মুখখান,— শুধু অক্ষয় কৃষ্ণায় ইয়ং স্লান! মূহু হাসিয়া জাক আপনার দুই হাত বাড়িয়া দিল। দুই হাত দিয়া সে সেসিলের কণ্ঠ বেঁধন করিল। আঃ, সেই কোমল স্পর্শ,—কি মধুর, কি আশামেব!

দীর্ঘ ধাবে সেসিলের মুখ আপনার মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া মুহূর্ত্তে জাক ডাকিল, “সেসিল—”

“কেন জাক?”

স্তব্দ দৃষ্টিতে জাক কিস্তক্ষণ ধরিয়া সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল; পবে আবার দীর্ঘ ধাবে ডাকিল, “সোসল—”

“কি বলছ, জাক? বল—”

“এখনও তুমি আমার ভালবাসি?”

“বাসি জাক, বড় ভালবাসি। তোমার ছাড়া আর কাকেও কখনও ভালবাসিনি আমি—কাকেও না।”

মৃত্যুর কর-স্পর্শে মমতা-হীন কঠিন এই বোগ-কাতব গৃহে এমন মধুর স্বব পূর্বে আর কখনও ধ্বনিত হয় নাই। ভালবাসি! জীবনের শেষ সোমা-বোথায় আসিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহার কাণে এই শব্দটুকু কি বিচিত্র মাধুরী যুক্ত করিয়া তুলে!

“তুমি এসেছ সেসিল,—আমায় দেখতে এসেছ? আমায় তুমি এত ভালবাসি? আর তবে আমার কোন দ্রুত নেই, কোন অভাব না! এখন আমি হাসি-মুখে মরতে পারব।”

ডাক্তার বিভাল কহিলেন, “মরবে কেন? ছি, ও কি কথা বলছ, জাক? ভয় কি? তুমি মেরে উঠবে।

আমাদের সেবার তুমি মেরে উঠবে। তোমার জ্বর এখন নেই; স্বাস্থ্য তুমি ভালই আছ, জাক, মুখখানিও বেশ দেখাচ্ছে!”

সত্যই আত্মজাকের মুখে স্বাস্থ্যের একটা উজ্জ্বল আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, অনেকখানি পাণ্ডুতা ঘুচিয়া গিয়াছিল! কিন্তু হাস, নিবিবাব পূর্বে মাটির দীপ এমনই উজ্জ্বলভাবে মুহূর্ত্তের ভগ্ন জলিয়া উঠে! অন্ত বাইবার ঠিক পূর্বে মুহূর্ত্তে স্বর্ধ্য উদয়-কালের মতই বস্তু কিরণে বাণিয়া উঠে—প্রভাতের তাব আকাশের গাথ মিলাইয়া বাইবার পূর্নক্ষণে এমনই ভক্তহাস ভরিয়া উঠে।

জাক আপনার মুখের উপর সেসিলের হাত চাপিয়া বাগিল—সেসিলের মুখের দিকে আবার কিস্তক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জাক কহিল, “আমাব জীবনে যা-কিছু অভাব ছিল, তুমিই তা পূর্ণ করবে। তুমি আমার কে, তা জান, সেসিল? তুমি আমার বন্ধু, আমার ভগ্নী, আমার স্ত্রী, আমার বাপ, আমার মা—এক কথায় আমার সর্বস্ব।”

কিন্তু এ আনন্দ-ছোঁচি সহসা স্লান হইয়া গেল। সেসিলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই জাকের চক্ষু মুন্ডিয়া আসিল। তাহাব বিবর্ণ মুখের উপর মৃত্যুব ছাদ পড়িবারে নামিয়া আসিতেছিল; সেসিল তাহা লক্ষ্য করিল। ডাক্তার বিভালের দিকে চাহিয়া সে ডাকিল, দাদা মশায়—”

“হুপ!”

সেসিল নিষেধ মানিল না, আবার ডাকিল, “জাক—”

ধীর্ঘে অতি ধীর্ঘে জাকের মৌট নাড়িল, মুদিত নয়ন-পল্লব একশব্দ শুধু কাঁপিয়া উঠিল। জাক কথা কহিবার চেষ্টা করিল—কথা বাচিব হইল না; মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল, শুধু একটা বড় রকমের নিশ্বাস করিয়া পড়িল।

এমন সময় বাহিরে একটা কলবব উঠিল। “দাও, দাও, যেকো দাও—” নারী-কণ্ঠে মিনতির সে এক করুণ স্বব। এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মত বেগে দুইজন স্ত্রীলোক সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। ইদা ও মাদাম বেলসেয়ার। মঘন নিশ্বাসে ইদা কহিল, “কৈ—কৈ—আমার জাক কৈ সে?”

মাদাম বেলসেয়ার কহিল, “এস—দেখবে বৈ কি! এমন মার পেটেও এমন ছেলে জন্মায় গা!”

ইদা আসিয়া জাকের শব্দের সম্মুখে দাঁড়াইল। নিস্তব্ধ স্বব। জাকের বুকের উপর মুখ ঢাকিয়া সেসিল শুধু নীরবে রোদন করিতেছিল। ডাক্তার বিভাল নিশ্চল জড়প্ত-লব মত জাকের মুখের পানে চাহিয়া পার্শ্বে

দাঁড়াইয়া ছিলেন ইদা ডাকল, “জাক,—বাবা  
আমাব—”

ডাক্তার রিভাল চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, কর্হলেন,  
“চূপ—”

এই জাক! ইদার অত সাধেব, অশ্রু আদরের  
জাক! এমন বিবর্ণ মলিন মুখ, নিঃশব্দ দেহ! হাত  
এলাইয়া পড়িয়াছে—জীবনের চিহ্নও যে দেখা  
যায় না!

কৈ! নিশ্বাসও পড়ে না ত! তবে—তবে কি  
জাক নাই? ইদার প্রাণে কাঁপিয়া উঠিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, “জাক, বাহু আমার, দেখ, চেয়ে  
দেখ, মা এসেছে—তোমার মা”—

ইদা কম্পিত স্বরে কর্হল, “একবার চেয়ে দেখ, জাক  
—আমি এসেছি, তোমার মা, পাষাণী মা—”

কিস্ত কে সাড়া দিবে?

ডাক্তাবেব দিকে চাহিয়া রুদ্ধ শ্বাসে ইদা কর্হল, “তবে  
কি ওগো, বাহা আমার নেই—সর্বনাশ হয়ে গেছে?”

“না।” ডাক্তাবেব স্বর দৃঢ়, তীব্র! ডাক্তার  
করিলেন, সর্বনাশ নয়, কডায়-গুণ্ডায় তোমার পাওনা  
চুকিয়ে দিয়ে সে আজ ছুটি নিয়েছে, তার সব যাতনার  
শেষ হয়ে গেছে।”

সমাপ্ত

# সোনার কাঠি

উপন্যাস

( দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে মুদ্রিত )

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

## দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

সোনার কাঠির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ছয়মাসে অর্থাৎ তিন মাস পূর্বে প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। এতিনমাস বহু তাগিদ পাইয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণ সত্ত্বর প্রকাশের জন্য। কিন্তু অবসরের অভাবে ছাপাইতে পারি নাই, এজন্য ক্ষমা চাহিতেছি।

এ সংস্করণে কয়েক জায়গায় বচনাব একটু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছি।

ছয়মাসে এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ শেষ হইয়াছে, ইহাতে আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। আশা করি, এ সংস্করণের প্রতিও পাঠক-পাঠিকা সেই অনুবাহ দেখাইয়া আমাকে সত্যার্থ করিবেন।

১৭, মোহনবাগান বো

কলিকাতা, ১২ই ফাল্গুন, ১৩২৯।

পরম প্রীতিভাজন বন্ধু

শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ

উদার চরিতেষু

ভাই গজেন্দ্র

জানিনা কি সোনার কাঠির পরশ আমার প্রাণে বুলিয়ে দিয়েছে। তোমার স্নেহ, তোমার প্রীতি—জীবনে আমার মস্ত লাভ। তোমার স্নেহের গভীরতা মধ্যে মধ্যে প্রতি পলে আমি অনুভব করি। আমার এ তুচ্ছ বইখানি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। যত তুচ্ছই হোক, তোমার হাতে এ-উপহারের অনাদব হবে না, এ আমি বেশ জানি।

১৭, মোহনবাগান বো

কলিকাতা, ৩রা আষাঢ়, ১৩২৯

প্রীতিমুগ্ধ

সৌরীন্দ্র

"It is the mass of actions, their weight their sum  
that constitutes the value of a human being."

Anatole France.

# সোনার কার্টি

পৌষ মাসের বাড়ি। তখন প্রায় দশটা বাজিয়াছে। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া টু-সীটার মোটর-কার ইকাইয়া প্রণব কলিকাতায় ফিরিতেছিল। বরাহনগরে পালপাড়ার কাছে আসিয়া হঠাৎ গাড়ী বন্ধ হইয়া গেল। প্রণব চিন্তিতভাবে গাড়ী হইতে নামিয়া এদা-ওদা দেখিয়া পরখ করিয়া বুঝিল, গাড়ীর কার্বেটে ঘুলা ঢুকিয়াছে। পাইপ খুলিয়া ময়লা সাফ করিয়া আবার গাড়ীতে বসিয়া যেমন ষ্টার্ট দিবে, অমনি বাস্তার বাঁ দিক হইতে একটি স্ত্রীলোক ছুটিয়া তাহার গাড়ীর কাছে আসিয়া কাদিয়া পাড়িল, বলিল, —আমায় একা করুন।

প্রণব অবাক হইয়া গেল। একি সে স্বপ্ন দেখিতেছে? বড় বড় ঘন দেবদাক গাছের পাতার অন্তরাল ভেদ করিয়া ছোয়াঁয়ার মত আলো পথে লুটাইয়া পড়িয়াছিল—আকাশ নিম্নল, কোথাও এণ্টুকু দৌয়াব চিহ্ন নাই। সে আলোয় স্ত্রীলোকটিকে দেখিয়া প্রণব স্পষ্ট বুঝিল, নাতান বয়স অল্প। সমস্ত শরীর কাপেড ঢাকা থাকিলেও তাতেব যেটুকু দেখা যািতেছে, সেটুকু হইতে ইহাও বুঝিল, স্ত্রীলোকটির বং বেশ ফবশা এবং ফরশা তাতে পাঁচ গাছি কবিতা সোনার চুড়ি আছে।

প্রণব প্রথমটা এমন বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। তাহা দেখিয়া স্ত্রীলোকটি আন্ত স্ববে বলিল,—দয়া কবে আমাচে বাঁচান। এই গাড়ীতে করে আমায় সঙ্গে নিয়ে চলুন।

কথাটা শেষ করিয়াই বমণী গাড়ীতে চড়বার অল্প-মতিটুকু পাইবার জন্য এমন কাতর দৃষ্টিতে প্রণবের দিকে চাহিল যে, প্রণব কথা বলিবার আব অবসর পাইল না। সে একেবারে গাড়ীর বাঁ দিক বুসিয়া দিল। বন্দীও অমনি ভাবত পদে উঠিয়া প্রণবের পাশে বসিয়া পাড়িল। প্রণব মন্ত-চালিতের মত গাড়ী চালাইয়া দিল।

বাড়ির স্ত্রুততা ভেদ করিয়া গাড়ী আসিয়া কলিকাতায় পৌছিল; কলিকাতায় পৌছিয়াও প্রণব কোথায় যাইবে, বমণীকে কোথায় নামাইতে হইবে, এ সব কথা ভুলিতে একেবারেই ভুলিয়া গেল। সে কেমন স্বপ্ন-বিস্ময়ভাবে গাড়ী ছুটাইয়া সোজা চলিল; গাড়ী ছুটাইয়া ক্রমে সাকুলার রোড ধরিয়া খিদিরপুরের পাশ দিয়া গঙ্গাব ধাবে আসিয়া পৌছিল। হুই এক চক্রে ঘুরিবার পর প্রণবের হঠাৎ মনে হইল, তাই তো, এ সে কি করিতেছে! বমণীকে লইয়া পাগলেব মত পথে পথে ঘুরিয়া মারিতেছে

কেন। সে তখন গঙ্গার ধাবে একটা জায়গায় গাড়ী থামাইল।

বমণী এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই! গাড়ী থামাইয়া প্রণব বমণীর মুখের পানে চাহিল,—সে মুখখানি বড় স্নানব, সে চোখে সহায়-প্রার্থিনীর কি যে আকুল অধীর নব।

প্রণব বলিল,—আপনাকে কোথায় নামিয়ে দিতে হবে, বলুন দিক?

বমণী অনেক কষ্টে ছবাব দিল; বলিল,—আমায় নামিয়ে দেবেন?

প্রণব কহিল,—হাঁ, আপনি কোথায় যেতে চান, বলুন? আমি আপনাকে বেথে আসবো!

কিছুক্ষণ ধরিয়া বমণীর মুখে কোন কথা ফুটিল না। শুণ মান নয়নে কাতর দৃষ্টি লইয়া সে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল।

সে ভাব দেখিয়া প্রণব ভাবিল, বমণী উন্মাদিনী? না, কি...? প্রণব বিপদে পড়িল, তাইতো—

সহসা বমণী কথা কহিল। সে বলিল,—আমার তো কোথাও আশ্রয় নেই।

বমণীর কণ্ঠস্বরে এমন দারুণ হতাশা করিয়া পড়িল যে প্রণবের মনে সে স্বব গিয়া কাঁটার মত বাঁধল।

প্রণব অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল। একি বোঝা তাহার ঘাড়ে আসিয়া চাপিল! বমণীর অসহায়তায় মনে করুণা জাগিলেও এই একান্ত নিকপায়তার মধ্যে পড়িয়া বিরক্তিও যে প্রণবের একেবারে ধরে নাই, এমন নয়। কে এ বমণী? কাতর কন্ঠা? কাতরই বা স্ত্রী? এ দায় ঘাড় করিয়া শেষে তাকে আদালতে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে নাকি! আদালত তো পবের কথা, এখন এই রাত্রে সে ইহাকে লইয়া কি করিবে! গৃহে সহসা ইহাকে লইয়া যাঁহতে সাহস হয় না। অথচ পথেও এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব! সীয়ারিং হুইলে মাথা বাগিয়া প্রণব ভাবিতে বসিল।

ভাবিয়াই কি ছাই কুল পাওয়া যায়! কি দারুণ রহস্ত এই বমণীর চতুর্দিকে কি জাল বিস্তার করিয়া আছে, কে জানে! তাইতো! এ নারী চরিত্রহীন নয় তো? হয়তো কুল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, তার পর বাহাদের চক্রান্তে কুল ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহার ইহাকে পথে ফেলিয়া পলাইয়াছে...?



কিন্তু ঐ জনহীন পথে সে আসিল কি করিয়া! এই রাজ্বে!—তার উপর এই বেশ,—ঐ মুখ—প্রণব মহা-সমস্তায় পড়িল। না, কুলত্যাগিনীর সে কুটিল ভাব ইহার কথার স্বরে বা দৃষ্টির ভঙ্গীতে কৈ প্রকাশ পায় না তো!

রমণী বলিল,—আপনি কি ভাবছেন?

আশ্চর্য! প্রণব চমকিয়া নাবীর পানে চাহিল। নারী এ বলে কি? কি ভাবিতেছি? কি ভাবিতেছি—রমণী তাই সত্যই বলিতেছে না?

প্রণব অত্যন্ত চিন্তাকুলভাবে কহিল,—আপনি যে আমাকে বিপদে ফেল্লেন দেখি। আপনি বলছেন, আপনার কোন আশ্রয় নেই, অথচ—আচ্ছা, আপনি কাগে যেখানে ছিলেন, সেখানে ফিরে যেতে পারেন না?

—না—না। রমণী সবল কণ্ঠে বলিল—কিছুতেই না।

প্রণব বলিল,—তাইতো,—তা হলে কি করি?

রমণী কহিল,—আপনার বাড়ীতে দাসীদের কাছে না হয় আজ বাঙালি মত আশ্রয় দেবেন। তারপর কাল সকালে কোথাও চলে যাবো।

দাসীর কাছে। না, তাহাও হইতে পারে না। প্রণব বলিল,—সে হয় না। তবে, কালই বা কোথায় যাবেন, শুনি?

রমণী সে কথাই জবাব না দিয়া করুণ স্বরে কহিল,—আপনাকে অনর্থক তাহলে আর বিপন্ন কবি কেন! আমার জন্মেই আপনি বাড়ী যেতে পারছেন না,—আমি বুঝি। বেশ, আপনি বাড়ী যান। আমি এখানেই নেমে যাচ্ছি,—তারপর আনার অদৃষ্টে যা আছে, হবে'খন। কথাটা বলিয়াই রমণী গাড়ী হইতে নামবার জগা উড়ত হইল।

প্রণব বাধা দিয়া বলিল,—সে হতেই পারে না। এই রাজ্বে পথে আপনাকে অসহায়ভাবে ছেড়ে দেবো, এত বড় নরহত্য আমি নই।

—তাহলে এমান গাড়ীতে বসেই বাজিটা কাটিয়ে দেবেন?

—তা ছাড়া উপায়?

—তারপর রাত কেটে যাবে, সকাল হবে,—তখন কি করবেন?

সত্য, সেও এক কঠিন সমস্যা! না, প্রণব আর ভাবিতে পারে না। সে বলিল,—তবে এক কাজ করা যাক, গাড়ী কবে খানিক ঘোরা যাক—দেখি, ঘুরতে ঘুরতে যদি কোন উপায় ঠিক করতে পারি। কিন্তু, আপনি যে শীতে কাপছেন! দাঁড়ান, তার ব্যবস্থা আগে করি,—বলিয়া প্রণব উঠিয়া আপনার ওভার-কোটটা খুলিয়া রমণীকে বলিল,—আপনি এইটে পরে বন্ধন দেখি। যদিও গায়ে বড় হবে, তবু শীতটা কতক কাটিবে!

রমণী মুগ্ধ হাসিয়া বলিল,—আর আপনার শীত কবুবে না?

প্রণব বলিল,—কিছু না। আমার গায়ে গরম কোট রয়েছে। আর আপনার গায়ে কিছুই নেই। পরণে ঐ সাদা কাপড়টুকু আর একটা সাদা সেমিজ।

রমণী বলিল,—না, না, আমার গায়ে একটা গরম গেঞ্জি আছে, আর সেমিজটাও সাদা নয়, গরম ফ্রান্সের।

প্রণব বলিল,—তা হোক, তবু আপনাকে এ ওভার-কোট গায়ে দিতে হ'বে। আমার একখাটুকু আপনি রাখতে পারেন না?

রমণী বলিল,—সে কি কথা! আপনি আমাকে কত বড় বিপদ থেকে যে আশ্রয় উদ্ধার করেছেন! আমার যে আপনার পায়ে আঙুল বিকিয়ে থাকা উচিত, আর এ সামান্য কথাটুকু আমি রক্ষা করবো না! আমাকে এত বড় বেহমান্ন দাবেন না।

রমণী ও-ও-কোট গায়ে দিয়া বসিলে প্রণব আবার গাড়ী ছুটাইয়া দিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে এমন হৈয়ালির মত মনে হইতেছিল,—এই অপরিচিতা নারী—এ কে? কথাবাত্তির ধরণ দেখিয়া পদ্ধানশীল ঘরের নিতান্ত অসংজ্ঞিতা সরমকৃষ্টিতা মেয়ে বলিয়াও মনে হয় না—বৎ একটু প্রগল্ভা! অথচ মুখ-চোখ দেখিয়া ভ্রমের গভীর বাতব হইতে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ঘুরিয়া ফ্রান্স হইয়া প্রণব ভাবিল, আর তো ঘোরা যায় না। গৃহেই ইতাকে লইয়া যাওয়া যাক। না হয়—চট্, কারিয়া অমানি একটা কথা মনে জাগিল।

ভাবানীপুর্বে প্রণবের বন্ধু অচলের বাড়ী। বাড়ীতে সে ও তাহার স্ত্রী—দুটি মাত্র প্রাণী। তাহার বাড়ীতে আজিকার বাজিটুকুর মত ইতাকে রাখিয়া আসিবে। তারপর কাল যা হয় পরে না হয় ভাবিয়া স্থির করা যাইবে। অচলকে বলিবে, রমণী তাহার আত্মীয়... আসল কথাটা এখন নাই বা ভাবিল!

তখন সে নারীকে বলিল,—তার চেয়ে আমার এক বন্ধু বাড়ীতে আপনাকে বেখে আসি, চলুন। কোন বিশেষ কারণে আমার বাড়ীতে আজ নিয়ে যেতে পারলুম না। কাল আপনার সঙ্গে দেখা করে একটা উপায় যা-হোক করবো—তবে সেখানে কি পারচয় দেবো, বলুন তো?

—বলবেন, পথ থেকে এক তুর্ভাগিনীকে কুড়িয়ে এনেচেন।

প্রণব একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—না, না, সে হয় না। আপনি বোঝেন না, লোকের মন পাঁচটা বাজে গল্পের সৃষ্টি করে একটা কুৎসা বটাতে পারে—তাতে ক্ষাত কিছু না হোক, আপনার অপমান হতে পারে।

—আমার আবার অপমান! নারীর কঠিন হৃদয়ে  
আবার তেমনি হতাশা, তেমনি বিষাদ।

প্রণব বলিল,—বসবো'খন, আমার সম্পর্কে ভয়ী হন  
আপনি—বিপদে পড়েছেন,—আজ এইখানে থাকবেন,  
কাল আমাদের ওখানে সকালে নিয়ে যাবো। কেমন?

—কিন্তু...

প্রণব বলিল,—আপনি যেখানে আজ বাড়িটা নির্ভয়ে  
থাকতে পারবেন। তাহা ছাড়া মাত্র প্রাণী—স্বামী আব  
স্ত্রী।

রমণী বলিল,—আপনার বাড়িতে একটু ঠাণ্ডা দিতে  
পারলেই ভালো হতো। আপনার স্ত্রীর ভয়ে বুক নিয়ে  
যাচ্ছেন না?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—স্ত্রী থাকলে তবে তো ভয়!

রমণী একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিল,—কেন, আপনার  
স্ত্রী...?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—এখানে এসে জুটে পারেন  
নি!

—আপনার বিবাহ হয় নি, তা হলে?

—না।

গাড়ী একদিকে ভাঙা পথে পৌঁছিয়াছিল। স্ত্রী  
পথেব পাশে একদিকে গৃহের দ্বারে আঘাত করিয়া বন্ধকে  
ভাঙিয়া তুলিতে ভিতর হইতে সাড়া আসিল,—ঘাই।

প্রণব তখন বলিল,—ভালো কথা, আপনার নামটা  
জানা দরকার তো—না হলে যে মুশ্কেল পড়বে।

গা হইতে ওড়ান-কোট খুলিয়া প্রণবের হাতে দিয়া  
রমণী কহিল,—আমার নাম? বলিয়া একটু খামিল,  
পবে বলিল,—আপনার কাছে গোপন করবো না, আমার  
নাম প্রীতিসংগী।

—বেশ, জানা হইলো। কাল এসে আমি আপনাকে  
নিয়ে যাবো তাহলে, কেমন?

বন্ধু আসিয়া বলিল,—কি হে, এই রাতে ব্যাপার  
কি?

প্রণব বলিল,—ইনি আমার এক আত্মীয়, সম্পর্কে  
বোন হন। বড় বিপদে পড়েছেন। এইখানেই এঁদের  
বাড়ী। এঁকে আজ রাতের মত আশ্রয় দাও। কাল  
আমি আমাদের ওখানে এঁকে নিয়ে যাবো। তার পর  
রমণীর দিকে চাহিয়া প্রণব বলিল,—আজ রাতটা তুমি  
এখানেই তাহলে থাকো, প্রীতি। তারপর কাল আমি  
তোমায় নিয়ে যাবো।

রমণীকে গাড়ী হইতে নামাইয়া উপবে পাঠাইয়া  
অচল বলিল,—তুমি চলো যে প্রণব,—একটু বসবে  
না?

—না ভাই, ভারী ব্যস্ত। মা কত ভাবছেন, তাঁকে  
গয়ে খবর দিতে হবে আবার। তারপর কাল সকালেই

আসি তো। বলিয়া প্রণব ব্যস্ত হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া  
বসিয়া গাড়ী ছুটাইল,—বাড়ীর পথে।

অচল দ্বার বন্ধ করিয়া ভাবিল, ব্যাপার কি! প্রণব  
অমন বিদ্যুতের মত আসিয়া বিদ্যুতের মতই অন্তর্হিত  
হইয়া গেল। অথচ বিপদটা কি, তাহাও জানা  
গেল না! সঙ্গে এই কিশোরী! প্রণব বলিল, বিপদ  
আত্মীয়!

প্রণব বেশ বড় ঘরের ছেলে। কলিকাতায় স্বামীপুত্রে  
মস্ত বাড়ী, অগাধ পয়সা। তাহার দুই ভাই, প্রণব  
বড়, ছোটব নাম শশাঙ্ক। প্রণবের বাপ নাই। বিধবা  
মা প্রণব আর শশাঙ্ককে লইয়া সে-বাড়ীতে বাস করেন।  
তা-ছাড়া জাতিকুটুম্ব-দলে বাড়ীখান ভরিয়া আছে।

প্রণব এখনও বিবাহ কবে নাই। তাহার বয়স  
চব্বিশ-পঁচিশ বৎসর। খেয়ালী মানুষ। এম-এ পাশ  
করিবার পর ছবি আঁকিবাব নেশা তাহাকে পাইয়া  
বসিল। আট স্কুলে দুই বৎসর কাটাইয়া সে এক ষ্টুডিও  
খুলিয়া ফেলিল। প্রথম প্রথম ল্যাণ্ডস্কেপ আঁকিয়া  
হাত মজা করিয়া পরে সে নব নারীর চিত্র-বাস্তব বিচিত্র  
বিকাশ ছবিব পটে রঙাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার  
হাতে আঁকা বাঙালী-ঘরের বিস্তর ছবি মাসিক-পত্রিকার  
পৃষ্ঠে চড়িয়া লোকের ঘরে ঘরে প্রশংসা পুষ্পাঞ্জলি অর্জন  
করিতে লাগিল। দুই-চারিটা এককিংশনে তাহার  
আঁকা “ভিখারী বালক,” “বঙ্গবধু,” “কুলশয্যা” প্রভৃতি  
ছবিগুলি বেশ চড়া দরে বিক্রয় হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে  
চিত্রকবও সোনার পদক এবং দশঃশ্রী-নাভে বসিত  
রহিল না।

এখন সে স্ত্র্যচর্যের ওদিকে গঙ্গার ধারে মস্ত এক  
বাগান-বাড়ী কিনিয়া তাহাতে ষ্টুডিও খুলিয়াছে। পথ  
হইতে যত দূর-দুঃখীর ছেলে-মেয়েদের পয়সা দিয়া  
সেখানে লইয়া যায় এবং তাহাদের মডেল করিয়া ছবি  
আঁকে। বাস্তবের উপর কল্পনার তুলি ব্লাইয়া যে-সব  
মূর্তি সে এখন ছবিব পটে আঁকিয়া বাস্তব করে, তাহা  
জীবন্তের চেয়েও প্রাণম্পর্শী হয়। এই ছবি আঁকার  
ব্যাপারে সে এখন এমনি মাতুরা উঠিয়াছে যে, সকালে  
মোটবে করিয়া ষ্টুডিওতে ছুটিয়া আসে। মার নিতান্ত  
সাধ, মার সামনে বসিয়া আহার করিতে হইবে, তাই  
দুপুর বেলায় বাড়ী আসিয়া স্নান-আহার সারিতেই হয়;  
তারপর স্নানাহার সারিয়া আবার সে গাড়ীতে চড়িয়া  
ষ্টুডিওতে ছোটে। মা কাদিয়া কাটিয়া অনর্থ করেন,—  
শরীর থাকবে কেন রে! তা প্রণব সে কথা হাসিয়া  
উড়াইয়া দেয়।

তাছাড়া মার দুঃখের আরো কারণ ছিল। মা প্রায়

বলিতেন,—বিষে কব্ব বাবা, তোদের দু'টির বিষে দিখে আমি নিশ্চিন্ত হই। আর এ শূত্র পুরীতে থাকতে পারি না! প্রণব হাসিয়া বলে,—বিষে করবার সময় কোথায় মা? বিষে করলে বো নিয়েই মেতে থাকতে হবে যে! আর আমার ছবিগুলি মলিন চোখে আমার পানে চেয়ে চেয়ে নিরাশায় স্তব্ধ হয়ে মরে যাবে।

মা বলিলেন,—শোনো কথা! ছবি আবার মবে যায় কখনো? বিষে কবলে নাকি আবার ছবি আঁকা যায় না! শোন, আমার কথা শোন, দিয়ে করে তুই বো এনে দে দিকি, আমি বলছি, বো আমাব কাছে থাকবে, আর তুই তোর ছবি নিয়ে থাকিস্। আমি কোন কথা বলবো না।

প্রণব আবার হাসিয়া বলিল,—সে তার দাবী ছাড়বে কেন মা? বো তর্জন করে বলবে, বিষে কবে আনলে, আর আমার ছেড়ে ছবি নিয়ে থাকবে? সে হবে না। মাঝে থেকে তোমারো অপবাদ হবে বো-কাঁটকী শাস্তী বলে। তুমি কিছুতেই ছেলে ছেড়ে বোয়ের পক্ষ নিতে পারবে না! তখন তোমার ছেলের যে দুর্বস্থা হবে, তা ভেবে তোমাব ও-সাধ নিবৃত্ত করো।

মা বলিলেন,—তুই বিষে না কবলে শশাঙ্কর বিষেও দিতে পারি না!

প্রণব বলিল,—কেন, সে বিষে ককক না। আমি তাকে খুব সবল মনে বহাল ভবিষ্যতে অনুমতি দিচ্ছি, তা হলেই তোমাদের শাস্ত্রে কোথাও বাগবে না।

মা বলিলেন,—সে কি কখনো হয়! লোককে বলবে কি?

প্রণব বলিল,—লোকের কথায় কি এসে যায়, মা?

মা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—তা হয় না বাবা!

প্রণব বলিল,—আমায় মাপ করো মা, আমি বিষে কববো না, কবতে পারবো না।

মাব চোখে জল আসিল! অঁচলে চোখের জল মুছিয়া মা বলিলেন,—আমার অদৃষ্ট! আমাব অদৃষ্ট স্বপ্ন নেই, না হলে তোমাব এমন সাধ হবে কেন?

শশাঙ্ক কিন্তু প্রণবে পথ অবলম্বন করিতে পারে নাই। বড় লোকের ছেলে মার আদরে প্রায় যেমন হয়, সেও তেমনই হইয়াছে। বি, এ ফেল করিয়া সে পারিষদবর্গ লইয়া প্রথমে গান-বাজনায় উন্মত্ত হইয়া কিছুদিন কাটাইল। তারপর পারিষদবর্গের পরামর্শে প্রকাণ্ড এক মোটরের কারবার খুলিয়া বসিল। সেখানে নানা চরিত্রের নানা মানুষের সংসর্গে আসিয়া বেশ, বাগান-বাড়ী প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদ লইয়া মাতামাতি শুরু করিয়া দিল। দশটা-পাঁচটা কারবারে হাজিরার সময়ে ক্রমে টান ধরিল, মাহিনা-ভোগী কর্মচারীর দল দিব্য দৃষ্টিতে কারবারের ভবিষ্যৎ দেখিয়া নিজেদের ভাগ্য ফিরাইতে মন

দিল। কারবারে লোকের আসা-যাওয়া বাড়ী ভিন্ন কমিল না, তবে বিল আদায় হয় না, ফেরত আসে, অথচ পাওনা-দারের তাড়া বাড়িয়া ওঠে। দুই-চারিটা নালিশও কজু হইল। উকিল-কৌশলির খরচ ছিল না, সে খরচও দেখা দিল। শেষে কারবারের ফটকে আদালতের পেয়াদা আসিয়া একদিন কুপুণ আঁটিয়া দিল। তখন শশাঙ্কর টনক নড়িল। ব্যাঙ্কে চেক কাটিয়া সে কারবাবের দ্বারের তালা খুলিল। দুই তিন মাস আবার সমারোহ করিয়া কারবাব চলিল। কারবারের বন্ধ চাকা পুনরায় যখন বেশ ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন পুরাতন পারিষদবর্গ আসিয়া নূতন আমোদের সংবাদ দিল। নূতন কর্মচারীর হাতে কারবারের ভাব অর্পণ করিয়া শশাঙ্ক অমনি পারিষদবর্গ লইয়া বেশে ও বিবিধ আমোদের বিপণির দিকে মোটর হাঁকাইয়া সবেগে ছুট দিল।

গান-বাজনাব যে সখ বাড়ীতে অর্গন-যন্ত্রে প্রথম সাড়া দিয়াছিল, সে সখ ক্রমশঃ নাবীর চণ্ড-নৃপের মিষ্ট স্বভাবে ও ললিত মন্দির কণ্ঠস্বরে বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিল। সহবের সৌগীন সমাধে তখন মিস্ বোজ ও প্রেমলিনীর বেজায় প্রতিপত্তি। শশাঙ্ক মিস্ বোজেব নৃত্যের ও প্রেমলিনীর সঙ্গীতের রীতিমত সমজ্ঞান-রূপে সৌগীন-সমাজের ললাটে জয়-টীকাব মত জল্জল্ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। চেকের খাতা কলমেব অঁচড়ে শশাঙ্কর সচি বহিয়া ব্যাঙ্কে আসিয়া জমিতে লাগিল। ব্যাঙ্কও হুড়-হুড় করিয়া টাকা চালিয়া সে-সব চেকের মধ্যদা একা করিল।

বাড়ীতে এত-বড় সংবাদ কিন্তু লোকের প্রচ্ছন্ন রহিল। শশাঙ্ক মাকে বলিল, কারবাব ফলাও করিয়া তুলিতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন, তাই এত চেকের খাতা এমন করিয়া চটপট ফুঁরাইয়া বাইতেছে। শশাঙ্ক যেখানে যাক্, যাত্রি এগারোটার মধ্যে গৃহে ফিরিত, স্রার সঙ্গে তাব কোন সম্পর্ক রাখে নাই! প্রণবের কাণে মাঝে মাঝে পারিষদবর্গের সম্বন্ধে দুই-চারিটা মন্তব্য প্রবেশ করিলেও সে ভাবিত, কারবার করিতে গেলে সকল রকমের লোককে হাতে রাখা দরকার। মানুষ যে এমন করিয়া বিগড়াইতে পারে, বিশেষ তাব নিজেব ভাই শশাঙ্ক,—এ সম্বন্ধে তাহার নিজেব মনে তিলকি সংশয় ছিল না। তাই সে কুংসা-বটনাব বারো আনা বাদ দিয়া চাব আনা মাত্র কাণে স্তনিত। এটী জন্মই শশাঙ্ক এমন ভাবে বহিয়া বাইতে পারিয়াছিল। বহিয়া গেলেও মাকে ও দাদাকে শশাঙ্ক সম্বন্ধে চক্ষে দেখিত, সেই জগ স্রা স্পর্শ করিতে বা বাতির কোথাও যাত্রি কাটাইতে তাহাব সাহস হইত না। এমন ভাবে যখন দিন কাটিতেছিল, তখনই একদিন রাত্রি পথ-হারা প্রীতিলাভা আনিয়া প্রণবেব চলন্ত গাড়ীর সম্মুখে সহায়-প্রার্থিনী হইয়া দাঁড়াইল।

অত রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া উপরে উঠিয়া প্রণব দেখে, দালানে তাহার খাবার ঢাকা, আর মা সেই ঢাকা খাবারের কাছে একখানি মাহুর পাতিয়া শুইয়া আছেন। একটা দাসী শুধু পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছে।

মা বলিলেন,—তোমার আজ বড় গাধিও হয়ে গেছে যে শিশু। এমন করলে শরীর থাকবে কেন ?

প্রণব বলিল,—হ্যাঁ, আজ মা একটু রাত হয়ে গেল। বাগান থেকে বেরিয়েছিলাম ঠিক সময়ে; কিন্তু একটু বেড়াবার সখ হল কি না, তাই গঙ্গার ধারে খানিক ঘুরে এলাম।

মা বলিলেন,—এই নীতের রাত্রে ? ঠাণ্ডা লেগে অস্থগ করবে যে।

ভাব-কোটী ভক্ত-আনন্দায় পাটাইয়া রাখিয়া কোট খুলিতে খুলিতে প্রণব বলিল,—এই সব জামা গায়ে থাকতেও যদি ঠাণ্ডা লাগে মা, তাহলে তোমার এই হৃৎকোষ্য ছেলেটিকে আঙুকের বাস্কর মধ্যে এবার থেকে ঢেকে রেখো।

মা উঠিয়া খাবারের ঢাকা খুলিয়া দাসীকে এক গ্লাস জল দিতে বলিলেন। দাসী জল আনতে গেলে মা বলিলেন,—শশী আজ বাড়ী আসবে না, সন্ধ্যার পর মোটর ফিরিয়ে দেছে। ডাইনার বলে গেল, ছোট বাবুর নেমস্তম্ভ আছে কোথায় বরানগরের ওদিকে, এক বন্ধুর বাড়ী। কাগ সকালে ফিরবে। ছাখো দিক কাণ্ড! দেখানোই তোরা বাস্ পায়, বাত্রে বাড়ী না ফিরলে আমার এমন অস্বস্তি লাগে।

প্রণব বলিল,—আমি তো কখনো তোমায় ভাবাই না মা।

মা বলিলেন,—আজ কিন্তু তোর কণ্ঠেও ভারী ভাবনা হাচ্ছিল। শশী ফিরবে না বলে পাঠিয়েছে, এক রকম খপর পেলাম। তার উপর তোর এত দেয়ী হচ্ছে, আমার কিছু ভাষা লাগছিল না।

প্রণব বলিল,—তোমার এখনো ষাওয়া হয়নি ?

মা বলিলেন,—আমি তো কিছু খাণো না। আজ যে একাদশী।

—ও! বলিয়া তাহার জ্ঞান রক্ষিত গবম জল ও সাবান লইয়া হাত-মুখ ধুইয়া তোয়ালেয় মুচিয়া প্রণব আসিয়া একবারে মার কোলের কাছে বসিয়া ছোট শিশুর মতই ডাকিল,—মা, আমার মা—

মা সম্মেহে ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন,—তোরা যত বড়ই হ'না কেন বাবা, আমার কাছে এখনো তোরা সেই ছোটটিই আছিস। আমার কাছে কি আর বড় হ'ব রে কখনো ? তোরা পথে বেরুস্, এখানে-সেখানে বাস্, আমি এখানে সমস্তকণ শিউরে বসে থাকি,

ঠাকুরকে কেবল ডাকি আর বলি, বাছাদের আমার নিরাপদে ফিরিয়ে আনো ঠাকুর! তোরা যে বাবা, আমার কাছে এখনো সেই ছেলে বেলার মতই অসহায়, নেহাৎ ছোটটি আছিস। নয় ?

মার কোলে মাথা রাখিয়া প্রণব চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল।

মার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, ও মুখে কি গভীর স্নেহ, কি অসীম মমতা! এই মার মনের সাধ অপূর্ণ রাখিয়া তাঁর প্রাণে কতখানি সে ব্যথা দিতেছে! বিবাহ করা! সে তো খুব সামান্য কাজই! অথচ মার প্রাণ কি গভীর পরিতৃপ্তিতে না ভরিয়া ওঠে.....!

কিন্তু বিবাহ যে করিবার নয়! তাহার আজন্মের সাধ, এই ছাবর বর্ণে ছবির ভাষায় নারী-চিন্তের নানা ভাবের বিচিত্র দীপা অপরূপ মধুর ভঙ্গীতে ফুটাইয়া তুলবে। জীবনে তাহার আর কোন সাধ নাই! কোথা হইতে কাহাকে বিবাহ করিয়া আনিবে, তাহার সহিত মনেবামল হইবে কি না, কে জানে! এই যে মা আর ছেলের মনে গভীর মিল, নিবিড় বন্ধন,—যৌ আসিয়া যদি এ মিল, এ বন্ধন কাটিয়া দেয়? গৃহে এই বিপুল শান্ত্যুৎ তাহার ক্ষুদ্র হীন অনুযোগের সুরে যদি ভাঙ্গিয়া ফেলে? প্রণব ভাবিল, ভাঙ্গবেই বা কেন? এ শান্তি আরো নিবিড়, আরো সুন্দর কাব্যগু তুলিতে পারে। পাকক, ভাপার ভয়ও যখন আছে, তখন ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিবার চেষ্টাই বা কেন!

ছেলের গালে-মুখে হাত বুলাইয়া মা কহিলেন,—নে, ওঠ দিকি, খেয়ে নে, অনেক বাত হয়ে গেছে। বেশী রাত্রে খেলে অস্থগ করবে।

প্রণব উঠিয়া খাইতে বসিল। নিঃশব্দে সে পাইতোছিল, আর ভাবতেছিল, আজিকার রাত্রে এইমাত্র যে মস্ত ঘটনা ঘটয়া গিয়াছে, তাহার কথা দুর্ভাগিনী প্রীতি! কোথাকার এই অপরাচিত জীব, এ কোথায় আসিয়া পাড়ল! কোথায়ই বা কাল যাইবে! প্রণবের জীবনের পথে এক মহুস্তের জ্ঞান আসিয়া দাঁড়াইয়া কোথায় আবার চিরকালের জ্ঞান অদৃশ্য হইয়া যাইবে। শুধু একটু স্থাতর ক্ষণ আভাস হয় তো লাগিয়া থাকবে! কি তাহার পরিচয়? কোন্ গৃহ-কাননে ছোট্ট ফুলের কুঁড়ির মত এক নব-নির্মল প্রভাতে দেখা দিয়াছে, তারপর ফুলটি যেই ফুটিয়া উঠিল, অমনি কার নির্মল অঙ্গুলি-স্পর্শে একেবারে পথের মধ্যে চিট্কাইয়া পড়িল! এ কি দায়িত্ব কোথা হইতে তাহার ঘাড়ে আসিয়া জুটিল! রাত্রির এই কদমু মাত্র প্রণব যা-একটু নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। কিন্তু কাল? দিনের আলোর সঙ্গে চারিধার যখন লোকের কোলাহলে ভারিয়া উঠিবে, তখন হৃজের হৈয়ালির মত এই তরুণী নারীকে

লইয়া সে কি করিবে? মার কোলেই আনিয়া ফেলিবে? প্রণব ভাবিতে লাগিল।

মা বলিলেন,—কি ভাবচিস্ রে পিছু? এমন চুপ করে থাকিস্ যে! কি আঁকাল আজ, কিছু বলচিস্ না?

প্রণব এক টোক জল খাইয়া বলিল,—এ্যা, না, বিশেষ কিছু এমন আজ আঁকিনি মা। একটা ছবির জমি তৈরী করোচ শুধু। ভাবচি, খুব একটা সুন্দর মেয়ের ছবি আঁকবো—তার নাম দেবো, কৈশর।

মা বলিলেন,—কি করে আঁকার?

প্রণব বলিল,—একটি খুব সুন্দর মেয়ের মুখ চাই মা, তাই ভাবচি।

মা বলিলেন,—যদি বিয়ে করতিস্, তাহলে আমি কেমন একখানি সুন্দর মুখ দিতে পাওতুম।

প্রণব হাসিয়া বলিল,—ক্ষেপেচো মা। যে মুখ কল্পনাতেও আম আনতে পারি না, সেই মুখ তুমি ঘরের কোণ থেকে জোগাড় করে দেবে।

মা ও ছেলের মধ্যে কথাবাতায় কোন আইন বাদ ছিল না। ছেলের মনে যে কথা, যে চিন্তা যেমন উদয় হইত, সরলভাবে অসঙ্কোচেই সে তাহা মার কাছে খুলিয়া বলিত; মাও সানন্দে সগৰ্বে সে কথা শুনিতেন।

প্রণব বলিল,—এটা যদি ঠিক আঁকতে পারি মা, তাহলে আমি আর একখানা মস্ত ছবি আঁকবো। দেবো, সে ছবি এঁকে জগতে অমর কীর্তি বেগে যাব।

মা সাগ্রহে বলিলেন,—কি ছবি?

প্রণব বলিল,—মার ছবি আঁকবো। একেবারে জগদ্ধাত্রীর রূপ!

মা বলিলেন,—তুই তো ভারী ঠাকুর-দেবতা মানিস্, তুই আঁকবি জগদ্ধাত্রীর রূপ?

প্রণব বলিল,—সে জগদ্ধাত্রীর কল্পনা তোমার শাস্ত্র ধারণাও করতে পারে নি, কোনদিন। ও সিদৌ-মিসৌ লটবহরের ধাব ধারে না, আমাব সে জগদ্ধাত্রী।

মা বলিলেন,—কি করে আঁকবি তুই?

প্রণব বলিল,—কেন, এই তো মার মূর্তি! তোমাব এই মুগখানি—মুখে চোখে গভীর স্নেহ, অসীম মমতা উছল পড়চে। এই নিশ্চিন্ত ববভগপ্রদ অপূৰ্ণ মূর্তি! এই রূপ, আর এই তথানি পা, লক্ষ পদ্ম তোমার এই ছুই পায়ে ফুটে আছে, মা!

মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—আর জালাস্বে বাপু, তুই খাম। দেবতার কথায় মস্তব্য।

প্রণব বলিল,—মস্তব্য নয় মা। আর কোন দেবতা মানিনে আমি। আমার এই দেবতা প্রসন্ন থাকলে আমি তোমার খোদু সেই খোদাবও কোন তোয়াক্কা রাখি না।

মা বলিলেন,—জানি, জানি বাপু, তুই খাম। ভোর সব বাড়াবাড়ি। নে, তোকে আর বক্তে হবে না, তুই চুপ করে যা এখন! ক্ষাপা ছেলে ক্ষেপে উঠলো!

প্রণব আবার নিঃশব্দে আপনাব ভাবনার বোঝা খুলিয়া বলিল। মাকে প্রীতির কথা খুলিয়া বলবে?

আবার সে ভাবল, থাক! কাল তাহার পরিচয় লইয়া যদি যথা-স্থানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সব শোলই চুকিয়া গেল! তখন না হয় মাকে বলিবে,—কি করিয়া এক নারীকে তাহার কি বিপদে সে রক্ষা করিয়া ছল।

আর যদি এমনই হয়, সত্যি তাহার কোন আশ্রয় না থাকে? কোথাকার কে,—জানা নাই, শোনা নাই, একেবারে গৃহে আনিয়া ফেলিবে! এ বাড়ীতে পাঁচ রকমের আরো পাঁচজন মানুষ আছে, তাহারা বেচারীকে কি চক্ষে দেখিবে, কে জানে? যদি কেহ একটা রুট বা অপমানের কথা বলিয়া বসে? না, না,—বেচারী! আহা! মনের দুঃখে একেবারেই সে তাহা হইলে মরিয়া যাইবে।

তবে সে তাহাকে অপর কাহারো হিঁস্বা করিয়া দিবে কি? সেই ঠিক। কিন্তু কত দিনের জঙ্ক? হয়তো জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এমন পবের ভিস্মায় তাহাকে থাকিতে হইবে! এ ভাব লইবেই বা কে? লইলেও প্রীতি তাহাতে বাজী হইবে কেন? তার চেয়ে সব কথা খুলিয়া বলিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাহাকে তাহার পূর্বে-কার যথা-স্থানে পাঠানোই সব-চেয়ে ভালো। এককাল নিরাপদে যেখানে কাটাইয়া আসিয়াছে, আজ এমন কি হইল যে সেখানে সে আর ঘিরিতে চায় না? এ মুহূর্তের উত্তেজনা! শুধু আতঙ্ক! আজ রাজ্বে সে উত্তেজনা কমিয়া যাইবে, সে আতঙ্কও মুছেতে পারে! তবে আর কি!

প্রণবের মন অমনি হু-হু করিয়া উঠিল। নিজের হাতে যাহাকে সে রক্ষা করিয়াছে, কালই সে হস্তচ্যুত হইয়া কোথায় ভবিষ্যতের কোন্ অদৃশ্য গহনে চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়া যাইবে,—এ কথাটা মনে উদয় হইবামাত্র মন টনটন করিয়া উঠিল। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনের অতল-তল অবধি গভীর ভাবে তপাইয়া দেখিল।

প্রীতিলাভ সেই ক্ষণিক আলাপে মনের মধ্যে বেশ একটু স্পষ্ট রেখা পাত করিয়াছে! সে একেবারে চোখের বাহিরে চলিয়া যাইবে, হাজার মনে করিলেও তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না—এ কথাটা কাঁটার মত প্রণবের মনে বিধিল। মন টাটাইয়া উঠিল। ভোর করিয়া প্রণব মনকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, একি হীনতা তাহার মনে আজ সাড়া দিয়া উঠিতেছে! প্রীতি—সে

তাহার কে? কেন তাহার জন্ম আজ এ মিথ্যা অমরগ? জীবনের পথে এমন কত লোক যে নিত্য আসিয়া দুই-চারিটা আলাপ করিয়া কোথায় আবার চলিয়া যাঠিহেঁচে, তাহাদের কাহাকেও তো কোনদিন নিবিড় বীধনে বীধিবার আগ্রহ হয় না—তবে এ মেয়েটির জন্মই বা আজ কেন এ আগ্রহ? সে-ও যাক—ঐ সমস্ত পথিকদের মত এষ্ট স্মৃতিটুকুকে ক্ষণিক আঁচড়াইয়া দিয়াই সেই পথে সবিয়া যাক!

কিন্তু সেই মুগথানি, দুই অদীৰ চোখে সেই স্নান ছল-ছল দৃষ্টি! সে যে জুলিবার নয়! প্রণব ভাবিল, জুলিতেই হইবে। কোথাকার মেয়ে, কাহার মেয়ে, কাহার স্ত্রী সে! তাহার কথা এ-ভাবে চিন্তা করাও অজায়। খুব অজায়। প্রণব স্থির করিল, যেমন করিয়া হোক, শ্রীতিসত্তাকে বিদায় দিয়া জীবনের পথ হইতে একেবারে সে তঠাইয়া দিবে। তাহার মন উহার কল্পনা লইয়া ক্ৰমায় থাকুক। সে আর কিছু চাচে না। আর কিছুতে তাহার কোন প্রয়োজন নাই। যবে তাহার এই ভগবন্ত্রী না, স্নেহেব ভাসি শগন্ধ, আব তাহার চিব-সাদেশ ছ'ব কল্পনা—তাহারই তাহার সর্গস্ব! লক্ষ শ্রীতিসত্তা আসিয়া যদি পথে ভিড় করিয়া দাঁড়ায়, তবু সে অনায়াসে তাহাদের পাশ কাটাইয়া নিজের লক্ষ্যপথে চলিয়া যাঠিবে। ভুলস মন তাহার উপর আধিপত্য করিবে? কখনো না। শ্রীতিসত্তা—সে একটা স্বপ্নমাত্র! স্বপ্ন ছাড়া তাহার আর কোন অস্তিত্ব নাই!



সকালে যখন প্রণবের ঘুম ভাঙিল, বেলা তখন আটটা বাজিয়াছে। প্রণব দড়মাড়িয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রে ভালো ঘুম হয় নাই—যটুকু হইয়াছে, স্বপ্নময়। শ্রীতিব সেই স্তম্ভর মুখ, আর সেই মুখের কাঁচি ভরা আকুল স্বর কেবলি তাহার আশে পাশে ঘুরিয়া বাতাসটাকে আক্রান্ত ভারী করিয়া তুলিয়াছে। সায়া বাত্রি অনিদ্রার পর ভোরের দিকে ঘুমটা গাঢ় হইয়া দুই চোখ ছাটয়া ফেলিয়াছিল।

প্রণব উঠিয়া বাহিরে আসিতে মা বলিলেন,—তোমার চা দিয়ে যাক এটাণব?

প্রণব বলিল,—এত বেলা অবধি ঘুমিয়েছি মা, ডাকোনি আমাকে?

মা বলিলেন,—তোমার ঘরে এসে দেখলুম, তুই অধোরে ঘুচ্ছিস্, তাই ডাকিনি,—অত রাত্রে খেয়ে শুয়েচিস্।

প্রণব বলিল,—তাইতো মা, বড্ড যে দরকারী কাজ ছিল আজ।

মা হাসিয়া বলিলেন,—সেই স্তম্ভর মুখ আঁকা তো? ভারী দরকারী কাজ তোমার,—খাম্! তার চেয়ে বল,

আমি একটি স্তম্ভর মুখ খুঁজে বের করি, তোমার জন্মে। সেটা বেকী দরকারী কাজ।

প্রণব সে কথা কানে না তুলিয়া বসিল,—শুধী ফিরেচে?

মা বলিলেন,—হ্যাঁ। এই আধ ঘণ্টা আগে ফিরে সে চান্ন করতে গেল। কাল সারা বাত ঘুমোতে পার নি, বললে। মুখের বা শ্রী হয়েচে!

প্রণব মুখ-হাত ধুইয়া দালানে একটা ইঞ্জি-চেয়ারে গিয়া বসিল। মা বলিলেন,—তাব জন্মে আমার ভাবনা হয়েছে আজ। সত্যি, কি যে হবে বেড়াচ্ছে, তাও বুঝছি না! কম টাকা তো বার কবেনি ব্যাঙ্ক থেকে!

একটু অগমনস্কভাবে প্রণব শুধু বলিল,—হঁ।

মা বলিলেন,—যে বয়সেব যা। পুরুষ মানুষের যে বয়সে বিয়ে করা উচিত, তোদের এখন সেই বয়স। এখনো ছেল্লো-ছেল্লো কবে বেড়াবি ভুজনে? টাকাব অভাব নেই, মানি—কিন্তু তার একটা সীমা আছে তো। কাছ-কর্ষ নাই করলি—'বনে প কর, না হলে সংসারে মন বস্বে কেন? আমি গেলে সংসার চালাবে কে? চাকর-বামুনের উপর নির্ভর কবে মানুষেব চলে না, সত্যি। তা যদি চলতো, তাহলে লোকে আর সংসার করতো না, মেশেই পড়ে থাকতো।

চায়ের পেয়ালা আসিয়াছিল। প্রণব হাতে করিয়া বলিল,—তা যদি থাকতো মা, তাহলে স্নেহেই থাকতো সকলে। এই বে দেশবাপী দারিদ্র্য হাহাকাহ, এরও কিছু কর্ম্ভিততো। ভাবো দেখ মা, বাঙালীর ছেলেমাত্রেরই এই যে বিয়ে করা একটা মন্ত ব্যাধি আছে, অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে দমাদম্ সব বিয়ে করে বসচে, এর ফলে হয় কি? এক-একটা প্রকাণ্ড পরিবার গড়ে তুলচে, যার ভিত্তে জোর নেই, নেতান পল্কা! বাশ-বাশ ছেলে-পিলে হচ্ছে, তারা না খেয়ে বেগে ভুগে জ্বরজ্বরে হাড়ের বোঝা বয়ে সংসারটাকে বিস্তী কুণ্ঠিত আশান কবে তুলচে, পৃথিবীর সৌন্দর্য-শাস্তি নষ্ট করেচে,—এ কি ভালো, মা?

মা বলিলেন,—বাঙালীর ছেলেগুলো যদি বিয়ে না করে, তাহলে বাঙালী মেয়েগুলোর গতি কি হবে, শুনি? তাবাতো আর মেশে থেকে চাকরি করতে যাবে না!

প্রণব এক চুমুক পান করিয়া চায়ের পেয়ালা নামাইয়া বলিল,—তোমারো মুখে ঐ কথা শুনবো, মা? সম্ভান প্রসব করা আর তাদের খাওয়ানো ছাড়া মেয়েদের আর কোন কাজ নেই? লেখাপড়া শিখুক, গান-বাজনা শিখুক, ছবি আঁকতে শিখুক, লোকের সেবা-শুশ্রূষা করতে শিখুক! পৃথিবীতে কাজের আবার অভাব? দেশের দারিদ্র্য দূর করবে, শিক্ষা দেবে, মনটাকে দরাজ করবে...

মা হাসিয়া বলিলেন,—শিক্ষা কাকে দেবে রে? সবাই যদি আলাদা-আলাদা ঐ সব নিয়ে থাকে, তাহলে দশ বছর বাদে বাঙালীর সংসাবই যে লোপ পাবে। মানুষ আসবে কোথা থেকে?

প্রণব বলিল,—আমি কি তাই বলছি যে কেউ বিয়ে করবে না? বিয়ে করবে—কিন্তু কখন? যখন পুরুষ নিজের পায়ের জোরে দাঁড়াতে পারবে, সংসারের দায়িত্ব বয়বার যোগ্য হবে। উপার্জন করে বুঝবে, চার-পাঁচটা ছেলে-মেয়ে জন্মালে তাদের মুখে অন্ন, পরণে কাপড় আর রোগে ওষুধ দিতে পারবে, তখন বিয়ে করবে। আর যাবা এ-কাজের যোগ্য হবে, তাবাই বিয়ে করবে শুধু। জ্রীলোককে তাব রীতিমত মধ্যাদা দিতে যে পুরুষ সক্ষম, সেই শুধু তাকে বিয়ে কববার যোগ্য—অক্ষম পুরুষের পা-খ্যাংলানি খাবার ভজ নারীর কন্ম হয় নি। পুরুষের বোঝা উচিত, তার দাম নারীর চেয়ে এক পাই বেশী নয়—সে-ও যে, নারীও সে। নারীকে বিয়ে করে তাকে সে কৃতার্থ কবে না, নিজেই বরং কৃতার্থ হয়।

মা হাসিয়া বলিলেন,—নে বাপু, গোর বকৃত্তা রাখ্। তুই ছবি এঁকে বেড়াস—সংসারের কি জানিস? মেয়েদের পুরুষ বৈ গাত নেই। পুরুষ নিগুণ হোক, নির্ধন হোক, মেয়েরা তাদের পানেই চেয়ে থাকবে নিজেদের আশ্রয়ের জন্তে। মেয়েদের বুদ্ধি কম, বলেবও তাদের তেমনি অভাব। বাইরের সঙ্গে লড়াই সে শক্তি কি মেয়েদের আছে রে?

প্রণব সবল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—ভুল মা, এইটি মহা-ভুল। নিকেকে নিয়ে হীন দ্যাখো না মা। বাবা বগন মারা যান, তখন আমবা কত ছোট। তারপর এই তুমিই তো মা, আমাদের দু' ভাইকে মানুষ করেচো, লেখা-পড়া শিখিয়েচো। কৈ, যেটাকে ভুল পথ বলে, সে পথে চলবার দুর্বুদ্ধি আমাদের হয় নি—অথচ তার সুযোগ ছিল কত! তুমি জ্রীলোক হয়েও যে স্নেহ-শাসনের দণ্ড ধরে সিংহাসনে বসে আজ, অনেক পুরুষকেও তেমন দেখি না। তার মাফী দেখ মা, ঐ মিন্তরদেব বাড়ীর শচীনকে। বাপ কড়া শাসন নিয়ে আর মা গভীর স্নেহে ঘিরে শচীনকে মানুষ করে তুপতে পারলেন না। আর তুমি বলো কি না, নারী পুরুষের চেয়ে হীন!

মা বলিলেন,—ভুট খাম্ পিছ। তোরা যে খারাপ হোস্ নি, সে কি আমার গুণে বাবা? সে তোরা ভালো বলেই শুধু। নাহলে সত্যি যদি খারাপ পথে যেতে, আমি কি ঠেকিয়ে রাখতে পারতুম? আমার গণ্ডী তো এই বাড়ীর সদর অবধি—বাড়ীর বাইরে আমার জোর চলে না, নজর চলে না—আমি মেয়ে মানুষ। কিন্তু পুরুষের গণ্ডী ঘব ছেড়ে বাইরে অবধি চলে। তা, ও কথা বাবু—তুই যা বলচিস্, তোর কথাতেই বলি,

তোদের দু' ভাইয়ের জন্ত তিনি যা রেখে গেছেন, তাতে তোদের পরসার অভাব হবে না, তবে তোরা বিয়ে করবি না কেন?

প্রণব বলিল,—আবার সেই কথা আনলে মা! আমি বলছি তো, আমার বিয়ে করা চলবে না। আমি পেয়ালাই মানুষ, বিয়ে করে পরের মেয়ে এনে তাকে শেখ অশক্ত-অনাদর করবো কি! সে বেচারীর নিশ্বাসে তোমাকেও হয়তো শবে পুত্র-শোক পেতে হবে।

মা বলিলেন,—ঘাট্, ঘাট্! খাম্ বাপু, তোকে আর বিয়ে করতে বগবো না কখনো। আমার অপরাধ হয়েছে। মার স্বর শেষ দিকটার অশ্রুমান্নে ভারী হইয়া উঠিল।

প্রণব বলিল,—শশী বিয়ে করুক না মা, সে বেশ হবে'খন। ওর ছেলে-মেয়ে হবে, আমায় জ্যাঠাবাবু বলে ডাকবে, তাদের কোলে-পিঠে করে আমরা ঠুঁড়িতে নিয়ে যাবো। তাদের ছবি আঁকবো—সে ছাবব নাম দেবো, 'অনন্দ'। সে বেশ হবে...না মা?

মা বলিলেন,—তোরা যেমন শশীকে দিয়ে সাধ মেটাতে ইচ্ছে হচ্ছে, আমি তেমনি তোদের দুজনকে দিয়েই সাধ মেটাতে চাই যে পিত্ত!

প্রণব বলিল,—ঐ তো মা, তোমার দুষ্ট বুদ্ধি!

এমন সময় শশাক্স স্নান সা'রয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়া সে বাসল,—মা, আজ আমাকে একটু সকাল-সকাল খেতে দাও দিক।

মা বলিলেন,—কেন? আবার কোথায় যাবি? এই বললি, কাল সাবা রাত ঘুমাতে পাসনি। খেয়ে-দেয়ে এখন একটু ঘুমা দেখি, ঘবে শুয়ে।

শশাক্স বলিল,—হবে না মা। আজ অফিসে একবার যেতেই হবে। কতকগুলো বড় বড় কাজের ডেলিভারী দিতে হবে—অফিসার সাহেবদের কাজ।

প্রণব বলিল,—কারবার কেমন চলছে রে? নজর রাখচিস্ ঠিক?

শশাক্স বলিল,—রাখচি বৈ কি।

প্রণব বলিল,—তবে যে মা বসছিল, অনেক টাকার চেক কাটচিস্! কেন, এত টাকাব কিসেব দবকার হচ্ছে? বিল আদায় হচ্ছে না, না কি?

শশাক্স একটা চেয়ারে বসিয়া পাড়য়া বলিল,—বিল কি সব সময় ঠিক আদায় হয়? তা ছাড়া কতকগুলো যন্তর আনাতে হলো কি না!

প্রণব বলিল,—যাই করো শশী, কারবারটা নষ্ট করে ফেলো না। লোকের সঙ্গে dealings যেন সর্কদা straight থাকে। আর যত-বড় বিপ্যাসী লোকের উপরই কাজের ভার দাও, নিজের নজর কখনো আল্গা করো না! তাহলে বিপ্যাসী লোককেও অবিশ্বাসী হবার সুযোগ দেবে, এটুকু মনে রেখো!

লেকচার-বিরোধী শশাঙ্কর এ লেকচার তেমন ভালো লাগিল না। মুখে সে শুধু বলিল,—সে তো নিশ্চয়। তারপর মাকে বলিল,—আমাকে খেয়ে নিয়ে শীগ-গির বেরুতে হবে, মা। না বেরুলে নয়। এইটুকু বলিয়া শশাঙ্কর সে স্থান ত্যাগ করিল।

মা বলিলেন,—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, পিছু। ওর এত কি কাজ বেড়ে গেল, বল দেখি? আমি আজ ক'দিন ধরে দেখছি, ও আর আগেকার মত আমার সঙ্গে ছুঁচোর দণ্ডে বেঁধে হয়ে বসে কথা কবে, তাবও ফুরসৎ পায় না। আর তখন বলছিল, ক্রমাগত নাকি চেক কাটচে। একবার তুই গিয়ে দেখে আসিস্ যদি তো ভালো হয়। সে সব নন্দী-ভঙ্গী সঙ্গী জুটেচে, তাদের মাথার চুল ছাঁটার ধরণ দেখে আমার গা কেমন শিউরে ওঠে! যেমন চুলছাঁটা, তেমনি সব পাঞ্জাবি গায়ে! জামার খুল নেমেচে সেই হাঁটুর নীচে অবশি। মাগো, কি কদাকার!

প্রণব বলিল,—আমি তাহলে এখন উঠি মা। ছ' একদিনের মধ্যে ওর অফিসে যাবো'খন। এত টাকার কি বস্তুর এসো, একবার দেখেও আসবো। তবে অল্প ভয় নেই মা, ভেবো না—তোমারি পেটে ও জন্মেচে।

মা একটু উদ্ভিষ্টভাবে বলিলেন,—তাই হোক, বাছা! কারবার ঘুটিয়ে দিয়ে ও না হয় ঘরে বসেই গান-বাজনা করুক! প্রাণ থাকতে তাদের কোন কলঙ্কের কথা যেন কানে না শুনেতে হয়, দোখসু।

প্রণব উঠিল। মা বলিলেন,—কখন ফিরবি?

প্রণব বলিল,—যেমন সময়ে ফিবি।

—৪—

বাহিরে আসিয়া প্রণব ছোট মোটরের পরিবর্তে বড় মোটর লইল; সোফারকে বলিল, সে নিজেই গাড়ী হাঁকাইয়া যাইবে, তাকে প্রয়োজন নাই।

প্রণব স্থির করিয়াছিল, বড় মোটর লইয়া যাওয়াই ঠিক। এই দিনের আশেই একজন অপরিচিতা তরুণীকে সহরের বুকুর উপর দিয়া টু-সাঁটার কাঁবে পাশে বসাইয়া লইয়া আসা ভালো দেখাইবে না। নিজের জন্ম সে ভাবে না, তবে সেই স্ত্রীলোকটির সন্তান রাখা করা তাহার কর্তব্য তো। প্রীতিসত্যকে খাব কাছেই আনিয়া দিবে, স্থির করিয়া সে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

গাড়ী বন্ধন ভবানীপুরে অচলের বাসায় পৌঁছিল, বেলা তখন দশটা।

অচল তখন বাহিরের ঘরে চিন্তাকুলভাবে বসিয়া ছিল; প্রণব আসিতে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া তাকে বসাইল।

অচল বলিল,—মেয়েটিকে প্রণব?

প্রণব প্রথমটা কেমন ড়ড়াইয়া গেল, টট করিয়া ভাব দিতে পারিল না; পরমুহুর্তে সে অপ্রতিভ ভাব কাটাইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—দূর-সম্পর্কে বোন হয়। বিন্দে পড়ে ডাকিয় পাঠিয়েছিল!

অচল বলিল,—হ্যাঁ, আমার জ্বর কাছেও শুনলুম। আমার জ্বর কাছে ডান সব বলেচেন। ওঁর স্বামীর সঙ্গে শত্রুতা করে কে তাঁর নামে ওয়ারেন্ট বার করিয়ে পুলিশে ধরিয়ে দেছে না কি! পাড়ার লোকের সঙ্গে স্বামীর তেমন সম্বন্ধ নেই, ওঁরা একটু ব্রহ্ম ধরণের বলে,—কাজেই তোমাদের ওখানে খাব পাঠিয়ে তোমার আনিবেচেন,—তুমি ওঁকে এখানে নামিয়ে থানায় ওঁর স্বামীর জামিনের চেষ্টায় ছুটে গেছলে ১০০ তা, জামিন পেলো?

প্রণব বলিল,—না।

অচল বলিল,—এই ভবানীপুরের থানাতেই?

প্রণব আর একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল,—না। কোথায় নিয়ে গেছে, এরা তা জানে না।

—উপর?

—দগি। ব'লিয়া প্রণব একটু খামিল; পরে বলিল,—আগে একে আমাদের বাড়ী পৌঁছে দি, তারপর একজন উকিল ধরে সন্ধান নিই। হ্যাঁ, তাহলে আর দেবী করবো না, কাম ভাই ওকে ডেকে দাও।

অচল বলিল,—দেউকে।

অচল উঠিয়া গেলে প্রণব ঘরের মধ্যে অধীতভাবে পাখটারি কাঁবো বেড়াতে লাগিল। সে ভাবিল, প্রীতি তাহা হইলে বেশ একটু গল্প বানাইয়া বলিবে তো। ভাগ্যে সে ও বিষয়ে কোন কথা বলে নাই, তাহা হইলেই গল্পার ফাঁকি চট্ করিয়া অচলের চোখে ধরা পড়িত, আর অচল কি একটা বিত্তী ব্যাপার বলিয়া কাঁবো লইত!

প্রণব তত্কাপোষের উপর শুইয়া পড়িল, ভাবিল, তবে কি গল্পটার মধ্যে সত্যের ইঙ্গিতও আছে? সত্যই কি তাহা ঘটিয়াছে? বেচারার স্বামী ওয়ারেন্টে ধরা পড়িয়া পুলিশের হেফাজতে আছে...

পরমুহুর্তেই সে ভাবিল, গল্পটা যদি আগাগোড়া বানানো হয়? তাহা হইলেও ভয় ঘরের মেয়ে প্রীতি,—সে এই সব ওয়ারেন্ট পুলিশ...এ সব কথাগুলি মাথায় আনিল কেমন করিয়া? ভাবিতে ভাবিতে ব্যাপারটা তাহার মনে অস্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিতে লাগিল। কে এ নারী? কে...?

তারপর সে ভাবিল, সত্যই যদি প্রীতি ভয়ঘরের মেয়ে না হয়? তাহা হইলে পরিচয় না লইয়া নিজের গৃহে যাব পাথের কাছে একেবারে উহাকে দাঁড় করাইবে কি বলিয়া? না,—পরচয় লইবার পূর্বে দাঁড় করানো হইবে না! সে স্থির করিল, প্রীতিকে লইয়া



সে আপাততঃ ঠুঁড়িওতেই যাইবে। সেখানে যাগাতে তাহার কোন অস্তবিধা না হয়, সে বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। ইচ্ছাতে একটু ভাবিবার সময় পাও। যাইবে! চট্ করিয়া এমন কাছ কণিয়া বসিবে না, যাগাতে ভ্রম-বন্ধে মেয়ে হইলে শ্রীতির এতটুকু সম্ভ্রম-হানি ঘটিতে পাবে! আর যদি এমন হয়, সে অতিমান কণিয়া বা ভয় পাইয়া ক্রুদ্ধ স্বামীব ঘব ছাড়িয়া সেই গভীর বাত্রে পথে বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া আবার তাকাকে স্বামীব ঘবেই পৌঁচাইয়া দিবে। বেচারীকে তাহা হইলে আর জন্মের মত সারা জীবনটাকে পোয়াটিকে হইবে না।

অচল আসিয়া বলিল,—উনি স্নান করিতে গেছেন, স্নান হয়ে গেছে। আমার স্ত্রী একটু জল না খাইয়ে ছাড়বেন না, বসলেন। এখন আসচেন।...তা তুমিও কিছু পাও, প্রণব।

—না ভাই, আমার এখন খাবার ফুরসৎ নেই। বুঝাচো, এখন আমার কি ছুটাছুটি করতে হবে। বাড়ীতে এঁকে পৌঁছে দিবে মুখে দুটি ভাত গুঁজে আবার বেরুবা।

অচল বলিল,—আর্টিষ্টব মন্দ শ্রম নয়! তাহলে আব বসনো না। ঐ যে উনি এসেচেন, তুমি তাহলে ওঠো। I wish you good luck.

শ্রীতি সদয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, পিছনে অচলের স্ত্রী অশ্রুপূর্ণের মধ্য দিয়া তাকাকে বিদায় সম্ভাষণ করিতেছিল; প্রণব আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল,—নমস্কার পৌঁছি, কাল আপনি এঁর সম্ভ্রম রক্ষা করে বড় দায়ে বাঁচিয়েছেন। তার জগ্না দয়ান! তারপর শ্রীতির পানে চাহিয়া বলিল,—আপনি আসুন, আর দেরী করবেন না। বলিয়াই সে জিভ্ কাটিল। তাই তো, শ্রীতি বয়স তার চেয়ে ছোট! তাকাকে এই আপনি বলিয়া সম্ভাষণ এ যে ভালো শুনাইল না। কিন্তু তখন আর সামলাইবার উপায় নাই, সে সময়ও নাই! সে আসিয়া গাড়ীতে ঠাঁট দিয়া হুইল ধরিয়া বলিল। শ্রীতিলাতা উঠিয়া গাড়ীর মধ্যে বসিলে গাড়ী চলিল।

—৫—

গাড়ী আসিয়া ঠুঁড়িওতে পৌঁছিলে উভয়ে গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে গেল।

বাংলা ধরণের বাড়ীখানি বাহির হইতে দেখিতে ঠিক ছবির মত। শ্রীতি কাম্পিত বৃকে ঘরের মধ্যে আসিলে প্রণব বলিল,—এই চেয়ারটায় বসুন। শ্রীতি বসিল।

সেখানি মাঝের ঘব; সোফা-কোচে সাজানো। দেও-ঝালেব গায়ে বড়-বড় ছব; প্রাকৃতিক দৃশ্য ও নব-নারীর নানা ভাবের নানা মুখের চিত্র। অনেকগুলি ছবি

প্রণবের নিজের হাতে আঁকা। শ্রীতি বসিলে প্রণব ঘরটার মধ্যে কয়বার পাখচারি করিয়া বেড়াইয়া একটা কোচে বসিয়া পড়িল; বসিয়া শ্রীতির পানে চাহিয়া বলিল,—আজ এবেলায় এখানে থাকতে হলে আপনার কষ্ট হবে। তাই বলছিলুম, কোথায় আপনাকে বেখে এলে আপনি নিরাপদে থাকতে যাবেন, বলুন দিকি!

শ্রীতির প্রাণ শতবিধা উঠিল। এই পরিপাটী সাজানো নিরঞ্জন গৃহের মধ্যে একটু হাঁদ ছাড়িবার অবসর সে যেমন পাইয়াছে, অমান এই প্রশ্ন! কোনমতে সঙ্কোচটাকে ঠোনিয়া কোলয়া অত্যন্ত মিনাতর স্ববে সে বলিল,—কাল বাত্রেব আতঙ্কটুকু আমি এখানে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারি নি। দয়া করে একটু সময় দিন আমাকে। চারিধাবটা একবার ভেবে নি। তারপর...চলেই যাবো আমি। আমার জগ্না আপনাকে বিপন্ন বা দায়গ্রস্ত করে রাখবে না। এটুকু বলিয়াই দুই চোপের উদাস দৃষ্টি লইয়া শ্রীতি ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো একখানা বড় ছবির দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রণবও ভাবনায় পাড়িয়াছিল। এই অপরিচিতা স্মরণীয় তরুণীর কথা কাল বাত্রে কতবারই যে না ভবিয়াছে! ইচ্ছাকে মডেল কাঁচিয়া 'ঠেকশোর' ছ'বখানি আঁকিতে পারিলে কেমন হয়? বেশ হয়। কিন্তু ভদ্রঘরের মতলাকে নিজের একটা খেলার বশবর্তী হইয়া আটকাইয়া রাখতে পাবে না তা। তাকাকে ধরিয়া রাখতে অস্বাভাবিক আছে প্রচুর, অথচ ছাড়িয়া দিবার কথা মনে উদয় হইয়া মাত্র প্রাণটা কেমন হাতাকার করিয়া ওঠে। কিন্তু তাই বলিয়া দায়ধা রাখাও তো চলে না!

প্রণব বলিল,—বেশ, স্বচ্ছন্দ হুঁনি আপনি এখানে থেকে ভেবে-চিন্তে নিতে পারেন। আপনার নিরঞ্জনতা-টুকুও এখানে শুষ হবে না, এ আশ্বাস আপনাকে দিতে পারি।

শ্রীতি একটু শিথিলের সঙ্গিত করিয়া,—আপনার বাড়ীর লোকজন কাকেও দেখেনি না যে!

প্রণব একটু চোঁক গিলিয়া কহিল,—না। এখানে তাঁরা কেউ থাকেন না। তারপর প্রণব আপনার পরিচয় খুলিয়া বলিল। বাড়ীতে মা ও ছোট ভাই। দুই ভাইয়ের কেহই এখনো বিবাহ করে নাই; মা সেজগ্না কত অমুযোগ করেন। ছবি আঁকিবার সুবিধার জগ্না এই বাগান-বাড়টা ছয়মাস হইল, সে কিনিয়াছে। প্রথমে ভাড়া লইয়াছিল, তারপর পছন্দ হইয়া গেল। কাঁচগাটুকু নিরঞ্জন, কোন গোল নাহ। এ-বাড়ীর অধিকাংশ ছবিই তাহার হাতে আঁকা। এখানে থাকে শুধু দেওয়ান, একটা ভৃত্য ও তৃপ্তন মালী। সকালে সে বাগানে আসিয়া ছবি আঁকে, বেলা এগারোটায় বাড়ী যায়,

তারপর আত্মাঙ্গি সারিয়া দুটা-তিনটার সময় আবার আসিয়া এত্রে বাড়ী ফরে।

পবিত্র দিয়া প্রণব শেষে বলিল,—‘দু’দিনের জগ্গে যদি এখনে আপনাকে থাকতে হয়, তাহলে আজই আমি দরওয়ানকে বলে দি, একটা বামুনী আর একটা বী এনে দিচ্।

প্রীতি কি ভাবিতেছিল, চিন্তিত স্ববেই বলিল,—বামুনী? বামুনী কি হবে?

প্রণব বলিল—আপনাকে খেতে-দেতে হবে তো।

প্রীতি বলিল,—নিজেই বামুনী নিজেই আমি রেখে নিতে পারবো’খন। অনর্থক আপনি ও-সব ঝগড়াট কবেন না।

প্রণব বলিল,—স হয় না।

প্রীতি গৌ ধাবয়া বলিল, হঠাৎই হঠবে। এই সামান্য ব্যাপারে অনর্থক দুই দিনের জগ্গ একটা বামুনী আনার কোন প্রয়োজন নাই। তবে বী? নেহাৎ একলা না থাকিতে হয়! আগল্গতিবার জগ্গ তত না হোক, কথা কহিবার জগ্গ মন্দ হইবে না বটে।

প্রণব বলিল,—বেশ, তাই হবে। তারপর একটু শুক থাকিয়া প্রণব আবার বলিল,—দেখুন, আমার নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাইনি বলে’ হয়তো আপনি অপরাধ নিতে পারেন। সেজন্য কাবণটা খুলে বলা আমার পক্ষে দরকার। প্রথমতঃ আপনি একজন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা, দৈবাত বিধানে পাড়ে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপবিত্রিত, এ অবস্থায় আমাদের বাড়ী গেলে তা’বার ঘরের কোতুললা চোখের সামনে আপনি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়বেন, সেটা আপনার বরদাস্ত না হওয়াই সম্ভব। বাড়ীতে যদি শুধু আমরা দুটি ভাই আর আমার মা থাকতুম, তাহলে কোন বিধা না করে কাল বাত্রেই আপনাকে একেবারে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতুম।

প্রীতি বলিল,—এ আপনি খুব ভালো ব্যবস্থাই করেছেন। আমার মনের যে-বকম অবস্থা হয়ে রয়েছে, তাতে আপনাকেও সমস্ত ব্যাপার খুলে-বলবার মত মনের বল এখনো পাঠ নি। সমস্ত কাণ্টা এমনি তর্কায় ঘটে গেছে, আর তা শুনতে এমনি কাল্পনিক গল্পের মত যে আমিও শুভ্রিয়ে সবটুকু ঠিক বলতে পারবো বলে মনে হচ্ছে না। এমন অবস্থায় লোকালয়েব মাঝখানে দাঁড়াতে গেলে আমার মাথা ঘুরে যাবে। সত্য বস্তুতে কি, আমার মনে হচ্ছে, আমার অবস্থা বুঝে ভগবান ঠিক যোগ্য আশ্রয়েই আমাকে এনে ফেলেছেন!

এই অবধি বলিয়া প্রীতি চুপ করিল; চুপ করিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাহিরের পানে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল।

প্রণব বলিল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা কবছিলুম। চমকিয়া প্রণবের পানে ফিরিয়া চাহিয়া প্রীতি বলিল,—কি? বলুন।

প্রণব সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—ভাবানীপুরে ওদের মুখে শুনেছিলুম, আপনি নাকি তাদের বলেছেন, আপনার স্বামীকে কে মিথ্যা ওয়াবেটে পুলিশে দরিয়ে দেছে।

প্রীতির বৃকের মধ্যে রক্তটা ছলং কবিয়া তুলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তেব জগ্গ দুই গাল পাংগু হইয়া গেল। জোর কবিয়া প্রণবের কথায় বাধা দিয়া প্রীতি বলিয়া উঠিল,—না, না! আপনি শুনেছেন সে কথা? মিথ্যা কথা বলে’চ আমি। তাঁরা যে পরিচয় চেয়ে বসুলেন!...স্বামী! আমার স্বামী নেই,—ছিলও না কোন দিন।

প্রণবের দুই চোখ এত সুন্দরী কিশোরীটিকে মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়া ঘিরিয়া ছিল। সে চোখ এখন লজ্জা স্বব করিতেই স্পষ্ট দেখিল, কিশোরীর তুহার-সজ্জা ললাটেব মাঝখানে সীঁখিব সীমায় সিঁদুবেব রক্ত-চুহ নাহ! গিববা? না, সে যে বলিতেছে, স্বামী তাহার ছিলও না কোন দিন। তবে?

প্রণবের সমস্ত মন এই অপরিচিতা ককণীয় জুজের রহস্য জানিবার অঙ্গ অধীব আকুল হইয়া উঠিল। ঐ নিবড় কৃষ্ণ কেশপাশ, ঐ মধুর-সুভ্র গায়া, ঐ রক্ত গোলাপের বর্ণ, ঐ শুভি-সিদ্ধ অনাধর বেষজ্জা, আর ঐ নিখিল অনবজ যৌবনশ্রী তাহাব ভাবনে তর্কায় বৃহচ্চ পুষ্পের মত উদয় হইয়া কি অপরূপ নেশায় তাহাব সমস্ত চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ পুষ্পের ভাবনে অতীত নাই, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট ছায়ায় ঢাকা। প্রণবের মনে হইল, একপালা বিচিত্র রোমাঞ্চেব সব-চোয় বড়ান পৃষ্ঠাখানি কি এক পরম মুহূর্ত্তেব বিশ্ব-গম্ভীর নিপুণ যন্ত্রদাব তাহার চোখের সম্মুখে বাওয়া দিয়াছেন! পৃষ্ঠাখানি যেমন বসালো, তেমনি অপরূপ কৌতুহলে ভরা!

প্রণব বলিল,—আপনি...

বাধা দিয়া প্রীতি বলিল,—হুদিন সব্ব করুন। হুদিন বাদে আপনাকে সব কথা খুলে বলবো, এতটুকু গোপন করবো না, এতটুকু মিছে বলবো না। শুনে আমার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা তখন আপনি করতে চাইবেন, আমি তা মাথা পেতে নেবো।

প্রণবের উপব তন্দরীর এতখানি নির্ভরতা! প্রণব একটু কেমন কুণ্ঠিত হইল। আহা, বেচারা! নিতান্তই বেচারা! বাহার কাছে নিজেই একটু নিরাপত্তা ভাবিতে পারে, এমন আপন-জন এ দুনিয়ায় হয়তো ইহার কেহ নাই! যদি তাই হয়? প্রণব ভাবিল, সেও যে এক সমস্তার কথা! হোক সমস্তা,—মাহুজ জীবনে কে আর কি করিতেছে! শুধু অন্ন-বস্ত্র, বিলাস-খেয়াল, ইহার পিছনে ছোট্ট নামই মাহুজের জীবন-যাত্রা-নির্কাহ /

ইহার উপর কেহ যদি জলারশিপের ফণ খুলিয়া ছই তিন লাখ টাকা দান করিবা বসে তো সে একেবারে মানুষের সমাজ দিগ্‌গজ বনিয়া যায়। প্রণব না হয় এ-সবের পিছনে না ছুটিয়া এই অশ্রয়হীনার অশ্রয়ের জগ এক-খানি নিবাপদ নীড় বাধিয়া দিবে! ইহার জগ এত মাথা-বাখাই বা কেন!

প্রণব বলিল,—বেশ, আপনি এখানে থাকুন। আমি বাজারের একটা ব্যবস্থা করিয়ে দি, আর ঐ আনাই। আপনি বাগ্না-বাগ্না কবে খাওয়া-দাওয়া করুন। আমি আপাততঃ বাড়ী যাচ্ছি, একবার না গেলে নয়,—জানেন তো?

প্রীতি বলিল,—আপনি আবার আজ আসবেন তো একবার?

প্রণব একটু হাসিয়া বলিল,—বলেন যদি, তাহলে আসবো বৈ কি!

তাহাকে আসতে বলায় প্রীতি এই আগ্রহ দেখিয়া প্রণবের মন প্রশস্ত হইল। তাহার তরুণ চিত্তে ইহাতে একটু গর্বেরও উপর হইল। সে বলিল,—দরোয়ান আপনাদের সঙ্গে এখান ঐ আনিয়া দেবে এখন।

প্রীতি বলিল,—আপনার যদি অসুবিধা হয়, তাহলে অবশ্য আসতে বলা --

বাধা দিয়া খুব উৎসাহের সহিত প্রণব বলিল,—না, না, এতে আর অসুবিধা কি। আমার তো আর অজ্ঞ কোন কাজকর্ম নেই—তা-ছাড়া আমি এ খাওয়া-দাওয়া করতেই যা বাড়ীতে ছুপুর-বেলায় একবার যাই। না হলে এইখানেই তো আমার দিনের বেশী সময় কাটে। আর তা না হলেও ভদ্র বলে যখন নিজের পরিচয় দি, তখন আপনার একটা খোজ-খপর নেওয়াও আমার উচিত তো!

প্রণব বাহিরে গিয়া প্রীতির জগ দাসী ও বন্ধনাসির আয়োজন-বন্দোবস্ত করিয়া আবার যখন ভিতরে আসিল, তখন প্রীতি এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া চারদার দেখিয়া বেড়াইতেছে। প্রণবকে দেখিয়া প্রীতি বলিল,—আপনি দ্রিবি বেখেচেন বাড়ীখানকে। নিজেও ছবি আঁকেন কি না—তাঁই বাড়ীটিও সা হয়েচেন, বেশ ছাব!

প্রশংসার কথা প্রণবের মন তত টলিত না, কিন্তু আজ এই মুখের স্বরে এ প্রশংসায় তাহার সমস্ত শরীর বহিয়া পুলকেব একটা হিলোল ছুটিয়া গেল। সে মুহু হাসিয়া মুখ নত করিল।

তারপর ঘরের একদারে একটা অগ্নি দেখিয়া প্রীতি বলিল,—বাজনাও যে রয়েছে। আপনি গাইতে পারেন তাহলে?

প্রণব বলিল,—সামান্য একটু-আধটু চোঁচাই। ছবি আঁকতে-আঁকতে একটু বৈচিত্র্যের দরকার হয় কি না,

তাই এই নির্জন অরণ্যে চোঁচাই—কারো শাস্তি-ভঙ্গের আশঙ্কা নেই তো।

তারপর প্রণব উৎসাহের ঐক্যে কখন এক সময় ফশ করিয়া অগ্নির সম্মুখে বাসিয়া পড়িয়া মুক যন্ত্র সুরের কোয়ায়া ছুটাইয়া দিল, আর প্রীতি ছাবতে আঁকা মূর্তির মত নীরবে সে সুরের ধাবায় আপনাদের শাস্ত ভয়ান্ত মনকে ডুাইয়া দিল, সেদিকে কাতারো হুঁশ ছিল না। ঢং করিয়া ঘড়িতে যখন একটা বাজিল, প্রীতি তখন হুঁশ হইল। সে বলিল,—যান, যান, আপনার বাড়ী যান। একটা বাজলো যে। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—ঐ যে যাই। আপনার ব্যবস্থা ঠিক হলো কি না আগে দেখি।

প্রণব আবার বাহিরে গেল, প্রীতি সঙ্গে চলিল। বাহিরে তখন দরোয়ান ঐক্যে বাগ্নাব জায়গা দেখাইয়া উঠুনে আগুন দিতে বলিতেছে। প্রীতি বলিল,—বা, সব যে ঠিকঠাক, দেখছি। আপনি তাহলে আছেন এইবার।

প্রণব বলিল,—হাঁ, এবার আমি আসবোই। আবার এখনি ফিরেও আসছি।

—৩—

নতুন শাড়ী-কাপড় প্রভৃতি মোট-ঘাট সঙ্গে লইয়া প্রণব যখন আবার বাগানে ফিরিল, বেলা তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য তখন বিনাধের মালিন হাসি চোঁটে মাগিয়া পশ্চিম আকাশে অনেকখানি গড়াইয়া পড়িয়াছে। বাগানের সামান্য প্রমাণে তেঁতুল গাছের ঘন শাখা পত্রের উপর সূর্যের আদীর-মাথা রঙ পড়িয়া সে দিকটাকে একেবারে লাল বঙে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। গাড়ী হঠতে নানিয়া যবে ঢুকিয়, প্রণব প্রীতিকে কোথাও দেখতে পাইল না। এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া পিছনের বাবান্দায় গিয়া দেখে, ওদারে বাগানের এক কোণে লোচাব বেঞ্চের উপর প্রীতি নিবষ্ট মনে বসিয়া আছে। প্রণব খানিকক্ষণ প্রীতি পানে চাহিয়া চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কি ভাবিতেছে প্রীতি? তাহলে, কি না ভাবিবে? গৃহ-হার্য সর্ব-হার্য নিরাশ্রয় অনাথিনী তরুণী, জগতে দাঁড়াইবার যাব স্থান নাহ! কিন্তু কে এ রহস্যময়ী?

এ রহস্য ভেদ করিবার জগ প্রণব ঢুকল হইয়া উঠিল। নিম্নেখের অন্ধকার যখন গাঢ় হইয়া বিশ্ব ছাটয়া ফেলিবে, তখন এই ব্যাকুলা বালিকা দাকন মর্মজালায় একা এই বাড়ীর মধ্যে কি করিয়া বাত্রি কাটাইবে? প্রণবের সর্বশরীর চুশ্চিত্তায় উদ্বিগ্নে ছমছম করিয়া উঠিল। কেন ও নিজের পরিচয় বলিতে এতখানি কুঠা বোধ করিতেছে? কেন এ সঙ্কোচ?

প্রণব ধীরে ধীরে আসিয়া। শ্রীতির সম্মুখে দাঁড়াইল,  
ডাকিল,—শ্রীতি...

শ্রীতি চমকিয়া উঠিয় দাঁড়াইল, কহিল,—আপনি  
এসেচেন ?

প্রণব কহিল,—হ্যাঁ, একটু দেরী হয়ে গেছে, না ?  
আপনার দাসী কোথায় গেল ?

শ্রীতি বলিল,—সে তার কাপড়-চোপড় আনতে  
গেছে।

প্রণব বলিল,—ঐ ক্ষণের খাটের বিতানায় শুতে  
আপনার বেশ চমকান অসুবিধা হবে না ?

শ্রীতি গাঢ়স্বরে বলিল,—অসুবিধা। এ যে রাজার  
প্রাসাদে এমন অমায় স্থান দেছেন আপনি !

প্রণব হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, একেবারে সিংহাসনের  
উপর,—না ? কথাটা বলিয়াই সে অপ্রতীত হঠাৎ  
পড়িল। এ কথাটা বলা ঠিক হইল না, হয়তো !  
পরকণ্ঠে সে অগ্নি শ্রীতি পানে চাহিল—শ্রীতি মুখ  
সন্তোষেটা গোলাপের মত রাঙা হঠাৎ উঠিয়াছে। সে  
অপ্রতীত ভাণ্ডারে কানিয়া লগ্নাব উদ্ভাস প্রণব  
বলিল,—আপনি বাইরে রয়েছেন যে। খাওয়া-দাওয়া  
হয়েছে ?

মুত হাসিয়া শ্রীতি কহিল,—শত ভূখ-কষ্টেও মায়া  
এই পেটের মাথা ছাড়াতে পারে কখনো ? আপনি অতদূর  
পশ্চিম লোক হয়েও এ কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন ?

এ কথায় প্রণব একটু বিব্রত হঠাৎ বলিল,—এমন  
কি ভূখ-কষ্ট যে আপনি কিছুতেই তা ভুগতে  
পারছেন না !

—কি ভূখ-কষ্ট ? মুখে মলিন হাসি ফুটাইয়া শ্রীতি  
প্রণবের পানে চাহিল, পরে একটু খামিয়া আবার বলিল,  
—এত বড় ভূখ-কষ্টের কথা কোনো কেরাবেও বৃদ্ধি  
লেখেন কেন ! কল্পনাতেও মায়া আনতে পারে  
কিনা, জানি না।

প্রণব বলিল,—লোককে বললে ভূখ-কষ্টের কতক  
লাগা হয়, শ্রীতি।

শ্রীতি বলিল,—হ্যাঁ, বলবো আমি। যাবার আগে  
আপনাকে সব কথা বলে যাবো। না বলে বিদায় নিলে  
বেইমানি হবে, প্রণববাবু।

কথা শ্রুতি শুনে কঠিন পাঠ্যের দিকে চলিয়াছে  
দেখিয়া প্রণব সে শ্রোত ফিরাইল। কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া  
সে বলিল—লুন, আমার ছবি দেখাইগে।

অসম্ভবত গৈ শ্রীতি বলিল,—চলুন।

প্রণব সে শ্রীতি লক্ষ্য করিল। সে বলিল,—তার চেয়ে  
মোটবে হবে একটু বেড়ার আসবেন ?

অসম্ভবত গৈ শ্রীতি বলিল,—নড়তে চড়ে  
কেমন ভালো লাগতে না।

—বেশ, তাহলে আপনি এখানেই বসুন। আমি  
বস ছবি আঁকগে।

প্রণব চলিয়া যািতে শ্রীতি হঠাৎ তাহার দিকে  
আগাইয়া আসিয়া বলিল,—আমাব একটা কথা আছে।

—বলুন।

—আপনি আমাকে 'আপনি' বলবেন না। আশ্রয়  
যখন দেছেন, তখন ছোট বোনের মতই আমাকে মনে  
করবেন। আপনি বলে আর অপরাধী করবেন না।

—বেশ, তাই হবে।

কথাটা বলিয়া প্রণব ঘরের দিকে চলিয়া গেল।  
শ্রীতি নিম্নমুখে নয়নে তাহার পানে চাহিয়া ছিল।  
প্রণব চোখের অন্তবালে অশ্রু হইয়া গেলে সে চেয়ারের  
উপর বসিয়া পড়িয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল, তার পর ধীরে  
ধীরে আঁকনের পানে চোখ তুলিয়া চাহিল। সূর্য্য তখন  
কোথায় উঠিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যা ছায়া লঘু পদক্ষেপে  
পৃথিবীর দিকে অনেকখানি নামিয়া আসিয়াছে।

ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রণব একেবারে হাঙ্গোনিয়ম  
বাহ্যিতে বসিয়া গেল। হঠাৎ-তনুনা গাং বাড়াইবার  
পর বাজনা জ্বালো লাগল না ; চেয়ার ছায়া সে উঠিয়া  
পড়িল। উঠিতেই তাহার চোপ পড়িল শ্রীতির উপর।  
শ্রীতি তখন দ্বারের সম্মুখে উনাসভাবে দাঁড়াইয়া আছে।  
ঘরে উজ্জল আলো জ্বল, তাহারই প্রিয় বাক্য শ্রীতির  
নিকষে মুখের উপর পড়িয়া এক অপূর্ণ দাঁড়াইয়া  
তুলিয়াছে। প্রণব চাক্ষুশ চাহিয়া মুক্ত দৃষ্টি ফাংয়া  
লইল। সূর্য্য মুখপান। ছবিতে আঁকিবার ঘোষা বটে !

শ্রীতির উনাস ভাব দেখিয়া প্রণব বলিল,—আমার  
বড় ক্ষিদে পেয়েছে, শ্রীতি,—কি করি যেনো দেখি ?

—ক্ষিদে পেয়েছে ! শ্রীতি একান্ত সপ্রতিভ হইয়া  
বলিয়া উঠিল,—লুচ ভেজে দেবো,—খাবেন ?

—লুচি ভাজবে ! বেশ কথা ! ঠিক বলেচো !  
তাহলে...

—দি আমি ভেজ। আর একটু চুঁচকি কবে দেবো  
কি ? শুধু ভাজা, সে ভালো হবে না, খেতে পারবেন  
না।

প্রণব মুত হাসিয়া বলিল,—এই শুধু ? লুচি আর  
একটু মাত্র চুঁচকি ? বাস ? আজ এখান থেকে  
যাবার পর খেতে দেবে কম ঘুবেঁচ। ক্ষিদে বহর সামান্য  
নয় শ্রীতি, খাওয়াতে বসে তোমার ভয় লাগতে পারে !

—আজ্ঞা, আজ্ঞা, আমি আগে তৈরি করি, তার  
পরে দেখা যাবে, কত ভয় লাগতে পারেন ! তবে  
আপনাকে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। কথাটা  
বলিয়া শ্রীতি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে দিকে চলিয়া গেল।

প্রণব তখন ছবির দ্বার গিয়া পর্দা টেলিয়া ছবির কান-  
তের দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে !

তুলি লইয়া এখানে ওখানে গোটাকয়েক লাইন টানিয়া সে গাছের পানিকটা ছায়ার স্রষ্টি কবিতা তুলিল ; তারপর প্রচণ্ড লোভ হইল, এইমাত্র দ্বাবের সম্মুখে প্রীতিব যে উদাস মূর্তি চোখে পড়িয়াছে, যুগের উপর কপেব আলো অপরূপ দীপ্তিতে ফুটিয়া আছে, সেই বটুকু তুলির বেধায় ফুটাইয়া তুলিতে ! প্রীতিকৈ গিয়া বলা যায় না, এইখানে আসিয়া তুমি বসো, আমি তোমাকে দেখিয়া ছবি আঁকি ! সে কি ভাবিবে ? নিজেকে অপমানিত মনে করিতে পরে ! তাহাকে একটু আশ্রয় দিয়া এমনি মাথা কিনিয়া ফেলিয়াছি যে নিতান্ত নিলজ্জের মত আমার বিক্ষোভিত দুই চোখের দৃষ্টিব সম্মুখে এক অপবিত্রিতা তব্বী মহিলাকে বলিতেছি, তোমার রূপটাকে পণের মত ধরিয়া বসো ! আব সেও অমনি বসিয়া বলিবে, নাও গো, আমার দেখিয়া ছবি আঁকিয়া লও ! ছি, তা কি কখনো হয় ।

খানিক তুলির আঁচড় টানিবার পর তাহাও আর ভালো লাগিল না । প্রণব তখন ধীরে ধীরে বান্নাঘর দিকে চলিল । বান্নাঘরে উদ্মন জ্বলিতেছে । দাসী ময়দা মাখিয়া সেচি কাটিতেছে, আব প্রীতি কড়ায় তবকারী চাপাইয়া অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে তাহারি তথিব করিতেছে । উন্মুখে তপ্ত আগুনের হৃৎকায় তাহা চাপাব মত বর্ণে যেন সিন্দূরের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে ।

প্রণব বান্নাঘরের দ্বাবে দাড়াইয়া বলিল,—হলো প্রীতি ?

প্রীতি মৃগ তুলিয়া চাতিয়া বলিল,—এখানে এসেচেন নুই ! তব্বু সইচে না ? তরকাবীটা এই হয়ে এলো, এখনি নামাবো । তারপর ঝায়েব দিকে চাতিয়া বলিল,—অন্নদা, তোমাব হলো ভাই ? ঐ যে সেচি কাটিচে, তরকাবীটা নামলেই ভেঙ্গে দেবো । কপিভাজা আলুভাজা হয়ে গেছে । তবে আমি ভাবছিলুম, একটু চাটনি করে দেবো, তা'...

হাসিয়া প্রণব বলিল,—চাটনির জ্বলে অপেক্ষা কবতে গেলে এদিকে ব্রহ্মহত্যা হয়ে যাবে ! সে পাববো না, প্রীতি । আমার যে কি বকম ক্ষিদে পেয়েচে, তা তুমি বুঝতে পাবচো না !

প্রণবের এই সরস সহজ কথাব ভঙ্গীতে প্রীতি ভারী খুশী হইল । হাসিয়া সে বলিল,—এত অধীব হলে কখনো হয় ! বাঃ, আমার সময় দিন একটু তৈবী কববাব ! তবে এটুকু আশ্বাস দিতে পাবি, নেহাৎ অখাদ পাতে ধরে দেবো না । জানলেন ?

প্রণব বলিল,—সময় দিতে হবে এব জ্বলে ? এ'তো ভাবিনি আমি । এই বুঝি তোমাব আতিথ্য,—এ'্যা ! আমি কোথায় ভাবতে ভাবতে আসচি, এখানে এলেই প্রীতি যত্ন করে তখনি কিছু খেতে দেবে !

এ কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া প্রীতি বলিল,—নতুন ব্যবস্থা, নতুন জায়গা ।

প্রণব বুঝিল, তার কথায় প্রীতি অপ্রতিভ হইয়াছে । তাই সে কথাব গতি ফিরাইবার উদ্দেশ্যে বলিল,—তা যাক, তুমি মোক্ষা এটুকু সময়ে সমস্তই তো প্রায় তৈবী কবেচো । আমি ভাবছিলুম, লুচি ভাজতে দশটা বেজে যাবে । তা এ যে দেখচি, মেল ট্রেন চালিয়ে দেছ একেবারে !

প্রীতি বলিল,—এই দেখুন, আমার তরকাবীও হয়ে গেল,—এইবার নামিয়ে ফেলি । অন্নদাকে বলিল,—তুমি লুচি ঠিক বেলেগে পাববে তো ?

সে মাথা নাড়িয়া ছানাইল, পারিবে ।

প্রণব বলিল,—বারে, আমি বসবো কোথায় ? ঘরের মধ্যে জুতো পায়ে ঢুকবো কি ?

প্রীতি বলিল,—স্বচ্ছন্দে । এ'তো ঠাকুর-ঘর নয় ।

প্রণব বলিল,—না, সেটা ঠিক নয় । গৌড়ামির জ্বলে বলচি না । জুতো পায়ে দিয়ে পথে-ঘাটে ঘুরে বেড়াই, ধূলা-ময়লা, আবো কত কি রোগের ব্যাসিন্দি তলায় থাকে, খাবার ঘরে কিম্বা শোবার ঘরে রাস্তা-বেড়ানো জুতোশুদ্ধ তাই যাওয়া উচিত নয় । কথাগুলো বলিতে বলিতে প্রণব বান্নাঘরের মধ্যে ঢুকিল, ঢুকিয়া বলিল,—এই তোমাব বান্নাঘর ! বসবার জায়গা একটুও নেই ! বসি কোথায় ?

প্রীতি হাসিয়া বলিল,—বান্নাঘরে আবার বসবার জায়গা থাকবে কি ? এ'তো আপনাব ড্রয়িং রুম নয় যে সোফা চেয়ার মনে সাঙ্ঘিয়ে রাখতে হবে । এখানকাব আসন হলো এই কুর্সি পিড়ে । এতে তো বসতে পারবেন না আপনি, একখানা চেয়ার আনিতে না হয় বসুন ।

প্রণব বলিল,—বটে ! চেয়াবে বসবো না আমি—কথখনো বসবো না । তুমি ঠাট্টা কবলে যখন, তখন ঐ কুর্সি পিড়েতেই আমি বসবো । সত্যই তো, এ হলো বাঙালীব বান্নাঘর, এখানে আবার সোফা-চেয়াব কেন ! তা কুর্সি পিড়ে কৈ ?

প্রীতি ছোট একখানি পিঁড়ি পাতিয়া দিলে প্রণব তাহাতে বসিল । প্রীতি দাসীকে বলিল,—নাও ভাই, তুমি একটু হাত চালিয়ে নাও । বাবুর কি বকম ক্ষিদে পেয়েচে, শুন্লে তো ?

তারপর লুচি ভাজিবার পূর্বে বান্নাঘরেই পিঁড়িব সম্মুখে ঠাঁই কবিতা প্রীতি ভাজি ও তরকারী প্রায় সবটাই খালায় সাজাইয়া দিল ! ব্যবস্থা দেখিয়া প্রণব বলিল,—দেখি, ও কি ! সমস্ত তরকারীটুকু যে আমার পাতে ফেলে দিলে । বাঃ, তোমাব নিজের জ্বলে রাখলে না কিছু ? তার উপর কী আছে ।

প্রীতি বলিল,—ঝাঁর এবেলার জগে তরকারী আছে! আব'আমি? এবেলায় আমাব তেমন ক্ষিদে নেই।

প্রণব বলিল,—লক্ষ্য তলো বুঝি? না, আমার প্রচণ্ড ক্ষিদে দেখে তোমাব ক্ষিদে লক্ষ্য মরে গেল? সে তবে না প্রীতি। এই না তরকারী আমাব পাতে দেহ, এব অদ্বৈত তুলে আগে তোমাব জজ্ঞে বাখো, তবে আমি বাকী অদ্বৈত বাবো। আব ঐ যে লুচি হচ্ছে, ও থেকে তোমাব জগে দস্তুরমত অংশ রাখলে তবে বাকী-টুকু আমি গলাধঃকরণ করবো।

প্রীতি একটু বিরক্তির ভাব করিয়া বলিল,—দেখুন দিকি, খেতে বসে বাঁধুনৌ সঙ্গে ঝগড়া আবস্ত করচেন। তবেই আপনি খেয়েছেন খুব।

প্রণব বলিল,—আমি ভাবী ঝগড়াটে। মাব সঙ্গে বাড়ীতে আমার তবেলা ঝগড়া চলে প্রীতি। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ কি। তুমি আগে তোমাব বখবর বন্দোবস্ত করো, তবেই আমি বীদর্পে ভোজন-কার্যে অগম্য হবো—নাহলে তুমি সে সাবা রাত উপোস করে থেকে আমায় শাপ দেবে, সে আমি সহ্য করবো না।

প্রীতি এই আমোদ-পাগল আশয়-দাতার বচনে ব্যবহাবে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব পর্যন্ত যে দ্বিধা যে সংকোচের ভাবে সে কাতর কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছিল, সে-ভাব কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। প্রীতির মনে হইল, কেনই বা এ সংকোচ! এ যে কত-কালেব জ্ঞানা আপনাব জনেব মত,—কি প্রাণ-খোলা সদানন্দময় এই সোকটি!

তারপর স্বী লুচি বেলিতে স্তব্ধ করিল এবং প্রীতি ভাজিয়াভাজিয়া গরম লুচি প্রণবের পাতে দিতে লাগিল, প্রণবও হাসি-গল্পেব ফোয়ারা খুলিয়া খাইতে লাগিল। তরকারী শেষ করিয়া প্রণব বলিল,—একটু চাটনি কবোনি? এই তো প্রীতি, তাহলেই আমার পাইয়েচো তুমি!

প্রীতি ঈশৎ ক্ষুণ্ণ স্বরে বলিল,—আপনি কি রকম তড়া দিলেন, বলুন তো। এত শৌণ্ডিক্য মান্তন সব তৈরি করে উঠতে পারে?

প্রণব বলিল,—তবে আর বাঁধুনৌ কি। বাবো ঘণ্টা সময় পেলে আমিও যে সতেবোখানা বাজান বেঁধে তাক লাগাতে পারি।

প্রীতি ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—একটি উন্নয়ন—আচ্ছা, কাল আর একটা উন্নয়ন আমি তৈরি করাবো'খন—তারপর দেগবো, আপনি কত বড় খাইয়ে!

—তাই দেখো। এখন তাহলে উঠলুম। বলিয়া প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রীতি উন্নয়নের উপর হইতে কড়া নামাইয়া বাঁধিল।

দেখিয়া প্রণব বলিল,—ও কি, কড়া নামিয়ে রাখলে যে। তুমি খাবে না?

প্রীতি বলিল,—সে হবে'খন!

প্রণব বলিল,—তবে এখন কেন? এখনই হোক না! তুমি খেয়ে নাও, খেয়ে স্বীকে উন্নয়ন ছেড়ে দাও—ওব খাবাব ও তৈরি কবে নিক।

প্রীতি বলিল,—আপনার যে দেখছি শুধু ছবি আঁকা, যব দাজানো বিজেই শেষ নয়, গিল্পীপনাতেও বেশ দখল আছে। তারপর একটু খামিয়া আবার বলিল,—স্বী ওব কটি নিজেই মেখে সেকঁ নেবে। আমি একটু পরে পাবো'খন।

প্রণব বলিল,—না, আমি ঘরে গিয়ে বসছি, তুমি লুচি ভেজে গেবে নিয়ে এসো দিকিন্। একটু গল্প-সল্প করা যাবে'খন। না হলে ভাবী রাগ করবো আমি। আমি ভাবী রাগী মান্তন—আমার রাগ তো কখনো জাখোনি!

প্রীতির চোখে ঘোঁয়া লাগিয়াছিল। আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে হাসিয়া ো বলিল,—বটে। তাহলে গাগটা একবার দেখাই যাক। কি বলেন?

প্রণব বলিল,—না, না, বাগ আর দেখতে হবে না। তুমি খেয়ে নাও প্রীতি, তাবপর অনেক কথা আছে তোমাব সঙ্গে।

প্রীতি বলিল,—আচ্ছা, আমি খেয়ে নিচ্ছি। আপনি এখন যান, হাত-মুখ ধুয়ে ঘবে গিয়ে বসুন। অন্নদা, বাবুর আঁচাবাব জজ্ঞে গরম জল করে বেবেচি, তুমি ঐ বাসুতির ঠাণ্ডা জলে মিশিয়ে দাও তো ভাই।

প্রণব বলিল,—থাক, ঐ কেটলিতে গরম জল আছে তো? আমি নিজেই নিচ্ছি। স্বী ততক্ষণ তোমায় লুচি বেলে দিক্!

প্রণব বাতির হইয়া গেল। প্রীতি তখন উন্নয়ন আবার কড়া চাপাইয়া দিল, দিয়া আত্মগতভাবে বলিল,—ভেবেছিলুম, আজ রাতে আর কিছু খাবো না।

ো কথায় বাধা দিয়া দাসী অন্নদা বলিল,—তা কি হয়, বৌদিমা? বাবু রাগ করবেন। ই্যা, ভালো কথা, গয়লা কখন হুধ দিয়ে গেছে গো! হুধ এখনো জাল দেওয়া হয় নি তো! তা এক কাজ করো তুমি, তোমার লুচি ক'খানা ভেজে হুধের কড়াটা চাপিয়ে দাও। আমি জাল দিয়ে জুড়িয়ে টেলে রাখবো'খন।

প্রীতি কোন কথা বলিল না, লুচি ভাজিতে ভাজিতে কেবলই ভাবিতেছিল, বৌদিমণি! স্বী ডাকিল, বৌদি-মণি। তাইতো,—এ যে একটা মস্ত গি'ট পড়িতেছে ও দিকে—এ গি'ট কেমন করিয়া, কি বলিয়াই বা এখন খোলা যায়! না খুলিলেও নয়! এ গি'ট আরো জটিল হইলে সে যে বড় বিস্মী হইবে। বাবুর কানে যদি এ ডাক পৌঁছায়! হি! তিনি কি ভাবিবেন?

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া প্রীতি যখন ঘরে আসিল, প্রণব তখন তাহার ছবির সম্মুখে তন্ময় হইয়া বসিয়া আছে। প্রীতি ছোট একটি পিরাটে কয়েকটি সাজ পাণ লইয়া তাহার সামনে ধরিয়া বলিল,—আপনার পাণ!

প্রণব হাসিয়া বলিল—বাঃ, পাণও সেজে ফেলেচো যে। বেশ। এখন ঐ বাঙালিটা খোলো দিকি—ওর মধ্যে তোমার কাপড়, সেমিজ, তোয়ালে, গামছা, এই-সব পাবে, তাছাড়া মাথায় মাথবাব তেল-টেল সে সব ঐ পাশেব বাঙিলে আছে। এ-সবের কোন বন্দোবস্ত ছিল না তো এখানে।

প্রীতি বাঙিল খুলিতে খুলিতে বলিল,—হু'দিনের জগ্গে কেন আপনি এত খবচ-পত্তব কবলেন বলুন দিকি? মিছে এ-সব আনানো।

প্রণব বলিল,—হু'দিনের জগ্গেই যদি হয়, তাই নয় ধরলুম—সে হু'দিনই বা সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকতে যাবে কেন?

প্রীতি বাঙিল খুলিয়া সেমিজ প্রভৃতি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিল,—আগ্নি আন্ধাজে মাপও তো ঠিক ধরেছেন!

হাসিয়া প্রণব বলিল,—ধাঁকিয়ে মানুষ কি না। একবার দেখে ছবিতে মুখ-চোখের ছাঁচ ঠিক তুলতে পারি যখন...

প্রীতি বলিল,—কিন্তু কেন আপনি এত সব জিনিষ-পত্তব কিনলেন বলুন দিকি? অনর্থক এত পরসাদ খরচ করে?

প্রণব বলিল,—দরকারী জিনিষ! না কিনলে চলবে কেন?

প্রীতি বলিল,—হু'দিনের জগ্গে মিথ্যে এই খবচ-পত্তব করা!

প্রণব বলিল,—বুঝেচি। না হয় যাবাব সময় স্মৃতি-চিহ্নের মত এগুলো নিয়েই গেলে প্রীতি!

প্রীতি বলিল,—এইগুলোই কি মস্ত স্মৃতিচিহ্ন? নিয়ে যাবাব মত কি আর-কিছু দেন নি?

প্রণব একটু বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করিল,—কি দিয়েচি, প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—কিছু নয়। বলিয়া সে অতি-সন্তপণে ছোট একটা নিখাস চাপিল। প্রণব তাহা লক্ষ্য করিতে পারিল না।

প্রণব বলিল,—ভালো কথা, তোমাব খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

প্রীতি বলিল,—হ্যাঁ।

প্রণব বলিল,—কীর খাওয়ার কি হলো? সে নিজে তৈরী করে নিচ্ছে তো?

প্রীতি বলিল,—আমি যাচ্ছিলুম তৈরী করে দিতে, তাও দিলে না। বললে, কেন তুমি কষ্ট করবে। আমি নিজে তৈরী করে নেবো'খন।

প্রণব বলিল,—ছোটলোক হলেও বুদ্ধি-বিবেচনা আছে।

প্রীতি বলিল,—হ্যাঁ, মানুষটি ভালো।

প্রণব বলিল,—সত্যি, আমিও তাই দেখি। ভক্ততা, বিবেচনা, এই সব জিনিষগুলো—যাঁদের ভদ্র বলে খ্যাতি আছে, তাঁদের চেয়ে এই যাদের আমরা ছোটলোক বলে ঘৃণা করি, তাদের বাস্তবিকই প্রচুর আছে। তাই ভদ্র সমাজ ত্যাগ করে আমার মেলা-মেশা, কাজ-কন্ম, যা-কিছু সমস্তই এই সব ইতব ঘৃণ্য ছোট লোকদের সঙ্গে! দেখেচো প্রীতি, আমাব ছবির মধ্যে ভদ্রঘরের রূপসী বধু কি নাথিকার দেখা তুমি খুব কম পাবে,—ঐ সব অভদ্র ইতব ঘরের ছেলে-মেয়ে নিয়েই আমার কারবার! সত্যি, এবাই বেশেব লোক, বাঙালী মাটিতে তৈরী, বাঙালীর জল-বাতাসে এদের পুষ্টি! আর ঐ যে ইংরাজি পোষাক-পরা কি শিক্কেব পাঞ্জাবি গায়ে বাবুর দল ছাথো, ওরা তো পাঁচমিশেলি জাতের বিশ্বাস খিচুড়ী মাত্র। পোষাকে ব্যবহারে আচারে ভঙ্গীতে স্বভাবে তাদের এ বাঙালী দেশের লোক বলে মনেও হয় না। বাঙালীবা বাঙালীবা যদি তারা ঢাকা দিতে চায় তো তাদের বাঙালী বলি কিসে?

প্রণবের প্রাণে ভাবের যখন আবেগ আসে, তখন এমন নিষ্ঠুরেব মত তার প্রোত বিপুল বেগে বহিয়া চলে, কাহাবো বাধায় সে আবেগ বন্ধ হয় না।

প্রণবের মুখে বাঙালী দেশের ইতর সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে এই ভাবাবেগ গুনিয়া প্রদ্বায় প্রীতির প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এই তরুণ বয়সে এমন খাঁটি প্রাণ—কেতাবেই এমন প্রাণের পাবিচয় পাইয়াছে। সত্যাকার জগতে কি হীন, কুৎসিত বসব সব...

কথাটা ভাবিতে তাহার সঙ্করারীব আতঙ্কে শিররিয়া উঠিল। এই অল্প বয়সে সত্যাকার জগতে যে কয়টি প্রাণীর সে পরিচয় পাইয়াছে, সে পরিচয় তাহার হাড়ে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছে। প্রণবেব উচ্ছ্বাসে বাধা না দিয়া স্থির হইয়া সে একবার নিজের জাবনের উপর দিয়া যে ঘটনাস্তলা বহিয়া গিয়াছে, বায়োন্ধোপের ছবির মত সেস্তলার উপর মনশ্চক্ষু ব্লাইয়া লইল। প্রীতিকে নরকন্তব দেখিয়া প্রণব দ্বয়ং অপ্রতিভ হইল। এই সত্তা-পরিচিতি মেয়েটির কাছে ভাবের উচ্ছ্বাস একটু অতি মাত্রাতেই বাতির করিয়া ফেলিয়াছে না? ও কি ভাবিবে? প্রণব বলিল,—আমার কথাগুলো নেতায় বক্ততার মত শোনাচ্ছে,—না প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—না।

প্রণব বলিল,—বন্ধুতার কথা নয় এ। কাজেও আমি এই রকম করবাব চেষ্টা পাঠ।

প্রীতি বলিল,—সে তো নাব প্রমাণও পেয়েছি আমি। এই যে, জানা নেই, শোনা নেই, কাদের ঘরের মেয়ে তাবও ঠিক নেই, আমাকে আপনি এমন আশ্রয়, এতখানি সম্ভ্রম দিয়েছেন—

প্রণব বাধা দিয়া লজ্জিতভাবে বলিল,—ও-সব তুমি ক বলচো। পরো, নয় তোমায় আশ্রয় দিয়ে ভালো কাজই আমি করেছি—বদিত এটাকে বিশেষ মন্ত বললে আমি মনে কবচি না, তবু তোমাব কথাতেই বলচি, মন্ত কাজ, ভাল কাজ কবেচি আমি। কিন্তু এতে তুমি এমন কেন আশ্চর্য হচ্ছ ? এত মানুষ্য মাঝেই করে থাকে। ধরো, যদি আমার সামনে না পড়ে কাল রাত্রে অজ্ঞ লোকের সামনে গিয়েই তুমি অমনি আশ্রয় চেয়ে দাঁড়াতে, তাহলে কি সে এ আশ্রয় দিত না ?

ঈশ্বর হাসিয়া প্রীতি বলিল,—আমার জবাব চাই-ছেন ? সত্য জবাব ?

প্রণব কোড়ুল-ভরা স্বরে বলিল,—বেশ, জবাব চাইছি। সত্য জবাব।

প্রীতি বলিল,—সকলের কাছে এ আশ্রয় পেতুম না আমি। তারা শিউরে উঠতো, ভাবতো, তাইতো, এত বাত্রে পথের মধ্যে একটা মেয়ে-মানুষ আশ্রয় চায়। নানা সন্দেহ তুলে তাবা সরে পড়তো। সরে না পড়লেও এমন সব সন্দিক প্রশ্নের পর প্রশ্ন তুলে আমায় অস্থির করে ফেলতো যে আশ্রয়-ভিক্ষা তুলে লজ্জায় আমার মাথা হয়ে পড়ত। মানুষকে আপনি যত বড় ভাবেন, আমি তত বড় ভাবতে পারি না, এ আমার দুর্ভাগ্য, আমি স্বীকার করচি।

শেষের দিকটায় প্রীতির স্বব গাঢ় হইয়া আসিল।

প্রণব বুঝিল, না জানিয়া প্রীতির মধ্যে ঠিক বেদনার জায়গায়টাই হইতো সে আঘাত দিয়া বসিয়াছে। সে যে আজই স্পষ্ট বলিয়াছে, আতঙ্কে মন তাহার এখনো ভাবিয়া আছে। তাই সে নিজেব দুর্ভাগ্যের কাহিনী বলিতে দুই দিন আরো সময় চাহিয়াছে।

প্রসঙ্গটা বদলাইবার জগ প্রণব হঠাৎ বলিল—তুমি গান গাইতে জানো প্রীতি ?

প্রীতি বলিল—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা কবেচেন যে ! গানটা কি এতই সহজ ঠাওবানু যে পথে-ঘাটে যে-সে লোকের গু-ভিনিষে দখল থাকবে !

প্রণব বলিল—তা নয়। যে-সে হলে কথাটা তুলতুম না। তোমার মধ্যে আমি কিছু কিছু বিশেষত্ব দেখেচি—এই সহজ সবল অকৃত্রিম ভাব একখানি মাজ্জিত হৃদয়ের পরিচয় দিচ্ছে। তা ছাড়া আমি

যখন হাস্যোনিয়ম বাজাচ্ছিলুম, তুমি তখন এমন তন্ময় হয়ে তা শুদ্ধিছিলে,—তবু কোন গানও আমি গাইনি ! এ শাস্ত্রে অধিকার না থাকলে শুধু বাজনা কেউ এমন তন্ময় হয়ে শোনে না প্রীতি।

প্রীতি নতশিরে ঈষৎ লজ্জিতভাবে কহিল—গানেব কিছুই জানি না আমি। তবে গান-বাজনা শুনতে খুব ভালবাসি। আপনি বাজাবেন ?

প্রণব বলিল,—শুনতে চাও যদি তো বাজাই !

প্রীতি বলিল—বাজান।

তবলীব এই কণ্ঠাহীন সহজ বচন-ভঙ্গীতে প্রণব সত্যই মুগ্ধ হইতেছিল। এমন চিব-পবিচিত্রের মত মেলা-মেশা করিতেছে, অথচ কথায়-বার্তায় আচারে-ব্যবহারে কেমন সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অলাপ-আপ্যায়নের যে একটি ভঙ্গ রীতি আছে, তাহা এই তবলীব ব্যবহারে আগাগোড়া শোভন ও সংরক্ষিত। তবলী লজ্জাশীলা, অথচ তাহাব লজ্জায় প্রাণহীন আড়ষ্ট ভাব মোটেই নাই। সে লজ্জায় তবলীর শ্রী তাহাব মস্তক অবয়বটিকে বিবিয়া শুচিগন্ধ শতদলের মত কুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রণব হাস্যোনিয়ম খুলিয়া বাজাইতে শুরু করিল। বাজাইতে বাজাইতে মুগ্ধ শ্রোতাঃ সান্নিধ্য অনুভব করিয়া কষ্ট যে কখন খুলিয়া গিয়াছে, প্রণবের সেদিকে খেয়ালও নাই। গানের পর গান মুক্ত নিব্বাবের মত অবোধে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে ! হঠাৎ এক সময় যখন চমক ভাঙ্গিল, ঘড়িতে তখন দশটা বাজিয়াছে। প্রীতি বলিল,—আব থাক্। বড় রাত হয়ে গেল আপনার। দশটা বাজচে। বাজীতে মা আবার ভাবেন যদি ?

প্রণব বাজনা ছাড়িয়া বলিল,—তা ঠিক। মাকে তো এখনো তোমাব কথা বলিনি। তোমার অনুমতি না পেলে বলতেও পারি না। আসল কথা, বাড়ীতে তোমায় নিয়ে যাইনি কেন, তা তো বলেচি, মন্ত বড় সংসার, পাচরকমের পাঁচজন লোক আছে, নানা প্রশ্নে আপনাকে পাছে তারা বিদ্ধ করে ফেলে...

প্রীতি বলিল,—বেশ কবেচেন। আমার এখন মনের অবস্থা যা, তাতে কাবো ছোট একটা প্রশ্নও সহ্য করতে পারবো না। মন সত্যি এখনও এমন ভারী হয়ে রয়েছে ! নাহলে আপনাকেও বলি না ?

প্রণব বলিল,—বেশ, এখন তা হলে আমি আসি। কাল আমার ছবি আঁকা চলবে। দেখো। প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রীতি বলিল,—এইখানে থাকেন কি কাল সকালে ?

প্রণব বলিল,—না প্রীতি আমার মার মনে তাহলে ভাবী অস্বাচ্ছন্দ্য জাগবে। সামনে এসে আমাদেব হু'



ভাইকে খাটয়ে তিনি যে কি তৃপ্তি পান! এই বাড়ী বাচ্ছ তো, সেখানে মা আমার খাবার আগলে বসে আছেন—খেয়ে-দেয়ে শুলে তবে মা নিশ্চিন্ত হবেন। এত বড় হয়েচি দু'ভাই, তবু মার কাছে আমরা যেন সেই কোন ছেলেবেলার মতই ছোট বয়ে গেছি। লোকে হয়তো হাসবে একথা শুনলে। কিন্তু...

প্রীতি বলিল,—আপনার কাছে মাঝ কতটুকুই বা শুনেচি, তবু শুনে অবধি তাঁর উপর আমার মন এমন শ্রদ্ধায় ভরে রয়েছে। যাবার আগে তাঁর পায়ে প্রণামটুকু করে যাবার অন্তিমটি অব স্ত্রযোগ আমার দেবেন কিন্তু—নাহলে আমিও নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবো না।

প্রণব বলিল,—বেশ তো, আর বেশী কথা কি।

প্রণব চলিয়া গেল।

প্রণব চলিয়া গেলে প্রীতি বহুক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানে তেমনি বসিয়া রহিল। প্রণব আর তাহার সংসারের চারিধারে প্রীতির মন কিসের আকর্ষণে এমন ব্যাকুল আগ্রহে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল যে সে ক্রমে হাফাইয়া উঠিল। কি স্নেহের সংসারটি,—আগ! এই তপ্ত মধুর বৃক্ষে ছায়ায়-ঘেরা স্নিগ্ধ নীড় যদি কোথাও থাকে তো সে ঐ প্রণবের গৃহ! সে যদি ঐ নীড়েব এককোণে চিবদিনের মত একটু স্থান পায়—তাহা হইলে এ-জন্মটা আবার বাঁচিতে সাধ হয় বটে! এ পৃথিবীর যেটুকু সে এই বয়সে দেখিয়াছে, তাহা কি ভীষণ! দৈত্যের মত লেলিহান বসনা মেলিয়া সে-জগৎ মন-প্রাণ-দেহ সমস্তই গ্রাস করিতে চায়!

দাসী অন্নদা আসিয়া বলিল,—এখনো জেগে আছে বৌদিমণি? বাবু চলে গেলেন যে! বাত্রে থাকবেন না এখানে?

কথাটা কাঁটার মত প্রীতি মখে বিঁধিল। গভীর মুখেই সে জবাব দিল,—না।

দাসী বলিল,—তুমি বসে কেন, বৌদি? যাও, শোওগে—অনেক রাত হয়েছে। আমি কি তোমার ঘরের মেঝেতেই শোবো তা হলে? তুমি একলাটি শুতে পারবে?

প্রীতি বলিল,—আচ্ছা, তুমি ঐ মেঝেতেই শুয়ো। আমি একটু পরে শুতে বাচ্ছি। তুমি আর কেন মিছে জেগে থাকবে, ভাই? শুয়ে পড়'গে।

দাসী চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার একটা কথা আগুনের গোলার মত প্রীতির মনে ছ'য়াকা দিতে লাগিল! বৌদিমণি! ঝাঁঝি বৃষ্টিয়াছে, বাবু তাহার...! ছি!

লজ্জায় প্রীতির সর্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল। চোখ মুদিয়া চুপ করিয়া সে পড়িয়া রহিল। মুদ্রিত চোখের সম্মুখে ছোট একটি স্নেহের কুঞ্জ অপরূপ মাধুর্য্যে ফুটিয়া ঠিল। ফুলে-ফুলে সে কুঞ্জ ছাইয়া গিয়াছে,— শুধু

ফুল, শুধু স্নিগ্ধ-মধুর হাওয়া আর পাখীর গান,—প্রচুর, অজস্র! আর সেই কুঞ্জে ঝরা-পাতার শব্দায় মান বেশে প্রীতি বসিয়া আছে। দূরে সে কার আশা-পথটুকু চাহিয়াই যেন বসিয়া আছে। ক্রমে এক পথিক আসিয়া দেখা দিল, মাথায় তার ফুলের মুকুট, গলায় ফুলের মালা। পথিক আসিয়া স্নিগ্ধ দৃষ্টির পবনে প্রীতির মুখের-মনের কালিমা মুছিয়া তাহাকে ডাকিল। সলজ্জ দৃষ্টি তুলিয়া প্রীতি চাহিয়া দেখে, পথিক আর কেহ নয়,—প্রণব!

একটা নিখাস ফেলিয়া চোখ চাহিয়া প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া ভাবিল, মনেব আশ্চর্য্য স্পর্ধা বটে! মনটাকে দুই পায়ে সে মাড়াইয়া চাপিয়া ধরিল; তারপর ধীরে ধীরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

শুইয়া শুইয়া কত কথা, কত চিন্তা লইয়া সে এই একটু আগেকার মনে-জাগা কুঞ্জের কথা চাপা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সেই সব চিন্তার স্ত্র পদে পদে খুলিয়া গিয়া মন সেই কুঞ্জকেই সামনে তুলিয়া ধরিতে লাগিল। সে কুঞ্জে রাজার আসন পাতিয়া প্রণব বসিয়া আছে, আর তাহারই আসনের নীচে ভুলুটিতা প্রীতি! সমস্ত শরীর বহিয়া অস্বস্তির একটা তীব্র তপ্ত ঝাঁজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কি অবাধ্য মন! শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া ধাব পদে প্রীতি আসিয়া পাশের ঘরে খুঁজিয়া খুলিয়া উদ্ভাস্তের মত বাহিরের পানে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে কৃয়াশাব পদ্মা চৌলিয়া জোৎস্না তখন ঢগল চরণে রূপালি নাচের ঝরণা ঝরাইয়া দিয়াছে!

—৯—

পবদিন অনেক বেলায় প্রীতি ঘুম ভাঙিল। ঘুম ভাঙিতে সে দেখে, ঘরে অনেকখানি বৌজের হিল্লোল আসিয়া পড়িয়াছে। সে ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল—প্রণব হয়তো আসিয়াছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুইয়া সে বাহিরের বাবান্দায় আসিল। প্রণবের গাড়ীর চিহ্নও নাই! দরোয়ান ফটকেব সামনে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। ফটকেব কাছে তাহার ঘরের সমানের ঘোষাকে বাট'না বাটা শীলটা পড়িয়া আছে। মালী বাগানে ফুল তুলিতেছে। প্রীতিকে দেখিয়া মালী প্রণাম করিল। প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল,—বাবু এসেছেন মালী?

মালী কহিল,—না। তারপর সে ফুলের তোড়া তৈয়ার করিতে চলিয়া গেল। প্রীতি মন প্রণবের দর্শনাকাজক্ষায় অত্যন্ত অদীর হইয়াছিল। প্রণব আসে নাই শুনিয়া মন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল। পথের দিকে উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া আবার সে ভিতরে আসিল। অন্নদা তখন মশারি

তুলিয়া বিছানা ঝাড়িতেছে। প্রীতিকে দেখিয়া ইবৎ হাসিয়া অন্নদা কহিল,—দাদাবাবু কাল চলে গেলেন যে ? রাগ-টাগ করেচেন বুঝি, বৌদিমণি ?

আবার সেই কথা। পোড়ারমুখী এ বলে কি !

প্রীতির মনে শপাশপ্ কে যেন ঢাবুকের ঘা মারিল। এ কি দাবণা দাসীটা মনের মধ্যে পুরিয়া বসিয়াছে ! কি বিষম ভুল !...অথচ কি বলিয়াই বা তাহাব এ দাবণা সে খণ্ডন করিয়া দেয়। যদি প্রীতি বলে, না বে, সে বৌদিমণি নয়, কোনো কালে বৌদিমণি হইতেও পাবে না, তাহা হইলে এই অশিক্ষিতা মূৰ্খ দাসী আবও কি সব কদম্বা দাবণা করিয়া বসিবে ! হোক ভুল, কানে বড় মিষ্ট লাগিতেছে। বৌদিমণি ! তাই বলিয়াই দাসী যদি খুশী থাকে, বলুক ! আর একটা দিন বৈ তো নয় ! তারপর কোথায় সে চলিয়া যাইবে, প্রণবকে ছাড়িয়া কত, কত দূরে—প্রণবের সম্বন্ধে এতটুকু ছোট কথাও সেখানে অত দূরে আর তাহাব কানে পৌঁছিতে না ! এই বাগান, এই ঘর, এই হাসি-আনন্দের মিষ্ট লহর—এ শুধু স্মৃতির একটি কোণে ঐ অজস্র ফোটা ফুলের গন্ধের মত, বর্ণের মত জমিয়া থাকিবে !

প্রীতিকে নিরন্তর দেখিয়া অন্নদা বলিল,—ও রাগ কিছু নয়, বৌদিমণি। আজই দেখো, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তা, তুমি নাইবে তো ? গরম জল চড়িয়ে দিইগে। তারপর তোমার চুল খুলে তেল মাখিয়ে দেবো'খন। নাইবে তো ?

কোনমতে এই-সব কথাবাত্তার হাত হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় প্রীতি বলিল,—নাইবো।

—তাইলে গরম জল চড়িয়ে দি, আব মালাফে বলি, নাইবার ঘরের টবে ঠাণ্ডা জল তুলে দিক্। বলিয়া অন্নদা চলিয়া গেল।

প্রীতি অগ্নমনস্কভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। এখনো প্রণব আসিল না কেন ? কাল রাত্রে সেই হাসি-গল্প, গানে বাজনায কি পুলকের স্রোতই না বহিয়াছিল ! আর আজ ? উৎসব-রজনীর অবসানে উৎসব-মগ্ন শৃঙ্গ পড়িয়া আছে, ফুলের মালাগান হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে, পবিত্র মগ্ন নিঃশব্দ নিজীব, নীরব ! সে হাসির এক বিন্দুও আব রবে না ! প্রচণ্ড নিরানন্দময়তা গুমট বাধিয়া প্রীতির মনের উপর যেন একখানা ভারী পাথরের মত চাপিয়া বসিয়াছে ! হাসিয়া প্রীতি ভাবিল, এ কি দ্রাশাব পিছনে মস্ত মন এমন ছুটিয়া চলিয়াছে। আব একটা দিন শুধু এখানে তাহার থাকিবাব অধিকার আছে। তবে কেন এ আকুলতা ! কেন এ অধীর আবেগ !

অন্নদা আসিয়া বলিল,—এখনো চূপ কবে বসে আছ

বৌদিমণি ? এসো, চুলগুলো খুলে দি। তেলের শিশি কোথায় ?

প্রীতি বলিল,—ও ঘরের শেল্ফে আছে।

অন্নদা তেলের শিশি আনিয়া প্রীতির কুঞ্চিত কৃষ্ণ নরম কেশের রাশি বেণী-বন্ধন হইতে মুক্ত করিল। নাচিয়া নাচিয়া কালো কেশের রাশি অধীর তবঙ্গের মত তাহার পিঠ ছাপাইয়া ঝাপাইয়া ঝরিয়া পড়িল। অন্নদা সেই কালো কেশের রাশি কুলাইতে কুলাইতে বলিল,—কি বেশমের মত নরম চুলগুলি তোমার বৌদিমণি ! ভারী সুন্দর !

প্রীতি এ কথার জবাব দিল না। অধীর মন প্রতিক্ষণে একটা গাড়ীর প্রতীক্ষা করিয়া উন্মুখ হইয়া রহিল।

তেল মাখিয়া তাবপর সে স্নান কবিতো গেল ; স্নান করিয়া প্রণবের দেওয়া শাড়ী পরিয়া আবার বাবান্দায় আসিল। কোথায় প্রণব ? তাহার গাড়ীর শব্দ নাই, প্রণবের চিহ্নও নাই। প্রীতির মন অবসরের মত হইয়া পড়িল।

তাবপর কতক্ষণ এমনি ভাবে কাটিলে অন্নদা আসিয়া তাড়া দিল,—বান্নাবান্না হবে না বৌদিমণি ? উমুন যে জ্বলে গেল।

বান্না-বান্না করিতে প্রীতির ভালো লাগিতেছিল না। সে বলিল,—থাক্গে, ক্ষিদে নেই মোটে।

অন্নদা হাসিয়া বলিল,—তোমাব যেন ক্ষিদে নেই, বৌদি ! আমাকে খেতে দিতে হবে তো।

প্রীতি বলিল,—চল, তোমাব জগা ভাতে-ভাত চড়িয়ে দি।

অন্নদা আবার হাসিয়া বলিল,—শুধু ভাতে-ভাত নয়, বৌদি। কাল তোমাব তরকারীটুকু ভারী চমৎকার হয়েছিল। একটু ডালও-বোঁধো।

প্রীতি উঠিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল, মতাই তো, আমার জগা ও বেচাবী না খাইয়া মরিবে কেন ! সে বলিল,—আচ্ছা, তাই হবে। চলো।

অন্নদা বলিল,—তোমার জগাও দুটি চাল নিয়ে, বৌদি। না খেয়ে মানুষের থাকতে নেই। কাল রাত্রে এমন কিছু খাওনি যে আজ ক্ষিদে থাকবে না ! তারপর একটু থামিয়া হাসিয়া সে আবার বলিল,—কেন ক্ষিদে নেই, তা কি আব আমি বুঝি না গা ! ঘর করতে গেলে অমন ঝগড়া-কাঁটি হয়েই থাকে, তার জগা একেবারে উপোস দেবে ! দাদাবাবুই বা কি রকম কাণ্ড—এত বেলা হলো, দেখা নেই !

প্রীতি শিহরিয়া উঠিল। তাহাব সর্কাসে কে যেন কশাঘাত করিল। ঝী এ বলে কি ! বৌদিদি ! বৌদিদি ! বৌদিদি ! এ কি বিস্তী দাবণা মনের মধ্যে সে পুষিয়া

বাখিয়াছে ! লজ্জায় সে যেন মরিয়া গেল ! মুখ তুলিয়া  
অন্নদার পানে তাকাইতেও পারিল না। সে বলিল,—  
আমি রান্নাঘরে যাই। এবং কথটা বলিয়াই অন্নদার  
সম্মুখ হইতে সে সরিয়া গেল।

রান্নাঘরে গিয়া রান্না চাপাইয়া সে চুপ কবিয়া বসিয়া  
বহিল। মনের মধ্যে স্বীয় কথাপ্রতি প্রচণ্ড ঝড় তুলিয়া  
ভীষণ তোলাপাড়া বাধাইয়া দিল। এমন তাহার অদৃষ্ট  
হইবে ! বাসেব স্বস্তি একখানি ক্ষুদ্র গৃহকোণ কোন দিন  
সে অধিকার করিতে পাইবে। সেই গৃহের কোণে  
স্বামীর স্বস্তি বাঁধিয়া-বাড়িয়া সে তাঁতাব আশা-পথ  
চাতিয়া বসিয়া থাকিবে ! অধীর প্রত্যক্ষ্য প্রক্তি-মুহূর্ত্ত কি  
উদ্বেগেই কাটিবে ! হোক উদ্বেগ, তবু কি যথুৎ সন্তাননা  
তাহার পিছনে গো। সে ঐশ্বর্যের কাঙাল নয়,  
বিলাসের কাঙাল নয়। ঐশ্বর্যের তাহাব অভাব কি ?  
পায়েব কাছে বস্ত্রালঙ্কারেব স্তম্ভ চড়ানো,—রাজ্যব ঐশ্বর্য।  
শুধু তাতে কবিয়া তুলিয়া লওয়াব অপেক্ষা। সে ঐশ্বর্য  
যদি সে তাতে লয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য বর্জাইয়া যায় !  
কিন্তু সে এ-সব কিছু চায় না—দরিদ্র স্বামীর ঘরে সহস্র  
কাজে সে আপনাব এই সজবিকশিত সৌবনকে চালিয়া  
দিতে কতখানি উন্মুখ, তাহা শুধু তাহার অন্তর্ধ্যামীই  
জানেন ! কিন্তু কী এ কি দুরাশাব স্বপ্ন কাণের কাছে এমন  
স্বরে শুনাইতে চায়। তাহে নিক্ৰোধ,—সে জানে না,  
দাসী হইলে কি হয়, তাহাব পাশে প্রীতি কত দীন,  
এ সবেব আশা হইতেও সে একেবারে বঞ্চিতা !

অন্নদা আসিয়া বলিল,—এই তোমার বাটনা আর  
এই কুটনো। এগুলো ঝোলে দিয়ো। আর এই বাঁধা  
কপিতুঁছু ভাতে দিয়ো না বৌদি, বেশ ঝাঁজালো তেল  
এনেচি, একেবারে টাটকা ঘানির—খেতে যা হবে, একটু  
হুন দিয়ো !

এ সব আত্মবের আলোচনা প্রীতির মোটেই ভালো  
লাগিতেছিল না। সে এখন চায় নিশ্চিনে একটু একলা  
থাকিতে—মনেব রাশকে উদ্ধাম গতিতে একবার  
ছাড়িয়া দিতে ! কি নব নব পথে নব নব অপরূপ  
দৃশ্যাবলীর পাশ দিয়া কোন্ অজানা অসীমের তীবে গিয়া  
মনেব সে যাত্রা শেষ হয়, তাহা দেখিতে !

তাই ঝাঁকে বিদায় দিবার উদ্দেশ্যে প্রীতি বলিল,—  
হ্যাঁ ভাই অন্নদা, একটু ঘুরে আসো না ভাই,—মিঠে পাপ  
আর দালটিনি-এলাচ, এ সব কোঁথাও পাও কি না !

অন্নদা বলিল,—পয়সা দাও, যাচ্ছি। আর তো  
আমাব এখানে এখন কোনো কাজ নেই, তোমাব সব  
গুছিয়ে রেখেছি।

খরচের স্বস্তি প্রণব কয়টা টাকা দিয়া গিয়াছিল ;  
প্রীতি উঠিয়া আসিয়া আশির টেবিলের ড্রয়াব খুলিয়া  
তাহা হইতে একটা টাকা দিয়া অন্নদাকে বিদায় করিয়া

কিরিয়া আবার রান্নাঘরে আসিয়া বাসল ; বাসিয়া মনেব  
রাশ ছাড়িয়া দিল। মন কি বিচিত্র কল্পনা-কল্পের ধাব  
দিয়া নব-নব ফুলেব সৌভে যন্ত হইয়া কোন্ অসীম  
লক্ষ্য করিয়া দুরন্ত ঘোড়ার মত ছুট দিল ! অজানা  
নূতন পথে চঞ্চল গতি-ভঙ্গীতে পদে-পদে ঠোকর খাইলেও  
প্রীতি সে অপরূপ দৃশ্যেব মধ্যে একেবারে তন্ময় মোহিত  
হইয়া পড়িল। মন গিয়া শেষে পৌছিল এক সজ্জিত  
গৃহের দ্বারে,—প্রণব সে গৃহে বসিয়া ছবির পানে বিহ্বল  
দৃষ্টিতে চাতিয়া আছে।

আর...? বৃকে অসহ্য বেদনাব ঘা খাইয়া প্রীতি  
সেই ঘরের দ্বার-প্রান্তে মূচ্ছিত হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ  
পরে হঠাৎ তাহাব মোহ ভাঙ্গিল। তাই তো, সে এ কি  
দুরাশাব পিছনে মনকে ছুটাইয়া দিয়াছে ! যে তোব  
এমন উপকার করিয়াছে, সর্বনাশী, তুই তাব ছবিব  
ধান এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিতে চাস !

মনে মনে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া সে মনের বাশ  
চাপিয়া ধবিয়া আবার রান্নার দিকে ফিরাইল।

—১০—

অন্নদার তাগিদে আহাবাদি করিতে হইল ! আত্মবেব  
পর প্রীতি বাগানে খানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইল।  
শেষে তাহা আর ভালো লাগিল না। তখন সে আসিয়া  
ছবির ঘরে ঢুকিল। দেওয়ালের গায়ে তাতে আঁকা  
কত ছবি ! এই-সব ছবি প্রণব নিজের হাতে আঁকি-  
য়াছে ! ছবির বড়ে, ছবির লতায়-পাতায়, ছবির  
অবয়বে প্রণবের সরল খোলা প্রাণের মধুর ছাপ হাসির  
মতই বিছানো বহিয়াছে ! দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া  
বহুক্ষণ ধবিয়া সে ছবি দেখিল ; তাবপর অজ্ঞমনস্কভাবে  
আসিয়া হাঠোনিয়মেব সামনে বসিয়া তাহার রীড-গুলায়  
আঙুলের পবন ব্লাইল। মৌন মুক বীডগুলি অমনি  
সে পবশে এক ককণ স্বব জাগাইয়া তুলিল। স্ববেব  
পর স্বরের তবঙ্গ ছুটিল। তাবপর বাজনাব স্বরে কখন  
যে কঠ আসিয়া যোগ দিল, প্রীতি তাহা লক্ষ্য করিতে  
পারিল না। হাঠোনিয়মেব স্বরে প্রীতি গাতিতে  
লাগিল,—

তুমি সক্ষ্যাব মেঘ, শান্ত স্তম্ভ

আমাব সাধেব সাধনা,

মম শূন্য গগন-বিহারী !

আমি আপন মনেব মাধুরী মিশায়ে

তোমাবে কবেছি বচনা,

তুমি আমারি যে তুমি আমারি,

মম অসীম গগন-বিহারী !

একবার, দুইবার, তিনবার সে এই গান গাতিয়া  
চলিল,—যখন ক্লান্ত কঠে গান ধামিল, তখন প্রীতির

চোখ ভলে ভবিয়া উঠিয়াছে। সজল চোখে প্রীতি স্থির হইয়া বসিয়া বহিল—আশে-পাশে কোন দিকে ভাটার লক্ষ্য ছিল না। তাহাব চাবিদাব হইতে বাহিরের জগৎ অদৃশ্য হইয়া গানের ভাষায় গানের স্ববে মিশিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এমন সময় একটা স্বব কাণে গেল,—চমৎকাব গাউতে পারো তুমি প্রীতি।

চমকিয়া প্রীতি চাহিয়া দেখে, অদূরে প্রণব সোক্ষায় বসিয়া আছে। সে লজ্জায় এতটুকু হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রণব বলিল,—উঠো না, প্রীতি। আব একটু গান গাও। আচ্ছ আমার এ হাঙ্গোনিয়ম কেনা সার্থক হলো। সেমন তোমাব হাত, গলাও তেমনি! আমার লজ্জা হচ্ছে, কাল আমি তোমাব সামনে বাজনার কেতামতি দেখাতে গিয়ে শুধু বাজনাব অপমান করিনি, তোমারও দস্তবমত অপমান কবেচি।

প্রীতি ঈষৎ লজ্জাব হাসি হাসিয়া বলিল,—আপনি কখন এলেন, আমি কিছুই জানতে পারিনি।

প্রণব বলিল,—কি কবে জানবে? গানের শব্দ শুনে গাড়া ঐ দটকেব সামনে বেগে পা টিপে-টিপে আমি ঘবে এসেচি—কি জানি, যদি ভূমি টেব পাও, তাহলে এমন সুরেব নিৰ্ব্বা, এ যে শুকিয়ে যাবে!

প্রীতি বলিল,—লুকিয়ে-লুকিয়ে কেন আপনি গান শুনলেন?

প্রণব বলিল,—প্রকাশে শোনবাব কোন আশা ছিল না বলে।

প্রীতি বলিল,—ভাবি অজায় কিন্তু।

প্রণব বলিল,—এ অজায়েব মাজা হবে আব একখানি গান শোনালে।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—আমায় খালি অপ্রতিভ করছেন!

প্রণব বলিল,—না, সত্যি বলচি, প্রীতি—মেয়ে-মাহুষেব উপব নানা বিষয়ে আমার খুব শঙ্কা আছে, স্বীকাব করি। কিন্তু গেয়ে গানকে এমন জীবন্ত করতে পাবে, এ ধাবণা আমার কোনকালে ছিল না। আমার সেটা মস্ত অপরাধ হয়েচে,—তাও স্বীকাব কবেচি। নাও, এখন ববি-বাবুর আব একখানি গান গাও দিকি, গাও প্রীতি।

কণ্ঠেব স্ববে একটু সঙ্কোচ মিশাইয়া প্রীতি বলিল,—গাইবো? কিন্তু নিশ্চয় কববেন না, ঠিক সুরে গাইতে না পাবলে! ঠিক স্বব আমি জানি না।

প্রণব বলিল,—ভূমিকা বেখে তুমি এখন গাও।

প্রীতি আবাব হাঙ্গোনিয়মেব সামনে বসিয়া প্রথমে একটা বীড় টিপিয়া সুর ধবিল, তাবপব কণ্ঠ খুলিয়া গাহিল,—

লেগেছে অমল ধবল পাগে

মন্দ মধুর তাওয়া।

দেখি নাই কভু দেখি নাই

এমন তরবী বাওয়া।

কোন সাগবের পার হতে আসে

কোন সুদূবের ধন।

ভেসে যেতে চায় মন,

ফেলে যেতে চায় এই কিনাবায়

সব চাওয়া সব পাওয়া।

প্রণব অবাক হইয়া গেল। গলাব সুরে ও মাধুর্য্যে, গায়িকাব আন্তরিকতায় সমস্ত গানখানি যেন সুরেব কোয়াবা খুলিয়া দিল,—গানটি অপকূপ মূর্তি ধরিয়া তাহাব মানস-নয়নেব সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, গলা ও সুরেব কসবৎ নয় শুধু রীতিমত কালচার ও হৃদয় না থাকিলে, এ-সব গান এমন কবিয়া গাওয়া ষাব-তাব কাজ নয়! প্রীতি এমন শিক্ষা পাইয়াছে যখন, তখন সে যে-সে ঘবের মেয়ে হইতেই পারে না। কাহাদের মেয়ে আজ এমন নিবাস্রয় অবস্থায় প্রণবেব গুচে দৈবাৎ আসিয়া পড়িয়াছে? মুগ্ধ বিষয়ে প্রণব প্রীতির মুখের দিকে চাহিয়া বহিল। প্রীতিব মুখে-চোখে এমন শ্রী ফুটিয়াছে—ও কি তাহাব চোখছটি ছল ছল কবিতেছে যে। প্রীতি চোখ তুলিতেই প্রণবেব সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল—অমনি সে চোখ নামাইল।

প্রণব ডাকিল,—প্রীতি...

প্রীতি প্রণবেব পানে চাহিয়া বলিল,—কি বলচেন?

প্রণব বলিল,—খাক! আব গাইতে হবে না।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—সখ মিটে গেল। এমন গাইলুম যে গান বন্ধ কবতে বলচেন?

প্রণব বলিল,—তা তো বটেই! না প্রীতি, গান এখন থাক, তোমাব কণ্ঠ হবে।

প্রীতি বলিল,—কণ্ঠ। কোন কণ্ঠ নেই। আপনি যদি শুনতে চান...

প্রণব বুঝিল, এই যে গাহিতে চাওয়া,—এ শুধু তাহাকে খুশী কবাবব জ্ঞান। প্রীতিব কণ্ঠস্ববে কৃতজ্ঞতাভাবটা যেন ককণ মূর্তিতে ফুটিয়া ওঠে! এমন মিনতি, এমন নিবেদনেব সুরেব স্ববে দেখা দেয় যে প্রণবেব সমস্ত মন তাহাতে তাহাকাব কবিয়া ওঠে! প্রণব বলিল,—না, আমি শুনতে চাচ্ছি না। আজ একটু ঝগাট পোহানো হয়েচে কি না, তাই একটু গল্প-স্বল্প করে জিকতে চাই। আজ সকালে আসতে পারিনি, কৈ, জিজ্ঞাসা কবলে না তো, কেন এলুম না?

প্রীতি কোন জবাব দিল না, শুধু হুই চোখে মিনতি ভবিয়া প্রণবেব পানে চাহিল। জিজ্ঞাসা কবিলাম না...?

বটে! হায় বে, এতক্ষণ কি অস্থিরতা বৃদ্ধি কবিয়া যে কাটাইয়াছি, তা যদি বুঝিতেন!

প্রণব বলিল,—দবকাব বোধ কবোনি, না?

প্রীতি বলিলে,—কেন আসেন নি?

প্রণব বলিল,—আজ সকালে মাব সঙ্গে বালিগঞ্জে নেমস্তন্ন গেছলুম, এক আত্মীয়ের বাড়ী। সে একটা বীতিমত যড়যন্ত্রের ব্যাপার।

প্রীতি বলিল,—যড়যন্ত্র কি একম?

প্রণব বলিল,—যড়যন্ত্র বৈ কি। কাল বাত্রে ফিবে গিয়ে মাব কাছে গুলুম, কে-এক পিস্তুল তো বোন্ আছেন বালিগঞ্জে—তাঁর বাড়ী আজ সকালে নেমস্তন্ন। ছোট ভাই জবাব দিয়েচেন, তাঁর যাবাব অবসর হবে না, কাজেই মাকে নিয়ে আমাকে যেতে হবে। তখাস্ত। গিয়ে হাজির হলুম—দ্বিবা চক্ষ্য-চুম্ব-ভোজনে উদব-তৃপ্তি কবা গেল—তারপর আসবো—মা বললে, মাকে নিয়ে তবে ফিবে পাও। বেশ। তারপর বিশ্রামের জন্ত এক সজ্জিত কক্ষে বসলুম। পাণ নিয়ে এক কিশোরীর কম্পিত বক্ষে সে কক্ষে প্রবেশ হলো। বাজ্যের লজ্জা তাঁর গায়ে জড়ানো! পাণ নিলুম, কিন্তু তিনি নড়েন না। একটু সন্দেহ হচ্ছিল। হঠাৎ মা এসে সন্দেহ-ভঞ্জন কবে দিলে, বললে,—এই মেয়েটিকে পছন্দ হয় বে পিছ? আমি তো অবাক! মুখে স্পষ্ট কবে বলতে পাচ্ছি না—না মা, না! বেচাবীর প্রতি বড় অজায় কবা হয় তাহলে। আমতা আমতা কবে কোনমতে পাণ কাটালুম। মাকে বললুম,—বুৎ ধড়ক করছে আমাব! বললুম, গাভী পাঠাবো সন্ধ্যার সময়, তুমি বাড়ী যেয়ো,—ব্যস, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে বেবিয়া পড়ে একেবারে চেথায় আগমন!

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—কেন মেয়েটিকে পছন্দ হলো না?

প্রণব বলিল,—ফেপেছ প্রীতি! আমি তো নেহাৎ খোকা নই যে-নাগী-মুষ্টি দেখলেই মুগ্ধ হয়ে যাবো!

প্রীতি বলিল,—কেন, আপনার পছন্দ কি এমনি গবেষণার বস্তু?

প্রীতির এই সরল ব্যঙ্গ প্রণব একটু প্রীত হইয়াই বলিল,—না, আমাব মনে হয়, এখন পছন্দ কবতে গেলে চট্ কবে তা করে উঠতে পাববো না। গায়েব কটা চামড়া কিখা কুণ্ডিত কৃষ্ণ কেশদাম দেগেই ভুলে যাবো না—তাব মনের পরিচয়ও দস্তবমত পেতে চাইবো।

প্রীতি বলিল,—এ মেয়েটিকে তাব অবসর দিলেন না যখন, তখন আপনার অপছন্দ করবার অধিকারও নেই তো।

প্রণব বলিল,—হা নেই। তবে চেহারা থেকে তাব পরিচয় কতক মিলবে বৈ কি! এ যে-ভাবে জড়পুস্তকিবাণ পাণ নিয়ে সাম্নে এসে দাঁড়ালো! বামঃ! এসে

ভদ্রলোককে কোথায় বলবে, পাণ নিন্—তা মুখে একটা কথা নেই!

ঈষৎ অমুযোগেব স্তবে প্রীতি বলিল,—কি করে বলবে? সে বাড়ীর মধ্যে শুনেচে, আপনি কেন এসেচেন, আর সেই বা পাণ নিয়ে আপনার কাছে আসচে কেন। এতে তাব লজ্জা হবে না?

প্রণব মুহূর্ত্তের জন্ত স্থির হইয়া প্রীতির পানে চাহিল, তারপর বলিল,—ঠিক! তুমি ঠিক বলেচো প্রীতি। তা হলে ও-বকম এক কথায় ডিসমিস্ কবা আমাব উচিত হয়নি। তারপর একটু হাসিয়া আবার বলিল,—তবু কি জানো প্রীতি, একে ঐ একটিবার দেখেই মনে হল, বুদ্ধি এর তেমন তীক্ষ্ণ নয়। পছন্দ হবে যে-মেয়ে, সে এমন হবে যে তার মুখ-চোখ একটি নিমেষেই আমার প্রাণে রেখাপাত করবে। এই কি পছন্দ কববার আসল মাপ-কাঠি নয়? আমি জানি, এই একমাত্র পথ—এবং এই পথে চলে যাবে অবোধ অধম ভৃত্য এ নয়ন, খুড়ি, এ প্রণব রায়।

প্রীতি অবাক হইয়া বলিল,—ও কি হলো আবার?

প্রণব বলিল,—রবি বাবু ‘বিসর্জন’ কোট্ করে দিলুম।

প্রীতি বলিল,—আপনার সঙ্গে কথা করে ভারী স্তব হয় কিন্তু! এক মিনিটে এমন জমিয়ে দেন...

প্রণব বলিল,—যেন কুলপা বরফ! না?

প্রীতি বলিল,—যান, সব কথায় ঠাট্টা!

এমন সময় অন্নদা আসিয়া ঘরের দ্বারপ্রান্ত হইতে ডাকিল,—বৌদিমাণ—

হঠাৎ জুত দেখিলে মাহুষ যেমন চমকিয়া ওঠে, প্রীতি ঠিক সেই রকম চমকিয়া উঠিল। চমকিয়া মুহূর্ত্তের জন্ত প্রণবের পানে চাহিল, প্রণবের দৃষ্টি তখন একেবারে বাহিরে ছুটিয়া গিয়াছে। যে-মাহুষ এমন হাস-ভরা কথার বান ডাকাইয়াছিল, এ যেন সে মাহুষই নয়! এমন গভীর! রাজ্যের লজ্জা গায়ে মাখিয়া প্রীতি উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। আসিয়া অন্নদাকে কহিল,—কি বলচো?

অন্নদা বলিল,—আব একটা উমুন তৈরী কবে দিতে বলেছিলো না? তা একবার এসো গো বৌদিদি,—কত বড় উমুন হবে, আর কোথায় হবে, আমায় দেখিয়ে দিয়ে যাও।

প্রীতি মস্তচালিতের মত বলিল,—চলো। কথাটা বলিয়া সে একবার ঘরের মধ্যে প্রণবের পানে চাহিল,... সেই একই ভাবে সে বদিয়া আছে! অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবেই প্রীতি অন্নদার সঙ্গে চলিয়া গেল।

—১১—

প্রণবের কানেও ঝাঁয়ের সঞ্চারনটুকু স্পষ্ট আঘাত করিয়াছে, ইহাতে সেও একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল। প্রীতি চলিয়া গেলে সেও বেন স্বস্থির নিশ্বাস ফেলিল! তাইতো, কী এক সম্পর্ক ধরিয়া লইয়াছে! প্রীতি কি ভাবিল? ঝাঁয়েরই বা অপরাধ কি? সে যে-ভাবে কাল প্রীতির সঙ্গে হাস-গল্প করিয়াছে, ইহাতে ঝাঁয়ের ও ধারণা কবার কোন অপরাধ হয় নাই! তাহার মনে লজ্জা হইল, প্রীতির সঙ্গে তবে ঠিক-ভাবে ব্যবহার কবে নাই সে! তা যদি কবিত, তবে কী ওরূপ ভাবিত না!

প্রণব আবার ভাবিল, ঝাঁয়ে এ-রকম ভাবা বিচিত্র নয়। এই নগরের প্রান্তে এই সম্ভ্রিত বাড়ীতে তরুণী নারী একা বহিয়াছে, বাড়ীতে অপূর্ণ নোক-জনও কেহ নাই—সে আসিয়া এমন চিব-পরিচিতির মত সহজ ভঙ্গিতে তরুণীর সঙ্গে আলাপ কবিতোছে, ইহাতে কী অগুরুত্ব ভাবিবেই বা কোথা হইতে! তবু তো সে বৌদিমণি ভাবিয়াছে, কী মন ভালো, তাই! নাহলে গরিচেয়ে অশ্রু কুণ্ডলী একটা ইঙ্গিতও সে দিতে পারিত! ছি, ছি! না, প্রণবের এ বকম মেলা-মেশা করা উচিত হয় নাই। প্রীতিব সপ্তম বক্ষা কবিতো গিয়া ইহাতে সে তাহার সপ্তমের হানি করিয়া বসিয়াছে।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া প্রণব গিয়া ছবিব সম্মুখে বসিল। ছবিত্তা উড়াইয়া দিবার জ্ঞান মনকে সে ছবির কল্পনায় ভুলাইয়া দিল। হাতে তাল লইয়া সে 'টেকশোবে' বঙ্ক ফলাইতে বসিল। ছ-চাবিটা ফুটন্ত লতা-পাতায় back-ground আঁকিয়া সে এক তরুণীর নব কিশলয়ের মত কোমল স্তম্ভ মূখ আঁকিতে শুরু করিল। ছবিব কাপড়ে তুলিব আঁচড় টানিয়া পবক্ষণে তাহা মুছিয়া, আবার নূতন বণ্ডে পোচ টানিয়া কোনমতে একখানি মুগের খালস যখন ফুটাইয়া তুলিল, তখন দিনেব আলো নিবনিব হইয়া আসিয়াছে। মুগ্ধ নয়নে ছবিব পানে চাহিয়া সে দেখে, এ কি! এ কি কবিয়াছে! এ যে প্রীতির মুখখানিকে ভাবের ঝাঁকে আঁকিয়া বসিয়াছে! সেই মুখ, সেই নাক, সেই কৃকিত কেশেব অলকদাম, চূর্ণ-কুন্তল বস্ত্রিম কপোল বহিয়া, বেশমী স্তাব মত দুই-চারিগাছা বরিয়া পড়িয়াছে, সেই টানা-টানা চোখ-দুটি, সে দুই চোখে স্নান ছল-ছল দৃষ্টিটুকু অবধি! প্রণবের সঙ্গরদীর ছম্ ছম্ কবিয়া উঠিল। এ দেখিয়া প্রীতি কি ভাবিল? প্রীতিথ্যের বিনিময়ে প্রীতিকে সে একেবারে সহস্র দর্শকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে এমন ভাবে টানিয়া বাহির করিয়াছে!

একটা পেয়ালা লইয়া হঠাৎ প্রীতি ঘবে ঢুকিয়া বলিল,—আপনার চা।

প্রণব ছবিখানা পক্ষা টানিয়া ঢাকিয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল; কহিল,—চা এনেচো? দাও।

প্রীতি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—লুচি ভেজে দেবো?

কী বকখাটা তাহার সর্কাসে সাপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া তখনো জড়াইয়া ছিল, তাই এ কুঠা!

প্রণব বলিল,—লুচি? বলিয়া সে চায়েব পেয়ালা মুখে ধরিল, জবাব দিল না।

প্রীতি বলিল,—আজ আব অশুবিধা হবে না। লুচি ভাজবো—শাবেন না?

প্রণব বলিল,—না। থাক। অবেলায় নেমস্তন্ন খেয়ে পেট ভাব আছে, লুচি আব আজ খাব না। এই চাই যথেষ্ট হবে। বৎ গোটা-দুই পান; সঙ্গে দিয়ে।

—দি। বলিয়া প্রীতি বিদ্যুতের মতই খানিক আলোর ঝিলিক ছিটাইয়া ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে প্রণব খানিকক্ষণ চুপ কবিয়া বসিয়া রহিল। তারপর চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া পেয়ালাটা চা-পয়ের উপর রাখিয়া ঘব-মব পাখচারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

প্রীতি আসিয়া পান দিল। পান দিয়া সে তখনি চলিয়া যাঠিতেছিল; প্রণব বলিল,—কোথায় যাচ্ছ?

—বাঁধতে।

—এখন থাক না।—তারপর তাহাব পানে চাহিয়া বহিল। প্রীতি মুখ নত করিল। প্রণব বলিল,—মনে আছে, প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—কি?

প্রণব বলিল,—কাল।

প্রীতি বলিল,—ও। মনে আছে নৈ কি! কাল আমাব বিদায়েব দিন, না? তাই বলচেন তো?

প্রণব মনে আঘাত পাইল। আঘাত পাইয়া কহিল,—ছি, ও কথা কেন প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—অজায় কথা বলিনি আমি। টিরকাল শাপনাব ঘর দখল কবে বসে আপনাব অন্তঃস্বপ্ন কবতে পারি না ত!

প্রণব বলিল,—যদি আমি যেতে না দিই?

প্রীতির সমস্ত প্রাণটাব মধ্য দিয়া বিদ্যুতের তরঙ্গ বহিয়া গেল। দুই চোখেব বিম্বিত দৃষ্টি প্রণবের মুখে স্থাপন করিয়া সে কহিল,—যেতে দেবেন না! তারপর মুখ নামাইয়া হাতের একটা নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ধীর স্ববে বলিল,—কেন যেতে দেবেন না, জানতে পারি?

—১২—

প্রণব বেশ সহজভাবেই বলিল,—ছোট বোনের উপর বড় ভাইয়ের কি একটু অধিকারও নেই?

স্বাসী বকখায় মনেব কোণে যে মেঘ আসিয়া জমিয়া

ছিল, যে মেসের ঘটায় চারিদিক একেবারে ঝাপসা কালো হইয়া আসিতেছিল, প্রণবের এই কথার তাওয়ায় সে যেখা ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া সরিয়া বুনটাকে স্বচ্ছ পরিষ্কার করিয়া দিল। একটা নিখাস ফেলিয়া প্রীতি বলিল,—কাল আমার পরিচয় দি, আগে শুভুম। ভাবপর তা শুনেও আমায় এখানে রাখার যে'গা মনে কবেন যদি, তা হলে এইখানে এই তীর্থেই পড়ে থাকবো। আর যদি তাড়িয়ে দেন...

প্রণব বলিল,—তোমার সঙ্গে কথায় প'রা ভাব।

প্রীতি বলিল,—আমার বাচালতা মাগ কবেন না। আপনি বড় প্রশংস দিচ্ছেন, এ-প্রশংসে আমার মত লোকের মাথা ঠিক থাকে না।

প্রণব প্রীতির কাছে সবিসা আসিল, আসিয়া সম্মুখ কণ্ঠে কহিল,—বড় ভাইকে ও-বকম কথা বলতে নেই, প্রীতি। আর কখনো বলো না। কাল মার কাছে তোমার কথা বলবো মনে কবেছিলুম—বলিনি। ভাবলুম, যা যদি জিজ্ঞাসা কবেন,—কাদের মেয়ে, কি পরিচয়, তখন বেকুব বনবো কি? তাই বলিনি। কাল তোমার পরিচয় নিয়ে মার কাছে সব কথা খুলে বলবো। কোন ভয় নেই প্রীতি। যে পরিচয়ই হোক তোমার, তুমি ইচ্ছে করে আমার সম্মুখ না করলে আমি কখনো এ-কথা তোমায় বলবো না যে, তুমি চলে যাও :

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রীতির চোখে জল আসিল। সে আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না; একেবারে প্রণবের পায়ে ধূলি মাখায় ঠেকাইয়া বলিল,—আপনার দয়া ভীষনে ভুলবো না। আমার দ্বাৰা—

কথা আর শেষ হইল না। আবেগে-আবেশে দুই চোখে জল এমন ঠেলিয়া আসিল যে, পাছে প্রণব তাহা দেখিয়া ফেলে, এই ভয়ে প্রীতি বিজ্ঞাতের মত সে ঘব হইতে বাহির হইয়া গেল।

প্রীতি চলিয়া গেলে প্রণব অনেকক্ষণ শুক্ক হইয়া বসিয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, কাল প্রীতির পরিচয় দিবার দিন! পরিচয় দিতে এ আশঙ্কা তাহার কেন হইতেছে যে, পরিচয় শুনিয়া প্রীতিকে আশ্রয় দিবার সম্বন্ধে প্রণব দ্বিধা করিবে! পরিচয়ের মধ্যে এমন কি বস্তু আছে, যা'হা জানিতে পারিলে প্রীতিব এই কোমল শাস্ত প্রকৃতি, এই উদার শিক্ষার আলোয় আলোকিত মন—এ-সব একেবারে ধূলিসা হইয়া যাইবে? এমন কোন ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রীতিব পরিচয়ে থাকিতে পারে না! সে কি কাহারও কিছু চুপি করিয়াছে, না, সে মাহুষ খুন করিয়াছে...

কথাটা মনে হইতেই প্রণব কেমন শিহরিয়া উঠিল। প্রীতি চোর? প্রীতি খুনী? অসম্ভব! এ যে স্বপ্নেরও অগোচর! তবে কি সে কুলত্যাগিনী? কখনো নয়!

তাহাব বিবাহ হয় নাই! সে নিজেই বলিয়াছে, তা'র স্বামী নাই, ছিলও না কোনদিন।

আর যদি এমন হয়,—প্রীতি সম্মুখ কুলত্যাগ করিয়া আসিয়াছে? তবে বুঝিতে হইবে, প্রীতিব তাহাতে কোন অপরাধ নাই! সে যদি কুলত্যাগ করিয়া থাকে, তবে দায়ে পড়িয়াই করিয়াছে এ'ব' সে কুলত্যাগ করাই উচিত ছিল। না, না, এ-সব নয়। হয়তো বেচারী এমন বিপদে পড়িয়াছিল যে, তাহার আত্মক এখনো মন হইতে মুছিয়া যায় নাই—মাহুষের উপর তাহার বিকট ভয় ভ্রমিয়া গিয়াছে এবং এত শীঘ্র এমন অকস্মাৎ সে ভয় কাটে নাই। তাহার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছিল—কণে-গুণে এমন মেয়েটি—তাই তো—কি তার পরিচয়? কে এ? অথচ একটা রাত্রির জন্য এ কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে যাওয়াও ঠিক হইবে না। তাহা হইলে প্রীতিব মনের সেই ক্ষতটুকুকে আরো সে খোঁচাইয়া তুলিবে। প্রীতি ভাবিবে, একটা রাত্রির সবুজ সঠিতেছে না? কাল তো সে নিজেই সব কথা খুলিয়া বলিবে।

প্রণব হাসিল; মনে মনে ভাবিল, যে পরিচয়ই হউক, প্রীতি ইচ্ছা করিয়া চলিয়া না গেলে প্রণব তাহাকে কখনো বলিবে না, তুমি চলিয়া যাও। আবার এ কথাও জমনি চকিতে মনে উদয় হইল, রাখিতে হইলেও এ-ভাবে এখানে রাখা যায় না। পাঁচটা লোকেব মনে নানা সংশয় জন্মিতে পারে। সে সংশয়ে অবশ্য তাহার কিছু আসিয়া যায় না, তবে প্রীতি তাহাতে বেদনা পাইতে পারে! এই যে কীটা তাহাকে বোঁদি বলিয়া ডাকিল...

প্রণব আবার হাসিল। মাহুষের মন এমনি বটে। দেখিয়াছে নির্জন বাগান-বাড়ী—বাস, সেখানে আব কে থাকিতে পারে? স্বীয়েব অপরাধ কি! ইতবেব মত আমাদের এই সমাজও যে সময় সময় এমন ধারণা করিয়া বসে! কেন, নাই বা থাকিল কোনো আত্মীয়তা—স্বীলোক ও পুরুষকে একত্র মিশিতে দেখিলে ঐ একটা সম্পর্কই বৃদ্ধি কল্পনা করিয়া লইতে হয়! নারী ও পুরুষে বিস্তৃত বিমল সম্বন্ধ—সে কি এমনি অসম্ভব ব্যাপার?

প্রণব ভাবিল, স্বীব ঐ সম্বোধন না জানি প্রীতিকে কতখানি আঘাত করিয়াছে। বেচারী আশ্রিত। নেহাৎ নিকপায় ভাবিয়াই হয়তো এ কথাব কোন প্রতিবাদ সে করে নাই। কি জানি, তাহা হইলে আরো কি কষ্টের সম্বোধন শুনিতে হয়।

তারপর প্রণব ভাবিল, ঐ সম্বোধনটুকু শুনিতে কিঙ্ক মন্দ লাগে নাই! প্রীতি যে-বকম যত্ন-আদর করিয়া তাহার খাওয়া-দাওয়ার তত্ত্বির করিতেছে, কথায় বার্তায়

যে রকম সহজ সলীল ভঙ্গী তাব—জানি না, আমি-স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক এই রকমই মধুর কি না—তবে সেটুকু বড় ভালো লাগিয়াছে। মা তো বিবাহের জন্ত এত তাগিদও দিতেছেন। প্রীতিকে নদি—

প্রণবের মন অমনি হৃদ্য দিয়া উঠিল, খবর্দার! আতিথ্যের মধ্যে এতখানি স্বার্থে বিষ পুশিয়া রাখিয়া-ছিস! না, না, না—প্রীতি তাহার বোন, ছোট বোন!

ঘরের মধ্যে মুহূর্তে অমনি এমন গবম বোধ হইতে লাগিল যে, প্রণব সেখানে আর টিকিতে পারিল না, কয়বাঘ ঘবে পায়চাঁবি কবিয়া বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া সে রান্নাঘরের দিকে গেল। সেখানে সে অস্ত্রবাল হইতে টুকি দিয়া দেখিল,—না, প্রীতি রান্নাঘরে নাই! স্বী একলা বসিয়া ময়দা মাখিতেছে। একবার তাহার মনে হইল, স্বীকে জিজ্ঞাসা কবে, প্রীতি কোথায় গেল। পব-মুহূর্তে ভাবিল, কিন্তু কি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে? নাম ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে ভালো দেখাইবে না, অথচ এ-কথাও জিজ্ঞাসা করিলে ভালো দেখায় না, যে তোব বৌদিদি কোথায় রে? নিঃশব্দে সেখান হইতে সে চলিয়া আসিল।

আসিয়া ঘরগুলার মধ্যে এমন ভাবে ঘুরিয়া চলিয়া সে বেড়াইতে লাগিল যেন, প্রীতিকে সে খুঁজিতেছে না,—বিনা-উদ্দেশ্যে বেড়াইতেছে শুধু! ঘূষিতে ঘূষিতে কোন ঘরেই সে প্রীতিকে দেখিতে পাইল না। উত্তর দিকের বাবান্দায় একখানা ইজি চেয়ার পড়িয়াছিল, প্রণব বারান্দায় আসিয়া চাঁদের আলোয় দেখে, ইজি চেয়ারবে উপর কে যেন কইয়া আছে! প্রণব বুলিল, সে প্রীতি। প্রণব ডাকিল—প্রীতি...

প্রীতি ষড়মুদ্রিয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। সে কাঁদিতছিল, প্রণবের অলসে তাড়াতাড়ি কাপড়ের আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

প্রণব বলিল,—এখানে একলাটি পড়ে আছো কেন প্রীতি, অসুখ করেছে কি?

প্রীতি গাঢ় স্বরে কহিল,—না।

প্রণব বলিল,—তবে?

প্রীতি বলিল,—মাথাটা একটু ধরেছিল।

প্রণব অগ্রসর হইয়া তাহাব লল্যটে হাত দিয়া দেখিতে যাইতেছিল, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—তা এখানে কেন? ঘরের মধ্যে কোঁচে গিয়ে শোও না। এখানে ঠাণ্ডা লাগবে। আজ আর আগুন-তাতে যেয়ো না। শুধু দুখ খেয়ো, আর বেয়াবাটাকে বরং বলে দাও, আমার পাঁওকটা আছে, তাই ক'খানা টোষ্ট করে দিক।

একটা নিখাস চাপিয়া প্রীতি বলিল,—না, না, ও-সব

হাস্যের দরকার নেই। এ মাথা-ধবা এখনি ছেড়ে যাবে। এখনো ময়দা মাখা হয়নি, তাই এখানে এসে বসেছিলুম।

প্রণব বুলিল, প্রীতিব স্বর বেশ স্বাভাবিক নয়, একটু যেন গাঢ়! সে বলিল,—ময়দা মাখা হলে স্বী নিজেই খাবাব তৈরি করে নিক। তুমি আর নাই খেলে...

প্রীতি কহিল—আপনি?

প্রণব বলিল,—আমি আজ খাবো না। ক্ষিদে নেই।

প্রীতি ভাবিল, তাহাব অসুখ করিতেছে, কষ্ট হইবে, এই জগাই প্রণব ও কথা বলিল,—সে খাইবে না। তাই সে চেষ্টা কবিয়া একটু হাসিয়াই বলিল,—আপনাব ক্ষিদে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। আর আপনি আমায় খেতে দেবেন না, পাঁওকটা টোষ্ট আর দুখ খেয়ে থাকতে বলচেন? শীতকালের এই এত বড় বাত! তাবপর আমি ক্ষিদেব জ্বালায় মরি আব কি।

প্রণব বলিল,—না প্রীতি, ও-সব কথা বললে চলছে না। তুমি যে ময়দা মাখচো, বুঝি সে আমার জ্ঞাত। তা বেশ, এত যদি খাওয়াবার সাধ হয়ে থাকে তো কাল রাত্রে খাইয়ো। কাল এখানেই খাবো, খেয়ে বাড়ী যাব। মাকে বরং বলে আসবো, নেমস্তন্ন আছে। দেখবো, কত খাওয়াতে পারো।

প্রীতি বলিল—কাল খাবেন?

—হ্যাঁ, কাল। তুমি ভাবচো, কাল আমি বেঁচে থাকব না, মবে যাব? তোমার খাওয়ানো একদম বরবাদ যাবে?

এ-কথায় প্রীতি মুখ নত করিল, তাব পর হাসিয়া বলিল,—তা নয়। তবে কাল এ-সময় আমি নিজে কোথায় থাকি, তাব ঠিক নেই তো!

প্রণব এ কথার মশ্ব বুলিল; তবু যেন বোঝে নাই, এমন ভাণ করিয়া বলিল,—কেন? কাল তুমি কোথায় যাবে? কাশীবাসের জন্ত বেরুবে না কি?

প্রীতি বলিল,—সে ভাগ্য আমার হবে কি না!

প্রণব ব্যথিত চিত্তে বলিল,—এ-সব কথা কেন বলচো প্রীতি? সত্যি, আমি তামাসা করে বলেছি শুধু। আমায় মাপ করো।

—ছি ছি, ও কি কথা বলেন আপনি! আপনি মাপ চাইছেন আমার কাছে? ছি! ওতে যে আমার পাপ হয়!

—কেন তুমি ও কথা বললে? ও কথায় আমার ভারী পুণ্য হয়! না?

—তা নয়। তবে কাল আমার সব কথা খুলে বলবো কি না!

—আর তোমাব কথা যেই ফুঝোবে, অমনি আমি



তোমার কেশাকর্ষণ করে পৃষ্ঠে পদাব্যাহত দিয়ে বলবো, তুমি দূর হও? এই সত্তা আছে তোমার সঙ্গে?

—তা নয়। তবে সে কথা শুনে আপনি এমন মনে কবতে পাবেন কি না যে, আমার স্পর্শে আপনার ঘর কলঙ্কিত হচ্ছে।

—এত-বড় নিষ্কলঙ্ক পূর্ণশরী আমি নই যে তোমার কথা শুনে আমি মনে করবো, আমার এ রাজপ্রাসাদ কলঙ্কিত হচ্ছে! আমি বেচাবা চিত্রকর মাত্র, প্রীতি, আমি কলকাতার থিয়েটারের নাট্যকলাকুশল স্নপ্ৰিয় অভিনেতা নই! ও-সব কলঙ্কিত, কলুষিত কথার মানেও জানি না যে গোল চক্ষু রক্তবর্ণ করে ঐ সব ভাবার তপ্তাব ছাড়বো! ছি প্রীতি, আমার সম্বন্ধে এত হীন, এমন নীচ ধারণা তোমার!

প্রীতি একটু থামিয়া দীর্ঘভাবে কহিল,—না সত্যি, আপনাকে আমি যে কি শ্রদ্ধা কবি, তা আমার অন্তর্ধ্যামাই জানেন! আপনার সম্বন্ধে হীন-নীচ ধারণা কববো আমি! আমার মাথায় তা হলে সেই দণ্ডে বজ্রাঘাত হবে না!

প্রণব দেখিল, প্রীতি এই অস্বস্ত শরীরে মনটাকে ঐ একই আঙুনে পোড়াইতে চায়! ঐ পবিচয় দিব্যার ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া আপনাকে অত্যন্ত অপরাধিনী ভাবিয়া একেবারে কঠিন কঠোরভাবে নিজেই অস্বস্ত করিতেছে! এ প্রশঙ্গ হালকা করিয়া উড়াইয়া দিব্যার অভিপ্রায়ে তাই সে গম্ভীরভাবে কহিল,—তোমার পবিচয় পেয়েছি, প্রীতি। নতুন করে ছন্দে গেঁথে তা আর তোমার বলবার দরকার নেই; এবং কথাটা বলিয়া সে গম্ভীরভাবেই চুপ করিয়া রহিল।

প্রীতি কিন্তু একথায় একেবারে ফাঁটা হইয়া গেল। তাহার বৃক্কেব মধ্যে বস্তুটা ছলৎ করিয়া উঠিল। তাহার ভাগ্যশুণে একটুকু মেঘ আসিয়া চাদকে ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাই চাঁদের আলো তেমন উজ্জ্বল ছিল না, না হইলে সে আলোয় প্রণব দেখিত, প্রীতির মুখ কিরূপ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে! তাহার বৃক্কেব পাঁজবাগুলার মধ্য দিয়া বিদ্যুতের একটা তীব্র ফুলিঙ্গ ছুটিয়া গেল। সে কি বলিতে বাইতেছিল, মুখে কথা ফুটিল না।

প্রণব আবার বলিল,—পরিচয় পবিচয় করে বাস্তব করচো—কিন্তু তা পেতে কি আমার বাকী আছে?

প্রীতি এবার জোর করিয়া কথা কহিল, বলিল,—কি বলুন? বলুন আপনি। প্রীতির মুখ বিবর্ণ! সে কাম্পিত চিত্তে অধীর আগ্রহ লইয়া প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল।

প্রণব বলিল,—তুমি মাসিক পত্রে গল্প-টল্প কিছু লেখো, এ আর আমি বুঝি না! না হলে এমন কথার বাঁধুনি!

প্রীতির বৃক্কেব মধ্যে বেন মেঘ জমিয়া উঠিয়াছিল, প্রণবের কথার তাড়ায় তাহা উড়িয়া গিয়া বৃক্কেব হালকা হইয়া গেল। তবু ভালো, তোমার! কিন্তু মুখে কোন কথাই সে বলিতে পারিল না।

প্রণব বুঝিল, কাল পবিচয় দিতে হইবে এবং সেই কথা মনে উঠিতে প্রীতির পুনাতন আতঙ্ক আবার নূতন হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই সে বলিল,—শোনো প্রীতি, তুমি অমন কবে আমার মনে আর ব্যথা দিয়ে না। তুমি কি ভাবো, আমি তোমার ঐ পরিচয় নেবার শগ্ন একেবারে অধীর উদ্ভত হয়ে আছি! এই দুদিন তোমার সঙ্গে মেলামেশা কবে, আলাপ কবে, তোমার যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমাদের শ্রদ্ধা হয়েছে তোমার উপর খুব,—এটুকু শুধু ক্ষেপে বাথো। এব বেসী যদি কোন পবিচয় থাকে, তবে সে তোমার মনেই থাকুক—আমি তা কানতে চাই না! আর কি এই আশ্রয় আশ্রয় কথা তুমি মুখে বলো, বলো ত? তোমার যতদিন অল্পগ্রহ হবে, তুমি এখানে থাকবে, তাৎপর্য সে দিন তোমার চলে যাবার ইচ্ছে হবে, তোমার খুশী, সেই দিন তুমি চলে নেয়ো। আমি তোমায় থাকতে বাধ্য কববো, জোর করে—এ তুমি কখনো ভেবো না। তোমার এখানে থাকা না থাকা সে তোমার ইচ্ছা, মর্জি! কেন তুমি পরিচয়-পবিচয় কবে মিছে আমার বাস্তব করে। যেদিন পথে গাড়ীতে তোমায় তুলে নিয়েছিলুম, সেদিন তোমার পবিচয় জানিনি বলে এক মুহূর্তের জগ্ন আমার এতটুকু দ্বিধা দেখেছিলে? তবে?

প্রীতির হুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। বৃক্কেব মধ্যে অক্ষর তবঙ্গ একেবারে বাঁধ-ভাঙ্গা নদীর মত ঠেলিয়া ফুলিয়া উঠিল। এই কান্না ছাড়া তার আর কি বা সম্বল আছে?

সে বলিল,—আমাকে মাপ করবেন। কিন্তু আমার কথা কাল আপনাকে শুনেই হবে, আমার পবিচয়। আমি সত্য কবেছি! এটুকু দয়া করবেন আমার উপর! না হলে আপনার এ স্তম্ভ অতিথ্যের অমর্যাদা হবে, আর তা আমার দ্বাবাই হবে, এ ভেবেও যে আপনার এখানে আমি নিশ্চিত মনে থাকতে পারব না।

প্রণব বলিল,—আবার ঐ কথা, প্রীতি! তা হলে আমার চলে যেতে হবে এখন।

প্রীতি বলিল,—আর ও-কথা বলব না আমি। আপনি রাগ কববেন না।

প্রণব বলিল,—আমি রাগ করিনি। তবে তোমার মুখে ও-রকম কুজিত কাতব কথা শুনে আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তাই বলছিলাম।

এ কথার আর শেষ নাই! এ যে বাড়িয়াই চলে! তাই এ প্রশঙ্গ চাপা দিব্যার জগ্ন প্রীতি বলিল,—সত্যি

আপনি খাবেন না ? না, আমার মাথা ধরেচে বলে আমার পাছে কষ্ট হয়, এই অজ্ঞ ও কথা বলচেন ?

প্রণব বলিল,—না প্রীতি, আজ আর সত্যি খাবো না। আজ এখনি আমাকে যেতে হবে। ওবেলায় মাঝ সন্ধ্যে একটা গোলমাল হবে এসেছি কি না, তাই একটু শীঘ্র ফিরতে হবে। যাক, তোমার মাথা ধরা থাকে যদি তো ভিতরে এসে, এখানে ঠাণ্ডা থেকো না। মেসুল আছে এখানে, আমি দিচ্ছি; দুই বগে দাও দেখি, সেবে যাবে'খন। 'আব তাতেও যদি না সাধে তো একটা জেনাস্প্রিং-ট্যাবলেট খেয়ে ফেলো। আমি আনতে দিই।

প্রীতি হাসিয়া বলিল,—আপনি শুধু ছবি আঁকেন না, ডাক্তারীও করেন, দেখছি।

প্রণব বলিল,—এগুলো সাধারণ ব্যাপার, সকলেরই জেনে রাখা উচিত। এ আব ডাক্তারী কি।

প্রীতি বলিল,—ওষুধের দরকাব নেই, তবে ভিতরে যাচ্ছি। মেসুলই দেবেন চলুন।

—বেশ, তাই এসো।

উভয়ে নিঃশব্দে ঘরে আসিলে প্রীতি দুই বগে মেসুল পরিয়া দিল। এমন সময় ময়দা আসিয়া ডাকিল,—ময়দা মাথা হয়েচে বৌদি। এসো এবার।

আবার ঐ কথা! 'দুজনই একটু অপ্রতিভ হইল। প্রণব যেন সে কথা শোনে নাট, এমনি ভাবে বলিল,—সে বকম মাথা ধরা না থাকে তো বীকে বলো, তোমার জন্মে ক'খানা ও ভেঁকে দিক,—খেয়ে ন'ও আব দুদ খাও—বাস, খেয়ে শুয়ে পড়ো।

—তাই বলচি। বলিয়া প্রীতি বসিবে গিয়া কি কবিত্তে হইবে, অল্পদাকে বঝাইয়া দিয়া আসিল।

প্রণব বলিল,—আমি তা হলে এখন আসি। তুমি খেয়ো মোদ্ধা, উপোস করে থেকো না। থাকে তো বলো।

প্রীতি বলিল,—যদি না খাই ?

প্রণব বলিল,—আমার আতিথেয় তাহলে পাপ স্পর্শ করবে,—ধর্ম যাবে।

হাসিয়া প্রীতি বলিল,—যান আপনি !

—তাই যাচ্ছি, প্রীতি।

—না, আপনাব সঙ্গে কথায় পাবা ভাব। বলিয়া প্রীতি চলিয়া যাইতেছিল; প্রণব বলিল,—খাবে তো ? বলো। উপোস দেবে না ?

—না, না।

—কি না ? খাবে না ? না, উপোস দেবে ?

—খাবো,—খাবো।

—আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি তাহলে, কথা দিয়েচো ! বলিয়া প্রণব ওভাব-কোট গায়ে দিয়া ঘর

হঠাতে বাহির হইল। প্রীতি বলিতে যাইতেছিল, কাল একটু সকাল-সকাল আসিবেন তো ? কিন্তু লজ্জায় সে কথা আব বলা হইল না।

বাহিরে সশব্দে প্রণবের গাড়ী যখন ফটক পাব হইয়া বাস্তায় পড়িল, তখন প্রীতি একেবারে কৌচের উপর দেহভার লুটাইয়া দিল। লুটাইয়া দিয়া ভাবিল, না, এমন লোক, এমন দবদী, এমন দবাজ বুক—পরিচয় বলিতেই হইবে। না হইলে নিজের মনের কাছে সে মস্ত অপবাদী হইয়া বসিয়া থাকিবে ! তারপরও ইনি ছাড়িয়া না দেন, তবু তাহাকে চলিয়া যাঠিতে হইবে, নহিলে—

নহিলে লোকে উঁহার নিকলস্ চরিত্রে কোনদিন যদি এক বিন্দু কালির ছিটা দেয় ? না, না, চলিয়া যাঠিতে বুক তাহার ভাসিয়া ছিঁড়িয়া গেলেও সে কালিব বিন্দু প্রীতি সত্য কবিত্তে পারিবে না !

তবু চলিয়া যাইবার কথা মনে হইতে সমস্ত প্রাণে যেন ঝড় বঁচে থাকে ! সে ঝড়ে প্রাণের মধ্যে মনের মধ্যে যা কিছু আছে ভাবনা-চিন্তা, সাধ-আশা, কল্পনা সব ছিঁড়িয়া পড়িয়া প্রাণ ও মন যেন একেবারে সাক হইয়া যায়, খাঁ-খাঁ করিতে থাকে।

—১০—

প্রণব চলিয়া গেলে প্রীতি তাড়াতাড়ি কিছু আশাব করিয়া ঘরের মধ্যে সেই কৌচটাতে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এই ঘর, এই নির্জন কোণ, এই সঙ্গ,—সব ছাড়িয়া কাল কোথায় কোন্ অনির্দিষ্ট পথে লক্ষ্য-ভারা গতি লইয়া তাহাকে বাহির হঠাতে হইবে ! প্রণব মুখে যত আশাস দিক, নিজের সমস্ত পরিচয় খুলিয়া বলিবার পব সে নিজেই বা কোন্ মুখে এখানে থাকিবে দয়াব পাত্রী হইয়া ? তা-ছাড়া প্রণব তাহাকে না ছাড়িলেও প্রীতি যদি এইখানেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে লোকের মুখে-মুখে এমন গ্রানির কুংসা সহসা এক দিন হয়তো রটিয়া উঠিবে যে, প্রণব অন্তবে জলিয়া থাকু হইয়া যাইবে ! এত ককার, এমন স্নেহের বিনিময়ে প্রণবের বুক সাধ করিয়া সে অশান্তির খোঁচা মারিবে ? তাও কি হয় কখনো !

অনেক রাজি পর্যন্ত তেমনি বসিয়া প্রীতি নানা কথাই ভাবিতে লাগিল। শেষে মনে হইল, যেমন আছি, এমনি থাকি ! অনন্ত কাল ধরিয়া এমনি সুখে, এমনি লোক-চক্ষু অস্ত্রবালে, জগতের বাহিরে, এই নির্জন কোণটুকুতে ! এ কোণটুকুতে বসন্তের হাওয়া, সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, পাখীর কুজন—কোন্ সুখই বা নাই ! প্রণব যখন এমন আশাসও দিয়াছে—পরিচয় সে জানিতে চায় না !

প্রীতি চূপ করিয়া চক্ষু মুদ্রিয়া নিস্পন্দের মত কোঁচে পড়িয়া বসিল। তারপর হঠাৎ এক সময় গা ঝড়িয়া উঠিয়া মনে মনে বলিল, না, তা হয় না! এমন কাপুরুষ সে! এত দুর্বল মন! ছি! সাহস কবিয়া সত্যের সামনে সকল আবরণ ঠেলিয়া ফেলিয়া নিজেব সত্য পরিচয় লইয়া সে দাঁড়াইবে, এ রত্নের কুতলি কাটাওয়া দাঁড়াইবে—তাব পর যা হয়, সে তাহা মাথা পাতিয়া লইবে! পথেই যদি দাঁড়াইতে হয় তো দাঁড়াইবে। এই প্রণবের সঙ্গে সে-দুর্দিনের বাজে এমন অকস্মাৎ পথে বাদ দেয়া না হইত? যে রাত্রে পাষণ্ডের দল যদি পিছনে তাড়া করিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে পিছমোড়া কবিয়া বাধিয়া আবার সেই নরকের আঁধার গহবরে টানিয়া লইয়া গিয়া নিষ্কপ করিত! কথাটা মনে করিতে প্রীতি শিচয়িয়া উঠিল। সমস্ত তাতে-পায়ে যেন কিসের বান্ধন কাঁধা বসিল। কম্পিত-কলেবরে নিজেব পানে খুব সন্দিক্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে একটা নিশ্বাস ফেলিল, পবে হাসিয়া কোঁচে পড়িয়া ভাবিল, এ কি মিথ্যা আতঙ্ক তাহা! কোথায় কে তাহাকে বন্দী করিবে? সে মুক্ত, স্বাধীন! সে আত্ম পথে দাঁড়াইয়া নাই—দুর্গের মত নিরাপদ আশ্রয়-ছায়ায় গা ঢালিয়া সে নানা বড় বড়ীন অলস স্বপ্ন দেখিতেছে! সমস্ত প্রাণটাব মধ্য দিয়া স্বস্তির স্নিগ্ধ-নির্মল বাতাস বহিয়া গেল! সে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

ভাবপর আবার ভাবনা হইল, কেমন করিয়া আসামীয় মত প্রণবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের দুর্গতি দুর্ভাগ্যের অত-বড় কাহিনী অচপল মুক্ত কর্তে আগাগোড়া সে খুলিয়া বলিবে! অথচ বলিতেই হইবে, এবং কাল! না বলিলে তাহার নিজার নাই না, বলিলে একদণ্ড চলিবে না! কাল সকালেই প্রণব আসিয়া যখন এখানে দাঁড়াইয়া ডাকিবেন—প্রীতি—তখন সে কি বলিয়া নিজেব আশঙ্কা, বিধা ভয়, সব দূরে ঠেলিয়া অকম্পিত চিত্তে সব কথা বলিয়া যাইবে! সে কথার মধ্যে কতখানি সংশয়, কতখানি ভয়, কতখানি লজ্জা, কত দুশ্বা, কত গ্রানি যে জড়িত আছে! তাছাড়া মৃত্যু আজ ষাটাই বলিয়া যাক, কাল সকালে প্রণব কি তাহা এই পবিত্রত্বকে স্তম্ভিত আশ্রয়েই এখানে আসিয়া দাঁড়াইবে না? প্রীতির সমস্ত মন এক তীক্ষ্ণ কাঁটার খায়ে জর্জরিত হইয়া উঠিল। দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল। ঘরের মধ্যে বাতাস যেন শুষ্ক হইয়া গেল—নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।

সত্যই যদি এ নিশ্বাস চিরকালের জগৎ বন্ধ হইত, তাহা হইলে সে বেশ হইত! কত বড় অগ্নি-পরীক্ষার দায়ে সে খালাস হইতে পারিত! কিন্তু সে-ভাগ্য কি তাহার হইবে! সমস্ত দুনিয়ার উপর তাহার রাগ হইল। পূর্বের পাপের ভার তাহাকে বহিতে হইতেছে কেন?

তাহাব কি অপরাধ? সে তো কোন দোষে দোষী নয়! পূর্বের কলঙ্কের দাগ তাহাকে এ জীবনে এমনি মার্কা মারিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে যে, সে দাগ ঢাকিবাব কাহারও সাধ্য নাই! সেই কালো দাগগুলো মুখে-বুকে সর্বদা মাখিয়া এই কালি-মাখা মুখে তাহাকে বেড়াইতে দেখিলে সোকে হাসির বাণ মারিবে, ঘৃণাব ঢেলা ছুড়িবে, লাঞ্ছনার শব্দবৃষ্টি করিবে—আর সে-সব তাহাকে সহিয়া থাকিতে হইবে! তাহার জুঁকটিটুকু করিবাব যো নাই—করিলে লাঞ্ছনার মাত্রা বাড়িবে বই কমিবে না! এই আঘাত ও লাঞ্ছনার জগৎ কাহাবো কাছে নালিশ করিতে পারিবে না—নালিশ করিলে তাহা বিজ্ঞপের ফুৎকারে তখনই বাতল নামজুঁব হইয়া যাইবে। অথচ সেও জন্ম লইয়াছে ঐ উগ্রদেহের মত শুভ্র অকলঙ্ক মন ও নিষ্পাপ শরীর লইয়া! তাহা বে, এই রকমেই এ জীবনটা তাহাকে কাটাওয়া যাইতে হইবে! সকলের ঘৃণাব পাত্র হইয়া অস্পৃশ্য হীন জানোয়ারগুলার মত! দাধ কবিয়া এ ভার বহিয়া বেড়ানো কেন? কিসেব আশ্রয়? প্রীতির মনে হইল, নিজেকে সে বেশ করিয়া একবার ঢাককাইয়া দেয়! কেন এ মুখ লইয়া এখানে এই গৃহ-কোঠারে আসিয়া সে আশ্রয় লইল? সে-বাজে কেন প্রণবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিল? এদূরে গঙ্গায় অতল জল ছিল—সেই জলেব তলে আশ্রয়ও ছিল প্রচুর! তবে?

অনেক ভাবিয়া প্রীতি বুঝিল, মধ্য হইবে না! মরিতে সে পারিবে না। মরার কথা মনে হইলে গা ছম্ ছম্ কবিয়া ওঠে! এই শূন্য পৃথিবী,—হাসি-গানের এই অনন্ত উৎস, জীবনের এই স্নিগ্ধ-শীতল শুভ্র ধায়া,—এই নিম্নল শীতল ধায়ায় এ কালি কি মুছিয়া ফেলা যায় না। পরেব দেওয়া এই কালি? এই শীতল ধায়ায় বুকের দাঠ নিবানো কি এমনি অসম্ভব? সে আর ভাবিতে পারে না!—প্রণবের পায়ে সমস্ত কথা নিবেদন কবিয়া সে তাহাব পরামর্শ লইবে—ওগো, তুমি আমায় বলিয়া দাও, আমি এখন কি করিব? বাঁচিব, না মৃত্যুর কোলে সমস্ত বিসর্জন দিব?

সে ভাবিল, না, মুখে এত কথা শুধাইয়া বলা যাইবে না। কাগজে লিখিয়া সব কথা জানাইবে! প্রণব যখন সে কাহিনী পড়িবে, তখন সে অন্তবালে দাঁড়াইয়া দেখিবে, সে কাহিনী পড়িতে পড়িতে প্রণবের চোখে ঘৃণাব কালি ঘনাইয়া ওঠে, না, সমবেদনার নির্মল ধারা দুই চোখে ছাপাইয়া ঝরিয়া পড়ে! ঠিক! সেই ঠিক হইবে। প্রীতি উঠিয়া ড্রয়ার হইতে কাগজের তাড়া বাহির করিল—টাবিলের উপর প্যাডের পাশে প্রণবের ফাউন্টেন পেন ছিল—পেন লইয়া আলোটা আরো উজ্জ্বল করিয়া দিয়া সে নিজের কাহিনী লিখিতে বসিল।

লিখিতে গিয়া সে দেখিল, এ সহজ ব্যাপার নয়,—কোন্থান হইতে কি কথা দিয়া আবশ্য কবা যায়! বাজে কতকগুলি যা-তা লিখিয়া প্রণবকে বিরক্ত করা চলিবে না—অথচ এমন সংক্ষেপে আসল কথাটুকু লিখিতে হইবে, যাহা পড়িয়া প্রণব নিরপেক্ষ বিচার কবিত্তে পারে। কোনো একম উচ্ছ্বাসের ঘোঁকায় ফেলিয়া সে চায় না যে প্রণব কৃপার পাত্রী বলিয়া তাহাকে কৃপা করিয়া এসে। দয়া নয়—সে তা চায় না। সে চায় বিচার, নিরপেক্ষ বিচার।

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া একরকমে সে একটা কাহিনী রচনা কবিয়া ফেলিল। তারপর আগাগোড়া সেটা পড়িয়া দেখিল,—ঠিক হইয়াছে। কোথাও সে বং ফলায় নাই—সকল কথা অকপটে খুলিয়া লিখিয়াছে। একটা জায়গায় মনেব নিভৃত কথা কয়টা বলিয়া ফেলিয়াছে—সেগুলো কাটিয়া দিবে? তাত বন্ধ-বন্ধ করিতেছে,—মাথা-কাণ গরম আগুন হইয়া ঝাঁঝ কবিত্তেছে, সমস্ত শরীর মাতালের মত টলমল কবিত্তেছিল। সে ভাবিল, থাক, আর কাট-কট করিয়া কাছ নাই। কলমের মুখে আপন! তইতে যেটুকু বাতিব হইয়াছে, তাহাতে বুদ্ধিব প্রলেপ লাগাইবার দরকার নাই!

থানাব ঘড়িতে ঢং ঢং কবিয়া তিনটা বাজিয়া গেল। কাগজগুলি একটা বড় খামে পুথিয়া খামের উপর স্পষ্ট কবিয়া বড় বড় পবিত্রার অক্ষরে সে লিখিল—

শ্রীযুক্ত বাবু প্রণবনাথ রায়,  
শ্রীচরণে—

এইটুকু লিখিয়া উঠিয়া পাশের কোঠে সে অলস দেহ-ভার লুটাইয়া দিল। ছুই চোখ উত্তেজনার ঝাঁজে প্রান্তির আবেশে ঘুমের ঘোবে মুদ্রিয়া আসিয়াছিল। কোঠে গা গড়াইয়া দিবামাত্র সে ঘুমাইয়া পড়িল।

—১৪—

সকালে প্রণব আসিয়া ডাকিলে তবে তাহার ঘুম ভাঙ্গিল; উঠিয়া সে ভাবী অপ্ৰতিভ হইয়া পড়িল। প্রণব বলিল,—এখানে শুয়ে ঘুমুজিলে যে?

শ্রীতি কোন কথা না বলিয়া লেখার তাড়াটা হাতেব মধ্যে লুকাইয়া ধীরে ধীরে প্রশ্নান কবিল। প্রণব অবাক হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরেই মুখ-হাত ধুইয়া আসামীর মত কম্পিত বক্ষে শ্রীতি আসিয়া লেখার তাড়াটা প্রণবের হাতে হস্তিয়া দিয়া বলিল,—এই আমার পবিচয়। কষ্ট করে দৈর্ঘ্য ধরে সবটুকু পড়বেন।

প্রণব হাসিয়া বলিল,—এ কোনে' মাসিক পত্রে পাঠাতে হবে না কি, শ্রীতি?

শ্রীতি কোন কথা বলিল না—নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রণব তাহার মুখের পানে চাহিল, শ্রীতিব মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। লজ্জিত হইয়া প্রণব বলিল,—এর কোন দরকার ছিল না, শ্রীতি। ছোট বোনের এত-বড় লম্বা পবিচয় কোন বড় ভাই আর কবে চেয়ে থাকে?

শ্রীতি অত্যন্ত মুহু কণ্ঠে বিনীতভাবে বলিল,—না, পড়ুন।

প্রণব আবার তাহার মুখের পানে চাহিল—সে মুখে বেদনাব এমন কালো ছায়া যে দেখিয়া প্রণব শিহরিয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে পারিল না।

শ্রীতি বলিল,—দয়া কবে পড়ুন!

প্রণব কহিল,—আচ্ছা, পড়বো'খন। তার জন্তে এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন?

শ্রীতি কহিল,—না, অর্থান পড়ুন, নাহলে আমার স্বস্তি হবে না। শ্রীতির সমস্ত হৃদয় সত্যই অতি অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কাঁটার মত কি-একটা যেন বৃকে ফুটিয়া অনববত খচ-খচ করিতেছিল।

প্রণব বলিল—আচ্ছা, পড়চি। কিন্তু—

শ্রীতি দৃঢ় স্বরে বলিল,—কিন্তু নয়। দয়া করে পড়ুন।

—পড়চি—বলিয়া প্রণব কাগজের তাড়া খুলিয়া পড়িতে বসিল।

শ্রীতি তখন ধীরে ধীরে সে ঘর হইতে বাতির ভুইয়া পাশের ঘবে একটু আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। প্রণবকে দেখানে হইতে স্পষ্ট দেখা যায়। প্রণব লেখা পড়িতে বসিল, আর শ্রীতি দেখিতে লাগিল, প্রণবের মুখে-চোখে কি ও ভাবের স্রোত খোলয়া বহিয়া চলিয়াছে! বুকটার মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল—যেন প্রতিক্ষণে কে বৃকে যুগের ঘা মারিতেছে! কাঠগড়ার আসামীর মতই চিন্তা-ক্লিষ্ট ব্যাকুল মন! প্রণব পড়িতে লাগিল। শ্রীতি লিখিয়াছে—

আমি পতিতার মেয়ে। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলেই আমার কথা শেষ হইবে না। আমি আজ সব কথা খুলিয়া বলিয়া বিচার চাহিতেছি। আমি পতিতার মেয়ে, কিন্তু সে কি আমার মস্ত অপরাধ? এত বড় অপরাধ যে মানুষের সভায় আমার স্থান নাই? মানুষ দেখিলে অত্যন্ত কুণ্ঠায় অস্পৃশ্য জানোয়ারের মত অন্তরালে সরিয়া যাইতে হইবে?

কথাটা সব খুলিয়া বলি। যে নারী আমার এই পৃথিবীতে আনিয়াছিল, বাগে আজ তাহাকে অভিশাপ দিতে চাহিলেও মনে ককণা যে এতটুকু হয় না, এমন নয়! অভাগিনী!

সে নারী, অর্থাৎ আমার মা পেটের দায়ে কলিকাতা সহরে এক মস্ত-বড় সংসাবে চাকরি করিতে আসে। এক

মুহুর্ত অন্ন সংগ্রহের উপায় না থাকিলেও বিদাতা রূপ ও যৌবন-ধনে হতভাগিনীকে বঞ্চিত করেন নাই। বিদাতার এই ককণার কথাই বড় বড় বইয়ে বহু পাণ্ডিত্য খরচ করিয়া নানা মূর্নি নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার পণ্ডিত, ভগবানের ককণা তাঁতবাই ভাল বোঝেন। কিন্তু এই ককণা দায়ে ঠেকিয়া বেটাবা আমি আজ জলিয়া-পুড়িয়া থাক্ হইতেছি।

কলিকাতার সেই বাবুদের বাড়ীর এক তরুণ উত্তরাধিকারী অভাগিনী নারীব একদিন সর্বনাশ করিল। সর্বনাশই! অভাগিনী কিন্তু তখন এ সর্বনাশের কথা একটুও বোঝে নাই! আদব সোভাগের মধুব বচন, মিনতির ললিত কোমল স্বব্রাণে তাহার চাঁদের জ্যোৎস্না ফুটাইয়াছিল, বসন্ত জাগাইয়াছিল। শত মিথ্যা ছলনায় ভরা হইলেও তাই সে গোপনে ঐ প্রণয়ের উজ্জ্বলগুলাকে অমর-লোকের অমৃত-ধারার মত পান করিয়া নিজেব ভ্রমকে সার্থক মনে কবিতেছিল। তাবপর একদিন সমস্ত গোপনতাব বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের মোহ কাটিয়া আমার আগার সম্ভাবনা জাগিল। অভাগিনী সেদিন বুঝিল, স্বধা বালয়া কি বিষ সে আকর্ষণ পান করিয়াছে! পাপিষ্ঠ তরুণ যুবা এই সম্ভাবনাব সূচনা-মাত্রই পশ্চিমে হাওয়া খাইতে চলিয়া গেল, আব বড় লোকের বাড়ীর কঠিন নিষ্ঠুর লাঞ্ছনা-নিখাতন অভাগিনী নারীব শিরে বাজের মত আসিয়া পড়িল। চুলের মুঠি ধরিয়া বাড়ীর লোক পাপের গাছটাকে কাটিয়া বিদায় করিল, আর পাপের গাছ জলিয়া-জলিয়া স্বহস্তে বে রোপণ করিয়াছিল, সে নিজের পুরুষত্বের দোহাই পাড়িয়া তরুণ বয়সের একটা অবিরেচনাব কালি মুছিয়া আবার মানুষের সভা আলো করিয়া বসিল। অভাগিনী মা পথে দাঁড়াইয়া যখন বুঝিল, কান্ পথে পা দিয়াছিল, তখন সব পথ এড়াইয়া এ জন্মের মত যাত্রাটাকে শেষ করিবার জন্ত গঙ্গার ঘাটে গিয়া দাঁড়াইল! সেখানে ওপারের যাত্রী হইতে গিয়া আমার জন্ত মায়া তাব উথলিয়া উঠিল—তাই পারেন নৌকা ফিরাইয়া মা সেই ঘাটেই পড়িয়া রহিল। তার দুইদিন পরে রোগান্ত নারীব উপর সহানুভূতি দেখাইয়া পাঁচজন তাহাকে ধরিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেই হাসপাতালের ঘরেই আমি জীবনের মুখ দেখিলাম। পৃথিবীর আলো-হাওয়া আমার নিজের বুকে তুলিয়া লইল। আমার সর্বদা কালির ছাপ মাঝিয়া সংসারের বুকে আমাকে ছাড়িয়া দিয়া অভাগিনী মা মরিয়া বাঁচিল।

একদল নারী আছে, নিলজ্জের মত তাহার শুধু নিজেদের দেহ বিক্রয় করিয়াই ফেরে না, রূপ-যৌবনের পশরা লইয়া মানুষের লালসাব হাতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াই তাহাদের ভুগি হয় না—তাহারা চায়, ফুলের মত অমনি

শত শত শুভ হৃদয়গুলিকে পুড়াইয়া ছাই করিয়া সেগুলিকে লইয়া ব্যবসা ফাঁদিত। আমি অমনি-এক রাফদীর হাতে পড়িলাম। সে আমাকে মার আদরে বুকে তুলিয়া লইল। ফুলের মত আমার হৃদয়টাই শুধু ছিল না,—ভুনিয়াছি, আমি নাকি রূপেব ছটায়, মাধুর্য্য, স্বহমায় ঐ ফুলের মতই ছিলাম।

তাহারি ঘরে বড় হইতে লাগিলাম। রোদে সে আমায় বাইতে দিত না, পাছে রোদের জ্বলসে রূপ আমার শুকাইয়া যায়! ব্যসা পরে ভালো চলবে ভাবিয়া সে আমাব জন্ত মাঠার রাখিয়া দিল—তাহারি কাছে লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলাম, গান শিখিলাম।

বয়স যখন আমার দশ বৎসর, তখন হঠাৎ একদিন পুলিশ আসিয়া ছোঁ মাঝিয়া আমাকে সে রাফদীর হাত হইতে জিনাইয়া লইয়া গেল। রাফদীর তখন সে কি বুক-ফাটা কান্না! সে পুলিশের পায়ে ধরিল, কত স্তপাশি আনিল। কত বড় লোক—আমাব বড় হওয়ার আশায় যাহারা অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছিল,—তাহারা আসিয়া নানা ফন্দী বাতির করিল, কত টাকা খরচ করিয়া উকিল-কৌশলী দাড় করাইল, পুলিশ কিন্তু কাহারো কথায় কর্ণপাত করিল না—আমাকে এক আশ্রমে পাঠাইয়া দিল।

আশ্রম বেশ লাগিল। এক মেম-সাহেব আমার ভাব লইলেন। আমার মত আরো পাঁচ-সাতটি বালিকা সেখানে ছিল। তাহাদের সঙ্গে ক্রমে ভাব হইল। কিন্তু আশ্রমে তাহাব যেন খাঁচার পাখীর মত ছটফট করিতেছিল—কেবল ফাঁক খুঁজিতেছিল, কোনো ফাঁক দিয়া উড়িয়া বাহিরে যদি একবার পলাইতে পারে! সে সুরে আমি কিন্তু স্ব মিলাইতে পারিলাম না! বাহিরে কোথায় বাইব? বাহিরের বাতাস কেমন ধোঁয়ায় ভরা মনে হইত। চোখ জ্বালা করে—সমস্ত প্রাণ তাহাতে হাঁপাইয়া ওঠে!

মেম-সাহেবের কাছে প্রথম শুনিলাম, আমার জীবন, কি সে জীবন, কেমন জীবন! যে আমাকে মার আদরে মানুষ করিতেছিল, সে কেন এত আদর করিত—কি তাহাব লক্ষ্য, তাহাও জানিলাম! তাবপর নানা বই পড়িয়া, জগতের নানা তথ্যের পরিচয় পাইতে লাগিলাম! বুঝিলাম,—আমি ঘৃণার বস্তু। গ্লানির পক্ষে আমাব জন্ম। এই এত-বড় বিধে কোলাহল-ভরা লোকের সমাজে আমার এতটুকু স্থান নাই!

বয়স বাড়িয়াছিল। পনেরো বছর বয়সে আলোয়-বাতাসে মেয়েমানুষের মন আপনি পাকিয়া ওঠে—তার উপর সেই সঙ্গিনীদের কথায়-বাগ্ধায়, মেমেদেব আলোপ-প্রসঙ্গে মনের পবিচয় পাইতে আমাবো কোন অস্ববিধা ঘটে নাই! মেম-সাহেব বলিল, বুঠান হও, তাহা

হটলে জীবনটার কতক তবু স্বাদ পাইবে! বিবাহেই নারীর জীবনের সার্থকতা, স্বামীর প্রণয়েই নারীর সব পাওয়া। অর্থাৎ খুশান হটলেই শুধু এ সম্ভাবনা আমাব আছে—নহিলে ঐ পাপেব মধ্যে পাপাব শরীব-মনের থোবাক জোগাইয়া কোথায় শেষে গিয়া পড়িব, আমাব মোটে তল্লাসই পাওয়া বাটবে না!

মাঝে মাঝে বায়োঙ্কোপে যাইতাম, মেমের সঙ্গে। পুরুষ ও নারীর প্রণয়-সান্নাধ্য মধ্যে পনেরো বৎসর বয়সের কিশোরীর মন যে কি ভাব অনুভব করিত, সে আমাব মনই জানে—সে কথা খুলিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই! তবে খুশান হইয়া একটা সোনালি পাতে নিজে ক মুড়িয়া পণ্যের মত খুশানেব পাতে বিকাইতে দাঁড়াইব, এ কথা মনে করিতে যুগায় আমার সর্কশবীর শিহরিয়া উঠিত। কেবল ভাবিতাম, জন্মেব মধ্যে একটা বিনী ইতিহাস আছে বলিয়াই লোক-সমাজে আমাব ঠাঁই নাই? জন্ম-বলে মনের মাধুর্য্যে আমি যদি নিকলক মানুষ হই, তাহা হইলেও আমি চিরদিন এমনি হৈয় হইয়া থাকিব কেন? আমাব এ-মনেব কি কোন দায় নাই? এই যে মনকে চারিধারের কালির ছোপ হইতে বাঁচাইয়া অমলিন রাখিয়াছি? এ মনটার পানে সমাজ চাহিয়া দেখিবে না? শুধু কবেকার একটা ইতিহাসের জীর্ণ মলিন পাতা কয়খানা খুলিয়া অবজায় সে মুখ ফিরাইয়া থাকিবে? তা যদি থাকে, তবে সে সমাজের দ্বাবে আমি দাঁড়াইতে চাহি না!

বায়োঙ্কোপে দেখিয়াছি,—এমন পাঁকে জন্ম লইয়া কত নারী যে পদ্মেব মত সমাজেব বৃকে অমল শোভায় অপরূপ মাধুর্য্যেতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বথ-শাস্তিরও তাহাদের অভাব নাই! বায়োঙ্কোপ হইতে ফিরিয়া কত রাত্রে ভাবিয়াছি, কি চমৎকাব ঐ সাহেবদের সমাজ! মানুষকে যাহারা মানুষের চোখে দেখে! সমস্ত সংস্কার, সমস্ত ইতিহাসেব খোশা ছাড়াইয়া খাঁটি মনটুকুর তাহারা দরদ কবে, দরদ করিয়া তাহারা ক্রায়া মূল্য তাহাকে দেয়! মানুষকে তাহারা এতখানি যুগা করে না! আর এখানে আমাদের সমাজে? কাটা খালের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট গভী ধরিয়া সকলকে চলিতে হইবে! মানুষের নিজের দাম এখানে কিছু নাই! দাম যা-কিছু, তা তার বংশের, তার অভিজাত্যেব! নহিলে যে-অভাগিনীর জঠর হইতে আমি আসিয়াছি, তাহাকে বে দিন সমাজ চুলের মুঠি ধরিয়া পথে বেদাইয়া দিয়া চোখ বাড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়িল, সেই সমাজেই সে দিন সেই নবাধম উত্তরাধিকারীটার একটি কেশাগ্র কেহ স্পর্শ করিল না! সমাজে উঁচু গদিতে তাকিয়া হেলান দিয়া রাজচক্রবর্তীর মতই সে দিব্য বসিয়া রহিল!

এমনিভাবে এফৎয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন লইয়া আরো কয় মাস কাটিয়া গেল। শেষে একদিন তলব আসিল সেই পুলিশেব অফিসে—যেখান হইতে আশ্রমে চালান হইয়া আসিয়াছিলাম। মেমের সঙ্গে পুলিশেব অফিসে আসিলাম। সেই বাক্সটোটাও আসিয়াছিল—যে আমার মা সাজিয়া আমাকে মানুষ করিতেছিল! আমায় দেখিয়া দুই চোখে সে বান ডাকাইয়া দিল! শরীর তাহার জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চুলে পাক ধরিয়াছে। সাহেবের সম্মুখে আসিয়া সে বলিল,—আমাব বিবাহের সে ঠিক করিয়াছে! আমাব দেহ ভাডায় খাটাইয়া পয়সা বোজগাবের এতটুকু অভিপ্রায় তাহার নাই। আরো এমনি কত কথা সে বলিয়া গেল। বিবাহ না দিয়া অমন গর্হিত চেষ্টা যদি কবে, তবে সে এক হাজাব টাকা খেয়ায়ং দিবে—এমনি সন্তে মূলেকা দিতেও প্রস্তুত আছে।

পুলিশ আমায় বলিল,—ইহাব সঙ্গে বাটবে?

আমি বলিলাম,—বাটব।

আসল কথা, মেমেদেব আশ্রমে মনটা যেন হাঁফ ফেলিতে পারিতেছিল না—দেওয়ালেব গভীর মধ্যে শুধু নীরস উপদেশ আর খুশানেব মাতায়া-কথা শুনিতে শুনিতে আমি কেমন শিহরিয়া উঠিতেছিলাম। এখানে জীবন কোথায়...জীবনের সে মলয়-হিল্লোল? প্রাণ আমার তাহারই প্রশ্ন খুঁজিয়া মরিতেছিল! তাবপব যখন-তখন ওখানকাবই একজন কস্মটাবী আমাব পানে কি-এক দৃষ্টিতে চাহিয়া কয়দিন এমনি হাসিয়া আলাপ কবিত্তে আসিতেছিল,—ভাবিলাম, দূর হোক, যাই ইহার সঙ্গে! মানুষ করিয়াছিল! একটু মায়া কি নাই? তার উপর যখন বলিতেছে—

বাক্সটোর সঙ্গে তাহার বাড়োতেই আসিলাম। সে এই সে দিনের কথা।

আমায় পাইয়া বাক্সটোর যেন হাবামণি ফিরিয়া পাইল। কি সে আদর-বদর। তার বাড়ীতে আরো কতকগুলো ছুঁবাগিনী নারী ছিল। আমি থাকতাম তেতলার ঘরে—সেখানে রাত্রে তাহাদের গানের আওয়াজ আসিয়া কণ্ঠে এমন বেতলা বাজিত যে, আমার সর্কাদ্র ছম্-ছম্ করিয়া উঠিত।

একদিন বাক্সটোর ঘরে বসিবা একখানা বই পড়িতেছি—দুপুরবেলা—ইঠাং জুতার ছপ ছপ শব্দ তুলিয়া এক যুবা আসিয়া উপস্থিত। আমায় দেখিয়া সে হাসিয়া ঘবে ঢুকিল। আমি তখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম। যুবা আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিল। আমি বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলাম। সে ডাকিল, আমার নাম ধরিয়া—কত পরিচিতব ভঙ্গীতে!

বিল্লী লাগিল। কোনো জবাব না দিয়া চলিয়া

বাইতেছিলাম; রাফসী আসিয়া হাসিয়া বলিল,—  
কোথায় যাচ্ছ মা?

কোন কথা না বলিয়া বাহিরে বাবান্দায় আসিয়া  
দাঁড়াইলাম। নীচে নামিতে পাবিলাম না। নীচে  
তখন অত্যন্ত কদর্য ভাষায় দুটা নারী গালি-গালাজ  
করিতেছিল। সমস্ত বাতাস নিমেষে এমন দুর্গন্ধে  
ভরিয়া উঠিল যে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল।  
আমি বাবান্দায় বেলাং পরিয়াই দাঁড়াইয়া বহিলাম।  
একটু পবে হঠাৎ সে যুবা বাহির হইয়া গেল, বাইবাব  
সময় বলিয়া গেল,—বাগ করো না। মাপ করো।

করণ নিবেদনে ভরা স্বব, তবু বিরক্তি ঘুচিল না।  
নীচে নামিয়া একবার উপব-পানে তাকাইল। আমি  
তাহাকেই লক্ষ্য করিতেছিলাম—কোনো সঙ্কল্প বা উদ্দেশ্য  
লইয়া নয়! এমনি, অলস ভাবে। আমার চোখে  
চোখ পড়িতে সে একটু হাসিল। সে হাসি এমন কদর্য  
যে আমার হুই চোখে যেন কে আগুন ছুড়িয়া মারিল!

ঘরে আসিলাম। রাফসী বলিল,—যে-ভাগ্য নিয়ে  
জন্মেচো মা, কি কদবে বলো? এই দেহ আর রূপ দিয়ে  
যা কিছু কামিয়ে নিতে পারো! না হলে উপায় কি!  
পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে পারবে না তো!

ঘৃণার বিষে মন ভরিয়া গেল। আমি সব বুঝিয়া  
বলিলাম,—পুলিশের কাছে কি বলে এসেচো, মনে নেই?  
ভয় নেই? আমার চোখে জল আসিল।

রাফসী বলিল,—কৈদে ফল কি মা। এ কাম্যায়  
কিছু উপায় হবে না। এখন এমন ঘরে জন্মেচো, তখন  
এই নিয়মই থাকতে হবে। অদৃষ্ট তো বদলাতে পারবে  
না।

নিরুপায় মুর্ছিতের মত বসিয়া পড়িলাম। রাফসী  
চলিয়া গেল। তাবপর আবাব সব চুপচাপ! ঝড়ের  
পূর্বে প্রকৃতি যেমন স্থির থাকে, তেমনি! কিন্তু ঝড়  
শীঘ্রই উঠিল। ঝড় উঠিবার পূর্বে তার লক্ষণটুকুও  
জানিতোপারি নাই!

যে রাত্রে পথে আপনার গাড়ীর সামনে কাঁদিয়া  
আসিয়া পড়িলাম, সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে হঠাৎ রাফসী  
আসিয়া বলিল,—তোমারই কথা থাকবে মা। এ  
বাড়ীতে তোমায় রাখা চলবে না, পাঁচজনে ভারী বিরক্ত  
করচে। কলকাতা ছেড়ে পালাই চলো। আজই রাত্রে  
উৎপাত কর্তে পারে।

অত্যন্ত ভীত কুণ্ঠিত চিত্তে রাফসীকে জড়াইয়া  
ধরলাম, পূর্ব বিশ্বাসে, একান্ত নির্ভয়ে, নিবাপদ আশ্রয়ের  
জগ!

সন্ধ্যার ঠিক পূর্বে একখানা গাড়ীতে করিয়া রাফসীর  
সঙ্গে অনেক পথ ঘুরিয়া এক জীর্ণ বাগান-বাড়ীতে  
আসিয়া উঠিলাম। বাহির হইতে জীর্ণ দেখাইলেও

ভিতরটা বেশ সাজানো। আমি প্রথমে বিস্মিত হইলাম,  
পলাইয়া আসিলাম যদি তো এখানে কেন? চারিধারের  
আব-ভাওয়া ভালো ঠেকিতেছিল না। কিন্তু মনের  
সন্দেহ প্রকাশ করিলাম না, শুধু একটা ভীষণ বড়য়  
আশঙ্কা করিয়া সতর্ক রহিলাম।

যা ভয় করিয়াছিলাম, শেষে তাই ঘটিল। খানিকটা  
বাত্রি হইতেই উৎপাত শশরীরে দেখা দিল। কোথা  
হইতে একটা বেঘারা আসিয়া ঝড়ে আলো জালিয়া  
দিল। একটা কোঁচের উপর কেমন বিমূঢ়ভাবে পড়িয়া  
ছিলাম, প্রতিফলনে ভীষণ ঝড়ের প্রতীক্ষা করিয়া।  
শেষে সে ঝড়ও আসিল। তিন-চারজন তরুণ  
যুবা হঠাৎ আসিয়াই সে ঘরে ঢুকিল। আমার দেখিয়া  
তাহাদের কি সে উল্লাস-চীংকার। আমার দশা হইল,  
ঠিক ব্যাপের জালে হরিণের মতই। তাহাদের মধ্যে  
একজনকে চিনিলাম। সে সেদিন ছপূর বেলায় ঘবে  
গিয়া ফিবিবাব সময় মাপ চাহিয়াছিল! সে হাসিয়া  
বলিল,—এখন কোথায় যাবে, সন্দি?

আর একজন গান ধরিল,—ও আমার বনের  
হবিণী!

সমস্ত পৃথিবী আমার পায়ের তলায় হুলিয়া উঠিল।  
একজন ধরিতে আসিল। আমি বাঘের মত তাহার  
উপর ঝাপাইয়া পড়িলাম। গায়ে বাঘের বলই  
আসিয়াছিল। মুহূর্তে একটা ক্ষাপা ঝড়ের মত কাহাকেও  
ঠেপিয়া, কাহাকেও ফেলিয়া ছুটিয়া বাহিরে আসিলাম।  
রাফসী পথ আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সংবেগে একটি  
ধাক্কা তাহাকে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া বাগানের কটকে  
আসিলাম। তাবপর একবার শুধু পিছনে চাহিয়া  
বাগান ছাড়িয়া আসিলাম পথে। ছুটিতে লাগিলাম।  
অক্ষর পথ। পথের ধারে দূরে দূরে একটা করিয়া  
তেলের আলো টিম টিম জ্বলিতেছে! সেই আলোর  
লক্ষ্যহারা ছুটিতে ছুটিতে আপনার গাড়ীর সামনে আসিয়া  
পড়িলাম। তাবপর আপনি আমার এখানে আনিয়া  
আশ্রয় দিয়াছেন!

এখন বলিবার কথা আর কি আছে? আপনার  
কণ্ঠায় নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছি। এমন নিবাপদ  
আশ্রয় আব কোথাও নাই। তবু আজ আপনার আদেশ  
চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি। আমার ধরিয়া রাখিবেন না।  
তাহাতে নানা বিষ, নানা উৎপাত! দয়া করিয়া  
আমায় ছুটি দিন। এ বিশ্বের কোনো নিভৃত কোণে এখন  
নিজেকে আমি লুকাইয়া রাখিব! আপনার করুণার কথা  
জীবনে ভুলিব না। আপনার স্বপ্ন শুধিবার নয়।  
যতদিন বাঁচিব, ভগবানের কাছে শুধু ইহাই প্রার্থনা  
করিব, আপনাকে যেন তিনি চির-স্বখে সখী  
করেন!

—১৫—

এক নিশ্বাসে প্রণব প্রীতির লেখা-কাহিনীটুকু পড়িয়া শেষ করিল। পড়িতে পড়িতে কখনো হর্ষে তাহার চোখ উজ্জ্বল দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে, কখনো বা বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল। এ বেন সুরেব সাগর মন্থন করিয়া আর-সব সুর ডুবাইয়া বিশেষ শুধু এক ভৈরবীর করুণ তান ছুটিয়াছে। এমন বিষাদেব গান সে কখনো শোনে নাই, অশ্রু-সদৃশ এমন করুণ কাহিনী কোনো কেরাবেও বুঝি কোন দিন পড়ে নাই! পড়া শেষ হইলে প্রণব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, নিশ্চল পাশাণের মত মৌনতাব পাঠাড সাজিয়া। মনের মধ্যে ভাবনা-চিন্তার কোন বন্দ্য নাই -- মন হঠাৎ সব কোলাহল সরিয়া গিয়াছে! হুই চোখ সমবেদনাব অশ্রুতে শুধু ভবিয়া উঠিল।

প্রীতি অন্তরাল হইতে প্রণবকে লক্ষ্য করিতেছিল। প্রণব পড়া শেষ করিয়া স্থির হইয়া বসিলে প্রীতি সেই পাশেব ঘরেই এক কোণে ঝড়ের ঝাপটায় আহত পক্ষি-শিশুর মতই মুচ্ছিত হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ পবে প্রণব উঠিল। কাগজের তালুটা হাতে লইয়াই সে প্রীতিব সন্ধানে বাহিরে আসিল। চারি-ধারে ঘুরিয়া প্রীতিকে দেখিতে না পাইয়া উদ্বেগাকুল মনে আবার বখন ফিরিল, তখন দেখিল, ঐ যে, ঐ কোণে প্রীতি একটা কাপড়ের স্তূপেব মত ভূমে পড়িয়া আছে! প্রণবেব প্রাণ হা-হা করিয়া উঠিল। অভাগিনী বালিকাব কাছে ধাবে দীবে আসিয়া সে প্রীতির পাশে ভূমেই বসিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর প্রণব প্রীতিব শির ধরিয়া আপনাব ক্রোডের উপর সে শিব বক্ষা করিল; তাবপর অতি কষ্টে বড় একটা নিশ্বাস চাপিয়া ডাকিল,—প্রীতি—

প্রীতিব বৃকের মধ্যে ভীষণ ঝড় বাহিতেছিল। চাপা কান্না প্রণবেব ঐ একটি ডাকে একেবারে বৃষ্টির দাবার মত ঝরিয়া পড়িল। প্রণব আবার ডাকিল,—ছি, কেঁদো না। ওঠো প্রীতি।

এ কথায় প্রীতির কান্নার বেগ কমিল না, আরো বাড়িল। সে কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া আরো কাঁদিতে লাগিল। প্রণব বলিল,—কেঁদো না প্রীতি! কান্না কিসের জন্ম? এ কাহিনী পড়ে তোমার উপর আমার শ্রদ্ধা কতখানি যে বেড়ে উঠে! এই এতটুকু মেয়ে তুমি—কিন্তু তোমার মধ্যে কি মহিমাময়ী নাবী জেগে বসে আছে, তা তুমি জানো না, কিন্তু আমি তাকেই দেখছি শুধু।

প্রীতি তবু মাথা তুলিতে পারিল না, কান্নার বেগ এতটুকু থামাইতে পারিল না। অশ্রু তখন মনের দুই

কূল ছাপিয়া খরস্রোতে নদীব মতই তীব্র ধাবায় বহিয়া চলিয়াছে।

প্রণব আবার বলিল,—পাপের মধ্যে বাস করেও পাপেব উপর এত ঘণা, পাপেব নামে এমন লজ্জা—এ যে আমার কল্লনাব অতীত ছিল। ওঠো প্রীতি।

প্রণব জোব করিয়া প্রীতির মুখখানি তুলিয়া ধরিল।

প্রীতি সবেগে নিজেকে প্রণবেব পায়েব কাছে লুটাইয়া দিয়া কুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রণব আর কোন কথা বলিল না; সে একদৃষ্টে শুধু প্রীতিকে দেখিতে লাগিল। গ্রাহাব মন বলিল, কাঁদো, প্রাণ ভরিয়া কাঁদো। দুঃখিনী, অভাগিনী বোনটি আমার, চোখের জলে মনেব সমস্ত মেঘ ধুইয়া সাক্ষি করিয়া ফেলো! নিশ্চল নিঃসঙ্গ মনে তোমাব যদি কোন আবর্জনা খিটাইয়া থাকে, বেশ করিয়া চোখেব জলে সে সব ভাসাইয়া দূবে ঠেলিয়া দাও।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্লান্ত হইয়া অনেকক্ষণ পরে প্রীতি মুখ তুলিয়া গাচ স্বরে বলিল,—আমায় ছেড়ে দিন। আমি যাবো।

প্রণব বলিল,—কোথায় যাবে?

—যেখানে আমার হুঁচোখ যায়! নদীব জল—

—ছি, পাগল হযো না, অধীর হযো না। মরবে কি দুখে? বিধাতাব এত-বড় দান একটা নাবীব প্রাণ, সেটাকে পবেব দোষে নষ্ট করবে? না প্রীতি, এ জীবন তোমার সার্থক করো, ধন্য করো।

সার্থক করো! কথাটা প্রীতির কাণে বিদ্রুপেব মত শুনাইল। পাপেব পক্ষে সে জীবনের উদয়, তাহার আবার সার্থক হইবার আশা কোথায়। সে শুধু কাতব দৃষ্টিতে প্রণবেব পানে চাহিয়া বহিল, কোন কথা বলিল না।

প্রণব বলিল,—কথাব কথা বলছি না। জন্মের উপব মানুষেব কোন হাত নেই, কন্মেই তার পবিচয়, প্রীতি। দেশের অনেক মহাত্ম্মার জন্মই দরিদ্রের ঘরে, ছোটব ঘরে, ভীনের ঘবে, তা বলে কেউ তাঁদের মহত্বেব কোনো অমর্যাদা কবেচে কোনো দিন? জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা-অর্থ্য তাঁদের মাথায় পড়ে দগ্ন হয়ে উঠে। ওদিকে তেমনি কত মহাপুরুষেব ঘবে জন্মে কত লোক যে চণ্ডালেবো অধম ঘণ্য হয়ে দিন কাটাচ্ছে! কেন তুমি হতাশ হচ্ছ? তোমাব এই ফুলেব মত শুভ অকলঙ্ক জীবন, তাকে তুমি সার্থক করো। তুমিই সকলের নমস্ত্রা হবে একদিন দেখো। জানো, একজন মহাপুরুষ কি বলে গেছেন,—দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম, মদায়ত্তং তু পৌকরং। এই পৌকরেব জ্বারে জন্মের মহত্ব তুমি জগতে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করো।

প্রীতির কাণে প্রণবেব এ কথাগুলো মস্তেব মত



ওনাটল। এ যে বড় আশার সুর! এ সুর তো সে কোথাও শোনে নাট। আশ্রমের মেমেবা অবধি বলিয়াছিল, যে-ঘরে সে জন্মিয়াছে, তাহাতে এ-জন্মটা কোনো দিক্ দিয়াই সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে না। তবে যদি খুঁটান হইতে পারে, তাহা হইলে কাহারও সঙ্গে বিবাহ করিয়া সংসারে একটা বাসা তুঁ বাঁধিতে পারে, মাথা তুলিতে পারে!

সংসার! সংসারে বাসা বাঁধাতেই কি নারীর জন্মের চরম সার্থকতা! দয়া করিয়া কেহ যদি তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ কবে, তবেই সে ধগা হইয়া বাইবে? আর তা না হইলে ঐ নবকের আবন্তে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে!

এ কথাটাও সেই আশ্রমে বলিয়া কতদিন সে ভাবিয়া দেখিয়াছে। আশ্রমের আবে দুটি-তিনটি মেয়ে, ডালিম, সুরো, পাকল—তাহারা ভয় দেখাইয়াছিল, একদিন সেষ্ট স্বামী সগর্জনে যদি ঘরেব বাহির করিয়া দেয়, দিয়া বলে,—যে ঘবে জন্ম, সেষ্ট ঘরে তুই চলিয়া যা? তাহা হইলে জগতে আব কোন দাব সে খোলা পাইবে না। পুঙ্খবের জগা সহস্র পথ আছে—কিন্তু নারীব খোলা ঐ এক পথ। সে পথেও বিপদের ভয় প্রতি পদে। তবে? সে-অবধি সংসারের আশা প্রীতি ছাড়িয়া দিয়াছে।

তবু মরিতে ইচ্ছা হয় না। মরিবার কথা মনে হইলে সমস্ত প্রাণ শিহরিয়া ওঠে! মরিবার শক্তি যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই দিনই মরিত, যে-রাএ দিক্‌বদিকের জ্ঞান হারাইয়া ছুটিয়া সে প্রণবের গাড়ীর সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল! গাড়ীখানা দেখিতেই আশ্রয়ের ভগ্ন তাহার সমস্ত প্রাণ চাচাকাব করিয়া উঠিল। মরিবার কথা মনে পড়ে নাট। এমন সুন্দর পৃথিবী—মরিবে কোন্‌ ছুৎখো! পৃথিবীকে যে তাহা হইলে দেখাই হয় না!

প্রীতিকে নিকন্তব দেখিয়া প্রণব বলিল,—কথা কচ্ছ না যে? শোনো প্রীতি—মাথা ঠিক কর, চকল হয়ো না। বুঝেচি, তুমি হয়তো ভাবচো, তোমার এ জীবন কেমন কবে সার্থক কবে? কিন্তু আছে, সহস্র উপায় আছে। তুমি আমার বিশ্বাস করো, আমার উপর নির্ভর করো—আমি তোমায় সে সার্থকতার পথ দেখিয়ে দেবো।

প্রীতি বলিল,—আপনার নয় কখনো ভুলবো না। যদি বাঁচতে পারি, তবে সে আপনার দয়াতেই বাঁচবো, জানবেন।

তাবপব প্রণব চটু কবিয়া আব কোনো কথা বলিতে পারিল না। প্রীতি বলিল,—আপনার কথা আমি শিরোধাৰ্য্য করবো। আমি অঙ্ক হয়ে পথ খুঁজে মরচি,

আপনি আমার পথ দেখিয়ে দিন। পূবের পাপের পশর মাখায় যখন বইতে হয়েচে—উপায়ও যখন নেই, তখন কি আর করব! তবে ঐ সংসর্গে আব আমার পাঠাবেন না। তাদের হাত থেকে আমার বক্ষা করুন।

প্রণব বলিল,—কোন ভয় নেই প্রীতি। এখানে যতক্ষণ আছ, জোনো, তুমি নিরাপদ চর্গের মধ্যে বসে আছ। দবকার হয়, বুক দিয়ে আমি তোমায় বক্ষা করবো।

তাবপব একটু স্থির থাকিয়া প্রণব আবার বলিল,—আমার একটা কথা রাখবে প্রীতি?

প্রীতি মাথা না তুলিয়াই বলিল,—কি কথা?

প্রণব বলিল,—বদি রাগো, বল।

প্রীতি বলিল,—আপনার কথা আবার রাখবো না,—এই কি আপনার বিশ্বাস?

প্রণব বলিল,—কথাটা এই, কাল যে-সব পাগলামির কথা বলেছিলে—সে, তুমি এখানে থাকবে না, এখান থেকে চলে যাবে, সে বকম কল্পনা কি এখনো তোমার মনে আছে?

এইটুকু বলিয়া প্রীতির উত্তরের জগা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে আবার বলিল,—আমার কথা হচ্ছে, সে কল্পনা যদি এখনও থাকে, তবে তা ত্যাগ করো। আমার অহুমতি ছাড়া আমার এ ঘর ছেড়ে তুমি কোথাও যাবে না—বলো, এ কথা রাখবে?

প্রীতি বলিল,—রাখবো। তাবপব চারিদিকে চাতিয়া বলিল,—এখান থেকে উঠে চলুন, কেউ যদি আসে...

প্রণব বলিল, ঠিক। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রীতিও উঠিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া বলিল,—আপনি ওবেলায় এখানে থাকবেন তাহলে?

মুহু হাসিয়া প্রণব বলিল,—নেমন্তন্নর কথা ভোলেনি দেখচি।

প্রীতি মনে মনে বলিল, সে কথা কি ভুলিবার! সে কথা বলিয়া প্রীতিকে কতখানি ধগা করিয়াছ—তা তুমি কি জানিবে! তুমি প্রীতিকে যে দায়ে বক্ষা করিয়াছ, তা প্রীতির অন্তর্যামী দেবতা শুধু জানেন! তাহার শোধ দিতে যদি—প্রীতির সর্বদা হুম্‌হুম্‌ করিয়া উঠিল। সে আর ভাবিতে পারিল না, বলিল,—মাংস-টাংস কিছু কববো?

প্রণব বলিল,—না, না। স্রেফ নিরিমিষ। পারবে? রান্নার কেবামতি দেখাতে চাও নিরিমিষ বেঁধে খাওয়াও! মাংস খাওয়ানোটা আন্তরিক পদ্ধতির আতিথ্য। নয় কি? বলিয়া প্রণব হাসিল।

প্রীতি বলিল,—নিরিমিষই হবে।

প্রণব বলিল,—পুরানো কথা মন থেকে এখন মুছে

ফ্যালো। চোখের জলে তোমার বাইরের সব ময়লা মুখে সাক হয়ে গেছে। সে সব কথা ভুলেও আর মনে এনো না। জেনো, আজ তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে। তুমি আর সে প্রীতি নও। পৃথিবীতে যদি তোমার আর কেউ না থাকে, তবু জেনো, সম্পদে বিপদে চিরদিন তোমার পাশটিতে যে থাকবে, সে এই আমি, তোমার বড় ভাই। পুরানো কথা হুলবে তো, বেলো?

—ভুলবো। বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে প্রীতি প্রণবের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া দীর্ঘ পদে চলিয়া গেল। প্রণব একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রীতি দৃষ্টির অন্তরালে গেলে প্রণব একটা ঘোয়াকে বসিয়া পড়িল; বাসিয়া প্রীতির কথাই ভাবিতে লাগিল। প্রীতির ভবিষ্যটাকে সে গড়িয়া দিবার ভার পইয়াছে! কত বড় দায়িত্বের ভার! সে ভবিষ্যৎ কেমন হইবে, প্রণব তাহা ভাবিয়া পাইল না, তবে চকিতে সেই অজানা ভবিষ্যতের অত্মজ্ঞান আলোর একটা আভাষ তাহার চিত্তে এমন আলো ফুটাইয়া তুলিল যে, সে মুক্ত বিষয়ে সেই আলোর নেশায় নিজেকে হাবাইয়া ফেলিল।

—১৬—

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া প্রণব স্নান করিতে যাঠবে, এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—হ্যারে পিছু, তোরা এমন করে বাইরে-বাইরে যদি সময় কাটাস্ তো আমায় আর কেন যথের দন আগলাতে এখানে বাসিয়ে রাখিস্ বাবা? কি নিয়ে আমি একলাটি থাকি, বেলো দেখি?

কথাটা শুনিয়া প্রণব ভাবিল, কাল সে মার সাধের সো-স্বপ্নটুকু যে ভাঙ্গিয়া দিয়া আসিয়াছে, সেই জগৎই মা বুঝি অভিমান করিয়াছেন! প্রণব হাসিয়া বলিল,—আবার সেই সব পুরানো কথা তুলে ঝগড়া বাধাচ্ছ, মা—?

মা বলিলেন,—না বাবা, পুরানো কথা নয়। শশী আমাকে মারবে, দেখচি। কাল রাত থেকে সে আর বাড়ী ফেবেনি। আজ দশটা অবধি বসে বসে এমন অস্থির হয়ে উঠলুম যে বেগীকে একবার তার কাবখানায় পাঠালুম। এখনো সে ফিরচে না—আমার প্রাণ কেমন শিউরে উঠচে।

প্রণব চিন্তিত হইল। কাল হইতে শশাঙ্ক বাড়ী ফিবে নাই? এত কি কাজ? সে বলিল,—কাল বেকবাব সময় কিছু বলে যায় নি?

মা বলিলেন,—সন্ধ্যার পর তো বেকুল,—ভাবলুম, যেমন ধোজ বেরোয়, তেমনি বেকছে। তারপর রাতে ফিরল না—ভাবলুম, দুব ছাই ভাববো না। ক্রমশঃ দেখি, বেলো দুপুর হতে চলেছে, তবু তার দেখা নেই!

প্রণব মার চিন্তাখুল মুখের পানে চাহিয়া বসিল,—এ

তো ভাল কথা নয় মা। দেখি, আমি তেল মেখেচি, চান না করলে নয়—চান কবে আমি নিজেই বেকছি।

মা রাগ করিয়া বলিলেন,—কোথায় তুই সে লক্ষ্মীছাড়া ছেলের পিছনে ঘুরবি বল্ তো? না খেয়ে না দেয়ে, এই দুপুর রোদে?

প্রণব বলিল,—তা বলে খবর নেব না?

মা বলিলেন,—তা নিবি, নে না। তবে এত তাড়া কেন! বেগী ফিরুক। তুই তার মধ্যে নেয়ে খেয়ে নে

প্রণব একটু বিস্মিত হইল। শশাঙ্ক এখনো ফেবে নাই! মাতার জ্ঞান চিন্তিত, তবু তাব না খাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত কাববেন না! সে কিছু না বলিয়া বাথ-রুমে যাঠিতেছিল, মা ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিজেব মনেই বলিলেন,—আমার পাপের দস। অন্ধ স্নেহে পিছুর কাছে লুকিয়ে রাখছিলুম।

শেষের কথাটা প্রণবের কাণে গেল। সে বলিল,—কি লুকিয়ে রাখছিলে মা?

মা চোখ ছল-ছল কাবতেছিল; চট্ কবিয়া তাঁহার কোন কথা জোগাইল না। প্রণব মার চোখের জল ও মুখের ছল-ছল ভাব লক্ষ্য করিল। লক্ষ্য কবিয়া ডাকিল,—মা—

মা বলিলেন,—কি বলছিস্ পিছু?

প্রণব কহিল,—আমার কাছে কি কথা লুকিয়ে রেখেচো মা?

মা বলিলেন,—আজকাল মধ্যে মধ্যে সে এমন করচে, বাবা। এক এক-দিন রাতে মোটেই ফেবে না।

প্রণব বসিয়া পড়িল, বলিল,—আমায় এ-কথা না বলে! ভাল করোনি মা। যাই হোক, আমায় শান্ত দিতে বলো। আমি নেয়ে খেয়ে এখনই তার সন্ধানে বেকই।

প্রণব উঠিয়া স্নান করিতে গেল। স্নান কবিতে গিয়া এক অজানা ভাবনায় তাব মন প্রতি মুহূর্তে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। নিজেব স্বস্তি পইয়া সে এতখানি ব্যস্ত যে বাড়ীর খবর রাখতে তাহার মনে থাকে না! এই যে আগে তুই ভাই একসঙ্গে আহার কবিতে বসিত, কত গল্প কবিয়া কত হাস্যকৌতুকে সেই সময়টুকু কাটাইয়া দিত, মাও প্রাণ খুলিয়া একটু তৃপ্তি পাইতেন! এ কয়দিন সেই ভাইয়ের সঙ্গে একত্রে আহার কবা হয় নাই। চকিতে মুহূর্তের জ্ঞান বা দেখা হইয়া গিয়াছে মাত্র! সে দেখার স্বপ্নটুকুতেও শশীর তেমন সন্দিগ্ধ ভাব কৈ, চোখে ঠেকে নাই তো! কি এক চিন্তায় সে যেন জর্জরিত! কেন? সেদিককার কোন খবর প্রণব রাখে নাই!

স্নান সারিয়া তাড়াহাড়ি মুখে ভাত গুঁজিয়া প্রণব তাহার টু-সীটার কার লইয়া শশাঙ্কর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। প্রথমেই সে গেল মাটরের কারখানায়।

কারখানার গিয়া প্রণব দেখে, শশাঙ্ক সেখানে নাই। কোথায় সে? ম্যানেজার নিজের সাফাই গাতিবার উদ্দেশে ম্পষ্টই বলিল, বাবু আজ প্রায় এক সপ্তাহ কাবখানায় আসেন নাই। অনেক কাজ হাতে লইয়া টাকার অভাবে সারা হইতেছে না, এজ্ঞা খারদারদের দলে মহা অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। তাড়াতাড়ি কয়টা মোটা বিলের টাকা শোধ হয় নাই বলিয়া কড়া তাগিদা আসিয়াছে, দুই-একটা নালিশও কজু হইয়া গিয়াছে।

প্রণব একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল, বলিল,—এ খপব এতদিন আমাকে দেওয়া হয় নি কেন?

ম্যানেজার কুণ্ঠিত স্বরে কহিল,—আজ্ঞে, ছোট বাবুব মানা ছিল।

প্রণব তীব্র দৃষ্টিতে ম্যানেজারের পানে চাহিল, কহিল,—মানা ছিল বলে কারবারটিকে সম্প্রদায়ের পথে দিন দিন ঠেলে দিচ্ছেন! চাকরি বন্ধা করচেন?

এমন রুঢ় কথা প্রণব জীবনে কোনদিন কাতাকেও বলে নাই। আজ বলিবার কারণ ছিল। কারখানায় ঢুকিতেই সে দেখিয়াছে, একটা দ্বিবিদী ছোকরা দুইটা মদের বোতল লইয়া অত্যন্ত বে-হেড অবস্থায় কারখানা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রথমটা সেদিকে সে তত নজর দেয় নাই। ভাবিয়াছিল, বুঝি কোন খবিন্দাব বা দানালি। তারপর কাবখানায় ঢুকিয়া সে দেখে, চারিদিকে কেমন বিশৃঙ্খল ভাব। লোকজন কাজকর্ম লইয়া কেহ ব্যস্ত নাই। ওদারে পাঁচ-সাতজন মিলিয়া জটলা করিতেছে,—সিগারেট ফুকিতেছে! অফিস-ঘরেও কেহ নাই, টেবিলের উপর একরাশ ধূলা জমিয়া রহিয়াছে। এ-সব ব্যাপার দেখিয়া লোকগুলাব কন্ডব্য-জ্ঞান বুঝিয়া মনে মনে সে অত্যন্ত চটিয়াছিল। তা'র উপর এত টাকা দেনা, অত লোকেব কাজ পড়িয়া আছে, অথচ ম্যানেজারের সেদিকে দৃষ্টি নাই, কাজের দিকে আগ্রহও নাই! প্রশ্ন করিতে অমান বদনে বহু দিনকাব সঞ্চিত এই বন্ধ হাওয়ার দুঃসংবাদ দিয়া বলিল! এই সব লোকের হাতে কাবখানার ভার দিয়া শশাঙ্ক নিশ্চিন্ত আছে! শশাঙ্ক না হয় নিশ্চিন্ত আছে, কিন্তু এ লোকগুলাবও তো একটা কন্ডব্য-জ্ঞান ছিল! হায়রে, বাঙালী ম্যানেজার দিয়াও নাকি আবাব কাজ হয়! ফাঁকি দিবার জ্ঞা যাহারা প্রতিক্ষণ উত্তত—দায়িত্ব বলিয়া যে-একটা স্রিনিয় আছে, তাহার কোন সংবাদও রাখে না! বিলাতী অফিসের কর্তা যে অনেক সময় বিলাতে বসিয়া থাকে, অথচ ইংরাজ ম্যানেজার কাজ ঠিক বজায় রাখিয়া যায়। চুরি-চামারি করিলেও অফিসের ইজ্জতটা বন্ধা করে! আর ইহার—? সদাই ইহাদের অসন্তোষ, মুখে সদাই বুলি, দাও, টাকা দাও! সদাই মনিবের গাফিলি ফাঁকে

নিজের ফাঁকি বজোগাড়ে ব্যস্ত! এইজ্ঞাই বাঙালীর কারবারের এমন দুর্দশা!

প্রণব বলিল,—কত টাকা বাইরে দেনা, তার একটা দ্বিরস্তি আমাব কাছে আজই পাঠিয়ে দেবেন। আর কি কাজ পড়ে আছে, কেনই বা আছে, সে কাজের জ্ঞে কি কি চাই, তারও একটা নোট আজই আমি চাই। আপনি নিজে দেখে করে দেবেন। মামলা-মকদ্দমা যা কজু হয়েছে, তার তদ্বিবেব কি বন্দোবস্ত করচেন, শুনি?

ম্যানেজার একটু খতমত খাইয়া বলিল,—আজ্ঞে, ছোটবাবুব দেখা পাইনি বলে—

তাহার কথায় বাদা দিয়া প্রণব বলিল,—মকদ্দমা ছোটবাবুর ফুরস্তং প্রতীক্ষা করে বসে থাকবে না! ছোটবাবু অফিসেই আসেন নি যখন, তখন বাড়ীতে গিয়ে আপনি এ সম্বন্ধে কথাবার্তা কন নি, কেন?

ম্যানেজার এ কথাব কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রণব বলিল,—ভেবেছিলেন, আপনার কি গরজ! ডিহা হয়, ছোট বাবু যাবে,—আপনার মাস-মাইনে তো আব অনাদায় থাকবে না? এখানকার চাকরি যায়, আরো অজ্ঞা জায়গা আছে! ছি!

ম্যানেজার কহিল,—আজ্ঞে, এ-সব কথা বলছেন যখন, তখন কাজেই আমাবও সব খুলে বলা দরকার।

প্রণব বলিল,—বলুন।

ম্যানেজার কহিল,—ছোটবাবু কড়া হুকুম দিয়েচেন, কাবখানার কোন কংবা বা কাজের জ্ঞা কেউ বাড়ীতে যাবে না। তাই—

প্রণব বলিল,—আপনি এটা বুঝেছিলেন যে, এ হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মানলে ছোটবাবুর সর্বনাশ! তাঁর মঙ্গলের জ্ঞা আপনার কি বাড়ীতে আমার কাছে খপব দেওয়া উচিত ছিল না? কারখানায় যদি আগুন লাগতো, কিম্বা কারখানা যদি লুঠ হয়ে যেত, তাহলেও আপনি ঐ আদেশ শিরোধার্য করে চুপ করে এইখানেই বসে কারখানায় সে সর্বনাশ দাঁড়িয়ে চক্ষে দেখতেন?

ম্যানেজার এ কথাব কোন জবাব দিতে পারিল না। বয়সে ছোকরা, কাজেই কারখানার প্রতি টান যে তাহার একেবারে ছিল না, এমন নয়।

মানেজার জড়িত কণ্ঠে বলিল,—আজ্ঞে, যদি অভয় পাই তো বলি।

প্রণব বলিল,—বলুন। ভয় করবার কোন কারণ নেই।

ম্যানেজার বলিল,—ইদানীং ছোট বাবু বড় বাড়ী-বাড়ি করচেন। পঞ্চাশজন বখা ইয়ার আশে-পাশে ঘুরচে, কারখানাব কোন কথা বলতে গেলে তারা তাদা দিয়ে আমাদের হঠিয়ে দেয়। তাদের সঙ্গে রেশে যাওয়া,

তবে পাঁচটা ফিরিঙ্গী মাগী সঙ্গে নিয়ে বাগান-টাগান, এমনি...

প্রণবের মুখ বাগে রাঙা হইয়া উঠিল। সে গম্ভীর-ভাবে শুধু বলিল,—হঁ! পরে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল,—কাল থেকে সে বাড়ী ফেবেনি। কোথায় আছে, জানেন?

ম্যানেজার বলিল,—কোথায় আছেন জানি না, তবে সন্ধান নিয়ে বলতে পারি।

প্রণব বলিল,—তবে আসুন আমার সঙ্গে, আমার গাড়ীতে। আর ফিরে এসে, যা-যা বললুম, সে-গুলো কববেন। কারখানাটা গেলে আমাদের লোকসান খুবই, আপনাদেরও তাতে লাভ বা মঙ্গল নেই। এবং কারখানাটাকে বাঁচিয়ে গড়ে তুলতে পাবলে আপনাদের তাতে লাভ আছে! এইটে বুঝে কাজ করুন যদি চালায়ে নেন...

ম্যানেজার বলিল,—আপনাকে আর বলতে হবে না। আমি নিজের অজ্ঞার বুঝি। আব কোন বকম গাফিলি আমার তবফ থেকে পাবেন না। এবং যাতে কারখানা এ বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে, সেজ্ঞে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করবো।

প্রণব উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—দেখুন, লেখাপড়া শিখে চাকরি বাকরি করে বাঙালীর কি হচ্ছে? কিছু না। এমনি কল-কারখানা গুলে তাতে যদি প্রাণ ঢেলে লাগি, তাহলে বাঙালীকে নেহাৎ এঁখের্যের কাঁড়াল হয়ে থাকতে হয় না! আপনিও যখন আমার কাছে এই সত্য করলেন আজ, তখন আমিও কথা দিচ্ছি, আপনি কারখানাটাকে তুলে দাঁড় করান, মাহিনার উপর একটা ভালো কমিশন আপনাকে আমরা দেবো। বাঁধা মাহিনার উপর একটা আশার বস্তু না থাকলে কাজে উৎসাহ আসবে কেন? এখন আসুন আমার সঙ্গে। আর লোকজনদের একটা ওয়ার্মিং দিয়ে যান, কাজ কর্ত্তে কেউ যেন গাফিলি না করে!

প্রণব আসিয়া মোটরে উঠিল। মিনিট দুই পরে ম্যানেজার আসিয়া বলিল,—বীডন্ স্ট্রীটের দিকে চলুন। সেখানে বামতারক বাবু বাড়ী খপর পাবো, নিশ্চয়। কাল তাঁর সঙ্গেই ছোটবাবু বেঁচেছিলেন।

—১৭—

বীডন্ স্ট্রীটে আসিয়া শশাঙ্কর কোন খপর পাওয়া গেল না। বামতারক বাবু বলিলেন, শশী কাল চুনিদেব বাগানে গিয়াছিল। চুনির বাড়ী নারিকেলডাঙ্গায়।

প্রণব নারিকেলডাঙ্গায় ছুটিল। চুনি তখনো বাড়ী আসে নাট। তাহার চাকরকে কাছে খপর লইয়া গাড়ী

ছুটাইয়া সে যশোর রোডে চলিল। চুনির বাগান যশোর রোডে।

পাতিপুকুর স্টেশন ছাড়াইয়া থানিকটা অগ্রসর হইতে দেখা গেল, পথে একখানা প্রকাণ্ড মোটর দাঁড়াইয়া আছে। মোটরে দুই-তিনজন তরুণী, হাবে-ভাবে সাজে-সজ্জায় একেবারে রূপব পশবা খুলিয়া যেন চলন্ত পথিককে লুক করিবার জুগুই তাহা বা বসিয়া আছে!

ম্যানেজার বলিল,—আপনি একটু আগে গাড়ী বাধুন দিকি। আমি নেমে একবার ডাইনে ঐ গালব মধ্যে যাই।

প্রণব গাড়ী থামাইয়া ম্যানেজারকে নামাইয়া দিল। ম্যানেজার বড় মোটরখানার সামনে দিয়া ডাইনে গলির মধ্যে ঢুকিল। প্রণবের সমস্ত শরীর-মন জলিয়া উঠিয়াছিল। এই সংসর্গে মতিয়া তাহার ভাই শশী বাড়ীর কথা, মাব কথা ভুলিয়া বসিয়া আছে! কেমন একটা অস্থিতির ধরিতেছিল। সে মোটর হইতে নামিয়া ইতস্তত বেড়াইতে লাগিল। পথে প্রকাণ্ড খালি বাজবা হাতে খুলাইয়া পিঠে বহিয়া সওদা চুকাইয়া ব্যাপারীর দল যবে চলিয়াছে খুলা উড়াইয়া,—খুলায় সর্কাদ ভরিয়া সকলে চলিয়াছে। ওদাবে একটা গাছ-তলায় বসিয়া একটা লোক পাণ টারিয়া ছোট ছোট খিলি সাজাইয়া রাখিয়াছে। পাশে ছোট চুবড়িতে কয়েকটা কমলা লেবু ও সোডা-লিমনেডের বোতলও বহিয়াছে। রেলোয়ে সিগনালের ধারে একটা বুড়ী কলা-পাতা বিছাইয়া তাহার উপর কয়েকটা শুকনো নারিকেল কুল ও টোপা কুল রাখিয়া বসিয়া আছে। দেখিয়া প্রণব ভাবিল, আহা, বেচারী! এইগুলি বিক্রয় করিয়াই তাহা বা জীবিকার সংস্থান করে! ক'টা পয়সাই বা ইহাতে পাইবে। দেশের চারিদিকে কি দারিদ্র্য তার কঙ্কালসার মূর্তি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে! আর ঐ মোটর গাড়ীটায় বিলাসিনী নারীর দল চেহারার চটক দেখাইয়া শরীবে ও মনে মিথ্যার খোলস আঁটিয়া বিলাসিনীর টাকার তহবিল ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইতেছে! এই নিরন্নদের মুখ চাহিয়া একমুঠা চাল ফেলিয়া দিবাব কথা কানো মনে কাগে না! তাহার সর্কাদে যেন কে চাবুক মারিতে লাগিল। সে নিজেও কি ইহাদের এই কঙ্কালসার মূর্তি ভিতবটা কোনদিন নাড়িয়া দেখিয়াছে? জীর্ণ কুটীরের শত ছিন্ন চাল ফুঁড়িয়া শীতের হিম, শ্রীষের বর্ষা, বধাঁব জল নিঃস্রম অত্যাচারের মত বেচারীদের জর্জরিত করিয়া তুলিতেছে, তাহাদের দুঃখ জানিয়া সে দুঃখ ঘুটাইবার জন্ত সেই বা কি করিয়াছে! সে উহাদের ধরিয়া লইয়া গিয়া ছবিতে রং ফলাইয়াছে! নিজের সম্মতিয়াছে, শুধু! সেও তো ঐ বিলাসীদের

মত! উহারা মন্ত আছে এই নারীদের রূপ-যৌবন, চটল চাহনি আর মধুর বচন-বিজ্ঞাস লইয়া—আর সে মাতিয়া আছে ছবি লইয়া। ঐ যে প্রীতি,—তার মত কত অভাগিনী বালিকা বে সবলের সঙ্গে সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া নিজেদের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া নেহাৎ ঘৃণা কাঁটের মতই জীবন বহন করিতেছে। না—প্রণব ভাবিল, এই শনের অত্যাচার, শক্তিব অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে একবার তাহার ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবে! কবিতা দেখিবে, এ অত্যাচার এতটুকুও সে বোধ করিতে পারে কি না!

ভাবিতে ভাবিতে উত্তেজনার বশে প্রণব গতির বেগ কখন যে বাড়াইয়া দিয়াছিল, নিজেও তাহা বুঝিতে পারে নাট। কোনদিকে তাহার মন বা লক্ষ্য ছিল না—নিজের চিস্তার মধ্যে সে একেবারে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। চঠাৎ হুঁশ হইল, যখন কাণেব কাছে বড় মোটবখানা যাত্রার সূঁচা আগাইয়া বিবাট গর্জন তুলিল। চমকিয়া প্রণব চাতিয়া দেখে, মোটবখানা যাইতে উত্তত, আর মোটরের আরোহীণী তরুণীরা তাহার পানে বিশ্বয়-কৌতুক-মিশ্রিত দৃষ্টিতে চাতিয়া আছে, মুখে তাহাদের মুহ হাসি, চোখের দৃষ্টিতে বিদ্রোহের লহর!

ঘৃণায় মুগ্ধ ফিরাইয়া প্রণব আসিয়া নিজেব গাড়ীতে বসিল। বড় মোটবখানা চলিয়া গেলে সে একবার গলির দিকে চাহিল। দুই-চাবিজন করিয়া লোক নেহাৎ কোনমতে দেহ-ভার টানিয়া গলিব পথে চলিয়াছে। প্রণব বিরক্ত হইয়া মোটর হইতে নামিয়া গলিব মধ্যে ঢুকিল; খানিকটা পথ গিয়া চমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ম্যানেজার ফিরায়া আসিতেছে। একা যে? প্রণব বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ম্যানেজার কাছে আসিলে প্রণব বলিল,—খবর পেলেন?

ম্যানেজার বলিল,—পেয়েচি। এইখানেই আছেন।

প্রণব-বলিল—এলো না?

ম্যানেজার বলিল,—ভারী বেগে উঠলেন। আমি বললুম, বড় বাবু গাড়ী নিয়ে এসেচেন, আপনাকে যেতে হবে, তা শুনে আমরা ধমকে উঠলেন।

প্রণব বলিল,—আব কেউ আছে?

ম্যানেজার বলিল,—যাঁর বাগান, সেই চুনিবাবু আছেন। তা তিনি নেশার একেবারে অজান।

দারুণ শঙ্কায় গাড়ী উত্তেজনায় প্রণবের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শশীও তবে বিষম মাতাল হইয়া পড়িয়া আছে? প্রশ্নটা করিতে তাহার বুক দ্রব্ধ করিয়া উঠিল। যদি শোনে, হ্যাঁ? প্রণবের সমস্ত মন যে তাহা হইলে সেই দণ্ডে একেবারে মুগ্ধিত হইয়া লুটাইয়া পড়িবে! তাহার সকল শক্তি অন্তর্হিত হইবে!

তবু এ প্রশ্ন করিতেই হইবে! তাই সকল দ্বিধা সবলে কাটাইয়া সে বলিল,—শশী?

ম্যানেজার বলিল,—কৈ, নেশা করেচেন বলে মনে হলো না!

আঃ, ভগবান রক্ষা করুন! প্রণবের মনে হইল, সে যেন বড় দায়ে বাঁচিয়া গিয়াছে! সব তো হইয়াছে, এই সঙ্গে মাতাল হইলে কি করিয়া তাহাকে লইয়া মার কাছে সে এখন দাঁড় করাইবে!

প্রণব বলিল,—তবে চলুন একবার। আমি তাকে না নিয়ে ফিবোনা।

ম্যানেজার অগত্যা প্রণবকে লইয়া বাগানে উপস্থিত হইল। শশী তখন গায়ে শাল জড়াইতে জড়াইতে ফটকের দিকে আসিতেছিল। প্রণবকে দেখিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইল; আগাইয়া আসিয়া বলিল,—তুমি এসেচো?

বাগে প্রণবের সর্বাঙ্গ জ্বলিতেছিল! সে বলিল,—আসবো না? মা ওদিকে ভাবনায় সারা হচ্ছে, আর তুমি এখানে পিকনিক করচো! বাড়ীর কথা মনে থাকে না?

শশী বলিল,—মিছে ভাবনা! আমি তো ভলে পড়ি নি।

প্রণব শশীর কথা শুনিয়া অবাক হইল। এক কথা কোন্ মুখে সে অনায়াসে বলল? এই কি তার সেই ভাই শশী! কালও যে এমন কঠিন কথা শশীর মুখে শুনিবে বলিয়া সে কল্পনা করে নাই! হায়রে, দুর্জনের সঙ্গ মাহুয়কে এমন অধঃপাতে টানিয়া আনে।

শশী বলিল,—এখনি যাচ্ছলুম। শুধু গাড়ীখানা এলেই হয়। তা চলো, তোমার সঙ্গেই বাই।

গাড়ীখানার কথায় প্রণব বৃষ্টি, শশীকে কোন্ গাড়ী আসিবার কথা বলিতেছে! যাক, ঐ গাড়ীখানা যে সে দেখিয়াছে, শশীকে তাহা জানে না। ভালই হইয়াছে। তবু একটু পর্দার আড়াল থাকুক!

প্রণব বলিল,—এসো, আমার গাড়ী আছে। তাতেই যাবে।

শশী বলিল,—চলো।

প্রণব ও শশীকে আসিয়া মোটরে বসিল। ম্যানেজার উঠিয়া পিছনের সীটে বসিলে প্রণব মোটর হাঁকাইয়া দিল।

গাড়ীতে শশীকে চুপচাপ বসিয়া আসিল, প্রণবও কোন কথা বলিল না। বাড়ীতে আসিয়াও কোন হাদ্যমা হইল না। মা শুধু বলিলেন,—এমনি কবে কি বাড়ী ছেড়ে থাকতে হয় রে শশী? আমাদের ভাবনা হয় না? না হয় একটু খবর পাঠিয়ে দিতস! কোলের কাছে ভাত বেড়ে নিয়ে এই যে বসে আছি...

একটু বাঁঝালো শ্রমে শশাঙ্ক বলিল,—গেছি একটু নেমস্ত্রয়, তাতেও নিশ্চিত নেই! লোক পাঠানো! আমি কচি থোকা নই।

কথাটা বলিয়া অপ্রসন্ন চিত্তে শশাঙ্ক গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।

প্রণব তখন বাহিরে মানেদ্বারের সঙ্গে কারবার সম্বন্ধে নানা কথা-বার্তা কহিতেছিল। কি করিতে হইবে, তাহারি পরামর্শ দিয়া ম্যানেজারকে অফিসে পাঠাইয়া প্রণব উপরে আসিতে মার সঙ্গে দেখা হইল।

মা উদ্ভয়ভাবে বলিলেন,—শ্যাপাব কি পিছু?

প্রণব একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আর নাই বা সব শুনলে! ও-ও জানেনা, আমি সব জানি। তা কানলে আরো বে-পরোয়া হয়ে উঠবে। তবে আজ থেকে ওর উপর আমার কারবারের উপর আমি বড়ো চৌকদারী করছি। বতরিন তুমি বেঁচে আছ, ততদিন অবস্থা আমারও জোর আমি খাটাবো। সে কটা দিন ভাল থাক, তারপরে তুমি গেলে ও যা খুশী করুক, আমি তাতে বাধা দিতে যাবো না। সম্ভাবনের কলঙ্ক যে-মাকে শুনতে হয়, তার মত দুর্ভাগিনী মা যে আর কেউ আছে, তা আমার মনে হয় না।

মা বলিলেন,—কি হয়েছে, বল দেখি বাবা?

প্রণব বলিল,—কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়া বওয়াদের সঙ্গে মিশেছে আর কি!

মা বলিলেন,—উপায়?

প্রণব বলিল,—আমি।

তারপর কিছুক্ষণ খামিয়া প্রণব বলিল,—আমায় একটু চা খাওয়াও মা—মাথাটা ধরে টিপ টিপ কবচে। গলায় ব্যথাও একটু হয়েছে। আর নাকটা স্ফুস্ফু কবছে—বোধ হয়, সর্দি হবে।

মা বলিলেন,—এই রোদে ঘুবে দুশ্চিন্তা নিয়ে কেন গেলি বাবা? শেষে একটা অশুখ হবে, আমি ভেবে মরবো!

হাসিয়া প্রণব বলিল,—কোন ভয় নেই মা। তোমার হাতের চা খেলেই আমার সব অশুখ সেবে যাবে।

মা হাসিলেন, হাসিয়া বলিলেন,—পাগল ছেলে! তুই কি চিরকাল এমনি পাগল থাকবি রে!

মা চালিয়া গেল, প্রণব নিজের ঘরে আসিয়া ইচ্ছা চেয়াবে শুইয়া পড়িল। শীতের রৌদ্রে দারুণ উদ্বেগ লইয়া ছুটিয়াছে, তাহার উপর অতখানি গ্রানি, উত্তেজনা! প্রণবের মাথা অত্যন্ত দপদপ করিতেছিল। মাথা ভারী হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুটা জ্বালা করিতেছে। প্রণব বুঝিল, জ্বরের লক্ষণ! সে ধীরে ধীরে চক্ষু মুদিল।

অনেকক্ষণ পরে মা চা লইয়া আসিয়া দেখিলেন,

প্রণব ইচ্ছাচেয়াবে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। মা ডাকিলেন,—পিছু। কোন সাড়া নাই! মা তখন তাহার কপালে হাত দিলেন, এ কি! কপাল যে আগুন! পুড়িয়া যাইতেছে। এ-যে বেশ জ্বর! মা তাহার কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া ডাকিলেন,—পিছু, বাবা—

—মা!—বলিয়া প্রণব চোখ খুলিল। বলিল,—চা এনেচো? দাও, খাই।

—এ যে বেশ জ্বর দেখছি তোরা।

—হ্যাঁ, জ্বর আসবে বলেই মনে হচ্ছে। ও কিছু নয়। চা খেলেই সেরে যাবে।

—চা খাও, মোকদ্দা আজ আর বেরিয়ে না তুমি।

চা পান করিয়া প্রণব ইচ্ছা চেয়াবে পড়িয়া রহিল। মা বলিলেন,—বিছানায় উঠে শো'না, বাবা।

—আচ্ছা। বলিয়া প্রণব গিয়া বিছানায় শুইল। মা মাথাবশিরবে বসিয়া তাহার মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

সারা রাত্রি মাথাব যন্ত্রণার প্রণবের ভালো ঘুম হইল না। সকালে উঠিয়া মা শশাঙ্ককে ডাকিয়া বলিলেন,—ভাগ্য তো শশী, পিছুর টেম্পারেচারটা। গা বেশ গরম।

শশাঙ্ক উঠিয়া আসিয়া থার্মোমিটারে টেম্পারেচার দেখিল, জ্বর ১০৩। খুব সর্দি। সে বলিল,—ইন্ফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে, দেখছি।

মা চিন্তিতভাবে বলিলেন,—নগেন ডাক্তারকে একবার খবর দে বাপু।

—যাই। বলিয়া শশাঙ্ক নিজের ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া গেল। কালিকাৎ ঐ ঘটনার পর হইতে তাহার মন একেবারে ভুঁড়াইয়া ছিল। সে ভাবিল, না, ও সব বড় সঙ্গ ছাড়িয়া দিব। আমার জগা ঘূষিয়াই দাড়াব এই অশুখ হইল! সেই রোজ্রে অতখানি উদ্বেগ বৃদ্ধি লইয়া—

যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—নিউমোনিয়াব লক্ষণ দেখছি। খুব সাবধান।

প্রণব একেবারে বেহুশ হইয়াছিল। মাথায় অসহ্য যাতনা। ডাক্তারের কথায় মাথায় আইস্ ব্যাগ দেওয়া হইল। মা নিজে নিয়মে বসিয়া আইস্ ব্যাগ ধরিয়া বসিলেন। শশাঙ্ক বলিল—আমায় দাও মা।

—না রে, তুই যা। বলিয়া শশাঙ্ককে তিনি উঠাইয়া দিলেন।

১৮

সেদিন মনের উৎসাহে বৈকাল হইতেই পরিপাটী করিয়া রন্ধন সাবিয়া প্রীতি উন্মুখ হইয়া বসিয়াছিল, কখন প্রণব আসিয়া তাহার এ সেবা গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া দিবে! রাত্রি হইল। আটটা

বাজিল, ন'টা বাজিল, দশটাও বাজিয়া গেল, শেষে এগারোটা বাজিতে বায়, তবু প্রণবের দেখা নাই। সন্ধ্যার পর হুইতেই দূরে পথে কাঠাবো গাড়ীতে চণ বাজিয়া ওঠে, প্রীতি অমনি আকুল চোখে পথেব পানে চায়। কোথায় প্রণব? কেহ নাই।

সে অধীর হইয়া উঠিল। এত ব্যগ্রি হইয়া গেল, তাই তো। কেন আসিলেন না? আর আসিবার সময় কৈ? কি হইল? আমি যে কত আশা করিয়া পথ চাতিয়া আছি, ওগো আমার কীরন-মরণের দেবতা, ওগো নিবাসঘরের একমাত্র আশ্রয়—কোথায় তুমি? তুমি কি তবে ঘণার ভবে আমার সেবা ভুলিয়া গেলেন!

বাল্যাবধি সমস্তে প্রস্তুত বিচিত্র খাণ্ড শুকাইয়া কাঠ হইতেছে। প্রীতি কখনো আসিয়া নিঝমভাবে বাল্য-ঘরের দ্বারে বসিয়া থাকে—বাতিবে একটা কিছু সাড়া পাইলে ছুটিয়া অমনি বাতিবে গিয়া দাঁড়ায়। দেখিয়া অন্নদা বলিল,—তুমি খেয়ে নাও বৌদি। আর কতক্ষণ বসে থাকবে? বাবু হয়তো কোন কাজে আটকে পড়েছেন। রাত বাবোটা বাজে।

প্রীতি বিরক্ত হইয়া বলিল,—তুই খেতে বোস্ দেপি বাপু। আমার সঙ্গে তোকে ভাবতে হবে না।

—সাত বৌদি, আমি তাহলে খেয়েই নি। আমার আবাব আজ রাডী যেতে হবে। আমার ভাইবো সদ কাল ভাবে গুণবাবুড়ী যাবে—কাল আস্তে আমার দেবী হবে ভাই। আমার আজ রাতটা ছুটি দিয়ে।—তুমি আমার বেড়ে দেবে তো?

—তুই আপনি বেড়ে নেন, ভাই। বাবু খাবার আলাদা করা আছে—জু'স্ নেন বেন।

—আচ্ছা বৌদিমণি, তাই নিচ্ছি। বাবু খাবার আমি জু'তে যাবো কেন! কিন্তু আর কি রাত ছুটায় তিনি আসবেন?

অন্নদা খাটিতে বসিল। প্রীতিব দুই চোখে দাবা বহিল। তার এমন যত্ন—সব বুখা হইল। কি হইয়াছে...তার কি হইয়াছে? কেন তিনি আসিলেন না? তিনি যে নিজে যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইয়াছিলেন! তবে...তবে?

প্রীতি যেন পাগল হইয়া উঠিল। কিন্তু পাগল হইয়াই বা কি করিবে! চিন্তাব ভাবে আকুল হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, রাজ তখন চিনটা। হঠাৎ কি একটা শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ষড়মড়িয়া উঠিল আলু-খালু বেশেই সে গিয়া বাতিবে বাবাকায় দাঁড়াইল। শীতের ব্যগ্রি। চারিবার কিছু কিছু করিতেছে। কোন সাড়া নাই, শব্দ নাই। শুধু ঘুরে কে একজন অত রাজে গান গাহিতেছিল,...

আমার গাঁথা মালা যবে গেল, শ্রাম হলো না; সখি, শ্রাম হলো না।

প্রীতিব বুকটা ধক্ক করিয়া উঠিল। ওবে, তাহার মত দুর্ভাগ্য তবে আর কাঠাবো ঘটয়াছিল! শ্রামের জন্ত তার গাঁথা মালা বরিয়া গিয়াছিল, শ্রাম আসে নাই! আর তার দশা? প্রীতির সমস্ত বুকটাকে হুলাইয়া প্রলয়ের ঝড় উঠিল। সে ঝড়ের বেগ সহিতে না পারিয়া সে আবাব গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

যদি বাতিটা কখনো একটু ঘুম আসে, আবাব তখনই সে স্বপ্ন দেখে, ঐ যে, প্রণবের গাড়ী আসিয়া থামিল! প্রণব হাসিমুখে বলিল, —বাঃ, বেঁধে বেড়ে আরাম করে ঘুমোচ্ছ যে প্রীতি! অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। এমনি ঢেউয়ের আঘাতে বাতিটা কোনমতে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা আটটায় ঘুম ভাঙ্গিল। অন্নদা আসিয়া বলিল,—খাবার-দাবার সব অমনি রয়েছে বৌদিমণি, বাবু দেখা নেই! এ তো ভালো কথা নয় ভাই, তুমি খপর নাও।

টুক! এ কথাটা প্রীতির মনেও জাগিতেছিল। কিন্তু এখনই খপর লওয়া! যদি তিনি রাগ করেন? বাড়ীতে তার পরিচয় দেন নাই, তার কথা কাঠাকেও বলেন নাই। দরোয়ান গিয়া শেষে কি বলিয়া বসিবে! খপর লওয়া চলল না। সে দিনটা দারুণ উদ্বেগে কাটিল।... প্রণব আসিল না। রাত্রে উদ্বেগ আরো বাড়িল। বুক যেন ফাটিয়া যায়।...মাগো বলিয়া প্রীতি বিছানায় লুটাইয়া পড়িল। দুই চোখের জলের দাবাও আর ফুগাইতে জানে না! এত জলও এ চোখে ছিল!

পরদিন সকালে সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। দুইটা টাকা দরোয়ানের হাতে গুঁজিয়া সে বলিল,—তুমি এখনি বাও, রামসিং...বাবু কেমন আছেন, সেই খপরটা শুধু আনো।

দুইটা টাকা পাইয়া চটপট স্নান সারিয়া টিকিতে ফুল না বাঁধিয়াই সে ছুট দিল। মা-কী বলিয়াছে, শীঘ্র ভালো খপর আনিয়া দিলে আরো দুই টাকা বখশিস্ মিলিবে।

প্রীতি বাসি মুখে জল না দিয়া তেমনি বসিয়া বহিল, কেমন যেন স্বপ্ন-বিস্ময়ের মত। পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দে গাছেব পাতা যেমন ডলিয়া ওঠে, বাতিবে যেমন একটু শব্দ হয়, অমনি চমকিয়া প্রীতি চোখ মেলিয়া চাবধারে চায়, ঐ বুঝ দরোয়ান ফিরিল! বাতিবে পথে ছোট ছেলেরা লোটার চাকায় বাঁখাি ঠুকিয়া ছুটিয়া যায়—প্রীতি ভাবে, ঐ বুঝ প্রণবের মোটর আসিয়া দাঁড়াইল! প্রতীক্ষার ক্ষণটুকু তাহার যে কি করিয়া কাটিল, তাহা সে জানেও না। এক একটি মুহূর্ত যেন যুগ বলিয়া মনে হইতোছিল! ভাবিয়া কোন কুল না পাইয়া সে শেষে

এক-মনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল—ঠাকুর, হে ঠাকুর, ভালো খপর আনিয়া দাও। শুধু তিনি ভালো আছেন! আর আমি কিছু চাই না—কিছু না।

ঠাকুর সে মিনতি বাশিলেন না। দরোয়ান ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পরন্তু সন্ধ্যা হইতে বাবুর ভারী বোঝার! বাড়িতে ডাক্তারের ভিড় লাগিয়াছে। দরোয়ান এ সংবাদে নিজেই বিচলিত হইয়াছিল, কাজেই বখশিসের জ্ঞাত হাত পাতিতে তাহাব সঙ্কোচ হইল। সে চলিয়া গেল।

প্রীতি তখন চারিদিক অন্ধকার দেখিল। তাঁহাব অশ্রুত? এমন অশ্রুত? সে দেবতার কাছে মানত কবিত্তে লাগিল—তাকে ভালো কবে দাও ঠাকুর, আমি বুক চিরে রক্ত দেবো। ঠাকুর, হে ঠাকুর—

কিস্ত কি কবিবে? প্রীতি এখন কি কবিবে? খাঁচার মধ্যে বন্ধ পাখীর মত ডানা ঝটপট করিয়া এইখানেই পড়িয়া থাকিবে? না, না। সেখানে গিয়া নিজের হাতে সে তাঁর সেবার ভাব গ্রহণ কবিবে। অতি তুচ্ছ দাসীর কাজ! তাঁর মুখে জলের গ্লাস তুলিয়া ধরিতে না পারুক, তাঁর পবণের কাপড় কাচিয়া, তাঁর তুচ্ছ পাত্র মাঞ্জিয়া ধুইয়া, যেমন করিয়া, যত তুচ্ছ হৌক—নিজেব হাতে কিছু সেবা তাহাকে কবিত্তেই হইবে। নহিলে অকৃতজ্ঞতার মহাপাপে সে জ্বলিয়া থাকু হইয়া যাইবে।

কিস্ত কি কবিয়া, কি বলিয়া সে সেখানে যায়? প্রীতি ভাবিতে বাসল। অনেক ভাবিয়া একটা উপায় মাথায় আসিল। প্রতাবণা—তা হব, হৌক। সে তো প্রতাবণা করিয়া ধন-বস্তু লুটিতে যাইতেছে না। সে চায় ক্ষুদ্র শাস্তিতে একটু সেবা করিতে। এ প্রতাবণাব পাপ ভগবান ক্ষমা কবিবেন না? না কবেন, সে তাহার জ্ঞান নরকে বাইতে প্রস্তুত আছে। তাহাব মনে হইতেছে, সে যদি গিয়া প্রণবেব সেবার ভার লইতে পারে, তবে তার প্রাণ-ঢালা আকুল আবেগে প্রণব নিশ্চয় শীঘ্র সারিয়া উঠিবে।

সে উঠিয়া মুখ-হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া দরোয়ানকে ডাকিল, তার হাতে ছইটা টাকা দিয়া বলিল,—একখানা গাড়ী শীগগির ডেকে আনো তো। আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

দরোয়ান টাকা পাইয়া গাড়ী আনিতে ছুটিল। প্রণবের দ্বারে গাড়ী থামিলে দরোয়ানের হাতে আরো ছইটা টাকা দিয়া প্রীতি বলিল,—তুমি যাও, বাড়ী চৌকি দাও গে—আমি এখন এইখানেই থাক্‌বো। বাবু সারলে তবে যাবো।

দরোয়ান টাকা পাইয়া সেলাম করিয়া চলিয়া গেল।

প্রীতি ভিতরে আসিয়া পরিচয় দিল, সে নার্শ; বাবুর অশ্রুত শুনিয়া আসিয়াছে, সেবা করিতে।

কি দিতে হইবে? এ-কথার উত্তরে সবকাবকে জানাইল, বাবু যদি সারিয়া ওঠেন, তবে তাঁহাবা খুশী হইয়া যাত্রা দিবেন, তাহাই সে সম্বন্ধে চিন্তে গ্রহণ করিবে। টাকার তাহার বড় অভাব। এখন শুধু ছই বেলা ছই মুঠা খাইয়া সে কাজ কবিবে। বড়লোকের বাড়ী,—টাকার আবাদ ফিরিত্তি সে কি দিবে!

সরকার প্রীতিকে লইয়া ভিতরে গেল; কর্তার কাছে বলিল,—নার্শ আসিয়াছে।

ভালোই হইয়াছে। কাল ডাক্তারও বলিয়া গিয়াছেন, একজন পাকা নার্শ পাইলে ভালো হয়। শুধু পাকা নয়, তার দরদী হওয়াও দরকার।

মা প্রীতিকে দেখিয়া খেন আশাব মুখ দেখিলেন। তিনি বলিলেন,—তোমার নাম কি বাছা?

একটা ঢোক গিলিয়া প্রীতি বলিল,—আমার নাম? আমি জগৎতাবিণী।

মা শুনিলেন, জগদ্ধাত্রী। চাহিয়া দেখিলেন, জগদ্ধাত্রীর মতই আলো-করা রূপ, জগদ্ধাত্রীর মতই বরাহমুখ মূর্তি বটে!

মা বলিলেন,—আমাদের রান্না খাবে তুমি?

মুহু হাসিয়া প্রীতি বলিল,—খাবো।

আশ্রমে এই নার্শের কাজটাই সে ভালো করিয়া শিখিয়াছিল। ভবিষ্যৎ যখন নিতান্ত অন্ধকার ছিল, হাতড়াইয়া এ জীবন-নদীর কোন কূল সে পাইত না, তখন সে পীড়িত ননকে পীড়িতের সেবাত্তেই ঢালিয়া দিয়াছিল! নার্শিংয়ে মেমেদের কাজ হইতে তাবিকও পাইয়াছিল।

মা প্রীতিকে লইয়া প্রণবের ঘরে আসিলেন। প্রীতি চমকিয়া উঠিল। প্রণবের ঘর! তাহার দেবতার মন্দির। আর শয্যার উপর—ঐ যে শীর্ণ দেহ লইয়া তাহার জীবন-মবণের দেবতা, ঐ রোগের যাতনা ভোগ করিতেছেন।

সতর্ক নিপুণ হস্তে সে প্রণবের সেবার ভার গ্রহণ করিল। তাহাব সমস্ত ভঙ্গী, তাহার পবিচ্ছন্নতা, তাহার দরদ দেখিয়া মার প্রাণ আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ডাক্তার আসিয়া প্রীতিব সেবা দেখিয়া বলিলেন,—এইটুকুই বা একটু অভাব ছিল। এখন আমার বেশ আশা হচ্ছে, সাগাতে দেবী হবে না।

ডাক্তার প্রীতিকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়া চলিয়া গেলেন।

ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়ানো, সেক্ দেওয়া, ফোমেণ্ট করা, পথ্য খাওয়ানো, বিছানা-পত্র ঝাড়িয়া বদলাইয়া দেওয়া—এ-সব কাজ ঘড়ির কাঁটার মতই নিয়মিত চলিতে লাগিল। কোথাও একটুকু খুঁং নাই, কোথাও এতটুকু ক্রটি নাই!



ছপুব বেলা মা আসিয়া বলিলেন,—তুমি এসে অবধি একটু জল পর্য্যন্ত মুখে দাও নি বাছা। যাও মা, খাও গে—খেয়ে আবার এসো।

অডিকলোন্ ফুৰাইয়া গিয়াছিল। মা বলিলেন,—ঐ কুঁজোর ভালো জল আছে—এই পেয়ালায় ঢেলে অডিকলোন্ দাও মা।

প্রীতি একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—জলের কুঁজো আমি ছোঁব না মা। আমি ক্রীশ্চান।

মা বলিলেন,—তোমার এত যত্ন, এই সেবা, তুমি লক্ষ্মী ঠাকুরণ মা। ক্রীশ্চান হও আর যেই হও, যে-হাতে আমার ছেলের সেবা করচো, তোমাব সে হাতে আমিও নিরীক্সে জল খেতে পারি। কোন দোষ হবে না, তুমি দাও।...তুমি ক্রীশ্চান? তুমি ছুঁলে আমার সামান্য জলের কঁজা নষ্ট হবে? না মা, তুমি দাও।

এই সমবেদনা ও সত্যবৃত্তির কথা শুনিয়া প্রীতির প্রাণ জুড়াইয়া গেল। মানুষকে মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করা! মা এমন না হইলে কি আব ছেলেব প্রাণ অতখানি উঁচু হয়। কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখে জল আসিল। জল আনিয়া প্রীতি খাটিতে গেল।

অন্ধরে জাতি-কুটুম্বিনীর বিষম ভিড়। প্রীতিকে একটা অপূর্ণ চোজ মনে করিয়া তাহার সামনে দস্তুরমত ভিড় জঁমিয়া গেল। সকলে সবিষ্ময়ে তাহাকে দেখিতে লাগিল। একজন প্রাচীনা আসিয়া বলিলেন,—কেমন দেখলে বাছা? পিছু আমাদের শীগগির সেরে উঠবে হ?

প্রীতি বলিল,—সাববেন বৈ কি মা,—এমন পুণ্যের সংসার, এখানে মঙ্গল ছাড়া কোন অমঙ্গল ঢুকতে পারে কখনো!

সকলে আগন্তু হইল। এত লোক থাকিলে কি হয়, বাড়ীতে সকলেব মনে আশ্চর্য্য মিল, প্রীতি তাতা ছুঁদেওই ব্যুলিল। কেন হইবে না? গৃহিণীর প্রাণ দরাজ হইলে কাহারো মনে কোন ক্ষুদ্রতা আসিতে পারে না যে!

## ১৯

প্রণব অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিল। প্রীতির ঐকান্তিক সেবার জয়-জয় পড়িয়া গেল। এখন প্রণব বড় দুর্বল,—বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারে না।

কাল সে পথ্য করিবে। বাইশ দিন বিছানায় পড়িয়া বোগে ভুগিয়া সে যেন শুকাইয়া কাঠি হইয়া গিয়াছে!

প্রীতিকে ডাকিয়া মা বলিলেন,—তুমি এখনি যেতে পারে না মা। ও আমার সেরে উঠে মানুষেব মত বেড়াক চেড়াক, তখন তোমার ছুটি হবে। কি বলবো, তোমায় ধরে রাখবার উপায় নেই—না হলে তোমায় কি

ছাড়তুম! আমাব পিছুকে যে ফিবে পেলুম, সে শুধু তোমাবই প্রাণ-ঢালা সেবায়। আমি মা, আমিও এমন কবতে পারতুম না। জানি না, আব-জন্মে তুমি আমার কে ছিলে!

প্রীতি সসঙ্কোচে বলিল,—আমি আপনাদের দাসী, আমায় ও কথা বলবেন না।

প্রীতির চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন,—দাসী বলে না, তুমি আমার মা ছিলে, মা। মায়েব মতই তোমাব দরদ। নিজেকে দাসী বলে ছোট করে না। কি দিখে তোমাব এ পূণ শোধ হয়, আমি ঠাউরে উঠতে পারচি না।

প্রীতি বলিল,—আমরা গরিব, পেটের দায়ে এ দরদ করতই হয় মা, না হলে লোকে ডাকবে কেন? পয়সা দেবে কেন?

মা বলিলেন,—ছি, ও কথা বলে না। পয়সা দিয়ে তোমাব পূণ শোধ হয় কখনো? না। এ সংসারে ঢেব ত দেখলুম মা।—আমার প্রাণটা ছিঁড়ে যদি তোমাব হাতে দিতে পাবতুম, তাহলে এ পূণের কতক তবু শোধ হতো। তাও সব নয়।

প্রণব ডাকিল,—মা—

মা বলিলেন,—কেন বাবা?

প্রণব বলিল,—ও মেয়েটি কে, মা?

মা বলিলেন,—এটি নার্শ। এঁব সেবাতেই তোকে ফিরে পেয়েচি, পিছু।

প্রণব বলিল,—উনিই আমাব মাথার শিরের বসে সেবা করেচেন, ওষুধ খাটয়েছেন? আমি স্বপ্নে দেখতুম, যেন কোন্ দেবী এসে আমাব মাথায় হাত বুলাচ্ছেন।

মা বলিলেন,—দেবীই বটে, পিছু। এমন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি, এমন প্রাণ-ঢালা সেবা—তাইতো বলছিলুম বাবা, আমিও এমন করতে পারতুম না।

প্রীতির দুই চোখে জল একেবারে ঠেলিয়া আসিল। মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া সে ঘরের বাতির হইয়া গেল। লোকচক্ষুর অন্তরালে গিয়া কদ্ধ ভাবেব তরঙ্গ দুই চোখে সে একেবারে উন্মুক্ত করিয়া দিল।

প্রণব বলিল,—উনি কি নেবেন?

মা বলিলেন,—সেই কথাই জাচ্ছল। লক্ষ টাকা দিলেও ওঁব পূণ শোধ হয় না। যে প্রাণ নিজেব হাতে বাঁচিয়ে তুলেচেন, সেই প্রাণটিকেও ওঁব হাতে দিতে পারতুম বাদ...

প্রণব হাসিল, হাসিয়া বলিল,—তুমি কেবল ঐ চেষ্টাতেই ফিরচ না।

বড় আদরের ছেলে, সে রোগ হইতে বাঁচিয়া আবার হাসিয়া কথা কহিয়াছে, এ দৃশ্যে মার আনন্দ-উচ্ছ্বাসিত প্রাণ চোখের জল সম্বরণ করিতে পারিল না। মার

চোখে জল আসিল মা বলিলেন,—তুই যদি সে সেবা চোখে দেখতিস্, বাবা—

প্রণব বলিল, আমি সে সেবা অচেতন হয়েও মধ্যে মধ্যে অনুভব করিচি, মা।

মা বলিলেন,—যাই, আমি চান করি গো। তেল মেখে রয়েচি, হোব কাছে বসতে পারবো না! ওঁকে ডেকে দিয়ে যাই, তাব ওয়ুধ খাবাব সময় হয়েচে, বোধ হয়।

মা চলিয়া গেলেন; বাটবার সময় প্রীতিকে ডাকিয়া দিয়া গেলেন। পীতি আসিয়া ঘড়ি দিকে চাহিয়া গ্রাসে ওয়ুধ চালিয়া প্রণবের কাছে আসিতেই প্রণব চমকিয়া ডাকিল,—প্রীতি।

এ-ডাক প্রীতিব রুদ্ধ অশ্রু আবার দুই চোখের কোলে পুঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে দাঁড়াইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল। তাহার পায়ের গোছে কে যেন লাঠির ঘা মারিয়াছে!

প্রণব বলিল,—ওয়ুধ দাও প্রীতি।

প্রীতি উঠিয়া দ্রুত দিল। প্রণব তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিল, ফাল্ ফাল্ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিল,—মাকে সব বলেচো?

গাঢ় স্বরে প্রীতি বলিল,—না।

প্রণব বলিল,—বোগের ঘোবে স্বপ্নে তোমাকেই আমি দেখতুম। কে সেবা করচে, বুঝতে পারতুম না। তবু মনে হতো, 'তুমিই'। তাই চোখ খুলতে সাহস হতো না।...মাকে কি বলেচো?

সংক্ষেপে প্রীতি শুব্ব বলিল,—কীচান নাশ।

প্রীতি আব দাঁড়াইতে পারিল না। সে তাত ছাড়াইয়া ঘরের মেঝেয় একদা বে গিয়া বসিয়া পড়িল। চোখ তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। প্রণব একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া বহিল। সে দৈহিকতাইল, এই দুর্ভাগিনী বালিকার অন্তরখানি। কি মায়া, কি মমতায় তাহা ভরিয়া রহিয়াছে। কি মতমায় দীপ্ত অন্তর।

মা ফিরিয়া আসিলে প্রণবের চমক ভাঙ্গিল। সে বলিল,—হ্যাঁ মা, এ মেয়েটিকে পেলে কোথায়? কথাটা বলিয়া মুখে একটু হঠামি আসি মাঝাইয়া সে প্রীতিব পানে চাহিল। প্রীতি তখনো পুতুলের মত নিস্পন্দ কাঠ হইয়া মেঝেয় বসিয়া।

মা বলিলেন,—ভগবান পাঠিয়ে দেছেন, বাবা। তখন কি আর খোঁজ গণব নেবার কথা মনে ছিল! আজ ধরে পণ্ডিত নেবো। ভাগ্যে মা আমার এসেছিলেন। নাহলে তোমায় ফিরে পেতুম কি না, কে জানে!

মার মন অতীত ভয়ের আভাসে শিহরিয়া উঠিল।

প্রণব বলিল,—এঁকে খুশী করা হয় যেন।

মা বলিলেন,—সে আর বলতে! ওঁকে কি দিলে আমি নিজে খুশী হই, তা বুঝতে পারিচি না। এমন ধন আমার কি আছে, বা দিলে মাঝে মধ্যে শোধ হয়!

প্রীতি আব স্থির থাকিতে পারিল না। সে উঠিয়া আসিয়া জড়োসড়ো ভাবে মার পায়েব কাছে বসিল, বসিয়া বলিল,—আপনারা মাণ করুন। ও সব স্বর্ণের কথা তুলে আমায় ব্যথা দেবেন না।

প্রণব হঠামি করিয়া বলিল,—বেশ, আপনি নিজে বলুন, কি পেলে আপনি সন্তুষ্ট হন?

তাহাব কথা শেষ হইল না। প্রীতি এমন-এক দৃষ্টিতে প্রণবের পানে চাহিল যে প্রণবের বুকের উপর সে দৃষ্টি লাগিয়া অশ্রুর সঙ্গ্রহ ধাবায় ফাটিয়া পড়িল। কতখানি হতাশা, কতখানি বেদনা যে সে দৃষ্টিতে মাখানো!

মা বলিলেন,—না পিতৃ, ওঁকে ও-সব বলে ওঁর সেবাব অপমান করো না, বাবা। সত্যি, উনি যা কবেচেন, এ ভগতে তার শোধ হয় শুধু একটি জিনিষে।

প্রণব সম্মুখে বলিল,—সে কি জিনিষ মা?

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অঙ্গদিকে চাহিয়া মা বলিলেন,—সে হবার নয় বাবা। মিছে বলে মুখ নষ্ট করি কেন!

মার একখান ইঙ্গিত প্রণব বুঝিল, বুঝিয়া প্রীতির পানে চাহিল। প্রীতি নত শিরে দাঁড়াইয়া ছিল। সে প্রণবের চোখের সে-ভাষা বুঝল না।

প্রণব হঠাৎ কথাব শ্রোত ফিরাইবার ভঙ্গি বলিল,—শশী কোথায় মা?

মা বলিলেন,—কদিন বাড়ীতেই আছে। আমি একবার আদবার ঠেলে-ঠেলে তবু কাবধানায় পাঠাতুম, তা গিয়ে থাকতে পারতো না; একটু পরেই পালিয়ে আসতো। ভয়ে সে নিজের ঘবটির মধ্যেই পড়ে থাকতো, নড়তো না। এ ঘরেরও বড় একটা ঢুকতো না, কেউ ওদিকে গেলেই যেন চমকে উঠতো, খালি বলতো, দাদা কেমন আছে এখন? যে দৃষ্টিক্রিয়া সে দিন কাটিয়েছে!

প্রণব কহিল,—তাকে একবার ডাকো মা। কারখানায় অনেক গোল উঠেছিল, কি হলো, জানতে চাই।

মা বলিলেন,—সে আগে ভালো কবে সেয়ে ওঠো বাবা,—তাব পর লেখো।

প্রণব বলিল,—না মা, তুমি ডাকো তাকে, একবার!

মা বলিলেন,—সে নেই, বেবিয়চে। কোন্ বন্ধুর বাড়ী থেকে নেমস্তন্ন করে গেছলো,—তা কিছুতে বাবে না। আমি ঠেলে-ঠেলে এখন পাঠিয়ে দিলুম, বললুম, ও তো সেবেচে। মিছে কেন তাদের মনঃক্লেশ করিস!

প্রণব বলিল,—বেবিয়চে? কার বাড়ী নেমস্তন্ন?

মা বলিলেন,—কে রাম বাবু আছে, এই বীড়ন প্রীটে বাড়ী। তারা কিছুতে ছাড়বে না! তাই আমি বললুম—

রামবাবু! ও, সেই বীড়ন স্ত্রীটির রামতারক! তাই তো! প্রণব একটু চিন্তিত হইল; মুখে কিছু বলিল না।

—২০—

সাত আটদিন পরের কথা। সেদিন সন্ধ্যার পূর্বে প্রণব বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। প্রীতিকে ডাকিয়া মা বলিলেন,—যাও তো মা, পিছুর ঘবেব নতুন বালিশের ওয়াড়গুলো কেচে এসেছে—সেগুলো নাথু পবিষে দিচ্ছে। তুমি মা ওয়াড়গুলোয় তাব নাম লিখে দাওগে ত। তোমার মেয়ের মতই দেখে, তাই বলটি। জানি, তুমি এতে দুষ্ট ভাবেব না!

প্রীতি বলিল,—সে কি কথা, আমি এতে সত্যি ভাবী খুশী হই। এই যত্ন—এ বে আমার একেবারে অজানা মা! শেষের দিকে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। সে আসিয়া প্রণবের ঘবে ঢুকিল ও ছুঁচ-সুতা লইয়া ওয়াড়ে নাম তুলিতে লাগিল। একদিন সেবার কাজ চুকিলেও প্রণবের প্রত্যেক কাজটি নিজের হাতে সে ক বতে যাউতেছিল। কি কবিয়া সে এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, প্রণবকে তাহা বলিয়াছে, কিছুই লুকাই নাই! যে-ভাবনা তার হইয়াছিল।—ওঃ! এইবার বিদায় লইবার পালা আসিয়াছে। ইহা বা না ছাড়িলেও সে কি বলিয়া এখানে থাকিবে? ভালো দেখায় না! কিন্তু নাইবেই বা কোথায়! বাহিরে নিরাশ্রয় মক বুধু করিতেছে। কোথায় আশ্রয়? কোথাও নাই! এ বাড়ীতে যত্নের কি কমিত আছে। মাজগৎ বলিতে অজ্ঞান! আনর কবিয়া জগদ্ধাত্রী-মা বলিয়া ডাকেন! আর বাড়ীর লোকগণ—ক্রীশ্চান জানিয়া ছুঁৎ বাঁচাইয়া চলিলেও সকলেই তাহাকে স্নানস্বরে দেখে। ছোটাবুটি কেমন, সেইটুকু তাহার দেখা হয় নাই। ছোটাবু নিজের ঘর আর নিজেকে লইয়া ব্যস্ত! বাড়ীতে আব কে প্রাণী আছে, তাহা জানিবার আগ্রহ একটুও নাই! এটুকু ছাড়া সে আবো লক্ষ্য করিয়াছে, ছোটাবুর চাল-চলন সব কেমন অদ্ভুত রকমের। কখন বাড়ীতে থাকেন, কিছু বুঝা যায় না। তবে প্রত্যহ গভীর রাত্রে কণ্ঠস্বর শুনা যায়, তাহাতে সে যোষে, ছোটাবু বাহিরে গিয়াছিলেন, এখন বেড়াইয়া ফিরিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার স্বরথানা ছাইয়া ফেলিয়াছিল। উঠিয়া ইলেক্ট্রিক আলোটা জালিয়া দিবে, সেদিকে খেয়াল ছিল না। অন্ধকারে চিন্তাত্রোতে মনটাকে ভাসাইয়া দিতে ভালো লাগিতেছিল। সেলাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার ঝাপসা আঁধারে মনও চিন্তার স্রোতে কোন্ অকূলে অনির্দেশ যাত্রা শুরু করিয়াছিল। তীরে গাছপালা নাই, ছায়া নাই, উঁচু পাড়ের মধ্য দিয়া

তাহার মন একা কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছিল, সে দিকে তাহার কোন খেয়াল ছিল না।

ঠাট্টাং একটা শব্দে সে চমকিয়া চাটয়া দেখিল। কে একজন আসিয়া ডয়ার হইতে চাপি টানিয়া কোণের দেওয়াল খুলিতেছে—তারপর তাহার মধ্য হইতে কি একটা বাহির কবিয়া সে আলোর স্তূট্ টানিয়া দিল। আলো জ্বলিল। প্রীতি উঠিয়া তাহাব পানে চাহিল। কে? সে শিহরিয়া উঠিল। এ সে...সে-ই! সেই ছদ্মবস্ত্রের রাত্রে এই তো তাহাকে বাগানে ধরিতে গিয়াছিল। সে এখানে আসিল কি করিয়া...? এ তবে...?...এ তবে? ঠিক!

আগন্তুক প্রীতিকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল, কহিল,—তুমি?

আগন্তুক শশাঙ্ক:

শশাঙ্ক আবার সেই বন্ধুদের দলে পড়িয়া তাহাদের ঠাট্টা-বিক্রপ-টট্কারীতে সেই পুরাতন অভ্যস্ত পথেই চলিতে আবস্ত করিয়াছে। তবে এবার ভাবী সতর্ক হইয়া চলিতেছে। অর্ধ কিছু টাকার প্রয়োজন হইয়াছে—হাতে টাকা নাই, ব্যাঙ্ক এ সময় চেক পাঠানো যায় না, ধাবও কোথাও মিলিল না। তাই দাদাব কাজ হইতে ধাব কবিবে, ভাবিয়াছিল। দাদা বাড়ীতে নাই শুনিয়া দাদাব দেওয়াল হইতে টাকাটা লইয়া বাইবে ভাবিয়া সে আসিয়াছিল।

আসিয়া প্রীতিকে দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মেয়েটা কি ভাবিল? ভাবিল না কি, সে চোর? চোরের মত আসিয়াছে টাকা চুরি করিতে!

শশাঙ্ক প্রীতির দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিল,—বনের হবিণী, তুমি এখানে এলে কি করে? এঁয়া!

প্রীতি বলিল,—চুপ।

শশাঙ্ক বলিল,—কি রকম। আমার বাড়ীতে আমি থাকবো চুপ করে, আর তুমি সমাজীব মত হুকুম করবে! তাবপর একটু থামিয়া আবার বলিল,—ও, তুমিই নার্শ! চাল চলেছো বেশ!

প্রীতি কোন কথা বলিল না। সে বুঝিল, ইনিই বাবুর ছোট ভাই শশী! সেখানে নাম লইয়াছিল মোহন বাবু! কি লজ্জা, কি ঘৃণা!

প্রীতি বলিল,—টাকা রেখে দিন।

বিক্রপের স্বরে শশাঙ্ক বলিল,—বটে! সে আসিয়া প্রীতিব হাত চাপিয়া ধরিল।

প্রীতি একটা স্বাক্ষর দিয়া বলিল,—হাত ছাড়ুন। শশাঙ্ক বলিল,—কেন ছাড়বো, বলো তো? তোমার জন্তে অনেক টাকা খরচ করে'চ। ওজাদের মাইনে, বাড়ী ভাড়া, পুলিশের টাকা, সে সব তোমার মা বসন্ত বাড়ীউলি তালুক বেচে জোগায় নি! এই শর্মাই গাঁট খেঁচে খরচ করেছিল, মস্ত প্রত্যাশায়!

সমস্ত ব্যাপার অমনি এক নিমেষে প্রীতির চক্ষে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। ইনিই তবে... ?

শশাঙ্ক বলিল,—ভাগ্যে, এ নার্শের কাজে ক'টাকাই বা রোজগার হবে! ছেড়ে দাও। এ কি তোমার সাজে? তার চেয়ে বলা, কি চাই? হীরের মটুক, হীরের হার, সোনার সিংহাসন, বা সাধ থাকে, বলা। শশাঙ্ক প্রীতির হাত ধরিল।

প্রীতি বঙ্কর দিয়া উঠিল,—হাত ছাড়ুন। তাবপর সে সবলে হাত ছাড়াইয়া পড়িল। হাত ছাড়াইয়া সে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। শশাঙ্ক গিয়া তখন দ্বার আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রীতি বলিল,—আমায় যেতে দিন, বলচি, না হলে ভালো হবে না।

শশাঙ্ক বলিল,—বটে! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকেই চোখ রাঙাবে! বেশ, রাঙাও! কিন্তু যদি চোখেমচি কথো, তা হলে আমি সকলকে ডেকে এখনি তোমার পরিচয় দেবো, এই নার্শটিকে!

প্রীতি ভয়ে চমকিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভয় তখনই কাটিয়া গেল। চঠাৎ সেই মুহূর্তে প্রণব আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে যেন ইন্দ্রদ্যাবের মত! প্রণব বলিল,—কি বলবে শশী?

শশাঙ্ক প্রথমটা একটু খতমত খাইল, তাবপর বলিল,—এ নার্শ নয় দাদা,—এ কে, জানো?

হাসিয়া প্রণব বলিল,—একে নার্শ বলেই জানি। এ বজ্রেরই আমি প্রাণ পেয়েছি। অল্প পরিচয় আছে না কি?

হাসিয়া শশাঙ্ক বলিল,—ওর নাম ফুলি, ও বেণু। বসন্ত বাড়ীটলির মেয়ে।

প্রণব গভীর কণ্ঠে বলিল,—সাবধানে কথা বলা শশী! একজন স্ত্রীলোককে হাতে পেয়ে অপমান কবো না। তুমি ঠেকে চেনো না, কিন্তু আমি চিনি।

শশাঙ্ক বিস্মিতভাবে বলিল,—তুমি চেনো? ও... ?

প্রণব বলিল,—হ্যাঁ, তোমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী হবে। শুনলে?

সেই মুহূর্তে দাক্ষ অন্ধকাবে সমস্ত বিশ্বটা যদি একেবারে ঢাকিয়া জমিয়া যাইত, তাহা হইলেও প্রীতি ও শশাঙ্ক কেহই অত বিস্মিত হইত না। প্রীতি অবাক হইয়া গেল! এ কি কথা! শশাঙ্ক বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। এমন সময় মা আসিয়া বলিলেন,—কিসের গোলমাল রে তোদের?

প্রণব অচপল কণ্ঠে বলিল,—আমি শশীকে বলছিলুম, এঁকে গেনে না, তাই তিনিয়ে দিচ্ছিলুম। বলছিলুম যে, এই নার্শ—এ আমার স্ত্রী। আমি একে বিবাহ করবো।

মার বৃকে কিসের একটা ঢেউ উথলিয়া উঠিল।

তিনি বলিলেন,—তাঁই কব্ব বাবা। আমি প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করচি, এতে তোব মঙ্গল হবে, দেখে নিস! বিয়ের মানে যদি এই হয়, দুজনে মনে মনে গভীর মিল, দুজনে দুজনের উপর প্রাণ-মন ঢেলে দিয়ে এক হওয়া, তা হলে এর চেয়ে যোগ্য মেয়ে তুই আর কোথাও পাবিনে। ক'দিন আমি কেবলি ভাবচি, কি দিলে এন্থ স্বর্ণ শোধ হয়! আর এও ভাবছিলুম, যদি এই প্রাণটি—যেটিকে ও প্রাণ-ঢালা সেবার বাঁচিয়ে তুলেছে—সেই প্রাণটুকু ওরই হাতে জন্মের মত তুলে দিতে পারি, ওরি জিম্মায়, তা হলে যেন আমার প্রাণ খুশী হয়। নাহলে ওব সেবার দাম তুচ্ছ টাকার শোধ হয় না।

শশাঙ্ক বলিল,—কিন্তু মা, তুমি ওব পরিচয় নিয়েচো? হাসিয়া মা বলিলেন,—কোন দবকাব নেই, শশী। মামুষের পরিচয় কি শুধু তার গোত্রের? তা নয়। মামুষের পরিচয় মামুষের মনে। ওর মন এ ক'দিনে আমি বা দেখে বুঝি। তাতে বলতে পারি, মস্ত বড় মহামহোপাধ্যায়ের ঘবেব মেয়েকেও এর কাছে মাথা হেঁট কবে দাঁড়াতে হয়। এত বড়, এত পবিত্র ওব মন!

প্রণব উচ্ছ্বসিত আনন্দে মার পায়েব উপর পড়িয়া বলিল,—মা, তোমাকে এর সব কথা বলবো। এর নিজের হাতে লেখা সত্য পরিচয়। তা পড়লে শুধু স্নেহ কি মা, শ্রদ্ধায় তোমার মন ভেবে উঠবে!

মা বলিলেন,—এসো মা জগৎ, পিহু ব ছুপ আনবে। প্রণব বলিল,—জগৎ কাকে বল্চো মা? এর নাম প্রীতি।

মা বলিলেন,—প্রীতি! প্রণব বলিল,—হ্যাঁ মা, ওর কথা তোমার আমি বলবো'খন।

শশাঙ্ক যেন অবাক হইয়া গেল! এই এক মুহূর্তে যে ঘটনা ঘটিয়া গেল, এ কি সত্য, না স্বপ্ন? এ কি সে উপন্যাস পড়িতেছে, না, বায়োস্কোপে ছবি দেখিতেছে! সে কেমন বিহ্বল হইয়া পড়িল। ফুলি—সে কাহাদের মেয়ে স্পষ্ট করিয়া সে কথা বলা সত্ত্বেও তাহাকে একেবারে—!

সে চলিয়া যাইতেছিল। প্রণব বলিল,—শশী, কোথাও যেয়ো না—তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। বাইরে তোমার এক বন্ধু দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, তোমার কাছে কি টাকার জন্তে এসেচেন। আমি তাঁকে বলেচি, পাওনা টাকা হয় যদি তো কাল হিসাব নিয়ে আসবেন। তা' চলে গেলেন।

শশাঙ্ক এমন হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার আর কোথাও বাইতে ভালো লাগিতেছিল না। হাতে টাকা, দেবাজ খোলা—এগুলার রহস্য এখনি কি বিল্লী হইয়া সকলের চোখে ধরা পড়িবে! সে বলিল,—দাদা,

তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে, একবার বাইরে এসো।

প্রণব বাড়িরে গেল। শশাঙ্ক প্রায় কাঁদিয়া তাকে বলিল,—দাদা, আমি চোরের মত তোমার দেবাজ থেকে এই টাকা বার কবে নিয়েছি। চুরির মন্তলব আমার ছিল না। কিন্তু—

প্রণব বাধা দিয়া বলিল,—আমাব টাকা তুমি নিলে চুপি করা হয় না, শশী। তুমি আমাব ভাই, আমরা ছুজনে এক নই কি? টাকার দরকাব হয়েছে, নিয়েচো—তাতে কি।

শশাঙ্ক বলিল,—না দাদা, আমার মাপ করো। এই টাকা নাও, নিয়ে ভুলে রাখো। ইয়াংদের ফুর্তি দেবার জন্ত টাকার দরকার হয়েছিল, সেই টাকা নিয়ে যাবো বলে এসেছিলাম। নিজের হাতে কিছু নেই—ভেবেছিলুম তোমার কাছ থেকে চেয়ে নেবো। তুমি বাড়ী ছিলে না, আমাবো অব্ সইছিল না—

—কত টাকা?

—দুশো।

—কি হবে?

—একটা বাজি রেখেছিলুম। হেবেচি, তাই দিতে বাচ্ছিলুম।

—বেশ, দিয়ে এসো। কথার খেলাপ করো না। তবে ও-সঙ্গ ছাড়ো শশী। ওতে কোন আয়োদ নেই। জীবনটাকে সার্থক করবার হাভার উপায় আছে—তার একটা অন্ততঃ বেচে নাও। টাকাটা দিয়ে এসো—তবে সে আয়োদে খেঁকো না।

—না দাদা, যাবো না।

—যাও। তবে তার যদি না ছাড়ে? তাদের বোলো, বাড়ীতে কাজ আছে।

শশাঙ্ক বলিল,—বেশ, তাই হবে।

শশাঙ্ক চলিয়া গেলে প্রণব নিজের ঘরে আসিল। ঘবে কেহ ছিল না। প্রণব ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। ভাবিল, তাইতো, এক নিমেষে কি এ এক নাটকের অভিনয় করিয়া ফেলিল। কিন্তু না, এ অভিনয় নয়! এই কথাটাই আজ কয় দিন ধরিয়া সে ভাবিতেছিল। এই একটমাত্র উপায় ছিল—প্রীতিকে নিবাপদ আশ্রয় দিতে শুধু এই একটমাত্র উপায়। সে তো মাকে জানে। মার কাছে বংশ-গোত্র-এ-সবগুলার চেয়ে মনের দাম ঢের বেশী।

প্রীতি আসিয়া বলিল,—দুধটুকু খেয়ে ফেলুন। মা দিলেন।

প্রণব নিঃশব্দে দুধ পান করিল। পান করিয়া বাটিটা মেঝের রাখিল। প্রীতি তখন দুধ করিয়া তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল, বসিয়া বলিল,—আমার একটি ভিক্ষে আছে।

প্রণব সম্মুখে বলিল,—ভিক্ষে! কি ভিক্ষে, বসো?

প্রীতি বলিল,—বলুন, সে ভিক্ষে দেবেন?

প্রণব বলিল,—দেবো, বসো। আমার জীবনসাত্রীকে আমার অদেয় কিছুই নেই।

প্রীতি বলিল,—ও কথা বলে আপনার তৃপ্তি হয় যদি তো বলুন। আমার ভিক্ষা এই যে, ও হবে না—আপনি ও সঙ্কল্প ছেড়ে দিন।

প্রণব বলিল,—কি সঙ্কল্প?

প্রীতি বলিল,—এইমাত্র এই যা বললেন।

প্রণব বলিল,—ও! বুঝেছি। এ কথা কেন বলচো প্রীতি?

প্রীতি বলিল,—তা হতে পারে না।

প্রণব বলিল,—কেন হতে পারে না, শুনি?

প্রীতি বলিল,—আপনি সব জানেন তো! আমার জন্ত আপন সমাছে হয়ে হয়ে থাকবেন, এ কথা মনে হলে আমার সেই দণ্ডে মরবার সাধ হয়।

প্রণব বলিল,—এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই যে প্রীতি। মার কথা শুনে তো?

প্রীতি বলিল,—শুনচি। তিনি যদি স্নেহে অন্ধ হন, আপনি পুরুষমানুষ, আপনিও তবেন?

প্রণব বলিল,—কিন্তু এ অন্ধের কথা নয়, প্রীতি, যার চোখ আছে, চোখ ফুটেচে, এ তাব কথা।

প্রীতি বলিল,—না, না, এ হতে পারে না।

প্রণব বলিল,—খুব হতে পারে।

প্রীতি বলিল,—আপনি যে আমার দেবতা।

প্রণব হাসিয়া বলিল,—জ্বালোকের স্বামীই দেবতা।

প্রীতি বলিল,—না, না, সে-দেবতার কথা আমি বসচি না। আপনি,—আপনি আমার ভাই, বন্ধু, মা, বাপ, স্বামী, সব...সব। আপনি যে ও-স্বামীদেবতারও উপরে।

প্রণব কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে বলিল,—আমার মার মনেব অত্থানি সাধে তুমি বাদ সাধবে?

প্রীতি কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া বলিল—কি করবো? আমি যে কত্থানি নিকপায়...! নাহলে স্বর্গ পেয়ে এমন করে কেউ তা হারাতে চায় কখনো?

প্রণব বলিল,—প্রীতি, তুমি জানো না, তুমি এ কি বলচো! এই কথায়, তোমার এ সঙ্কল্প রাখতে আমার কত্থানি কেড়ে নিচ্ছ! এ জগতে কখনো জ্বী বলে কাকেও গ্রহণ করতে পার্বে, তা আমি স্বপ্নে ভাবিনি কোনদিন। আজ জ্বী বলে গ্রহণ করতে চেয়েছি একমাত্র তোমাকে। কবুতে চেয়েচি কেন—মনে মনে পেয়েওচি। তুমি যদি এ সাধে বাদ সাধো, তাহলে এ-জগৎ আর কখনো আমি বিয়ে করবো না। মানুষ এমন করে ভালো-বাসতে পারে একজনকে শুধু—আমি তোমার সেই

ভালোবাসাই বেমেছি। সমাজের ঘৃণার কথা বল্‌চো? এ ভালোবাসা সে ঘৃণাকে অনায়াসে পরাস্ত কব্‌তে পারবে।

প্রীতি কোন কথা বলিল না।

প্রণব আবার বলিল,—আমার মার মুখের পানে চেয়ে দেখেচো কি? আমার এ কথাই মার মুখে হাসির কি জ্যোৎস্না ফুটেচে! এ জগতে মার আমার সব। মার অমূল্য মতি, মার ধমন আশ্রয়-ভরা সম্মতি পেয়েছি যখন, তখন জগতে কোন সমাজকে ডবাইনে আমি। তুমি যদি এ-সব ভেঙ্গে-চুরে চলে যেতে চাও—আমার মন থেকে দূরে, খুব দূরে, তাহলে আমি কি শোপ নেবো, জানো?

প্রীতি আকুল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রণবের মুখের পানে চাহিল,—কোন কথা বলিতে পারিল না।

প্রণব বলিল,—তাহলে আমার নান আর কখনো তুমি কাণে শুনে পাবে না।

প্রীতি নিরুপায়ের কান্না কাঁদিতে লাগিল। তাহার বুক ফাটিয়া অশ্রু সাগর গেল ঝুলিয়া উঠিল।

এমন সময় মা আসিয়া বললেন,—হৃদ খেয়েচিস্‌ রে?

—হ্যাঁ মা।

তারপর প্রীতিকে দেখিয়া মা বলিলেন,—বৌমা কাঁদচে কেন বে?

প্রণব ডাকিল,—মা—

সে কথা কাণে না তুলিয়া প্রীতির হাত ধরিয়া মা বলিলেন,—ওঠো তো মা। ছেলেবেলায় মা হারিয়েছি। যেদিন পিঙ্কি কোলে এলো, সেদিন থেকে এই দিনটিব পানেই শুধু সেসে আছি—কবে একটি ছোট দরদী মা পেয়ে মন খুলে তাকে মা বলে ডেকে ডুপ্তি পাবো! আজ সেই সন্দিন এসেচে। আমার এ সাধ পূর্ণ করো মা। একবার ওঠো—উঠে পিঙ্কির পাশে বসো। দেখে আমি চক্ষু সার্থক কার!

আনন্দের উত্তেজনার মার চোখে জল আসিল। মা দুই জনকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—এই কথাটি মনে বাখিস্‌ দুজনে, এ জগতে বংশের পরিচয় গোত্রের পরিচয়ে মানুষ মানুষ হয় না, মানুষ মানুষ হয় তার নিজের মনের গুণে, নিজের মনুষ্যত্বে

তারপর মা বলিলেন,—ভালো কথা, আমার মালা-ছড়া নিয়ে আসি। পিঙ্কির মুখে তোমার কথা শুনবে সব। পালিয়ে না মা।

মা চলিয়া গেলেন। প্রণব তখন প্রীতির মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বলিল,—মার কাছে তোমার আবেদন জানালে না কেন বে, ওগো মা, আমায় এ দায় থেকে মুক্ত করো?

প্রীতির চোখে-জল ঠেলিয়া আসিল। দুই চোখে কৃতজ্ঞ দৃষ্টি ভরিয়া সে প্রণবের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে হইতেছিল, তাহার চোখের সামনে হইতে মলিন জার্ণ কি একখানা পর্দা খসিয়া পড়িয়াছে—চারি-ধার সোনার বর্ণে বস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে!

সে বলিল,—কি সোনার কাঠির পবন বুলিয়ে দিয়েচেন আমার প্রাণে—

—যে, প্রাণে প্রেমের শতদল ফুটে উঠলো এতক্ষণে—না? বলিয়া প্রণব প্রীতির অধরে গাঢ় চুম্বন-বেশা অঙ্কিত করিয়া দিল।

\* \* \* \*

গভীর রাত্রি। অন্ধকার আকাশের গায়ে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রীতি জানালার ধারে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে'ছিল, আজিকার এই সমস্ত ব্যাপাবগুলি। এমন সময় পাশে কে ডাকিল,—বৌদ—

চমকিয়া চাহিয়া প্রীতি দেখে, শশাঙ্ক। সে একটু সঙ্কচিত হইল।

শশাঙ্ক তাহার পাশের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল,—আমায় ক্ষমা করো, বৌদি। অতীত ভুলে যাও। আমাকে আর সে-পশু তুমি কখনো দেখবে না। আজ থেকে আমায় ছোট ভাইয়ের মতই দেখো। দেখবে?

প্রীতি যেন পাগলের মত হইয়া পড়িল। এত আলো। এ বিধে এত আনন্দ সঞ্চিত ছিল! তাহার অন্তরে এত স্থখ!

সে শশাঙ্কের হাত ধরিয়া বলিল—ছি, ও-কথা বলবেন না। আমি দুর্ভাগিনী, নিরাক্ষর। আমাকে আশ্রয় নয়, এ যে একেবারে রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছেন আপনারা। এ স্বপ্ন কি ভোলবার!

# পুনশ্চ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অজাতশত্রু

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত

বন্ধুবরেষু—

পৌষ, ১৩৪১

সৌরীন্দ্র

# দাদু

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

বহুকালের পুরানো দোতলা বাড়ী। সামনে থানিকটা খোলা জায়গা—তৃণশ্যে ঘাজ্জল। সেইখানে একঝানা বেঞ্চে বাসিয়া বৃদ্ধ শ্রামাচরণ আকাশের পানে চাহিয়া আছেন; সজ্জ বেড়াইয়া ফিরিয়াছেন! এমন সময় মুহূর্তপন্থকাবে নাতি মণ্টু আসিয়া কহিল,—আমার লবঙ্গুস এনেচো দাদু?

সঙ্গে সঙ্গে নাতনী শচীও কণ্ঠস্বর,—আর আমার পুতুল?

নাতি-নাতনী আসিয়া দাদুকে দুই দিক হইতে আক্রমণ করিল। দাদু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—ঐ যাঃ! সত্যি ভুলে গেছ ভাই...

দুজন সাহুনাশিক স্তরে কহিল,—বা বে, বোজ বোজ ভুল!

মণ্টু বলিল,—আজ কাগজে লিখে তোমার জামার পকেটে সে কাগজ রাখলুম...

শচী কহিল,—আমি তোমার কোঁচায় গিট বেঁধে দিলুম যে আর কথনো ভুলে যাবে না!

সনিখাসে দাদু কহিলেন,—তবু ভুলে গেছি, বোন।

অনুযোগের স্বরে মণ্টু কহিল,—দাদুর কিছু মনে থাকে না...

শচী প্রতিধ্বনি তুলিল,—না!

দাদু কোনো জবাব দিলেন না। দিবার মত জবাব ছিল না।

মণ্টু কহিল,—কি গোমাব মনে থাকে?

শচী বলিল,—হ্যাঁ...

দুজনকে কোলের কাছে টানিয়া দাদু সনিখাসে কহিলেন,—থাকে যে, থাকে অনেক কিছু মনে থাকে।... মন থেকে চেষ্টা করবে সে-সব তাড়াতাড়ি পাব না!

মণ্টু কহিল,—কি মনে থাকে—ভনি...

শচী ঝাঁকানি দিল, বলিল,—বঙ্গো...

দাদু দুজনের পানে চাহিয়া রহিলেন। গোধুলির স্তিমিত আলো-আঁধারে তাদের চোখ দুটি জ্বলিতেছিল যেন স্নায়ুর বাতি!

দাদু কহিলেন,—ভনিবি...কি মনে আছে?

মণ্টু কহিল,—ভনিবো...

শচী কহিল,—নিশ্চয়।

দাদু ক্ষণেক নীরব রহিলেন।

মণ্টু কহিল,—বলো...

শচী বলিল,—হ্যাঁ...ছাড়টি না না-বললে। ভনিবোই।

দাদু কহিলেন,—শোনো তবে...

দাদু একবার আকাশের পানে চাহিলেন। আকাশ যেন নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে—তার নক্ষত্র-নয়নে যেন প্রচণ্ড কৌতুহল। সারা জীবনের যত ঘটনা...তাদের মধ্যে কোনটা দাদুর মনে আজো কাঁটাব মত বিঁদিয়া আছে, ভনিবার জগৎ আকাশের কৌতুহলও যেন দারুণ হইয়া উঠিয়াছে! আকাশের বৃকে তার কোনোটাই অগোপন নাই! দাদুর জীবনকে নিজের আশ্রয়-তলে আগাগোড়া রাখিয়া আসিয়াছে...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাদু কহিলেন,—রাগাঘরের পাশে ভাঙ্গা পাঁচিল দেখচো...

মণ্টু কহিল,—হ্যাঁ...

দাদু কহিলেন,—ঐ পাঁচিল একদিন আস্ত ছিল—টানা, লম্বা! ঐ যে পথের ধারে আস্তাওড়ার জঙ্গল... ওখানে জঙ্গল ছিল না; পাঁচিল ছিল সেই রাস্তার ধার পর্যন্ত। আর বে জায়গায় জঙ্গল ছাখো, এখানে ছিল মস্ত ঠাকুর-দালান। একদিন সে দালানে খুব ধুমধামে পূজা হতো...ভূর্গা-পূজা, জগদ্ধাত্রী-পূজা, অন্নপূর্ণা-পূজা...

শচী কহিল,—সব পূজাই?

দাদু কহিলেন,—তাই!...আমার বয়স তখন সাত-আট বছর। কি ধুমই হতো। যাত্রা হতো—গান, বাজনা, আমোদ-আহ্লাদের আস্ত ছিল না।

শচী প্রশ্ন তুলিল,—তুমি অত ছোট ছিলে? দাদার চেয়েও ছোট? বা বে।

মুহূর্তান্তে দাদু কহিলেন,—ছিলুম দিদি! বরাবর কি এমন বুড়ো আমি?...মাথায় টাক? দাঁত নেই? তা নয়...একদিন আমিও ছিলুম তোমার এই লম্বা দাদাটির মত। আমার মা ছিল, বাবা ছিল...কত আদর করতো, কত ভালোবাসতো। সকালে উঠে ঠাকুর-দালানে পণ্ডিত মশায় এসে বসতেন—তঁার কাছে বসে বানান করে ঐক্য-বাক্য পড়তে হতো! পড়া বলতে না পারলে কাণমলা খেতুম, মার খেতুম।

শচী কহিল,—তোমাকে মারতো? সে পণ্ডিত-মশায় তোমার চেয়েও বড় ছিলেন বুঝি?

দাদু কহিলেন,—ছিলেন।

শচী বলিল,—তিনি এখন কোথায় আছেন, দাদু? তাঁকে ভারী দেখতে ইচ্ছা করচে।



দাহু কহিলেন,—তাকে আর দেখা যাবে না ভাই !  
তিনি এখন স্বর্গে ।

—তোমার মা ? তোমার বাবা ?

—তারাও স্বর্গে ।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের স্মৃতির ভারে দিকে দিকে স্তব্ধতা জাগিল । মন্টু শচী চুপ—যেন তারা মনের মধ্যে সেই অতীত দিনের স্মৃতিকে ভালো করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে !

দাহু কহিলেন,—তখন অনেক টাকা ছিল আমার বাবার । তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় যেতেন... ফেরবার সময় কত কি কিনে আনতেন । টিনের বেল গাড়ী...দম দিলে চলে—সবে তখন উঠেছে । লবঙ্গুদ, মার্বেল আনতেন ; এনে আমাকে দিতেন । আমার খেলনা দেখে পাড়ার ছেলেরা আমার কাছে আসতো খেলবার জন্ত...

একদিনের কথা তবে বলি...

মুড়ি খাবার আমার ভারী সখ ছিল । বাড়ীতে গেতে দিত না । সেদিন মার কাছ থেকে একটা পয়সা চেয়ে নিয়েছিলুম । চাকরদের গোথে ফাঁক দিয়ে চুপ চুপি বিকেলেও দিকে বাড়ী থেকে দূরে ছিল শিখর দোকান... সেই দোকানে গিয়ে পয়সা দিয়ে এক পয়সার মুড়ি চাইলুম । তারা কৌটায় মুড়ি ঢেলে দিলে একবাশ । সেই মুড়ি পথে দাঁড়িয়ে চিবুছি...এমন সময় গাড়ীর শব্দে চেয়ে দেখি, গাড়ীই বটে—আমাদের বাড়ীর দিকে আসচে । নিশ্চয় বাবা ফিবচেন কলকাতা থেকে ! ভয়ে সেই কৌচড়-ভবা মুড়ি ছুড়তে ছুড়তে বাড়ী ছুটলুম । বাড়ীতে ঢুকে একেবারে তেতলার চিলকোঠার পাশটিতে...নিশ্চিন্ত মনে মুড়ি চিবোচ্ছি... হঠাৎ সামনে দেখি, বাবা ! পথ থেকে বাড়ী পর্য্যন্ত—সিঁড়ি বয়ে ছাদ পর্য্যন্ত ছড়ানো মুড়ি দেখে বাবার মনে সন্দেহ জেগেছিল, নিশ্চয় সে আমার কার্তি ! সব মুড়ি তিনি ফেলে দিলেন...দিয়ে চাকরদের ধমকালেন—ছেলে চৌকি দিস্ না...ছেলে দোকানে গিয়ে মুড়ি কিনে খায় ! আমিও বকুনি খেলুম । কিন্তু সেজন্ত তত দুঃখ হয়নি, যত দুঃখ হলো মুড়িগুলো মনের সাথে খেতে পেলুম না বলে ! মার কাছে রাত্রে মনের দুঃখ জানিয়ে বলাইছিলুম—বেশ, যেমন আমাকে মুড়ি খেতে দাও না, দাঁড়াও, বড় হই, ঐ মুড়ি ধামা ভরে খাবো !

শচী কহিল,—বড় হয়ে ধামা ভরে মুড়ি খেয়েছিলে ?

দাহু কহিলেন,—না দিদি । তখন মুড়ির সখ জন্মের মত ঘুচে গেছে । তখন বড় বড় জিনিষ নজরে পড়লো... তুচ্ছ মুড়ির কথা মনে রইল না ।

মন্টু শুক বসিয়া কাহিনী শুনিতেছিল, দাহু কহিলেন,—কি ভাবচো দাদা ?

একটা নিখাস ফেলিয়া মন্টু কহিল—তোমার মাকে বাবাকে ভাবী দেখতে ইচ্ছা করে দাহু । কেন তাঁরা স্বর্গে গেলেন ? থাকলে আমরা কেমন দেখতে পেতুম ! তোমার মত ভালোবাসতেন । আচ্ছা দাহু, তাঁদের তাহলে কি বলে ডাকতুম ?

গাঢ় স্বরে দাহু কহিলেন,—যদি তাঁরা কখনো আসেন, তখন শিখরে দেবো দাহু, কি বলে তাঁদের ডাকবে ।

শচী কহিল—তাঁরা আমাদের দেখেন নি ?

দাহু কহিলেন,—না ।

শচী কহিল—আমাদের দেখলে কি করে চিনতে পাবেন ?

মন্টু কহিল—তাঁরা এলে ভালো হয়...আমার খুব ভালো লাগে । আমাদের দেখতে তাঁদের ইচ্ছা হয় না দাহু ?

দাহু কোনো জবাব দিলেন না...

শচী কহিল—আশ্রম না একবার ! আমরা এমন ভাব করবো আর নেপটে থাকবো যে আমাদের ছেড়ে আর চলে যেতে পাবেন না...

দাহু ভাবিতেছিলেন—তাঁরা তো তোমাদের দেখেন নাই, দাহু ! যারা দেখিয়াছিল, বকে রাখিয়াছিল, শত সাধ সন্তোষ তারা কোথায় চলিয়া গেল তোমাদের ফেলিয়া...! এ কি মানুষের সাধ্য, যে এমন বৃকের মণি ফেলিয়া যায় ! অক্ষম কিন্তু মানুষ...

কিছুক্ষণ পরে মন্টু কহিল—চুপ করে থেকো না দাহু । আদো বলো...ভালো লাগচে ।

শচী কহিল—আমার কান্না পাচ্ছে । কেন সবাই একসঙ্গে থাকে না দাহু ? স্বর্গে কেন যায় ? স্বর্গে কি আছে দাহু...?

দাহু কহিলেন—জানি না দিদি । যদি কখনো সেখানে যাই, ফিবে এসে বসবো...

শচী সবলে দাহুর হুই হাত চাপিয়া ধরিল, বাম্পাত্র' কণ্ঠে কহিল,—না দাহু, স্বর্গে কি আছে, জানতে চাই না । তুমি স্বর্গে যেয়ো না । শুনেচি, যারা স্বর্গে যায়, তাবা আর ফিরে আসতে চায় না ।

দাহু কহিলেন—আসে বৈ কি দিদি...

মন্টু কহিল—আসে ?

দাহু কহিলেন—আসে । আমি দেখো, ফিরে আসবো । সত্যি আসবো...তোমার পেটে এসে জন্মাবো দিদি...ছোট্ট ছেলে হয়ে...

শচী কহিল,—না দাহু, ছেলে হয়ে পেটে এসে জন্মতে হবে না । তোমাকে তাহলে চিনতে পাববো না...

মণ্টু কহিল—তুমি বলো দাছ, যা বলছিলে...

দাছ কহিলেন—আর একদিনের কথা তবে বলি, ভাই...

সেদিন বিজয়া-দশমী। নদীর ঘাটে সারা দিন ধরে খুব ধুমধামে দুসানো নৌকা গুচ্ছ দিয়ে জুড়ে ফুলে পাতায় নিশানে আশে-পাশে সাজানো তছিল—সেই নৌকায় প্রথম তুলে খুব খানিকটা দূরে ভাসান দেওয়া হবে—বাড়ীতে জ্ঞাত-কুটুম্বের মস্ত ভিড়। আমবা ছেলের দল মহানন্দে মেতে নেচে বেড়াচ্ছিল। সন্ধ্যার পর বাজনা-বাজ করে প্রতিমা তোলা হলো ঠাকুর দালান থেকে। আমার মা প্রতিমা বরণ করলেন। লাল-টকটকে বেনারসী পাড়ী-পরা মায়েব সে মূর্তি... আজো আমার চোখের সামনে জলজল করচে। সে মূর্তির পানে তাকিয়ে প্রতিমার পানে তাকাবার কথা আমার মনে আসেনি। আনন্দে বুক ভরে গেছলো। মনে মনে কেবলি মস্ত্রের মত আওড়াইলুম—মা, আমার মা...

এমনি তন্ময়তার মধ্যে কখন যে সকলে প্রতিমা তুলে পাটবের পানে নিয়ে গেল, খেয়াল ছিল না। মা দাঁড়িয়েছিলেন, ঠাকুর-দাসানোব খিলানোব নীচে সব উপবের সিঁড়িতে মাঝে মাঝে জলে ভরে আছে। কদিন মায়েব মুখে আনন্দের যে জ্যোতি দেখেছিলাম, তা এই প্রতিমা-বিদায়েব বাখায় মলিন ম্লান। আমার বুক-খানার মধ্যে বাখা টনটনিয়ে উঠাছিল। তঠাৎ বাড়ীর চাকর গোপাল এসে আমাকে কাঁধে তুলে নিলে। আমি চমকে উঠলুম। মা বললেন—খাও, ভাসান দেখে এসো...

আমি বললুম—তুমি যাবে না?

মা বললেন—আমি বাড়ীতে থাকবো। যাবো না তো।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। বাড়ীওদ্ধ সব লোক ঝেঁটিয়ে বোরয়ে গেছে—বো, ঝা, ছেলেনেয়ে, দাস-দাসী সকলে। অব মা...

বুকটা নিশ্বাসে জমে ভারী হয়ে এলো... মায়েব পানে চাইলুম—হুট চোখেব পড়নে জল ঠেলে এলো।

গোপাল আমাকে কাঁধে তুলে এলো নদীর ঘাটে। বাদনা-বাজ মশালের সমারোহে তখন প্রতিমা নৌকায় তোলা হয়েছে। লোকের ভিড় একেবারে গিশগিশ করচে... আরো পাঁচ-দাতখানা ভাইলৈ ছিল। ছেলে-মেয়েরা তাতে চড়ে বসেছে। লোকের চীৎকারে কাণে ভালো ধরে যায়—এমন কলরব!

বাবা বললেন—গোপাল, তুই তোর দাদাবাবুকে নিয়ে আমার পান্থীতে ওঠ...

গোপাল চললো আমাকে নিয়ে। আমার চোখে মশালের অত আলো যেন নিব-নিব হয়ে এলো। হুই চোখ জলে ঝাপসা! আমি ডাকলুম,—গোপাল—

গোপাল বললে,—কি বলচো?

আমি শুধু বললুম,—মা...

গোপাল বললে—মা বাড়ীতে আছেন।

আমি বললুম—ভাসান আমি দেখবো না, গোপাল।

গোপাল বললে—বাবু যে বললেন! মা বলে দিচ্ছেন।

আমি বললুম—না। আমার মা একলা আছে... মায়েব কাছে কেউ নেই। আমি মার কাছে যাবো...

কথার সঙ্গে হুট চোখে ঝর-ঝর জল-ধারা বইলো।

গোপাল সেদিকে লক্ষ্য করলো না—আমি তার কাঁধে আছাড়ি-পিছাড়ি। তবু গোপাল ছাড়ে না। আমি তার চুলের ঝুঁটি ধরে টানটানি লাগালুম। তার নাকে মুখে চড় বসাতে লাগলুম। অত হট্টগোলে গোপাল কেমন দিশেহারা হলো... সে আমাকে সিঁড়ির উপর নামিয়ে দিলে। যেমন নামানো, আমি কোনো দিকে না চেয়ে সোজা ছুট দিলুম বাড়ীর দিকে।

রাত্রি-কাল। নদীর পথে হুদিকে ঘন বন। ভূতের ভয়ে এদিকে সন্ধ্যার পর কখনো আস না। তখন কোথায় গেল সে ভূতের ভয়! ছুটে বাড়ী চলে এলুম... ডাকলুম... মা...

মায়েব সাড়া নেই! এ ঘর ও-ঘর, এ দালান, ও দালান ছোটোছোট করে শেষে এলুম ছাদে...

দেখি, ছাদে আলিশাব ধারে দাঁড়িয়ে মা...

নদীর ও-দিককার আকাশ মশালের আলোয় লালে লাল! মা সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন...

আমি গিয়ে মায়েব আঁচল চেপে ধরলুম। মা চমকে ফিরে দেখলেন, বললেন—কে?

আমাকে দেখে মা অবাক! বললেন—ভাসান দেখতে গেলিনে?

আমি বললুম—না মা। আমি ভাসান দেখবো না। আমার ভালো লাগে না...

মা বললেন—সেকি! বাড়ীওদ্ধ সকলে গেল...

আমি বললুম—যাক! আমার বড্ড মন কেমন করচে মা... তুমি একলা আছো...

আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। মুখে কথা ফুটলো না। মা আমাকে বুক চেপে ধরলেন, আমার মুখে চুমু দিয়ে হেসে বললেন—পাগলা ছেলে, তোর মাকে একলা পেয়ে চোরে চুরি করে নিয়ে যেতো যে তুই এলি মাকে চৌকি দিতে?

আমার হুই চোখে জল-ধারা... মুখে কথা নাই!

মায়েব সে হাসি, মায়েব সে কথা—আজো আমার প্রাণে বাজচে, দাছ—যেন কাল আমার মার সঙ্গে একথা হয়েছে!

দাছ চূপ করিলেন। মর্ন্ত, শচী কাহাবো মুখে কথা নাই।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া দাছ কহিলেন,—তারপর অমন করে মাকে জড়িয়ে ধরে বৃকে চেপে রেখেছিলুম—কোথা থেকে এমন চোর এলো, দাছ—ছিনিয়ে নিয়ে গেল মাকে আমার বৃকের বাধন ছিঁড়ে। খোলা চোখে জেগে দিনের অত আলোতেও মাকে পাশে ধরে রাখতে পারলুম না...

মনে আছে দাছ, সে কথা আছো আমার মনে আছে—সে কথা এতটুকু ভুলিনি।

দাছ চূপ করিলেন।

শচী বলিল—হ্যাঁ দাছ, আকাশের তাবাগুলো কি সত্যি যারা স্বর্গে যায়, তাদের চোখ?

সনিশ্বাসে দাছ কহিলেন—হবে। ওখানকার কোনো খপর তো কোনোদিন বাখলুম না দিদি...ওদিক পানে চেয়েও দেখলুম না! ভূলাতই চেয়েছি—এই পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে, এই পৃথিবীকে বৃকে চেপে ধরে। তবু ভোলা যায় না!...কাঁচা বয়সে কি বেগ মনে চেপে বসে...বা যায়, মাটির নীচে সব যেন ঢাকা পড়ে যায়; কিন্তু হারায না! আবার এই চুল পাকবার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের মাটি ঠেলে তাবা জেগে ওঠে, ফুটে ওঠে নিত্য—সন্ধ্যা-জাগা ফুলের মত সেই গন্ধ, সেই বর্ণ নিয়ে। তখন দেখি, এতদিনেও তাদের অতি ছোট পরাগ কাঁটা অটুট—অটুট আছে সব। কোথাও ঝরেনি, খশেনি, টোটেনি। ভেবেছিলুম, গেছে। কিন্তু যায়নি, যায়নি। যায় না ভাই। সব যেন বীজ থেকে অঙ্কুরে ফুটে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে বৃকের মধ্যটা ছেয়ে আছে!

দাছর শেষের কথাগুলো মর্ন্ত ভালো বুঝল না—শচীও না; তাই তারা মুখের পানে তাকাইয়া রহিল—হতভম্বের মত!

দাছর চোখের সামনে নক্ষত্র-দীপ্তির উপর কে যেন কুয়াশার একখানি পুরু পর্দা টানিয়া দিল!

শচী কহিল—তারপর আর মনে নেই, দাছ?

দাছ কহিলেন—মনে নেই? সব মনে আছে। ভেবেছিলুম, মন থেকে গেছে; যায়নি। আছে, সব মনে আছে। সেই একদিন খেলার মাঠে ধুমধাম—বাজি জিতে সন্ধ্যার পবে বাড়ী ফিরেছি—দারুণ পিপাসা! কলসী থেকে জল গড়িয়ে ঢকঢক করে খাচ্ছি...সদরে হৈ-হৈ রব উঠলো।...চমকে সেদিকে ছুটে এলুম। দেখি, বাবাকে গাড়ী থেকে অজ্ঞান-অচেতন অবস্থায় পাঁচ-সাতজন লোক ধরে বয়ে দোতলায় উঠলো। আমার রক্ত যেন হিম হয়ে গেল! দোতলায় ছুটলুম। ঘরে কেউ

দুকে দিলে না...প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘরের বাহিরে ঘরের সামনে আকুল মন নিয়ে আমি ছটফট করে বেড়ালুম...লোকজনের বাতায়তেব বিবাম নেই। ক্রমে আমি পাথর বনে গেলুম! রাত তখন দশটা...মনে আছে, ঘবে ঢুকলুম। মাব কোলে বাবাব মাথা—বাবা শুয়ে আছেন—দুই চোখে ঝর-ঝর জল-ধারা...মাব চোখেও তাই! আমি গিয়ে পালঙ্কের পাশে দাঁড়ালুম। ভারী গলায় মা বললেন,—খেয়ে নাও গে বাবা...অনেক রাত হয়েছে...

আমি বললুম,—বাবার অস্থখ করেছে মা?

মা বলিলেন,—করেছিল। এখন ভালো আছেন। তুমি যাও...

আমি চলে এলুম...খেতে গেলুম না। আহা! কত ছিল না। পালঙ্কের ঘরে মেঝেয় শুয়ে পড়লুম...

ক্রমে অল্পে অল্পে জানলুম, বাবাব কলকাতায় যে কারবার ছিল, সে কারবার আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা দেখা-শুনা করতেন। তিনি ছিলেন ম্যানেজার। নানাভাবে বাবাব বিখ্যাসের তলায় তলায় তাঁকে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় রেখে বহু টাকা আত্মসাৎ করে কারবারে তিনি প্রচুর দেনা দোখিয়েচেন। কারবার বিক্রী হয়ে গেছে। এত-বড় বিপদের কথা বাবা কাকেও জানান নি। নারবে সে বেদনা চেপে রেখে বক্ষার উপায় নিদ্ধারণ করছিলেন। সকলেব সঙ্গে হাসি-গল্প, সামাজিকতা, শিষ্টাচার কোথাও ব্যাঘাত ঘটাননি এক কণা। সংসারের সবার দাবী সমানে রক্ষা করে এসেচেন। তবু পাবলেন না, এত-বড় বিপদ কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে! কারবার বেচে নিঃসহায় ফিরে এসেচেন। ব্যাবার ভারে নিজেকে আর সম্বরণ করতে পারেন নি!

সহ্য করতে পারলেন না। এক হপ্তার মধ্যেই এত বড় আঘাতে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন স্বর্গে...যেখানকার পথ আমরা চিনি ন—যেখানে গেলে মানুষ এই মাটির পৃথিবীর পানে ফিরে তাকাতে ভুলে যায়!

এক দিনে আমরা পথে বসলুম। তারপর আবো মনে আছে দাছ, মামাব বাড়ী মাঘেব সঙ্গে ভিখারীর মত বাস। যেদিন অবস্থা ভালো ছিল, সেদিন যে মামার বাড়ীতে হাঁটতে ফিরতে সবাই বৃক পেতে দাঁড়াতো, সে মামার বাড়ীতে এ হুঁদিনে সবার বৃক দেখি পাথরে ঢাকা! সে হাসি, সে স্নেহ-সৌন্দর্যের চিহ্ন যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

তারপর কোনোমতে দিনগুলো গড়িয়ে চললো। কত নূতন লোক নব নব স্মৃতি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো, সামনে থেকে সবে গেল। মনে কোনো বোকা পড়লো না। মন তখন পাথর বনে গেছে!

তারপর এলেন তোমাদের এই দিদিমা। তাঁর হাতে আমার চার্জ বুঝিয়ে মা নিলেন ছুটি। মাকেও হারালুম। আমার দুঃখিনী মায়ের দুঃখের অবসান হলো। তিনি স্বর্গে গেলেন! কাঁদছিলুম। মা বললেন,—কৈরো না! তিনি অনেক দিন চলে গেছেন...তোমাকে মানুষ করে তুলেছি বাবা! এবার তাঁর কাছে যাও...

আমার সেই ককণাময়ী স্নেহময়ী মা—সর্বশেষ বক্তিত হয়ে কি দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন! মায়ের বিদায়-ফণের এই হাসি দেখে তা আমি স্পষ্ট বুঝেছিলুম যে দাঃ! মায়ের মুখে ঈদানীং হাসি দেখিনি। আমার বাড়ী আশ্রিতা—বাক্য-যাতনা সইতে হতো...নির্যাক অবিরল সে যাতনা সয়েচেন—তাও দেখে'চি ভাই...এই চোখে...! ভূমি—আছে, আমার আছে তা মনে আছে।

তখন যৌবনের আবেগ। মনকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুললুম। যা গেছে, তার পানে তাকিয়ে বসে নিখাস ফেললে চলবে না। সংসার তো চলার পথ... চলতে হবে। না চললে কেউ হাত ধবে ঠেলবে না, বলবে না—ওঠো, চলো। সকলে চলে যাবে তোমাকে ডি'স্ময়ে মাড়িয়ে নিজের নিজের ঠিকানায়...

আমিও চলতে লাগলুম। তোমাদের দিদিমা ধরলেন আমার হাত...

দাহুর কণ্ঠ বাস্পরুদ্ধ হইল। তিনি একটা নিখাস ফেলিয়া সামনে ঐ আঁধার-ভবা ঝোপের পানে তাকাইয়া রহিলেন...

মন্টু কহিল—কোথায় চলতে লাগলে দাঃ? কোন দিকে?

দাঃ কহিলেন,—দিকের কোনো নিশানা ছিল না, ভাই। ভিড়ের সঙ্গে ভিড়ের চাপে তাদের দলে মিশে চলতে লাগলুম...আমি আর তোমার দিদিমা। তারপর এলো তোমার মা। পথে কি আরাম সে বয়ে নিয়ে এলো! আঃ, আজো মনে আছে তাৎ সেই হাসি কথা...

তাকে পেয়ে দুঃখ-যাতনা সব ভুলে গেলুম। মনে হলো, এতদিনকার হারানো যত-কিছু সুখ আবার কিরিয়ে পেয়েছি...!

দাঃ নিখাস ফেলিলেন, ফেলিয়া বলিলেন,—কিন্তু সেও রইলো না! কিছু রইলো না...সব চলে গেল।

বাবার কারবারে জ্ঞাতি কাকা পাহাড়-প্রমাণ যে দেনা চাপিয়েছিলেন, সে পাহাড় সরাতে সারা জীবন লড়াই করে চলেছি বে...সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকাবার খেয়ালও হয় নি! তাদের মা...তাকে দেখেই শুধু আশা আর শক্তি মিলেচে। না হলে এমন দিন এসেচে—যে,

তোমাদের দিদিমার কোলে মাথা বেখে বসেছি, আর পারি না—এসো, ছুঁনে নদীর জলে ডুব দিই গিয়ে...

তোমাদের দিদিমা বললেন,—না, বাণু...

সেই বাণুর পানে তাকিয়ে আবাব পরক্ষণে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছি—সব যাতনা সব শান্তি ভুলে।

সে দেনার পাহাড় সবাত্রে আব কোনো দিকে তাকাতো পারিনি। সে ঔনাত্ত-অবহেলায় এত বড় বাড়ীটা যেন মস্ত অভিমানে-বেদনায় তার দেওয়াল, ঘর নিখাসে নিখাসে স্বপ্নের খণ্ডে নিজেস্ব দীন ভিখারীর ককণ বেগে সাজিয়ে তুলতে লাগলো। ঠাকুর-দালান গেল পড়ে; ওদিককাব অমন যে চক-মিলানো ঠেংঠী-মহল, তাও গেল ধ্বংসে। অমন উঠান—যেখানে ষাড়া হয়েচে, নাচ হয়েচে, গাঁয়ের স্লোক মনের আনন্দে পাত পেড়ে বসে খেয়েচে—সে এখন মুছে গেছে—সেখানে উঠেচে অল্প আগাছার জঙ্গল! নিঃশব্দে তাও দেখেছি দিদি...কিছু করতে পারিনি। বাবাব স্বপ্ন...সেই স্বপ্ন শোধ করা'ই ছিল সারা জীবনের লক্ষ্য। তার মধ্যে সংসারের ছোটখাট দাবী—যা না মেটাতে নষ্ট, মিটিয়ে'চি!

তারপর খুঁজেপেতে কোন্‌ বন গিবি থেকে নিয়ে এলুম চাপার বরণ বাজপুত্র...আমাদের বাণুর বর, তোমাদের বাবাকে! আশার আলোর প্রাণ বওন হয়ে উঠলো... তারপর এলে তোমরা দুটি অপ্সর-অপ্সরী! তোমাদের দিদিমা বললেন,—সংসারে আমাদের দুঃখ কোন্‌খানে গা?

আমি নিখাস ফেললুম। কোনো জবাব দিতে পারলুম না...তোমার দিদিমা দেখেননি, জানেননি, এ সংসারে আমার শৈশব কি আরামে কেটেছিল...

সে সংসারে আমার প্রাণের কামনাব ধন বাণু-মা আমার—সেই বাণুমার ছেসেমেয়ে...তারা কি পেলে...! তাও যদি সব বেঁচে বর্ত্তে থাকতো! রইলো না...

তোমার বাবা...তার কি অভিমান হলো, আমাদের ছেড়ে চলে গেল। তোমাদের নিয়েও পাবলুম না দাঃ তাকে ধরে রাখতে। বাণু-মাও গেল চলে। আমাদের এত স্নেহ—তাতে তাৎ ক'টি ছিল না! একের বিহনে তাৎ সংসার অবণ্য হয়ে গিয়েছিল।

পারবে কেন? সে তো আমাদের মত পলে পলে নানা যাতনার আগুনে মনকে পুড়িয়ে লোহার যত শক্ত করে তুলতে পারিনি!...

এখন তোমরা দুটি ভাই-বোন...

এত দুঃখ, এত যাতনা সাধে ভুলে থাকি ভাই? সে সব দিনের কথা মনে এলে হ'তে সরিয়ে দিই! না, এখনি পাগল হয়ে যাবো...মরে যাবো। ভগবানকে কোনো দিন কোনো কামনা জানাইনি—এত দুঃখেও নয়। এখন জানাই। শুধু বলি, ঠাকুর, আমাদের দুই

বুড়ো-বুড়ীকে বাঁচিয়ে রাখো—ফেলে রাখো এই মাটির বৃকে, পৃথিবীতে ! তোমার সোনার ও স্বর্গে আমাদের কচি নাই ! সেখানে যেতে চাই না—আমরা চাই না...

দাহু'র দুই চোখে জল ঠেলিয়া আসিল—যাতনায় ভরা দুই চোখ—বৃকের অনেকখানি দুঃখ-দাচে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে। সে ছাট্টের মধ্যে কি করিয়া জল আসে, মনে মনে দাহু তাও ভাবেন। ভাবিয়া কোনো কুল-কিনারা পান না।

চোখের চশমা খুলিয়া কৌচ'র খুঁটে তিনি জল মুছিতেছিলেন।

মণ্টু কহিল—স্বর্গে তুমি যেতে চাও না, দাহু ?

দাহু কহিলেন,—না ভাই, চাই না।

—সেখানে তোমার মা আছেন,—আমার মা, বাবা...

কথাগুলো ছোট...কিন্তু এই ছোট কথাব আঘাত বৃকে বাজিল শক্তিশেলের মত ! দাহু কহিলেন, তাবা সেখানে ভালো আছে, তারা সেখানে থাকুক...! আমরা এখানে বেশ আছি ভাই...তোমাদের দুটি ভাই-বোনকে পেল সে-স্বর্গ আমরা চাই না !...

শচী কহিল—এত কথা তোমার মনে থাকে দাহু, আর আমাদের পুহল ?

শচীকে বৃকের কাছে টানিয়া দাহু কহিলেন—এই সব কথা'র ভিড়ে তোমার পুহলের কথা কোথায় যায় চাপা পড়ে দিদি...! আমি তো ভাবিনা এ-সব কথা...কিন্তু তবু এরা উৎপাত করতে ছাড়ে না !

মণ্টু ডাকিল—দাহু...

দাহু কহিলেন,—কেন দালা ?

মণ্টু কহিল,—মা-বাবাকে চাই না দাহু। আমরা স্বর্গে যাবো না। কিন্তু মা-বাবা যদি আমাদের ডাকে ?

দুই বাহুর ঘেঁষে দুজনকে ঘিরিয়া চাপিয়া দাহু কহিলেন—যেতে দেবো না আমি। খুব বকবো। কখনো বকিনি। তোমাদের ডাকলে কিন্তু ভারী বকবো। তাদের কাছে যেয়ো না ধন, যেয়ো না মাণিক। তারা এমন নিষ্ঠুর...নিজেদের যাতনা এত বড় করে দেখলো যে তোমাদের দুঃখের কথা ভাবলো না ! এমন নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল...

শচী কহিল,—তোমাকে আর দিদিমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না দাহু...

আবেগ-ভরা স্বরে দাহু কহিলেন,—না, যেয়ো না সোনা ! যেতে আমরা দেবো না। দুটো বুড়ো-বুড়ীতে কি নিয়ে থাকবো ?

মণ্টু কহিল—মা বাবা তো তোমাদের চেয়ে ভালো-বাসে না আমাদের...

দাহু কহিলেন—না, বাসে না তো ! আমি জানি...

শচী কহিল—মাকে বাবাকে আমরা চিনি না তো...

দাহু কহিলেন—আর কাকেও চেনবার তোমাদের দবকাব নেই দিদি...শুধু এই বুড়ো-বুড়ীকে চিনে রাখো ! তারাও আজ পৃথিবীর আর কাকেও চেনে না—চিনতে চায় না। চেনার পালা সাঙ্গ করে তোমাদের দুটিকে জড়িয়ে ধবে পড়ে আছে। বারে বারে দাগা পেয়েও তাদের মনের আশা আজো ফুরায় নি...এই মাটির বৃকে আজো এমন দুটি মণি তাদের বৃকে...

এত দুঃখ-যাতনা ব্যথা-বেদনার মধ্যে তোমরা আজো বৃক জুড়ে...পুখানো দিনের সঙ্গে স্মৃতির তারে হারানো তোমাদের গঁথে আমরা দুটিতে সে সব আবার প্রাণের উপরে পাই...। হাবায়নি, কিছুই হারায়নি...এ বৃকের সংসারে তোমরা একসঙ্গে সবাই আজো দাহু-সবাই ! আমার মা, আমার বাবা...রাণুমা, তোমরা। চাইবা মাত্র সকলকে বৃকের উপরে পাই। তাই বেঁচে আছি। হুয়ে ভেঙ্গে পড়ে মরিনি...মরিনি আজো।

# বিধাতার ইঙ্গিত

হু'বার ইন্টারমিডিয়েট ফেল কবিয়া নিকুঞ্জর মনে কেমন ধাবণা জন্মিল, এ বিধাতার ইঙ্গিত !

অর্থাৎ আর পাঁচজনের মত জীবনের সিধা বাঁধা পথ ধরিয়া ওকালতি ডাক্তারী বা চাকরি করা চলবে, সেকজ বাঙলার মাটিতে তার জন্ম হয় নাই। তার জীবন যজ্ঞ হইবে অজ্ঞ পথে।

এবং এই দারুণ বশবর্তী হইয়া সে লেখাপড়া ছাড়িয়া দিল; দিয়া স্নানাহার ও নিদ্রার সময় বাতীত বাকী সময়টায় এখানে ওখানে খেয়াল-মত্ত ঘুরিয়া বেড়াইত। কেহ তার উদ্দেশ্যগান পর্যটন সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিলে নিকুঞ্জ কখনো মুহু হাসিয়া, কখনো বা গম্ভীর স্বরে বলিত—মহুশ্য-চবিত্র অধ্যয়ন করিচ।

কিন্তু এমনভাবে ঘুরিতে—যত অসাধারণ হোক,—মাহুষের কতদিন ভালো লাগে? নিকুঞ্জও ভালো লাগিল না। সে তখন স্থাবিশূন্য বোডের মোড়ে এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তকারদের দোকানে ভড়ো-করা কেতাবপত্র ঘাঁটিয়া সময় কাটাইতে লাগিল। হু'বন্টা ধরিয়া বই ঘাঁটিয়া বাছিয়া কখনো চার আনা দামে পাঁচ-সাতখানা পুর্বানো ছেঁড়া পেনি-সংস্করণ পত্রিকা কিনিত; কখনো কিছু না কিনিয়া দোকান ছাড়িয়া সোজা পথে চলিয়া যাইত।

বন্ধুর দল বলিত,—পাগল! আত্মীয়েরা বলিত,—খেয়ালী! নিকুঞ্জ এ কথার কাণ দিত না; কারণ, মনে মনে জানিত, এ সব বিধাতার ইঙ্গিত!

এবং এ-ই ইঙ্গিতের অর্থ একদিন সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিল।

কখনো রহস্য-সিরিজ বিলাতী পত্রিকা পড়িয়া একদিন সে স্থির করিয়া বসিল, সখের গোয়েন্দা-গরি করিয়া দিন কাটাইয়া দিবে। ব্যবসা-হিসাবে এ কাজ করবে। এ ব্যবসা যখন বিলাতে চলে, তখন এদেশে কেন চলিবে না? হু'চারিজন বন্ধুর কাছে কথাটা প্রকাশ করিয়া বলিতে তারা বিষয়ে তার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিকুঞ্জ কহিল,—কাল রাখে শুতে যাবার সময় যেন প্রেরণা পেরেচি। বিধাতার ইঙ্গিত!

বন্ধু বলিল,—কিন্তু কাজের জন্ত তো গোয়েন্দা-পুলিশ রয়েছে।

নিকুঞ্জ কহিল,—তা আছে। তবে অনেক সময় এমন ঘটে—পারিবারিক উপসর্গে গোয়েন্দা পুলিশ দিয়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে গেলে আদালত পর্যন্ত দৌড়তে হয়।...

বন্ধু কহিল,—তার মানে?

নিকুঞ্জর মনে তখনো একটা সজ-পড়া বিলাতী কাহিনী জাগিয়া ছিল। সে বলিল—যথো, তোমার জ্যাকে কেউ হরণ করে নিয়ে গেছে। এ-'কেশে' গোয়েন্দা পুলিশ ডাকলে জ্যাকে পাওয়া যাবে, মানি; কিন্তু সেই সঙ্গে বাপার গডাবে আদালত পর্যন্ত। হয়তো জ্যাক নিবপরাধ, নিষ্কলঙ্ক—তবু লোক জানাজানির ফলে তাঁকে নিয়ে সমাজে বাস করা অসম্ভব হবে। এমন ক্ষেত্রে সখেব ডিটেক্টিভ দিয়ে জ্যাক সন্ধান করালে ব্যাপারটা গোপন থাকবে এবং নিষ্কলঙ্ক জ্যাক পক্ষে ঘরে ফেরা মোটে কঠিন হবে না। এমন আরো অনেক ঘটনা সমাজে ঘটতে।

বন্ধু বলিল,—তাহলে আইন-কানুনগুলো পড়া দরকার।

নিকুঞ্জ কহিল,—পড়ে নেবো। বাঙলা একখানা ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি বই কিনেচি। এক তকারের দোকানে পেলুম—দাম পাঁচ আনা। চাই একখানা ফৌজদারী Procedure Code. বাঙলা খুঁজে দেখবো—পাই ভালো, নাহলে ইংরিজ কিনতে হবে। কোনো উকিল-মোক্তারের কাছে বুঝে নেবো, যেখানটা বুঝতে পারবো না।

বন্ধু কহিল,—মোদ্দা হু'নিয়াব! আইন-পুলিশ নিয়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছে! ভুল হল মারা যাবে। হয়তো জীবন-বাস। শুনেছ একটা ধারা আছে Personating Police-officer—না, এমন কি!

হাসিয়া নিকুঞ্জ কহিল,—আইনের অন্ত্রে সজ্জিত হয়ে ব্যবসা করবো বন্ধু! বুঝচো না, এ বিধাতার ইঙ্গিত!

কর্ণওয়াল'ল স্ট্রীটের উপর 'চিত্রার' পাশে একখানা মস্ত তিন-তলা বাড়ার নীচেকার একটা ঘর ভাড়া করিয়া তার সামনে সাইনবোর্ড টাঙ্গাইয়া নিকুঞ্জ ব্যবসা খুলিল। বোর্ডে লেখা রহিল,—

নিকুঞ্জ দত্ত

প্রাইভেট ডিটেক্টিভ

অফিসে আসিত সকালে সাতটায়; বেলা এগাবোটা পর্যন্ত বসিত। তারপর গৃহে ফিরিয়া স্নানাহার সারিত। সারিয়া আবার অফিসে আসিত বেলা দুটায়; আসিয়া রাত্রি দশটা পর্যন্ত থাকিত।

খরিকার আসিত না; আসিত পুর্বানো বন্ধুর দল।

চা-পাণ-সিগারেট মিলিত; তাছাড়া এমন জায়গায় আসর। গল্প চলিত—সোনালি স্বপ্নে রচা কত সে গল্প।

নিকুঞ্জ বাশীকৃত খপরের কাগজ সংগ্রহ করিয়াছে; সে-গুলি পড়িত—সংবাদের কলম। কোথাও যদি তেমন কিছু ঘটনা থাকে! উইল জাল বা মানুষ গায়েব; দামী গহনা-পত্র সরানো বা তহবিল তছরূপ—স্ত্রী-চুরি—পুলিশ যে সেবের কুল-কিনারা পাইতেছে না! তাহা হইলে সে একবার চেষ্টা করিয়া দেখে। বিলাতী গল্প পড়িয়া যে কৌশল মাথায় খেলিতেছে—ওঃ! শুধু একটু স্বেযোগ!

কিন্তু খপরের কাগজগুলি যেন কি। এমন একটা ভয়ঙ্কর খপর আজ পর্যন্ত ছাপিল না, যাহার আগাগোড়া রহস্যাক্ত। তাদের কি দেশ? বুদ্ধিমান ফন্দিবাজেব দল কি আর আছে! যারা ছিল, তাদের কতক ফাঁসি-কাঠে ঝুলিয়া প্রাণ দিয়াছে; বাকী গিয়াছে স্বীপান্তরে! এখনকার খুনীর দল পথে ঘাটে খুন করিয়া বেড়ায়। খুন করিবামাত্র অস্ত্র-সমেত ধবা পড়ে। লোকে আশ্চর্যতা করে,—তাও চিঠি মিথিয়া তাব হেতু নির্দেশ করিয়া যায়। নাবী-হরণ এমন প্রকাজভাবে ঘটতেছে যে হাতাহাতীত বামাল সমেত ধবা পড়ে।

তবে কি আশার ছলে ভুলিয়া সে নিরাশা সার করিল।

একথানা বাঙলা কাগজ খুলিয়া সেদিন মফঃ-স্বলের পত্র-কলমে বর্জ্জেশ অক্ষরে ছাপা খববে নিকুঞ্জব চোখ পড়িল।

বারোয়ারী পুস্তা হইয়া গিয়াছে, স্বনামধন্য নাট্যকার গোবর্দ্ধন সাঁতারার অভ্যর্থনা ইত্যাদি জবাব খবর দিবাব পর তেলেনা গ্রামের নিজস্ব সংবাদদাতা লিখিয়াছে, বারোয়ারী তলাব পশ্চিমে যে-জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ধারে পুরানো বাইসিক্ল লক্ষ্য করিয়া গ্রামের লোক গিয়া দেখে, একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে—পগায়ে মুখ গুঁজিয়া; মুখের খানিকটা খোব্লানো! পশুতে খাইয়াছে কিংবা হত্যাকারী অস্ত্র হানিয়াছে, বুঝা যায় নাই। পুলিশ এ সংবাদে অকুস্থলে আসে; এবং লাশ আনা হইলে বুঝা গেল, ব্যোমপাড়া গ্রামের গাঙ্গুলী-বাড়ীর ছেলে শিবচরণ—যাত্রা থিয়েটার করিয়া বেড়াইত; তাহার লাশ। কেহ খুন করিল, না, বাইসিক্ল হইতে পড়িয়া মারা গেল, তাহা নির্ণয় হয় নাই। বাইসিক্লখানি ভাঙ্গা দেখিয়া পুলিশ অমুমান করিয়াছে, লোকটি পড়িয়া মারা গিয়াছে! তারপর পশুতে খুব্লাইয়া খাইয়াছে ইত্যাদি।

হু'বার তিনবার বহুবার নিকুঞ্জ এ সংবাদটি পাঠ করিল; পাঠান্তে নিশ্বাস ফেলিল; তারপর শ্রামবাজার পাঠি অফিসে গিয়া তেলেনা গ্রামের হদিশ লইল। তার

পরে সে গেস বেলোয়ে বুকিং অফিসে এবং সেখান হইতে বহু সাধ্য-সাধনায় জ্ঞানিল, তেলেনা গ্রামে ঘাইতে হইলে বাবাসত লাইনের ট্রেনে চাপিয়া গোবরডাঙ্গা স্টেশনে নামিতে হয়। তারপর সেখান হইতে...

কোথায় কোন পথে ঘাইবে,—বেলেব কর্ণচাবীরা সে সংবাদ জানেন না। অর্থাৎ নিকুঞ্জকে গোবরডাঙ্গা স্টেশনে নামিয়া তেলেনার ভূগোল নির্ণয় করিতে হইবে।

অফিসে বসিয়া সে টাইম-টেবলের বহিঃগুলি বার-বার পড়িল; তারপর একথানা বাঙলা ভূগোলের পাতা উল্টাইল। কোথায় তেলেনা গ্রাম, সন্ধান মিলিল না। ভাবিল, এমন করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের ভূগোল শিখাইতেছে! তেলেনা গ্রাম কোথায়, বাঙালীর ছেলে তাহা জ্ঞানিবে না! অথচ জিজ্ঞাসা করে', লিসবন্ কোথায়? ছেলেরা বলিয়া দিবে—পোর্টুগালে!

সে যে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে নাই—ইহাতে সে আনন্দ বোধ কারিল।

চিন্তা করিল। 'চিহ্নাব' অমর মল্লিকের খোসামোদ করিয়া খানিকটা আঠা ও ক্রেপেব দাড়ি-পৌফ সংগ্রহ করিল। এবং পবের দিন সকালে স্নানাতার সাধিয়া শেষালদহ স্টেশনে গিয়া বাবাসত লাইনের ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে লইল একটা স্ট্রকেশ ও বিছানার ছোট লগেজ; হাতে বহিল একগাছি মোটা লাঠি।

বন্ধুকের লাইসেন্স নাই—কাজেই অস্ত্র বলিতে এই সনাতন লাঠি।

গোবরডাঙ্গা স্টেশনে তেলেনা গ্রামের হদিশ মিলিল। এবং নিকুঞ্জ তেলেনায় আসিয়া পৌঁছিল।

কি করিবা? সে কথা—আমি গল্প বলিতেছি, আমার বলিবাব কথা নয়। যদি ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতাম—লিখিবা জানাইতাম। সে কাহিনী লিখিবাব মত।

তেলেনার সাগর মুদি লোকটি ভালো। বৈফব; আতিথ্য-বর্ষ আভো মানে। নিকুঞ্জ তার গৃহে স্থান সংগ্রহ করিল। পরিচয় দিল, সরকারী কাজে আসিয়াছে। কাজটা গোপনীয়; চাকটোল পিটিয়া জানাইলে বিগ-ডাইয়া যাইবে।

সাগরের কোড়ুহল সীমাহীন হইয়া উঠিল।

সকালে নিকুঞ্জর ঘুম ভাঙ্গিল। সাগর গিয়াছে গস্তে। তার বৈফবী আসিয়া একটু ঘোমটা টানিয়া তরুণ অতিথিকে প্রসন্ন করিল—বাবু চা খাবেন?

নিকুঞ্জ কহিল,—পেলে ভালো হয়।

বৈফবী চা তৈয়ার করিয়া আনিল। পাখর বাটীতে করিয়া আনিল না, আনিল পেয়ালার ভরিয়া।

নিকুঞ্জ কহিল—বাঃ! তোমরা তাহলে চা খাও?

বৈষ্ণবী মুখের ঘোমটা একটু সরাইল, কহিল—আমি কলকাতার মেয়ে...

নিকুঞ্জ কহিল,—বটে! বেশ! তা জাখো সাগর-বৌ...

সাগর-বৌ চাহিল, কহিল,—পাণ দেবো?

নিকুঞ্জ দেখিল, সাগর-বৌ একটু গায়ে পড়া। জাতে বৈষ্ণবী বলিয়া হয়তো মায়া-মনতা এত বেশী! সে কহিল,—না।

সাগর-বৌ কহিল,—কলকাতা নাকি বদলে গেছে? এখন আর চেনা যায় না?

নিকুঞ্জ কহিল,—তাই। কদিন তুমি কলকাতায় যাওনি?

সাগর-বৌ কহিল—প্রায় দশ বছর। ঠিনি গেছলেন কলকাতায় গন্ত করত। ববাত্তে কেমন ছিল। হাঁর সঙ্গে চলে এলুম! আর ফিবে যাইনি। উনিও সেই অবধি যান না। কি জানি, যদি আমার স্বোয়ামী নালিশ-মকদ্দমা করে থাকে!

নিকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিল। ঠঃ! পরকীয়া প্রেম! এ কোথায় আসিয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এদিকে মন দিলে চলিবে না। যে কাজে আসিয়াছে! নিকুঞ্জ বলিল,—আজ্ঞা সাগর-বৌ, বলতে পাবো—গপবের কাগজে পড়েছিলুম, বারোয়ারি-তলাব ওদিকে কে একজন শিব গাঙ্গুলি খুন হয়েছিল...সে জায়গা কোথায়?

সাগর-বৌ কহিল—ও! গাঁ ছাড়িয়ে হাটতলা। সেই হাট-তলাব ওবাগে বাবোয়ারিতলা। সেইখানে।

—অনেক দূর?

—না। খুব বেশী দূর নয়। পুলিশ বললে, খুন নয়। কিন্তু আমি জানি, খুনই।

নিকুঞ্জ বোঝে, এই-সব স্থান হইতেই এ-ব্যাপারের সন্ধান মেলে।

তাই সে প্রশ্ন কহিল,—কিসে জানলে?

সাগর-বৌ কহিল—বয়স বেশী নয়। ছোকরা। দেখতেও খাশা! যাত্রা করতো। রাধিকা সেজে ছিল। দেখে কি চমৎকার! এখানে এলে থাকতো ঐ বিন্দে মিস্ত্রীর বাড়ীতে। বিন্দে লরি চালায়। তার বোটা দোজপন্থের বৌ—ভারি ফাজিল। দুজনে ভাব ছিল। এ-গুন ঐ বিন্দের কাজ। সন্দ করেছিল কেমন—তাই!

নিকুঞ্জ শিহরিয়া উঠিল। মেধ না চাহিতে জল! বাঃ! বিধাতার ইঙ্গিত!

নিকুঞ্জ তখন সাগর-বৌয়ের শরণ লইল, ডাকিল,—সাগর-বৌ—

বৌ বলিল,—কেন বাবু?

নিকুঞ্জ কহিল—আমায় সাহায্য করবে?

—কিসের বাবু? সাগর-বৌয়ের চোখ দুটা আঁশার আলোর বকমক করিয়া উঠিল।

নিকুঞ্জ লক্ষ্য করিল, বুঝিল, সাগর-বৌ শীকারী! সাগরবের কুলে আসিয়া এখনো শীকারের লোভ ছাড়ে নাই! কিন্তু সে ইহাতে ভুলিবে না। যে-কাজে আসিয়াছে। ডিটেক্টিভের কাজে ওশমানের মত ফন্দী, লীলাকৌশল চাই। সে কহিল—আমি এসেছি সেই খুনেব তদারক করতে। তুমি আমার সাহায্য করো—কাকেও এ কথা বলো না। সাগরকেও নয়।

মুহু হাসিয়া সাগর-বৌ কহিল,—বেশ। তবে আপনি টেক্স বনাবার ভঞ্জে আসো নি?

নিকুঞ্জ কহিল,—না।...

আহারাদি সারিয়া সাগর-বৌয়ের নির্দিষ্ট পথ ধরিয়া নিকুঞ্জ যাত্রা করিল—বারোয়ারি-তলার দিকে।

হাটতলায় হাট বসে নাই। আজ হাটের দিন নয়; তথাপি বেশ একটু ভিড় জমিয়াছে। তাকে দেখিয়া ভিড় ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল।

নিকুঞ্জ হাটতলা পার হইয়া অগ্রসর হইল। হাটতলার পর গ্রামের পাঠশালা। ছেলেরা স্তর করিয়া কোরাশে নামতা আওড়াইতেছে!

হৃদিকে দুটা পথ গিয়াছে। নিকুঞ্জ প্রশ্ন করিল,—বারোয়ারি-তলায় বাবো কোন্ দিকে?

গুরু ও শিষ্যদল নিমেষের জগা স্তম্ভিত। গুরু কহিলেন—সিধে পথ। সামনে।

নিকুঞ্জ চলিল। পাঠশালায় নামতা-গান বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ সাতটি ছেলে পথে বাহির হইল; নিকুঞ্জর সামনে আসিয়া কহিল,—সেখানে যাত্রার রাধিকা মারা গিয়েছিল—সেখানে বাবে বুঝি?

নিকুঞ্জ কোনো কথা কহিল না; অগ্রসর হইয়া চলিল। ছেলের দল সঙ্গ ছাড়িল না। নিকুঞ্জ বুঝিল, ইহারা সঙ্গে গেলে চলিবে না। সব ফাঁশ হইয়া যাইবে। খুনী সরিবে! সাগর-বৌ বলিয়াছে, বিন্দে মিস্ত্রী! অমন একটা রোমান্স রচিয়াছে—এ খুন বিন্দে করিয়াছে! সে অনেক গল্প পড়িয়াছে, বরাবর দেখিয়াছে—খুনের অন্তরালে আছে নারীর ভালোবাসা! জেলশি! শুণ্ড-নিশুস্ত, রাবণ, হেলেন অফ ট্রয়, মিসেস ডিক্‌জ, সনাতন লাহিড়ী...সর্বত্র!

জগতের নিয়ম!

ছেলেদের পানে চাহিয়া সে লাঠি তুলিল—ছড়ার ছাড়িল। ছেলেরা ছুটিয়া পলাইল।

বারোয়ারি-তলা মিলিল। একটা চাষা চলিয়াছিল বলদ তাড়াইয়া। তাকে প্রশ্ন করিতে জায়গা মিলিল—সেখানে সেই খুন। সেখানে আসিয়া দেখে, কি ঘন জঙ্গল! কাঁটাওয়ালা মনসার ঝোপ...পগার, খানা। মশা ভনভন করিতেছে।



নিকুঞ্জ দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিল। দেখে, ছেলেগুলো আসিয়া জুটিয়াছে। একজন আগাইয়া আসিল, কহিল,—শিবু গাঙ্গুলী কোথায় মরেছিল, দেখবেন? ঐ...ঐখানে।

অঙ্গুলি-নির্দেশে দেখাইয়া দিল।

নিকুঞ্জ কহিল—সে গাড়ী কোথায়?

ছেলেটা জবাব দিল,—সেই দু-চাকাব গাড়ী?

—হ্যাঁ।

—পুলিশ নিয়ে গেছে।

—হঁ।

নিকুঞ্জকে ফিরিতে হইল। এ ভিড়ে গোয়েন্দার তদারক চলেনা। সাগরের দোকানে সে ফিবিল—সন্ধ্যার একটু আগে।

সাগর কহিল—ফিবে বোয়েব কাছে শুনলুম, বেরিয়েচেন। ভাবলুম, যদি পথ হাবিয়ে ফেলেন!

হাসিয়া নিকুঞ্জ কহিল,—না।

দোকানে ভিড় ভরিয়াছে। নিকুঞ্জকে দেখিয়া এক জন বলিল,—যে টেন্ড-খাওয়া দিচ্ছি, তার জ্বালায় প্রাণ বেবিয়ে গেল! আবার কি নতুন খাওয়া হবে বাবু?

আর একজন বলিল—তা নয়—তা নয়। বন কাটানো, পুকুর বৃজ্ঞানোর হাজিমা হবে।...না বাবু?

নিকুঞ্জ এবার! সে কহিল—কাকেও এখন কিছু বলতে পারবো না। তবে তোমাদের ভয় নেই। সর-কারের যে-কাজে আমি এসেছি, তাতে তোমাদের ভয় পাবার কোনো কারণ নেই।

দোকান ও অন্দরের মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজায় করাঘাত হইল। সাগর উঠিয়া অন্দরে গেল; ফিবিয়া আসিয়া নিকুঞ্জর পানে চাহিয়া বলিল—যান ঠাকুর, ভিতবে যান।

নিকুঞ্জ বাঁচিল। ভিতর-বাড়ীতে আসিতে সাগর-বোয়েব সঙ্গে দেখা। মোড়া পাতিয়া বো হাঙ্গিল, বলিল,—বসো বাবু। জলখাবার আনি। মুখ-হাত ধুতে হয়, ধোও—দাওয়ায় জল রেখেছি।

মুখ হাত ধুইয়া নিকুঞ্জ মোড়ায় বসিল। বো বেকা-বিত্তে করিয়া মিষ্টান্ন আনিয়া দিল। সাগর-বো কহিল,—সন্ধান মিললো?

নিকুঞ্জ কহিল,—না। যে ভিড় জমে উঠলো!

বো বলিল—খুব ভোরে যেযো। তখন লোক থাকে না। তা ছাড়া ওর আর তত্ত্ব নেবে কি? ঐ বিন্দেকে ধরে চালান দাও। সব কথা সে স্বীকার করবে।

নিকুঞ্জ কহিল—বিন্দের বোয়ের কথা গাঁয়ের লোক পুলিশকে বলেছিল?

বো কহিল,—কে বলবে! হঁঃ! এত বড় বৃকের পাটা গাঁয়ে অড়ে কার?

নিকুঞ্জ কহিল—তুমি কি করে জানলে?

বো চোখ ঘুটাইয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমার চোখে ধূলো দেওয়া সহজ নয় বাবু। আমি এখানে এসে আড়ট বাট্টম হয়েছি। ঐ যে যাত্রা হয়েছিল—সে ছোঁড়া সেজেছিল রাধিকা। বিন্দেব বোয়ের মুখে কি সুখোৎ রাধিকা? তাকে ভাল খাওয়ানো—তার জঙ্গে ভালো করে পান সেজে পাঠানো। মেয়ে-মহলে কারো জানতে বাকী বইলো না। তার পর বিন্দে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে যেতো—আর ঐ রাধিকা এসে বোয়েব সঙ্গে বসে তাস পিটতো। কত লোক দেখেচে। ফিশির ফিশির কত কথা!

নিকুঞ্জ চুপ করিয়া রহিল। এ ঘটনাগুলো...? এগুলো সব সঙ্গে একটু সূত্র দিয়া বিন্দেকে জুটিতে পারিলেই বাস... এত বড় রত্নশ্রম খুনের কিনাবা হইয়া যায়!

সাগর-বো পবের দিন ভোবে ডাকিয়া দিল; চা তৈয়ার করিয়া খাওয়াইল। নিকুঞ্জ চা খাইয়া বাহির হইয়া গেল।

ভোবেব সোনালি আলো মাথিয়া গ্রাম যেন হাসিয়া সাবা! দু-একটা পাখী গান ধরিয়াছে। জানা পথ। নিকুঞ্জ আসিয়া অকুস্থলে পৌঁছিল।

পগার। চাঁদকে চাতিয়া নিকুঞ্জ লাফাইয়া পগারে নামিল। কাঁটায়, বোঁচায় জখম হইয়া গেল। তাহা হইলে কি হয়? যে কাছে আসিয়াছে...

গাছপালা ঠাণ্ডাইয়া, ঝোপ-কাঁটা ঠেলিয়া নিকুঞ্জ পাইল একখানা ভাঙ্গা বঁটা, আর ফাটা একটা টায়া। তাহা লইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা পবে গলদঘর্ষ হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তার গা ছড়িয়া গিয়াছে। জামা ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সে বা মূর্তি!

উপরে দাঁড়াইয়া ছিল কালিকার সেই পাঠশালার ছেলেগুলো! যেন বিরাট অন্ধো'হণী!

একটা ছেলে বলিল,—ওগুলো ওর মধ্যে পেলেন?

নিকুঞ্জ কহিল,—এ বঁটা কাব জানো?

ছেলেটি বলিল—ও তো বিন্দে মিস্ত্রীব খড়-কাটা বঁটা।

ঠিক।

জয়-গর্বে নিকুঞ্জ বলিল,—খানা কোন্‌দিকে?

—আমুন। ছেলেটি আগে আগে চলিল; পিছনে নিকুঞ্জ।...

তেলেনার থানা বেশ উঁচু আটচালা। সামনে বেড়া-দেওয়া বাগান। বাগানে রাশীকৃত দোপাটি ফুটিয়াছে...

নিকুঞ্জ আসিয়া কহিল,—ইন্স্পেক্টর বাবু কোথায় ?  
খাকী কোট-প্যান্ট-পরা একটি বাবু বসিয়াছিলেন।  
তিনি কহিলেন,—আমি ইন্স্পেক্টর। বলুন, কি দরকার ?

নিকুঞ্জ কহিল,—আমি এসেছি সবকারী কাজে।  
চৌকিদার চাই। খুনী আসামী গ্রেফতার করবার জন্য।  
খুনী আসামী! ইন্স্পেক্টর বাবুর দুই চোখ বিফারিত  
হইল। নিকুঞ্জ কহিল,—যাত্রায় রাধিকা সেজে'ছিল,  
শিবু গাঙ্গুল। সে খুন হয়েছিল। সে খুনের তদারকে  
এসেছি। আসামী পেয়েছি—তাকে গ্রেফতার করতে  
হবে।

ইন্স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কোথেকে আসছেন  
আপনি ?

—কলকাতা।

—লালবাজারেব সি আই ডি থেকে ?

—না। শ্রামবাজারে আমার বাড়ী। আমি  
প্রাইভেট ডিটেক্টিভ।

ইন্স্পেক্টর তাক্সলের হাসি হাসিয়া তাঁর ডায়েরি-  
খাতার দিকে চাহিলেন।

নিকুঞ্জ ক'হল,—শুনবেন না আমাব কথা ?

জু কুঁকিত কণিয়া ইন্স্পেক্টর কহিলেন,—প্রমাণ ?

নিকুঞ্জ কহিল,—বঁটা দেখলুম, টায়ার দেখলুম।  
নিষে এসে'চ।

ইন্স্পেক্টর কহিলেন,—কাব বঁটা ?

—বিনোদ।

ইন্স্পেক্টর কহিলেন,—না। কাল ছেলেগুলো এ-বঁটা  
নিষে পগারে জঙ্গল কাটছিল। আমার চৌকিদার  
গিয়ে তাড়াদিতে বঁটা ফেলে পালায়। একজনকে ধরে  
এনে জিজ্ঞাসা করি—কি করাছিল ওখানে ? তাতে  
জবাব দেয়, কলকাতা থেকে একজন বাবু এসেচে—  
ওখানে যেতে চায় কিসেব খোঁজ করতে ; তাই জঙ্গল  
কাটছিলুম। আর ঐ টায়ার ? ও টায়ার আমরা বিনোদ  
কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলুম। কাঁটায় নেমে লাশ তুলতে  
পারিনি বলে ঐ টায়ার দিয়ে কাষদা করে লাশ তুলি।  
মড়ার ছোঁওয়া বলে বিনোদ ওটা কিরিয়ে নেয় নি।

ইন্স্পেক্টর উচ্চ হাস্য করিলেন ; কহিলেন—শিবু  
খুন হয় নি। বাইসিক্লে চেপে যা'চ্ছিল। খানা ছিল।

তাড়ি খেয়ে নেশাও করেছিল। নেশার ঝোঁকে পড়ে  
যায়। সে সব প্রমাণ পাওয়া গেছে পোষ্ট-মর্টেমে...

নিকুঞ্জ নিখাস ফেলিল ; ফেলিয়া পথে আসিল। পথে  
আসিতে ছেলের দল হো-হো হাস্তে যে-রব তুলিল,  
নিকুঞ্জর মনে হইল, সে-রবে আকাশের বিধাতা বৃষ্টি  
প্রদর্শন করিয়াছেন ! তাঁব ইঙ্গিত আব মিলিবে না !

হাটতলা পার হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়াছে,  
একটা জুয়ান লোক আসিয়া চোখ বাঙাইয়া পথ রোধ  
করিয়া দাঁড়াইল। তার পানে চাহিতে নিকুঞ্জর বুকখানা  
থড়াসু করিয়া উঠিল। সে কহিল,—আমার নামে খুনের  
অপবাদ দেখ আমার গাঁয়ে এসে !

নিকুঞ্জ ভীত কাম্পিত স্বরে কহিল—ত-ত-তুমি ?

সে কহিল,—আমার নাম বিনোদ। তুমি বলেচো,  
আমি খুন করেছি শিবুকে ? আমার বৌ ছিল তার সঙ্গে  
নষ্ট ? পাখী বদমায়েশ্-কোথাকাব !

কথার সঙ্গে সঙ্গে কিল চড় ঘৃষি ! নিকুঞ্জ বিপর্যস্ত  
হইয়া পড়িল। একে দু'ঘণ্টা ঐ পগারের কাঁটায়  
দেহ ক্ষতাবক্ষত হইয়াছে ! তার পর টায়ার স্বাড়ে  
কবিয়া খানা পর্য্যন্ত হাঁটিয়াছে ! সে সবেব উপর  
এখন...

পৃথিবী যেন টলমল করিতেছিল ! বিনোদ হুঙ্কার  
দিল,—ভাগ্যে শিবু আমার পরিবারের ভাই হয়। না  
হলে আমার পরিবারের নামে এ-কলঙ্কে আমি গাঁয়ে  
থাকতে পারতুম ! ভদ্রবসেজে বাদরামি করবাব আর  
জায়গা পাওনি ? মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো। হতভাগ্য,  
পাজী ! আমি কবেচি আমাব নিষের সন্ধ্যাকে খুন !  
ছুঁচো কোথাকাবেব...

নিকুঞ্জকে বিনোদ প্রায় আধ-মরা করিয়া ছাড়িয়া  
দিল। নিজেকে সন্ধ্যুত করিয়া নিকুঞ্জ চাহিয়া দেখে,  
চারি দিকে মস্ত ভিড় জমিয়াছে !

একজন বলিল—সোঁচা চলে যাও গোবরডাঙ্গা ইষ্টি-  
শান। জোর পায়ে গেলে দু'ঘণ্টায় পৌঁছুতে পারবে।  
গিয়ে রেল চড়ে। ও-মুখ নিয়ে সাগরের ওখানে আব  
ফিরো না।

# প্রজাপতির রঙ্গ

ভূজঙ্গ গিয়াছিল পূর্ণ থিয়েটারে—অল্‌কোয়ারেট্‌ ছবি দেখিতে।

শো শেষ হইলে পথে আসিয়া বাসে চড়িবে, পিছনে কে ডাকিল,—ভূজঙ্গ না কি!

ফিরিয়া ভূজঙ্গ দেখে, কার্তিক।

ফিটফাট বেশ; বাস্‌ হইতে কার্তিক সত্ত্ব না মিয়াছে!

ভূজঙ্গ কহিল,—কোথায় আছো? কি করচো?

কার্তিক কহিল—সে মস্ত কাহিনী। এসো না সঙ্গে... বেশী দূরে নয়। হরিশ পার্কে।

ভূজঙ্গ কহিল,—চলো...

বহুদিন পরে দেখা। দুজনে একসঙ্গে সেণ্ট জেভিয়ার্স' বি-এ পড়িত; ফেল হয়। চার বৎসরের কথা। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি।

হরিশ পার্কে আসিয়া একটা বেঞ্চে দুজনে বসিল। কার্তিক কহিল,—কি করচো?

ভূজঙ্গ কহিল—আপাততঃ ছুটো টুইশনি।

—কোথায় আছো?

ভূজঙ্গ কহিল—বাবাভায়ে এক মেখে। তুমি?

কার্তিক একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল—জানো তো, লেখার সম্বন্ধ আছে। গল্প লিখি।

ভূজঙ্গ কহিল,—তাতে এত পরস্যা উপার্জন করে! পোষাক বেশ ফিটকাট্‌ দেখ'ছ...

কার্তিক কহিল,—হ্যাঁ। এর মধ্যে মস্ত কাহিনী আছে।

ভূজঙ্গ কহিল,—কি?

একটু হিংসা হইতেছিল। ফেল করা ইন্তক চাকরির বাজার টুঁড়িয়া বেড়াইয়াছে! আজ ইনসিওরেন্স অফিস, কাল ছাপাখানা, পরন্তু কর্পোরেশনে খাণ্ডড় খাটানোর কাজ—কোনটা টেকসই নয়। পরের চাকরিতে ঠেকা দিয়া সময় কাটানো! বিরক্ত হইয়া ছুটা টুইশনি লইয়া পড়িয়া আছে; চাকরির চেয়ার ঘোরা ছাড়িয়া দিয়াছে। সময়ে-সময়ে মন পাথরের মত ভারী হইয়া ওঠে!

ভবিষ্যতের কত আশা মনে গড়িত। ছোট সংসার—রূপসী স্ত্রী! গৃহের কোণ! হায়রে, সবই মরীচিকায় মিলাইতে চলিয়াছে!

কার্তিক কহিল,—গল্প লেখার শ্রোতে জীবন ভাসিয়ে চলে ছিলুম—আলাপ হলে! মন্দাকিনী দেবীর সঙ্গে। মাসিকে কবিতা লেখেন এই মন্দাকিনী দেবী। বিধবা।

হাতে বেশ পরস্যা আছে; মাথায় বুদ্ধি আবো বেশী! নিছের কোথাও কেউ আত্মীয় নেই। বকুলবাগানের ওদিকে দোতলা একখানি বাড়ী—ব্যাংক পাটার্ণের। নিজে দোতলার ছপানা ঘর নিয়ে আছেন, বাকীগুলোয় বোর্ডিং মেস্‌ খুলেচেন। সরকার আছে। আয়েব জন্ত ভাবতে হয় না। আমি সে বাড়ীর একতলায় কামরায় একখানি তক্তাপোষ দখল করে আছি। ভাড়া দিভুম; এখন ভাড়া মাপ হয়েছে। মানে, বোর্ডিংয়ের কাককর্ষ কতক দেখি। মন্দাকিনী আমার গল্পগুলোর তাবিক করেন।

ভূজঙ্গ কহিল,—তাহলে বেশ আরামে আছো! গল্প লেখবার সুবিধাও খুব?

কার্তিক কহিল—সম্প্রতি একটু অসুবিধা ঘটেছে!

—কি বকম?

কার্তিক কহিল—মন্দাকিনী দেবী এ-যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলেছেন। কোনো দিকে কুঠা বা সঙ্কোচ নেই। পুরুষকে ভয়ের চক্ষে বা সন্দেহের চক্ষে দেখেন না। তর্ক-বিবাদ পুরুষের সঙ্গে করেন সমানে গলাব ভোরে—অর্থাৎ নারী হয়েও আচরণে তিনি বীতিমত পুরুষ!

ভূজঙ্গ বিস্ময়-ভরা স্বরে কহিল,—এবং তিনি কবিতাও লেখেন?

কার্তিক কহিল,—লিরিক কবিতা। মহাকাব্য নয়।

—আশ্চর্য!

কার্তিক কহিল—তোমার তাদা আছে?

—কেন?

কার্তিক কহিল—তাহলে আমার ওখানে নিয়ে যেতুম।

ভূজঙ্গ বসিল—তীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্ত?

কার্তিক কহিল—না। তিনি এখন এখানে নেই; গেছেন শিউড়িতে। একটা এগজিভিশন হচ্ছে। তিনি এক বেনারসী শাড়ীর ফার্ণের প্রতিনিধি হয়ে গেছেন।

—ব্যবসা-বুদ্ধিতে বেশ দড়?

—নিশ্চয়।

—তোমার মুন্সি তবে কন্থানে!

কার্তিক কহিল—আমার প্রতি দরদ একটু বেশী। মানে, তিনি বিবাহ করতে চান এবং আমাকে...

ভূজঙ্গর হুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সে কহিল—  
যোমাল! তোমার আপত্তি কিসের? বিধবা বলে?

কার্তিক কহিল—তা নয়। এমন পুরুষালি চালের মেয়েকে বিবাহ! তা ছাড়া টাকা-পয়সার মালিক! জীব কাছে সারা জীবন মাথা নীচু করে থাকতে হবে। আহি ভালো, সন্দেহ নেই! মনের খেয়ালে লিখি! খাওয়া-পরাব জন্ত ভাবতে হয় না—বাড়ীভাড়া হস্তিষ্ঠায় পাগল হতে হয় না! কিন্তু...

এমন আরামেও কিন্তু! ষ্টুপিড। সে কহিল—কিন্তুটা কিসের?

কার্তিক কহিল,—অসব বাসায়? খাওয়া-দাওয়া করে বাড়িটা না হয় কাটিয়ে গেলে!

ভূজঙ্গর কোঁতুল হইতেছিল। ব্যাপারটা বহুশ্রম—‘ষ্টাডি’ কারবার মত!

সে কহিল,—চলো।

কার্তিকেব সঙ্গে ভূজঙ্গ আসিল, বকুল বাগানের বাসায়।

বাসা-বাড়ী। পিছনে অনেকপানি কম্পাউণ্ড। ঘরগুলো বড়; বিকলী বাতির আলোয় ভবপুৰ।

কার্তিক কহিল,—স্পষ্ট আমাকে এমন কথা বলেন নি যে বিবাহ করতে হবে। তবে স্বামীর কথা প্রায় তোলেন। বলেন, মনে কত সাপ ছিল, কত আশা। আমাব সঙ্গে এসব কথা কইতে সঙ্কোচ নেই। আমাব উপর অসীম যত্ন,—ভোরে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে এসে নিজেব হাতে চায়ের পেয়াদা ধরে দেন। একটু অস্থির হলে ডাক্তার ডাকেন। সেদিন শিরদাঁড়ায় ব্যথা হয়েছিল গরম জলের বোতল ধরে সেরে দিলেন। সর্দি হলে চায়ে আদার বসটুকু নিজেব হাতে মিশিয়ে দেন।

ভূজঙ্গ যত শুনিতেছিল, ততই তাব তাক লাগিতেছিল! সে কহিল—এ যে গল্পেব রাজকল্যাণে! তুমি নেহাৎ গর্দভ!

কার্তিক কহিল—বেপরোয়া নব-নারীর কল্পিত কাহিনী গল্পে যতই লিখি ভাই, ঘবের জীব সঙ্কে আমার মত আজো সেকেলে রয়ে গেছে—তা স্পষ্ট বলবো! ইনি বয়সে তরুণী—গল্প পড়ে আমার সঙ্গে পাবচয়। তাব উপর যেভাবে সকলের সঙ্গে মেলামেশা করেন,—বিবাহিতা জীব অতখানি স্বাভাব্য, স্বাধীনতা বরদাস্ত করা দায় হবে। গল্প শুনেও মন এখনো সেই আদিম সংস্কারে জড়িত আছে। কে জানে, যে-নারী এরকম গায়ে-পড়, তার জীবনে হয়তো ইতিহাসও আছে। ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকা নিয়ে নাট্য রচনা চলে—ঐতিহাসিক জীব নিয়ে সংসার রচনা চলে না। এই যে খুশী হবামাত্র শিউড়ী গেলেন—একা! স্বামী হলে এ স্বাধীনতা আমি কি সহ করতে পারবো?

ভূজঙ্গ কহিল—বিষে তো হয়নি, শুধু শুধু এতখানি

দুর্ভাবনাই বা কেন? নোটিশ দিয়ে বিদায় নিতে পারবো!

কার্তিক কহিল—ভয়তায় বাধবে! এত যত্ন, এমন সেবা! চক্ষুসজ্জা তো আছে!

ভূজঙ্গ কহিল—তা আমার ধরে আনলে কেন? আমি কি করবো এ ব্যাপারে?

কার্তিক কহিল,—তুমি যদি ওব স্বামি-পরিচয়ে এসে দেখা দাও!

ভূজঙ্গ শিহরিয়া উঠিল; কহিল,—বলো কি! জাল প্রতাপটান। তারপর ঐ ডাওয়াল কেশ্ চলছে! না ভাই, জেলের ভয় আছে। না খেতে পেলেও ছেল শিরোধার্য কবাব মত সাহস আমার নেই। তাহলে কোনদিন ননকোতে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে পারতুম।

কার্তিক কহিল,—ওঁর স্বামীর পরিচয় আগে শোনো—আমাকে তো কোনো কথা বলতে বাধি রাখেন নি। মানে, ওঁর বিবাহ হয় দশ বৎসর বয়সে। স্বামী সাক্ষি-লেন চাকরী নিয়ে কোন্ দূর-বিদেশে—অমান স্বামীর বুড়ো মা ছেদ ধরলেন, বিয়ে করে তবে যা! তাতেই মায়ের কথায় স্বামী বিয়ে করেন। বিয়ে করে আসামে যান—আব ফেহেন নি। সেখানে ভূমিকম্প বাড়ী চাপা পড়ে মরে গেছেন। বুড়ো শাশুড়ী ছেলেব শোক সহিতে না পেরে ছেলেব পথে পথিক হয়েছেন। দুঃখের কাহিনী!

কার্তিক সবিস্তারে বহু কথা বলিল, বলিল, মন্দাকিনী দেবী খুব ফবোয়র্ড। গল্পে উপজ্ঞাসে বাঙালীর মেয়েকে ফবোয়র্ড দেখিলে প্রকৃত প্রীতিতে মন ভরিয়া ওঠে, কিন্তু ঘর-সংসারে ঠিক একেবারে নিজের পাশটিতে নারীকে সে বকম ফবোয়র্ড দেখলে তার আতঙ্ক হয়। স্তবং ভূজঙ্গ যদি মন্দাকিনী দেবীর মত স্বামী গোঁকুল চাটুষ্যের বেশে আসিয়া দেখা দেয়, ধরা পড়িবার কোনো ভয় নাই। স্বামীকে সেই বিবাহের সময় চকিতের জন্ত মন্দাকিনী দেবী দেখিয়াছেন! তার পর এই সুদীর্ঘ বিরহ! স্তবং...

এ কাজ করিলে ভূজঙ্গকে সে নগদ একশোখানি টাকা গণিয়া দিবে, তাহাও বলিল। সেও তাহা হইলে মুক্তি পায়। তারপর ভূজঙ্গব পলায়ন আদৌ অসম্ভব হইবে না। মন্দাকিনী দেবীর বুকখানা শূন্যতায় আকুল হইয়া আছে স্বামীর জন্ত ইত্যাদি ইত্যাদি।

কার্তিক কহিল—দেখবে এসো, ওঁর ঘরে ওঁর স্বামীর ছবি।

ভূজঙ্গকে কার্তিক দোতলায় মন্দাকিনী দেবীর ঘরে টানিয়া আনিল।

ঘরখানি সজ্জিত। বিধবা! বাড়ালীর ঘরের তরুণী  
বিধবা! এতখানি বিলাসের মধ্যে...

ভূতঙ্গর আজন্মের সংস্কার লজ্জায় রী-রী করিয়া  
উঠিল। সে কহিল,—চাৰি তোমার হাতে দিয়ে গেছেন?  
এমন বিশ্বাস...

কার্তিক কহিল,—স আর বিচিত্র কি, বেলো! জীবন-  
টাকেই আমার হাতে বিশ্বাস করে দিতে প্রস্তুত...

ভূতঙ্গর ক্ষণেক চূপ করিয়া কি ভাবিল। পরে  
কহিল, কিন্তু—তুমি বলচো, স্পষ্ট তোমায় সে কথা  
জানানি! তোমার এ অহুমান।

কার্তিক বলিল, কখনও কোন নারীর প্রেমে  
পড়েচো? হুঁ! আমি ঐ নিয়ে কারবার করচি!  
এদিককার ব্যাপার আমি বুঝি!

ভূতঙ্গর কৌতূহল বাড়িতেছিল। সে কহিল,—বেশ,  
আমি যেন স্বামী গোকুল চাটুঘো হয়ে এলুম। তাবপর  
প্রমাণস্বরূপ কাহিনী তো চাই।

কার্তিক কহিল—কদিন বা দেখা! ফুলশয্যার পরেব  
দ্বিগুণ গোকুল চাটুঘো আসাম যাত্রা কবেন। ফুলশয্যার  
বাত্রেব কথা আমি জানি—আমায় বলচেন।

সাম্ভাষণে ভূতঙ্গর কহিল, বেলো কি?

—তাই। সে কাহিনী তোমায় বলবো'খন!

—ক'বছর আগে বিবাহ হয়েছিল?

—দশ বৎসর আগে। শ্রাবণ মাসের দশ তারিখে।  
সেদিন ছিল শনিবার।

ভূতঙ্গর গুম হইয়া বসিয়া বহিল।

কার্তিক কহিল—একবার শুধু সেজে আসা। পরের  
দিন সবে পড়তে পারো। অ'ছলেব জগা ভাবতে হবে  
না। বলবে, জিনিষপত্র এক বন্ধু বা ডী ফেলে এসেচি—  
নিষে আস। ব্যস। যদি চিন্তাসা কবেন, এ্যা'দন  
কোথায় ছিলে? একটু শুভিষে বানিয়ে গল্প বলো! গল্প  
আমি বানিয়ে দেবো'খন। .. একবার তুমি লেগে যাও  
ভাই। না হয় ম'বাব জগা। তাবপর এই নিষে  
একখানা মস্ত উপজাস লিখে ফেলবো। তাতে যে টাকা  
পাও—অর্দ্ধেক আমার, অর্দ্ধেক তোমার!

কার্তিক নাছোড়বন্দা! সে বলিল—আমি এমন  
একটা মতলব আঁটছিলুম। বিশ্বাস কবতে পারি, আমি  
বন্ধু শুধু খুঁজে পাচ্ছিলুম না! লক্ষ্মী ভাই...

আতিথ্যে সে রাত্রিটা ভালোই কাটিল। ভূতঙ্গর ঘুমাইতে  
পারিল না। এ বহুস্ত তাকে অভিভূত করিয়া দিল! ...  
এমন কথাও মনে হইল, স্বামী সাজিয়া না ফিরিয়া  
বিবাহের পাত্র-বেশে আসিয়া যদি উদয় হয়? চাকরীর  
উমেদারী করিয়া শুধু নৈরাশ্য সার হইয়াছে! বিধবা-  
বিবাহ? প্রাণে বাঁচতে পারিলে বিধবা-বিবাহে আসিয়া  
যায় না! এত পয়সা-কড়ি আছে...

তবে মাথা নীচু করিয়া থাকা! ...আরে মনিবের  
কাছে চাকরি রাখিতে মাথা বুঝি ঢুঁচু থাকে? এ হইবে  
জ্ঞী! তার কাছে মাথা নীচু ক'বায় কি ক্ষতি? জ্ঞী...  
অর্দ্ধাজিনী...কথায় বলে,—এক-প্রাণ, এক-মন!

সকালে কার্তিকের কাছে কথাটা পাড়িল। কার্তিক  
কহিল,—না, না, না। তরুণী নারী...প্রেমের দাম বোঝে!  
স্বামী পাওয়া লক্ষ্য হলে বিবাহ কি এতদিন পড়ে থাকে?  
ভূতঙ্গর কহিল—তাহলে ভেবে ছুদিন পরে বলবো,  
ভাই!

কার্তিক কহিল—বেশ! তোমার ঠিকানা?

কৌতূকেব ব্যাপার! কৌতূহলও খুব!

ভূতঙ্গর ঠিকানা লিখিয়া দিল।

কার্তিক কহিল—আগাম এই পকাশ টাকা নাও।

ভূতঙ্গর টাকা লইল। অভাব বড় ভীষণ...

এ বা'জ। ভিক্ষা নয়! দোষ কি?

কার্তিক কহিল,—কাল মন্ডাকিনী দেবী আসবেন।

তুমি কবে উদয় হছো? পরশু?

ভূতঙ্গর কহিল,—বেশ!

সন্ধ্যার সময় মন্ডাকিনী বসিয়া হিসাব বলিতেছিল,  
কার্তিক তাহা খাতায় লিখিতেছিল। বোড়িংয়ের ভৃত্য  
আসিয়া বলিল—একটি বাব এসেচেন।

কার্তিক কহিল—কে?

গঙ্গা বলিল—নাম বললে না। সে বললে, মন্ডাকিনী  
দেবীও বা ডী এটা? আমি বললুম, হ্যাঁ। শুনে আমার  
বললে, তাঁকে খবর দাও, বেলো, তাঁর একজন আশ্রায়  
এসেচো। দেখা করতে চায়।

—আশ্রায়। মন্ডাকিনী দেবীও চোখে বিষয়।

কার্তিক কহিল—দেখবো?

মন্ডাকিনী কহিলেন—ছাপো।

কার্তিক নীচে নামিয়া গেল।

তারপর দোতলায় আসিল—মুখে-চোখে একরাশ  
বিশ্বয় ভরিয়া।

মন্ডাকিনী কহিল,—কে?

কার্তিক কহিল—নাম বললে, গোকুল চাটুঘো।

মন্ডাকিনীর দুই চোখ বিষয়ে বিষফারিত হইয়া  
উঠিল। সে কোন কথা কহিল না।

কার্তিক বলিল—বললে, আমি মন্ডাকিনী দেবীর  
স্বামী।

মন্ডাকিনী কহিল—এ্যা!

তার দুই চোখ এমন হইল, যেন ভূত দেখিয়াছে!  
তেমনি বিশ্বয়-স্তম্ভিত দুই চোখের দৃষ্টি! ...

তারপর মন্ডাকিনী কার্তিককে বলিল গোকুল

চাটুঘোকে তাৰ কাছে আনিতে। কাৰ্ত্তিক কি কৰিবা তাকে  
আনিয়া দাঁড় কৰাইল এবং গোন্ধুৰ আনিয়া দাঁড়াইলাক  
ভাৰে—সেগুলা কাসিৰ লেখাৰ চেয়ে তুলিৰ লেখাতেই  
ফোটে ভাণে। ত্ৰিমূৰ্ত্তী সে ভবি অকিয়া দেখাইবাৰ;  
লিখিয়া দেখাইবাৰ কালি ফাট'টন পেনে কুণায় না। ..

গোকুল ডাকিল,—মন্মাকিনী...

—তুমি। বলিয়া মন্মাকিনীৰ মূৰ্ছা।

সেই সঙ্গে এ-দৃশ্যৰ উপৰ পটঃকল্প!

দশ বৎসৰ পৰে স্বামি-স্ত্ৰীৰ অপ্ৰত্যাশিতভাবে মিলন!  
পৌৰাণিক যুগে ড'একটা মাত্ৰ এমন ঘটনাৰ উল্লেখ দেখা  
যায়। তাৰপৰ হইতে বিধাতা তাঁৰ আইনগুলাকে টাইট  
কৰিয়া আঁটিয়া দিয়াছেন। তাই ধৰণীৰ বৃকে এমন  
ঘটনা আৰ ঘটে নাই।

পাঁচদিন পৰে অসহ্য কৌতূহল বৃকে লইয়া কাৰ্ত্তিক  
আসিয়া হাঙ্গিৰ হটল—বৌবাভাৰ স্ত্ৰীটে ভূজঙ্গব মেশে।

মেশেৰ মানেভাৰ বলিল,—আজ ক'দিন তাঁৰ দেখা  
নেই। সত্বেবো টাকা সাত আনা বাকী পাওনা ছিল।  
আজ সত্ৰালে এসে পাওনা-গুণ্ডা চুকিয়েকাপড় বিছানা  
নিয়ে চলে গেলেন।

—কাখায় গেছেন—জানেন?

মানেভাৰ কহিল,—বললেন, বিয়ে কৰচেন। বকুল-  
বাগানে বাড়ী নেওয়া হয়েচে...

বিবাহ! বকুলবাগান। ...

কাৰ্ত্তিক দাঁড়াইল না; বহুবাভাৰেৰ মোড়ে আসিয়া  
প্ৰথম বাসখানাৰ চাপিয়া বসিল এবং সেখান হইতে  
সোজা আসিল ভবানীপুৰ, বকুলবাগান।

সেই গলি। সেই বাড়ী।

পা কাঁপিল। কি বলিয়া ও-বাড়ীতে আবার গিয়া  
মাথা গলাইবে?

মোড়ে সে দাঁড়াইয়া রহিল। মুদিকে বলিয়া চুপি  
চুপি ডাকাইয়া পাঠাইবে?...

ডাকাইণে হইল না। ভূজঙ্গ আসিতেছিল; ট্ৰাম  
হইতে এই দিকে। তাৰ হাতে মস্ত একটা বাগিল।

সে মলিন বেশ নাই! সেইটাই সব প্ৰথম কাৰ্ত্তিকের  
নজৰে পড়িল।

ভূজঙ্গ কহিল—হালো কাৰ্ত্তিক...

কাৰ্ত্তিক কহিল—খপর কি?

ভূজঙ্গ কহিল—As luck would have it...

কাৰ্ত্তিক কহিল—বিবাহ কৰচো?

ভূজঙ্গ কহিল,—হ্যাঁ।

মুখে চোখে আনন্দের দীপ্তি! এমন স্পষ্ট বে, পথের  
গ্যাস-বাতিভেও নজৰে বাধিল না।

কাৰ্ত্তিক কহিল—তুমি নিরুদ্দেশ স্বামী! অথচ তোমায়  
বিবাহ কৰবে! তাৰ মানে?

ভূজঙ্গ কহিল,—তুমি যা অনুমান কৰেছিলে...

বিশ্বয়ে কাৰ্ত্তিকের বাক্য বিলুপ্ত হইল।

ভূজঙ্গ কহিল,—বিধবা নন, কুমাৰী। গোকুল  
চাটুঘোকে জানেনও না। বাপের পরয়া ছিল। লেখাপড়া  
শিখেচেন। বাপের পরয়ার সংবাদ পেয়ে কতক-  
গুলো হতভাগা পাত্র দোবে এসে ভিড় ভমিয়ে-  
ছিল। সকলকে তাড়ালেন। তখন সাধ ছিল, খুব  
লেখাপড়া শিখবেন।... তাৰপৰ বাবা গেলেন মায়া।  
এ বোৰ্ডিং হাউস নিজের আইডিয়া নয়। বাপের ছিল।  
সেটা ছাড়লেন না, চালিয়ে আসচেন। বোৰ্ডিং আগে  
ছিল শাহানগরে। এই বাড়ীতে পরে আসে। এ  
বাড়ী কিনেছিলেন। এতে ভাড়াটে ছিল। ভাড়া  
আদায় হতো না তাই এই বাড়ীতে উঠে আসেন।  
কুমাৰী বলে পরিচয় নিলে ভক্ত বাসিন্দার অভাব হতো।  
কিবা কতকগুলো ফাজিল কবি, গল্প-লিখিয়ে এসে ভিড়  
করতো, তাই বিধবা-পৰিচয়ে আশ্বগোপন।

কাৰ্ত্তিক যেন স্বপ্ন-কাহিনী শুনিতেছিল! কহিল,—  
সে ফটো?

হাসিয়া ভূজঙ্গ কহিল,—বাজে। নিলেমে কতকগুলো  
ফাৰ্ণিচাৰেব সঙ্গে এক লাটে কেনা। এটিকে বৰ্ণ-ৰূপে  
খাড়া কৰে'ছিলেন।

কাৰ্ত্তিক কহিল,—তোমার মিত্যা পরিচয় তখনি ধরে  
ফেললেন?

ভূজঙ্গ কহিল—She has a heart. মূৰ্ছাটা কৃত্ৰিম।  
তুমি তো সবে পড়লে! উনি উঠে বললেন, আমার  
স্বামী তুমি? আমি বললুম, হ্যাঁ। উনি  
বললেন,—কোনো জন্মে স্বামী নও। তুমি ভাল।  
কন্ম্বনকালে আমার বিবাহ হয়নি। বিবাহ কে  
দেবে, এমন আত্মীয় আমার ছিল না।...তোমাকে  
পুলিশে দেবো! আমি ভয়ে তখন পদানত হই।  
নিজের দুৰ্দ্ধশার কথা জানিয়ে ক্ষমা চাই। ঠাঁৰ মমতা  
জাগলো! আমার বললেন, সংসাবে কে আছে?  
আমি বললুম, এক বিধবা মা আর বোন। বললেন,  
তোমার নাম? আমি বললুম, ভূজঙ্গ ঘোষাল!  
বললেন, তুমি ব্রাহ্মণ! বেশ! তাৰপৰ বিবাহের  
প্ৰস্তাব।

প্ৰচণ্ড নিখাস চাপা দিয়া কাৰ্ত্তিক কহিল,—Luckই  
বটে!

ভূজঙ্গ তাকে পাকড়াইয়া ধরিল, কহিল—ক'কে  
এসো। তোমার সেই টাকা কটা...

কাৰ্ত্তিক কহিল,—মাপ কৰো। সে টাকা মন্মাকিনী  
দেবীৰ।

ভুজঙ্গ কহিল,—সে টাকা আমি নেবো না। তখন আমার অভাব ছিল। এখন নেই।

ভুজঙ্গ ছাড়িল না; কার্তিককে ধরিল।...

কার্তিক কহিল,—আমাব উপর চটেছেন?

ভুজঙ্গ কহিল,—তোমাব কথা শুধু একদিন উঠেছিল। তুমি নাকি ঠেকে একখানি প্রণয়-পত্র লিখেছিলে...

ওঁকে! প্রণয়-পত্র...!

কার্তিক যেন আকাশ হঠাতে পড়িল।

ভুজঙ্গ কহিল,—হ্যাঁ। স্পষ্ট নয়। একটু অস্পষ্ট বকম। মানে, বিধবা ল্যাণ্ডলেডি! গল্প লেখার আর্ট জানা আছে। আমাকে তাই বলছিলেন, যেন গল্পের কাপির ছেঁড়া পাতার মত! তাতে লেখা ছিল,—আর কতদিন ধ্যান কববো দেবী? আমার সকল কামনার প্রদীপ জ্বলে দিয়ে আর কত দগ্ধ কববে? উনি তাই আভাসে জানিয়েছিলেন, স্বামীর কথা ওঁর আগাগোড়া বানানো গল্প। সেই গল্প শুনেই নাকি তুমি টিট্ হয়ে যাও! সেই জগত তোমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বাড়িয়ে বোর্ড গ্র্যাণ্ড লজিং ফ্রী করে দেন। বলছিলেন, হয়তো বিবাহ কবতেন। শুধু ঐ গল্প লেখো বলেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। লেখকদের উপর মতটা ভাবী সেকলে বকম। বলেন, বেচারী মাষ্টার-গুলো আব যাই হোক দুর্বৃত্ত হয় না—পোষ মানে। লেখকগুলোর মনের নাকি অস্ত্র পাওয়া যায় না!

বিবরণ শুনিয়া কার্তিক কহিল—না ভাই, ছাড়ে।

ভুজঙ্গ কহিল,—তোমার টাকা আমি রাখবো না।

কার্তিক কহিল—সে না হয় আর একদিন আসবো—দিয়ো।

কার্তিক মিনতি করিল; ভুজঙ্গ কহিল,—আচ্ছা...

ভুজঙ্গ উঠিয়া তেতলায় গেল। মন্দাকিনী তখন পুরোহিতের সঙ্গে কথা কহিতেছে।

মন্দাকিনী কহিল—কি বকম বেনাবশী ছোড় আনলে, দেখি।

ভুজঙ্গ কহিল—ছোড় তো বেনাবশী নয়। গরদ। তবে শাড়ী এনেচি...বেনাবশী।...তোমার জন্ত।

—সে আবার কে আনতে বলেছিল?

ভুজঙ্গ কহিল—বা রে, আমি হবো স্বামী! স্ত্রীর লজ্জা দবদ কববো না? বেনাবশী পরবে তুমি। একটা বাড়ির জন্ত আমার বেনাবশী জোড়ে কি হবে? মিছে পয়সা খরচ...

—ইস! তবু যদি নিজেব রোজগারের পয়সা হতো।

—তোমাব পয়সা এখন আমারি পয়সা...

পুরোহিত কহলেন—তা তো বটেই বাবুজী...

সন্ধ্যার পর মোটা খাতা বাঁধিয়া কার্তিক ওদিকে উপজ্ঞাস ফাঁদিয়া ছিল। উপজ্ঞাসের নাম হইবে—জ্বী-চরিত্র! সে স্থির করিয়াছে, সমস্ত নারীজাতটাকে সে উপজ্ঞাসে এমন কালো কারিয়া আঁকিবে, যে সে-মূর্তি দেখিয়া সকলে...

কিন্তু সে ভবিষ্যতের কথা! বর্তমানে সে আলোচনার প্রয়োজন দেখি না।

# পল্লী-দর্শন

প্রমথ ঘোষাল কলিকাতায় থাকে। বি-এ পরীক্ষা দিয়া বিশ্রাম-কামনায় হাটুয়ায় আসিয়াছিল দিদির কাছে। হাটুয়ায় দিদির শশুর-বাড়ী। ভগ্নীপতি পশ্চিমে চাকরী করে; আমের সময় ছেলেমেহেঙলা গাছেব আম খাইয়া বাঁচিবে, তা ছাড়া গ্রীষ্মে ছুটি হইয়াছে—এমনি নানা কারণে হাটুয়ায় আসিয়া দিদি এই ক'মাস এখানে কাটাওয়া যায়।

বি-এ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রমথের তরুণ মন কাব্য-লোকের পথে বিচরণ করিত, একালের পাঠক-পাঠিকার কাছে বাহুল্য-বোধ হইলেও সে-কথাটুকু বলিয়া না রাখিলে প্রমথের প'বচনটুকু পূর্ণ-বিকাশ ঘটিবে না—সেজন্য বিশেষ কবিতা একথাটুকু বলিয়া রাখিতেছি।

প্রথম দিনে বৈকালেব দিকে গ্রাম ছাড়িয়া মেঠো পথ ধরিয়া প্রমথ বহুদূর ঘুরিয়া আসিল। পথের বৈচিত্র্য তাকে বীতিমত মুগ্ধ করিল। কাব্য-রসের বসিক বলিয়া মনে গর্ব আছে—কাজেই মুগ্ধ হওয়ায় বিশ্বয়ের কিছু নাই।

গৃহে ফিরিয়া সে ছাদে উঠিল। ছাদে মাজুর পাতা। শুইয়া আকাশের পানে সে চাহিয়া রহিল। আকাশের এককোণে ফালি চাঁদ। ছোট আলিশাব ওদারে গাছের শ্রেণী, বাতাসের দোলা পাইয়া আমোদে মাতিয়াছে—প্রমথের ভারী ভালো লাগিতেছিল। মনে হইতেছিল, তার চিত্ত-আকাশেও ভাবের অজানা দোলায় যেন কোন্ কিশোরীর আঁচল উড়িতেছে—তার মুখখানা যেন ধবা পড়ে, পড়ে, পড়ে না!

দিদি ছাদে আসিল, আসিয়া বলিল—বেড়িয়ে এলি?

প্রমথ কহিল—হ্যাঁ।

—পাড়া-গাঁ ভালো লাগলো?

প্রমথ কহিল—চমৎকার!

দিদি কহিল—রাত্রে মশার উৎপাত, এই যা কষ্ট। না হলে আমিও হু'মাসের জগৎ এখানে এসে যেন বর্তে যাই...

প্রমথ একথাও জবাব দিল না। আকাশের বৃক্ক কতকগুলো টুকরা মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে! চাঁদকে কখনো ঢাকিয়া দেয়—আবার কোন্ ফাঁকে চাঁদ তাদের গ্রাস ছাড়িয়া বাতির হইয়া আসে! কল্পলোকের কিশোরীর মুখচন্দ্রও তেমনি থাকিয়া থাকিয়া যেন চোখের সামনে আভাসে উদয় হয়, আবার পবকণে আবছায়ার অস্পষ্ট-তায় ঢাকিয়া যায়।

প্রমথ ডাকিল,—দিদি...

দিদি কহিল—কেন?

প্রমথ একটা নিশ্বাস ফেলিল। যে কথা মনে জাগিতেছিল, চাঁদের অস্পষ্ট আলোয় দিদির কাছে তাহা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হয়! সে কহিল,—বাবাবু বোধ হয় এমনি গ্রামে বসেই সেই গান লিখেছিলেন—

গ্রামছাড়া ঐ বাঙা মাটির পথ

আমার মন ভুলানো বে!

সত্যি দিদি, বহুদূর মাঠের শেষে সূর্য্য অস্ত যাচ্ছিল; সারা আকাশ লালে লাল—পথের মাটি অবধি রাঙা হয়ে উঠেচে। সে যা দেখতে! আহা!

দিদি কহিল—খত জানিনে বাপু। তবে এখানে বেশ কঁাকা ফর্দা... তোদের কলকাতা আমার সত্যি ভালো লাগে না! বাড়ার পরে বাড়ি—ঠাশাঠাশি, ঘেঁষাঘেঁষি... যেন বৃক্ক চেপে ধরে। হাওয়া নেই, খালি ধূলো আর ধোঁওয়া...

প্রমথ কহিল—যা বলেচো!...

ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া প্রমথের আর কাজ ছিল না। ঘুরিতে ঘুরিতে স্বপ্নগুণা বৃক্কের উপর কত ছায়া-ছবি আঁকিয়া চলে! ছায়া-শ্রামল পথে তরুণী পল্লী-বমণীদের কলস কাঁখে চল আনিতে যাওয়া... মাটির বৃক্ক পায়েব রেখা... নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমথ ভাবে, যাঁহা যাঁহা কমল চরণ ফেলি যাওয়াত...

একটা কবিতাও সে লিখিয়া ফেলিয়াছে—

আমার মনেব লক্ষ্যযুগের প্রিয়া

যায় এ পথে, কাঁখে কলস নিয়া।

জল সে বলে, ছল-ছল সুরে—

কোথায় বঁধু, কোথায় আছে দূরে?

তার উপর দিদির এখানে কবেকার একখানা পুরনো ছেঁড়া মাসিক পত্রে সে একটা গল্প পড়িতেছিল,—গল্পেব নায়ক তার মত এগজামিন দিয়া পল্লীর বৃক্ক বেড়াইতে গিয়াছিল। এক পুকুর-ঘাটে ছপুরে দেখা কিশোরী নায়িকার সঙ্গে। নায়িকা একবাশ বাসন মাজিয়া ঘাট ছাড়িয়া উপরে আসিতে পিছল-ধাপে পড়িয়া যায়—নায়ক গিয়া তাকে তোলে! তার পর নায়িকার সঙ্গে ঘাটের ধাবে একটা বকুল গাছেব তলায় নিত্য দেখা! প্রেম যখন প্রাণের বাঁধ মানিয়া আর আটক থাকিতে চায় না, তখন একদিন মুখ ফুটিয়া প্রাণের কামনা প্রকাশ করিতে



কিশোরী নায়িকা বলিল,—সে বিধবা ! নাশক কহিল—  
সামনে এই দীর্ঘ ভীবন ! একটা স্মৃতি বহিয়া সে-জীবন  
বহিয়া বেড়ানো.. ?

নায়িকা বলিল—স্বামীকে শুধু বিবাহের বাক্সে দেখিয়া-  
ছিল, শুভদৃষ্টির সময়...পরের দিনই স্বামী মাঝা মাঝি !

নাশক বলিল—তবে ? তবে ?

নায়িকা বলে,—না ।

নাশক বলে,—দিকে দিকে এমন মাধুরী ! ঐ পান্না  
পুকুর, ঐ বাগবন, ঐ ঝিল্লার শব্দ...তুমি শুধু নিশ্বাস  
ফেলিবে ?

নায়িকা বলিল,—এই হৃদয়ের মধু-স্মৃতি—সোনার  
রেখায় বৃকের পটে আঁকিয়া বাগিবা !

নায়িকার চোখে জল—নায়িকা কলস-কাণে চলিয়া  
গেল । নাশক দাঁড়াইয়া বহিল—বতরুণ নায়িকাকে  
দেখা যায় ! তার পব নায়িকার চরণ রেখায় বৃক দিয়া  
পড়িয়া বহিল !

গল্প এতপানে শেষ । তবু ব্যাখ্যাত কাহারো বাক্য  
থাকে না, ছুটা বৃকে কি মরুভূমি বচিয়া রহিল ।

বৃকে এমন মরুভূমি কবিতা তুলিতে সেও কি পারে  
না ? তার ভাগ্যেও তেমনি কোনো জীবন্ত কিশোরী  
যদি.....

দিদি আসিয়া বলিল,—আজ আমার এক ভাস্করের  
বাড়ী বাক্সে নেমস্তন্ন...যাবি তো ? হোকেও যেতে বলে  
গেছে অনেক কবে । তুই তখন বেবিয়েছিলি...তাই  
দেখা হয়নি ।

নিমন্ত্রণ ! প্রমথ কহিল,—না দিদি, কাকেও চিনি না,  
জানি না, গিয়ে পুতুলের মত বসে থাকবো !

দিদি কহিল,—তাতে কি ! গেলেই আলাপ হবে ।  
মাঝুয়ের সঙ্গে মিশতে শেখবে । কণো হয়ে থাকিস্ নে ।

প্রমথ কহিল,—আচ্ছা,যাবো । কিন্তু কাব সঙ্গে যাবো ?

দিদি কহিল,—কেন, নিতাইয়ের সঙ্গে যাবি ।

নিতাই দিদির বড় ছেলে, বয়স বাবো বছর ।

তখন এই অববি...কিন্তু সেই যে কথা শুনা যায়,  
বিধাতা অলক্ষ্যে বসিয়া মাঝে মাঝে হাসেন, তেমনি  
ব্যাপার নিশ্চয় ঘটয়াছিল ! নাহলে...

নিতাইয়ের সঙ্গে দিদির ভাস্করের গৃহে গেলে একটা  
ঘটনা ঘটিল । ঘটনা তুচ্ছ । কিন্তু তুচ্ছ তত্ত্বের মধ্যে  
বিরাট পরিণতি বিরাজ করে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয় । এই  
আসরে প্রমথর সমবয়সী ক'জন কিশোর গান-বাজনা  
করিতেছিল । কলিকাতার সৌখীন বেশ-ভূষায় প্রমথকে  
আসিতে দেখিয়া তারা মুগ্ধ তুলিয়া তার পানে চাহিল ;  
তার পর নিতাইকে একান্তে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল,—উনি  
কে নিতাই ?

নিতাই কহিল,—আমার মামা ।

মামার সবিস্তার পরিচয় দিতে বসিয়া নিতাই কহিল,—  
মামা কবি—কবিতা লেখে ; মামা কখনো পল্লীগ্ৰাম  
দেখে নাই ; বি-এ দিয়া বাড়লা দেশের গ্রাম দেখতে  
আসিয়াছে ইত্যাদি । বাড়লা দেশের গ্রাম—এ-কথাগুলো  
মামার কথার কোটেশন !

দলের মধ্য হইতে প্রিয়নাথ আসিয়া প্রমথকে অভি-  
বাদন জানাইল,—আপনি কবি ।

কুষ্ঠা-ভাঙিত দবে প্রমথ কহিল,—কবিতা লিখি ।

—কোন কাগজে ছাপা হয় ?

—'বসন্ত-দূত', 'কল্যাণশ্রী'—এই সব মাসিকে ছাপা  
হয় ।

কণেক ভাব পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রিয়নাথ  
কহিল,—আমাদের এ গ্রাম কেমন দেখতেন ?

—চমৎকাব ।

প্রিয়নাথ কহিল,—আমাদের একটা লাইব্রেরী  
আছে...এক দিন আসবেন সেখানে ?

প্রমথ কহিল,—আসনো ।

প্রি নাথ কহিল,—নিতাইয়ের কাছে বলে দেবো—  
একটা তাবিল ঠিক হবে । মানে, সেদিন আমাদের  
কমিটির সকলে হাজির থাকবে । আপনাকে at home  
দেবো ।

প্রমথ খুশী হইল । বুড়া চাণক্যর বচন মিচা হইবার  
নয়—বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে ! বিদ্বান আর কবি—স্বতন্ত্র  
জীব নয় ! চাণক্যর আমোলে কবির কন্মতি ছিল, শাস্ত্র-  
পড়ার দলে ছিল ভারী । নহিলে চাণক্য 'বিদ্বান' কথা  
না লিখিয়া 'কাব' লিখিতেন ।

ভক্তদলের ভক্তি-নিবেদনের উচ্ছাস বেশী দিন রহিল  
না ! তাদের নিষেদের কাজ-কর্ম আছে—কলিকাতার  
মত নিছক ভাব-বিলাসী এখানে নাই ! খায় দায়,  
মাথায় লম্বা চুল রাখে, আর কবিতা লেখে—এমন জাত-  
ভাবুকেব দারুণ অভাব ! সাধে কলিকাতা অমন সুরাসিক !

এক সপ্তাহ পরের কথা । সকালে উঠিয়া প্রমথ আবার  
তার দীর্ঘ পাড়ি সুর কবিতা ফিবেছিল । মাঠের ধারে  
একঝাড় কলাগাছের পাশে জীর্ণ এক-তলা বাড়ী ।  
বাড়ীর সামনে রোয়াক । রোয়াকে বসিয়া একটি  
কিশোরী...হয়তো সাজিয়া কলিকাতার পথে মোটরে  
চড়ি়া বাহিব হইলে তার পানে পথিকের চোখ পড়িত  
না ! কিন্তু এখানে ঐ তরু-পল্লবের ব্যাক-গ্রাউণ্ড, আর  
এই জীর্ণ গৃহ—পথে আর পথিকও কেহ নাই ! কাজেই...  
প্রমথর মনে হইল, পল্লীশ্রী যেন অপরূপ মূর্তিতে রোয়াকে  
বসিয়া আছে !...

প্রমথ তাব পানে চাহিল ! এমন মুখ এখানে আসিয়া অবধি চোখে দেখে নাই ! চোপ দুটিতে কি এক অজানা রহস্য ! তার গাত মস্তুর হইল । নানা ভাবে সে কিশোরীর পানে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছিল...সহসা কিশোরীর দৃষ্টিব সজিত তাব দৃষ্টি মিলিল । কিশোরী মুহু হাসিল । সে হাসি...

বাহ্যের কণিতা, গল্প—সে হাসির দাবায় প্রমথব মনের পাখাবে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল । যেন বাশি রাশি ফুল সে পাখাবে কে ভাসাইয়া দিয়াছে ! তাব বুক কাঁপল ; ভয় হইল...তখন চকিতে চোখ ফিরাইয়া সে পথের বাঁক ঘুরিল ।

বাকের মুখে এক মুদির দোকান । বড় নয় । দোকানে দু'চারিজন লোক বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে !...দোকান পার হইয়া প্রমথ চলিল...আশে-পাশে মাঠ, বাগান, কুটীব...সব যেন ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে ।

মনের মধ্যে দু' চারিটা কবিতার ছত্র বড়-বেশী কলরব তুলিয়া দিল । কবে কোন্ মাসিকে পড়িয়াছিল—  
নিষ্কেষ লেখা নয়...

মুহু হাসি হেসে তুমি গেলে চলি—

চমক ভাজিল মম !

তা রে অভাগা ফুৎলো নিমেষে

মতা-পুথ অল্পম !...

তাট কি ? কীরনে এই একটিমাত্র সন্যোগ...প্রাণের চিব-সম্মল, মনের সঙ্গল কামনা...সতাই জাগিয়া নিমেষে হাবাইতে চলিল ।...

না, না...

প্রমথ ফি বল ; ফিরিয়া দোকানে আসিল । দোকানী কহিল—কি চাই বাবু ?

প্রমথ চারিদিকে চাহিল, চাহিয়া কহিল—ডাব আছে ?

দোকানী কহিল—খাজে, না । চাল আছে, ডাল আছে, মুগ আছে, তেল আছে ।

প্রমথ কহিল—ভারী তেঁটা পেয়েছে...

দোকানী কহিল—বেশ, ডাব পাড়িয়ে দিছি । ওরে দীনো...জাথ তো, ঘরে ডাব আছে কি না...

দোকানী প্রমথব পানে চাহিল । প্রমথব মনে তাব চিরদিনের কল্পনা তখন ভাল মেলিয়া বসিয়াছে যত ভালো ভালো আধুনিক গল্পের প্লট বাছিয়া খুঁজিয়া ধরিবার বাসনায়...

দোকানী কহিল,—এ দিকে কোথা এসেছিলেন ?

প্রমথ চট্ কাবয়া বলিয়া ফেলিল,—ঐ যে বাড়ী-খানা...বাকের ওদিকে...

দোকানী কহিল,—ও । আমাদের নবীন ভশ চাষা মশায়ের বাড়ী ?...তা, ওখানে ?

দোকানীর স্বর যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল । প্রমথ স্তম্ভীকৃত দৃষ্টিতে দোকানীর পানে চাহিয়া...দোকানী কহিল,—ভশ চাষা মশায়ের পরিবার বৃষ্টি নদীতে গেছেন চান করতে ! আর ভশচাষা মশাই ? কোথায় যে নিরুদ্ধেশ । অথচ কি কাবণ...

প্রমথ কহিল,—তাঁর কাছেই এসেছিলুম । তা, কার সঙ্গেই বা দেখা করি !

দোকানী কহিল,—ও !...তা কেনার মেয়ে তো আছে ! চমৎকাব মেয়ে । খাশা বুদ্ধি ।

ডাব আসিল । প্রমথ ডাবের জল নিঃশেষ করিয়া কহিল,—ক' পয়সা ?

দোকানী কহিল,—যেবে ডাব, বেচি না ।

প্রমথ উঠিল, কহিল,—দেখি আব একবার...ভটচাষি মশায়ের পরিবার ফিরলেন কি না ।...

প্রমথ ফিরিল । রোয়াকে উপর কিশোরী তখনো তেমনি বসিয়া আছে ! প্রমথ ভাবিল, কি ব্যাপার ?

সে কাছে আসিল ! কিশোরীর দৃষ্টি স্থির, তার উপর নিবদ্ধ !

প্রমথ কহিল,—এটা তো নবীন ভটচাষি মশায়ের বাড়ী ?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, হাঁ, । তার চোখে বিস্ময় !

প্রমথ কহিল,—তাঁর কাছে বিশেষ দরকারে এসে-ছিলুম...

কিশোরী কহিল,—কি দরকার ?

প্রমথ কহিল,—মানে...কলকাতা থেকে আমি আসিচি !...তিনি বাড়ী নেই ?

কিশোরী কহিল,—না ।

—কখন ফিরবেন ?

কিশোরী কহিল,—তার ঠিক নেই ।...

কথা ফুরাইল ! ইতার পর ?...কিশোরী কহিল,—কি দরকার, আমার বলতে পারেন ।

প্রমথ কহিল,—আপনি তাঁর মেয়ে ?

কিশোরী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ ।

প্রমথ কহিল,—আপনার মা আছেন না ?

—আছেন ।

—তাঁর সঙ্গে দেখা হয় না ?

কিশোরী কহিল,—মা নাইতে গেছে ।

প্রমথ কহিল,—আমার দরকারী কাজ ছিল...বড্ড দরকারী ।...তাই তো !

কিশোরী কহিল—তা হলে ঘরে বসবেন, আসুন । মা এখন চান করে ফিরবে...

প্রমথর বুকটা ধ্বক করিয়া উঠিল ! চলিয়া যাইতে পা সবে না—অথচ বসিতে গেলে...

তার পর ?...

কিন্তু ঐ কিশোরী...!

বুক হু-হু করিয়া উঠিল।...প্রমথ অগত্যা কিশোরীর সঙ্গে আসিয়া ঘরে বসিল।

৪

ঘরখানি সাজানো। একধারে ছোট তক্তাপোষ। তক্তাপোষের পাশে ছোট একটি টেবিল—টেবিলের উপর একরাশ খাতা, বহি দোষাত, কলম। দেওয়ালের গায়ে রঙীন ক্রাকডার আবরণে একটা প্রশস্ত আলিও আছে।

মা অচিরে ফিবিলালেন। কিশোরী তাঁকে কহিল—একটি ভদ্র লোক এসেছেন কি দরকারে!

মা কহিলেন—কে ?

মেয়ে কহিল—দেখো'খন কাপড় ছেড়ে। ঐ ঘরে বসিয়েচি...

এ কথা শুনা হইল নেপথ্যে। নেপথ্যে হইলেও কথাগুলি প্রমথ শুনিল। তার বুক কাঁপিল। এবার সঙ্গীত মূর্ত্ত। মনে মনে সে ডাকিল—জয় মা বাগীধরী... কণ্ঠে সার্থক বাক্য ফুটাও মা...

অচিরে এক প্রৌঢ়া মহিলা অর্থাৎ মা ঘরে আসিলেন, কহিলেন—কে গা ?...

প্রমথ কহিল,—নবীন ভট্টাচার্য্য মশায়ের কাছে আসিচি। মানে, একটা কাজ আছে। তিনি বলেছিলেন, এখানে এসে দুদিন থাকলে সে কাজটুকু সারবার সুবিধা হবে।

মা কহিলেন—কবে বলেছিলেন ?

প্রমথর মনে সজাগ ছিল, দোকানীর কথা—নিরুদ্দেশ! সে কহিল—সে অনেক দিনের কথা! তখন নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, তাই... তা এখন...

মা কহিলেন—কি দরকার তোমার ?

প্রমথ কহিল—একটু বৈয়য়িক কাজ। অর্থাৎ ঐ গাজুলিদের সঙ্গে...

গাজুলির অর্থ, প্রমথর ভগ্নীর স্বপ্নের গোষ্ঠী।

মা কহিলেন—ও...তা, কতদিন লাগবে কাজ বুঝতে...!

প্রমথ কহিল—হস্তাথানেক...

তার বৃকের মধ্যে যেন মৃগের বা পড়িতেছিল! মনে হইতেছিল, সে যেন কল্পলোকে প্রবেশ করিয়াছে! বা কোনো এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী পড়িতেছে—তার আগাগোড়া thrill। কিংবা স্বপ্ন দেখিতেছে!...

মা কহিলেন—তিনি যদি বলে থাকেন, তাঁর জ্ঞান লোক—বেশ, থাকো...

মা প্রমথকে আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, করিয়া কহিলেন—তোমার জিনিষ-পত্র ?

ঠিক! প্রমথ কহিল—ষ্টেশনে রেখে এসেচি!...

মানে, একটা গুচ্ছ শুনেছিলুম, নবীন বাবু না কি দেশে নেই...তাই ভাবলুম, বাড়ীতে কেউ আছেন কি না...

মা কহিলেন—এ বেশার এখানে থাক তো ?

প্রমথ কহিল—না, এ বেশার আর আপনাদের কষ্ট দেবো না। ষ্টেশনে যেমন করে হোক...ষ্টেশন-মাষ্টাবটি ভারী ভয়লোক। তার সঙ্গে আপনায় চায়েচ...

মা সে-সব কথাই কর্পাত না করিয়া কহিলেন,—তা বেশ, এখানেও আমাদের কোনো কষ্ট হতো না...

প্রমথ মার পায়ের কাছে খাড়া মনত হইয়া প্রশ্ন করিল, করিয়া কহিল,—এখন তাহলে আসি।

সে উঠিয়া বাহিরে আসিল। উঠানের কোণে কিশোরী বসিয়া তখন কাঁচা চালাইতেছে। তার দৃষ্টির সহিত প্রমথর দৃষ্টি আবার মিলিল...

পথে আসিতে ঘাম দিয়া যেন জ্বর ছাড়িল। এ কি অমাহুয়িক দুঃসাহস! ভাগ্যে কোনো পুরুষ ছিল না। থাকিলে পুলিশের তাতে...

না, এ বোমাল গল্পের পাতাতেই সাজে!...এ কথা মৃণালবে প্রকাশ পাইলে...

দিদি! দিদির আশ্রয়-কুটুম্বের দল...

প্রমথ শিহরিয়া উঠিল...না, এ দেশ ছাড়িয়া আজই পলায়ন করিয়া...!

খাইতে বাসিয়া দিদির কাছে বিনায়েব পালা গাছির উপক্রম করিতে দিদি কহিল,—কলকাতায় ফিবে কি রাজ্য জয় করবি ? শুনি!

প্রমথ কহিল,—গাজ্য-জয় নয়, তবে সমিতির মিটিং-গুলো...

দিদি কহিল,—তোর মিটিংয়ের কথা আর বলিসনে! ও-সব শুনে হাড় জ্বালা কবে!...তোর গাজুলি-মশাই এক দিন কম জালায়নি আমার ঐ মিটিং করে। ওতে কি লাভ ?

লাভ যে নাই, প্রমথ তা জানে। তা ছাড়া এ্যাডভেঞ্চারের যে বাজটুকু আজ এই পল্লী-প্রান্তে বুনিয়া আসিয়াছে...কিশোরীর চোখে সেই কুতূহলী দৃষ্টি...

গল্প হইলে এ-প্রত্যেক চমৎকার ভাবেই না 'ডেভেলপ' করা চলিত!

সে অনেক ভাবিয়াছে! উপস্থাসে মস্ত একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয়-স্বজন, বা পাঁচজন প্রান্তবেশীর চুলের টিকি কোথাও দেখা যায় না! অথচ বাস্তব জীবনে এদের ভিড়, এদের কলরব এমন বিশ্রীভাবে রোমান্সের স্বর কাটিয়া দেয়! উপস্থাস হইলে ঐ বাড়ীটির কোনো দিকে লোক-জনের বসতি থাকিত না! থাকিলেও তারা

এ-দিকে চোখ তুলিয়া চাহিত না! পদে পদে লক্ষ্য কৈফিয়ৎ চাহিত না! উপজ্ঞাসেব হুনিয়া ধু-ধু মকব মত... আর সেই মকবর এক প্রান্তে আমল ওয়েসিসের মত বিবাক করিত শুধু ঐ নবীন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীখানি!—

দিদির কাছে সে বলিয়া বসিল,—তোমাদের এ গাঁয়ে নবীন ভট্টাচার্য্যর বাড়ী কোথায়, জানো দিদি?

দিদি কহিল,—না। গাঁয়ের সঙ্গে আমার ভাগী সম্পর্ক কি না।

প্রমথ কহিল,—তুই জানিস রে, নিতাট?

নিতাট তখন স্বগভীর মনোবোগে কাঁচামিঠা আম খাটতেছিল, কহিল,—না।

দিদি কহিল,—এবার মস্ত মুকবির পাকডেচিস বটে... নিতাট। হুঁ!

প্রমথর যাওয়া হটল না! হয়তো যাটত। কিন্তু সেই কিশোরীর দৃষ্টির বাঁধন...।

অথচ ওদিকে যাটতে পা সবে না। এতক্ষণে হয়তো সব বহুস্ত্র দাঁখিয়া গিয়াছে।...পাডার্গী...তাকে লইয়া নানা কলরব উঠিয়াছে। দোকানদার কাছে যদি ডাব খাওয়াব কথা শুনিয়া থাকে?

সাবা দিন প্রমথ বাড়ীর বাতিব হটল না। বড় দূবের ব্যবধান। বড় বড় ছুটা: মাঠের পর নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ—বুও পাডার্গী! সহর নয়...যে, পাশের বাড়ীর সন্ধান পাশের লোক বাথে না!...যদি জানাঝনি হয়...?

সন্ধ্যার পর মনকে কিন্তু ধরিয়া রাখা গেল না। খেজুর ঝোপের পাশ দিয়া ফালি চাঁদ ঝাঁকি দিবামাত্র প্রমথ পথে বাতিব হটল। দিদি কহিল—কোথায় চলেছসু রে?

প্রমথ কহিল—সাবা দিন বেকুটিনি...একটু ঘুরে আসি।

দিদি কহিল—দেখিস, পথ ভুল কবিসু নে।

—না—না...

প্রমথ আসিল সেই পথে...

নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহে ঐ প্রদীপের আলো দেখা যায়। প্রমথ আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল, ডাকিল,—মা...

ভিতর হঠাতে প্রশ্ন হটল—কে গা? সঙ্গে সঙ্গে সেই মেয়েটী আসিয়া দ্বার খুলিল।

প্রমথর মাথাব বন্ধ ছলং কবিয়া উঠিল। কোনমতে গলা সাফ কবিয়া সে কহিল—মা আছেন?

কিশোরী কহিল—আছে।

প্রমথ কহিল—আমি এসেছিলুম। মানে, তাঁকে একটা কথা বলতে...

—আজুন...

প্রমথ গৃহ-মধ্যে আসিল। মা কহিলেন—কি বাবা?

প্রমথ কহিল—মাজ্জ খাব আশ্রমাদের কষ্ট দেবো না, তাই বলতে এসুম। ঐখানে ষ্টেশনেই আছি...যদি অসুবিধা হয়, আসবো। তখন যেন ভাড়িয়ে দেবেন না...

বহু প্রয়াসে প্রমথ মুত হাসিল। মা হাসিলেন না, গম্ভীর কাণ্ড কহিলেন,—আচ্ছা।

মা চলিয়া যাটতেছিলেন; প্রমথ কহিল,—এক গ্লাস জল দেবেন মা?

মা ডাকিলেন,—ওরে মেনি, এক গ্লাস জল এনে দে তো...

মেনি কহিল,—যাট।

মেনি গ্লাস আনিল, প্রমথ জল পান করিল। ঘরে একটা কেবোসনের চিমনি জ্বলিতেছিল। টেবিলের উপর একখানা বাউলা বই পড়িয়া আছে। প্রমথ কহিল,—এ বাউলা...আপনি বাউলা?

মেনি কহিল—না,—বাবা বাউলা।

প্রমথ কহিল—আপনি এশাঙ্ক শেখেন না কেন? মুহু হাসিয়া মেনি সলজ্জভাবে মাথা নামাইল। শোভা যা হটল...

দেখিয়া প্রমথ একটা নিশ্বাস ফেলিল।

মেনি চলিয়া যাটতেছিল, প্রমথ কহিল—এ বই...আপনি পড়তেন?

মেনি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

বইখানা হাতে লইয়া প্রমথ দেখে, পরমানন্দ পাঁড়ের লেখা গল্পের বই—“তিন তালি”। সজ্জ বাতিব হইয়াছে। পাঁড়ে বহু লিখিয়া খ্যাতি লাভ কবিয়াছে, অসাধারণ! “সুচরিত্রা,” “গান্ধারী,” “নবনী,” “মাবু চাবুক” প্রভৃতি হালেব মাসিকগুলো আছে। সে খ্যাতির প্রাক্ষরানিতে ভরপুর।

প্রমথ কহিল—বেশ বই না?

ঘাড় নাড়িয়া মেনি জানাইল, হাঁ।

প্রমথ কহিল,—এই পরমানন্দ পাঁড়ে আমার বন্ধু... মানে, আমরা একই দলেব...অর্থাৎ আমাদের লেখা পরস্পরকে না দেখিয়ে ছাপতে দিই না।

মেনি কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রমথর পানে চাহিল। প্রমথ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝল, বুঝিয়া কহিল,—আমিও লিখি। গল্প নয়, কবিতা। গল্প লেখা এবার শুরু করবো, ভাবছি। মানে, কবিতার ছন্দ মনে ভালো করে না এসলে গল্প লেখা উচিত নয়। গল্প আর কবিতা—হৃদের মূলে বড় তফাৎ নেই—একটাকে মিত্রাক্ষর ছন্দ, অপরটাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলা চলে।...

মেনি বেশ মনোযোগ দিয়া কথাগুলো শুনিতেছিল।...

প্রমথ কহিল,—আপনি কখনো লেখবার চেষ্টা করেচেন?...

মেনি কোনো জবাব দিল না।

প্রমথ কহিল—লেখা উচিত। মেয়েরা লিখতে শুরু করলে, সে-লেখার কাছে পুরুষদের লেখা হার মানবে! অন্তরের বথার্থ্য যে-কথা, তা লেখবার শক্তি আছে শুধু মেয়েদেরই!...এই দেখুন না, সম্প্রতি ঐ চারগী মিত্র, শোষিত সেন, কানাড়া পণ্টনবীশ, উদ্ভাদিনী সাহা—এঁরা যে লেখা লিখতে শুরু করেচেন, আঃ, লেখায় যেন আগুন ছুটে! সে আগুনে মেয়েদের ঘোমটা, অন্দরের পাঁচিল, জানলার পর্দা—সব একেবারে ছ-ছ করে পুড়ে যাচ্ছে... .

প্রমথর মুখের কথায় এবারে বন্টা নামিয়াছিল। এ সব কথা তার element! পাড়া-গাঁয়ে দিদির কাছে আসিয়া এ সব কথা দিদির কাছে বলিতে পারে না! এ সব কথা শুনিবার লোক এখানে কোথায়? কাজেই এতদিন রুদ্ধ ছিল! কলিকাতার আসরে তাদের কথাবার্তা যে চলে, তা এমনি রসালো। আজ এই কিশোরী বয়সের স্পর্শে সে সব কথা...চন্দ্রালোকে নদীর জল যেমন উজ্জ্বলিত হয়, তরঙ্গিত হয়, তেমনি...

এই কথার তরঙ্গে বহু কথা সে বাকিয়া চলিয়াছিল। মাঝবে মাঝবে ভেদ নাই—নর-নারী বাহা চাহিবে, তাহাই করিবে। কিসের নিষেধ? সে নিষেধ কে তুলিয়াছে? পরিণত বসিক মন সে নিষেধ মানিবে কিসের জ্ঞান? না-জানা পথিক যদি দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তো কিশোরীর উচিত, তাকে প্রাণের ঘরে প্রবেশ করিতে দেওয়া! নহিলে ঘরে-বাহিরে বোগ রচিবে কেন? এমনি বহু কথা...

আর মেনি...? অত্যন্ত কুঠা-ভরে চোবের মত দাঁড়াইয়া সে-কথা শুনিতেছিল!...

সহসা মা ডাকিলেন,—মেনি...

—বাই মা...

মেনি চলিয়া গেল। প্রমথ চূপ করিল, যেন গ্রামোফোনের রেকর্ড ফশ্ করিয়া বন্ধ হইল।

একটু পরে মেনি ফিরিল; ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—মা বললে, আপনি কি এইখানে থাকবেন?

একটা নিশ্বাস! নিশ্বাস ফেলিয়া প্রমথ কহিল,—না, কেন আর আপনাদের কষ্ট দি?...তবে নবীন বাবুর সঙ্গে দেখা হলো না...সেজ্ঞ আমার ক্ষতি হচ্ছে। অর্থাৎ...

৫

পরের দিন। বেলা প্রায় আটটা। এক হাঁটু ধুলা মাখিয়া ডাক-পিয়ন আসিয়া একখানা টেলিগ্রাম দিয়া গেল। প্রমথ বাহির হয় নাই। দিনের আলোয় পথে বাহির হওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে! কোনো দিক দিয়া যদি মেনি বা তার মার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

টেলিগ্রাম পড়িয়া সে দিদির কাছে কহিল,—গাঙ্গুলি মশায়

বাবার জ্ঞান তার করেচেন গো! অসুখ-বিসুখ নয়। তবে হঠাৎ বদলি হচ্ছেন...চটপট যাওয়া দরকার!

দিদির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই গরমে বদলি! দিদি কহিল,—কোথায় বদলি, লিখেচে?

প্রমথ কহিল,—না...

দিদি কহিল,—একবার আক্কেলখানা ছাপো। সে কথাটা জানাতে হয়...যে, আমি বুঝতুম!...তুই বাবি রে প্রমথ আমার সঙ্গে?

অল্প সময় হইলে প্রমথ মহানন্দে সহযাত্রী হইত! কিন্তু এখন? কাল সন্ধ্যায় মেনিদের বাড়ী অমন আলাপ জমিবার পর? না, এখন যাওয়া চলে না। দিদি চলিয়া গেলে কোনোমতে যদি এ-গৃহে আরো ছ'চারি সপ্তাহ থাকিতে পারে তো বড়ইয়া যায়!...যে প্লট ফাঁদিয়াছে, তার ডেভেলপমেন্ট...

কিন্তু তা হয় না! কি বলিয়া থাকিবে?

হেদিন গোছগাছ করিতে সময় কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব বাতির হইতে পাবিল না।

পবেদ দিন বৈকালে দিদিদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া প্রমথ কহিল—বাঃ! আমার একজোড়া পাম্পশু তোমার ওখানে ফেলে এসেছি দিদি...

দিদি কহিল—উপায়?

প্রমথ কহিল—থাক গে... তবে কি না নতুন—এখানে আসবার সময় কিনেছিলুম।

দিদি কহিল—এই নে চাবি। জুতোজোড়া বার করে চাবি সঙ্গে নিয়ে বাস। তার পর কলকাতা থেকে ডাকে রেজেক্ট্রী কবে আমায় পাঠাস। কোথায় বাই আগে জানাবে, তার পরে—বুঝি?

বাড় নাড়িয়া প্রমথ জানাইল, বুঝিয়াছে।...

দিদির ট্রেন ছাড়িয়া দিলে ষ্টেশনে আরো কিছুক্ষণ থাকিয়া প্রমথ দিদির গৃহে ফিরিল। দ্বারের কাছে দিদির এক জাতি-জাঠখন্ডর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন; তিনি কহিলেন,—ফিরলে যে, বাবাজী?

প্রমথ কহিল—কি সব গুছোতে হবে—দিদি বলে গেল...

জাঠ-খন্ডরটি চিরদিন পল্লীগ্রামে থাকেন—সহরের বাঁচ জানেন না, বলিলেন,—আমাদের ওখানেই রাত্রে তাহলে থায়ে...

প্রমথ কহিল—আজ্ঞে না। এখানে আমার একটা নিমন্ত্রণও আছে—রাত্রে...

—তাহলে মিছে বলা। তবে বাড়ীতেই ফিরচো তো নিমন্ত্রণ রক্ষা করে?

মৃদু হাস্তে প্রমথ কহিল,—দেখি।

মনের মধ্যে যেন বসন্ত আগিয়াছে। কত স্বরে কত পাখীর কুহন চলিয়াছে!...

সন্ধ্যার পরে প্রমথ চলিল নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহের পথে!...

সেই দোকান! দোকানের সামনে মস্ত ভিড়। সর্বনাশ! সে ভিড়ের মধ্যে তার পরিচিত সেই ছুটি ভক্ত...নিতাইয়ের মারফৎ যাদের সঙ্গে পরিচয়...

ভক্ত কহিল,—এদারে?...

প্রমথর বুক কাঁপিস, পা টলিল।

প্রমথ কহিল,—একটু দরকারে...

হু-নম্বর ভক্ত কহিল,—ঠরা যে সব চলে গেলেন—

ছোট্টা কোথায় বদলি হয়েছে না?

ছোট্ট ভগ্নীপতির ডাক-নাম।

প্রমথ কহিল,—হ্যাঁ...

এক নম্বরেখটি কহিল,—আপনাকে বুঝি ছ'চার দিন থেকে যেতে হলো?

প্রমথ কহিল,—হ্যাঁ...

তারা নড়িতে চাড়ে না, অথচ বাঁক ঘুরিলে সেই বাড়ী। ইহার যদি সঙ্গে যায়?...

সে কহিল,—আপনারা বুঝি বাড়ী যাচ্ছেন?

ভক্ত কহিল,—না। আমাদের আজ এ্যামেচার থিয়েটার আছে...হু'জনেব দেপা নেই, তাই এমিকে এসেচি বিধুকে ধরে। বিধু নেই...তাকে না নিয়ে যেতে পারচি না।

প্রমথ কহিল,—হুঁ...

ভক্ত কহিল,—আপনার দরকার কার কাছে?

দ্বিতীয় ভক্ত কহিল,—কত দূরে যাবেন?

টোক গিলিয়া প্রমথ কহিল,—তা প্রায় ক্রোশখানেক...

—কার বাড়ী?

এত জেরা! বিপদও কম নয়! প্রমথ কহিল,—বাড়ী নয়। মাঠ। ধানের মাঠ আছে না? তাতেই...। মানে, পাটের চাষ, সরষে, তিশি, ছোলা...

এমনি কি-সব মাথামুণ্ড বকিতে বকিতে প্রমথ চলিয়া গেল—নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ ছাড়িয়া বহু দূরে...নবীনের গৃহের দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে চাতিয়া গেল—বাড়ীর দ্বার খোলা...ভিতরে একটা অক্ষুট কলরব...

সামনে দাঁড়ানো চলিল না, ভক্ত ছুটি অদূরে বহিয়াছে। অথচ মন ঐ বাড়ীটার কাছ ছাড়িয়া বাইতে চায় না। উপায় কি? পথ ধরিয়া সোজা সে চলিয়া গেল—দৃষ্টি সেই রোয়াকে।

এমন সন্ধ্যা!...হায়, চাদের এই আলো...নবীনের গৃহে নবীনতর আলাপ! বাস্তব জীবনে রোমালে এত প্রমাণ বাধা! বাঙালী কি করিয়া মাছুষ হইবে?

বুকে আগুন বহিয়া পাগলের মত পল্লীর পথে বহুক্ষণ ঘুরিয়া প্রমথ আবার যখন এ-পথে ফিরিতেছিল, তখন নবীনের গৃহ-দ্বার বন্ধ। চারিদিক নিশুতি। মুদির দোকানে আলো জালিয়া মুদি দিনেব কেনা-বেচার হিসাব মিলাইতেছে। দূবে মিশ্র একটু বাজধ্বনি! প্রমথ বুঝিল, বিধুকে তাহা হইলে পাওয়া গিয়াছে, ওদিকে তাই এ্যামেচার থিয়েটার অভিনয়ে মাতিয়াছে!...

সে...?

ভাগ্য!

৬

রাত্রে বিছানায় শুইয়া সে মাথায় নানা প্লানের আদ্যুত চকিতে লাগিল। কাণাকাণি ও আইন বাঁচাইয়া কি করিয়া...

সকালে মুখ-হাত ধুইয়া স্নান সাবরিয়া আবার সে বাস্তব হইল। নবীন ভট্টাচার্য্যের গৃহ। আবার সেই ভক্ত...আঃ! ভক্তটি এক বাশ আশুগাওড়ার ডাল ভাঙ্গিয়া গৃহে ফিরিতেছে, তা'সয়া ক'হিল,—দাঁতন হবে।

আব কোনো কথা নয়। প্রমথর বুক আবার সেই উদ্ধত মুণ্ডব! কিন্তু...খুব বাঁচিয়া গেছে! ভক্ত দাঁড়াইল না।

এখানে ভিড় থাকে না। আজও ছিল না। প্রমথ আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল,—মা...

মেনি আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, কহিল,—আমুন...

হাসিয়া প্রমথ হবে আসিয়া বসিল।

মেনি কহিল,—বাবা এসেচে কাল সন্ধ্যার সময়...

বাবা! কাণে বেগ বাজ হাঁকিল! প্রমথর মুখ চকিতে বিবর্ণ পাণ্ডুর! অর্ধক্ষুট হবে সে কহিল,—কোথায়?

মেনি কহিল,—ষ্টেশনে গেছে আপনার খোঁজ করতে...

—হ্যাঁ! মুখ এমন ফাঁকাগে যে মেনির লক্ষ্য এড়াইল না! মেনির চোখের দৃষ্টিতে বিষম ফুটিল!

কোনোমতে আপনাকে সম্বরণ করিয়া প্রমথ কহিল,—তা হলে আমি যাই। আমার জন্ম ওদিকে তিনি বাস্তব হবেন আবার!...

প্রমথ উঠিয়া পড়িল। আর বসে না। এখন যদি নবীন ভট্টাচার্য্য...

সে দাঁড়াইল না। মোড় বাঁকিবে, এক জন ভক্তলোক কহিলেন,—আপনি আমার খুঁজেন?...

প্রমথর আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কহিল,—না...

—আমার বাড়ী থেকেই তো আসছেন?..নবীন... নবীন—আমি নবীন ভট্টাচার্য্য।...

এ প্রশ্নের জবাব নাই। জবাব চলে না। এ সেই

অবস্থা...যে অবস্থায় অতি-বড় নাস্তিকও কাঁপিয়া মনে মনে ডাকে,—ঠাকুর, ঠাকুর...

প্রমথ কহিল,—তাহলে নামের ভুল করেচি।

নবীন হাসিল, হাসিয়া কহিল,—আমুন। ভুল হোক, তবু আমার বাড়ীতে এসেচেন যখন...

নবীন ছাড়িল না। প্রমথকে আসিতে হইল।

নবীন ডাকিল,—মেনি...

মেনি আসিল, কহিল,—ইনি...

নবীন কহিল,—উনলুম, আপনি কবি। 'বীশবেড়ে গেজেটে', না 'নবডঙ্কা' কাগজে আপনার লেখা ছাপা হয়।

প্রমথর বুকের মধ্যে যা হইতেছিল...মনে মনে সে ভাবিতেছিল, সীতার মত ডাকিতে পারিলে, বুঝি, মা-বসুমতী আজো বুক কাঁড়িয়া সে-বুকে মাটির মানুষকে আশ্রয় দিয়া তার দুর্গতি হরণ করিবেন!

নবীন ডাকিল—মেনি...

মেনি কহিল,—কেন?

নবীন কহিল,—মাছ ধরতে বলে দে, বড় দেখে। এত বড় লোক অতিথি...স্বাগতিব করা চাই...

মেনি চলিয়া গেল।

স্তব্ধ ঘর। বাহিরে আমড়া গাছের ডালে বসিয়া একটা কাক ক্রমাগত জড়িত অর্ন্ত রব তুলিতেছে, আব গাছের ডালে মাঝে মাঝে আক্রোশে, না, বেদনায় সোঁট হুঁকিতেছে!...

সহসা বাহিরে কাব কণ্ঠস্বব,—সত্যি?...

সঙ্গে সঙ্গে উত্তব,—ই্যা...

পরক্ষণে ঘরে উদয় এক প্রোটা নারীর বিরাট বগু...কালো রঙ...! দেখিলে মনে হয়, মাসিক-পত্রের অফিসের সামনে বসাইয়া রাখি, কাকলী-কবির দল সম্পাদকের দ্বাবে সনেট বা লিরিক লইয়া ঘেষিতে পারিবে না!...

প্রোটা আসিয়া প্রমথকে ভালো রকম দেখিয়া পরথ করিয়া কহিল,—ও মা, তাই তো! তা দাদা...

প্রমথর হাত ধরিয়া প্রোটা প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রমথর চেতনা বিলুপ্ত হইতেছিল!

প্রোটা কহিল—আমার নাতনীকে বিয়ে করে পালিয়ে

বেড়ানো, একি ভাস হচ্ছে, দাদা! হলোই বা কালো, হলোই বা পাগল-ছাগল! মানুষ তো! তোমরা আছো, ভাই, মোমাংসা করে দাও, নশ্বিট...

প্রমথ কাঁদ-কাঁদ...এ আবার কি কথা!

হাসিয়া নবীন কহিল,—না, না, তোমাসা নয়, ঠানদি। ইনি কবি। তা মুখিল এ ক্ষেত্রে কি হয়েছে জানেন প্রমথ বাবু? আমার জীব পরিচয় জানেন না? ওর নাম পদ্মাবতী দেবী,—যিনি উপগ্রাস লেখেন...লেখিকা পদ্মাবতী দেবী। এই উপগ্রাস লিখে সংসার চালাছেন। আমি কারবারে ফতুর, দেদার দায়ে ইন্সপেক্শন নিতে চলেছি। আপনার কথাবার্তা শুনে আমার জীব কেমন সন্দেহ হয়েছিল! তা ছাড়া আপনাকে এরা ছোট্টর ওখানে দেখে এসেচে কি না। ছোট্ট আবার সম্পর্কে আমার সম্বন্ধী...কাজেই আপনার কথায় প্রথম দিন থেকেই এঁদের বিশ্বাস হয়নি!...আমার জীব বলছিলেন, রোমাঙ্গ! ছোকরা বয়স। গ্রামের এক কোণে আমার ঘর! আর...

নবীন মেনির পানে চাহিল। মেনি কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল...মৃদু হাসির আভাষ তার মুখ উজ্জ্বল!

নবীন কহিল,—আমি নিকশেশ হইনি সত্যি। একটা মামলার ডিক্রী ছুরি উঁচিয়ে ছিল...তাই সে টাল সামলাতে গেছলুম! বাঙালীর ঘরে রোমাঙ্গ আজ পর্যন্ত ঘটতে দেখলুম না, প্রমথবাবু। গল্পে-উপগ্রাসে আমার জীবও এমন কথা লেখেন...! খেয়াল...লিখুন!...আসলে এখানকার মাটিতে ও-ব্যাপাব অসম্ভব! তা ছাড়া মেনির বিয়ের ঠিক হয়ে আছে। ছোট্টর এক মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো...লাহোরে প্রফেশরি করে। তাদের কথায় মেয়েকে গান-বাজনা শেখাচ্ছি! ও-বিভে আমার একটু আয়ত্ত আছে কি না...আর।

প্রমথ কোনোমতে নবীনের পানে চাহিল।

নবীন কহিল,—লেখার উপব মানুষের আর তেমন শ্রদ্ধা-সম্মত নেই। লেখক এখন কে নয়? কবিতার গল্পে বাঙালীর মাথা এখন ঠাশা যে তাদের...বুঝলেন...?

আর বোকা? প্রমথর বুদ্ধি তখন কোথায় উঠিয়া যাইতেছিল...

# বেঙ্গল বেহার কাটলারি

রাত্রি প্রায় দশটার পশ্চিমের এক জংসন-ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিলাম। ফিরিব কলিকাতায়—মেল আসিবে রাত্রি প্রায় দুটার। এতখানি সময় ষ্টেশনে বসিয়া কাটানো সহজ ব্যাপার নয়! একটু ঘুমাইব, উপায় নাই। রয়স হইয়াছে। ঘুমের আয়োজন কবিত্তে খানিকটা সময় লাগে—ষ্টেশনের কোলাহল-কলরবে সে ঘুম পাকিতে হিন ঘণ্টা লাগিবে, ততক্ষণে মেল ধরিবার উদ্যোগ!

ছইলায়ের বুকষ্টল হইতে একখানা রোমাঞ্চকর ডিটেকটিভ উপন্যাস কিনিয়া ওয়েটিং-রুমে আসিয়া ঢুকিলাম। ঘবটি জন-হীন নয়। চার-পাঁচজন বাঙালী ভঙ্গলোক গোল-টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। কেহ সিগার টানিতেছেন, কাহারো হাতে খপরের কাগজ, কেহ বা ঘাড় গুঁজিয়া চক্ষু মুদিয়া তন্দ্রাসুখ উপভোগ করিতেছেন!

আমি আসিতে নিমেষের জন্ত চাকল্য ঘটিল। দেওয়ালের দিকে ইঞ্জিচেরাবখানা শূন্য পড়িয়াছিল। বিস্ময়ে-আনন্দে সেখানা দখল করিয়া তাহাতে আড় হইয়া ওইয়া নভেল খুলিলাম।

একটু পরেই মধ্যে মধ্যে উপলব্ধি করিলাম—ইঞ্জি-চেরাবের গদি শূন্য থাকার হেতু। ছারপোকাব বংশ বোধ হয়, এ মুল্লকের সকল খাট-পালঙ ছাড়িয়া এইখানে আসিয়া সমৃদ্ধ উপানবেশ স্থাপন কাবয়াছে! বুদ্ধিমান জীব! কত জাতিব বিচিত্র শোণিত-পানের স্রবোগ—তারা এখানে hall of all nations পাইয়া বর্তাইয়াছে!

বাতিরে গিয়া হুঁখানা খবরের কাগজ কিনিয়া আনিলাম। সেই খবরের কাগজে ইঞ্জিচেরাবের বেজাংশ ছ-তিন পৃষ্ঠ মুড়িয়া আবার নভেল খুলিলাম।

লেখা বটে! পাঁচখানা পাতা উল্টাইতে মনটাকে যেন শুষিয়া লইল। ঘটনার গতি চলিতেছে বেগে—রহস্যের পর রহস্যের মাইল-পোষ্ট অতিক্রম করিয়া। কোথাও সে গতির বেগ কমিতে জানে না—যেন non-stop run!

কিন্তু নিখাসে লাইন ধরিয়া মন ছুটিয়া চলিল। বাহিরের বিশ্ব ক্রমে পর্দায় ঢাকিয়া অমুভূতির অন্তরালে অদৃশ্য হইল। জগতে রহিল শুধু দুটো খুন—পাঁচটা ইয়ালী-জড়িত নয়-নারী; আর তাদের পিছনে ছুটন্ত এক দুর্ধর্ষ ডিটেকটিভ! তার ভয় নাই, ডর নাই,

ধিধানাই! কলের দম-খাওয়া পুতুলের মত নিজের গোঁয়ে চলিয়াছে, চলিয়াছে!

দেড়শো পাতা অতিক্রম করিবার পর ঘাড়ের অসহ্য জ্বালা অনুভব করিলাম। চমক ভাঙ্গিল। উঠিয়া অভিনিবেশ-সহকারে দেখি, ছারপোকার একদল ছুরন্ত ফৌজ কোনোমতে কাগজের ‘ওয়ার্ল’ ঘুরিয়া আশ্চর্য্য অধ্যবসয়ে আমার স্বদেশ আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। অদ্ভুত organisation! উঠিয়া পীঠ-বস্ত্র খুলিয়া নথ-বর্ষণে ঘাড়ের চামড়া ছিঁড়িয়া অশান্তি নিবারণ করিলাম; পরে দিয়াশলাই জ্বালিয়া কতকগুলো ছারপোকার নিধনান্তে কাগজখানাকে স্রবিস্তৃত করিয়া দুর্গন্ধটুকু নির্যাপদ করিলাম। বসিতে বাইতেছি, একজন ভঙ্গলোক কহিলেন,—ছারপোকা খুব বেশী?

আমি কহিলাম,—উঃ!

ঐ একটি কথায় তিনি বুলিলেন, সংখ্যা কত। তাহা অনুভব করিলাম শ্রোতার মুখ-চোখের ভঙ্গী দেখিয়া।

ভঙ্গলোকটি নবাগত। আসনের অভাবে ঘরের মেঝের বাক্স-প্যাটরা বাখিয়া তাহার উপর তিনি চড়িয়া বসিয়াছেন। ভঙ্গলোক কহিলেন,—কি বই পড়েন? ডিটেকটিভের গল্প?

কহিলাম,—হ্যাঁ।

তিনি বলিলেন,—ভূতের গল্প-টল্প কিছু পাবো এখানকার বুকষ্টলে?

কহিলাম,—জানি না।

গোল-টেবিলের প্রান্তস্থিত জর্জনক ভঙ্গলোক কহিলেন,—পাবেন। ভূত নিয়ে ওদেশে এখন খুব বেগে চর্চা চলেছে। কথটা বলিয়া তিনি হাসিলেন।

প্রথম বন্ধু কহিলেন,—তামাসার কথা নয়। ভূতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় যাদের ঘটচে, তারা জানে, কি মর্যাদাসিক সত্য ঐ ভূতের ব্যাপার!

চট্ করিয়া ঘরের হাওয়া ফিরিয়া গেল। নিজা-ঘরের সে স্তব্ধ আচ্ছন্ন ভাব কাটিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন। প্রথম বন্ধুটি কহিলেন,—আপনারা বোধ হয় জীবনে কেউ ভূত দেখেন নি এবং তার অস্তিত্বে বিশ্বাসও করেন না?

সকলের মুখে সজোর হাসি উথলিয়া উঠিল।

বন্ধু কহিলেন,—আমি শুধু যে অভিজ্ঞতা লাভ করে



আসি, সে-কথা মনে হলে এখনো সারা-গায়ে রোমাঞ্চ হয়!...এই দেখুন...

ভক্তলোক উঠিয়া ছুই হাত আমাদের সামনে প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। দেখিলাম, তাঁর হাতের লোমগুলো সত্যি খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। কায়দা ডিটেকটিভের রোমাঞ্চকর কাহিনী এইখানেই বই মুড়িয়া চাপা দিলাম। সে কাহিনী হাতে রহিল! এ কাহিনী ভৌতিক, এবং.....

ঘরগুরু সকলে তখন বেশ সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। একজন উহা-ব-মধ্যে চেয়ারখানা টানিয়া ভৌতিক-বন্ধুর কাছে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—জীবনে নিজের চোখে দেখিনি; তবে আমার আত্মীয়-বন্ধুদের মুখে শুনেছি, তাতে ভূত নেই বলে উড়িয়ে দিতে পারি না!...অলৌকিক!

কেহ বলিলেন,—Deep mystery!

আর একজন সুরগভীর একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। ফেলিয়া বলিলেন,—There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy!

ঠিক যেন সেই মধুচক্রে গোষ্ঠ-নিকোপ! সকলেই মৃদু-গভীর গুঞ্জন-বব তুলিলেন।

বন্ধু কহিলেন,—গিয়েছিলুম গুলগাঁওয়ে। ছোটো ষ্টেশন আগে—পীরখান ষ্টেশনে নেমে সাত-আট মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিতে হয়। এককালে ওদিকটা নাকি বেশ সমৃদ্ধ ছিল। ওখানে কামার-মিস্ত্রী আছে। তাদের হাতের কাজ চমৎকার। গুলগাঁওয়ে একটি নদী আছে, সারা বছর বাঁধের গাদায় লুকিয়ে থাকে; বর্ষায় জল একেবারে অঁঠে-অতল হয়ে ওঠে। এখানকার নদীগুলোর দশা-ই তাই!...আমি গিয়েছিলুম গুলগাঁওয়ে—একজন মিস্ত্রীর কাছে। সেখানে ছু'দিন ছিলুম। কোনো গোলযোগ ঘটে নি। কাল ফেরবার মুখে মস্ত বিজাট...

আমরা উৎকর্ণ উদগ্রীব হইয়া বসিলাম।

বন্ধু কহিলেন,—বেলা তখন চাবটে—মিস্ত্রীর ওখান থেকে বেরুলুম। আকাশে মেঘ জমছিল। মিস্ত্রী বললে,—ভরি ঝড় হবে বাবু-সাব! আজ যাবেন না! আমি বললুম, তা হয় না মিস্ত্রী, আজই রাজের ট্রেন আমার ধরা চাই। মিস্ত্রী বার-বার মানা করলে। আমি গুনলুম না—বেরিয়ে পড়লুম। ছু'মাইল আসবার পর হু-হু ঝড় উঠলো। মেঠো পথ—হু'ধারে বন আর মাঠ! মাঠ ফুটিফাটা—জনপ্রাণীর বসতি নেই। মিস্ত্রীর এক কারিগর আমাব এই লগেজ মাথায় সঙ্গে আসছিল। সে বললে, একটা ঝোপের ধারে বস। বাক বাবু! আমি বললুম, বাপ রে! তেপান্তর মাঠ আর ঐ ঝড়!

আমার মাথায় কেমন নেশা জাগলো—গ্র্যাভিটাকায়ের

নেশা! সে ঝড় ঠেলে চলতে লাগলুম। আরো এক মাইল এলুম...পথের ধারে পুলিশের ফাঁড়ি। জরাজীর্ণ কুঁড়ে-ঘর। ঝড়ে তার মাথাটা যেন একবার বাঁধন ছেড়ে উঠে পড়চে, আবার সজোবে সেটাকে কে খুঁটির মাথায় আছড়ে ফেলচে! মিস্ত্রীর লোক সেইখানে আস্তানা নিল! লগেজগুলো ভিজবে? আমি বললুম, তুই বোস, বুষ্টি আসচে! আমি এগুই। বর্ষাতি-কোটটা গায়ে চড়িয়ে আমি সেই ঝড়-জল কখে ষ্টেশনের দিকে এগিয়ে চললুম!

এই পধ্যস্ত বলিয়া বন্ধু চুপ করিলেন; তারপর একটা সিগার বাতির করিয়া ধরাইয়া মুখে দিলেন। আমাদের সামনে কেশটা ধরিলেন। আমবা সিগার লইয়া ধরাইয়া মুখে দিলাম। বন্ধু বলিতে লাগিলেন,—বুষ্টি বেশ জোরেই এলো। বুকখানা কাঁপলো ক্ষণেকের জন্য! ভাবলুম, এ গোয়ার্তুমি না করলেই হতো! বাতাস তার বেগ তখন ভয়ঙ্কর বাড়িয়ে তুলেছে। জলের বড়-বড় ফোঁটা পাটকেলের মত এসে গায়ে বাজতে লাগলো। বাজেব সঘন গর্জ্জন—বিদ্যুতের চমক! যেন প্রলয়ের সীল! গা ছম-ছম করতে লাগলো। মাঠ এ সময় নিরাপদ নয়। বজ্রাঘাতের আশঙ্কা আছে! কিন্তু ফেরা গেল না। খোঁটার সামনে রোখ দেখিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এসেছি! কাজেই সে-দুর্ঘ্যোগে অগ্রসব হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

কিন্তু অগ্রসর হওয়া যায় না। তিন-পা এগুতে পাঁচ-পা যেন কে ঠেলে পিছিয়ে দেয়!

আধঘণ্টা আমার সংগ্রাম চললো...প্রকৃতিব এই ক্রতলীলাব বিরুদ্ধে! সংগ্রামই! হাত-পা ক্রমে ঝিমিয়ে এলো...

সহসা ঝড়কার ভেদ করে বিদ্যুতের আলোর চমক! সে আলোর পথের পাশে দেখি, একটা বাঙলো-ধরণের বাড়ী। মনে পড়লো, মিস্ত্রীর ওখানে যাবার সময় দেখে গিয়েছিলুম—ইনসপেকশন-বাঙলো! নিকপায় হয়ে সেই বাঙলোর ভাঙা ফটকে ঢুকে তার বন্ধ দ্বারে করাঘাত করলুম!...

বার-বার করাঘাত! ভিতর থেকে এক বুড়া চৌকিদার এসে দ্বার খুলে সামনে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা হারিকেন লঠন। লঠনের আলোয় তার বা মূর্তি দেখলুম—শিউরে ওঠবার মত মূর্তি! শীর্ণ দেহ, কোটরগত চক্ষু,—মাঝুখের জীর্ণ ককাল! তাকে বললুম,—রাজে এখানে থাকবো।

তুনে সে এমন বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো! তার ভঙ্গী দেখে মনে হলো, তার বিশ্বাসের সীমা নেই!

আমার সঙ্কল্প অটল দেখে সে বললে,—অর্থাৎ, তার

কথার মর্ম—এ বাঙলো ঝড়-বাদলেব রাতে মোটে নিরাপদ নয়! অশরীরীদের আস্তানা হয়ে ওঠে। তাকে চাকরির দায়ে নিরুপায় চিত্তে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বাহিরের রোয়াকে পড়ে চাকরি রাখতে হয়। তখন তাব চাবিদিক ঘিরে কি কাণ্ডই চলে! এ বাঙলোর লোকে কালে-ভজ্রে আসে।—সাতাব-লোক। তারা বাত্রে কখনো থাকে না! পাশের গায়ে সাতাব-লোকের চিনির কল আছে। সেখানে যাতায়াত করতে কেউ যদি বাঙলোর আসে তো পানিক বসে বিশ্রাম কবে যায়।

সে আরো জানালে...

কিন্তু কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না। এই ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞানের যুগে—যে-যুগে ছবির মানুষ কথা কয়—সে-যুগে ভূত! এর চেয়ে অসম্ভব আর কিছু হতে পারে না। লোকটার গুস্তানী। বাত্রে এইখানে আরামে মুড়ি দিয়ে ঘুমোবে—আমি আস্তানা নিলে ফাই-ফরমাশে ব্যতিব্যস্ত করবো—তাই আমাকে ভূতের নাম করে সরাবার ফন্দি!

আমি বললুম—ভূত-দানাদিত্য যে-ই আসুক বাপু, আমাকে এইখানেই থাকতে হবে। অন্ধকাব পথ। এই জল-ঝড় মাথাঙ্গ করে ষ্টেশনে যাওয়া সম্ভব হবে না!

সে খ' হয়ে দাঁড়িয়ে বইলো—মুখে কথা নেই। আমি আশ্বাস দিলুম,—ভয় নেই! খাওয়া দাওয়ার উৎপাত করবো না। রাত্রিটা শুধু পড়ে থাকবো। বিছানা আছে তো?

ঘাড় নেড়ে সে জানালে,—আছে।

আমি বললুম—বিছানাটা শুধু দেখিয়ে শও!—তুমি যা খুশী করো, আমার আপত্তি নেই।...

লোকটা তবু নেড়ে না—কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বইলো। তার সে-ভঙ্গী দেখে মনে হলো, হয়তো এর পিছনে আরো বিচিত্র কোনো রহস্য আছে! বাঙালীর মন—যেখানে মৌনতা, সেইখানেই সে বিচিত্র গাঢ় রহস্যের সন্ধান পায়।...আমি বললুম—বখশিস মিলবে।...

বুড়ির বেগ তখন বেশ প্রচণ্ড হয়ে উঠেচে—সঙ্গে সঙ্গে মস্ত বাতাসের তীব্র হুকার! বাজ হৈকে যায়—সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আগুনের হলুকা আকাশ চিরে ছুটে আসে—যেন প্রলয়-রাক্ষসীর লক্লকে ভিড়েক মত!

লোকটা নিশ্বাস ফেলে বললো,—বখশিস চাই না, বাবু-সাব!...আজ্ঞন, শোবেন। কিন্তু আমাকে পাবেন না! রাত দশটার পর আমি ঐ ফাঁড়িতে বাবো।

আমি বললুম—কুছ পরোয়া নেই!

ঘরের মধ্যে প্রবেশাধিকার পেলাম। ঘরখানি নেহাৎ ছোট নয়। এককালে সমৃদ্ধ তৈরী হয়েছিল! বড় বড় ক'টা সার্শি—খড়খাড়; একখানা খাট—খাটে বিছানা আছে। দেওয়ালের গায়ে একটা সার্শির টেবিল;

আলমারি। পাশে বাথ-রুম, বাথ-রুমে বাথ-টব, ছোট র্যাক।...

সে বললে,—জলের দরকার হবে?

আমি বললুম,—কিছু জল রাখতে পারো?

সে বললে,—পারি। ইদারা আছে।

লঠন বেখে সে বেরিয়ে গেল। আমি জুতা-মোজা-বর্ষাতি-কেট খুলে, আরাম করে খাটের বিছানায় শুয়ে হাত-পা ছড়িয়ে দিলুম!...

ভাবলুম, ঝরুক আকাশ সারা রাত—ঝড়ের গর্জন হুনিয়াকে ভীত-শঙ্কিত করুক—আমি আরাম-নৌড় পেয়েছি! আরাম, আরাম...!

চৌকিদার ফিরলো প্রায় আধ ঘণ্টা পরে; ফিরে বললে,—রাত্রে তাহলে নিশ্চয় থাকবেন?

আমি বললুম,—নাহলে এ-দুর্যোগে গাছতলায় দাঁড়াবো?

সসঙ্কোচে সে বললে,—পুলিশ-ফাঁড়ি ছিল...

আমি ভাবলুম, সেপাহীদের খাটমল-ভরা খাটিয়া... না বাপু! যদি মরতে হয় তো ভূতের হাতেই মরবো। ছারপোকাকার কামড়ে পলে-পলে মৃত্যু-যাতনা সহ—সে-কষ্ট আমার পোবাবে না।

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে বইলো। তার পব বললে,—কুজোর জল রেগেচি। বাথ-টবে জল আছে। ওদিক বন্ধ করে দিয়েচি। আপ'ন এ-দিককার দরজা বন্ধ করে শোবেন তো?

সঙ্গে টাকাকড়ি ছিল। বললুম,—নিশ্চয়।

সে হতাশভাবে আর একটা নিশ্বাস ফেললো; বেশ বড় নিশ্বাস ফেলে বললে,—আমি ঐ দাওয়াতেই থাকবো। আপনি যখন নেহাৎ থাকবেন—নড়তে পারবো না। বিদেশী লোক—সাতাব-লোক!

চৌকিদার বেরিয়ে গেল...আমি বিছানায় শুয়ে ভাবতে লাগলুম। অনেক কথা মনে আসছিল...

সব চেয়ে বড় কথা—হাতে লোকজন আছে না কি? পয়সা-কড়ি সঙ্গে আছে—বোঝে। হয়তো ফাঁড়ির চৌকিদারদের সঙ্গেও যোগ আছে। মেঝে-ঘরে যথাসম্ভব কেড়ে নেয়—তারপর ভূতের কথা বলে ব্যাপারটাকে চাপা দেয়।

ভূতের নামে প্রাণে চমক লাগেনি, এখন এ চিন্তার শিউরে উঠলুম—সত্যি!...

কিন্তু নিরুপায়! অগত্যা উঠে বড় দরজায় খিল এঁটে লঠনটাকে সার্শির টেবিলে রেখে বিছানায় শুয়ে চক্ষু মুদলুম।

পরিশ্রম কম হয়নি, কাজেই বর্ষার উদ্দাম মত্ত

ছক্কা কাণে এসে বাজলেও কখন ঘুমিয়ে পড়লুম, বুঝতে পারলুম না।

ভক্তলোক এই পর্য্যন্ত বলিয়া থামিলেন। তারপর সিগারে একটা দীর্ঘ টান দিয়া যেন দম লইলেন—দম লইয়া কাহিনীর পুনরাবৃত্তি শুরু করিলেন। বলিতে কি, গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। আমাদের দেহে যোমাঞ্চ হইতেছিল...তবে ভয়ের কিছু নাই, বুঝিতেছিলাম। যেহেতু ভূতের হাতে পড়িলেও ভক্তলোক অক্ষত-দেহ লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছেন!

ভক্তলোক বলিতে লাগিলেন,—অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে-ছিলুম। ঘুম কিসে ভাঙ্গলো, বলতে পারি না। তবে ঘুম ভাঙতে বুঝলুম, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে। গা কেমন ছম-ছম করছিল—চারিদিক গভীর স্তব্ধ। ঘড়িতে সময় দেখি, বারোটা বেজে সতেরো মিনিট। এত রাত্রে পথে বার হওয়া যায় না। উপস্থিত আশ্রয় ছেড়ে পথে বার হওয়া সম্ভব হবে না! আছি বেশ!...

থাকলেও কেমন অস্বস্তি বোধ করছিলুম...মনে হলো, যেন ঘরের মধ্যে কারা চলে বেড়াচ্ছে। ছায়া! দেখা যায় না—কিন্তু বেশ পায়ে চলার একটা শব্দ! লঠন জলছিল। অন্ধকার ঘরে কেউ স্পষ্ট সন্তর্পিত গতিতে চলে বেড়ালে যেমন অমৃভূতি পাওয়া যায়—আলো-জ্বালা ঘরে তেমনি অমৃভূতি বোধ করছিলুম।... এই দেখুন—স কথা মনে হতে আমার গায়ে এখনো এই যোমাঞ্চ...

ভক্তলোক আবার তাঁর হাতখানি প্রসারিত করিয়া আমাদের সামনে ধরিলেন।... কথাটা সত্য।

ভক্তলোক বলিতে লাগিলেন, 'তবু উঠে দাঁড়ালুম। মন তখন—ভয়াতুর না হোক—মনে কেমন একটা অস্বস্তি। ভাবলুম, খড়খড়ি খুলে দি'; শুধু সার্শিটাই বন্ধ থাকুক। তবু কাচের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে আলোয় বাহিরের সঙ্গে একটু সম্পর্ক থাকবে! উঠে সার্শির ভড়কো খুলে—খড়খড়ির কপাট হ'গানা!...

খোলবামাত্র মনে হলো, যেন বাহিরের বারান্দার কাছে মস্ত মজলিশ বসেছিল—আমার অনধিকার-হস্তক্ষেপে তারা যেন চাপা-হাসি সম্বরণ করতে না-পেরে হেসে চট করে সরে গেছে!...

গা কঁপে উঠলো। চকিতে দেখে নিলুম—আপাদ-মস্তক কাপড়ে-ঢাকা পুঁটলির মত কি একটা পদার্থ বারান্দায় পড়ে আছে। মাথার মধ্যে বস্তু ছলৎ করে উঠলো। কিন্তু হাতে সার্শি বন্ধ করে দিলুম।

তবু আর একবার চাইবার লোভ সম্বরণ করা গেল না। বুকটার মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়ছিল—তবু চাইলুম। চাইবামাত্র নিজের এ-ছমছমানিতে নিজেই লজ্জিত-

হলুম। ভূত নয়—চৌকিদারটা আপাদ-মস্তক মুড়ি দিয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে।

ফিরে খাটে এসে বসলুম। মনে হতে লাগলো, বাহিরে বাঙালোর চারিদিকে যেন কারা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে! ...মনে মনে সাস্তনা সংগ্রহ করলুম—গ্রাম্য বিড়াল, শেয়াল, ভাম। নয়তো কোনো নিশাচর পাখী!

শুয়ে চক্ষু মুদলুম। কিন্তু না...

গায়ে আবার যোমাঞ্চ! ক্ষণে ক্ষণে গায়ে যেন হাজার ছাঁচ বিধতে লাগলো—তেমনি অস্বস্তি।

বাহিরে হুটোপাটি দ্রুত...যেন ঝনাৎ কবে বাথরুমের দরজা খুলে কে তার মধ্যে ঢকে আবার সেটা বন্ধ করে দেছে! ভাবলুম—উঠি, নিশ্চয় চৌকিদারটা বাথরুমের দরজা খুলে রেখেছিল। হয়তো এম মধ্যে কোনো যোমাঞ্চ আছে! পল্লীর কোনো আহিরাগীর প্রণয়-রঙ্গ হয়তো!

আমার ঘরের দ্বার গেল খুলে। বাথরুমের দিকে যে-দ্বার...সেইটে। চেয়ে দেখি...

যা' দেখলুম, তাতে নিমেষে যেন পাথর বনে গেলুম। আমার চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গেল।

একজন দীর্ঘাকৃতি ভক্তলোক। গায়ে প্রকাণ্ড আচকান। বেশমী আচকান...মাথায় সাটিনের টুপি। বেশ সুপুরুষ। কাঠ হয়ে আমি বিছানায় বসে...দৃষ্টি পসক তারা...

রূপকথায় পড়েছিলুম, মায়্যা-ছড়ির স্পর্শে জীবন্ত মায়ুষ অচেতন নিম্পন্দ পাষাণ হয়ে যেতো...আমার ঠিক সেই দশা!

কথা কইবার চেষ্টা করলুম! ঠোঁট নড়লো না—কথা মুখে ফুটলো না। হাত-পা সব যেন অবণ, নিথর, নিম্পন্দ।

পুতুলের চিত্র-করা চোখ। সেই চোখের অবিচল দৃষ্টিতে শুধু সেই মূর্তির পানে চেয়ে বইলুম। ঘবটা তখন আতব-খোসবোর গন্ধে মশগুল হয়ে উঠেছে! কি গন্ধ... তীক্ষ্ণ স্পষ্ট। আতঙ্কে বোধ হয় চক্ষু মুদে এসেছিল! কারণ, তীব্র একটা সুস্পষ্ট রবে যেন নূতন দৃশ্য চোখে জাগলো।

দেখি, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ভক্তলোক। তার পিছনে এক নারী। নারী স্তন্যরী তরুণী...নৌল সাটিনের যাগরা পরা। রূপে বিহ্বল ঠিকরে পড়তে!

পুরুষ সবলে নারীর কণ্ঠ চেপে ধরেচে—নারী প্রাণপণে মুক্তির চেষ্টা করচে!...টেবিলের টানা খুলে পুরুষ কিন্তু হস্তে কি-একটা বার করলে! বার করে নারীর অধরের উপর সেটা রেখে সজোরে যেন লাইন টেনে দিলে! বিস্ময়কর করে উঠলো একটা রূপার পাত।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আর্ন্তরব এবং চারিদিক নিমেষে  
আবীরের রঙে রাঙা হয়ে উঠলো।

ভয়ে আমি মুহূর্তে হয়ে পড়লুম। যখন জ্ঞান হলো,  
দেখি, সাশিৎ কাঁচ ভেঙে কবে ভোঁরের খলো। এসে ঘরে  
পড়েছে।...মেঝের রক্তের টেউ বয়ে যাচ্ছে...আর রক্ত  
মেঝে পড়ে আছে একটি টিয়াপাখী হার গলা কাটা—  
পাশে পড়ে আছে...একখানা ক্ষুঃ

এই সে ক্ষুঃ।

ভক্তলোক পকেট হটতে কাগজ মোড়া ছোট  
একখানা ক্ষুঃ বাহির করিলেন; আমাদের সামনে ধরিয়  
বলিলেন,—গুণগাঁওয়ের মিত্রাব তৈরী ক্ষুঃ। আশ্চর্য্য  
ধার। না হলে এক-টানে নাবীর গলাটা কেটে ফেলা  
সহজ কাজ নয়!

শুধু ক্ষুঃ কেন! ছুরি, নকণ, কাঁচি—সমস্ত গুণ-  
গাঁওয়ের মিত্রাবদের হাতের তৈরী। দাম খুব শস্তা!  
ক্ষুঃ—পাঁচ আনা; ছুরি—হ আনা; আর কাঁচি—হ  
পয়সা। তা ছাড়া ছুঁচ, ডাক্তারী লাস্টে! বা বলবেন,  
—আমরা গুণগাঁওয়ে তৈরী কমাছি। বেঙ্গল-বেহার  
কাটলারি ওয়ার্কস—নাম শুনেচেন? আমি সে  
কোম্পানীর Solo অর্থাৎ একমাত্র এজেন্ট এণ্ড  
ক্যানভাসার।...

কি চাই বলুন? লিমিটেড কোম্পানী। কলিকাতায়

ব্রাক অফিস আছে—No ২ Pagla Modi Lane  
Ahiritola,...দয়া করে আপনাদের কিছু কিছু কিনতে  
হবে। সস্তা হবেন কাজ দেখে...তা ছাড়া আমার  
এ জীবিকা!

চটিয়া উঠিলাম,—এমন করিয়া রসভঙ্গ! কহিলাম,  
—ইনসপেকশন-বাউলোয় সে ভূত...?

হাসিয়া ভক্তলোক কহিলেন,—বিজ্ঞাপন...গল্প না  
বললে আপনারা শুধু শুধু দয়া করবেন কেন? চের ক্যান-  
ভাসার চের ব্রিনিষ নিয়ে পথে বেরিয়েচে তো!

প্রবল হান্তাঘোল উঠিল। বেচারী—এতখানি  
সম্মোহিত কবিয়াছে। চুপচাপ বসিয়াছিলাম। গল্প মন্দ  
জমায় নাই। আমাদের গায়েও কাঁটা দিয়াছে!

সকলেই দাম দিয়া হুঁখানা করিয়া ছুরি-কাঁচি  
কিনিসাম। মোটা একটি ভক্তলোক বসিয়াছিলেন।  
তিনি কহিলেন,—বই-টাই লেখেন না কেন?

ক্যানভাসার কহিল,—লিখেচি। তাতে পয়সা হয়  
না। গল্প রচনার শক্তি নিয়ে ক্যানভাসিংয়ে নেমেচি।  
হুঁপয়সা বোজগার হচ্ছে মণায়। বাত্রে ভুতের গল্প জমে  
বলেই এ গল্প...প্রয়োজন হলে বাদশাহী কেছা বসতে  
পারি। এ যুগের triangle-এর গল্পও মজুত আছে।  
সব রদের গল্প বলি..... বসিক বুঝে!

ওদিকে ঘণ্টা পড়িল—সিগ্‌নালের ঘণ্টা। মোট-বাট  
বাঁধিয়া প্লাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইলাম।

# ভূতের বাড়ী

৯

দিদির সঙ্গে স্মৃশীলের জোর তর্ক চলিয়াছিল। নূতনও নাই। এমন তর্ক নিত্য হয়। খুব খুঁটি-নাটি ব্যাপার লইয়া দিদি বিরক্ত হয়, রাগ করে, স্মৃশীল তবু দমিতে চায় না; শেষে দিদির দৈর্ঘ্যের বাধ ভাঙ্গিয়া চোখে জল আসে, স্মৃশীল তখন উচ্চ হান্তে আকাশ ফাটাইয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়!

দু'তিন ঘণ্টা পরে স্মৃশীল ফিবিয়া আসে; দিদি গম্ভীর মুখে সংসারের কাছে মগ্ন! স্মৃশীল কখনো খাঁচায় ভবিয়া ক্যানারি আনে, নয় তো গিনি-পিগ, কিম্বা সাদা ইঁদুর...দিদির অভিমান পলায়, দিদি সোৎসাহে বলিয়া ওঠে,— বাঃ, বেশ তো রে! কত দাম পড়লো?

স্মৃশীল জবাব দেয়,—দশ টাকা...

দিদি টাকা ফেলিয়া দেয়; টাকা হাতে লইয়া স্মৃশীল বলে,—সাত টাকা লাভ হলো।

দিদি ইা কবিতা স্মৃশীলের পানে তাকায়, স্মৃশীল বলে,—সত্যি দিদি, তিন টাকায় কিনেছি, খাঁচা-শুধু...

দিদি প্রশ্ন করে,—তবে দশ টাকা বললি যে?

হাসিয়া স্মৃশীল বলে,—না হলে আমার লাভ থাকে কৈ? খরচ কত, জানো? একটা র্যাকেট কিনতে হবে, টেনিশ-শু এক ছোড়া, বল, চাঁদা...

দিদি বলে,—টাকা-কাড় পাও না কি সহজ-ভাবে চাইলে?

স্মৃশীল বলে,—কত চাইবো দিদি? চক্ষুজ্জ্বা হয় না?

দিদি বলে,—চুরি-বাটপাড়ি করে নিতে চক্ষুজ্জ্বা হয় না, না রে?

স্মৃশীল বলে,—এতে একটা সান্ত্বনা থাকে এই যে, বুদ্ধি-বৃত্তিতে শাণ দেওয়া হয়। Worldly success-এর মূলে হলো এই শাণিত বুদ্ধি!

দিদি পলকের জ্ঞান গুম্ব হইয়া স্মৃশীলের মুখের পানে তাকায়, পরে সন্ত-অনীত পঁপ-পক্ষী ব সেবায় মনোনিবেশ করে; স্মৃশীলও আসিয়া সে সেবায় যোগ দেয়।

দিদি আর ভাই লইয়া সংসার, মাথার উপর আর কেহ নাই। দিদি বিধবা, স্মৃশীলের চেয়ে আট-দশ বছরের বড়; ছেলে-মেয়ে নাই। ছোট ভাইটিকে আজ বারো বৎসর বৃকে রাখিয়া মানুষ করিতেছে। স্মৃশীল এবার বি, এ পাশ করিয়াছে; ল পড়িতেছে; এম, এও সেই সঙ্গে। ওকালতি করিয়া খাইবার প্রয়োজন নাই।

দিদির যা সম্পত্তি আছে, নিবৃত্ত স্বখে দিদিই তার মালিক। এবং...

কিন্তু সে কথা থাক। ওবেলায় যে তর্ক চলিয়াছিল, সেই তর্কের কথা বলি।

দিদির সাণ, ভাই মানুষ হইয়া উঠিল, এবার তার বিবাহ দিয়া...

কিন্তু স্মৃশীলের কাছে সে কথা তুলিলে সে হাসিয়া উড়ায়। দিদি আজ পণ করিয়াছিল, স্মৃশীলকে আর ছাড়া নয়! একটি মেয়ে দেখিয়া বাখিয়াছে, যেমন রূপ, তেমনি শিক্ষা, বাপের তেমনি পয়সা আছে, একালে যেমনটি হওয়া উচিত! স্মৃশীলের কাছে সে কথা তুলিতে তর্ক বাধিল এবং তর্কের ফল নিত্য যেমন হয়, আজও তাই। হাসিয়া স্মৃশীলেব অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং দিদির সেই মুখ গম্ভীর করিয়া গুম্ব হইয়া বস।

রাত্রে স্মৃশীল আহার করিতে বসিলে কথার পূর্বে ভূমিকা ফাঁদিয়া দিদি বলিল,—তোমার বুদ্ধি-শুদ্ধি যদি এমনি ধাবাই হয়, তো বেশ, তুই এখনে থেকে যা খুশী কর, আমি সামনের মাসে হরিদ্বার, নয় স্বাবকা চলে যাবো।

স্মৃশীল বুকিল, এ ভূমিকাব পবে দিদি কোন্ কাহিনী শুরু করবে। সে কহিল,—আমিও তাই ভাবি দিদি, আমার জ্ঞান সত্যি চিরকাল কাঁহাতক বন্দী হয়ে থাকবে! তা, হরিদ্বার-স্বাবকা কেন? বলে তো, রামেশ্বর-সেতুবন্ধ অবধি যাতে যেতে পাবো, ফর্দ বানিয়ে খরচের খশড়া তৈরী করে দি। মায় ট্রেনের টাইম, কোন্ স্টেশনে কখন গাড়ী বদল করতে হবে, তা পর্য্যন্ত।

দিদি কহিল,—থাক, ও কষ্ট তোমার না করলেও চলবে! আমি বেশ ছাঁশিয়ার লোককেই সঙ্গে নিয়ে যাবো। ও বাড়ীর কালীপদ...চাকরি নেই, বসে আছে, সে যাবে, তার মা যাবে—আমাকে কোনো ঋক্তি পোহাতে হবে না।

স্মৃশীল কহিল,—সব তা হলে ঠিক করে রেখেচো?

দিদি কহিল,—রেখেচি। তবে একটা কাজ শুধু বাকী...

—কি?

দিদি কহিল,—তোমার বিয়ে। বিয়ে কবিস, না কবিস, তোমার মর্জি! ভাবনায় আমার ঘুম হচ্ছে না, এমন নয়

...তবে পাড়ায় পাঁচ জনে বলে...এব-পর খারাপ হয়ে যাবি! কি যে হবে...

হাসিয়া সুশীল কহিল,—হঁঃ! বিয়ে আমি করবো না। এই যে স্বচ্ছন্দ আরাম, এ আরাম খোয়ানো আমার পক্ষে অসম্ভব!

দিদি কহিল,—বিয়ে করে লোকে বেয়ারামে ভোগে—না? সংসারে আরাম পাবে বলেই মানুষ বিয়ে করে...

সুশীল কহিল,—সকলেব আরামেব ধারণা এক বকম নয়, দিদি...

দিদি গম্ভীর হইয়া রহিল, সুশীল ঝাইতে লাগিল।

সহসা দিদি কহিল,—কেন বিয়ে করবি না, বলতে পারিস? তোর ভয়টা কিসের?

সুশীল কহিল,—ভয়! প্রথমেই ধরো, এই স্বচ্ছন্দ জীবন-প্রণালীর মধ্যে এক অজানা লোক এলে তাকে জীবনে খাপ খাইয়ে নিতে অনেক ব্যাপারে গুলট-পালট ঘটে যাবে। তার পর তাঁর অস্তিত্ব প্রতি পলে আমার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাঘাত ঘটাবে। আমার মনের সঙ্গে স্ত্রীর মন মিশ পাবে কি না, সেটা ভাবনায় কথা। তাতে risk অনেকখানি...

দিদির গা জলিয়া উঠিল। দিদি কহিল,—মেয়ে আমি দেখেছি। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি শাস্ত...রূপেও লক্ষ্য!

সুশীল কহিল,—এটুকুই বৃষ্টি জৌত্বেব passport ঠাউরেচো? হয়তো সেকালে এটুকুই সব ছিল...কিন্তু কালের গতি...

দিদি কহিল,—ওরে, এ-মেয়ে গান-বাজনা জানে, সেলাই জানে; আর লেখা-পড়ায় ভালো। ম্যাট্রিক পাশ দেবে...বুঝি?

সুশীল কহিল,—হঁঃ...

সে আবার ভোঙ্কনে মনোনিবেশ করিল। দিদি নিজের মনে সংসারের বিচিত্র রঙীন বর্ণনায় তার ক্ষতি-বিবর পরিপূর্ণ করিয়া চলিল...

ভোঙ্কন শেষ হইলে দিদি কহিল,—তা হলে কি বলিস? মেয়েটিকে একবার দেখবি?

সুশীল কহিল,—দেখবো!...তার কথায় অগভীর অভিনিবেশের আভাস!

দিদি কহিল,—হ্যাঁ, ঠাখ্। একালের ছেলে, ডাগর হয়েচিস, নিজের পছন্দ-অপছন্দও আছে। সত্যিই তো, কেন দেখবি না?...ভাখ্...দেখলে 'না' বলবি না...এ আমি জোর গলায় বলতে পারি।

সুশীল কহিল,—বেশ, তুমি যখন বলচো-

দিদি কহিল,—তা হলে কালই...ও আর দেরী করে না। তাবাও আশা করে বসে আছে। এখানে যদি না হয়, অন্তত চেষ্টা দেখবে তো! তাদের হলো মেয়ে...

বলে, সাগর ছেঁচতে হয় যদি পাত্র আনতে, তাও তাদের করতে হবে!

সুশীল কহিল,—কাল নয়, সময় হবে না। কাল আমাদের ক্লাবে টুর্নামেন্ট...নিখাস ফেলতে সময় পাবো না।

দিদি কহিল,—বেশ, তব্বে পরন্তু...

সুশীল কহিল, কাল জবাব দেবো।

দিদি কহিল,—এর আশাব জবাব কি! একবার শুধু গিয়ে দেখে আসা...আরো পাঁচ কাজে ঘোরো তো...এ অর্মান পথ চলেতে এক দাঁকে দেখে নেওয়া...

সুশীল কহিল,—বেশ!...

## ২

পরের দিন সন্ধ্যায় টুর্নামেন্ট সারিয়া সুশীল ফিল। ভারী বাস্ত ভাব। তাব তাতে একখানা বাঙলা খবরের কাগজ।

কাগজ হাতে ভিতবে আসিয়া সুশীল ডাকিল,—দিদি...

দিদি কহিল,—কি রে?

সুশীল কহিল,—এক মডার খপর আছে...

দিদি কহিল,—কি খপর?

সুশীল কহিল,—এই কাগজ পড়ে তাকো...

দিদির সামনে সুশীল কাগজখানা মেলিয়া ধবিল, কহিল,—এই যে...

'মফঃসল' স্তম্ভে বর্জ্জয়েস অক্ষবে ছাপা এক দীর্ঘ প্যাব। দিদি পাড়ল...

কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন হইতে যে পথ পূর্বদিকে পলাশীতে গিয়াছে, ঐ পথেব উপর বহুকালের পুতান একটি দ্বিতল বাড়ী আছে। বাগীর সঙ্গে বাগান, পুকুর; কোনো বস্তবই অভাব নাই। এককালে এক ধনীৰ বাস-ভবন ছিল। পরে নানা কারণে গৃহস্বামীর ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। বাড়ীটি খালি পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি মিল খুলিবার জন্ত ঐ বাড়ী কিনিবার অভিপ্রায়ে এক সাহেব সেখানে গিয়া থাকেন। সকালে সাহেবকে সূত অবস্থায় পুকুর-ঘাটে দেখা যায়। এ ব্যাপারের মৌমাংসার জন্ত সাহেবের এক বন্ধু ঐ গৃহে যান; তাঁর সূতদেহও পবদিন প্রাতে একটা আম-গাছের ডালে লটকানো দেখা যায়। তদন্তে জানা গিয়াছে, ঐ বাড়ী উপদেবতার উপদ্রব-হেতু বহু কাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। গ্রামের লোক রাজি দশটার পর ওবাড়ীর সামনে দিয়া পথ চলে না। আমাদের মধ্যে এমন কোনো সাহসী তরুণ নাই, যিনি আসিয়া এ রহস্তভেদে সমর্থ হন? ভূত নাই বলিয়াই জানি। ভূতের নামে অত্যাচারীৰ দল আস্তানা বাঁধিয়া ভয় দেখায়, আমাদের এমনই বিশ্বাস। অথচ লোকাল-পুলিশ বলিতেছে, ওখানে বদমায়েসের আড্ডা নাই। স্তারাত্ত

রাত্রিকালে ওবাড়ীর সৌমান্য পদার্পণ করিতে ভয় পায়। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন কথা কাণে শুনিব, স্বপ্নে ভাবি নাই! সম্প্রতি আবার নাকি ও-অঞ্চলে গোলযোগ ঘটয়াছে। আশু প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। এদিকে গভর্ণ-মেন্টের ও আমাদের ভ্রাতাটিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

পড়িয়া দিদি কহিল,—পড়লুম। তা কি হবে?

সুশীল কহিল,—কাল আমরা সদলে যাবো কাঁচড়া-পাড়ায় এই রতন্ত্র ভেদ করতে...

দিদির হুই চোখেব দৃষ্টি কঠিন হইল। দিদি কহিল,—ঐ দু-দুটো সাহেব মরেচে, তা জেনে...?

হাসিয়া সুশীল কহিল,—এ যুগে ঐ ভূতুড়ে কাণ্ড তুমি মানতে চাও, দিদি? ভূতও মানো তা হলে,... বলো?

দিদি কহিল,—ভূত না হোক, কোনো বদমায়েস লোকের কাণ্ড, নিশ্চয়।...

সুশীল কহিল,—কিন্তু পুলিশের কথাও তো পড়লে! তা ছাড়া কাগজওয়ালা এমন করে তরুণদের ডাক দেছে যখন...

দিদি কহিল,—সম্পাদক তো বেশ টিপ্সনী কেটেচে—বিজ্ঞানের যুগ, বদমায়েসের আস্তানা, তরুণের সাহস—এ সব বেশ! নিশ্চয় যাক না তদন্ত করিতে...

সুশীল কহিল,—কাগজ লিখতে হলে রাজ্যের জ্ঞান আর সাহস নিজের আছে বলে প্রচার করতে হয় কি না; তাই। না হলে সম্পাদক মহাশয়কে বেতে বললে, তাঁর হাড়ে নিশ্চয় কাঁপন লাগবে!...

দিদি কহিল,—সব ভূয়ো! এমন কাণ্ডও না কি ঘটে।

সুশীল কহিল,—দেখাই যাক না; একটা adventure!

দিদি কি ভাবিল; ভাবিয়া কহিল,—না। খুন-খারাপির মধ্যে যাবি কি, বল?

সুশীল কহিল,—আমরা দলে থাকবো আট জন; বন্দুক সঙ্গে থাকবে।

দিদি মুখ ফিরাইয়া কহিল,—যা ভালো বোঝো, করো, আমার কোন কথাটাঁই বা ওনচো...

সুশীল কহিল,—কোন কথাটা শুনি না?...ও...বিষে? আচ্ছা, ফিরে আসি, তার পর মেয়ে দেখবো, এবং...

দিদি কহিল,—তোমার খুশী।

৩

পরের দিন বৈকালে কোনো মতে ছুটিয়া সুশীল গিয়া শেয়ালদায় ট্রেন ধরিল, যে-কামরা সামনে পড়ে! দিদির শরীর ভালো ছিল না, এবং দিদি কাঁচড়াপাড়া যাওয়া

লইয়া অনেকখানি বিয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। অল্পমতি মিলিল প্রতিশ্রুতি দিয়া! বিবাহ ব্যাপারে সুশীল সত্যই নামের গৌরব রাখিবে, শাস্ত্র ছেলেটির মত বিবাহ করিবে। কাজেই বিলম্ব!

ট্রেন বারাকপুরে থামিতে সুশীল ভাবিল, সঙ্গীদের সন্ধান করিবে। পরক্ষণে ভাবিল, থাক। তারা ভাবিতেছে, ভয়ে সুশীল সরিয়া পড়িয়াছে। বেশ হইবে, একদম কাঁচড়াপাড়ায় গিয়া তাদের তাক লাগাইয়া দিবে।

কাঁচড়াপাড়ায় ট্রেন থামিলে সুশীল নামিল, সন্তর্পণে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কা কস্ত পরিবেদনা! সঙ্গীরা? দেবকী? প্রফুল্ল? প্রমথ? অসীম? অনিল? হেম?... কাহারো চিহ্ন নাই! সে অবাক! তারা আসে নাই?... যদি আগের ট্রেনে আসিয়া থাকে...

নিঃশব্দে সে আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল। হু'খানা বাস দাঁড়াইয়া আছে, থার্ড ক্লাশ গাড়ীও হু'চারখানা। তবে থার্ড ক্লাশ গাড়ীগুলার পানে চাহিলে প্রাণে মায়া জাগে! ও গাড়ী কবে সেই পাঠান-যুগে মিস্ত্রীখানা হইতে বাহির হইয়াছিল, ঘোড়াগুলো যেন সত্যযুগে অশ্বমেধের হাত ফস্কাইয়া কোন্ খোঁয়াড়ে অনাহারে পড়িয়াছিল! খোঁয়াড়ে থাকার জন্ত আকারেও এমন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে...মনে হইল, সেকালের পক্ষিরাজ কি সত্য এমনি ছিল? কে জানে!

বাসে গিয়া সে উঠিল। বাসে বিবিধ শ্রেণীর লোক, বোচকা-বুচকিও অন্ত নাই!...

বাস চলিতে এক বাঙালী ভদ্রলোক তাকে প্রশ্ন করিল,—আপনি কোথায় যাবেন?

সুশীল কহিল,—পলাশী।

—পলাশী?...কার বাড়ী?

সুশীল সংক্ষেপে ঠিকানা বলিল। বাস-শুদ্ধ লোক চমকিয়া সম্বরে কহিল,—সেই ভূতুড়ে বাড়ীতে? এই সন্ধ্যাবেলায়?

সুশীল কহিল,—তাই।

তারা মৃদু গল্পে বুঝাইয়া দিল, এ বয়সে প্রাণে বহুৎ দাগা না পাইলে, ও-গৃহে প্রবেশের সাধ কাহারও মনে জাগিতে পাবে না। নিশ্চিত মরণ জানিয়া কে কবে সাপের মুখে হাত দেয়?...

সুশীল কহিল,—আপনারা কেউ কখনো দেখেচেন কিছু?

সকলেই জানাইয়া দিল, না দেখা হোক, যা শুনা গিয়াছে, তা দেখার সামিল!

সুশীল কহিল,—ঐ সাহেব দুটো যে মলো, পুলিশ এসে তদন্ত করলে না?

তাছল্যের ভঙ্গীতে তারা জানাইল, তদন্তের কিছু

বাকী ছিল না! টিক্‌টিকি পুলিশ অবধি আস্তানা পাতিয়াছিল...

—তাদের তো প্রাণহানি ঘটে নি।

—তারা কি রাজে থাকতো? হুঁ ট্যাঁ কোঁ বা-  
কিছু তাঁদের, তা ঐ দিনের বেলায়! কোনো সন্ধান  
পেলে না।

—ও পথে রাজে কেউ হাঁটে না?

—রাজ্য দিলেও নয়।...

বাস চলিতে লাগিল। বোলায়ে লাইনের তলা দিয়া  
পথ। সেই পথে একটু আসিতে কাঁপা। দু'ধারে  
রেলোয়ে কোয়ার্টার—যেন ওদিকে পাশা-পাশি পাশরাব  
খোপসাজানো রহিয়াছে!

সুশীল কহিল—সে বাড়ী কি পথের উপর?

—না।

—আমার কোথায় নামতে হবে, একটু হদিশ বাংলা  
দেবেন দয়া করে.....

দলে এক বৃদ্ধ ছিলেন; তিনি কহিলেন,—এ দুর্ভাগি  
ছাড়া, বাপু। ও-বয়সে মানুষ একটু গোঁয়ার-গোবিন্দ  
হয়, মানি,—কিন্তু মানুষের কাছেই গোঁয়ারত্ব চলে।  
তা'বলে ভুতের সঙ্গে...

তাঁর কথার খেই শ্রিয়া আন একজন বলিল,—বটেই  
তো! ঐ যে জাগুলের জোন্ত ওস্তাদ...শুনচেন মশাই?  
সুহ্মন তবে তাঁর গল্প...বলি...

সুশীল কহিল,—বলুন...

লোকটি কহিল—ভূতের ওস্তাদ—তিনি ফুঁয়ে ভুত  
তাড়াতো। যেমন মন্তর, তেমনি ফুঁ—আহুনি-টাহুনির  
বিজ্ঞাও জানা ছিল। একবার রায় বাবুদের কাছে  
গলাবাজী করে সে ঐ বাড়ীতে গিয়ে ঢোকে। বাত তখন  
দশটা—রায় বাবুদের জোয়ান পালায়ান পাঁচ-সাতটা  
পথের মোড়ে পাহারা মোতায়েন ছিল—একটু শব্দ পেলেই  
বৈ-বৈ শব্দে গিয়ে পড়বে! ওঃ, কথেকাণ কথা! শোনা  
কথা! তবু এই দেখুন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

লোকটি স্তিমিত আলোকে হাত বাড়াইল।

সুশীল কহিল,—বলুন, বলুন...ওস্তাদজীর কথা...  
বেশ লাগচে।

লোকটি আবার গল্প ধরিল,—বাবোটা মশাল ছিল  
সঙ্গে...এক ঘন্টা চূপ-চাপ...বেশ কাটলো। তার পর  
বললে হয়তো প্রত্যয় হবে না,—বাবোটা বাজ, অমনি  
কোথা থেকে ভাবী ঝড় উঠলো, মশালের দপদপে আলো  
টুক করে নিভে গেল। যগু পালায়ানগুলো পরম্পরের  
মুখ চাওয়া-চাওয় করচে, অমনি এক হুহুকার রব...  
বাড়ীর ছাদে বাজ পড়লো...হৈ-হৈ কাণ্ড! পরের দিন  
সকালে পালায়ানগুলোকে সকলে দেখে, রায় বাবুদের  
পুকুরের বাগায় মুখ শুঁজড়ে পড়ে আছে, আর জোন্ত ওস্তাদ

তাদের পায়ের নীচে! কি করে এমন ঘটলো, তা কেউ  
বলতে পারে না!

বাসের এক কোণে ছিল এক নারী, তরী-তরকারী  
বেচিতে নৈহাটী গিয়াছিল! সে কহিল,—খামো বাবুবা,  
আমায় আঁধারে যেতে হবে জঙ্গল পার হয়ে...বুড়ো  
বয়সে মুখ খুবড়ে মরবো কি শেষে!

বাসের মধ্যে ঢাকতে স্তম্ভীত স্তম্ভতা! শুধু বাসের  
কর্কশ ঘর্ষব চক্র-ধব। কোয়ার্টারের গণ্ডী পার হইয়া  
বাস মুক্ত প্রান্তর-পথে পড়িয়াছে। 'হু'ধাবে আঁধার—  
মাঝে মাঝে গাছ-পালা সে আঁধারকে আরো ঘন করিয়া  
তুলিয়াছে!

বাসের এক দিক্ হইতে ক্ষীণ রব উঠিল,—গাছম্  
ছম্ করচে...কি আঁধার!

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—আলো-টালো সঙ্গে  
আছে?

সুশীল কহিল,—আমার এই ব্যাগের মধ্যে ছোটো  
এ্যাসেটিন লাইন গ্যাস-ওয়ালা সাইক্ল ল্যাম্প আছে, টর্চ  
আছে তিনটে, আর একটা পিস্তল।

—হুঁ...

আবার সেই স্তম্ভতা! বাতির বিন্দু-ঝঙ্কার বনবীধি,  
বগলতা-গুঞ্জে উগ্র কটু গন্ধ...

এক জন কহিল,—কাল আপিসে যাওয়া আর ঘটবে  
না...

সুশীল কহিল,—কেন?

সে কহিল,—আর কেন! জোয়ান ছোকরা...  
সকালে ঐ দেহ লগু-ভণ্ড হয়ে কোথায় লুটোবে, গায়ে  
মোবগোল পড়ে যাবে—যাকে রীতমত জুগ বলে!

সুশীল কৌতুক বোধ কবিল, কহিল,—হুঁ। আমি  
দেখতে পাবো না—এই ভেবে মনে আপশোষ জাগুচে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কহিলেন,—এ আপশোষ নিজেই  
তো বন্ধ করতে পারো, বাপু...

—সেইটে পারচি নে বলেই আপশোষ আরো গীমা-  
হীন হয়ে উঠে!

জীলোকটি শুনিতছিল,—নিজের মনে কহিল,—ম!  
বাপ ছেড়ে দিলে কি করে, কে জানে!

কথাটা সুশীলের কাণে গেল। সুশীল কহিল,—মা-  
বাপ নেই গো বাছা...

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া জীলোকটি কহিল,—তা  
তোমার মতি-গতি দেখেই মনে হয়েছিল বাপু...

বাস সহসা থামিল। বন-মধ্য হইতে একটু আলোর  
রেখা...

সুশীল কহিল,—এইখানে বুঝি আমি নামবো?

—না, না—প্যাশেজার আসচে।



—এখানেও প্যাশেঞ্জার ৭...

প্যাশেঞ্জার আসিল, এক জোয়ান কাবুলিওয়ালা।

সুশীল ভাবিল, সাবাস্ কাবুলী, কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছ, টাকা ধায় দিয়া বাঙলায় গরীব চাষাকে রক্ষা করিতে!

সুশীল কহিল,—এইখানেই থাকা হয় না কি মিয়া সাহেব?

পাণের ছোপ-ধবা দাঁত বাতির করিয়া হাসিয়া কাবুলী কহিল,—ইসিঁসঁহরে থ কি।

—তা এখানে চলেছো কোথায়?

—জঁগ্গে...

—কিরবে কখন?

—কঁল।...

একটু কথা...কিন্তু এই ছোট্ট কথাটুকুতে আশ-পাশের গ্রামেব গরীব চাষাভুষার পবিচয় তাব মনে জল-জল করিয়া উঠিল। সোনার বাঙালার মাটি চষিয়া দিন গুজরণ কবে যে চাষা, তার অভাব ঘূচাইতে আসে লাঠি-ঘাড়ে জোয়ান কাবুলী টাকা আর হাণ্ডনোটের ছাপানো খাতা লইয়া...ইহার পরেও বাঙালী চাষ-বাসের কথা মুখে আনে!...

জঙ্গলের মধ্য দিয়া বাস চলিয়াছিল—সেই জঙ্গল ফুঁড়িয়া আঁকা-বাঁকা পথ—বাসের হেডলাইটের পথ-রেখায় পথের আশ্রয় পাওয়া যায়।

এক মাঠেব প্রান্তে বৃক্ষ ভঙ্গলোকটি কহিলেন,—এই পলাশী। এইবার নামো তা হলে। সে বাড়ী ঐ দিকে...

সুশীল দেখিল, বাড়ীর চিহ্ন দেখা যায় না, মাঠের প্রান্তে শুধু নিবিড় বন।

—ঐ বনে?

—হাঁ।

বাস থামিল। সুশীল নামিল; নামিবার পূর্বে ব্যাগ খুলিয়া হুটা টর্ক জালিয়া লইল।

বাস ছাড়িল—সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একবাশ কণ্ঠস্বর—

—গেরোর ভোগ...

—নিষত্তি...

—গোঁয়ারতুমির ফল ভোগ কববে! নাচার!...

বাস চলিয়া গেল। তার চক্র-রব শৃঙ্গে মিসাইলে সুশীল টর্কের আলোয় দিক্ নির্ণয় করিল, ঐ পাছেব আড়ালে মস্ত কি যেন...বাড়ী? তাই!

পায়েব নীচে কি একটা সব-সব করিয়া সবিয়া গেল। সাপ? কে জানে! নিমেবের জন্ত বুকটা কেমন তুলিয়া উঠিল। কোনো দিকে জ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া সুশীল ব্যাগ হাতে তুলিয়া—হুটা টর্ক জালিয়া তাহারি আলোয় পথ-রেখা খুঁজিয়া বনের দিকে অগ্রসর হইল।

অন্ধকার বন। বনের আড়ালে জীব দেহতলা বাড়ী। টর্কের আলোয় দ্বাবের সন্ধান মিলিল। দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ, তবে কপাটের খানিকটা ছিল ভাঙ্গা, কাজেই ভিতরে প্রবেশ করিতে বাধিল না।

সামনে উঠান। উঠানে এক বাশ জঙ্গল, আবর্জনার সীমা নাই। চাবি দিক্ স্তব্ধ। সুশীল আলো ফেলিতে ছুঁচা-ইঁদুর প্রভৃতি নিশাচর জীবগুলি একটু কলরব তুলিল; ছুঁচাটি বাহুড় উড়িয়া পলাইল।

পথ খুঁজিয়া সুশীল দোতলায় উঠিল। সিঁড়ির পরেই মস্ত বারান্দা। রেলিং ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, মাথার উপর ছাদেব কড়ি হুঁকখানা পড়ে-পড়ে; ছাদেব খানিকটা ফুটা, টালি নাই। সেই রক্ষপথে নিশীথিনীর জমাট কালো অন্ধকার ছুঁ করিয়া ঢুকিতেছে। অন্ধকারের পর অন্ধকার। সে অন্ধকারেব পিছনে হুঁকখানা ঘোলাটে নক্ষত্র সুশীলের চোখে পড়িল। খানচারেক ধূলি-লিপ্ত বরগা জড়ো করিয়া কৌচার খুঁটে ধূলা ঝাড়িয়া সুশীল তাহাতে চাপিয়া বসিল, বসিয়া ব্যাগ খুলিল। ব্যাগেব মধ্যে ছিল গ্র্যাসেটিলিনেব হুটা বাইক্ ল্যাম্প; সেই ল্যাম্প হুটা জালিয়া রেলের বাতির মত আলো ঘুরাইয়া বাড়ীর বতখানি অংশ বসিয়া দেখা যায়, সে দেখিয়া লইল।

বারান্দার ওধারে সাব-সার ঘর। ঘরে বড় বড় জান্না। হুঁকখানা জান্নার কপাট ভাঙ্গা; কাঠের চওড়া রেলিং দেখা যাইতেছে, রেলিং ঘেরিয়া মাকড়সার বিস্তার্ত জাল। কত কালের নিকপদ্রবতায় ও জাল রচিয়া উঠিয়াছে, নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ব্যাপার! সুশীল ভাবিল, তুত যদি থাকে তো মাকড়সাগুলার প্রতি তার কেমনো বিদ্বেষ নাই, নিশ্চয়।

ছাদেব দিকে লঠন ঘুরাইয়া সে আলো ফেলিল, আলিসার রঙ যেন কালি ঝুল! ছাদে জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই! কোথাও এতটুকু সাড়া নাই! শব্দ নাই। না কোনো বাহুড় ডানা ঝাড়ে, না কোনো পাখী বিকট রব তোলে। একটা কালো বিড়ালের ডাক! চারি দিকে এমন স্তব্ধতা যে নিজের নিশ্বাসের শব্দটুকুও অনায়াসে শুনা যায়!...

তাছলেব মুহু হাসি সুশীলের অধরে উথলাইয়া গেল। আলো গাথিয়া সে ব্যাগ হইতে ট্রেনেব সস্ত্র কেনা ইংরাজী ছ'পেনি দামের ডিটেক্টিভ নডেল খুলিয়া বসিল।...

হু পরিচ্ছদের পর গুল্ট জমিয়া উঠিয়াছে। সুশীল উপজ্ঞাসের মধ্যে একেবারে তন্দ্রয় হইয়া গেল।...

সহসা একটা শব্দ... যেন দ্রুত-পায়ে সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে উঠিয়া আসিতেছে... পায়ে জুতা নাই। সুশীলের শুনিবার কথা নয়, কিন্তু উপলক্ষ্যেব চতুর্থ পরিচ্ছেদ শেষ হইয়াছে, বইয়ের পাতা কাটা নাই, বইয়ের পাতা হইতে মন খাশা পড়িয়াছিল, কাছেই প্রথমে সে উৎকর্ষ এবং পরক্ষণে আলোটা সিঁড়ির মুখে ফেলিল, সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির প্রান্তে লাল টকটকে শাড়ীর পাড় এবং এক তরুণীর মুখ... মাথায় কাপড় নাই, এক বাশ কালো চুল—খোঁপা নাই। আর হুট চোখ... ভয়ে ভবা! শুধু ভয়? করুণ বেদনা যেন মূর্ত্তি ধরিয়াছে! কিন্তু চকিতে সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল।

সুশীলের দেহে রোমাক! সুশীল আশ্চর্যতভাবেই প্রশ্ন তুলিল,—কে?

চাৰিদিক্ স্তব্ধ! তার স্বর প্রতিধ্বনিত ভাঙ্গিয়া বাতাসে মিশিল। কেহ সাড়া দিল না।

কিন্তু এ তুল নয়! সুশীল স্পষ্ট দেখিয়াছে, তরুণীর মুখ... এবং সেই আর্ন্ত দৃষ্টি...

হুই হাতে দুটি বাইক ল্যাম্প ও পকেটে পিস্তল লইয়া সুশীল উঠিয়া দাঁড়াইল এবং দ্রুত পায়ে সিঁড়িতে আসিল। কেহ নাই। সুশীল নীচে নামিল, দাঁড়াইয়া ডাকিল,—কে?

কোনো সাড়া নাই! সুশীলের বৃকের মধ্যে একটা শব্দ—হুপ্... হুপ্... হুপ্... হুপ্...

ভয়? সুশীল হুট চোখ বিস্তারিত করিয়া চাৰিদিকে তাকাইল,—কেহ কোথাও নাই। সেই স্তব্ধতা!...

ধীরে ধীরে সে নোতলায় বারান্দার আসিয়া বাসিল। বই? না, পড়া চলে না! হুঁশিয়ার থাকিতে হইবে! খবরের কাগজে পড়া সেই সাহেবদের মৃত্যুর কথা মনে জাগিল। সত্যই যদি...

পরক্ষণে সে ভাবিল, তাও কি সম্ভব! ভূতে মানুষ মারিয়া গাছে লটকাইয়া দিবে? ভূত কি সার্কাস দেখাইতে চায়? না, বীরত্ব? না, কি?...

তবু চুপ করিয়া থাকা চলে না! ভূত যদি হয় তো এমন সতর্ক মানুষের কাছে সে ঘেষিতে চাহিবে না! সুশীল আবার ডিটেক্টিভ উপলক্ষ্যের পাতা কাটিয়া পক্ষম পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিল।

বহুক্ষণ... সহসা কেমন একটা অবস্থি! আলো তুলিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরাইতে দেখে, ছাদের কোণে... হাঁ, শাড়ী... রমণী-মূর্ত্তি! মূর্ত্তি হাতছানি দিয়া তাকে ডাকিতেছে। চকিতের দেখা! তার পবই সে-মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সুশীল ভাবিল, ভূত? না, নারী? বাই হোক, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—এক হাতে দুটা লাইট, অপর হাতে পিস্তল। বারান্দা ঘুরিয়া, বহু ঘর পার হইয়া একেবারে

ছাদের সিঁড়ি... সুশীল সেই সিঁড়ি ধরিয়া ছাদে গিয়া উঠিল।

আলো তুলিতে দেখে, কোণে লাল পাড় শাড়ী-পরা তরুণী। বিবর্ণ মুখ, চোখে সেই আতঙ্ক! সুশীলকে দেখিবারাত্র তরুণী আঁর্ত রব তুলিয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল।

সুশীল পলকেব জগা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। চোখেব ভুল? না। ঐ তো তরুণীর মূর্ত্তি... হুই হাত বৃকে বাখিয়া, চোখে আবেদন জাগাইয়া... ভয়ে যেন শিহরিয়া বহিয়াছে।

সুশীল কহিল,—তুমি মানুষ? বলে! না হলে আমার হাতে এই পিস্তল... দেখচো...?

সুশীল অগ্রসর হইল। তরুণীর ভয় বাড়িল। সে কহিল,—না—না। তুমি কে? কে...?

মানুষের স্বর!... সুশীল আরো অগ্রসর হইল। তরুণী হু হাতে মুখ ঢাকিল—একটা ক্রন্দনের রব...

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে কার বহুমুষ্টি সুশীলকে এক পাক ঘুরাইয়া দিল—সুশীল স্তম্ভিত!

তার সে ভাব কাটিল বহু-স্বরে—আজ তোকে ধবেচি। পাজী! শয়তান! তোর এই কাজ!...

এও মানুষের স্বর! সুশীল কহিল,—ছাড়ো, আমি সব কথা বলচি...

—কোনো কথা নয়...

সুশীল তাব কবলে! পিস্তল পড়িয়া গেল! লোকটা সুশীলকে টানিয়া লইয়া চলিল—সেই সিঁড়ি... সিঁড়ির কাছে আসিয়া লোকটা কহিল,—আগে তোর ব্যবস্থা করি, তার পর ওর...

সুশীল যেন মস্তমুগ্ধ! তার এমন শক্তি নাই যে লোকটাব আক্রমণ রোধ করে!

সিঁড়ির পাশে ঘর। সুশীলকে সেই ঘবে ফেলিয়া লোকটা বাহির হইতে শিকল টানিয়া দিল, তার পর সিঁড়ির উপর হুপ্ দাপ্ শব্দ!... সুশীল কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল।

একটু পরে শুনিল, তীব্র হুঙ্কার,—চলে আর বলচি... সর্বনাশী... হুঙ্কারের সঙ্গে ও-পক্ষ হইতে আঁর্ত ক্রন্দন! যেন বজ্রাঘাতের সহিত বর্ষার ধারা...

হুঙ্কার-রব একটু পরে মিলাইয়া গেল। আবার সেই প্রচণ্ড স্তব্ধতা!...

সুশীল ভাবিল, এ কি রহস্য! সে উঠিয়া দাঁড়াইল টর্চের আলোর দেখে, ঘরে আবর্জনা। খুলে মাকড়শার জালে ঘর ভরা। নড়িতে চড়িতে মাথায় মুখে সে-খুল নাগপাশের বাঁধন কষিয়া দেয়!

ও

স্বপ্ন নয়! অথচ...

ঠিক যেন আষাঢ়ে গল্প! অনেক কথা স্মৃশীলেন মনে জাগিতেছিল...এ তো ভূত নয়! সহসা তবে খবরের কাগজে ভূতের বাড়ীর অসহ্য দোঁরাছোঁর কাহিনী ছাপা হয় কি কারণে?...বসিয়া এসব কথার আলোচনায় লাভ নাই! সে উঠিয়া দাঁড়াইল, দ্বার খুলিয়া নাইল; ওদিক হইতে শিকল বন্ধ। যদি ভূত হয়, তাকে আরাম করিতে দেওয়া নয় ভাবিয়া সবলে সে দ্বারে পদাঘাত শুরু কবিল...কত কালের কপাট...লাথির ঘায়ে ভাঙ্গিবে না?...

ভাঙ্গা চাই। যদি ভূত না হয়, তাহা হইলেও রহস্য এবং এরহস্যের অন্তরালে এক তরুণী নারী! আর্ন্ত অসহায়...তার চোখে সেই দৃষ্টি! পুরুষটা নিশ্চয় খুব পীড়ন চালাইয়াছে! নারী যেই হোক, প্রবলের পোষণে যাতনার তার সীমা নাই!

দ্বারে লাথির পর লাথি পড়িল। তবু ভূট্ট। সারা বাড়ী ঝন্-ঝন্ করিয়া ওঠে, তা ছাড়া দ্বার ভাঙ্গিবার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায় না!...

নিরুপায়! স্মৃশীল চুপ করিয়া বসিল, চক্ষু মুদ্রিয়া সমস্ত মনটুকুকে শ্রবণেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রিত করিয়া...

চারিদিক স্তব্ধ!...এবং সেই স্তব্ধতায়...

ঘুম ভাঙ্গিতে স্মৃশীলের বিশ্বয়ের সীমা রহিল না। ইহার মধ্যে ঘুম আসিল কখন, কি করিয়াই বা আসিল, কখন যে আসিল, আশ্চর্য!

আবার সে উঠিল, উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিতে দ্বার খুলিয়া গেল। স্মৃশীল দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। ছাদেব দিক হইতে একটু আলো!...ও...হাঁ, ভোবের আলো!

স্মৃশীল সোজা গিয়া ছাদে উঠিল। কেহ নাই! পিস্তলটা পড়িয়া আছে।...

ব্যাপার যে ভৌতিক নয়, তা সে ভালো করিয়াই বুঝিয়াছে। কিন্তু সেই নব আর নারী...তারা কোথা হইতে কেন আসিয়াছিল? ছাদ হইতে চারিদিকে চাহিল, দূরে বনান্তরালে ছ'একখানা কুটির...তার পর আবার বন, গভীর ঘন বন।

স্মৃশীল ছাদ হইতে নামিয়া ঘবগুলোর মধ্যে সন্ধানী দৃষ্টি লইয়া ফিরিল। মাহুষের বসতির কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না! বাবান্দ্যর আসিয়া বাগটা গুছাইয়া লইল, তার পর নিঃশব্দে সেই ভূতের বাড়ীর বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথে একজন লোকের সঙ্গে দেখা। এক বৃদ্ধ।

স্মৃশীলকে দেখিয়া সে কহিল,—আপনি কাল ও-বাড়ীতে ছিলেন রাজে?

স্মৃশীল কহিল,—হাঁ। একটা কথা আছে...

লোকটির সঙ্গে আলাপে এটুকু জানা গেল, বিশ বছরের মধ্যে এ-বাড়ীতে কেহ বাস করিতে আসে নাই। সরিকানী বলহে পাঁচ ভাই বাড়ী ছাড়িয়াছে ইত্যাদি।

মস্ত কাহিনী। তবে এ কাহিনীর মধ্যে একটু বিশ্ব-য়ের ব্যাপার এই :—কোনো ভাইয়ের স্ত্রী বাচে নাই। কেহ ছ'তিন বাব বিবাহ করিয়া সংসার পাতিবার প্রয়াস পাঠিয়াছে...কিন্তু পাঁচ-সাত বছর পরেই নবোঢ়া বধূদের ইতলোক হইতে বিদায় লইতে হইয়াছে। তারো একটু কারণেব ইঙ্গিত দিতে বৃদ্ধ ভুলিল না। ঐ সরিকদের পূর্বে বাড়ীটা ছিল রাজীব মণ্ডলের। সেই রাজীব মণ্ডলের নারী-রূপ-বিস্ময়তা ছিল বেশী মাত্রায়; আশ-পাশের গ্রামে কপসী তরুণীও দেখা মিলিলে সে-নারীর রক্ষা ছিল না। রাজীবের প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। কাজেই...

রাজীব মারা গেলে তার ছেলে এ-বাড়ী বেচিয়া বিলাত চলিয়া যায়। কিন্তু বাড়ীতে একটা উপসর্গ ঘটে। রূপসী তরুণীর দল বাত্রে মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, নানা বিভী-ষিকা দেখিতেন। ওয়ার দল আসিয়া ঝাড়-ফুক-মস্তাদি-সাধনের পর বুঝাইয়া দিল, রাজীবের রূপ-বিস্ময়তা এ-বাড়ীর ইটে-কাঠে জড়াইয়া আছে! রূপসী নারীর পক্ষে এ গৃহ নিরাপদ নয়।

স্মৃশীল কহিল,—খাক। আপনি বোধ হয় রবি বাবুর ক্ষুধিত পাষণ গল্প পড়েছেন...

লোকটি কহিল,—সে আবার কি?

স্মৃশীল কহিল,—এ সব রূপ কথা আজ-কাল অচেন...

লোকটি কহিল,—চাক্ষুয কিছু দেখি নি কখনো, তবে এ কাহিনী শুনে আসচি আমাদের প্রথম যৌবন থেকে। আপনি জানতে চাইলেন, যদি কোনো বিচিত্র ইতিহাস...

স্মৃশীল তাঁকে প্রণাম করিয়া ট্রেনে যাইবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইল বাসেব প্রতীক্ষায়...

বাস আসিলে বাসে চড়িয়া কাঁচড়াপাড়া ট্রেন। ট্রেন আসিতে দেবী আছে। প্লাটফর্মে সে পাষাচাষি করিতেছিল, ও-লাইনের ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এ লাইনের ট্রেনের সিগনাল পড়িয়াছে; ট্রেন এখনও আসে নাই। ও লাইনের ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চলন্ত ট্রেনের দিকে চাহিয়া স্মৃশীল দাঁড়াইল, কত দূর-পথের কত যাত্রী চলি-য়াছে...সহসা একখানা খার্ড ক্লাশ কামরার জানালায় নজর পড়িল...এ কি...

এক তরুণী বসিয়া...পরশে লাল পাড় শাড়ী; এবং তরুণীর মুখ...? না, ভুল হইবার নয়! বিশেষ ঐ ছটি

চোখ, সেই আতঙ্কের ছায়া! দিনের আলোতেও তেমনি রহিয়াছে! সূর্য্যোদয়ের সাগর দেহ রোমাঞ্চিত হইল! সে লোকটা কামরায়? না, কৈ, দেখা যায় না!

ট্রেন চলিয়া গেল। এদিক্কার ট্রেন আসিতেছে... দূর সীমান্তে দৌয়াব রেখা!

সূর্য্যোদয় চিত্তে ঢাকলোয় সীমা নাই! সমস্ত ব্যাপাবগানা...খিয়ত্‌কি? না, ফিলত্‌কি? জন্মান্তর? না, মরীচিকা? কিছু বুঝা যায় না! রাজীব মণ্ডলের বিহ্বলতা নাশিকাও তো নয়...

লাইন পার হইয়া ছুইচাবি জন লোক ডাউন প্রাটফর্মে আসিতেছিল...

সূর্য্যোদয় ভাবিতেছিল, কে ঐ নারী? সত্যি উহার অস্তিত্ব আছে? না, কাল রাত্রের বিভ্রম মাত্র? কিন্তু আজও ট্রেনে ঠিক তার চোখের সামনে!...তাব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই। বড় কবিতাও আসে নাই! সূর্য্যোদয় কাঁচড়াপাড়ায় আসিল, সঙ্গে সঙ্গে সে আসিল! আর সূর্য্যোদয় ট্রেনে, সে-নারীও অমনি ..

সহসা সামনে এক লোক। তাকে দেখিয়া সূর্য্যোদয় চমকিয়া উঠিল। সেই রাত্রের পুরুষটা না?...?

সূর্য্যোদয় ডাকিল,—গুনচেন মশায়?

লোকটি দাঁড়াইল। সূর্য্যোদয় কহিল,—চিনতে পারেন?

ক্ষণেকের জন্য লোকটির কেমন অপ্রতিভ ভাব! সে কহিল,—কাল রাত্রি মোড়ল বাবুদের বাড়ী...?

সূর্য্যোদয়ের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সত্য সব—ছায়া নয়, মায়া নয়!

সূর্য্যোদয় কহিল তাই। আমি এসেছিলুম কাগজ

পড়ে ভৌতিক রহস্যের সন্ধানে। তার মধ্যে হঠাৎ...

লোকটি কহিল,—বলেন কেন দুঃখের কথা! আমার পুত্র-বধূ। বাপের বাড়ী গেছিলেন প্রসব হতে... একটি মেয়ে হয়েছিল, রইলো না। তার পর থেকে উন্মাদ! আমার কাছে প্রকাশ কবে নি। বাপের বাড়ী থেকে এখানে রেখে গিয়েছিল। দু'মাস প্রাণ বাবার জো হয়েছিল! রাত্রি মাঝে মাঝে আচমকা কোথায় চল যান! তাঁর ভাইকে আনিয়েছিলুম...পাঠিয়ে দিলুম আজ। ঐ যে ট্রেন চলে গেল না?...বাড়ী শান্তিপুরে। বিপদ! পাগল বৌ নিয়ে কি করবো, বলুন তো! বিদায় করলুম!...হাড়ে আজ বাতাস লাগলো...আঃ, ঘুমিয়ে বাঁচবো।

ট্রেনখানা হুড়মুড় শব্দে আসিয়া পড়িল। সূর্য্যোদয় কহিল,—তা হলে ঐ ভূতের বাড়ী বলে কাগজে বা ছাপা হয়েছে...

সে কহিল,—ও! সে বাড়ী মোড়ল বাবুদের ও-বাড়ী থেকে আরও তিন কোশটাক পূবে, ভারী জঙ্গলের মধ্যে—মালুবেব অগাম্য ঠাই।

—সাহেব মার সে গল্প?

লোকটি হাসিয়া কহিল,—ও সব বাজে কথা।...কাণে শুনি টের কথা মশায়—কিন্তু চোখে তো কখনো কিছু দেখলুম না!...

ট্রেন আসিয়া পড়িল, সূর্য্যোদয় একটা কামরায় উঠিয়া বসিল। সে কামরায় আর কেহ ছিল না। জানালার ধারে বসিয়া সে আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। কি ভাবিতেছিল? ভূতের কথা? না, ঐ উন্মাদ-রোগ-গ্রস্তা অসহায় তরুণী? স্বপ্নব যাকে এই সকালে বিদায় দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছেন?

## সুন্দর মুখ

অজনাথ 'ল' পড়িতেছে—এবারে ফাইনাল দিবে। আইনের কেতাব খুলিলে তার মাথায় কল্পনার এমন জলশা জমিয়া ওঠে,—যে তাহার ছন্দে-তালে সেই বর্ষের যুগের শৃঙ্খলাহীন বর্ষেরতা, পীড়ন, অত্যাচার, জোর বার মূলুক তার, এই নীতির দুরন্ত প্রসার হইতে শুরু করিয়া শাস্তি-শৃঙ্খলার ওজুহাতে কি করিয়া মানুষে-মানুষে রক্তাক্তির অন্তরালে আইনের নানা বিধি গড়িয়া উঠিল,—তাহারি ধারাবাহিক ছবি যেন চোখের সামনে ভাসিতে থাকে ! সেই সঙ্গে চোর, খুনে প্রভৃতি বাকালিক মূর্তি গড়িয়া, ফন্দী-বদমায়েসি বৃন্দ গিল্পেষণের কাজে মন যেন কুথিয়া অনি-গলি, বস্তী পাড়া-নদী-বনের আশে-পাশে অভিযান-মত্ত ভাবে বিবেণ করিতে থাকে। অর্থাৎ তাব কল্পনা ফুল, নির্ঝর ও নারীর দেহ-মনের লীলা-ছন্দে আকুল হয় নাই, তার কল্পনা বাস্তবের ধূলি-জঞ্জাল লইয়া বিচিত্র খেলায় মত্ত থাকিত ; অর্থাৎ মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে তার কেমন স্বাভাবিক ঝোক ছিল।

বাড়ীতে ছিল কি একটা উৎসব। আত্মীয়-কুটুম্ব জড়ো হইয়াছে অনেকগুলি।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণেব ছাদে বসিয়া গল্প চলিতেছিল। —কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্যপ্রণালী হইতে শুরু করিয়া মেনিনজাইটিস্-ব্যাদির প্রকোপ—কোনো আলো-চনা বাদ পড়ে নাই।

সহসা জলু আসিয়া সংবাদ দিল, মোড়ে ঐ যে তেতলা বাড়ী—ও বাড়ীর মালিক রায় যোগীন্দ্র দাস বাহাদুর সপরিবারে বাহিরে গিয়াছিলেন বিবাহের নিমন্ত্রণে—তিন দিনের জঙ্ঘ। গৃহে ছিল একটি মাত্র খোঁটা ভৃত্য ; দোতলা-তেতলার চাবি দিয়া গিয়াছিলেন। আজ এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, তেতলাব দ্বারে লোহার সিঁদুক ভাঙ্গিয়া চোরে অনেক টাকা দামের গহনা-গাঁট চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। থানা ভাঙ্গিয়া পুলিশ-পাহারা আসিয়াছে তদারক করিতে।

অজনাথ বলিল—খোঁটা চাকরটা তো বাড়ীতে আছে ?

জলু কহিল,—আছে। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

অজনাথ কহিল,—তারই কাজ !

জলু বলিল—সে বাড়ীতে ছিল।

মলিনা—অজনাথের মীমত্বতো বোন ; অজর চেয়ে একবছরের বড়। মলিনা বলিল,—সে চুরি করেছে যদি তো বাড়ীতে বসে থাকে কেন ? পালাবে না ?

হাসিয়া অজনাথ কহিল,—ঐ তো মজা ! চোরের শাইকলজিই এই। ওস্তাদ নব্বর ওয়ান। তার

লোকজন চুরি করেছে—সে দেছে সন্ধান ! তারপর বাড়ীতে বসে আছে নিরীহ নির্দোষের মত ! পালালে বাবুবা দেশ থেকে পাকড়াও করে আনবে—তার বিরুদ্ধে প্রমাণ একেবারে অকাটা হয়ে উঠবে !

জলু বলিল—কিন্তু চাকরটা আজ বিশ বৎসর রায় বাহাদুরের বাড়ীতে চাকরি করেছে ! খুব বিশ্বাসী। বাড়ীর লোকের এতটুকু সন্দেহ নেই তাকে। পুলিশ বলচে—না মশায়, আপনারা বোঝেন না। ওরই যোগ-সাজিতে চুরি হয়েছে ! তাই তাকে গ্রেফতার করেছে !

সহজ আলোচনার মধ্যে এত বড় বাস্তব ব্যাপারের সংস্পর্শ ঘটায় ছাদের আসরে একটু গাভীর্ষের ছায়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা সহরের বিভিন্ন চোরের বিচিত্র ওস্তাদি—ক্রমে কলিকাতা ছাড়িয়া লণ্ডন, নিউ ইয়র্কের বড় বড় চুরির রোমাঞ্চকর কাহিনীর উপর দিয়া আসরের আলোচনা গড়াইয়া একালে সহরের এই চার-পাঁচতলা উঁচু বহু-বিস্তীর্ণ ফ্ল্যাট-ভাড়া-বাড়ীগুলায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রমণী কহিল,—আমাব সম্বন্ধী মনি থাকতো সহরের বৃকে বড় রাস্তার উপর মস্ত এক পাঁচতলা ফ্ল্যাট-বাড়ীর তিন-তলায় সাতখানা ঘর ভাড়া করে ! বাসের অসুবিধা ঘটেনি ; কিন্তু একদিন ভোর হবার একটু আগে দমাদম পিস্তলের আওয়াজে সচকিত হয়ে তারা সপরিবারে জেগে দেখে, পিস্তল চলেছে তার পাশের কামরায় ; অর্থাৎ তার ফ্ল্যাটেরই অপবাংশে হস্তাধানে এক আগে এক নতুন ভাড়াটিয়া আসে—আসার পর থেকেই গান-বাজনার আসর জমতে থাকে, সদরে বড় বড় মোটার এসে দাঁড়াতে এবং এত রকমের লোকও এসে জমতো ! রাত্রি একটা-দুটো পর্যন্ত সে-ফ্ল্যাটে মহাসমারোহে কিসেব যে আসর জেঁকে থাকতো, বেচারী মনি তার কোনো সংবাদ রাখতো না। সপরিবারে শুধু বিশ্বয়ে সচকিত থাকতো ! সেদিন পিস্তলের শব্দে যে নাটক গড়ে উঠলো, যবনিকার অন্তরাল থেকে জানা গেল,—তারা একদল চোর, বিপ্লবী—বহুদূরে পাড়ি দিয়ে চুরি-চামারি করে বাসার এসে জমিদার সেজে ধুমধামে বিশ্বজগৎকে ধাঁধা দিতে চায় ; পুলিশ খপর পেয়ে নিঃশব্দে এসে বাড়ী ঘেরাও করেছিল—একজন জানতে পেরে পালাবার সঙ্কেত তোলে ; পালাবার পূর্বেই পুলিশ আসে—তখন মরিয়া হয়ে তারা পুলিশের উপর গুলি চালায়। পুলিশও তখন গুলি চালিয়ে দেয়। রীতিমত একটা skirmish ; —ছুটো আসামী আর একজন বাঙালী ইনসপেক্টর জখম

হয়! এই চুবির তদারকীতে জানা গেল, ফ্ল্যাটের চার-তলায় তিন দিন পূর্বে যে চুরি হয়েছিল, সে-চুরির ব্যাপারে ছিল এই ছদ্ম জমিদারের কুশলী হাত। সে চোরাই মাল জমিদার-গৃহ থেকে উদ্ধার হয়। এ-দলে নারীও ছিলেন—সুন্দরী সুবেশা নারী!

রমণীর কথায় আসবে আতঙ্কেব শিহরণ বহিয়া গেল।

পরেণ বলিল,—ফ্ল্যাট বাড়ীগুলোয় মস্ত অসুবিধা ঐখানে। পাশের বাড়ীতে যত দুবস্ত বাক্তি বাস করুক, তাতে ভয় কম! কিন্তু পাশের ঘরে চোরের আস্তানা পড়লে ব্যাপার খুব সঙ্গীন হয়ে ওঠে। লোকের ও দিকে আমার পিশেমশায় এমনি একটা ফ্ল্যাটে বাস করতেন—রাত্রে থিয়েটার দেখতে যান—বাড়ীর সকলে মিলে। ফিরে এসে দেগেন, ঘরব মাঝখানে যে-দেওয়াল—সে-দেওয়ালে প্রকাণ্ড গহ্বর; সেই গহ্বর-পথে পাশের ঘর থেকে চোব এসে একটা কাশাবাক্স আব সিক্কের কাপড়-চোপড় সরিয়ে চম্পট দেছে!

পাশের ঘরে সে দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত ভাড়াটিয়া ছিল—দেখেছিলেন। তাবা ফেবার হবার পর ঘর খালি!

কথা শুনিয়া মলিনা ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। সর্বনাশ! সেও যে সেন্ট্রাল এভিনিউতে ফ্ল্যাটে বাস করে—দোতলায়। স্বামী উপেন্দ্র গিয়াছে বাহিরে আফিসের কাজে; সে আসিয়াছে এখানে! গহনাপত্র বাড়ীতে পড়িয়া আছে। ফ্ল্যাটের পাশেব কামবাক্স থাকে এক নেপালী ভদ্রলোক। সে নাকি বিলাত ঘুরিয়া আসিয়াছে; জুয়েলারিব কারবার আছে! কে জানে, জুয়েলারিব কারবারেব নামে হঠাৎ চোরাই ব্যাপারেব ব্যবস্থা!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,—আমার যে ভাবী ভর হচ্ছে পরেশদা! বাড়ী ছেড়ে এসেছি...আমারও যে ঐ ফ্ল্যাট-বাড়ী! যত গহনাপত্র...

পরেণ কহিল,—সহরের বৃকের উপর...

জলু বলিল,—এ ব্যাপারগুলো যা ঘটেচে, তা সহরের বৃকের উপরেই...পায়ের তলায় নয়!

রমণী কহিল,—মণিব কাহিনী তো শুনে...

পরেণ কহিল,—আর পিশেমশায়েব ফ্ল্যাটে...! সে ঘটনার পর পিশেমশায় ফ্ল্যাট ছেড়ে দেন। স্যাংসংতে গলির মধ্যে separate বাড়ীতে বাস করতেন, বলেন,—এ দুর্গন্ধ সয়েও বাস করা যায়, তা বলে অমন চোরের পাশে! বাপ রে!

মলিনা কহিল,—তাই তো। তাহলে কি করি? আমি বরং চলে বাই।

জলু বলিল,—চাকর-বাকর আছে তো বাড়ীতে?

মলিনা কহিল,—একটা চাকর আর একটা দাসী, তারা ছুটি নেছে আজকের মত! কাল সকালে আসবে। জলু বলিল,—তারা ছুটি নেছে,—এ-খবর তো কেউ জানে না!

মলিনা কহিল,—তা আর জানবে না কেন?

তার স্বরে ভয়ের রেশ।

অজ্ঞাত অতঙ্ক নিঃশব্দে বসিয়া বিচিত্র কাহিনী শুনিতেছিল। সে কহিল,—এর মধ্যে একটা psychology লক্ষ্য করেছে?

মলিনা কহিল,—তোব psychology রেখে দে, অজ্ঞ...যদি একবার আমাকে নিয়ে? গহনাপত্রগুলো নিয়ে আসি তাহলে।

অজ্ঞ কহিল, তোমার যাবার কি দরকার!...তার চেয়ে বলো, আমি না হয় রাজে গিয়ে সেখানে থেকে বাড়ী চৌকি দি।

শিহরিয়া মলিনা কহিল,—একলা?

হাসিয়া অজ্ঞ কহিল,—তাতে কি!...

মলিনা কহিল,—যদি চোর আসে?

অজ্ঞ কহিল,—মাফু খাকলে তারা আসতে বিধা বোধ করে!

নানা যুক্তি-আলোচনায় স্থির হইল—খাওয়া-দাওয়া সারিয়া অজ্ঞ চাবি লইয়া যাত্রা কবিলে মলিনাদি'র ফ্ল্যাটে—সেখানে রাহে থাকিবে—গহনাপত্র চৌকি দিবার জগ।

মোড়ের বাড়ীতে পুলিশের ভিড় তখনো গম্গম কবিতেছে।

দেখিয়া অজ্ঞ চাকিত্তের গুজব বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল—পরে কল্পনার রথে চাপিয়া psychology'র বৃহমধ্যে মনকে ঠেলিয়া দিল!

সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে মস্ত ফ্ল্যাট—বহুবাঙ্গারের চৌমাথা পার হইয়া চীনা থিয়েটারের একটু দূরে। ফ্ল্যাটে বহু জাতির বহু নর-নারীর বাস। নীচেকার একটা ঘরে এক চীনাও বাস করে। অজ্ঞ ভাবিল, এই ফ্ল্যাট-খানা যেন সারা পৃথিবীর একখানি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ!

ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া মস্ত ল্যাণ্ডিং। এখানে ষ্টাডাইয়া সে শুনিল,বিচিত্র কলরব। পিয়ানোব টুন-টান রাগিণীর সহিত হামানদিয়া'র মশলা-কোটা; তিন তলার এক ঘরে বাঙালী তুফারী কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গান যেমন আপনাকে বিচিত্র স্বরে নিচ্ছুরিত করিয়া ধরিয়াছে, একতলায় তেমনি দরওয়ান গুফলাল চৌবের বিরাট রাগিণীও অস্থি-গুলাকে কনকনায়িত করিতে কার্ণাণ্য করে নাই! মলিনাদি' বলিয়া দিয়াছে, দোতলার উঠিয়া বাঁ-দিকে 'নখর দুই'-কলক-আঁটা দিকটা তার।

সিঁড়ি দিয়া দোতলার উঠিয়া বা-দিকে ফলক নজরে পড়িল। কিন্তু দরজা খোলা!

অজর বুকমানা হাঁৎ করিয়া উঠিল! বা কল্পনা করিয়া মলিনাদি' শিহরিয়া উঠিয়াছিল, তাই? নিশ্চয় চোর। দেহের রক্ত নিমেষের জ্ঞাত-জ্ঞাত-রক্ত হইয়া গেল; বুক-খানাও কাঁপিল! পরক্ষণে মনকে নাড়া দিয়া চাপা করিল। সে আইন পড়িতেছে!...

ঘরের মধ্যে অজ্ঞ প্রবেশ করিল। প্রথমে ছোট একটি দালান; তাবপর ড্রিং-রুম। ড্রিং-রুমে পাশে ছোট কামরা—চাকরদের আস্তানা! ড্রিং-রুমে প্রবেশ করিয়া অজ্ঞ রক্তনিশ্বাসে দাঁড়াইল,—উৎকর্ষ হইয়া। না, কোন সাড়া-শব্দ নাই!

ঘর অন্ধকার। রহস্ত!

সে ধীরে ধীরে হাতভাটয়া আলোব স্নাইচ খুঁজিল—জানিলা-খড়খড়ি বন্ধ; অন্ধকার ঘর। স্নাইচ খুঁজিতে একটা ফুলদানী ফেলিল। সেও যেন পা-ঠুকিয়া হুমড়ি খাটয়া প'ড়ল! অবশেষে খড়খড়ি খুলিল, স্নাইচ মিলিল—সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো! আলোয় কাহারো দেখা মিলিল না!...

সম্পূর্ণে পাশের কামরায় প্রবেশ করিল। ড্রিং-রুম হইতে আলোব রশ্মি সে ঘরের অন্ধকারটুকুকে তরল করিয়া রাখিয়াছিল; আলো জ্বালিতে কষ্ট হইল না! আলো জ্বালিয়া দেখে, সামনে খাট; খাটে বিছানা! বিছানায় চোখ পড়িতে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্ময়ে সারা শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল!

দেওয়ালের দিকে পিঠ করিয়া বিছানায় শুইয়া এক নারী! পায়ের যেটুকু দেখা যায়, নারী রূপসী এবং তরুণী! নারী ঘুমাটতেছে!

গা ছমছম করিয়া উঠিল। তুল করিয়া আর কাহারো ফ্ল্যাটে ঢোকে নাই তো? কুণ্ঠিত ভীত-চিন্তে নিঃশব্দে দেওয়ালের পানে চাহিল। না—ফ্ল্যাট তুল করে নাই! এই ঘর...এই ঘর দেওয়ালে মলিনাদির হাতে বোনা কার্পেটের ছবি!

এ ঘর যদি,...তবে? মলিনাদি বলিয়াছে, ঘর খালি—ফ্ল্যাটে কেহ নাই। দাসী-চাকর ছুটি লইয়াছে। আজ তারা তাদের বাড়ীতেও গিয়াছিল! মলিনাদি হু'দিন এখান হইতে চলিয়া গিয়াছে; বাড়ীতে কেহ নাই—এমনি কথাই বলিয়াছে। আর থাকিবেই বা কে?

ষাঘের দিকে ধীরে ধীরে সে সরিয়া আসিল। খুট করিয়া শব্দ হইল—সঙ্গে সঙ্গে বিছানায় ওদিকে একটি ক্লান্ত নিশ্বাস-শব্দ এবং নারী পাশ দ্বিহিলেন। মুখখানি অন্ধর।

চোর? অসম্ভব!...

অজ্ঞ কিছু হঠিয়া সরিয়া যাইতেছিল। সহসা নারী চোখ মেলিল; চোখ মেলিয়া ক্ষিপ্ত উঠিয়া বসিল এবং ভীত-কল্পিত-কণ্ঠে কহিল—কে?

একটা ঢোক গিলিয়া অজ্ঞ কহিল—আমি অজ্ঞ... মলিনাদির ভাই।

তরুণীর চোখে কোতুহল। অঁচল টানিয়া আপনাকে সম্বৃত করিয়া নারী কহিল,—ও! নবীনদার সম্বন্ধী?

নবীন মলিনার স্বামী। অজ্ঞ কহিল,—হ্যাঁ।

তরুণী হাসিল, হাসিয়া কহিল—দেখুন তো বিপদ!

অজ্ঞর আতঙ্ক বুটিল। তরুণীর হাসি দেখিয়া সে ঘরে আসিল।

তরুণী বিছানা হইতে নামিয়া একটা চেয়ার টানিয়া কহিল,—বসুন...

অজ্ঞ বসিল। তরুণীও বসিল। তরুণী কহিল,—সম্পর্কে নবীনদা আমার cousin; আমি থাকি পাটনায়, আমার স্বামী সেখানে ওকালতী করেন। দাসপুরের রাজার একটা বড় মকদ্দমা আছে। আমার স্বামী এখানে এলেন বড় কৌশলী এন্গেজ কবতে! আমি বায়না ধবলুম, আমাকেও নিয়ে চলো—হুদিন ঘুরে আসি। নিকাসনে আছি; আপনার লোকজনের সঙ্গে দেখা হবে'খন! এলুম। এসে কোথায় নামবো? নবীনদার এখানে আমায় নামিয়ে স্বামী গেলেন রাজার ম্যানেজারের ওখানে। ম্যানেজারের ওখানেই তাঁর থাকবার কথা—কাগজপত্র দেখা—কৌশলী বড়ী যাওয়া—এ-সব কাজ কবতে হবে। আমি সেখানে কোথায় থাকবো?—আমি গাড়ী থেকে নামলুম—নেমে সোজা উপরে এলুম। চাকর ছিল, দোর খুলে বললে, মা-জী গেছেন নেওতা—বাবু গেছেন বাহার। আমি অকূল সমুদ্রে পড়লুম। চাকর বললে,—মা-জীকে খপর দেবো? আমি বললুম—কাল সকালে যেয়ো!...মানে, কাল সকালে চম্কে দেবো ভাবছিলুম।

অজ্ঞ কহিল—আপনি একা?

তরুণী বসিল—একা নই। আমার সঙ্গে আমার এক খুড়তুতো দাওর এসেচে। সে গেছে তার খণ্ডর-বাড়ী—খপর নিতে। তার খণ্ডর-বাড়ী ভবানীপুরে। দেখা-শুনা করে কখন সে ফিরে আসবে—জানি না তো। এখানে এরা কেউ নেই...

অজ্ঞর তরুণ মনে মমতার সীমা রহিল না। সে কহিল,—আপনার খাওয়া-দাওয়া হয় নি?...এঁদের চাকর আর দাসী আজ ছুটি নিয়ে গেছে। আপনার...

তরুণীর অথরে সলজ্জ হাসি—মুখের যা শোভা হইল! অজ্ঞর চোখের পলক তাহাতে পড়িতে চায় না। তরুণী

কহিল,—একটা রাত্রি না খেপে মরে যাবো না! আমাদের ব্রত-ইতির উপোসও মাঝে মাঝে একটু আধটু করতে হয় তো...

অজ্ঞ কহিল—না না... আমি দেখছি...সে উঠিতেছিল।

তরুণী কহিল, কোন দরকার নেই। ব্যস্ত হবেন না ...এরা কবে ফিরবে, তা জানেন? মানে বৌদি আর খুঁকী?

অজ্ঞ কহিল, আমাদের ওখানে গেছেন। কাল বাত্রে খাওয়া-দাওয়া...বোধ হয়, পবন্ত বিকেলে ফিববেন। নরেনদাও ফিরবে পরন্ত। গেছেন হাজারিবাগে—আপিসের কাজে।

তরুণী শুধু কহিল, ও!

অজ্ঞ চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তরুণী.....

তারপর তরুণী কহিল, আপনি এসেচেন বুঝি কেউ নেই বলে রাগে বাড়ী চৌকি দিতে?

অজ্ঞ কহিল, হ্যাঁ।

তরুণী কহিল, ভালোই হলো। জগৎ ঠাকুরপো এখন আসবে—আমার সেই ছাওর। সে ওঁব সঙ্গে জুনিয়ারী করচে। আপনাদের বয়সী...! আপনারা হুজনে এই খাটে শোবেন'খন। আমি পাশের ঘরে...

তরুণী পাকা গৃহীণী আর কথায় বাস্তায় এমন সহজ স্বর! অজ্ঞর শ্রদ্ধা হইতেছিল, শুধু ইহার উপরে নয়, নানী জাতিটির উপর। সে অপরিচিত—সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ তার সঙ্গে কি স্বচ্ছন্দ অবলীলায় আসাপ কবিতেন! নিঃস্বের বাড়ীতে সে নিত্য দেখিতেছে, ঘোমটা-দেওয়া জড়ো-সড়ো তাদের মূর্ত্তি। অপরিচিত কাহারও সাড়া পাইলে ছুটিয়া কোথায় পলাইবে, ভাবিয়া পায় না। যেন ছুনিয়াটা শুধু বাঘের আস্তানা। আর ইনি.....

চমৎকার!.....

অজ্ঞনাথ চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার উচিত কত কি করা...অভ্যর্থনা, সেবা-পরিচর্যা...কিন্তু কি ভাবে সে পরিচর্যায় নামিবে, ভাবিয়া কোনো হদিশ পাইল না।

বাহিরে পথে চলন্ত মোটরর শব্দ, নীচে দরোয়ানের ভজন-গান, তিন তলার পিয়ানোর ঝঙ্কার—সমস্ত গুল্মা মিশিয়া এমন এক মিশ্র ঝঙ্কার তুলিয়াছিল যে, সে ঝঙ্কারে তার কল্পনা ঠোঁকর খাইয়া ফাঁসিয়া চূর্ণ হইতেছিল... কোনো মতে একটা পরিপূর্ণ স্বপ্ন রচিয়া তুলিতে পারিতেছিল না।

সহসা তরুণী কহিল, আপনি কি করেন?

অজ্ঞ কহিল,—স' পড়ি।

তরুণী কহিল,—ওকালতি করবেন?

মুখ তুলিয়া মুহু হস্তে অজ্ঞ কহিল,—ইচ্ছা তো আছে।—হাইকোর্টে?

অজ্ঞ কহিল—না। বোধ হয় পুলিশ-কোর্টে।

পুলিশ-কোর্ট! কথায় বিশ্বাসের চমক!

অজ্ঞ কহিল,—হ্যাঁ। ওদিকে আমার একটু ঝোঁক আছে।

তরুণী কহিল—আপনার বিয়ে হয়েছে?

শিরায় শিরায় কাঁপন বহিল—রোমাঞ্চ! সলজ্জভাবে অজ্ঞ কহিল,—না।...

তারপর স্তব্ধতা! তরুণী কহিল,—আপনারা কি? কথাটা না বুঝিয়া অজ্ঞ কুতূহলী দৃষ্টিতে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল।

মুহু হস্তে তরুণী কহিল—কি গোত্র?

ও! অজ্ঞ কহিল,—চাটুয্যে।

—বাঃ!

তরুণীর সম্মিত-উজ্জ্বল অক্ষ তার পানে চাহিয়া দেখিল। তরুণী কহিল,—আমাব একটি বোন আছে। পূর্ণিয়ার থাকে। এবারে ম্যাট্রিক দেবে। দেখতে চমৎকার। রঙ...

এই অবধি বলিয়া সে নিঃস্বের হাত প্রসারিত কবিতা ধরিল, ধরিয়া কহিল,—আমার চেয়েও রঙ ফর্সা...! নরেনদাকে বলবো, ঘটকালি করতে। বৌদিকেও ছাড়বো না!

একথায় অজ্ঞ একেবারে কণ্টকিত...বাক্যহার্য হইল। তরুণী কহিল,—একটু চা পেলে খেতুম। বৌদির সে ব্যবস্থা কি রকম...

অজ্ঞ কহিল,—আমি দেখছি।...

উঠিয়া অজ্ঞ ওদিককার ছোট ঘরে গেল। এ ঘরে চায়েব সজ্জাম আছে। অজ্ঞ ষ্টোভ জালিল; কেটলিতে জল ঢালিল। ষ্টোভে কেটলি চাপাইবে—দ্রাবপ্রান্তে মিষ্ট কঠেব স্বর জাগিল—আপনাকে এ হাঙ্গামা করতে বলিনি তো...

অজ্ঞ ফিরিয়া চাহিল। তরুণী কহিল,—কোথায় আছে, দেখতে বলেছিলুম...চা-টুকু আমি তৈরী করতে পারি। সন্ধান...

তরুণী আসিয়া অজ্ঞব হাত হইতে কেটলি কাড়িয়া লইয়া তাকে মৃদুভাবে সরাইয়া দিল; কেটলি 'চাপাইয়া কহিল,—একটু উপকার করতে হবে!

—কি, বলুন।

তরুণী কহিল—এই গহনাগুলো যদি রাখবার ব্যবস্থা করেন...গারে দিয়ে সজ্জ, সঙ্গে বসে আছি যেন...

তরুণী কণ্ঠ হইতে একছড়া হার খুলিয়া অজ্ঞর হাতে দিল,—তারপর হাতের ব্রেসলেট...কাণের জুল...

অজ্ঞ কহিল—কোথায় রাখবো?



তরুণী কহিল—তা জানি না। দেখুন না! কোনো টেবিলের টানায়—রাতটার মত!...কিন্তু কাল সকালেই বৌদিকে একবার আনিয়া দেবেন দয়া করে! পরে না হয় আবার যাবে'খন।...এলুম এ্যাদ্ র—তারই বাড়ীতে এসে উঠলুম...দেখা না করে চলে যাবো?...এদের কাজ চুকলেই ষাড় ধরে বলবেন, চলো...দাঁড়াতে দেবেন না এক মিনিট!...

অজ্ঞ কহিল—মলিনাদি'র সঙ্গে আমাদের ওখানে গিয়েই দেখা করবেন। আমি গিয়ে গাড়ী পাঠিয়ে দেবো।

তরুণী কিছুক্ষণ স্তব্ধ রহিল, পরে কহিল,—মন্দ হয় না। নেমন্তন্ন খাওয়া হয়—সঙ্গে সঙ্গে বোনের সব্বন্ধও স্থির করা যায়...কি বলেন?

তরুণীর চোখে বিদ্যুৎ-শিখা! সে শিখার উজ্জ্বল দীপ্তির পানে অজ্ঞ তাকাইয়া থাকিতে পারিল না; মুখ নামাইল।

গহনা হাতে লইয়া সে শয্যাকক্ষের আশ্রিত টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া তার মধ্যে সেগুলি রাখিল; রাখিয়া আবার যখন চায়ের ঘরে আসিল, তখন তরুণী চায়ের ছুটো পেয়ালা জলে ধুইতেছে।

অজ্ঞ কহিল,—আমি চা খাবো না।

তরুণী কহিল—তাও কি হয়! একা চা খেতে ভালো লাগে না! চায়ের পেয়ালায় সঙ্গী চাই। তা ছাড়া বা' ভাবচি, যদি লাগে, আমি হবো আগনার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়া—শ্রাণী!

আনন্দে অজ্ঞর বুকখানা ছুলিয়া উঠিল। বিবাহে তার বড় কচি নাই—বধূর কল্লন'র পরিণীতা-আত্মীয়দের ঘোমটা ও সমস্ত ভঙ্গীর যে আদর-ছবি মনে জাগে, তাহাতে তার চিত্ত বিজ্রোহী হইয়া ওঠে। অমন জড়-পুস্তলি লইয়া জীবনে বাস করা চলে না! জীবনে রস বা বৈচিত্র্য জাগে না! যেন মরুভূমির মধ্য দিয়া কোনোমতে দেহটাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল! বালুকাস্রাবের চাপে মন শুকাইয়া মরিয়া যায়।

এই তরুণী—ইহার বোন...রঙ আরো ফর্শা! সাধা ছনিয়া যেন রঙের টেকার মধ্যে ডুবিয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল!...

কিন্তু না...ইহার খাওয়া হয় নাই।

অজ্ঞ কহিল—বেশ, চা খাবো। কিন্তু আপনাকেও আমার একটা কথা রাখতে হবে।

তরুণী কহিল—কি কথা?

অপাঙ্গ-দৃষ্টিতে সেই হাসির বিদ্যুৎ মিশিল।

অজ্ঞ কহিল—আমি খাবার কিনে আনি...আপনি খাবেন।

তরুণী কহিল,—রাত যে বারোটা বাজে...

অজ্ঞ কহিল—বাজুক। দোকান খোলা পাবো। ধর্ম্মতলায় ভালো খাবারের দোকান আছে।

বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরিত দৃষ্টিতে অজ্ঞকে বিধিয়া তরুণী কহিল—না খেলে মনে দুঃখ হবে?

বিহ্বল-বিগলিত কণ্ঠে অজ্ঞ কহিল,—খুব দুঃখ হবে।

তা হলে আহুন। কিন্তু দেবী করবেন না। একলাটি আছি। ভয় করবে মোক্ষা, জগৎ ঠাকুরপো করুলে কি? এত দেবী! বোঁ এখানে নেই...তবু গুত্তরবাড়ীর উপর এত মায়া!

তরুণী হাসিল। অজ্ঞও হাসিল। তারপর সে কহিল,—আপনি দরজা বন্ধ করে দিন—আমি খাবার এনে ডাকুলে দরজা খুলে দেবেন।

—বেশ কথা!

তাহাই হইল। অজ্ঞ গেল মহা-উৎসাহে ধর্ম্মতলায় দিকে খাবার কিনিতে। তরুণী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল, আশ্রয়-নীড়টুকুকে নিঃশব্দ নিরাপদ করিবার বাসনার।

চৈত্র মাসের উত্তল হাওয়া! সে হাওয়ায় ধর্ম্মতলার নয়, অজ্ঞ যেন কোন স্বপ্নলোকে উড়িয়া চলিয়াছিল।

তরুণীর চেয়েও ফর্শা রঙ...এই কথাটা বুক জুড়িয়া কি রাগিণীই বঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল! মলিনাদিকে আনা নয়, কাল সকালে নরেন্দ্রার বোনকেই তাদের ওখানে লইয়া যাইবে! যে কথা উনি বলিলেন...

যদি ঘটে। আঃ! জীবনের গতি বদলাইয়া যাইবে!

জগৎ-ঠাকুরপো! আসিলে ভাল হয়...না আসিলে ক্ষতি কি! শ্রাণী! সত্য, তার চেয়ে বড় সম্পর্ক, মিষ্ট-মধুর সম্পর্ক আর নাই।

বিবাহ এখনো হয় নাই—তবু অজ্ঞর উপর ইহারই মধ্যে এমন মায়া! তার মনটাও...

আলোর চমক! হাসির চমক! আনন্দের চমক!

বড় চোড়ায় রাজ্যের খাবার ভরিয়া তাহা বহিয়া অজ্ঞ আসিয়া ফ্র্যাণ্টের দোতলায় উঠিল। নিঃশব্দ ফ্র্যাণ্ট! দূরে কোন্ চীনার মাতলামির একটা কর্কশ রব শুধু কাণে বাজিতেছিল।

বিস্মিত মনে ঘরে ঠেলা দিল...ঘার ভেজানো ছিল—খুলিয়া গেল। অন্ধকার ঘর। বুমাইতেছেন?...

সুইচ্-টিপিয়া আলো জ্বলিয়া খাবারের ঠোঙা হাতে ঘরে ঢুকিল...সব শূন্য।

চাষের ঘর—পেয়ালার উপর পিরীচটা উপড় করিয়া বসানো। তরুণী নাই।

বাথরুম? বোধ হয়, গা-হাত ধুইতে গিয়াছেন!...

খাবারের ঠোঙা টেবিলের উপর রাখিয়া সে আসিয়া শয়ন-ঘরের চেরাবে বাসল...বুকখানার মধ্যে যে স্পন্দন জাগিয়াছিল...

সে স্বপ্ন দেখিতেছিল!...সজ্জিত ঘর...বিছলী বাতির আলোর ভরপুর...একধাবে একটা পিয়ানো...সেই পিয়ানোর ধারে বসিয়া...

পিয়ানো বাজিতেছিল সত্যি! সামনের জু'তলা বাড়ীর কামরার! চমৎকার রাগিণী...

স্বপ্ন ভাঙিল। ঘড়িতে দুটা বাজিল। সেই শব্দে। চমকিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বাথরুমের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল—দিদি—

নিজেই স্বরে নিজেই চমকিল। লজ্জাও হইল। দিদি? ...ছি ছি...

কোনো সাড়া নাই। আবার ডাকিল—দিদি..

আবার...আবার...বার-বার...

কোন সাড়া নাই! বিষয়ে সে ফিরিয়া আসিল।

শয়ন-ঘর।...চারিদিকে চাহিল...

ও কি! আলমাবির দরজাটা খোলা? তাই।

টানিতে দেখে,—চাবি ভাঙা। চাড় দিয়া কে ভাঙিয়াছে। ডরার টানিল...খালি ডরার। শুধু একখানা চিঠির মত ভাঁজ-করা কাগজ।

সেটা হাতে লইয়া ভাঁজ খুলিল—তাহাতে লেখা

—সাম্যের যুগে উপায় নাই! পুরুষের সঙ্গে নারী সকল ক্ষেত্রে যোগ না দিলে দেশের দুঃখ ঘুচিবে না। বুদ্ধিতে নারী ছোট নয়। এ-কাজে নারীর বিধি-মন্ত বহু সুবিধা আছে। এই রূপ, এই যৌবন—তার শক্তি সামান্য নয়।

ফ্ল্যাটের একটা ঘরে ভাড়াটিয়া ছিলাম। ছোটখাট চুরি এ ফ্ল্যাটে হইয়াছে—তার অন্তরালে আমার কৌশল।

আজ এ ফ্ল্যাট! সব সংবাদ রাখিতাম। ঘরে ঢুকি-মাত্র আপনার পায়ে শব্দ পাই। বিছানার পড়িয়া উপায় ভাবিতেছিলাম।

একটা প্লট ঠিক হইল। জাগিয়া ফিফিয়া আপনাকে দেখিলাম।—নব্য তরুণ! পথ সহজ হইয়া গেল।

দেবাজে গহনা-পত্র বা ছিল, লইয়া চলিলাম। আপনার কাছে যে ছুখানি গহনা জিন্মা দিয়াছিলাম—সে ছুখানি কাল সংগ্রহ হইয়াছে পাশের ফ্ল্যাট হইতে। সে বাড়ীতে ব্রাহ্মবী-বেশে গতিবিধি ছিল।

আজিকাব এ ব্যাপারের পর এ-পাড়া ছাড়িলাম। আমার কোন বোন নাই—থাকিলে গোত্রের বাধিত। নহিলে আপনার মত গোবেচারা-পাত্র হাত-ছাড়া করিতাম না। ইতি

শ্রীমতী বিহবল-কারিণী  
শ্যালিকা।

অজর পা টলিতেছিল। মাথায় হাত রাখিয়া সে খাটের পাশে বসিয়া পড়িল।

# আদর্শ স্বামী

ট্রেনে ডেলি প্যাশেঞ্জার। সকালে ৮-৫০এর ট্রেন, সন্ধ্যায় ৬-৪৭। কামবাটি প্রায় পরিচিৎ-দলে রিজার্ভ। খুচরা প্যাশেঞ্জার যদি কামরায় উঠিয়া পড়েন তো তাঁর দশা হয় কতকটা সেই fish out of waterএর মত।

শশাঙ্ক টিটাগড়ের প্যাশেঞ্জার। সেদিন ট্রেনে চড়িল, শশাঙ্কর হাতে একটা বড় খাম। অবু কহিল—পুলিন্দা কিসের?

শশাঙ্কের দল আসে হালিসহর হইতে। তাদের আসর তাতে সবগরম। পঞ্চাশ কাবার করিয়া হঠাৎ এমন চাঁৎকার তুলিল যে, এক খুচরা প্যাশেঞ্জারের কোলে ঘুমন্ত শিশু সে-চাঁৎকারে ঘুম ভাঙ্গিয়া ককাইয়া উঠিল।

দুই চোখে আনন্দের মশাল জ্বালাইয়া শশাঙ্ক কহিল,— আমার স্ত্রী আটিকলু লিখেচে... ক্যালকাটা পিওর অয়েল কোম্পানি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা করচে কি না—ফার্স্ট প্রাইজ কুড়ি টাকা নগদ, আর তাদের ঘানির বুশিক-মার্কি আড়াই সের পিওর মাষ্টার্ড অয়েল!

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। সে হাসিতে ভড়কাইয়া শশাঙ্ক কহিল,—সত্যি। এই ছাথে...

খামখানা সে চোখের সামনে ধরিল। মেয়েলি হাতের লেখা ঠিকানা—“ম্যানেজার, ক্যালকাটা পিওর অয়েল কোম্পানি, গোয়াবাগান, কলিকাতা।”

খামের মাথায় লাল কালিতে লেখা “প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা।” লেখা আঙুর-লাইন করা।

খামের মুখ আঁটা ছিল না। তারাদাস খামের মধ্য হইতে ফশ্ করিয়া প্রবন্ধটা টানিয়া বাহির করিল। ফুলক্যাপ সাইজে লেখা বারো পাতা প্রবন্ধ।

আমরা কহিলাম—পড়ো হে শশাঙ্ক।

রোহিণী বলিল—শশাঙ্ক লিখে দিয়েচিস?

শশাঙ্ক কহিল,—না ভাই, সত্যি না।

রোহিণী কহিল—তোর বোয়ের এ বোগ ছিল না তো...

মুহূ হান্তে শশাঙ্ক কহিল—মাঝে মাঝে লেখে—তবে ছাপানো হয় না। আর লিখবে না কেন, বলো? ওর এক খুড়ী যে উপভাস লেখেন। মানে, আমাদের এক খুড়শাণ্ডী—নাম শোনেনি ঐমতী কুঞ্জকামিনী দেবী?

সকলে কহিল—না।

আমি কহিলাম—গোলমাল রাখো। পড়ো, কি লিখেচে।

শশাঙ্ক কহিল,—তারা প্রবন্ধ চায়—“আদর্শ স্বামী”— আর শুধু মেয়েদের লেখাই এ competition-এ গ্রাহ্য হবে।

তারাদাস কহিল,—বটে! তা এ আদর্শ স্বামীটি কি পদার্থ? তোমার জীবন-বৃত্তান্ত? স্ত্রীর কথার নড়েন-চড়েন-ওঠেন-বসেন—তাস খেলতে বেরোন না—রাজে ছেলে কাঁদলে নিজে উঠে ঘুম পাড়ান—স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গান না—ইত্যাদি...?

বিরক্ত-ভাবে শশাঙ্ক কহিল—না, এ জীবন-চরিত নয়। প্রবন্ধ।

রোহিণী কহিল,—ও!

আমি কহিলাম,—গোলমাল করো কেন? আঃ! শোনো স্থির হয়ে...

কোরাশে বব উঠিল,—আচ্ছা, আচ্ছা...

ট্রেন থামিল খড়দায়। কামরায় প্রবেশ করিল বৈজনাথ আর রাইচাঁদ।

আমরা কহিলাম—চুপচাপ বসে যাও। শশাঙ্কর স্ত্রীর লেখা পড়া হবে। অয়েল প্রতিযোগিতাব লব্ধ লেখা—প্রবন্ধের নাম—“আদর্শ স্বামী।”

বৈজনাথ কহিল,—O. K.

অকসেসে সে সাতবেঁদে শাশু-কেরাণী—চিঠি-পত্র লেখে। কাজেই একটু সাতবেঁদে-ঘেঁষা—তার উপর হাতে তার চকিশ ঘণ্টা ক্রশ ডামা, স্প্যানিশ গল্প! আর জাপানী কবিতার বই। মস্তব্যাদি যা করে, তা ঐ জটিল ইংরেজী ভাষায়। আমরা ইন্টারামডিয়েট ফেল কারয়াছি। সে-সব কথা কোনো কেতাবে পড়ি নাই!

শশাঙ্ক প্রবন্ধ-পাঠ শুরু করিল,—

“আমাদের এই ভারতবর্ষে স্বামীর আদর্শ খুঁজিতে যাওয়া বিড়ম্বনা! স্বামী এখানে দেবতার তুল্য। স্বামী যেমনই হন, স্ত্রেরিক্ত বা দুশ্চরিত্র বা রোগগ্রস্ত বা তন্দুর বা বাটপাড় হন,—ভারত-রমণীর তিনি ধ্যানের দেবতা, ইহকাল-পরকাল, সাক্ষৎ নারায়ণ—”

রোহিণী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—আহা! চমৎকার লিখেচেন তো বোঁমা! আমাদের স্ত্রীরা যদি এ কথার দামটুকু বুঝতো...

তারাদাস কহিল,—সংসার স্বর্গ হতো!

অবু কহিল,—শশাঙ্ক is a happy husband.

বৈজনাথ কহিল,—Happy-hubby!—husband

কথাটা একেবারে সেকালের, অচল! Hubby হলো fond form—বুঝলে!

আমরা কথা কহিলাম না।

শশাঙ্ক পড়িতে লাগিল,—

“স্বামীর আদর্শ-প্রসঙ্গে আমরা প্রথমে তাঁর দেহ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে চাই। পূর্বে বলিয়াছি, স্বামী স্ত্রী হোন, বিস্ত্রী হোন, বেঁটে হোন, ঢাড়া হোন, কালো হোন, ফর্সা হোন, মোটা হোন, রোগা হোন, গরীব হোন, ধনী হোন, নারীর তিনি উপাস্ত দেবতা! তবু কুমারী বয়সে নারী স্বামীর একটি বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করিয়া মন-মন্দিরে সেই রূপ-বিশিষ্ট মূর্তি স্থাপন পূর্বক তাঁহার ধ্যান করেন। সেই ধ্যানের রূপ প্রত্যক্ষ স্বামীর রূপের সহিত না মিলিতে পারে—সে তো ভাগ্যের কথা! আমরা প্রত্যক্ষ স্বামীর কথা ছাড়িয়া কাল্পনিক স্বামী মূর্তির একটা আভাস দিবার প্রয়াস পাইব—”

বাধা দিয়া রোহিণী কহিল—সত্যি জ্ঞীর লেখা?

শশাঙ্ক সক্রোধ দৃষ্টিতে রোহিণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

রোহিণী কহিল,—রূপবিশিষ্ট, প্রত্যক্ষ, আভাস, প্রয়াস—এ সব কথার বানানও আমি জানি না যে রে, মানে তো দূরের কথা। প্রয়াস মানে কি রে?

শশাঙ্ক কহিল—আমার স্ত্রী ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিল!

আমি কহিলাম,—প্রয়াস মানে চেষ্টা।

রোহিণী কহিল,—ও!

শশাঙ্ক আবার পড়িতে লাগিল,—

“স্বামীর দেহ হইবে দৈর্ঘ্যে ছ’ফুট। কবি কালিদাস পৌরুষের চিত্র আঁকিয়াছেন—শালগ্রাম মহাভূজ। সুরভাঃ এ দৈর্ঘ্য আদর্শ আমরা বিশেষ হইতে আম-  
দানি কগিতেছি না! দৈর্ঘ্য ছ’ফুট না হইলে পুরুষ মানুষকে মানায় না! তাব পর সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে, পুরুষের দৈর্ঘ্য সংসার-পথে বিশেষ সুবিধা ঘটায়! যেমন, স্বামী সপরিবারে পূজার ছুটিতে পশ্চিমে চলিয়াছেন; ষ্টেশনে খুব ভিড়! স্ত্রী ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া মাথা নত করিয়া ট্রেনে উঠিতে চলিয়াছে—ভিড়ে স্ত্রী যদি পিছাইয়া পড়ে তো সামনে চাহিলেই দেখিবে, বিপুল জনতার মধ্যে হিমালয়ের শিখরের মত দীর্ঘ-দেহ স্বামীর “জাগিছে উচ্চ শির”! মহাভূজ বা আজমুলম্বিত বাহুর প্রয়োজন কেন?

কারণ বলি—আজকাল ফুটবল খেলা দেখা ছেলেদের একটা নিত্যকর্মে পরিণত হইয়াছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লইয়া পুরুষ মাঠে গেলে ছেলেমেয়েরা জনতা ভেদ করিয়া খেলা দেখিতে যদি না পায়, মহাভূজ পুরুষ তাহাদের হাতের তুলিয়া ধরিবেন, এবং ছেলেদের খেলা দেখায় তাহাতে

প্রচুর সুবিধা ঘটিবে! তাছাড়া গাছ হইতে ফল-ফুল পাড়া, শেলফে কাশ্মির-আচার তুলিয়া রাখা, মশারি টাঙানো, খাট-তক্তাপোষের তলার ঝাঁটা ব্লাইয়া দেওয়া, এমনি বিবিধ কার্যে আদর্শ পুরুষ যে কত সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না! আর দেহের দৈর্ঘ্য হেতু—স্বামীর মাথায় যদি টাক পড়ে তো সে টাক পথের পথিকদেব দৃষ্টিগোচর হইবে না।

“তাঁহার প্রকৃতি হইবে শান্ত, নিরীহ। সংসারে কুরুক্ষেত্র মহাসাগর বাধিয়া গেলেও তিনি নির্ভীকর ত্র্যম্বকের মত ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন; স্ত্রীকে তাহা হইলে সংসার-পরিচালনায় বেগ পাইতে হইবে না। স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী, গৃহের কর্তা। আমরা ভালো করিয়া জানি, এক-জনের কর্তৃত্বেই শৃঙ্খলা থাকে—হৃজনের কর্তৃত্ব শান্তি-শৃঙ্খলার বিশেষ পরিপন্থী। সংসারে যতই ব্যয় হউক, স্বামী সেদিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না—এজ্ঞ তাঁর প্রকৃতিতে চাই মহত্ব, উদারতা, দানশীলতা।”

ট্রেন দমদমায় থামিল—যথাসময়ে। এক ঝাঁক লোক কামরায় উঠিয়া কামরা একেবারে ঠাণ্ডা ব্লাক-হোলে পরিণত করিয়া তুলিতে চায়—এমন কাণ্ড! প্রবন্ধ-পাঠে কাজেই ব্যাঘাত ঘটিল।

আমি কহিলাম—এই প্রবন্ধ তুমি পাঠিয়ে দেবে আজ?

শশাঙ্ক কহিল—নিজে গিয়ে দিয়ে আসবো—রসিদ আনবো। শেষে বাছাদনরা না বলতে পারেন, প্রবন্ধ পাইনি মশায়—হঁ।

আমার প্রজ্ঞা জাগিতেছিল—স্ত্রীলোক এমন চমৎকার ভাষা জানে, এমনভাবে গুছাইয়া-সাজাইয়া লিখিতে পারে! বাঃ!

নারী-প্রগতির উজ্জ্বল দৃশ্য মানস নয়নে ভাসিয়া উঠিল। নারীর দল কাগজ কেতাব লইয়া ভারী কলরব তুলিয়াছে, আব পুরুষের দল সভয়ে ছিটকাইয়া মূঢ়ের মত সরিয়া গিয়াছে।

তারাদাস কহিল—কিন্তু মা-লক্ষ্মীর স্বামীটি—মানে, শশাঙ্ক এ-আদর্শের একেবারে উল্টো! চেহারা বেঁটে, মোটা,—মেজাজ খিটখিটে!

শশাঙ্ক কহিল—আমার কথা তো হচ্ছে না! এ হলো আদর্শ স্বামীর কথা অর্থাৎ ঐ কল্পনার রূপ-বিশিষ্ট স্বামী—সুন্দর তো!

শিবু বসিয়াছিল এক কোণে—সে কথা কয় কয়—আর ট্রেনে চড়িয়া বাঙলা নভেলের পৃষ্ঠায় তন্ময় থাকে। আজও তাই। সে কথা কহিল। বলিল,—লেখা শুনলুম। লেখা থেকে বুঝি, শশাঙ্ককে শশাঙ্কের স্ত্রী মোটে পছন্দ করে না—লেখার লাইনগুলোর মধ্য দিয়ে বরাবর একটা

বেদনার নিখাস ঝরে বয়ে চলেছে—লক্ষ্য করেচো? এই এখনকার নভেলে পড়ি—এই ক্লোভ আর জুপুব বেলায় নির্জন পল্লীভবন...ওব প্রাণ মনে মনে অমনি কাকে ভালো বেসেচেন—ভালো বাসেন—এ আমি জোর গলায় বলতে পারি!

আমরা সকৌতুহলে শিবু পানে চাহিলাম।

শিবু কহিল—এই অভূতপূর্ণ থেকে আদর্শের সন্ধান...

তার মুখের কথা লুকিয়া বৈজ্ঞানিক কহিল—and seeking for love at suitable quarters...

বৈজ্ঞানিকের ইংবাজী ভাষা আমরা ঠিক বুঝি না—এ কথার সম্বন্ধেও তাই ঘটিল। কিন্তু সে কথা স্বীকার করা চলে না, কাজেই হা-হা, হি-হি হাসি সকলের অধরে—যেন বিদ্যুৎ বজ্রিয়া গেল! শশাঙ্কর যে-ভাব হইল, বলিবার নয়! যেন সেই “পাণ্ডুর শশধর স্নান অন্তাচল!”

তার পরই শেয়ালদা ষ্টেশন! ভীষণ চীৎকার...কর্দ-চক্রের ঘর্ঘর ধ্বনি!

সে ধ্বনি, সে চীৎকারের মধ্যে আদর্শ স্বামী কোথায় যে ডুব মারিল!—

হু'মাস পরে সেই টিটাগড় ষ্টেশন...হাসি-মুখে শশাঙ্ক কহিল,—কাল এনেচি নগদ কুড়ি টাকা আর ‘বুচিক-মার্ক’ পিওর মাষ্টার্ড অয়েল।

আমরা তার পানে চাহিলাম।

শশাঙ্ক কহিল—মনে পড়ে না? আমার জীবের লেখা সেই প্রবন্ধ—ফাষ্ট প্রাইজ পেয়েচে—

শিবু কহিল,—জী খুঁকে পেয়েচেন বে—তার ও আদর্শ?

আমাদের দৃষ্টি শশাঙ্কর মুখ হইতে সরিতে চায় না! শশাঙ্ক কহিল—লেখাটা আমার। তবে টাকাটি গৃহিণী কেড়ে নিয়েচেন। তেলটা সত্যি খাশা—গৃহিণী বলছিলেন, কি স্বীজ! কড়ার চড়িয়ে সামনে দাঁড়ায়, কার সাধ্য! হাঁচতে হাঁচতে—ওঃ!

# ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

রবিবার। আশ্বিন মাসের ৩৮৮ তারিখ। বাতাসে শারদীয় অশ্বিন জাগিয়াছে। সতীনাথ দোতলার ঘরে বসিয়া একখানা পুৰানো টাইম-টেবলের পাতা উন্টাইতে-ছিল; পত্নী প্রমদা পাশের ঘরে বসিয়া ষ্টোভ আলিয়া শিঙাড়া ভাজিতেছে।

দু'একখানা ভাজা হইলে একটা প্লেটে তুলিয়া প্রমদা আসিয়া সতীনাথের কাছে দাঁড়াইল, কহিল,—ঝাঝে তো খেয়ে, ঠিক হলো কি না!

সতীনাথ মুখ তুলিয়া প্লেটের পানে চাহিয়া কহিল,—এই সকালে শিঙাড়া! অথল বুক জলে মবি আর কি! সারা দিনটা বরবার বাবে!

প্রমদা জ্ব কুঞ্চিত করিল, কহিল,—তা তো বটেই! ঘরে তোলা গাওয়া ঘী, তাতে ভাজি...অথল হলেই হলো!

সতীনাথ করুণ দৃষ্টিতে প্রমদার পানে চাহিল; প্রমদা কহিল,—কত রসই জানো! বাজারের খাবার নয় কি না! যখন বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিশে বেলা বারোটায় দোকান থেকে হিঙের কচুরি আনিয়া খাওয়া হয়, তখন তো অথলের ভয় করে না!...প্রমদা থামিল।

একটা নিশ্বাস পড়িল; সঙ্গে সঙ্গে সে কহিল,—এ যে আমি তৈরী করেছি—মুখে কচবে কেন?...

প্রমদার মুখ-চোখ সজল হইয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল,—অমনি অভিমান! দাও বাপু তোমার শিঙাড়া, খাই।

প্রমদা কহিল,—থাক! মলিনার জন্ম তৈরী করছিলুম। সে ভালো বাসে, একদিন বলেছিল, আমার হাতের শিঙাড়া ভালো লাগে, তাই। ভাবলুম, মূণ-টুন সব ঠিক হলো কি না, তোমার খাইয়ে বুঝি। তা...

আবার একটা নিশ্বাস!

প্লেট হাতে তুলিয়া সতীনাথ কহিল,—খাচ্ছি গো, খাচ্ছি!

প্রমদা কোন কথা কহিল না। সতীনাথ শিঙাড়া খাইতে লাগিল।

প্রমদা কহিল,—মূণ কম-বেশী হয় নি?

দু'খানা শিঙাড়া নিঃশেষ করিয়া হাসিয়া সতীনাথ কহিল,—তা তো বুঝলুম না...

প্রমদা কহিল,—আচ্ছা লোককে চাকাতে এসেছি।

প্রমদা গমনোন্মত্ত হইল। সতীনাথ কহিল,—নিজে

তৈরী করতে করতে দু'চার কামড় দিয়ে পথ করলেই পারো! কথায় বলে, আপু'কি খানা।

হাসিয়া প্রমদা কহিল,—তোমার মত রাধুনি হলে তাই করতুম!

প্রমদা বাহিরে গেল। সতীনাথ কৌচর খুটে হাত মুছিয়া আবার টাইম-টেবলের পাতা খুলিল...ভাড়ার 'নির্ঘণ্ট' দেখিয়া কাগজ-পেন্সিল টানিয়া কি হিসাব ফাঁদিল।

প্রমদা দ্রুতপদে আসিয়া আবার ঘরে ঢুকিল, তার হাতে সেই প্লেট!

প্রমদা কহিল,—খাও, গরম গরম একখানা মুখে দাও দিকিনি। হাঁ করো, আমি খাইয়ে দি...

সতীনাথ নিঃশব্দে হাঁ করিল, প্রমদা শিঙাড়া ভাজিয়া সতীনাথের মুখে ফেলিল। সতীনাথ মুখ বুজিয়াই উঃ করিয়া আর্ন্ত রব তুলিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিঙাড়ার ডালা মুখ হইতে বাহির করিয়া দিল।

প্রমদা কহিল,—ও কি হলো?

সতীনাথ কহিল,—পুড়ে মরেছিলুম আর কি! ভিড়টা বোধ হয় গেছে! চট্ করে হাইড্রোজেন পেরক্সাইডটা আনো দিকিনি...

স্থির দৃষ্টিতে প্রমদা স্বামীর পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—কচি খোকা! দেখো...!

কথাটা বলিয়া স্রুত পদক্ষেপে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিল।

সতীনাথ মূহু হাসিল, হাসিয়া হিসাবের কাগজে মন দিল।...

বাহিরে কঠিন,—সতী আছো...

সতীনাথ সাগ্রহে কহিল,—ললিত! চলে এসো...

ললিত বন্ধু। হুজনে অন্তরঙ্গতার সীমা নাই। বহু বৎসর ধরিয়া সেই কলেজের ফাষ্ট ইয়ার ক্লাশ হইতেই এ অন্তরঙ্গতা সমান রহিয়াছে! সুখে-দুঃখে পরস্পরে পরস্পরের পাশে দাঁড়াইয়া আসিতেছে চিরদিন। এবং এ অন্তরঙ্গতার ফলে ললিতের দ্বী মলিনা আর সতীনাথের দ্বী প্রমদা হুজনের সখীও বেশ নিবিড়। অর্থাৎ দুটি তরুণ পরিবারে হুজতার সীমা নাই।

ললিত কহিল,—বাড়ী ঠিক হলো হে। ঐ ভিহিবী-অন-শোণেই বাওয়া বাক। বাড়লা যা জোগাড় হয়েছে, ফাষ্ট ক্লাশ! একেবারে শোণের ঠিক উপরে।

সতীনাথ কহিল,—শোণে বজা নামে। শেষে...

হাসিয়া ললিত কহিল,—রামচন্দ্র! সেবারে অত বড় বজার বেহারের বহু দেশ ভেসেছিল, কিন্তু ডিহরীর কোনো ক্ষতি হয়নি। Co-relative যে...ডিহরীর নামই হলো ডিহরী-অন্-শোণ—শুধু ডিহরী নয়!...

ললিত প্রকেশণি করে—ফিলজফিতে এম, এ।

সতীনাথ কহিল,—হুঁ। আমি তা হলে মিছে হিসাব কবে মরি কেন?

ললিত কহিল,—কিসের হিসাব, শুনি...

সতীনাথ কহিল,—আমি ভাবছিলাম, বৈজ্ঞানিক-ধামে যাওয়া যাবে।

—বাড়ী?

সতীনাথ কহিল,—মিষ্টার সরকারের বাড়ী আছে। পাওয়া যাবে—বলেচেন।

ললিত কহিল,—বৈজ্ঞানিক ভাবী ভিড়। সকলে যায়! ডিহরী নির্জন জায়গা...বাঙলা যে ক'খানি আছে, তার সংখ্যা আজুলে গণ্য যায়।...এঁরা দুই সখীতে বলছিলেন, ভিড়ের মধ্যে এঁরা যাবেন না! নির্জন জায়গা এঁদের পছন্দ।

—বেশ!

সতীনাথ হাঁকিল—ওগো...

পাশের ঘর হইতে 'ওগো' বলিল,—যাই।

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী প্রমদার প্রবেশ। তার হাতে প্লেট; প্লেটে শিঙাড়া।

প্রমদা ললিতের সামনে প্লেটটা আগাইয়া ধরিয়া কহিল,—নি, খান্ দিকনি। গরম আছে!

ললিতের দুই চোখ স্ত্রগোল হইয়া উঠিল। সেই স্ত্রগোল চোখের দৃষ্টি প্রমদার মুখে নিবদ্ধ করিয়া ললিত কহিল—এখন?

প্রমদা কহিল,—আপনাদের কি যে ভয়!...বিবাহ। না হয় একটু বেলা কবে ভাত খাবেন!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ললিত কহিল,—সতীনাথ...?

সতীনাথ কহিল,—আমার ভোজন শেষ হয়েছে। প্রথমেই চেখেছি—চেখে চাখলান্দা হয়ে বসে আছি। এবার তোমার পালা। বিশেষ যখন এ-ভোজ্য শ্রীমতী মলিনা দেবীর জন্ত তৈরী হচ্ছে, তুমিই right person তাঁর মুখের মত শিঙাড়া হয়েছে কি না, সে সম্বন্ধে opinion দিতে...

ললিত কহিল,—কি রকম?

সতীনাথ হাসিয়া কহিল,—তাঁর অধরের taste সম্বন্ধে তোমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, এবং তা প্রচুর!

প্রমদা সলজ্জভাবে কহিল,—এ রসিকতার কথা বলবো'খন মলিনাকে।

সতীনাথ কহিল,—বেশ! আমি মিথ্যা কথা বলিনি, অপমানের কথাও বলিনি! এই তুমি...তোমার অধরের টেই সম্বন্ধে আমার যে অভিজ্ঞতা আছে, সে অভিজ্ঞতা কি ললিতের আছে? না, আর কোনো...

কথা শেষ হইল না। প্রমদা সতীনাথের দুই ঠোঁট হাতে চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—ঠোঁট জ্বলচে। এক খুরি ময়দার কাই কবে এনে দুটি ঠোঁট জুড়ে দিচ্ছি—রসিকতার দম বন্ধ হয় কি না, দেখি। ইতার কোথাও কবের! ওকালতি করো কি না—যত নিঃস্বপ্ন লোকের সঙ্গে সম্পর্ক দিবা-রাত্রি...

প্রমদার কবল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া কবজোড়ে সতীনাথ কহিল,—ক্ষমা করো, দেবি! তোমার শাসনের ইঙ্গিতই পর্যাপ্ত! আর কাইয়ের প্রয়োজন হবে না। কবি বলেচেন...

অথব অধরে বসি প্রহরীর মত

চপল কথার দ্বার রাখুক কুধিয়া!

তুমি সে পরম-কাম্য পশ্চাৎ ত্যাগ করে যে বর্ষব প্রথায় অধরের দ্বার বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলে, তাতে বিভীষিকা প্রচুর! অতএব...

প্রমদা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ললিতের পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—মুণ ঠিক হয়েছে?

ঘাড় নাড়িয়া ললিত কহিল,—খাশা হয়েছে। এ প্লেটটা নিঃশেষ করি। অসুবিধা ঘটবে না?

প্রমদা খুশী-মনে কহিল,—না। গাওয়া ঘী ঘরে তৈরী করেছিলুম; তাতে ভাঙচি। কোনো অসুখ করবে না।

ললিত কহিল,—তুচ্ছ অশ্লের ভয়ে যদি এ প্লেট নিঃশেষ না করি, তাহলে অসুতাপের সীমা থাকবে না।

সতীনাথ কহিল,—ও কথা থাক। ললিত বাড়ী ঠিক করেছে গো—ডিহরী-অন্-শোণে। পছন্দ হবে তো?

প্রমদা কহিল,—তোমরা যেখানে নিয়ে যাবে, সেই-খানেই যাবো। আমাদের আবাব পছন্দ-অপছন্দ কি!

সতীনাথ কহিল,—সে কি। তোমাদের মতকে শিরোধার্য্য করেই যে আমরা ছ'জনে কর্ত্তপথে বাড়া করতে চাই। আমাদের তাই ব্রত!

প্রমদা কহিল,—অত তত্ত্ব-কথা জানি না! আমরা বলেচি, এই ভিড়ের মধ্যে যাবো না। শিমুলতলা, বজ্রনাথ, মধুপুর, পুরী—এ-সব জায়গা ছেড়ে আর-যেখানে হোক!...মানে, এখানে এই ভিড়ের কচকচি, আবাব বাইরে জিকতে গিয়েও যদি সেই ভিড় মেলে...

ললিত কহিল,—না, না—ডিহরীতে মোটে ভিড় নেই।

প্রমদা কহিল,—বেশ! মলিনা জানে?

ললিত কহিল,—ঠিক হয়েছে, তা জানে না। ডিহিরীতে বাড়ী ঠিক করতে চলেছি, এ কথা তাঁকে বলে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।

ব্যাপার আর একটু খুলিয়া বলি। ক'জনে বাহির হইয়া পূজার ছুটিটা এবার পশ্চিমের কোনো জায়গার একসঙ্গে কাটাইয়া আসিবে, স্থির হইয়াছে। এক বাড়ীতে বাস, আবরাম সঙ্গ-সাহচর্য...অনন্দের সীমা থাকিবে না। সতীনাথ তাই টাইম-টেবল্ লইয়া হিসাব করিতেছিল, কোথায় বাইতে কত খরচ পড়ে—এবং আত্মীয়-বন্ধুদের মধ্যে কাহার কোথায় বাড়ী আছে; থাকিলে বিনা ভাড়ায় কাহার বাড়ী মেলে, তাহারই সন্ধানে ললিত ঘোরাফেরা করিতেছিল।

ডিহিরীতে বাড়ী পাওয়া গিয়াছে, ভাড়া লাগিবে না—সেই সংবাদ লইয়া সে এখন আসিয়াছে।

## ২

বাঙালোথানি চমৎকার। পিছনে শোণের বৃকে বালি ধু-ধু করিতেছে; মাঝে মাঝে জল। রেলের ঐ প্রকাণ্ড পুল। পথে লোকের ভিড় নাই! গাড়ীর মধ্যে সেই সনাতন একা! কোনো বকমে ক'খানা ভাঙ্গা তক্তা জুড়িয়া তলায় ছটা চাকা লাগাইয়া দিয়াছে; এবং ঘুতপত্র একটা ঘোড়ার গলার সঙ্গে একগাছা দড়ি দিয়া তক্তাটাকে বাঁধিয়াছে—ঘোড়া দৌড়িলে সেই সঙ্গে চাকা-বাঁধা তক্তাপ্রকাণ্ডে দৌড়িতে হয়! এই গাড়ী! ছ'চারখানা মোটর কচিং দেখা যায়!

বাড়ীতে ফটকের পর বাগান,—বৃত্তাকারে বাগানটুকুকে বেড়িয়া ত্রুণাজল পথ গিয়া বাঙলোর সিঁড়ির পাশে ঠেকিয়াছে। ফ্লোরের উপর বাঙলো। সামনে লম্বা টানা বারান্দা...বারান্দার ছিদ্রকে ছানা ঘর; সামনে একখানা হল ঘর। পাশের দুই ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন দুটি বাথ-রুম; ওদিকে রান্নাঘর। ভৃত্যদের ঘর স্বতন্ত্র হাতায়। একটা আস্তাবল আছে। আস্তাবলের মধ্যে একখানি জীর্ণ-মলিন টঙ্গা চাকা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া আছে। চাকার কাঠে ও কম্পাশে উই ধরিয়াছে।

দিন অনন্দের কাটিতেছিল। বেড়ানো, গল্প, গান...মাঝে মাঝে ট্রেনে করিয়া সাসারাম, কিংবা গরায় যাওয়া হয়। সেখান হইতে তরী-তরকারী কিনিয়া আনা—সুখধুর বৈচিত্র্য!

এক সপ্তাহ কোথা দিয়া যে কাটিয়া গেল! তার পর কোলাগরী লক্ষ্মীপূজার রাতে যা ঘটিল, বলি।

ললিত সকালে কান্দী গিয়াছে। তার পিগেমশার

আর শিশিমা সেখানে থাকেন...তাই। দু'দিন পরে ফিরিবে। বাঙালীদের ক্লাবে সন্ধ্যার সতীনাথের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে গান-বাজনার ব্যবস্থা আছে, এবং কিঞ্চিৎ জরুরোগ।

ক্লাব সাংঘিয়া সে বাঙলোয় ফিরিল, রাত তখন ন'টা। ফিরিয়া দেখে, সামনের বড় ঘরে আম-কাঠের যে বড় টেবিল, সেই টেবিলের দুই প্রান্তে দু'খান চেয়ার। চেয়ারে বসিয়া মলিনা ও প্রমদা। মুখ গম্ভীর...কথা বা হাসির রেখাও নাই!

এই টেবিলে ভোজনের ব্যবস্থা। টেবিল হইলেও ভোজ্য সনাতন বস্ত্রীয় প্রথা,—ভাত, ডাল, ঝোল, অম্বল, নুচী, তরকারী।

সতীনাথ আসিয়া সম্মিত মুখে কহিল—কি! হুজনে এমন চূপচাপ বসে যে! খাওয়া-দাওয়া চুকেচে?

প্রমদা গম্ভীর স্ববে কহিল—না!...

সতীনাথ কহিল—থাবার দিতে বলো তাহলে। আমি এখন মুখ-হাত ধুয়ে তৈরী হচ্ছি।

সতীনাথ চলিয়া গেল। মুখ-হাত ধুইয়া যখন ফিরিল, টেবিলে তখন এনামেলের থালা পড়িয়াছে। থালায় লুচি, ভাজি...ঠাকুর কাপে করিয়া ডাল-ঝোল আনিয়া দিল।

সতীনাথ কহিল,—ব্যাপার কি?

কেহ উত্তর দিল না।

হুজনের পানে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে কহিল—বাঃ! হুজনেই গম্ভীর! পবে মলিনার পানে চাহিয়া পরিহাস-হলে সতীনাথ কহিল—বন্ধুব বিবহ...এবং সে বিবহ এমন ঘনোভূত যে, দুই সখীর মুখ আঁধারে আচ্ছন্ন! Lucky ললিত!

এ-পরিহাস নিবর্থক হইল—কাহারো মুখে হাসির বা এতটুকু চাকুলোর স্রষ্টি ফুটিল না! সতীনাথ কহিল,—কি হয়েছে?

বলিয়া হুজনের পানে চাহিল। হৃদিক হইতে শুধু মৃদু ছটি নিখাস...তার পর অবস্থা পূর্ববৎ। সতীনাথ বুঝিল, হৃদিকেই মেঘ...এবং সে মেঘ কথার হাওয়ায় উড়িবার নয়! কিন্তু কি এমন ঘটিল চক্ষের নিম্নে যে...

মলিনার পানে সতীনাথ চাহিল। আহা, স্বামী কাছে নাই...তাই মিলনানন্দের মাঝখানে সুর কাটিয়া গিয়াছে! বেদনাগর তার বুক ভরিয়া উঠিল। সতীনাথ কহিল—মনটুর সন্ধিটা বাড়লো না কি? তাকে ব্রাহ্মোনিয়া দেওয়া হয়েছিল?

মনটু মলিনার তিন বছরের পুত্র। মলিনা কহিল,—ভালো আছে।

—টেবি?



সতীনাথের মেয়ে টেবি। বয়স দু'বছর প্রমদা কহিল—তার আবার কি হবে? সুস্থ মেয়ে...

প্রমদার স্বরে কেমন একটু ক্রকতা। সতীনাথের চক্ষু স্থির! সে একটা নিখাস ফেলিয়া ভোজন মনঃসংযোগ করিল। কিন্তু এ কি ভালো দেখার? লগিত নাই...মলিনার স্বাক্ষরের ভার তার উপর। একটা দায়িত্ব তো! সতীনাথ আবার মলিনার পানে চাহিল, ডাকিল,—মলিন...

মলিনার সঙ্গে সতীনাথের পরিচয় তার বিবাহের পূর্ব হইতে। মলিনার দাদা নীলাজ স্কুলে তার সহপাঠী ছিল। নীলাজের গৃহে সে তখন নিত্য যাইত। তার পর ম্যাট্রিক পাশ করিয়া নীলাজ পুনায় চলিয়া যায়। লগিতের সঙ্গে মলিনার বিবাহে ঘটক সতীনাথ স্বয়ং। তাই সে মলিনাকে ডাকে নানা নামে...মলু, মলিন, মলি, মিল, মিলা...যখন যে-নাম মনে আসে!...

সতীনাথের আহ্বানে মলিনা তার পানে চাহিল।

সতীনাথ কহিল—কি হয়েছে মলি?

মলিনা প্রমদার পানে চাহিল। তার ঠোঁট কাঁপিল! মুহূর্ত্তে মলিনা কহিল—কিছু না!

কথাটা বলিয়া সে মাছের কাঁটা বাছিতে মগ্ন হইল।

সতীনাথ নির্বাক বিস্ময়ে স্ত্রীর পানে চাহিল, ডাকিল—প্রমোদ...

প্রমদা তার পানে চাহিল...জুকুটি-ভরা দৃষ্টি! সতীনাথ কহিল,—কি হলো তোমাদের?

—কি আবার হবে!...প্রমদা ডাকিল,—ঠাকুর...

ঠাকুর নিকটে ছিল, আসিল। প্রমদা কহিল,—আমায় আর একটু মাছের চক্ষুড়ি দিয়ে যাও তো!

ঠাকুর চলিয়া গেল। প্রমদা লুটির উপর ডাল ঢালিল। ব্যাপার দেখিয়া সতীনাথ কহিল,—বাঃ!

নিঃশব্দে ভোজন-পূর্ব চূড়ল। মুখ-হাত ধুইয়া মলিনা গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। বায়ে প্রমদার ঘর। প্রমদা নিজের ঘরে গেল, ডাকিল—বিষণী...

বিষণী সতীনাথের ভৃত্য; আসিল। প্রমদা কহিল,—টেবির দুধ গরম করে আন।

বিষণী চলিয়া গেল। সতীনাথ ব্যাপার দেখিয়া একখানা বাউলা মাসিকপত্র লইয়া বাতিরঘর বাগান্দায় আসিয়া ইঞ্জিচেরারে বসিল।...এ-পাতায়, ও-পাতায় চোখ বুলাইল; গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, হিন্দু-শাস্ত্রের আলোচনা, বর্জ্যেয়ে ছাপা জাতিভেদের তর্ক—কিছু বাদ রাখিল না; শেষে একটা পাতা উন্টাইয়া 'নিকারাগুয়া-ভ্রমণ' পড়িতে শুরু করিল।...

দুধারে বন। জন-প্রাণীর চিহ্ন নাই। সেই বনের পথে লেখক গিয়াছে একা; এক হাতে রিভলভার,

গুলি-ভরা—অপর হাতে বর্ষা! গা ছম্-ছম্ করিতেছে। শুক বন। এমন শুকতা জীবনে সে কখনো উপলব্ধি করে নাই!...ইঠাৎ একটা খড়খড় শব্দ। চমকিয়া লেখক চারিদিকে চাহিল। সামনে এক খেজুর গাছ—আর সেই গাছ ভুড়াইয়া এক প্রকাণ্ড অঙ্গুর সাপ। সাপটা হাঁকিয়া ঘাড় জুলাইতেছে; লক্-লকে জ্বিত! লেখক ডান হাতে রিভলভার ধরিয়া তাগ্ করিল, বর্ষা বা হাতে...

সঙ্গীন মুহূর্ত্ত!...সতীনাথের গারে কাঁটা দিল...গা-ছম্ ছম্ করিতেছিল, কি হয়...কি হয়? তবে লেখক বাঁচিয়া যাইবে নিশ্চয়; নহিলে এ লেখা মাসিকে ছাপা হইত না।

এমন সময় হাত হইতে কে বই টানিয়া লইল। সেই সাপ...?

চমকিয়া সতীনাথ সোজা হইয়া বসিল। চাহিয়া দেখে, প্রমদা!...প্রমদা আসিয়া বইখানা কাড়িয়া লইয়াছে! প্রমদা কহিল,—চলো, শোবে চলো। টেবির দুধ খাওয়া হয়ে গেছে। একলাটি ভয় করে, বাপু...

সতীনাথ কহিল,—বইখানা দাও গো। অঙ্গুরের মুখে লোকটা পড়েচে, তার কি হলো...

প্রমদা কহিল,—ও গাঁজাধুরি গল্প পড়তে হবে না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখচেন! মন খুশী হয়, এমন বৃত্তান্ত লেখো, তা নয়...

সতীনাথ কহিল—বাঃ! ভ্রমণে বেরিয়ে নিছক সুখ, নিছক আরামই যে মিলবে, তাব কি মানে আছে! ঐ যে উত্তর-মেরু-ভ্রমণের ব্যাপার—কি সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটেছিল, ডাবো তো! যদি বিপদ ঘটে, সে কথা বৃষ্টি ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখবে না?

—না। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সুখের হবে। অঙ্গুর সাপের কথা লিখবে যদি তো ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলে ছাপানো কেন? লিখুক 'সাপের মুখে' বা 'অঙ্গুর-চক্র'...যে, নামেই বুঝবো, এ্যাডভেঞ্চারের কথা বল্চে।

সতীনাথ কহিল—ভ্রমণ আর এ্যাডভেঞ্চার co-relative terms.

—বা বলেচো! তবে ও তর্ক এখন থাক। শোবে, এসো।

—বইখানা দেবে না? ওটুকু শেষ করে...

—না। কাল সকালে শেষ করে!

—রাত্রে ঘুম হবে না। হয়তো স্বপ্ন দেখবো, ঐ অঙ্গুর আমার গলা চেপে ধরেচে। সত্যি, বুঝচো না...

—মা। বুঝি না, বুঝবো না। এসো। বই পাবে না।...

প্রমদা বই লইয়া গমনোদ্ভূত হইল।

সতীনাথ কহিল,—অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

প্রমদার পিছনে তাকে আসিতে হইল।...ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া প্রমদা কহিল,—কথায় বলে পরভোজী হওয়া বরং ভালো, কিন্তু পরঘরী হওয়া ঠিক নয়।

সতীনাথ কহিল,—চঠাৎ এত বড় তত্ত্ব-কথা?

প্রমদা সনিহাসে কহিল—

কিন্তু থাক,—সে কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। যেহেতু দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুবিন্দু, যুক্তি, বিচার প্রভৃতির সংমিশ্রণে সে কাহিনীটুকুর অমূল্য বর্ণনায় প্রমদার সময় লাগিয়াছিল একটি ঘণ্টা; এবং একঘণ্টা ধরিয়া এ-কাহিনী শুনিয়াও সতীনাথের ধারণা যে খুব স্পষ্ট হইয়াছিল, এমন কথা বলিতে পারি না। অস্পষ্ট আব্ছাষায় এটুকু সে বুঝিল, জল গরম করা লইয়া ললিতের ভৃত্য শিউধনীকে মলিনা বকে—অথচ শিউধনীর কোনো অপরাধ ছিল না। তাই সে কথা প্রমদা বলিয়াছিল—এবং ঐ কথার প্রসঙ্গেই মলিনার সঙ্গে প্রমদার কি-না কি তর্ক ঘটে! তাহাতে প্রচণ্ড অভিমানে ছেলের পিঠে মলিনা দুটা চড় কষাইয়া দেয়। প্রমদা গিয়া ছেলেকে তার কাছ হইতে কাড়িয়া আনে। মলিনা তাহাতে রাগিয়া নানা কথা বলে। সে কথা প্রমদার মনে নাই, তবে তার শেষটুকু কাঁটার মত মনে বিধিয। আছে।

সতীনাথ কহিল—সে কথাটুকু কি শুনি?

প্রমদা কহিল—আমার বললে,—আর টশ্ দেখিয়ে কাজ নেই, ভাই...চাকরের দোষ, তাকে বকচি, তাতে কারো মধ্যস্থতা আমি কখনো বদ্যাস্ত করি নি।

প্রমদার দুই চোখ সজল হইয়া আসিল। প্রমদা কহিল—মলিনা এমন কথা আমার বলবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল—হঁ!

৩

পরেব দিন সকালে সেই টেবিলের ধারে আবার তিনটি প্রাণীতে দেখা। চা আসিল। সতীনাথ কহিল—চা খেয়ে নাও মলিন! আজ শোণের বৃক্ষের উপর দিয়ে ওপারে যাবো।

মলিনা কোনো জবাব দিল না।

সতীনাথ তখন অবাস্তব কথা পাড়িল,—কাল ষ্টেশনে এক মজার ব্যাপার দেখলুম।...সন্ধ্যার ট্রেণে এক হিন্দু-স্থানী ভজ্জলোক এসে নামলো। ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে যাবে, পুলিশ তাকে পাকড়াও করলে।...ব্যাপার কি? না, জামা খুলে দেখা গেল, জামার যে অন্তর থাকে, সেই

অন্তরের নীচে আফিং...একেবারে পাংলা আমস্বের মত সাঁটা। Excise case। তা, আফিং প্রায় তিন হাজার টাকার। তারপর টান দিতে লাড়ি-গোঁফ খশে পড়লো। যাত্রী টেন থেকে নামলো খোঁটা ভগবানদাস, টান-হ্যাণ্ডায় গোঁফ লাড়ি খশিয়ে ভগবানদাস অবশেষে করিমুদ্দন চাচা হয়ে গ্রেফতার!

কাহিনীটুকু বলিয়া সে নিজে হাসিয়া সারা হইয়া গেল, কিন্তু হাসির এতটুকু রেখা...না প্রমদার মুখে, না মলিনার মুখে।

সতীনাথ প্রমদা গণিল।

চা-পান শেষ হইলে সতীনাথ কহিল—চলো মলিন, বেড়াতে যাই।

মলিনা কহিল—থাক। শরীরটা ভালো ঠেকচে না।

সতীনাথ কহিল—বলো কি! একরাত্রেই বিরহ এমন ভয়ঙ্কর হলো! এখনো যে দুদিন কাটাতে হবে! ললিতকে টেলগ্রাম করে দি না হয় যে, স্বর্গীর দারুণ বিরহ, জলদি আও..

সতীনাথ হাসিল। মলিনা গম্ভীর মুখে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সতীনাথ প্রমদার পানে চাহিল, কহিল—তুমি কি বেকবে না? তোমারো গোঁসা-ঘব?

প্রমদা কোনো জবাব দিল না; বাম্বাঘরের দিকে চলিল। বিয়গী কহিল—টেবুকে বেড়াতে লিয়ে যাবো, মা? প্রমদা কহিল—না।

ও-ঘরে শিউধনী বলিতেছিল,—খোঁকাগুবু যাঁবে না?

মলিনা কহিল—না।

চমৎকাব! সতীনাথ মাসিক-পত্র খুলিয়া বাবান্দার বসিল...সেই 'নিকারাগুয়া ভ্রমণ'। এ গোলযোগে সে ভ্রমণ-কাহিনীর কথা সে ভুলিয়া গিয়াছিল।

তরকারী-ওয়ালী আসিল। সতীনাথ ডাকিল—ওগো...

ওগো সাড়া দিল না। সতীনাথ উঠিয়া মলিনার ঘরের দ্বারে আসিল, ডাকিল—মলিন...

—কেন?

সতীনাথ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মলিনার হাতে একখানা নভেল। সে তন্তুপোষে শুইয়া নভেল পড়িতেছিল; সতীনাথকে দেখিয়া উঠিয়া বসিল। বিবাদিনী মৃষ্টি! স্বান, মলিন মুখ!

সতীনাথ কহিল,—তরকারীউলি এসেচে। তরকারী নেবে না?

মলিনা কহিল—জানি না।

সতীনাথ কহিল—কি হলো তোমাদের—বলো তা আমার।

মলিনার হুই ঠোঁট ঈষৎ কাঁপিল। মলিনা খোলা জানালার মধ্য দিয়া আকাশের পানে চাহিল।

সতীনাথ নিঃশব্দে বাহিরে আসিল। বারান্দায় প্রমদা তরকারীউলিকে কি বলিতেছিল।

সতীনাথ কহিল—এই যে তুমি! তরকারী এনেচে।

—হুঁ। বলিয়া গম্ভীর মুখে প্রমদা প্রস্থান করিল। তরকারী-ওয়ালী হতভম্বের মত সতীনাথের পানে চাহিল; সতীনাথ প্রমদার পিছনে চলিল, কহিল—তরকারী নেবে না?

প্রমদা কহিল—উনি কি বললেন? গিয়েছিলে তো জিজ্ঞাসা করতে।

সতীনাথ কহিল—মলি। তা সে তো দেখেনা এসব। তুমিই...

প্রমদা কহিল—আমি কিছু জানি না। মান ভাঙ্গাতে পারলে না? গিয়েছিলে তো! টশ্! ওঃ...

প্রমদার স্বর কক্ষ। বিষয়ে সতীনাথের মন ভরিয়া উঠিল। সে ডাকিল,—প্রমোদ...

সতীনাথ প্রমদার অক্সাগ্র ধরিল।

প্রমদা কহিল,—আঁচল ছাড়ো। আমি নাইতে বাছি।...আমি কিছু জানি না।

প্রমদা চলিয়া গেল। সতীনাথ হতভম্বের মত ঠাঁড়াইয়া রহিল...

হু'বন্টা পবের কথা।

বারান্দায় সেই ইজিচেয়ারে সতীনাথ পড়িয়াছিল। সামনে পথ। পথে হু'একজন করিয়া লোক চলিয়াছে। ফটকের মাথায় লতানে গাছটা বেশ ঝাঁকড়াইয়া উঠিয়াছে—কতকগুলো বেগুনি ফুল তাহাতে ফুটিয়াছে। ...ধূসর আকাশ, কোথাও এতটুকু মেঘ নাই, বৌদ্ধ-কিরণে চারিদিক্ ধপ-ধপ করিতেছে!...

প্রমদা আসিয়া ইজি-চেয়ারের হাতায় বসিল।...

সতীনাথ কহিল—মলিনার কাছে চলো। তুমি বড়...ওর হাত ধরে মিটিয়ে ফ্যালো এ গোলযোগ...

প্রমদা কহিল,—কি করেচি আমি যে মেটাবো?

সতীনাথ কহিল,—নাই করো! ওর মনে যদি আঘাত লেগে থাকে...

প্রমদা কহিল—কোথাও কিছু নেই—শুধু শুধু আঘাত...! তুমি তো শুনেচো...বেশ, বিচার করো। আমার কোনো অপরাধ হয়ে থাকে, আমি ভূঁয়ে নাক-খং দিয়ে গলবস্ত্র হয়ে মাপ চাইবো!

সতীনাথ কহিল,—তুমি ভিলকে তাল করচো, প্রমোদ!...বেচারী! একে লগিত নেই...মন খারাপ হয়ে আছে...তার উপর হয়তো কি অভিমান!

প্রমদা উঠিয়া ঠাঁড়াইল, কহিল—অভিমান আমার

নেই? বলচি তো, কোনো অপরাধ করে থাকি, আমায় ধরে হুশো জুতো মারো, সইবো। তা ব'লে বিন'-দোষে গল-বস্ত্র হবে...আমায় তো চেনো!

প্রমদা চলিয়া গেল।...সতীনাথ তেমনি বসিয়া; একেবারে থা...অকস্মাৎ ঘরে ওদিকে টেবিলের কন্দন। সতীনাথ উঠিয়া ঘরে গেল। দেখে, বিছানায় কালির দোয়াত উপড় করা...চাদরে কালি...আর টেবি হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে; টেবিল মা প্রমদার বর্ণ-বেশ! ব্যাপার জলের মত পরিষ্কার—বৃষ্টিতে বাধে না!

সতীনাথ কহিল,—কালি-কলম একটু উঁচুতে রাখতে হয়। ছোট ছেলেপিলে...

প্রমদা কোনো কথা কহিল না; টেবিকে ধরিয়া সেই কালির উপর তার মুখ ঝুঁজিয়া ধরিল। টেবিল বোল পঞ্চম ছাড়িয়া সপ্তমে উঠিল।...

তার পর আবার সেই টেবিল...টেবিলের উপর ভাত, ডাল, মাছের ঝোল, দই। নিঃশব্দ ভোজন-পর্ব! যেন সম্পূর্ণ অজানা তিনটি প্রাণী কোথাকার হোটেল আসিয়া উঠিয়াছে।

স্বকৃত ভাঙ্গিয়া সতীনাথ কথা কহিল, বলিল—আমি বিকেলের ট্রেনে সাসারাম যাছি। আমার এক বন্ধু সেখানে মুন্সেক! ছুটিতে বাড়ী যাবনি। আমায় যেতে লিখেচে।

প্রমদা বা মলিনা কোনো কথা কহিল না।

সতীনাথ কহিল,—রাত্রি বোধ হয় কিরতে পারবো না। তেমন ট্রেন নেই। তোমরা হু'জনে থাকতে পারবে?

কে যেন কাহাকে কি বলিতেছে! প্রমদা ও মলিনা জবাব দিল না; পূর্ববৎ গম্ভীর রহিল!

সতীনাথ কহিল,—সলিত তোফা আছে। শুধু আমার বরাতে...

কথা শেষ হইল না!...কাহার জগুই বা শেষ করা!...

ছপুর বেলায় সময় আর কাটে না। আগে তাদের আসর বসিত। র্যামি, জাপ, গ্রাব, ত্রে—কত খেলা!... আর আঙ্গ? মাসিক-পত্রের বিজ্ঞাপনগুলি অবধি সতীনাথের হু'বার পড়া হইয়া গিয়াছে!...

ওদিকে বিষণী ঘুরিয়া আসিয়া শিউধনীকে বলিতেছিল, ভারী বান এসেছে বে দরিয়ায়। এ-পার থেকে ও-পার ইস্তক সব বালি ডুবে গেছে। আর কি টান...

শিউধনী ছুটিল—বিষণীও সেই সঙ্গে।...

কথাটা সতীনাথ শুনি; ডাকিল,—ওগো...

ওগো বাহিরে আসিল। সতীনাথ কহিল,—টেবি ঘুমিয়েচে?

—হ্যাঁ। প্রমদা বাবাম্মার বেলিঙে কয়ুইয়ের ভর দিয়া ঝাঁড়াইল। তার পর ভিতরে গেল, গিয়া তখন আবার ফিরিল; ফিরিয়া আপন-মনে কহিল,—শোণে জল এসেচে।

সতীনাথ কহিল,—বাবে দেখতে ?

—বাবো !...

কাজেই চটি জুতা পড়িয়াছিল; প্রমদা চটি জোড়ায় পা চুকাইল।

সতীনাথ কহিল,—মলিকে ডাকি...

সে গিয়া মলিকে কহিল,—শোণে কূলে কূলে ভরা জল। দেখতে যাবে ?

জানাপা দিয়া শোণের বুক দেখা যায়। মলিনা জানাপা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল; পরে সতীনাথের পানে; তার দৃষ্টিতে আগ্রহ।

সতীনাথ ভাবিল, বেশ হইয়াছে। এবার হুই সমীর এ মনোজ্ঞ তাহা হইলে...

সতীনাথ কহিল,—এসো। প্রমদাও যাচ্ছে...

মলিনা উঠিতছিল, ওঠা হইল না। সে কহিল,—না, আপনারা যান। আমার ভারী মাথা ধরেচে।

সতীনাথের বুকখানা ছাঁৎ করিল। তবু হাল ছাড়িবে না! তাই পরিশ্রাস করিয়া বলিল,—তুয়ে তুয়ে দিন-রাত বিরহ-চিন্তায় মগ্ন থাকলে মাথা ধরবেই তো! আমি ললিতকে চিঠি লিখে দিয়েচি, পত্র-পাঠ রওনা হও। ভাবনা নেই। এসো মলিন...

—না, সত্যি, পারচি না। আমার মাপ করুন... আপনারা যান।

সতীনাথের উৎসাহ নিবিয়া গেল। সে আবার কহিল,—আসবে না মলি? আমার কথায়...

—মাপ...আমায় মাপ করুন।

মলিনা শুইয়া চক্ষু মুদিল। একটা নিখাসও বৃষ্টি! রোধ করিতে পারিল না।

সতীনাথ বাহিরে আসিল। তীব্র দৃষ্টিতে প্রমদা ঘরের পানে চাহিয়া ছিল। সতীনাথকে দেখিয়া কহিল,—বাবে না ?

সতীনাথ কহিল,—মলিনার মাথা ধরেচে...থাক।

প্রমদা গর্জিয়া উঠিল,—যাও, সেবা করো গো... আমি জ্ঞানভূম। বেশ, তুমি বাড়ী থাকো, সেবা করো। আমি যখন বাবো ঠিক করেচি, তখন যাবোই...

প্রমদা বাহির হইয়া গেল। সতীনাথ আবার সেই ইজি-চেয়ারে বসিল।...

৪

আরও এক দিন এমনি ভাবে কাটিল। এমন বিপদে সতীনাথ কখনো পড়ে নাই। কাহারো পক্ষ লইবার

উপায় নাই। নিখাস ফেলিয়া সে ভাবিল, সেকালের পণ্ডিতরাই নারী-চরিত্র ঠিক বুঝিয়াছিলেন। একালের মত ছাপাখানা, মাসিক-পত্র বা গল্প, কাব্য, উপন্যাসের এমন ছাড়াছড়ি ছিল না,—জীবন্ত নারীর চরিত্র লইয়া তাঁরা কারবার করিতেন। তাই! আর এ-যুগে? তাহা কাব্য আর উপন্যাসের নারী-চরিত্র ঘাঁটিয়াই পরমানন্দে ভাবে, শুদিক্টায় চূড়ান্ত রিশার্চ হইয়াছে! সংসারে পদে পদে তাই এমন মান-অভিমান, উৎপাত, বিগ্রহ, বিপ্লবের উদয় হয়! কে জানে, অধীরনর-নারীর দল সেই জন্তই বৃষ্টি-বা হিন্দুর ডিভোর্শ-আইনের স্বপক্ষে ভোট দিবার জন্ত উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে!...

অবশেষে রাত্রে কাশীর ফেরত ললিত আসিয়া ডিহরী ষ্টেশনে নামিল। সঙ্গে আনিল একটা টুকুরি ও একটা টিন। টুকুরিতে আপেল, নাশপাতি, পানিফল, আঙ্গুর প্রভৃতি—ফলের বাগান! টিনের মধ্যে পরিপুষ্ট এবং উপাদেয় বেনারসী মাগুর মংস্ত্র।

সতীনাথ ষ্টেশনে আসিয়াছিল, আর কেহ আসে নাই।...

সতীনাথ কহিল,—মাগুর মাছ এনে হাজির! এ যে রোগীব পথ্য হে!

ললিত কহিল,—এ সে মাগুর নয়। নামে মাগুর হলেও আকারে মুগ্ধব! দেখো। এমন মশগুল করেছিল হে যে, এই মাগুরের লোভে সাধ হচ্ছিল, ছুটির বাকী দিন-গুলো সেই কানীতেই কাটিয়ে আসি!

—বলো কি?

ললিত কহিল,—তাই।...

হুজনে গৃহে ফিরিল। মলিনা বা প্রমদা যেন এ-বাড়ীর কেহ নয়, কিম্বা সঙ্গ-আসীনা নব বধু...তাদের দিক্ হইতে এতটুকু চাকলোর চিহ্ন নাই।

কাজেই সতীনাথকে গৃহিণীপনার ভার লইতে হইল; ললিত অবাধ! হাসির উচ্ছ্বাসে ভরা গৃহ দেখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া দেখে, সেখানে এমন গাভীর্ষ্য! যেন ইন্স্পেক্টর জেনারেল আসিয়া ইন্সপেকশন্ সাহিয়া গিয়াছে, কি রিপোর্ট দিবে, সেই চিন্তায় চারিদিকে ছম্ছমে ভাব।

আহারাদি পর বিশ্বাস। সতীনাথ ভাবিল, এবার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

কিন্তু সকালে ললিতের আর-এক মুক্তি।

সতীনাথ কহিল,—ফলের টুকুরিটা খোলা হোক!

ললিত কহিল,—খোলো...

উৎসাহ ও আগ্রহ যেন ডিহরী দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে।...নিখাস ফেলিয়া সতীনাথ কহিল,—দুপুরবেলায় দেখা যাবে'খন, কি এনেচো...কেমন?

ফলের টুকরি তেমনি বচিয়া গেল। শিউধনী গিয়া মলিনাকে কহিল,—ও টুকরিঠো...

মলিনা কহিল,—আমি জানি না।

বিষণী গিয়া প্রমদাকে ঐ এক প্রশ্ন করিল।

প্রমদা কহিল,—আমি কি জানি।...

সতীনাথ ললিতের পানে চাছিল। ললিত আকাশের দিকে চাছিল—তার দৃষ্টি উদাস। বধূদের কথা হই বন্ধুর কাণেই প্রবেশ করিয়াছিল!...বেড়ানো ঘটিল না। সতীনাথ বারান্দায় বসিয়া থবের কাগজ খুলিল—কাল ডাকে আসিয়াছে।

ললিত একখানা মোটা বই খুলিয়া বসিল, বারান্দার আর এক প্রান্তে।

সতীনাথ বইখানা দেখিল,—কার গ্রন্থাবলী। বস্তুমতী সাহিত্য-মন্দির হঠতে প্রকাশিত...

তার অস্তিত্বের সীমা নাই। এক কবিলে ভগবান! এ 'বরফ' কি করিয়া ভাস্সা যায়! ললিত হয়তো ভাবিতোছে, তার অল্পপড়িত্তিতে এবা তার প্রিয়তমা পত্নীর খুব যত্ন করিয়াছে, বটে!...

আহারাদির পর এ-ভাব একান্ত অসহ্য হইল। সতীনাথ ডাকিল,—ওহে ললিত...

ঘরের মধ্যে হঠতে ললিত কহিল—কেন?

সতীনাথ কহিল,—একবার বাজাবে দিকে যাই, চলো...

—চলো!...ললিতের স্বর উদাস!

ললিত বাহিরে আসিল। সে সদা-প্রসন্ন মুখ আর নাই। সতীনাথ নিখাস ফেলিল।...

ফটকের বাহিরে আসিয়া সতীনাথ কলি—একটা ঠায়ে হয়েছে হে...এখানে ইতিমধ্যে অর্থাৎ...

ললিত কহিল—আমি সে কথা বলবো, ভাবছিলুম!

সতীনাথ কহিল—তুচ্ছ একটা স্ট্রিটমেন্টাল ব্যাপার! বিশেষ কিছু নয়...

তার মুখেব কথা লুফিয়া ললিত কহিল—তুচ্ছ!... বলিয়াই সে অল্প দিকে মুখ ফিরাইল।

সতীনাথ কহিল—না হয় একটু বোঝবার ভুল...

ললিত কহিল—তা কি কবে বলি?...যা শুনলুম...

সতীনাথ কহিল—আসল ব্যাপার তুমি তা হলে শোনো নি...মলি চিরদিন একটু অভিমানী...

ললিত কহিল—এ অভিমানের কথা নয়!...অভিমানী সে হতে পারে, কিন্তু মিথ্যাবাদী নয়।

সতীনাথ শিরিয়া উঠিল; কহিল,—মেয়েদের সব খুঁটিনাটি কথা শুনো না। সেটিমেন্টের সঙ্গে সত্য এমন মিশে যায়...

ললিত কহিল—ও কথা থাক! আমি তাই ভাবছিলুম...

—কি?

ললিত কহিল—ঠাবু তুলে গুঁতে ফেঁচা থাক!

—সে কি! এর মধ্যে? ছুটিটা মাটি হবে যে!

—মাটি যা হয়েছে, ঢের। এখানে থেকে মাটি ছাড়া আর কিছু হবাব আশা দেখিনে!...অর্থাৎ তুমি ভাই প্রণয়ানুগে শ্রীমতীর অপরাধ সম্বন্ধে একটু পক্ষপাতিত্ব করো। আমি অবশ্য যা শুনলুম...

সতীনাথ কহিল—আমাব প্রণয়ানুগ বতাই থাকুক...তোমার আমার মধ্যে reasonএর ব্যাঘাত তাতে ঘটতে পারবে না, এ কথা নিশ্চয় জেনো!...

—থাক, ও তর্কে প্রয়োজন নেই।

—বেশ!

—উত্তম।

হে-মাঝা মোড়। সতীনাথ ডাইনেব পথে বাঁকিল। ললিত কহিল,—তুমি ওদারে যাচ্ছো? আমি একবার ঐ আনিকাটের দিকে যাবো, ভাবছিলুম।

সতীনাথ কহিল—মানে, আমি ট্রান্স বোডে যাবো। হিমাংসু বাবু বলে একটি ভদ্রলোক আছেন। তাঁর কাছ থেকে কথানা বিলিতি মাগাঞ্জিন্ আনবো। দেবার কথা আছে।

দুই বন্ধু দুই পথে চলিল।...তুজনের বুকে অসহ্য যাতনা!... এমন ঘটতে পারে...কে জানিত? প্রমদা আর মলিনা...তুজনে এমন ভাব...এতখানি অন্তরঙ্গতা!...ছোট স্বার্থে একটু আঘাত। গৃহিণীপনায় বাধা! হয়তো তাই! কিন্তু নাবী এমন অসার...

তুজনের মনে চিন্তার ধারাও বৃষ্টি এক!...

সন্ধ্যার দিকে সতীনাথ ঘরে বসিয়াছিল...পুর্বানো ট্রাণ্ডের পাতায় ছবি দেখিতেছিল।

প্রমদা আসিয়া কহিল—ওঁবা বেড়াতে বেরুচ্ছেন। তুমি যাবে না?

সতীনাথ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল—তাঁই না কি!

প্রমদা কহিল—তোমাব বন্ধুটি স্ত্রীর কথায় ওঠেন-বসেন!...বোধ হয়, আমার নামে গিন্নী লাগিয়েচেন। আমার সঙ্গে একটা কথাও কইলেন না!

প্রমদার স্বর গাঢ়।

সতীনাথ কহিল,—হঁ...!

প্রমদা আয়না পাড়িয়া চুল বাঁধিতে বসিল। সতীনাথ বাহিরে বারান্দায় আসিল।

সেই ফলের টুকরি তেমনি পড়িয়া আছে। একটা দুর্গন্ধ! সতীনাথ নাসা কুঞ্চিত করিল।

ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইল ললিত আর মলিনা। মনটুক লইয়া শিউধনী আগে গিয়াছে!...

সতীনাথ কহিল—বেড়াতে চলেছো ?

—হ্যাঁ। একটু ঘুরে আসি।

ললিত ও মলিনা চলিয়া গেল। সতীনাথ আনন্দে হইতে জামা টানিয়া গায়ে দিল।

প্রমদা কহিল—বেড়াতে যাচ্ছে ? ওদেব সঙ্গে ? ও...

কথা সংক্ষিপ্ত—কিন্তু স্বরে এমন বৈচিত্র্য খেলিয়া গেল। সতীনাথ কহিল,—না, তোমায় নিয়ে বেরবো। ...ওরা বেড়াতে যেতে পাবে, আমবা পারি না ?

প্রমদা খুশী হইল, কহিল—আমার হলো বলে। শুধু মুখে একটু সাবান দেবো।

—বেশ। ...

পনেরো মিনিট পরে প্রমদা তৈয়ার হইয়া আসিল, এবং তুজনে বাহির হইল। কিন্তু বাইবে কোথায় ?

—শোণেই চলে। ...

নদীর বৃকে ডল নাট—ধু-ধু বাসি। মাঝামাঝি ঐ যে ললিত, মলিনা।

প্রমদার পায়ে হুঁচট লাগিল। প্রমদা কহিল—না বাবু—ভস্বেসে বাসি। পায়ে লাগে, হাঁটতে পারি না। চলো, ষ্টেশনের দিকে যাট !

সতীনাথ কহিল,—বেশ !

তিন দিন, তিন দিন, চার দিন আরো কাটিল। দিন কাটে, রাত কাটে, মেঘ তবু কাটিতে চায় না। ...বামুন-চাকরে কাজ করিয়া যায়...কলের মত ! সংসার চলিতেছে...কোথাও বিশৃঙ্খলা নাট। ...তবু...কেমন যেন নিষ্কর্ষ এল্লি।

সতীনাথ ললিতকে পায় না, ললিতেরও সেট দুঃখ ! ...কড়া নিষেধ,—না, ওদারে নয়। 'হু'দিকেই। ...নিঃশব্দে দিন 'তবু' কাটানো চাই।

ডাকে পরের দিন ললিত একথানা চিঠি পাইল। সতীনাথ লিখিয়াছে,—সকালে ষ্টেশনে আসিয়া—কথা আছে। ...

ললিত তার জবাব দিল—আচ্ছা !

জবাবটুকু সে কোনো একমে ষ্ট্রাণ্ডের পাতার মধ্যে পিণে গুঁজিয়া দিল। ...

পরের দিন সকালে ষ্টেশনের প্রাটফর্মে তুজনে দেখা।

সতীনাথ কহিল—এ কি হচ্ছে ললিত ?

ললিত কহিল—মাঝে বেতে বসেছি। ...হুই সখীর মান-অভিমান আমাদের মধ্যে খাঁড়ার মত এসে পড়েছে !

সতীনাথ কহিল,—আমায় স্পষ্ট বলেচে, ঢের হাওয়া খাওয়া হয়েছে। বাড়ী চলো। তাতে আমি বলেছি, বাড়ী এগ্রিমেন্টে ভাড়া—ছাড়লে লোকশান হবে।

ললিত কহিল—আমারো ঐ দশা ! ...আমি বলি,

শ্রীমতী প্রমদা তোমার চেয়ে বয়সে বড়, সম্পর্কেও তাই। তুমি আগে কথা কও। তাতে বলেচে, কি করেছি আমি যে আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করেচে ?...

সতীনাথ কহিল—উপায় ?

ললিত কহিল—ঠাওবাও। ...তুমি উকিল। মিথ্যা defence তো মাঝে মাঝে আদালতে খাড়া করতে হয়।

সতীনাথ কহিল,—হাকিমকে ভুলোনো আর জ্বীকে ভুলোনো—হু'য়ে বিস্তর প্রভেদ !

ললিত নিখাস ফেলিল। সতীনাথ কহিল,—চলো, বেড়াতে বেড়াতে শোণ-ইষ্ট-ব্যাক অবদি। একটা মতলব ঠাউরে 'তবে' বাড়ী ফিরবো।

ললিত কহিল,—বেশ বলেচো ! ...

বেলা দশটা। হু'জনে হু'পথে গৃহে ফিরিল। সতীনাথ ডাকিল,—ওগো...

ললিত ডাকিল,—মলি...

কাহারো সাড়া নাট। সতীনাথ ডাকিল,—বিষণী... বিষণী আসিল। সতীনাথ কহিল,—লগেজ বাঁধ। বার্ষ রিজার্ভ করে এসেছি। আজই রাত্রেব ট্রেনে গয়া যাবো ! ...

ললিত শিউখনীকে কহিল,—বিচানা পত্তর বাঁধ, আজ বিকেলে কাশী যাচ্ছি। ধোপার কাছে যা...কাপড়-চোপড়গুলো নিয়ে আয়। ট্রেনের বার্ষ রিজার্ভ হয়ে গেছে। ...বুঝলি ?

গভীর মুখে হুই বন্ধুতে পাকশালার দিকে চলিল। ওদিকে হাসি-গল্পেব কি কলোচ্ছাস ! ...তাঁহা হইলে ...

সতীনাথ হাঁকিল,—চটপট সেবে নাও গো, আজ গয়া যাবো।

ললিত হাঁকিল,—কাশীর জগা বার্ষ রিজার্ভ করে এলুম, মলি।

প্রমদা রান্নাঘরে; উনানে হাড়ি চাপাইয়া ডাকিল,—ওলো মলি...তোমার হলো ? আয় শীগগির...সুপুঁরি নিয়ে। যে মাংস, বাবাং ! সেদ্ধ করা দায়। ...বাবুয়া এলো বুঝি বে।

মলি কহিল,—দাঁড়াও দিদি...সুপুঁরি কি আছে ! সব উট ধরেচে ! মা গো, কি দেশ—সুপুঁরিতে উই ধরে !

—তুই আয় ভাই। হাড়িটা আমি বাইরে নিয়ে যাচ্ছি। উন্নও তেমনি...জাল নেই !

বেড়ি দিয়া উন্নের গলা ধরিয়া হাড়ি বহিয়া ওদিক হইতে প্রমদার প্রবেশ—এদিক হইতে একটা এনামেলের ডিশে উই-ধবা সুপারি লইয়া মলি...মধ্যপথে ললিত ও সতীনাথ ! ...

ললিত কহিল,—ও সব রাখো গো, গুছিয়ে নাও—শীগগির। আজই কাশী যাচ্ছি।

সতীনাথ কহিল,—খালো হাঁড়ি। বিড়ানা-পত্র বাঁধো। গয়া যাচ্ছি আজ।

—সে কি!

দুই সখী একসঙ্গে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল,—তার মানে?  
প্রমদা কহিল,—এমন ডেরা পেতে বসেচি। একসঙ্গে আনন্দে আছি। না, উনি বলেন, গয়া চলো,—উনি বলেন, কাশী!

মলিনা কহিল,—যেতে হয়, দুই বন্ধুতে যাও। আমরা যাবো না। বেড়াতে এসেচি বলে কেবলি টো-টো করতে হবে! থিতু হবো না—না?

সতীনাথ ও ললিত অবাক!...

সতীনাথ কহিল,—ভাসি নেই, কথা নেই—দুঃখের গোমড়া মুখ!

মলিনা কহিল,—তার বোঝাপড়া আমরা করবো। আপনারা পুরুষ মানুষ—মেয়েদের কথায় থাকেন কেন?

সতীনাথ কহিল,—বটে! আমাদের যে প্রাণান্ত!

ললিত কহিল,—কত বিধি-নিষেধের সৃষ্টি। না, উনবো না। আবার কাল তেমনি...

মলিনা কহিল,—আমার ভুল, আমি মানচি। তার কারণ ছিল...তুমি চলে গেলে কেন? তোমাব দোষ। ক'-দিনের জ্ঞান আমোদ করতে আসা...ভারী রাগ হয়েছিল। তাই। দিদি বারণ করলে না কেন? সতীবাবু যদি কোথাও যেতেন, আমি যেতে দিতুম না। তাই আমার রাগ হয়েছিল! আমার মনটা বপানে কেউ দেখলে না। সেই রাগে...

প্রমদা কহিল,—আমাব কিন্তু অভিমান হয়েছিল, সত্যি...

সতীনাথ কহিল,—তার পর?

প্রমদা কহিল,—আজ মাংস বেচতে এসেছিল—চাকররা বললে, কিনবো মা? সত্যি, তোমাদের খাবাব কষ্ট হচ্ছে! নিত্য ঐ ট্যাডশ আব চাঁচিঙ্গে! তাই গেলুম মাংস নিতে। এ-দিক থেকে আমি গেছি, ও-দিক থেকে ও...তার পর দু'জনে চোখো-চোখি হতে হেসে বাঁচি না!

সতীনাথ কহিল,—বাঃ! কিন্তু আমি যে বার্থ রিজার্ভ করে এলুম...

ললিত কহিল,—চমৎকার! পিশিমা কে টেলিগ্রাম পাঠিয়েচি, আজই কাশী যাচ্ছি বলে—এখন উপায়?

প্রমদা কহিল,—না।...কেমন একসঙ্গে আছি, নিৰ্ব্বাণটে! যাবো না।

মলিনা কহিল,—এ ক'টা দিন মিছে কি দুর্ভোগে

কাটলো। বেড়াতে আসার আনন্দ গেলুম কবে?

সতীনাথ কহিল,—জিহ্মাশ্রিতঃ...

প্রমদা কহিল,—শাত্রু রেখে সুপুত্রি আনিয়ে দাও এখনি। না হলে এই এক-হাঁড়ি মাংস সেক হবে না, চোখে জল যাবে! খাবে কি?

—অল রাইট!...

বিধাতা কিন্তু সত্যই বিরূপ। ডিহীরীতে থাকা গেল না। সেই দিনই সন্ধ্যায় মণ্ডুর প্রবল জ্ব দেখা দিল; এবং শেষ বাত্রে টেবির রক্ত আমাশয়!—উপায়? ডিহীরীতে ডাক্তার নাই! শেষে...

কাজেই কোনো মতে জিনিষ-পত্র গুছাইয়া পরের দিন আবার সেই পুনর্মুখিক...অর্থাৎ কলিকাতার সেই ধুমাজ্জর আকাশ, আকাশের নীচে সেই বন্ধ গাল, এবং সে গলিতে সেই কারা-গৃহ!...

সতীনাথ তাই আজও বসিতেছিল,—বাঙালী ভাগ্যে রোমান্স সইবে কেন! কথায় বলে, তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে!...

ললিত বলে,—কপাল নয় হে, বলো স্ত্রী! এই জগ্গই শাস্ত্রকাররা ব'লে গেছেন, পথে নারী বিবজ্জিতা!

প্রমদা হাসিয়া বলিল,—থামো। তোমরা দুই বন্ধুতে কি বলে গভীর হয়ে থাকতে মশায়? মুখ্য মেয়েমানুষ নও...এক জন উকীল, আব এক জন ফিলজফির প্রফেশন!

মলিনা বলিল,—ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখে অনেকে ছাপায়, দেখি। আমাদের মনে হয়, আমাদের ডিহীরীর সেই বৃত্তান্ত যদি ছাপানো যায়...

সতীনাথ কহিল,—লোকের তাক লাগে তা হলে; ভাবে, নারী জাতটা এমন অপদার্থ।

প্রমদা কহিল,—পুরুষ তার চেয়ে অদার্থ—সে প্রমাণ পেতেও কোনো বাধা ঘটে না।...আমরা যেন মান-অভিমান করেছিলুম, কথা বন্ধ করেছিলুম...তোমরা পেরেছিলে সে অভিমান সাবাত্তে?

ললিত হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নারীর কাছে পুরুষের পরাজয় যুগে যুগে ঘটেচে! তা ছাড়া স্ত্রীর চিন্ত-বিনোদনের জগ্গ প্রয়োজন হলে chivalric পুরুষ-স্বামী সব ত্যাগ করে! বন্ধুর সঙ্গে আলাপ, সে তো অতি তুচ্ছ বস্তু!

# ভগবান আছেন !

বি-এ এগ্জামিন দিব। বড়দিনের ছুটি ফুটাইলে পড়ার বইগুলো বাতিব করিয়া ঢশব তপশ্যায় মস্ত হইলাম। দু'টা বৎসব শুধু মিটিং করিয়া, কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রের অফিসে অফিসে ঘুরিয়া কাটাইয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, তাহাতেই নিজেব ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিব।

কিন্তু বন্ধুরা হুঁশ করাইয়া দিলেন—ডিগ্রীটাকে তুচ্ছ করিলে পরে পস্তাইতে হইবে। প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন,—যোগেশ, অভিলাষ, শর্করী—গোলদীঘার বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়ি টানিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের গায়ে থিমচি কাটিতে গিয়া মারা যাইতে বসিয়াছে। হুঃখের আজ তাদের সীমা নাই। আর ওদিকে ওই প্রশান্ত, সুনীল, চণ্ডী, হারাপ পাশ করিয়া নিজেদের আসনগুলোকে কায়েমি কবিয়া যেটুকু সাহিত্য-চর্চা চালাইয়াছে, তাহাতে—খাশা...

অর্থাৎ এদিকটায় আবাম আছে। ওদিকে ককণা-প্রার্থীর সেই দীন ভাব।

বন্ধুদের ইঙ্গিত গ্রহণ কবিলাম।

সকালের দিকে বাতিরের ঘরে ভিড় জমে। এ সময়টায় আমি পড়াশুনা করিতাম দোতলায়—আমাব শয়ন-কক্ষে। দুপরে বাতিরের ঘরে নামিতাম। তখন সে ঘরে ঝামেলা থাকে না—নির্জর্জনে বিশ্ব-বিজ্ঞান-মন্দিরের বাণী দেবীর সাধনা হয় ভালো।

‘প্রগ্রেস’ ভালো হইতেছিল, বলিতে পারি না। মন এ কষ্ট সহিতে পারিত না; ছুটিতে চাহিত সেই দারিদ্র-হীন মুক্ত কল্পলোকে! জোর করিয়া তাকে পড়ার কৈতবে চাপিয়া ধরিতাম। সেক্সপীয়ার, কীট্‌শ্, শেল—বিশ্ব-বিজ্ঞানের জুটুটি-পাতে রীতিমত নীবস কঠিন বোধ হইত। বাধ্যতায় এমনি দুর্ভাগ্য।

সেদিন কবিতার একটি লাইনে বাধা পড়িল প্রচুব—পাঁচটা সমালোচক বাক্‌জালে সে লাইনটা ব এমন বিভিন্ন অর্থ বাংলাইয়া গিয়াছে যে, সে তর্কের ফাঁশে মন বুঝি দম আটকাইয়া মরে। আমার হাঁফ ধরিয়াছিল।

খোলা জানালা দিয়া বাতিরের দীর্ঘ পথ দেখা যায়। সে-পথ সরল রেখায় দূবে গিয়া বাঁকিয়াছে। অর্থাৎ...

বাতিরের ঘরের পোজিশনটা একটু বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন।

আমাদের বাড়ীখানি একেবাবে মোড়ের উপর। বাতিরের ঘরের খড়খড়ি খোলা থাকিলে সামনের গলির সবটুকু সুস্পষ্ট দেখা যায়।

পথেব পানে চাহিয়াছিলাম। সহসা কাণে বাজিল,—চুড়িয়ালা—অ চুড়িয়ালা.....

ঝাঁকা মাথায় চুড়ি হাঁকিয়া পথে চলিয়াছিল এক চুড়িওয়ালা। এ আহ্বানে ফিবিল—ফিরিয়া একটা বাড়ীর দোতলার পানে তাকাইয়া দ্বাবে আসিয়া কহিল,—কোথায় গো?

দোতলা হইতে স্বর শুনিলাম—ঐ দোবের গোড়ায় নামাও। যাচ্ছি...

টেক্‌শট্-বুকে জর্জরিত মন যেন একটা অবলম্বন পাইল। এতক্ষণ পথেব পানে চাহিয়া ভাবিতেছিলাম, গলির মধ্যে বাস করা মূঢ়তা। কোনো রকম diversion নাই। বিশ্রী একঘেষেই।

চুড়িওয়ালা ঝাঁকা নামাইল...ওদিকে বাড়ীর দ্বারে মানুষী-সমাগম হইয়াছে, বুঝিলাম। চুড়িওয়ালা চুড়ি দেখাইতে লাগিল...দুখানি স্বগোল বাহু আমার চোখে পড়িতেছিল...দুইগাছি করিয়া কাচের চুড়ি...তাহাতেই বাহুর যা শ্রী বেশিলাম,—কবিতাব ছন্দে ফ্রেমে গাঁথিয়া বাগিবার মত।

পড়ার কথা মন হইতে উবিয়া মুছিয়া গেল। মনে হইতেছিল...

ভগবান আছেন। এবং তিনি অন্তর্ধ্যামী—এ-কথাও এক একবার বিশ্বাস হয়। নহিলে চুড়ি দেখিতে দেখিতে সেই বাহুর অধিকাবিণী দ্বার ছাড়িয়া গলির পথে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন? আসিয়া ঝাঁকা ঘাঁটিয়া দেখিতে লাগিল—রকমারি জিনিষ।—দেখিয়া দ্বাব-মধ্যবর্তিনী অপর কাহাকে দেখাইতেছিল।

নিশ্চয় ও-বাড়ীর কুমারী কজা! শীতের হাওয়া থামিবামাত্র চকিতে দক্ষিণ বায়ুর প্রথম পরশ যেদিন গায়ে লাগে, সেদিন যেমন আরাম বোধ হয়, কিশোরীকে দেখিয়া মনে যেমন আশ্রয় বোধ করিলাম। যৌবনের প্রথম টেটুটুকু আসিয়া অবসরবে লাগিয়াছে...

এখনো তার তরঙ্গ-ভঙ্গে সারা অঙ্গ তুলিয়া ওঠে নাই। তুলিবার ঠিক পূর্সক্ষণ! দেখিলে মনে হয়—আর কাহাবো হয় কি না জানি না, তবে কবিতার ফুল-বনে দু'বৎসর ঘুরিয়া আমার মত যদি কেহ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকেন তো আমার মত তিনিও বুঝিবেন, যেন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।

চমৎকার! কবিতা যদি লিখিতে হয় তো ঐ কিশোরীকে দেখিয়া। অপকল্প সুন্দরী? তা নয়। ত



কেমন যেন অপকৃপ মূর্তি! মন ও-মূর্তি ধ্যান করিতে  
চায়, কামনা করিতে চায়।

ভাবে-ছন্দে আমার বুক হুলিয়া উঠিল। বৃষ্টি, এই  
জুগই কবি বলিয়াছেন—Star to Star vibrates  
light ..

দ্বিতীয় ছত্রটাও বুক কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, - May  
not soul to soul...

কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম,—

লক্ষ যুগের জটিল তর্করাশি  
সোতার কঠিন নিগড়ে তা বন্ধ—  
তোমায় দেখি মিলায় স্তূপ প্রান্তে!  
চিত্তে ভাগে তোমার রূপের ছন্দ!

হ-হ করিয়া ছত্রের পর ছত্র—ছন্দে তালে নাচিয়া  
একশায়সাইজ বৃকের একখানা পাতা ভরাইয়া দিল!

কবিতা লিখিয়া চোখ তুলিয়া দেখি, পথ পড়িয়া  
আছে! রোজ-মাথা ধু-ধু পথ। পথে কিশোরী নাই;  
চুড়িওয়ালা চলিয়া গিয়াছে।

পড়ায় মন বসিল না। ও-বাড়ীর দ্বারের সামনে  
পথের ঐ অংশটুকু—সেই অরুণ চরণের আভায় এখনো  
যেন রাঙা হইয়া আছে।

ও-ধূলি! থিয়েটারে গান শুনিয়া ছিলাম—

যদি সে ঘরে না পশিতে পারিস্—  
ওরে সে দ্বাবেব ধূলা এনে দিস্—  
সেই সে ধূলাব কাজল দেখিস্  
নয়নে মাগিব হেসে।

বুঝিলাম, পথেব ধূলি তুচ্ছ বস্তু নয়!

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল। চমকিয়া  
উঠিলাম। আজিকার দিনটা...তাইতো! তাড়াহাড়ি  
মনের টুঁটি চাপিয়া Moral Philosophy পৃষ্ঠায় তাকে  
গুঁজ'ড়িয়া ধবিলাম। মন তাহাতে বসিতে চাহিল না..

পরেব দিন। পড়িতে বসিয়াছি! মন পথে ছুটিতে  
চায়...চুড়িওয়ালাটা আজ এখানে আসিবে না? কাল  
সন্ধ্যা বেচিয়া লাভ করিয়াছে।...

রাজ্যেব লোক পথে চলিয়াছে—ভুগু সেই চুড়ি-  
ওয়ালাব দেখা নাই!...

কিশোরী, চুড়িওয়ালা—তাদের চিন্তা ছাড়িয়া মন  
বহিমুখী হইয়া উঠিল। দেশের বাণিজ্য-বিস্তারে দেশ-  
বাসীর ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে দুঃখের সীমা নাই। এখানে  
সন্ধ্যা বেচিল; আবার আসা উচিত। তা নয়, আজ সে  
গেল অজ্ঞ পাড়ায়! হায়রে, আরো নব-নব শিল্প-সম্ভার  
আনিয়া...

চুড়িওয়ালা আসিল না। বেকুব! এই জুগ দেশের  
দুঃখ ঘোচে না! বাণিজ্যের কোনো নীতি জানে না!...  
চুড়িওয়ালার উপর রাগ হইল, দরদও হইল।  
অবশেষে...

কবিতার ছন্দে একটা কথা বড় হইয়া দেখা দিল,—  
কেমনে তাহাব দেখা পাই?

ভগবান আছেন—এ সত্য আবার উপলব্ধি হইল!  
হুপুরবেলায় ও বাড়ীতে তীব্র একটা আর্দ্রনাদ...  
সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্য আসিয়া আমার জানাইল—  
একবার আমাদের বাড়ী আসবেন?

আমার সর্বশরীরে বোমাঝু! এ কি সত্য?...

সত্যই। তখনই গেলাম। সেই কিশোরী বালিকা  
—তার পাশে শ্রোতা মহিলা—মুখে দাকণ উদ্বেগ।  
মহিলা কহিলেন—এঁর আফিসে একটা টেলিফোন করে  
দেবে বাবা? আমার ঐ ছেলের অস্থখ যাচ্ছে। ভারী  
টাল...ডাক্তার নিয়ে উনি যেন এখন বাড়ী আসেন।  
বলে গেছিলেন, তোমাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে;  
দরকার হলে যেন থপর দিই। তোমার বাবাব সঙ্গে  
আলাপ আছে তো...

আমি কহিলাম—কোথায় টেলিফোন করতে হবে?  
মহিলা চাহিলেন কিশোরীর পানে; চাহিয়া বলিলেন,  
—বল্ না...

কিশোরী এক মার্চেন্ট অফিসের নাম করিল।  
আমি কহিলাম—আমি এখন থবব দিচ্ছি...

তখন গৃহে ফিবিলাম এবং টেলিফোনে রিং করিলাম  
—হ্যালো...হ্যালো...

বামহরি বাবুকে পাইলাম। তাঁকে সংবাদ জানাইলাম।  
তিনি বলিলেন—আমি এখন যাইতেছি। এখন কেমন  
আছে?

তা তো! তা তো জানি না! সে সংবাদ লই নাই।  
কহিলাম,—একটু অপেক্ষা করুন। আমি জেনে আসি।

বামহরি বাবু কহিলেন—থাক। আমি এখন  
আসিতেছি ডাক্তার-সমেত.....

টেলিফোন-পর্ক চুকিল। কিন্তু এইখানেই আমার  
পর্ক শুরু!

আবার গেলাম বামহরি বাবুর গৃহে! ও গৃহের দ্বার  
আজ অবাবিত! গিয়া সংবাদ দিলাম, তিনি এখন  
আসিতেছেন। ছেলেটি এখন কেমন আছে?

গৃহিণী কহিলেন—এসো না বাবা। অস্থখ নেই। ভারী  
কাহিল...বোগ সেরেচে। ডাক্তার বলচে, খুব সাবধান।

তাঁর চোখে ঝল। তিনি কিশোরীর পানে চাহিলেন,  
চাহিয়া কহিলেন—আয় না বঁকি। লজ্জা কি!

কিশোরী নাম বৈকি। মা-বাপের মৃত্যু। আমি ভাবিয়াছিলাম, নাম বুঝি নলিনী, কিম্বা ছায়া, কিম্বা দীপ্তি।

কবিতায় আমি নাম দিয়াছি নলিনী! হৃদয়-স্বর্গ্য এই নলিনীকে দেখিবার স্বপ্নই আকাশে নিত্য আসিয়া উদয় হয়।

বিশু বৈকির নাই। বৈকি কহিল—যাব সব-তাতে ভয়। উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছলো। এখন তো এই চেয়ে আছে। মা কি কাণ্ডে করলে!

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম,—উনি সে মা! মায়ের মনে হৃদয়টাই আগে জাগে।

বৈকি কহিল,—আপনাকে শুদ্ধ জ্বালাতন করলে।

আমি কহিলাম,—না, না। এটুকু যদি না কবলুম, তাহলে এক পাড়ায় থাকার উদ্দেশ্যে?

কথাগুলো আমার কাণে ভাবি মুকন্দির মত শুনাইতে-ছিল। কিন্তু উপায় কি? দবদের কথা এমন শুনায। সহসা কবিত্বের কথা তোলা চলে না; বিশেষ এমন আপত্তিকালে।

বিশু আমার পানে চাহিয়াছিল, কহিলাম, ভালো আছে?

বিশু ঘাড় নাড়িল, হ্যাঁ।

বৈকির পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, আমি বাড়ী আছি, সে থপব...

কথা এইখানে থামিল। ‘আপনি’ বলিব, না ‘তুমি’ বলিব, স্থির করিতে পারিলাম না।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বৈকির পানে চাহিলাম। বৈকি অন্ধদিকে চাহিয়াছিল। মুখে...কবিতায় গল্পে পড়িয়াছি, ...সরম-রাগ—বৈকির কপোলে সেই সরম-রাগের দীপ্ত আভাস। অথবা যেন হাসির রেখা তন্দ্রাতুর পড়িয়া আছে...জীবনের একটু পরশ পাঠিলে যেন জাগিয়া সাড়া দিবে।

বৈকি আমার পানে না চাহিয়া জবাব দিল,—ভর্তু বললে,—ও-বাড়ী বাদাবাবু বাইরের ঘরে বসে পড়াশুনা করেন।

বুঝিলাম, চাকরের নাম ভর্তু। কহিলাম—হ্যাঁ। বি-এ এগ্জামিন দেবো কি না! আর ক’টা দিন পরেই এগ্জামিন।

কথা অল্পস্র—বিপুল হইয়া বুকে ফুঁশিতেছিল। বারিতেছিল শুধু ছোট একটু ব্যাপারে—‘আপনি’ বলব? না ‘তুমি’? ‘তুমি’ বলিলে এক মুহূর্তে প্রশ্নের কাছে গিয়া দাঁড়ানো যায়! ‘আপনি’ কথাটার মস্ত ব্যবধান। উপজ্ঞাস গল্পে ‘তুমি’ চলিয়া গিয়াছে। তাছাড়া বয়সে ছোট...

হোক ছোট! ‘তুমি’ বলিলে যদি ভাবে,—আমার

বয়স বহুদূর পথে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে—নাগালের বাতিবে!

সমস্তা! বাঙ্গলা ভাষার উপর রাগ ধরিয়া গেল। বিশেষ এই গল্প ভাষা! কবিতায় ‘তুমি’ চলিয়া যায় অবাধে; কবিতায় ‘আপনি’ নাই! কিন্তু কবিতায় তো কথা কওয়া চলে না! কহিলে একেবারে নাটক!...তাও হয় না!

বৈকি বলিল—আপনি এখানে বসবেন?

আমি কহিলাম—বসি। যতক্ষণ না ইনি আসেন।

ইনি অর্থে—রামহরি বাবু।

বৈকি চলিয়া বাইতেছিল। আমি মরিয়া হইয়া উঠিলাম। ভাষা-সমস্তা ভুলিয়া সাফ বলিয়া ফেলিলাম,—তোমরা শুধু দু’টি ভাই-বোন? বাড়ীতে আর কেউ নেই?

বৈকি বলিল—আমাব দাদা পড়ে শিবপুর্বে। সেই-খানে থাকে।

—ও।

বৈকি দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। ভাবিলাম, তাইতো। আবার কহিলাম—তুমি স্থলে যাও না?

বৈকি বলিল—যাই।

—আজ যাও নি?

বৈকি বলিল—বিশুয় অস্থির বলে গাই নি। মা একলা...

—ও!

বৈকি আব দাঁড়াইল না। আমি বসিয়া বহিলাম।

ঘরের চাবিটিকে চাহিয়া দেখিলাম। কার্পেটের ছবি—নাম লেখা আছে শ্রীমনোবমা দেবী। বৈকির নাম মনোবমা? মনে হইল, এনাম এ যুগে অচল! আগের যুগে এই নামটাই ছিল অপরূপ! এখন কাটিয়া ছোট করাব পালা! নাম হইবে ‘অক্ষরে’—বিশেষ কিশোরীদের। চাব অক্ষরে নাম শুনিলে মনে হয়, অতীত-যুগের নাগী—কিশোবী নয়। এ-যুগের নাম হাসি, শিখা, দীপ্তি, স্মৃতি, মীরা, গীতা!

তা হোক—মনোরমা-নাম কবিতায় কেন চলিবে না? ‘মনোরমা’ব চমৎকার মিল—‘প্রিয়তমা’, ‘প্রাণসমা’।

আবার মনে হইল, মনোরমা যদি বৈকির মায়ের নাম হয়! বৈকি কার্পেটের ছবি ভুলিয়াছে? এ যুগে বেওয়ারজ নাই। এ যুগের শিল্প কবিতার ছন্দে, গানের সুরে, ছোট গল্পের প্লটে, জাম্পার কোটে, পুল-ওভারে! কার্পেটের ছবির যুগ চলিয়া গিয়াছে! এখন ছবি আঁকা চলে—তুলি টানিয়া।

রামহরি বাবু আসিলেন; সঙ্গে ডাক্তার। দেখিয়া

শুনিয়া ডাক্তার বলিলেন,—ভয় নেই। লাফালাফি করেছিল বুঝি ?

বৈকি বলিল,—ছাদে উঠেছিল। তারপর মা বকতে ছুটে নীচে আসে... এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে !

রামহরি বাবু কহিলেন—জাখো তো অজ্ঞায় !

ডাক্তার বিস্মকে ভয় দেখাইলেন, কহিলেন—চূপ করে যদি শুয়ে না থাকো, তাহলে আমি হাসপাতালে তোমাকে নিয়ে যাবো !

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। রামহরি বাবু কহিলেন—আপিসে যাই ! অনর্থক দৌড় করালে !...

আমার পানে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি তো গুণময় বাবুর ছেলে ?

কহিলাম—আজ্ঞে, হ্যাঁ.....

রামহরি বাবু কহিলেন,—ভিৎম হয়েছিল। ওঁদের টেলিফোনে সে খপরটুকু দিলেই তো চলতো ! আমি ভাবলুম, না জানি, কি... বৈকি তো ছিল... এ বুদ্ধি তোঁর হলো না ?

বৈকি কহিল—প্রথম মুখে ভয় হলো। মা বললে, ভর্তুকে ডেকে, বাবুকে টেলিফোন করে দিক...

রামহরি বাবু আমার পানে চাছিলেন, চাতিয়া কহিলেন,—আমি চলে গিয়েছিলাম,—বাড়ীতে ছপুব-বেলায় পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না কি না। বলে গিয়েছিলাম, যদি তেমন বোঝো, গুণময় বাবুদের বাড়ী থেকে টেলিফোন করে দিয়ে...

এত কথাই আর প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ ডাক্তার সমেত রামহরি বাবুকে দৌড় করানোর গৃহস্থের কোনো লাভ না হোক, আমার লাভ হইল এই যে, প্রাণসম্মানোর সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আর একবার মনে হইল, ভগবান আছেন ! এ বিশ্বাস স্মৃদু হইল !.....

তারপর স্বেযোগ ছাড়িলাম না। পড়াব কেতাব খুলিয়া বসিতাম। মন কিন্তু ভাবিয়া থাকিত মনোরমায়। ছ'বৎসরে যে পরিমাণ কবিতা, গল্প-গান ঘাঁটিয়া বেড়াইয়াছি, তার ফলে মস্তিষ্ক খুলিয়া গিয়াছিল এবং কিছু সংবাদ গ্রহণের আগ্রহ লইয়া রামহরি বাবুর গৃহে নিত্য গিয়া উদয় হইতাম.....

বৈকির সঙ্গে কথাবার্তা হইত। কোনো দিন লভ্যেশ লইয়া যাইতাম, কোনোদিন চকোলেট, কোনোদিন বা একটা মাসিকপত্র, কোনোদিন ছেলেমেয়েদের এ্যাডভেঞ্চার উপন্যাস। বৈকিকে বিস্মকে গল্প বলিতাম। গল্প বিস্মকে বলিলেও বৈকি শুনিত ! যে দিন বৈকি

শুনিত, সেদিন আমার গল্প একেবারে আবব বজ্রনীর কূহক-স্বপ্নে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতাম !

দশ দিন পরেব কথা। বৈকির সেদিন জন্মদিন। আগের দিন বিস্ম বলিয়াছিল, দিদির কাল জন্মতিথি, দাঙ বাবু !

আমি কহিলাম,—বটে !

রামহরি বাবুর স্ত্রী নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রে একটু মাছ মাংস হইবে। বলিলেন,—তুমি আসতে পারবে না। তুমি এসো বাবা।

আমি কহিলাম,—আসবো।

জন্মতিথির দিনটা স্বেথাপড়ায় মন বসিল না। ছপুববেলায় বসিয়া কবিতা লিখিলাম। তারপর বৈকালের দিকে বাজার ঘুরিয়া দুটা কাপের টপ কিনিলাম। কবিতা-লেখা শ্রিপটা টপের সঙ্গে গুঁড়িয়া আকাশের দিকে চাতিলাম, কহিলাম,—এসো শ্রাম সন্ধ্যা.....

সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রণে বাহির হইলাম !

গৃহস্থ ঘর। আয়োজনে এমন কোন সমারোহ নাই ! বিস্ম দিয়া দোতলার ঘরে 'পাণ্ডয়া' বারিকী পড়িতেছিল। গজানন কোম্পানি পূজার সময় ছেলে-মেয়েদের জন্ম 'বারিকী' বাহির কবিয়াছে, হু'টাকা দাম। একখানা আনিয়া উপহার দিয়াছিলাম। কিনিতে হয় নাই। 'মন্দার' পত্রিকার সম্পাদকের বই ; উপহার—সমা-লোচনার্থে। দেখিব বলিয়া আনিয়া ফেরত দিই নাই ; গাপ কবিয়াছিলাম। সেই খানাই 'উড়ো থৈ' কবিয়া-ছিলাম। বৈকিও খুশী হইয়াছিল। আমার চুরি সার্থক ভাবিয়া আমাবো খুশীই অন্ত ছিল না।

বিস্মকে বলিলাম,—মা কোথায় বিস্ম ?

বিস্ম কহিল,—রাগাঘরে।

—দিদি ?

বিস্ম ডাকিল,—দিদি...

নীচে হইতে জবাব আসিল—কেন বে ?

বিস্ম বেইমান নয়। তা ছাড়া তার বুদ্ধি আছে। যে গল্প বলে, চকোলেট-লভ্যেশ উপহার দেয়, তাহার খাতির করা প্রয়োজন, তাহাও বোঝে ! কাজেই দিদিকে কৈফিয়ৎ চাহিতে দেখিয়া একটু চড়া সুরে কহিল,—দাঙ বাবু এসেচেন.....ডাকচেন...

বৈকি কহিল,—যাই.....

এবং সে আসিল। আমি কহিলাম,—কি করছিলে ? মা কোথায় ?

বৈকি বলিল,—মা রাগাঘরে মাংস বাঁধচে।

আমি কহিলাম,—তুমি ?

হাসিয়া একপাক ঘুরিয়া একরূপ নাচিতে নাচিতে  
বৈকি বলিল,—মাংস চাখছিলুম। চমৎকার হয়েচে।

দেশের বা সমাজের সমস্যা লইয়া বৈকি কখনো মাথা  
ঘামায় না। জানি না, কোন্ সমস্যা লইয়া সে আকুল।  
কিশোরীবা প্রাণে এতখানি সাংলো! মনের এমন সহজ  
প্রকাশ, লীলা-ভঙ্গী। কাজ নাই বৈকির সে সমস্যা লইয়া  
মাথা ঘামানোয়। সে মাংস চাখিয়াই বেড়াক। তাহাতে  
যে স্ত্রী খোলে!

কবিতা একেবারে ছন্দে হুঁলিয়া মাথায় কিলবিল  
করিয়া উঠিল...সদ্ব্যবহারের মত।...

মুগ্ধ-নয়নে বৈকির পানে চাহিয়া রহিলাম। বুক-  
খানাব মধ্যে বায়োঙ্কোপের বডান ছবি ফুটিল। একটা  
নিখাস চাপিয়া কহিলাম,—আজ তোমার জন্ম-দিন?

বৈকি কি-সে দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল...আজিকার এই  
তিথিতে তার মনে নতুন কোনো ভাবের জন্ম হইল কি?  
এমন বিহ্বল-করা দৃষ্টি বৈকির চোখে আগে দেখি নাই।

বৈকি কহিল,—হ্যাঁ।

আমি কহিলাম,—বাবা-মা কি দিলেন?

বৈকি জবাব দিবার পূর্বে বিগু কহিল,—মা দিয়েচে  
মাস্তাকী শাড়ী। বাবা কিছু দেয় নি...

বিগুর পানে চাহিয়া কহিলাম,—তুমি?

বিগু কহিল,—আমি পয়সা পাবো কোথায়? বা  
রে...

পকেট হইতে টপ্ বাহির করিয়া কহিলাম,—এই  
নাও...আমার উপহার।

বৈকি অবাক! বিগু লাফাইয়া কাছে আসিল,  
কহিল,—কি এ?

আমি টপ বাতিব করিয়া দেখাইলাম, কহিলাম,—  
কাণে পরো...

বৈকি কহিল,—মাকে দেখিয়ে আসি। আমার  
কেমন...

কথা শেষ না করিয়া বৈকি টপ্ লইয়া ছুট দিল।  
বিগুও পিছনে চলিল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম...  
...উৎকর্ষ...

নৌচে কি কথা হইল। কথা বুঝিল্যি না।

বৈকি কিরিয়া আসিল—আর এক মূর্তি! শাস্ত। সে  
নৃত্য-ছন্দ মিলাইয়া গিয়াছে! আমার পায়ে কাছ  
ভূমিষ্ঠ হইয়া বৈকি প্রণাম করিল। আমি তার মাথায়  
হাত রাখিলাম। কি বলিয়া আশীর্বাদ করিব, বুঝিলাম  
না। শুধু হাতটা মাথায় রাখিলাম!...বিদ্যুতের শিখা  
ছুটিয়া গেল—মাথা হইতে পা পর্যন্ত!

শহরিয়া উঠিলাম।

বৈকি চলিয়া গেল। আমি বসিয়া রহিলাম। বিগু  
কহিল,—আপনি বসুন। মা আসচে...

বৈকি আসিল, কহিল—একটা পরেচি। আর একটা  
পারচি না...

বৈকি কাছে আসিল। আমি কহিলাম—দেখবো?

বৈকি কহিল—পারবেন?

—পারবো।

—দেখবেন, লাগিয়ে দেবেন না!

কহিলাম,—না।

টপ্ তার কাণে পরাইতেছিলাম। কাণের এই ডগা-  
টুকু...ফুলের পাপড়ি বুঝি এমন কোমল নয়! আঃ...  
হুনিয়াব আরাম যেন এই কাণের ডগাটুকুতে!

সহসা বৈকি চীৎকার তুলিল,—উঃ...

ছিটকাইয়া সে সরিয়া গেল; জ্ব কুপিত কবিতা  
কহিল,—এমনি লাগিয়ে দেছেন। আমার কাণটাকে কি  
ভেবেছিলেন? মাটি? না, কাঠ?

সে-মিষ্ট রোষের মধুর ভঙ্গী! মন তাহাতে পাগল  
হইয়া যায়! আমারও গেল। কহিলাম,—মাটি কাঠ নয়...

—তবে? অপাঙ্গ দৃষ্টিতে হাসিব আভাস!

কহিলাম,—ফুল!

বৈকি চুপ করিল। চকিতে গভীর!

আমি কহিলাম,—লাগবে না! এসো পরিয়ে দি...

বৈকি আসিল। এবারে ঠিক পরাইয়া দিলাম।  
দিয়া কহিলাম,—বেশ দেখাচ্ছে।

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে বৈকি আমার পানে চাহিল। সে  
দৃষ্টিতে প্রাণে সাহস আসিল। শক্তি পাইলাম।

কহিলাম,—এইটে লিখে এনেচি। নাও...

বৈকি লইল, লইয়া দাঁড়াইল না; চলিয়া গেল।

কবিতার ছত্র। লিখিয়াছিলাম,—

আজকে তোমার জন্মদিনে

কত কি গব দিচ্ছে কিনে,

আমি গরীব—আমি কি আর পাবো?

সে দিন আর বৈকির দেখা মিলিল না...

মিলিল পরের দিন।

সে চাপল্য নাই। অবিচল ভঙ্গী। চোখের  
দৃষ্টি অনিমেয়। তবে বড় সতর্ক! বুঝিলাম,  
যে-চেষ্টে আমার বুক উঠিয়াছে, তার হিল্লোল  
লাগিয়াছে বৈকির বুক!...আর একটা বৎসর আসিয়া  
তাকে অভিনন্দন করিয়াছে। যৌবনের পুষ্পধারে...

কবিতা লিখিয়া আনিয়াছিলাম,...ডাকিলাম,  
—মনোরমা...

বৈকি বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

বুঝিলাম, নাম ধরিয়া আহ্বানের জ্ঞাপ! কহিলাম,

—এখন তুমি ডাগর হয়েচো। ‘বৈকি’ নাম আর  
সাজবে না! তোমার সঙ্গে সঙ্গে এখন ফাগুনের স্বপ্নমা।

বৈকি নীরব। আমি কহিলাম—কবিতাটা শুনবে?

বৈকি জবাব দিল না। আমি পড়িলাম—

কাল ছিলে বালিকাটি।

নৃত্যে ছন্দে যেন নিররিণী!

আজিকে যৌবন-বান

অন্তরে আবেগময়ী প্রেম-মন্ডাকিনী!

বৈকি দাঁড়াইল না, পলাইল।...

আমার দশা...?

তার পরিচয় জাগিতে লাগিল—কবিতাব পাতায়!...

সেকস্পীয়র, পিট, মেকলে অবহেলায় পড়িয়া রহিলেন  
শেলকে।

প্রেমে বাদ পড়িতে হয় তো সে এই বয়সেব কিশোরী  
সহিত! মন বার পাকে নাই! কতকগুলো কবিতা বই  
পড়িয়া মনকে যে অহঙ্কারে মাতায় নাই! এমন  
ক্রোধময়ী—অথচ পীলার বার অন্ত নাই।

বৈকির সঙ্গে নিত্য দেখা হইতে লাগিল। তাকে ও  
বিশুকে গল্প বল। তার মধ্যে বিশুকে বলি,—তোমার  
জ্ঞান লজ্জাজেস আনিয়াছি। বিশু লাফাইয়া ছুটিয়া আমার  
ওখানে যায়। আমি বৈকিকে কবিতা পড়িয়া শুনাই।  
বৈকি স্থির হইয়া শোনে—কোনো কথা কয় না।

সে-দিন আকাশে-বাতাসে বসন্তের পূর্ণ মাধুরী  
জাগিয়াছে। আমার প্রাণে বসন্ত সাড়া তুলিয়াছে।...  
সঙ্গে সঙ্গে কি অদীরতা!.....

বৈক একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়াছিল...

ডাকিলাম—বৈকি... ..

বৈকি বলিল,—মাসিমার বাড়ী নেমন্তন্ন যাজ্জি . ...

কহিলাম,—একটা কবিতা এনেচি। শোনো ..

বৈকি না বা হাঁ কোনো কথা কহিল না। তার এ  
মৌনতার অর্থ আমি বুঝিয়াছি। দু’বৎসর ধরিয়া কবিতা  
লিখিয়া নারী-চৈতন্যের পরিচয় যদি না পাই তো মিথ্যা  
কবিতা লেখা!

কবিতা পড়িলাম। লিখিয়াছিলাম,

এ বসন্তে দুঃস্থ এ-মন—

শান্ত তারে পারি না করিতে!

আসি বাই—আসি যে আবার,

ওগো লহো মনের তরীতে!

হে আমার প্রিয়তমা মনোরমা প্রিয়া

মনেরে করাও স্থান প্রেম-সুখা দিয়া!

বৈকির চোখের দুটি স্থব...আমি চাহিয়া দেখিলাম।  
মনে হইল, ও চোখে যেন মিষ্ট মধুর ইঙ্গিত!

আমার মাথায় কি যে হইল... শুধু ছন্দ আর ছন্দ।  
ভাবিলাম Now or Never।

বৈকির ছুটি হাত চাপিয়া ধরিয়া গদগদ-কণ্ঠে ডাকি-  
লাম,—বৈকি...

বৈকি কথা কহিল না; নিশ্পন্দ... যেন পাথরের  
পুতুল! সে মৌনতা আমাকে পাগল করিয়া তুলিল।

আমি কহিলাম,—আমি তোমায় ভালোবাসি...  
ভালোবাসি তোমার এই অধরের প্রেমসুখা...ঠোঁট নয়—  
ছুটি যেন রাঙা গোলাপ!

বৈকিকে বুকে টানিলাম। সহসা হাতে বিছার দংশন!

বৈকি ত্রিভায়া উঠিয়া সরিয়া গেল...। হাতের  
পানে চাহিয়া দেখি, হাতে রক্ত ঝরিতেছে...বৈকি  
সজোরে একটা পিন আমার হাতে ফুটাইয়া দিয়াছে...

করুণ নয়নে তার পানে চাহিলাম।

বৈকি কহিল—গোলাপে কাঁটা থাকে!

হাসিয়া বৈকি চলিয়া গেল।

আমাকে আসিতে হইল। অমন শান্ত মেয়ে...এমন-  
ভাবে প্রেমের অপমান করে! মনে ধিকার জন্মিল।

দুঃখ হইল। দুঃখ নিজের জ্ঞান তত নয়, বত এই  
বাঙলা-দেশের জ্ঞান। অভাগা দেশ!

আবার বুঝিলাম, ভগবান আছেন!

নহিলে এমনভাবে চেতনার সন্ধার হয়। বাড়ী গিয়া  
মেকলে সেক্সপীয়র খুলিয়া বসিলাম। তাঁরা অভিমান  
এমন বাঁকিয়া আছেন, মনে প্রবেশ কবিত্তে চাহেন না।...

আর তিন দিন পরে এগ্জামিন...

অসম্ভব! ছাদে উঠিলাম। বৈকিদের বাড়ীর দিকে  
চাহিলাম...একখানি খার্ড ক্লাশ গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইয়া  
আছে। বৈকির সদলে গাড়ীতে উঠিতেছে...

সোমবারে এগ্জামিন। রবিবার সকালে পাড়ায়  
হঠাৎ শব্দধ্বনি! মা আসিয়া ঝড়ঝড়র ধারে দাঁড়াইলেন,  
কহিলেন,—রামহরি বাবুর মেয়ের পাকা দেখা আজই  
তা’হলে!

একটা নিখাস পড়িল। ভাবিলাম, সেই বৈকি!  
একটা উকিল! নয় ডাক্তার! নয় ডেপুটি! নয়  
কেরানী! এমনি কোনো লোকের হৃদয়ের সঙ্গে তার  
হৃদয় মিশিয়া এক হইবে!

হোক! বৈকি মাহুষ নয়! মাহুষ চিনে না! ডেপুটি-  
উকিলের দল পাশ করিতে পারে; কিন্তু মাহুষ ‘পাশে’  
নয়, কবিত্তে!

ধাক্কা! বাঁচিয়া গিয়াছি! আমার চিত্ত...তা বুঝি  
বার শক্তি বৈকির নাই! থাকিলে...

ভগবান আছেন! সত্যই আছেন।



# হাতের পাঁচ

[ কৌতুক-নাট্য ]

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত ;

প্রথম-অভিনয়-রজনী, শনিবার, ১৬ই পৌষ, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ প্রহসন-কার

সমাজের অকৃত্রিম বন্ধু ও সংস্কারক, রস-সাহিত্য রথী

৩দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

গ্রন্থকারের শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ উৎসর্গিত হইল।

## পূর্ববক্তা

এই ক্ষুদ্র

গ্রন্থখানি সম্বন্ধে

আমার একটি ক্ষুদ্র নিবেদন

আছে। প্রহসন বা কৌতুক-নাট্য

বলিলেই এ দেশের পাঠক ও সমালোচকগণের

মধ্যে কেহ কেহ লেখকের উদ্দেশ্যের প্রতি মৃদু ইঙ্গিত

করিয়া থাকেন। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থের ব্যঙ্গটুকুর মধ্য হইতে কেহ যদি

কোনরূপ উদ্দেশ্য খুঁজিয়া বাহিব করিতে চাহেন, তাহা হইলে লেখকের

প্রতি তিনি অবিচার করিবেন। কারণ, এ গ্রন্থ লিখিবার সময় আমার মাথায়

কোনরূপ সুগভীর উদ্দেশ্য ছিল না। জ্ঞানীশিক্ষা ও জ্ঞানীলোকগণের অল্লাধিক স্বাধীন

বিচরণের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করাই বর্তমান বঙ্গীয় প্রহসনাদির চরম লক্ষ্য। অথচ সে দিক্

হইতে তাঁহাদের পক্ষ লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন প্রহসন বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে

বলিয়া, কৈ, আমার তো জানা নাই। এ গ্রন্থে ব্যাপারটার অপর দিক

দেখা হবারই আমি প্রেমাশ পাইয়াছি। সামান্য কৌতুক-রস অব-

তারণা করাই—অবশ্য আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী—

আমার অভিপ্রায়। সেই জন্য বক্তব্য, এ

ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিকে কেহ অপর কোন-

রূপ মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত জড়িত

না করিলেই আমি

কৃতার্থ হইব।

ইতি

ভবানীপুর

২৩ পৌষ, ১৩২২

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

# হাতের পাঁচ

চরিত্র

প্রথম দৃশ্য

প্ৰথম

সজ্জিত কক্ষ ; পশ্চাতে তালাবন্ধ অপব কক্ষ  
মাধুরী ও প্রকাশের প্রবেশ

অনিল মিত্র ... .. দনাঢ্য শিক্ষিত যুবক  
প্রকাশ দত্ত ... .. ঐ বন্ধু  
যতীশ সেন ... .. বিলাস-প্রত্যাগত নব্য বারিষ্ঠান  
নীলমণি ... .. যক্ষীশের খানশামা

পুৰোহিত, ভৃত্য প্রভৃতি

নারী

মাধুরী } পিতৃমাতৃস্নান দনাঢ্য-ভিত্তিভয়  
স্নেহ }  
পিশিমা ... .. মাধুরীর সম্পর্কীয়  
মালতী ... .. ঐ দাসী

কাল—আধুনিক ; সংযোগ-স্থল—কলিকাতা।

প্রস্তাবনা

কোরাঁস।

তোমাদের ঐটি বিষম ভয় (ওগো)।

আমাদের শিখিয়ে পড়া,

তোমাদের রান্নাঘরে ঢুকতে পাচ্ছে তয়।

নাবো কমল-কবে ধবলে কলম, ধবণো বেড়ি কি ?

লিখবো শুধুই কাব্য, করবো হা-হা-হুজু-হুজু !

তা সে ঠিক নয়, ওগো ঠিক নয়, ঐধু ঠিক নয় !

তোমরা দুসিয়ে কৌচা, বাগিয়ে টেরি, সেছে বিষম বাবু

সেলাম দিতে গোলামিতে কত কি হও কাবু ?

বলি ওগো, বলি ওগো, বলি ওগো মহাশয় !

আমাদেরো কেনো তেমন, মেসার্স প্রাণপতি,

সেলাম দিতে হবেই ও-পায়, নাবীর যে তাই গতি,—

(কারণ) চাকরি করা ত্বরান্বিত সে,—নাবীর তা কি সম ?

প্রকাশ। চাবি আমি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমাব  
এক কথা, বাইরের লোকেব সঙ্গে মেলা-মেলা আমি  
পছন্দ করি না। (পিছনেব ঘরের চাবি খুলিয়া)  
নিহ্ন। আমি আবাব আসচি এখনি।

(প্রস্থান)

মাধুরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া স্নেহর হাত ধরিয়া  
বাতিরে অনিল। স্নেহ নতমুখী ; তাচাব মুখ দেখিলেই  
মনে হয়, এতক্ষণ সে কুঁপিয়া কাঁদিতছিল।

মাধুরী। স্নেহ—

স্নেহ। (মাধুরীর বৃকে মুখ রাখিয়া) দিদি—

মাধুরী। আমি এ ব্যাপার জানতুম না, স্নেহ।  
রমেন বাবুদেব জন্ম খাবার তৈরি কবছিলুম। তাঁরা  
থেকে গেলেন, কিন্তু তোকে দেখতে পেলুম না।  
ভাবলুম, বুঝি উপরে কি কবাচল। তাব পর তাঁরা চলে  
গেলে উপরে তোকে খুঁজে পেলুম না—শেষ মালতী  
আমার সব বললে। তখন আমি প্রকাশবাবুকে  
ধরে ঘব খোলালুম। কিন্তু এ কাণ্ড ঘটালো কেন ?

স্নেহ। রমেনবাবুব ভাই মাসিক পত্রে লেখেন না ?  
তা তাঁব সঙ্গে আজকালকার মাসিক-পত্র সম্বন্ধে  
চটো কথা হচ্ছিল। রমেনবাবুর জ্ঞা তাতে ঠাট্টা-  
তামাসা করে যোগ দিচ্ছিলেন। প্রকাশ বাবু তিন  
চাব বার ঘবটাব সাম্নে দিয়ে আনাগোনা করলেন  
—তার পর মালতীকে দিয়ে আমায় ডাকিয়ে বললেন,  
এই ঘব থেকে রূপোব ভূপেটা বার করে দিতে।  
যেমন আমি বাব করতে ঘরে ঢুকেচি, বাইবে থেকে  
অমনি উনি দোবে তালা এঁটে দিলেন।

মাধুরী। কি ভয়ানক লোক ! এমন লোককে আর  
বাড়ী ঢুকতে দেওয়া ঠিক নয়। আজই আমি  
এর বাহিত করবো,—একবার আহুন প্রকাশবাবু—  
এত বড় ঠর আম্পর্দা ! এ রকম অপমান  
করবার ঠর কি অধিকার আছে ?

স্নেহ। আমাব কিন্তু ভয় হচ্ছে দিদি—



মাধুরী। ওঃ, কিসের ভয়? তবু যদি উনি স্বামী হতেন!

স্নেহ। কিন্তু—

মাধুরী। কিন্তু কি? প্রকাশ বাবুর সঙ্গে কখনই তোব  
বিয়ে হতে দেবো না।

স্নেহ। দলিলে আছে—

মাধুরী। দলিলে আছে, এঁরা দুজনে বিষয়ের টাঙ্গি,  
আর দুজনে আমাদের দুই বোনের অভিভাবক।  
আমাদের বিষয়ের পাত্র ওঁরা পছন্দ করে দেবেন,  
নিজে বা ইচ্ছা হলে বিয়ে করতেও পারেন। কিন্তু  
তাই বলে তোরা যদি ওঁকে বিয়ে করতে আপত্তি  
থাকে, তবু ওঁকেই বিয়ে করতে হবে, এমন আইন  
হতে পারে না।

স্নেহ। আমার অংশের সমস্ত টাকা তাহলে  
প্রকাশ বাবু—

মাধুরী। হাঁ, দলিলে আছে, প্রকাশ বাবু অমনোনীত  
পাত্র যদি তুমি বিবাহ করো, তাহলে তোমার অংশের  
টাকা বা বিষয়ে তোমার বা তোমার সেই স্বামীর  
কোন অধিকার থাকবে না। প্রকাশ বাবু সে-সব  
আপনার ইচ্ছামত কোন সদনুষ্ঠানে দান করতে  
পারবেন।

স্নেহ। তবে?

মাধুরী। তবে কি। অনিলবাবু সে-সম্বন্ধে গোঁজ  
নিয়েছিলেন। একজন বড় ব্যারিষ্টার বলেছেন,  
প্রকাশ বাবু জোর করে বিয়ে করতে পারেন না।

স্নেহ। প্রকাশ বাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে আমি বাঁচবো না।  
দেখচো তো দিদি, এখনই কেমন ব্যবহার!

মাধুরী। তুই নেহাৎ ভালোমানুষ বলেই না আশ্বাস  
বেড়ে যাচ্ছে! আমি হলে ছ'মণি কথা শুনিযে  
দিতুম।

স্নেহ। একটু ভাদে ওঠবার জো নেই, জানলার ধারে  
দাঁড়াবার জো নেই, ছ'খানা ভাল বই পড়তে পাবো  
না। পাগল হয়ে যাবার জো! আচ্ছা, সত্যি কি  
দিদি, লোকে আগে এই বকম ছিল?

মাধুরী। তা ঠিক বলতে পারি না। তবে পুরুষমানুষ-  
দেব মধ্যে কেউ কেউ এমন ছিল, এখনও আছে,  
যাদের বিশ্বাস, মেয়েরা যদি একটু স্বাধীনতা পায়,  
তা হলেই তারা নষ্ট হয়ে যাবে।

স্নেহ। ছি, ছি, কি নীচমন!

মাধুরী। মেয়েদের যারা সম্রমের চোখে না দেখে, এই  
রকম অসম্মান করতে পারে, তারা পণ্ড!

স্নেহ। অনিলবাবু কিন্তু বেশ লোক, দাঁদ। আচ্ছা,  
অনিলবাবু তোমায় বিয়ে করবেন কি না, সে কথা  
স্পষ্ট করে বলেচেন?

মাধুরী। না

স্নেহ। তাঁকে বিয়ে করতে তোমার মত আছে?

মাধুরী। আমার মতে কি এসে যায়, স্নেহ? ও কথা  
থাক। তুই একটা গান গা।

স্নেহ। প্রকাশ বাবু এসে পড়লে বাক্যজ্ঞান আর অস্ত  
থাকবে না।

মাধুরী। ওঃ, তবে তো মাথা একেবারে কাটা যাবে!  
গাখ, বখার্ব আমার দুঃখ হয়। লেখাপড়া  
ছেড়ে দিয়ে কতকগুলো বক-বার্খিকের সঙ্গে মিশে  
প্রকাশ বাবু আশ্রয় বদলে গেছেন। এমন হবেন  
জানলে বাবা কখনও তাঁকে টুটি কবতেন না। কি  
ভাবচিস, স্নেহ? গা—

স্নেহ। গীত

ছেলেবেলার কোমল ধরা কঠিন কেন হয়ে আসে?  
কোথায় আজিরঙিন আলো? লুকালো সেকোন আকাশে?  
মেঘে কারো পাটনে সাড়া, বাতাস কেন পরশ-হারা?  
কালো আঁধার করণ চাওয়া প্লাড়ে আছে কাহার আশে?  
কোথায় সেই নিমেষ হারা আঁধার-বাতের পুষ্প-তারার?  
আমার চোখে সকল আলো আজ কেন যায় নিবে আসে?  
ফুলের মুখে, পাখীর স্বরে, যে সুর ছিল যায় সে ঝরে!  
কোথায় মোরে নিয়ে এলো বেঁধে কি এক কঠিন ফাঁশে!

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

অনিল। মাধুরী, ইনি আমার বন্ধু যতীশচন্দ্র সেন  
এক্সায়ার, বাব-এ্যাট্-ল, যার কথা সেদিন বলে-  
ছিলুম।

যতীশ। (অভিবাদনান্তে) আবার এক্সায়ার কেন?  
চাট্ নেই, কোট নেই, ধুতি পবা, জামা গায়—

মাধুরী ও স্নেহ। (প্রত্যভিবাদন)

অনিল। এঁর সঙ্গেও দলিলের কথা হলো। ইনিও ঐ  
কথা বলেন, বিবাহের উপর হস্তক্ষেপ করতে  
প্রকাশের বা আমার কোন অধিকার নেই। আইন  
তা প্রোক্ত করবে না।

যতীশ। আসবার সময় স্তম্ভর গান শুনলুম,—কে  
গাইলেন?

মাধুরী। স্নেহ গাইছিল। ওর গলাটি বেশ—অন্ততঃ  
আমার মনে হয়।

যতীশ। কেন, আমারও বেশ মনে হলো।

মাধুরী। সে ওর সৌভাগ্য! স্নেহ, মিষ্টার সেনকে  
ধন্যবাদ দিলি নে?

স্নেহ। আঃ, যাও দিদি (লজ্জাবনতমুখী হইল)।

যতীশ। দেখুন, আপনারা যদি নিরীহ যতীশকে  
মিষ্টার সেন বলেন, তাহলে আমার আর লজ্জা  
রাখবার স্থান থাকবে না।

মাধুরী। মাপ করবেন, যতীশবাবু। আপনি যে

একঘরে, তা জানতুম না! যাঁদের সাতপুরুষে কেউ কখনো বোধাই কোন্ দিকে, তা জানেন না, বিলেত তো বড়দূর, তাঁরাও যে মিষ্টাব নামের জন্ত লালসিত, সেই মিষ্টাবকে টাটকা বিলেত থেকে ফিবে আপনি বয়স্কট কবেচেন, পরিচয় না পেলে এটা কেমন করে জানবো, বগুন?

যতীশ। তাঃ তাঃ, আপনি দেখচি, একজন wit.

মাধুরী। এটা fact—আমাব এতে wit নেই।

যতীশ। আপনি বোধ হয় বেগুনে পড়েছিলেন?

মাধুরী। না। বাবার কাছে ঘরেই যা একটু-আধটু শিখেছিলুম। তার পর অনিলবাবু যথেষ্ট চেষ্টা-পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু জানেন তো, একটা কথা আছে, মোল্লাব দৌড় মসজিদ অবধি!

অনিল। ওহে যতীশ, তুমি যদি একজন মহিলার সম্মানের দিকেই অতিরিক্ত ঝোঁক দাও, তাহলে অপর জন ক্ষুব্ধ হতে পারেন...

যতীশ। ওহো, মাপ করবেন, মিস্ বোস্।

মাধুরী। মিষ্টাব কাটলেন যদি তো আবার মিস্ কেন?

যতীশ। ঊঁর নাম,—এঁর নাম—

মাধুরী। ঊঁর নাম ঊঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না, কেন?

ওঁত বোঝা নয়, বেশ accomplished.

যতীশ। আ-আ-আপনার নাম?

মাধুরী। বল্ না!

স্নেহ। শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী।

যতীশ। (স্বগত) Ah how fine!

অনিল। তাহলে আর তোমায় আটকে রাখবো না যতীশ, কোথায় তোমার পাটি আছে, বলছিলেন!

যতীশ। ওহো, থ্যাঙ্ক্‌স্। ভুলে গেছিলুম। তাহলে আজ আসি, কিছু মনে করবেন না। আ-আপনার দেব সঙ্গে আলাপ হওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে।

মাধুরী। আবার আসবেন।

যতীশ। নিশ্চয়!

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। ইনি এসেছিলেন কে?

অনিল। আমাদেরই এক বন্ধু, সম্প্রতি ব্যারিষ্টার হয়ে ফিবেচেন...

প্রকাশ। তুমিও কি এঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করলে না কি, স্নেহ?

অনিল। শুধু ওঁর সঙ্গে কেন, মাধুরীর সঙ্গেও ওঁর বেশ আলাপ হলে।

প্রকাশ। সে সখ্যকে আমার কিছু বক্তব্য নেই—তবে অপর পুরুষমাত্রেয়র সঙ্গে স্নেহর এমনভাবে আলাপ-পরিচয় করা আমার পছন্দ নয়।

মাধুরী। তাতে অপরাধ?

প্রকাশ। আমার পছন্দ নয়। বাঙালীর ঘবেব মেয়েব ব্যবহার বাঙালীর ঘরের মতই হবে।

মাধুরী। তার অর্থ?

প্রকাশ। তার আবাব অর্থ কি! দোষের বলে আমি সেটা মনে করি। স্নেহ নেহাৎ ছেলেমানুষ নয় যে...

মাধুরী। দোষ! প্রকাশ বাবু, আপনি অস্বাভাবিক কথা বলছেন। স্নেহ ছেলেমানুষ নয়, সেজ্ঞা একথা আবও দোষের। স্নেহ আমার বোন, আপনি কি বলতে চান...

প্রকাশ। আমি বলতে চাই, আপনাব চালচলন আমার কাছে বড় ভাল মনে হয় না।

মাধুরী। সাবধান হয়ে কথা বলবেন, প্রকাশ বাবু। বাবা আপনাকে স্নেহ করতেন বলে আপনাব এই সব কথাবার্তা শুনেও শুনতুম না—কিন্তু আব এমন কথা বদনাস্ত কববো না। আপনি মহিলার সম্মান বুঝে চলবেন।

প্রকাশ। আপনাকে কোন কথা বলছি না! স্নেহকে বলবার আমার অধিকার আছে। সে আমাব বাগদস্তা স্ত্রী; নিজের স্ত্রীকে নিজের ইচ্ছামত লোকে দেখতে চায়, তাকে মহিলার অনুচিত ব্যবহার কবতে...

মাধুরী। প্রকাশ বাবু...

প্রকাশ। আপনি চোখ রাঙাচ্ছেন! জানেন, স্নেহের উপর আমার অধিকার আছে?

মাধুরী। অধিকার! কিসের অধিকার? কোনো অধিকার নেই! কে আপনি? আপনি বাইরের লোক, ট্রাষ্টী আছেন, সেইভাবে চলবেন। আমাদের শিক্ষা, আমাদের চালচলন, সে সবে উপর ইজিত করা ভজ্ঞতা নয়।

স্নেহ। দিদি—(হাত চাপিয়া ধরিল)

মাধুরী। চুপ কর, স্নেহ। স্ত্রীলোক সখ্যকে যার মন এমন ইতর, মানুষ বলে সে আপনার পরিচয় দেয়!

অনিল। মাধুরী, চুপ করো—আমার অনুরোধ!

প্রকাশ। অনিল, তুমি ভাগ্যবান! এমন তেজবিনী স্ত্রী পাবে, বক্তৃতা-মঞ্চ উজ্জ্বল হবে!

অনিল। আমিও বলছি, প্রকাশ, তুমি মহিলার মর্যাদা রেখে কথা বলো।

প্রকাশ। বেশ,—কথা আমি বেশী বাড়তে চাইনে। আমাব কথা হচ্ছে—বিবাহে আর বিলম্ব করা হবে

না! বড় বোনের বিয়ে না হলে যখন ছোটর হতে পারে না, তখন শীঘ্রই বিবাহের দিন স্থির করো। ২৭শে শ্রাবণ বিয়ের শেষ দিন—সেই দিনের মধ্যে আমি স্নেহকে বিবাহ করবো, সঙ্কল্প করেছি। আমার স্ত্রী হলে স্নেহকে নিজের মতে চালাতে গেলে কারো বাক্যবাণ বোধ হয় সহ্য করতে হবে না। আমি বলে গেলুম, ২৭শে শ্রাবণ, স্নেহর বিবাহ আমাব সঙ্গে। এর নড়চড় হবে না, জেনো। আর স্নেহ, যে-স্ত্রীলোক স্বামীর অনভিমতে অপব পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব কবে, বিগড়ে যেতে তার বড় বেশী দেবী হয় না! বুঝে চলবে। এ সব হিন্দু নাবীর আদর্শ নয়।

(প্রস্থান)

মাধুরী। ওঃ, এই পাষাণ বর্ষরের সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হবে? কখনো না!

স্নেহ। (মাধুরীকে জড়াইয়া) দ্বিদি...

মাধুরী। কাদিসনে স্নেহ। এ বিয়ে কখনই হবে না।

অনিল। তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েচো, মাধুরী! এতে বাস্তবিক রাগও হয়।

মাধুরী। আপনি এ বিপদে রক্ষা করুন। আপনি আমাদেব ভরসা।

অনিল। মাধুরী, সত্যই আমি স্বার্থপর। কিন্তু না, আর নয়,—একটা দুরাকাজ্ঞার বশবর্তী হয়ে সত্যই অপবাহ করেছি।

মাধুরী। অপরাধ! আপনি?

অনিল। হাঁ। তোমার জগৎ পাত্র-অন্যেণে আমার ক্রটি...

মাধুরী। অনিলবাবু (লজ্জানতমুরী)

অনিল। মাধুরী...

স্নেহ। মালতী ডাকচে। (প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী, আমি কিছুতে আমার মনকে বোঝাতে পারিনি। নিজের মনের সঙ্গে বিস্তর তর্ক করেছি, যুদ্ধ করেছি, তবু...

মাধুরী। (লজ্জিতভাবে) আমি যদি এতই আপনার ভার হয়ে থাকি...

অনিল। না, আজ থেকে তোমার সঙ্গে বড় একটা সাক্ষাৎ করবো না। পাত্র-অন্যেণে প্রাণপণ চেষ্টা করবো। না হলে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার কাছে কি জবাব দেবো?

মাধুরী। (নতজাহ্ন) আপনার পায়ে পড়ি...

অনিল। এ কি মাধুরী! ওঠো...ছি!

মাধুরী। আপনাকে না দেখতে পেলে আমি থাকতে পারবো না। (দ্রুত প্রস্থান)

অনিল। মাধুরী তাহলে আমায় ভালোবাসে! মাধুরী যদি আমার স্ত্রী হয়! তা কি হবে?

স্নেহর পুনঃপ্রবেশ

স্নেহ। অনিলবাবু, দ্বিদি কে বিয়ে করতে আপনার কোন আপত্তি আছে?

অনিল। আপত্তি! ও রক্তের যে অধিকারী হবে, স্নেহ, সে ভাগ্যবান! মাধুরী কি...

স্নেহ। দ্বিদি আপনাকে ভালোবাসে। আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি।

মাধুরীর পুনঃপ্রবেশ

মাধুরী। একটা কথা শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলুম। যতীশ বাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতে পাবে না?

অনিল। আমারও সেই কথা মনে হচ্ছিল।

মাধুরী। একবাব সন্ধান নিয়ে দেখলে হয় না?

অনিল। আমিও তাই ভাবছিলুম। যতীশকে তুমি চিনতে পারলে না, মাধুরী? মহেশ সেন উকিল ছিলেন—তার ছেলে। তোমার বাবার সঙ্গে মহেশবাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

মাধুরী। মহেশবাবুর ছেলে! চোখে চশমা আছে বলে বুঝতে পারিনি। ছেলেবেলা ঠন্ডের বাড়ী বাবার সঙ্গে কতবার গেছি। উনি খুব টেনিস খেলতেন। তোর মনে পড়ে না স্নেহ? সেই যে গ্রামবাজাবে প্রকাণ্ড গেট-ওলা বাড়ী—টুকতেই টেনিস কোর্ট; তার পাশে জালের বেড়ার মধ্যে হরিণ ছাড়া থাকতো।

স্নেহ। কে জানে? আমি আসছি। (প্রস্থান)

মাধুরী। প্রকাশ বাবুর সঙ্গে স্নেহর বিয়ে হতেই পারে না।

অনিল। আমারও সেই মত।

মাধুরী। তা হলে দলিলটার সম্বন্ধে পরামর্শ?

অনিল। শীঘ্রই স্থির করে ফেলছি।...মাধুরী...

মাধুরী। কি বলচেন?

অনিল। তা হলে মনে আমি নিতান্তই দুরাশা পোষণ করি নি? (চিন্তা দ্বিগুণ) বলো...

মাধুরী। (লজ্জানতভাবে কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া)

প্রস্থান করিল)

অনিল। ধন্য আমাব জীবন!

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রঙ্গপট

গীত

পুরুষ। এই আমরা—এই আমরা—

হঁত—আছি বলে তাই তোমরা আছো,

না হলে কোথায় থাকতে!

নারী। ওগো, আমরা—এই আমরা  
 বেধে ঢেকে সব চালাই,—তাই!  
 নয় 'ত্রাতি ত্রাতি' ডাকতে।  
 পুরুষ। আমরা পুরুষ কাছাকাছি—খাঁটি,  
 বোদ্ধগার করি অর্থ!

নারী। খাইয়ে সাজিয়ে আপিসে পাঠাই,  
 নয়, সবই ততো ব্যর্থ!  
 নটায় ভাতটি ধবে না দিলে সে  
 ঢাকবি কি কবে রাখতে?

পুরুষ। পথে ঘাটে তোফা বেড়িয়ে বেড়াই—  
 জানিনে ভয়—সে কি!

নারী। গোরা জুসু যদি দেখা দেয় পথে—  
 ওরে বাবা—চি চি চি!  
 পেগের বড়াই,—মোরা আছি, তাই।

নারী। না হলে কি দিয়ে ঢাকতে!  
 পুরুষ। মোরা বক্তৃতা করি, দেশে দেশে ফিরি—  
 চড়ি যে মোটর গাড়ী!

নারী। এত বড় দাঁড়। বলো নাকো আর,  
 ভয়ে ছিঁড়ে যাবে নাড়ী।  
 বচনে ভরা ও মুখগুলি। নয়, কত কালি-গুলি মাথতে!  
 (ভায়রা যে নাই—ওগো, কত কালি-গুলি মাথতে!)

পুরুষ। আমরা যোগাই অন্ন-বস্ত্র—  
 তাই তো বাঁচিয়া আছো।  
 নারী। সাধে কি যোগাও? মারণ-অস্ত্র—  
 ছাড়ি যদি—কিসে বাঁচো?

এই পায়ের গোলাম হয়ে আছো, বঁধু,  
 এই প্রাণগুলি রাখতে।

## তৃতীয় দৃশ্য

মাধুরীর বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। এর জন্তু আবার আইন আদালত! উকিল  
 মোক্তার ডাক! এই প্রকাশবাবুটাকে দেখলে আমারও  
 কেমন গা জ্বালা কবে! বাবা, ছোটদিদিমণির ধলি  
 সহি। তবু ও কোথাকার কে? সোয়ামী হলে  
 হতে পারে। আরে, সে তো দেশের লোক, মরুৎগে,  
 এই স্বজাতির মধ্যে সকলেই সোয়ামী হলে হতে  
 পারে। তবেই আর কি—এই দেশের লোকের  
 দাপট সয়ে থাকি! ইং, বাবু যেন পুলিশের দায়োগে।  
 জানলার ধাবে যেয়ো না, তো যাবো না—ভালো  
 কাপড়-জামা পথো না, তো পথ না! ছোব লাখ

না! হতুম আমি—এ বোঁচা নাকে ঝামা ঘসে দিতুম।  
 দলিলের টাট্টু হয়েছেন! ওং, টাট্টু হয়ে আর কিছু  
 হোক না হোক, চাট ছোড়াটুকু খুব চলেছে।  
 (প্রস্থান)

যতীশ ও নীলমণির প্রবেশ

নীলমণি। হেই বাড়ী তো দাদাবাবু? আর বুঝতে  
 হবেক লা, আমি অ ঠিক ধরেছি। তা আমি ঘটক  
 স্যাছে একবার ঘটকালী করছি, ছাখে লিয়ে।

যতীশ। আমি অনিলের ওখানে যাচ্ছি। তুই এখানে  
 থাকিস্—যদি অনিলবাবু এখানে আসে তো অপেক্ষা  
 করতে বলিস্—আমি আসছি। (স্বগত) স্নেহ—  
 an angel!

(প্রস্থান)

নীলমণি। তাং, এ ঘটকালী যদি লা পারি তো আমার  
 লামই লীলমণি লয়। (দার-সম্মুখে বসিল) এই  
 যে কে এ্যাট্টা আসে লা?

মালতীর প্রবেশ

মালতী। (স্বগত) মিসেসটা দরজার সামনে এসে বসলো,  
 কে ও? প্রকাশ বাবু শেষে চব পাঠালো না কি?  
 (প্রকাশে) কে গা তুমি?

নীলমণি। (এক-মুখ হাসিয়া) মুই লীলমণি।

মালতী। লীলমণি, তা এখানে কেন?

নীলমণি। এ্যাট্টা কাজে—মুই বস্ত্রে আছি। তুমি  
 বসবে তো বস না, ছোটো-এ্যাট্টা মলের কথা কই!

মালতী। আ মবু, মিলে, মনের কথা কইবার আর লোক  
 পাইনি। না? তোর সঙ্গে কইতে যাবো কেন?

নীলমণি। ক্যাগ, দব কি? তুমি কে?

মালতী। আমি যেই হই না কেন, তোর কি বে মিলে?

নীলমণি। আতা, রাগ কর কেল, ভাই?

মালতী। ইস, বস ধবে না যে!

নীলমণি। তা বসিকতা মুই এ্যাট্টু-আধটু জ্বালি। সাত  
 বছর মুই রসগল্লার দকানে কাম করেছি কি লা!  
 তা তমার লাম কি?

মালতী। আমার লাম যাই হোক না কেন—তুই কে  
 আগে বল, না হলে বুঝি! (ইঙ্গিতে ঝাঁটা  
 বুঝাইল)

নীলমণি। অ বাবা! মর লাম লীলমণি। দাদাবাবুর  
 খালসামা আমি—

মালতী। আর মবু, তোর দাদাবাবু কে?

নীলমণি। মর দাদাবাবু হেইগে মহেশবাবুর পুত্ৰ—  
 যতীশবাবু বেলাত থেকে বেলেন্তারা হয়ে এ্যাসেছে।

মালতী। বেলেন্তারা?

নীলমণি। হাঁ, বেগেন্তারা। সে তমার গে উকিল মস্তারের উপর।

মালতী। ও হো হো—বুঝেছি, যতীশবাবু! দিদিমণি য়ার কথা বলছিলেন। তা এখানে কি চাই?

নীলমণি। দাদাবাবু ত বিষয়া করতে চায় না। হেত ম্যায়ে, তেত ম্যায়ে—স্যা ত ম্যায়ে লহ, যেন এ্যাট্টা-এ্যাট্টা গলাপফুল! কত সাধাসাধি, পেড়াপেড়ি। মা-ঠাকরুণ এত কাদে কাটে, তবু লা! তা দাদাবাবু বললে, জ্ঞানবাবুর ছোট ম্যায়েটিকে দ্যাখে ভারী পছন্দ হইছে, তাকে বিষয়া করবে। তাই মরে বলে গেল, তুই বস্, যদি অনিলবাবু আসে, বলিস, মুই আসছি। তাই মুই বস্তে আছি! শুনলে তো ভাই?

মালতী। ও। ( অকল হইতে একটি পাণ লইয়া খাইল ও দোক্তা মুখে দিল )

নীলমণি। আমায় এ্যাট্টা পাণ দাও লা।

মালতী। মিলে ভারী ওস্তাদ, দেখছি। গায়ে পড়ে ভাব করে।

নীলমণি। তমার গড়ে পড়ি, এ্যাট্টা পাণ দাও লা—দহাই তমার! ( অকল ধবিল )

মালতী। ছাড়্! ভালো গেলো। এই নে! ( একটি পাণ দিল )

নীলমণি। ( পাণ মুখে দিয়া ) এ্যাট্টু দস্তা, ভাই!

মালতী। আবার দক্ষিণে চাই। ( দোক্তা প্রদান )

নীলমণি। ( দোক্তা মুখে দিয়া ) তুমি বড় ভাল, ভাই। তা তোমার লামটি?

মালতী। ( স্বগতঃ ) বেশ হয়েছে। যা চাই, তাই সামনে! এ লোকটাকে হাত করে যতীশ বাবুকে দেখতে হবে! কাজ ভারী সোজা হয়ে গেল! আর বুঝবোই বা কি! নিজের যখন নিজের বিয়ের ঘটকালী লাগিয়ে দিয়েছে, তখন বোঝাবুঝির আর আছে কি! বেশ হয়েছে, দিদিমণি চায় ছোট নিদিমণির সঙ্গে যাতে যতীশ বাবুর বিয়ে হয়। আমি দিদিমণিকে বলবো, এ ঘটকালী আমি কববো, আমার এক ছড়া সোনার হার চাই!

নীলমণি। ই্যা গা, লামটি বললে লা?

মালতী। আমার নাম মালতী।

নীলমণি। মলাতী! বেশ লামটি! কি বললে?

মলাতী, মলাতী! তা মলাতী—

মালতী। তা, কি?

নীলমণি। তমার কে আছে?

মালতী। তা বেশ! আমার সোয়ামী আছে!

নীলমণি। এঁয়া, সয়ামী আছে?

মালতী। হ্যাঁ, তাব আবার ভারী রাগী মেজাজ।

কারো সঙ্গে, এই কোন পুরুষমানুষের সঙ্গে, আমায়

কথা কইতে দেখলে শুধু যে আমার মাথা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেবে, তা নয়, সে পুরুষমানুষের শুদ্ধ দফা রফা করে দেবে।

নীলমণি। অ বাবা—কথায় থাকে সে?

মালতী। কথায় আবার থাকবে। আমায় ছেড়ে আর কোথাও সে থাকতে পারে না, কাজেই এখানে থাকে।

নীলমণি। অ বাবা।

মালতী। না হলে সত্যি বলতে কি, তুমি মানুষটি বেশ! খাসা যত্ন-আত্তি জানো, আমার ভারী মনের মত!

গীত

ওগো, মনের মানুষ, পুরুষ-রতন!

তুমি আমার নীলমণিটি,—যাহু বাচাধন!

নীলমণি। হাহাতা-হ-হ-হ-হিহিহি,

দফা যে হল রফা, বল তুমি কি।

মালতী। বলবো কি আব? প্রাণ-মন দিয়ে ফেলেছি—ও আমার লীলমণিটি, লীলমণিটি,

ঢ্যাঁড়স-বদন!

নীলমণি। মুই লীলমণি—মুই লীলমণি।

মালতী। তা হেথা কেন? যাও গয়লা-বাড়ী, ফেলো কাঁড়, পাবে ননী।

নীলমণি। তুমি রাধা,—অগো, তুমি রাধা—

মালতী। লাঠি হাতে আছে পথে, আয়ান ঘোষ দাধা।

নীলমণি। ইস্ ঐ ত ভারী রাধা!

মালতী। তাই বলি হাদা, মানে-মানে পথ ছাখো এখন! ( মালতীর প্রস্থান )

নীলমণি। লাঃ, এ এ্যাক্কেবারে ম্যারে রেখে গ্যালো! এ্যাব সঙ্গে যদি মোব বিষয়া হত! অর সয়ামীটা যদি মরে ত ব্যাশ হয়। অ বিধবা হলি ত্যাখন মুই ওকে বিষয়া কবি!

( দীর্ঘনিশ্বাসান্তে প্রস্থান )

অনিল ও যতীশের প্রবেশ

যতীশ। প্রকাশবাবুর attitude যে একম শুনিচি, তাতে আইন-কানুন করতে গেলে একটা কেলেকারী রাষ্ট্র করা হবে, আর আমাদের লক্ষ্মীছাড়া বাঙলা খপরের কাগজগুলো অমনি শেয়ালের মত হুঁকা-হুঁকা করে উঠবে, নাহলে কোটে দরখাস্ত দিয়ে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ-বাবুকে ট্রাষ্ট থেকে remove করানো যায়।

অনিল। সেই জগ্গেই আমি আর হাইকোর্টের ধারে যাইনি মোটে। আমার এক এটর্নি বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম। সে যা এক মতলব দিয়েছে—

আঃ, simply funny!

যতীশ। কি মতলব ?

অনিল। পথে-ঘাটে সে কথা বলবে না—তবে জানতে পারবে তুমি। তাতে তোমারও সাহায্য দরকার আছে।

যতীশ। তা হলে তোমার বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

অনিল। ২০শে শ্রাবণ। জাখো, মতলব যা বার করা গেছে, যদি ভেসে না যায়—তা হলে রীতিমত একটা নভেলের মত কাণ্ড দাঁড়াবে! ঐ দিনে প্রকাশ জানবে শুধু আমার বিয়ে, কিন্তু আসলে হুজনেই সেদিন ব্যাটিলব নাম ঘুচিয়ে ফেলবো। বুঝলে ?

যতীশ। তাহলে ঐ মত নিয়ে পাত্র ঠিক করা ! তার কি হবে ?

অনিল। ওহে, আইন বাঁচিয়ে, মাথা বাঁচিয়ে, দলিল বাঁচিয়ে, বিষয় বাঁচিয়ে কাম ফতে করবো !

যতীশ। সব শোনবার জগে ভারী অস্থির হয়ে উঠছি যে !

অনিল। এগো ভিতরে, সব বলছি।

[ উভয়ের প্রস্থান ]

## চতুর্থ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ

স্নেহ ও মালতী

মালতী। দিদিমণি যা ফন্দি খাটিয়েছে, সে বেশ হয়েছে। তাতে কিছু দোষ হবে না, ছোটদিদিমণি। জাখো দিকিন, যেমন কুতুর, তেমন মুণ্ডবের ব্যবস্থা হয় কি না !

স্নেহ। তিনি যদি কিছু মনে করেন ?

মালতী। কিছু মনে করবার অবসর তাঁর কি আছে ? ছোট দিদিমণি ! যাকে ভুলে পাশ, সেও দু দণ্ড ভালো থাকতে পারে, কিন্তু এই ভালোবাসার নেশা ঘাড়ে চাপলে একদণ্ড আর সোয়াস্তি থাকে না। কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না !

স্নেহ। তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেচিস মালতী ?

মালতী। সে সব কথা আর কেন ? ছোট দিদিমণি !

স্নেহ। না মালতী, লক্ষ্মাট, বলা...ও কি ষাড় নৌচ করলি যে !

মালতী। আমরা গরিব ছোটনোকের মেয়ে ছোট-দিদিমণি—নেখাপড়া জানি না, মনের উপর কখনও জোর করতে শিখিনি। যে দিকে মন ছোট, সেই দিকেই দিক-বিদিকের জ্ঞান হারিয়ে ছুটেছি। তার পর তোমাদের এখানে অকূলে কূল মিলেছে,

আপনার জন পেয়েছি। আমার কোথাও কেউ নেই দিদিমণি—আমাকে যেন তাড়িয়ে দিয়ে না !

স্নেহ। কাঁদিসনে মালতী। তোর যদি কষ্ট হয় থাক বলতে হবে না !

মালতী। না ছোট দিদিমণি, আমি বলছি। আমার বখন বয়স চার বছর, তখন বসন্ত হয়ে বাপ-মা দুই মারা গেল। গাঁয়ের ভূমিদারের বাড়ী ঠাঁই পেলাম। তাদের ছেলে-মেয়ে নিতুম। তারা দুটি খেতে দিত। তারপর আরো আট-বছর কাটলো—জমিদার-বাড়ীতে সুখেই ছিলাম। বোয়েরা বড় ভালোবাসতো, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দিদি বলে ডাকতো, আফ্রাদে আমার বুক ভরে উঠতো। তারপর এক নতুন নায়েব এলো, তার বয়স কম। ছেলেদের নিয়ে সকালে বিকেলে আমি বসে থাকতুম, সে এসে পাশে বসে বাপের কথা মার কথা জিজ্ঞাসা করতো ; এ কথা সে কথা কয়ে কত আশ্তি জানাতো। আমার কেমন তার কথা শুনতেও ভালো লাগতো। শেষে একদিন সে বললে,—তার মাথায় বাজ পড়লো না—সহায়হীন গরিব-দুঃখীর মেয়ে পেয়ে ভদ্রর নোক হয়ে এ পাপ কথা বলতে তার জিভ খশে গেল না ? আমি কিছু না বলে উঠে গেলুম।

স্নেহ। আর থাক্ মালতী...

মালতী। না ছোট দিদিমণি, শোনো। এমন কিছুদিন যায়—আমি দেখি, সে শুকনো মুখে বেড়ায়, আমার কাছে আসতে তার সাহস হয় না। আমার প্রাণটা অস্থির হলো। শেষে একদিন নির্জনে পেয়ে সে আমার পায়ে ধরলে, বললে, আমার বিয়ে করবে ; অশ্রুভাবে পেতে চায় না। যদি আমি রাজী না হই, তা হলে সে বিষ খাবে। শুনে আমার প্রাণটা শিউরে উঠলো ! সোয়ামী-স্ত্রী কত সুখে ঘর করে,—রাহুদিদির বিয়ে হয়েছিল—আমার কাছে তার বরের কত কথা বলতো ! শুনে সোয়ামী কেমন, জানবার জগ আমার প্রাণটা অস্থির হয়ে উঠতো। কখনো জানিনি, সোয়ামী কি ! আমি রাজী হলুম। সে বললে, সেখানে বিয়ে হতে পারে না—অশ্রু জায়গায় সে চাকরি নেবে, বিয়ে করবে, কিন্তু তাহলে লুকিয়ে তার সঙ্গে চলে যেতে হবে !

স্নেহ। ও-সব কথা আর কেন, মালতী ? থাক !—

মালতী। একদিন শেষ-রাত্রে মনিব-বাড়ী থেকে চোরের মত আমি পালালুম, বুক কেঁপে উঠলো ! করচি কি ! রেল চড়ে পরদিন ভোরে পশ্চিমের এক দেশে এলুম। সে বললে, এখানে তার চাকরি মিলবে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আমি বললুম, বিয়ে হবে কবে ? সে হেসে উঠলো—বললে, বিয়ে !

কীকে বিয়ে! আশ্পর্দা কম নয়! আমি কৈদে ফেললুম, বললুম,—তবে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? সে বললে,—উঃ, তাব ভিড খসে গেল না, পুড়ে গেল না? সে বললে, আমার উপর তার নজর পড়েছিল, তাই! দুদিন আমার নিয়ে খেলা করে ফেলে চলে যাবে! আমি কিছু বললুম না—ভয়ে চূপ কবে রইলুম। শেষে পেয়ে যখন সে একটু অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আমি ছুটে সে বাড়ী ছেড়ে পালালুম। খানিকটা এসেচি—হঠাৎ কে ধরে ফেললে...সেটা পুকুর-ধাব। দেখি, সে—জ্ঞানতে পেরে পেছু নিয়েছে। আমি হাত ভিনিয়ে নিলুম—কোথা থেকে দেখে হাতীর বল এলো। সে পড়ে গেল। গায়ে বত জোব ছিল, তত জোরে তখন তার মুখে নাথি মেরে আবার আমি ছুটলুম! সে কি ছুট। ছুটেতে ছুটেতে একটা বাড়ীর ধারে এসে পড়লুম—চাঁদের আলোয় সাদা বাড়ী ধব্ধব্ করচে। আমি কৈদে এসে বাবুর পায়ে পড়লুম। মা-ঠাকরুণ ছুটে এলেন—আমাব জ্ঞান ছিল না—

স্নেহ। আমাদের বাড়ী, না?

মালতী। হাঁ, বাবু তখন সেখানকার তাকিম। সেট অবধি তোমাদের আশ্রয়ে আছি! তোমার তখন খুব ব্যানো...

স্নেহ। মনে পড়েচে। দিদি এসব জানে?

মালতী। হ্যাঁ।

স্নেহ। মালতী, আজ থেকে আমি তোকে আরো ভালোবাসবো। এমন তুই! এত দুঃখে এত বিপদেও ধর্ম ভুলসনে!

মালতী। হিঁদুর মেয়ে আমি, ছোট দিদিমণি। হই না গবিব: হিঁদুর মেয়ে কি ধর্ম ছাড়তে পারে?

স্নেহ। অথচ এই হিঁদুর মেয়েকে মাহুয় কুলুপ এঁটে রাখতে চায়!

মালতী। ঐ প্রকাশবাবু আসচেন। মনে আছে সব? লজ্জা করো না। আগে আপনাকে বাঁচাও—তাতে যদি একটু চাতুরী করতে হয় তো—কোন দোষ নেই, ছোট দিদিমণি। আমি সরে যাই।

[প্রস্থান]

স্নেহ জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল;

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? রাস্তা থেকে দেখা যায়।

স্নেহ। (সরিয় আসিল) তাতে ক্ষতি কি?

প্রকাশ। ক্ষতি! ভুল্লোকের মেয়ে পথের ধারে জানা-  
লার সামনে দাঁড়াতে আছে। লোকে ভাববে কি!

একজন ভূত্যের প্রবেশ

প্রকাশ। এই বেটা, একেবাবে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলি যে?

ভূতা। (সভয়ে) আজ্ঞে, কাঁট দেবো।

প্রকাশ। ঘর কাঁট দিবি তো বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে আসতে পারিস না? এখানে মেয়েরা বয়েছে। ইয়ার্কি পেয়েচিস? বটে! বেরো, বেরো, বলচি—তোকে কাঁট দিতে হবে না। (ভূতা অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল) স্নেহ, মুখে ঢাকা দাও,—এই চাকর বেটা তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছে!

স্নেহ। (দৃপ্তভাবে) প্রকাশবাবু, এরকম ভাবে আপনি আমার অপমান করবেন না। একটা চাকরের সামনে...

প্রকাশ। হোক চাকর!...পুরুষ মাহুয়। এক বেটা ছোঁড়া চাকর—এ সব কি রকম বন্দোবস্ত! বেটা হনহন করে ঘরে এসে ঢোকে!

স্নেহ। আপনি একি বজ্জেন?

প্রকাশ। বলচি, এ সব আচরণগুলো ভালো নয়। (ভূত্যের প্রতি) আবার বেটা দাঁড়িয়ে রৈলি! বেরো (ভূতা গমনোচ্ছত)—আর ছাখু, শোন, অন্দর-মহলে খপর না দিয়ে খবরদার ঘরে ঢুকবি না। যা, এখন। মেয়েদের সামনে এ-ভাবে আর কখনও যেন আসতে না দেখি,—এলে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেবো।

ভূত্যের প্রস্থান

স্নেহ। দেখুন, প্রকাশবাবু, আপনি যা করেন, তাতে কখনো আমি কিছু বলি নি। কিন্তু এ-সব উৎপীড়ন আমার সহ্য হয় না। আপনি ভাবেন কি? একটু হাওয়াতেও আমাদের অধিকার নেই?

প্রকাশ। লোকে নিশ্চয় কবতে পারে। আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কেউ যদি কোন নিশ্চয় করে, বেহায়া বলে, তা হলে সেটা সহ্য করতে বলা?

স্নেহ। আমি তো আপনার স্ত্রী নই!

প্রকাশ। আজ নও, দু'দিন বাদে তো হবে।

স্নেহ। ওঃ!

পত্র-হস্তে মালতীর প্রবেশ

মালতী। একবার আশ্পর্দা দেখেচো, ছোট দিদিমণি! তোমার নামে খামে চিঠি পাঠায়—বলে, খুব গোপনে দিয়ে।

স্নেহ। কে?

মালতী। কে আবার! ঐ যতীশবাবু! বিলুত ঘুরে এসেছে কি না, সব খিষ্টানী ধরণ! এই যে প্রকাশবাবু—বলো তো বাবু...

প্রকাশ। দেখি। এ সে আবার রঙ-চঙে থাম। আবার ( ঘাণাত্ত ) উঃ, গন্ধ মাখানো—এ তো ভালো নয় ! মালতী। বৃকেব পাটা জাখো একবার। ( স্নেহের সহিত চোখেব সঙ্কেতাভিনয় )

স্নেহ। তুই নিলি কেন ?

মালতী। ওগো, আমি কি সাধে নিয়েছি। যদি কোন চাকর-বাকবের হাতে দিয়ে যায় না নিলে—তারা কি ভাববে। দই হজ্জো নিয়েছি। একবার সাহসখানা জাখো, প্রকাশবাবু।

প্রকাশ। চিঠি পড়ে দেখতে হচ্ছে। ( উন্মোচনে উত্তত )

স্নেহ। না, না, ও খুলে কাজ নেই। তা হলে ভাববে, আমি বুঝি পড়েছিলুম—ও অমনি অমনি কিরিয়ে দিন, আব কখনো সাহস কববে না !

প্রকাশ। এ নিয়ে এখনই পুলিশ-কেশ করতে পারি। পুলিশ কোর্টে এক বড় উকিলের সঙ্গে আমার খুব ভাব আছে। চালাকি নয় ! কত বড় যতীশ সেন, একবার দেখে নি।

স্নেহ। না, না, তাতে কেলঙ্কারী হবে। তাব চেয়ে চিঠিখানা ফেবতই দেওয়া যাক।

প্রকাশ। ঠিক বলেচো। আমি নিজে এখনই যাচ্ছি। হু কথা শুনিয়ে দিয়ে আগতেও ছাড়বো না ! সব লেখা-পড়া শিখেচেন। মোক্কা স্নেহ, রাস্তার ধারের ঘরে তুমি আব বড় একটা থেকো না। ২৭শে শ্রাবণ অবধি কোন মতে কাটাও, তারপর আমার বাড়ী নিয়ে যাবো। বাড়ী যা কচ্ছি, ওঃ, আগাগোড়া জানালা-খড়খড়ি সব লোহার জালে ঘিবে ফেলেছি।

[ প্রস্থান ]

মালতী। তোমাব জেলখানা তৈরী হচ্ছে—উনলে ?

স্নেহ। আচ্ছা, এরা ভাবে কি ?

মালতী। ভাববে আর কি। নিজেদের মত সকলকে ভাবে। নিজেরা যেমন হাঁ করে পথ চলে, পথের দুধারে জানালা-খড়খড়িব দিকে চেয়ে,—তেমনি ভাবে, মেয়েরাও অমনি পর-পুরুষের গুঁপো মুখ দেখবার জগেবুক ফেটে মবে যাচ্ছে। ঐ তো মুখের ছিঁরি—ওতে আবার সিঁথে বাগিয়ে বাহার করা হয়। ভাবে, মেয়েরা দেখলে ভাবে ভোর হুধে মুছো যাবে ! মরণ আব কি !

স্নেহ। তুই যেন কি !

মালতী। কি আবার—আমি তোমায় চাক্ষুষ দেখাতে পারি ! এই জানলার ধারে একটু দাঁড়াই দিকি,—পকাশ জন হতভাগা অমনি হাঁ করে উপর-বাগে চাইতে চাইতে যাবে ! যেন সাত-জন্মে কখনও মেয়ে-মামুষের মুখ দেখেনি ! মরণ হয় না হতছাড়াইদের !

স্নেহ। থাক, আমি চাক্ষুষ দেখতে চাই না, মালতী ! ও চিঠিখানা কি রে ?

মালতী। ও সেই যে বলছিলুম। দিদিমণি যতীশ বাবুকে একটা চিঠি লিখেছেন। লিখেচেন, তোমাকে বিষে কবতে তাঁব যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে শীঘ্র যেন দেখা কবে তা জানান ! তাঁর মাকে তাহলে এ বিষয়ে বলে ঠিক-ঠাক করে ফেলতে হবে ! আর ঠিকঠাক করতে গেলে একটু চালাকির দরকার—সে বিষয়ে অনিল বাবুব সঙ্গে পরামর্শ চাই।

স্নেহ। খামখানার উপরে কারো নাম নেই যে ?

মালতী। প্রকাশবাবুকে ক্ষাপাবার জগে। দ্যাখো না, প্রকাশ বাবুই এ বিয়ের ঘটকালী করবে'খন—তা না হলে আব মজা কি !

স্নেহ। কি জানি, আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

মালতী। দিদিমণিব কাছে যাও—জানতে পাববে। তোমাকেও কিছু কবতে হবে কিন্তু—সেটুকু যেন কাঁচিরে ফেলো না। আমি এখন যতীশবাবুব ওখানে যাচ্ছি। তাঁর জবাব চাই তো।

[ প্রস্থান ]

স্নেহ। সেদিন তাঁকে দেখে এমন লজ্জা হলো ! বেশ মামুষ কিন্তু ! সাধাসিধে, কোনো আডম্বর নেই ! যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি মিষ্টি স্বভাব !

[ প্রস্থান ]

## পঞ্চম দৃশ্য

যতীশের বাড়ীর বারান্দা।

নীলমণি আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল ;

যতীশের প্রবেশ

যতীশ। ওরে নীলে, তোব হলো কি ? এমনভাবে বসে আছিস যে ! কোনো অসুখ-বিসুখ হল না ত ?

নীলমণি। লাঃ—অসুখ নয় !

যতীশ। তবে ?

নীলমণি। কিছু কাজ নেই, তাই বসে আছি।

যতীশ। একবার জ্ঞান বাবুর বাড়ী যা দিখিন্ তবে...

নীলমণি। গ্যানবাবুর বাড়ী। সেই হুথাকে ?

যতীশ। সেদিন যেখানে গেছলি—

নীলমণি। সেই মলাতীদের বাড়ী তো ? ( উত্থান ) তা বাই।

যতীশ। মলাতী আবার কে রে ?

নীলমণি। হা-হা সে মলাতী ! মলাতী ! আছে !

খাশা লোক, দালাবাবু, এই মলাতী।

যতীশ। আরে মবু—আবাব মলাতী নিয়ে মবেছিস্ !



নীলমণি। আর সে সব লয়, দাদাবাবু—মলাতীর একটা  
সমামী আছে—সেটা মলে মুই তাকে হাল আইনে  
বিধবা বিয়া করব। হয় লা দাদাবাবু?

যতীশ। আরে, তাব স্বামী আছে, বলচিস, তবে সে  
বিধবা হলো কি কবে।

নীলমণি। লা, বিধবা হয়লি এখনও। সমামী মলে হবে  
ত! তখন তাকে বিয়া করব। মনটা বড় খারাপ  
হয়েছে তার লেগে।

যতীশ। বিধবা হলে বিয়ে করবি! আব তার স্বামী  
মরবাব আগে তুই যদি মরে যাস্?

নীলমণি। লা দাদাবাবু, গড় করি, হমন কথা বলুনি!  
তাকে বিয়া লা করে মুই মরতে পারবুলি।

যতীশ। তা তার স্বামী যদি না মরে?

নীলমণি। তাই ভাবছি বশু, দাদাবাবু, তার  
সমামীটে যদি ভালমাসী কবে লা মবে!

যতীশ। ভালো পাগল বটে! বসে বসে একটা লোকের  
মৃত্যু-কামনা কচ্ছিস।

নীলমণি। লাহলে আমি বাঁচবো লা! বিধবা বিয়া  
হয় লা, দাদাবাবু, হাল আইনে?

যতীশ। বিধবা বিয়ে হবে না, কেন? কিন্তু তুই যে  
সধবা নিয়ে কবতে চাস্—তা কি হয় বাদর?

(নীলমণি আবার বসিল)

প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। আপনাবই নাম, যতীশ বাবু?

যতীশ। হাঁ, আপনাব প্রয়োজন?

প্রকাশ। আপনি না ভদ্রলোক? আপনি না শিক্ষিত?

যতীশ। আপনি যে আরও ভদ্রলোক দেখছি, বাড়ী বয়ে  
গাল নিতে এসেছেন!

প্রকাশ। এই দেখুন, তবে চিঠি। (পত্র বাহির করিল)  
এ চিঠি আপনি জানাবাবুর ছোট মেয়ে স্নেহলতাকে  
লিখেছেন?

যতীশ। (সবিস্ময়ে) চিঠি লিখেচি?

প্রকাশ। হাঁ, এই সে চিঠি। এ চিঠি সে ঘুগার সঙ্গে ফেরত  
দিয়েচে—খোলে নি। এই নিন চিঠি। (সজোরে  
যতীশের মুখে উপর পত্র-নিষ্ক্ষেপ) জানেন, তার  
সঙ্গে আমার বিবাহ হবে? সে আমার বাকদস্তা  
স্ত্রী? তাকে চিঠি লিখে আপনি গর্হিত কাজ  
কবেচেন। আপনি তাকে ভালোবাসেন?

যতীশ। (পত্র-হস্তে বিস্ময়-স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া  
রহিল)

প্রকাশ। বলুন, গোপন করবার কোন প্রয়োজন নেই।

যতীশ। তা...তা...

প্রকাশ। বলুন, ভালোবাসেন কি না?

যতীশ। বাসি। মিথ্যা বলবো না।

প্রকাশ। ওঃ! সত্যবাদী যুধিষ্ঠির! ভালোবাসেন। বড়  
ভালো কাজ কবেন। অপবের স্ত্রীকে ভালোবাসা খুব  
ভদ্রতা! না?

যতীশ। কিন্তু তাঁর তো বিবাহ হয় নি।

প্রকাশ। হয়নি, তাতে কি এসে গেছে? তবে তো।  
আর সে বিবাহ আমার সঙ্গে। আমি সব জানি।

তাব সঙ্গে সেদিন আলাপ হয়েছিল, তাবপর দু-তিন  
দিন আমি আপনাকে সেখানে ঘুরতে দেখেছি।

উপবেব জানলার দিকেও মাঝে মাঝে চেয়ে থাকেন  
...আর স্নেহও কখনো কখনো জানালার ধারে এসে  
দাঁড়ায়। থাক্, কিছু বলতে হবে না। তবে আমার

এই কথা শুনে রাখুন, আর কখনো যেন এমন না  
দেখি! স্নেহ আমার স্ত্রী হবে—আপনি ভদ্রলোক,  
ভদ্রতা লঙ্ঘন করবেন না। [প্রস্থান

যতীশ। আশ্চর্য্য লোক। অদ্ভুত ভদ্রতা! কিন্তু এ  
চিঠিই মানে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না তো! দেখি পড়ে।

(পত্র খুলিয়া পাঠ)

নীলমণি। (সহসা লাফাইয়া উঠিয়া) এই যে মলাতী!  
মলাতী এস, এস।

মালতীর প্রবেশ

দাদাবাবু, এই মলাতী।

যতীশ। তুমি কে?

মালতী। আমি জানাবাবুর বাড়ী থেকে আসছি। প্রকাশ  
বাবু আপনাকে একখানা চিঠি দিয়ে গেছেন?

যতীশ। হাঁ, এই সে চিঠি। প্রথমটা আমি ভাবী  
অবাক হয়ে পড়েছিলুম, ব্যাপার কি? তাব পর চিঠি  
পড়ে সব বুঝলুম। তা প্রকাশবাবু তো ভাবী চোরাড়ে

লোক দেখলুম!

নীলমণি। (গোপনে মালতীকে নিকটে আসিতে  
সঙ্কেত)

মালতী। হ্যাঁ। ছোট দিদিমণি যদি ঠর হাতে পড়েন,  
তাহলে একদিন বাঁচবেন না! তা আপনি যদি...

যতীশ। আমি যদি কি মালতী?

মালতী। আপনিই তাঁকে বক্ষে করতে পারেন।

যতীশ। স্নেহ সে কথা তোমায় কিছু বলেছে?

মালতী। পষ্ট কিছু না বললেও তাঁর ইচ্ছে, আপনার  
সঙ্গে বিয়ে হয়।

যতীশ। আমার কি সে দোভাগ্য হবে?

মালতী। সে আপনার ইচ্ছে!

যতীশ। স্নেহ আমায় ভালোবাসে তা হলে? বেশ,  
আমি এখনই যাচ্ছি, অনিলের সঙ্গে দেখা কচ্ছি।

[প্রস্থান

মালতী গমনোদ্ধত ; নীলমণি পা টিপিয়া  
আসিয়া তাহার অঙ্কল ধরিল

মালতী। কে রে ?

নীলমণি। মুঠ লীলমণি।

মালতী। লীলমণি, তা আঁচল ধরিস্ কেন ?

নীলমণি। এ্যাটু বস্ না, মলাতী।

মালতী। আমার এখন বসবার সময় নেই। ছাড়।

নীলমণি। ভূটো পাণ খেয়ে ব্যাও।

মালতী। না, না আমার সময় নেই।

নীলমণি। তোমার মনে এ্যাট ছিল মালতী !

মালতী। আমার মনে কি ছিল আবার ?

নীলমণি। একেবারে ভুলে গেলি—সেদিন এ্যাট কথা  
বল্‌লি। তা তব্‌র সন্ধ্যামীর অসুখ-বিসুখ কিছু হল ?

মালতী। মব্‌, জোয়ান শরীর—অসুখ তত্‌র যাবে কেন ?

নীলমণি। তাই বলছি, তা হলে মর দশা কি হবে ?

মালতী। তোর দশা কি হবে, তা আমি কি জানি ?  
সব্‌, আমি যাষ্ট।

নীলমণি। মুঠ তোকে বড় ভালবাসি, মলাতী,—তব্‌র  
লাপেলে আমি বাঁচবো লা—সত্যি বলছি।

মালতী। অহা, ঢঙ্‌ দেখে আর বাঁচিনে। তুই মাল  
কি বাঁচলি, তাতে আমার কি বয়ে গেল ? আমায়  
সেই ধরণের নোক পেলি না কি ?

নীলমণি। ভালব, মলাতী, সে কথা লয়। সে দিকে  
লা। আমি তোকে বিয়া করব, মলাতী। তা  
তোর সন্ধ্যামী যে বেঁচে !

মালতী। ও হতভাগা, তুমি বসে বসে আমার সোয়ামীর  
মরণ কামনা কছ ! আমি বিধবা হলে আমায় বিয়ে  
করবে ? বটে !

নীলমণি। সত্যি বিয়া করব, মলাতী, সত্যি ! তোবে  
মুঠ বড় ভালবাসি।

মালতী। তা কি হয়, লীলমণি ? আমার যে সোয়ামী  
আছে, যাহ্‌।

নীলমণি। তাই তো মুই সারা হয় ভেবে।

মালতী। তা দেখে শুনে একটি বিয়ে না হয় করো না  
তুমি।

নীলমণি। লা মলাতী, তা নয়—আমি তকে বিয়া  
কবব—আর কাউকে নয়, কাউকে নয়, কাউকে  
লয়। আমি তব্‌র যে কি চোখে ছাখিছি।

মালতী। বুড়ো মিসের রকম দেখে হাসি পায়, দুঃখও  
হয়।

নীলমণি। মব্‌র বিয়া করবি লা মলাতী ?

মালতী। সধবার কি আবার বিয়ে হয়, সোনা ?

নীলমণি। সধবা নয়, সধবা নয়—বিধবা হলে।

মালতী। বিধবা হলে তখন না হয় দেখা যাবে !

নীলমণি। তুই কবে বিধবা হবি, মলাতী ? মুই সেদিন  
সত্যিয়ারালের সিল্লি দেব—আর তোকে বিয়া  
করব।

গীত

আহা, সে দিনটি আসবে কবে ?

মব্‌র স্ত্রী করতে তম্‌র সন্ধ্যামিটি

চিত্‌র রবে ?

মালতী। চোখের জল মুছে হ'তাত্‌,

দাঁড়াবো ছান্‌লা-তলাতে।

ঘাট-কামানো,—শ্রদ্ধ, সে সব

বিয়ের পর হবে !

নীলমণি। দেব বাজু-জশম, সোনার কাঁটা ফুল,

কানে তোর হলিষে দেব হল,...

মালতী। শুনে অহা প্রাণ জুড়ুলো—(পোড়া কপালে)

অত কি হবে !

নীলমণি। সন্ধ্যামীটে তব্‌র মরুক।

মালতী। হাড়টা আমার জুড়ুক !

নীলমণি। সেদিন এ পায়ের লফর পায়ে লুটবো—

মালতী। পরের কথা পবে সে সব,—আজ আসি তবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্নেহর কক্ষ

স্নেহ, মাধুরী ও মালতী

মাধুরী। কেমন, পারবি ?

স্নেহ। আজ শ্রাবণ মাসেব কঁউই হলো ?

মাধুরী। আজ ১৬ই। ২০শে আমাদের বিয়ের দিন।

মালতী। না হয় একদিন আগেই হয়ে যাবে ! তাতে  
সুবিধা ছাড়া অসুবিধে নেই।

মাধুরী। কেমন, পারবি ?

স্নেহ। আচ্ছা, দেখি।

মাধুরী। না, দেখি নয়, পাবতেই হবে। না হলে চলবে  
কেন, স্নেহ ?

স্নেহ। আচ্ছা, পারবো।

মালতী। না হলে চলবে কেন, ছোট দিদিমণি ? মেয়ে

মায়ুষের একটু ছল-চাতুরী চাই, না হলে আমাদের

আর অজ্ঞ বল্‌ কি আছে, বলো ? চাবুকও মারতে

পারবো না, বেতও গুটাতে পারবো না !

মাধুরী। মালতী মিছে বলে নি।

মালতী। নাহলে যে গোঁয়ার জাত পুরুষ—ওদের বশে  
আনা কি সহজ ?

মাধুরী। তা হলে আমি এখন চললুম। প্রকাশবাবুর আসবার সময় হয়ে এল। আর মালতী।  
মালতী। বাচ্ছি দিদিমণি, তুমি এগোও। (মাধুরীর প্রস্থান) আমার কি বলবে গা ছোট দিদিমণি ?  
স্নেহ। তুই না কি বিয়ে করবি। মালতী ?  
মালতী। ও কথা থাক্ ছোট দিদিমণি, আমার লজ্জা করে।

স্নেহ। এতে আবার লজ্জা কি, বল না আমাকে।  
মালতী। না হলে সে যে বিষ খাবে, বলেছে, ছোটদিদিমণি। একটা লোক সত্যি সত্যি মরে যাবে ?  
স্নেহ। তুই তাকে তাহলে ভালোবেসেছিস, মালতী ?  
মালতী। এঁ্যা,—তা ঠিক নয়, তবে সে বড় ভালোবাসে। সে জানে, আমার বিয়ে হয়ে গেছে—বলে, আমি বিধবা হলে আমার বিয়ে করবে।

স্নেহ। আচ্ছ, দেখ, অনিলবাবু কি বলেন !  
মালতী। বাবুর মত না হলে বিয়ে হবে না। তবে সংসার-ধর্ম করতে আমার এক-একবার সাধ হয়, ছোট দিদিমণি, রেঁধে বেড়ে স্বোয়ামীকে খাওয়াব—সে আমার যত্ন-আত্তি করবে ! আমি জীবনে একজনও আপনাব লোক কেমন, তা জানলুম না।

স্নেহ। কেন, মালতী, আমরা কি তোকে ভালো বাসি না ?  
মালতী। তা বাসো বইকি, ছোট দিদিমণি। সে কথা না মানলে অধর্ম হবে যে। তবে মাঝে মাঝে মনটা কেমন হয়ে যায়, ছোট দিদিমণি, তাই। তা বিয়ে করলে কি তোমরা আমাকে আর এমন ভালোবাসবে না ? ঘেপা করবে ? তবে থাক্, আমি বিয়ে করবো না।

স্নেহ। না, না, মালতী—তোকে ঘৃণা করবো না ! তুই যে পাণের পথে না গিয়ে বিয়ে করে একটা আশ্রয় নিচ্ছিস, তার জন্ত ঘৃণা করবো কেন তোকে ?

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। প্রকাশবাবু আসছে, স্নেহ।

স্নেহ। মালতী—তুই তবে যা।

( মালতীর প্রস্থান )

মাধুরী। ( প্রকাশবাবুকে দেখিয়া ) ওঃ আ-হা-হা !  
( কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসত্যাগ ভাবাভিনয়ান্তে চকিতে প্রস্থান )

প্রকাশের প্রবেশ

স্নেহ। দেখুন, একটা বড় বিপদ হয়েছে।

প্রকাশ। কি বিপদ স্নেহ ? ইনি এমন করে গেলেন কেন ? কোন অসুখ করেনি তো তোমার ?

স্নেহ। না, আমার কিছু হয়নি—ঐ দিদির কথাই বলতে চাই। ওর সম্বন্ধে খুব গোপনীয় কথা আছে।

প্রকাশ। গোপনীয় কথা ?

স্নেহ। হ্যাঁ ! সেই যে যতীশবাবু বলে একজন অনিলবাবুর কাছে আসতো—সেই যে, যে আমাকে চিঠি পাঠিয়েছিল, সেই যে আপনাকে দিয়ে চিঠি ফেরত দেওয়ালুম—

প্রকাশ। হাঁ, হাঁ, মনে পড়েচে।

স্নেহ। তা সেই যতীশবাবুকে দিদি ভালোবেসে ফেলেছে। তাঁর সঙ্গে যদি দিদির বিয়ে না হয়ে অনিলবাবুর সঙ্গে হয়, তাহলে দিদি বলেছে, দিদি বাঁচবে না !

প্রকাশ। এঁ্যা, বলো কি ?

স্নেহ। আর বলি কি ? দিদি নিজের মাথা নিজে খেয়ে বসেছে—সর্বনাশ কবেছে।

প্রকাশ। তাই তো ! উপায় ?

স্নেহ। উপায় বড় সুবিধের দোখ না। অনিলবাবু এ কথা শুনেল অনর্থপাত করবেন।

প্রকাশ। আহা, বেচারি অনিল !

স্নেহ। কত আশা করেছিলেন—

প্রকাশ। বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন—হাতে হাতে ফল পাবেন না ? ঐ জন্তই মেয়েদের সম্বন্ধে আমি এমন আঁটাআঁটির ব্যবস্থা করি। তার জন্তে আমার কম গুনিয়েছে ! তা তুমি কি বললে ?

স্নেহ। আমি ? আমি শুনে রেগে জলে উঠলুম। অনিলবাবুর সঙ্গে বিয়ের সব ঠিক—চারদিন পরে বিয়ে। আমি দিদিকে কত বললুম, কত বোঝালুম, তা চোরা না শোনে ধপ্পের কাহিনী। দিদি কাদতে লাগলো—বলে, যতীশবাবুর সঙ্গে বিয়ে না হলে দিদি বিষ খাবে।

প্রকাশ। তাই—তো ! তা—আহা ! অনিল বেচারার জন্তে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে।

স্নেহ। মন যখন একজনকে চায়, তখন আর একজনকে বিয়ে করা কি ভালো ?

প্রকাশ। কখনো নয়। শেষে উন্টো ফল দাঁড়াতে পারে। তা হলে দ্বিচারিণী হবে ! তা অনিলকে এ কথা বলে যতীশবাবুর সঙ্গেই বিয়ে দেওয়া উচিত। বাইরে একজনের স্ত্রী হবে, অথচ ভিতরে ভিতরে আর একজনকে ভালোবাসবে, অনিল এ বিয়েতে সুখী হবে না !

স্নেহ। অনিলবাবুকে এ কথা বললে তিনি সহজে দাবী ছাড়বেন ? তিনিও তো দিদির বিষয়-সম্বন্ধে হস্তারক হতে পারেন।

প্রকাশ। না, না, হস্তারক হলে চলবে কেন ? বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে। স্ত্রী-স্বাধীনতা ব্যবস্থা করুন ! সে কি লক্ষ-বক্ষ ! বুঝলে ?

স্নেহ। মেয়েমানুষ, দুর্বল মন—স্বাধীনতা দিলে তারা ঠিক থাকতে পারবে কেন? তারা তো আর পুরুষ মানুষ নয়—কাছাকাছা দিয়ে কাপড়ও পরে না! প্রকাশ। সত্যি তো। তা যতীশবাবুকে পাকড়ানো যাক।

স্নেহ। সেদিকে আবার এক বিপদ! যতীশবাবু দিদির বিষয়ে করতে চান না। তাঁর পছন্দ—

প্রকাশ। তোমাকে! বুঝেছি। না হলে চলবে কেন? ছোটটিকে দেখেছেন, কাজেই বড়টিকে—

স্নেহ। কিন্তু একটু ফিকির করতে হবে। দিদির সঙ্গে এ বিষয়ে তওয়া চাইত!

প্রকাশ। তা তো চাই, কিন্তু যতীশবাবু তো খোকা নয়—তাঁর নিজের মত নেই যখন বলচো—

স্নেহ। সেই জগুই বনছি—ফিকির চাই। তা আমি একটা মতলব ঠাওরেছি। আমাকে চিঠি পাঠিয়ে যেমন অপমান করেছিলেন, তেমনি চ্ছোড়াত্ত শোধ হয় তার।

প্রকাশ। কি, কি, খুলে বলো তো।

স্নেহ। আপনি একখানা চিঠি লিখুন,—আমার নামে। তাতে লিখুন, যেন আপনি যতীশবাবুর সঙ্গে আমার বিষয়ে দেওয়াব জগু মত করেছেন! হায়, হায়, দিদির জগু এতও করতে হলো। হাজার হোক সম্পর্কে দিদি—মেয়েমানুষ—তাকে রক্ষা করতে হবে তো!

প্রকাশ। এ আবার কি—এ আবার কি?

স্নেহ। আমার আপনি সন্দেহ করছেন, প্রকাশবাবু? তবে আপনি আমাকে এতদিন যে শিক্ষা দিলেন, তার কি ফল হলো?

প্রকাশ। না, না, আমি তা বঙ্গছি না। তা নয় তা নয়—

স্নেহ। তবে? আমি এই কাগজ-কলম নিয়ে আসছি। দিদিরক বাঁচান, প্রকাশবাবু। স্বচক্ষে তার অবস্থাটা দেখলেন কো? যতীশবাবু বুঝবেন, তিনি আমাকেই বিষয়ে করছেন। দিদি চেলির কাপড় পরে ঘোমটা টেনে থাকবে—বিষেটা তো হয়ে যাক—তারপর দিদি বানবনা করে নেবে! এ ছাড়া আর উপায়ও ত দেখি না। অনিল বাবুকে শেষে তাঁরই যুক্তি তর্কে এতে মত করিয়ে নোবো।

প্রকাশ। ঠিক বলেচো। We shall beard the lion in his own den.—মোদ্দা আমার মন সবছে না কেমন।

স্নেহ। না, না, ও আর ঘিষা নয়—(কাগজ-কলম লইয়া আসিল) নিন, লিখুন—

প্রকাশ। কি লিখবো, বলো। আমার কেনো বুদ্ধি আসছে না..

স্নেহ। লিখুন,—“শ্রীমতী স্নেহলতা দাসী, আয়ুতীষু—”

(প্রকাশ লিখিল) হলো? তার পর—হাঁ, একটু ফাঁক দিয়ে—হাঁ, ঐ। লিখুন,—“তুমি শ্রীযুক্ত যতীশ-চন্দ্র সেন বার-ঘাট-সকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়—” হলো? হ্যাঁ। তারপর, “আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, যে আমার সহিত তোমার বিবাহ সম্ভব নয়। তোমার শিক্ষা আমার আদর্শের সঙ্গিত খাপ খাইবে না। সুতরাং—” হাঁ,—লিখুন, “আদর্শের সহিত খাপ খাইবে না। সুতরাং” হাঁ, হয়েছে। “আমার ইচ্ছা, তুমি উক্ত যতীশ বাবুকেই বিবাহ কর। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। এতদর্শে স্বস্থ শরীবে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে, বিনামূল্যে বোধে, স্বইচ্ছায় এই অমূল্য-পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি—” এইবার আপনার নামটা সই করুন। বাঁ কোণে আপনার ঠিকানা, আর আঙ্গকেব তারিখটা লিখে দিন। ও কি, সই কবলেন না?

প্রকাশ। এ আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না, স্নেহ।

স্নেহ। এ আব বুঝতে পারছেন না? যতীশ বাবু এ চিঠি দেখে আহ্লাদে ডগমগ হয়ে ছুটে আসবেন, ভাববেন, আমার সঙ্গেই বুদ্ধি বিষয়ে হবে। শেষে দেখবেন, কি ভালেই পড়েছেন। তারপর সাতাশে তাবিখে আমাদের বিষয়ে হবে। হ্যাঁ, সই করুন। বেশ হয়েছে। এতটুকু সন্দেহ হবে না তাঁর। দিন, আমি চিঠিখানা মালতীর হাতে পাঠিয়ে দি।

প্রকাশ। নাও। মোদ্দা অনিলকে একবার গণপরি দিতে হবে।

স্নেহ। না, না, এখন থাক। বিষের দিনও তিনি জানবেন না। তারপর ব্যাপার বুঝে মাথা খুঁড়ুন!

প্রকাশ। বেশ হয়েছে। দ্বী-স্বাধীনতা চালান, বন্ধুর সঙ্গে দ্বীরা আলাপ করিয়ে দিন। যেমন কর্ম তেমনি ফল! এ বিষের ফুলের ভার আমি নেব। বাই, আজ আবার একবার লোহাপটি যেতে হবে। বেটারা এখনও লোহাব জাল দিয়ে গেল না, একবার তাগাদা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান]

স্নেহ। কি করলুম! এতে কি হবে?

## সপ্তম দৃশ্য

পথ

ভিন্ন-ভিন্ন দিক দিয়া অনিল ও প্রকাশের প্রবেশ

প্রকাশ। এই যে অনিল।

অনিল। তাই তো প্রকাশ যে। হন্-হন্ করে সজ্জা-বেলায় কোথায় চলেছ?

প্রকাশ। বিশেষ কাজে।

অনিল। কি এমন কাজ হে ? কাল আমাদের বিয়েতে এসে সব দেখচো শুনচো তো ?

প্রকাশ। কাল বুঝি ২০শে ! তা কাল আর বোধ হয়, কিছু দেখবার দরকার হবে না।

অনিল। দরকার হবে না ! বাঃ ! দরকার হবে না, কি হে ? আমি তো আর বর সেজে দেখাশোনা কবতে পারবো না।

প্রকাশ। সে কষ্ট আর তোমায় করতে হবে না। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তোমার উদার বন্ধু যতীশ বাবু তোমার হয়ে সে কষ্টটুকু আজই বোধ হয় সেবে ফেলবেন—এতক্ষণে বোধ হয়, সে কাজে লেগে গেছেন।

অনিল। কি বলচো, তুমি ? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রকাশ। যাক্...সে জ্ঞানবাবুর বাড়ী একটু কষ্ট করে গেলে এখনই সব চাড়ে চাড়ে বুঝবে ! তা তোমার বন্ধমানের কাজ চুকলো ? মকদ্দমাব কি হলো ?

অনিল। দেওয়ানী মকদ্দমা কি আর হুট বলতে চোকে রে ভাই ? আবার মাসখানেকের জন্ত মূলতুবি রইলো—তাদের পাতা-পত্র আনতে পারেনি বলে। তা তুমি যা সব বললে, তার অর্থ কি শুনি !

প্রকাশ। না, তোমায় না বলে থাকতেও পাচ্ছি না। তবে বড় সসংবাদ নয়—শুনলে যে তুমি আমার সন্দেশ খাওয়াবে, এমন বোধ হয় না।

অনিল। আহা, বলসেই ফালো না !

প্রকাশ। বলি, ২০শে তো তোমার সঙ্গে শ্রীমতী মাধুরী দাসীর বিয়ে ঠিক ছিল ? তা তাঁর অত বিলম্ব সইলো না ! তুমি এখানে ছিলে না—মকদ্দমা কবতে গেছলে, কাজেই তোমার বন্ধুকে ডেকে পাঠিয়ে সম্প্রদান-ফস্পদান-গুলো ঠাড়াড়ি সেবে নিচ্ছেন। পিশিমাও এসে পৌঁছেছেন, কাজেই কিছু বাধেনি। আজ আবার পাঁজিতেও না কি একটা স্তূতাহবুক যোগ আছে বলে লিখেছে !

অনিল। এ সব কি বলচো তুমি ?

প্রকাশ। একবারে যথার্থ ঘটনাব সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

অনিলচন্দ্র, বলিহারি তোমার শিক্ষা ! তার ফল আজ পাচ্চা হয়ে ফসেছে হে ! জ্ঞীদের স্বাধীন করা, মজলিসে নিয়ে যাও,—বাপ বে, ওদের কি কড়াড়িতে রাখতে আছে ? কোমল জাত—অন্ধবের অন্ধকারে ভেপসে মার! যাবে যে ! আলোয় নিয়ে যাবে না ? লেখাপড়া শিখিয়ে মেম বানিয়ে তুলবে না ? এখন ভোগো তার ফল।

অনিল। ভালো আপদেই পড়লুম—আবে, খুলেই বলো না !

প্রকাশ। অতিরিক্ত স্বাধীন হাওয়া পেয়েছেন কি না, কাজেই বাগদত্তা স্বামীটিকে ত্যাগ করে প্রণবীর ভূজ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে চান ! আর ঘরের বন্ধ বায়ুতে যারা ভেপ্‌সে মাঝা যান, তাঁরা এই সব হতভাগ্য প্রণবীগুলোকে তাড়িয়ে বাগদত্ত স্বামীর পায়ে দাসী হয়ে লুটোতে চায়—এই আর কি !

অনিল। যাও, যাও, নিজের কাজে যাও—শুনতে চাইনে আমি। (প্রস্থানোত্ত)

প্রকাশ। (ধরিয় ফিরাইল) চটেই চলল যে ! আহা, শোনো, শোনো। মাধুরী তোমার বন্ধু যতীশকে মনে মনে ভালোবেসেছেন—কাজেই তুমি বরখাস্ত হচ্ছে। লজ্জায় তোমাকে সে কথা তিনি খুলে বলতে পারেন নি। আজ তুমি বর্দ্ধমানে আছ—জানতে পাববে না ; তাই আজ যতীশবাবু টোপের মাথায় এসে মাধুরীকে বিয়ে কবতে বসেছেন। গোপলি লয়ে বিয়ে ! যতীশবাবু সেজেগুজে এসেছেন, দেখে এসেছি। আমি যাচ্ছি নিউ মার্কেটে ফুল কিনতে—স্নেহ পীড়াপীড়ি করলে—

অনিল। এ্যা—না, না—এ যে অসম্ভব ! যতীশ ! আমার বন্ধু ! মাধুরীকে আজীবন আমি শিক্ষা দিয়ে আসছি !

প্রকাশ। ভাই, সে শিক্ষার ফল হাতে হাতে পেলে তাই। এতে আর দুঃখ কি ? মেয়েদের হাওয়া খাওয়ালে চলে কি—ধাতে সইবে কেন ? আজ পাঁচশ বছর দেওয়ালের আড়ালে বন্ধ বায়ু আর অন্ধকার যাদের অভ্যাস হয়ে গেছে, তাদের যদি ফশ্ করে আলায় আনো, তাহলে চোখ খারাপ হয়ে যাবে যে ! হাওয়ায় সন্দির বায়মো দাঁড়াতে পারে যে !

অনিল। এই নিয়ে তুমি ঠাট্টা কবচো প্রকাশ ?

প্রকাশ। ঠাট্টা নয়, অনিল,—যথার্থ তোমার এ নৈরাশ্র আমার দুঃখ হচ্ছে। তবু আমি তোমার বন্ধু—একটা সান্ত্বনা এই যে, তোমার সৌভাগ্য, মাধুরীর সঙ্গে তোমার বিবাহ হলো না ! নাহলে বাইরে তোমার স্ত্রী হয়ে অন্তরে সে আর একজনকে ভালোবাসবে, এটা কি ভাল হলো ?

অনিল। আশুন শ্বেলে দাও ভালবাসায়। মাধুরীর মনে এই ছিল !

প্রকাশ। তুমি বরং আমার বাড়ীতে এসো—একটু বসবে ! আমি দাঁ করে ফুলগুলো এনে ওদের বাড়ী পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবো'খন !

অনিল। যাও তুমি। আমি কিছু শুনতে চাই না।

(প্রস্থান)

প্রকাশ। জ্ঞী-শিক্ষা, জ্ঞী-স্বাধীনতা—এ সবের উপর এই

জ্ঞেই তো আমি হাড়ে চটা। এ দেশের ধাতে ও সব  
সইবে কেন ? (প্রস্থান)

মালতীর প্রবেশ

মালতী। যাই, চট করে ছিঁটি নিয়ে যাই। আঃ,  
আমার লীলমণি আজ যা সন্তোষে এসেছে ! বলে,  
দাদাবাবুর বিষে, মুই মিত্রবর ! এই যে, পেছু পেছু  
এসেছে। নাঃ, মিন্দে জ্বালালে দেখছি।

নীলমণির প্রবেশ

এসেছিঁস্ ? ওবে, আমি মরবো এবার। এখনো  
বিষে হয়নি, এর মধ্যে এত ! এণ পর যে ভুতের মত  
আমার ঘাড়ে দিন-রাত চেপে বসে থাকবি, দেখছি।  
নীলমণি। মুই তুমায় ছেড়ে থাকতে পারব লা—  
মলাতী।

মালতী। আহা, যেন যশোদার ননীচোরা নীলমণি রে।  
তা আমি তো যশোদা নই যে, লীলমণি আমার জ্বালা  
ধবে বেড়াবে।

নীলমণি। কাল কখন মদের বিয়া হবে, মলাতী ?  
মালতী। যখন তোমার গলায় মালা দেবো, বুঝলে !  
ভাবনা গেছে তো এখন ? যাও তবে—  
নীলমণি। তুমি কোথায় যাচ্ছ মলাতী ? মুইও যাই লা !  
মালতী। অমনি তুমি যাবে ! বেশ, তুমিই যাও, আমি  
ভবে ফিরি।

নীলমণি। রাগ কবো না মলাতী—মর কান্না পায়।  
মালতী। একটু কাদো। দুঃখ থাকে কেন ? অমন  
করো যদি তো কখনো বিয়ে করবো না।  
নীলমণি। লা মলাতী, বাগ কর লা—মুই এই ফির্যা  
যাচ্ছি।

মালতী। যাও ফিরে—  
নীলমণি। এই যে যাই ( ব্যাকুলভাবে দৃষ্টি—এক পা  
অগ্রসর হয় ও ফিরিয়া চায় )  
মালতী। আবার ফিরে ফিরে চাইছ কি ? যাও।  
নীলমণি। এই যাই ! ( ফিরিয়া ) মলাতী—

মালতী। কেন ? কেন ?  
নীলমণি। তুমি এখনই আসবে ?  
মালতী। না, আমি আর আসবো না।  
নীলমণি। রাগ কর কেন, মলাতী ?

মালতী। সং ! হাসিও পায়। ( দাড়ি ধরিয়া ) যাও  
বাহু, বাড়ী যাও—তোমার জন্তে কত সন্দেশ কিনে  
আনবো, খেলনা কিনে আনবো ! লক্ষ্মী য'হু আমার,  
যাও, ঘরে যাও—লীলমণিটি, সোনামণিটি আমার।  
নীলমণি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ( হাস্ত ) মলাতী—  
মলাতী—

মালতী। দ্যাখো, সাথে সং বলি ! বিয়ে হতে চলেছে—

এখনো আমার ঠিক নায়ে ডাকতে শিখলে না !  
ওগো, আমি মলাতী নই। আমার নাম, মালতী।  
নীলমণি। এ্যা, বলিস কি—মলাতী ! এতদিন ভুল  
নাম ধরে ডেকে আসছি—তা হলে ? হায়, হায়,  
হায়—তা—মালতী আমার, মালতী আমার—  
মালতী। আহা, লীলমণি আমার, লীলমণি আমার—

আঁটুল বাঁটুল শামলা সঁটুল শামলা নেইক হবে—  
শামলাদেব লীলমণিটি পথে কেঁদে মরে !

কি হয়েছে লীলমণিবে, কি হয়েছে তোব ?  
চোখ মুছে ফেল মণিক আমার—দুঃখ কিসের ঘোর ?  
ছোলা ভাজা দেবো খেতে—চক্ষু মোছ ওবে !  
শাস্ত হ রে সোনা আমার,—ওরে আমার মণিক,  
রূপকথা বে বলবো ফিরে, একলা থাকো খানিক।  
কেঁদোনাকো, কঁাদলে এবার আছাড় দেবো ধরে !

নীলমণি। ফিরতে দেবী কব লা, মলাতী।  
মালতী। ওগো, না গো, না।  
নীলমণি। লা হলে মন কেমন করবে মর।  
মালতী। না, মনকে একটু বেঁধে রাখো।

( উভয়ের বিভিন্ন দিকে প্রস্থান )

## অষ্টম দৃশ্য

মাধুরীর বাটী ; সজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপ  
দুই পার্শ্বে আসনে—একধারে অনিল ও মাধুরী ; অপবধারে  
বতীশ ও স্নেহ উপবিষ্ট। অনিল ও বতীশের বরবেশ,  
মাধুরী ও স্নেহর বধু-বেশ, চারি জনের গলায়  
পুষ্পমালা। সম্মুখস্থ আসনে পিশিমা।  
ভট্টাচার্য্য ; ও সজ্জিত-বেশা  
মহিলাগণ।

পুরোহিত। ( উঠিয়া ) নাও, বব-কনে এখন বাসরে নিয়ে  
যাও। আগে অনিলবাবুদের রেখে আসুন, তার পর  
এঁদের নিয়ে যাবেন।

মালতীর প্রবেশ

মালতী। পিশিমা, তুমি একটু জল খাবে, এসো। সারা-  
দিন উপোস গেছে—এই গুট ! তেঁটা পেয়েছে কত !  
ভট্টাচার্য্য মশাইও আসুন।  
পিশিমা। আজ কি আমার ক্ষিদে আছে রে মালতী !  
আহা, বেঁচে থাকো সব, সুখে-স্বকর্য্য করো, সোনার  
চাঁদ ছেলে-পুলে হোক ! আমার জ্ঞানব নাহ বজায়

থাকুক! আহা, আমার জ্ঞানের কত সাধের কত আদরের মেয়ে! বেঁচে থাকো মা,—পাকা মাথায় সিঁদূর পরো, হাতের নো অক্ষয় হোক।

(চারি জনে পিশিমা কে প্রণাম করিল)

ওরে, শাঁখটা বাজা না কেউ। (শব্দ ও হলুধ্বনি)  
পুরোহিত। তা হলে পিশিমা, আপনি একটু জলটল খান গে।

পিশিমা। এই যে, এরা বাসবে যাক। আমাব সোনার চাঁদেরা আগে ঠাণ্ডা হোক!

১ মহিলা। ওদের ভক্ত ভাবতে হবে না, পিশিমা। ওদের এমনতেই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আজ।

২ মহিলা। না হলে বর্দ্ধমান থেকে দৌড়ে এসেই কেউ ছানলাতলায় দাঁড়াতে পারে?

৩ মহিলা। তা ছাড়া কাণমলা খেয়ে পেট ভরে গেছে।  
অনিল। কাণমলা খেয়ে কি আমাদেব আর পেট ভরে, পিশিমা? ওঁতো চায়ের মত নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে পড়েছে!

যতীশ। এমন মিষ্টি হাতের কাণমলা খাওয়া ভাগ্যের কথা, পিশিমা! কাণটার যে এমন সৌভাগ্য ততে পারে, তা কি কখনো কল্পনা করেছিলুম!

পিশিমা। পাগল ছেলে সব।

১ মহিলা। দে'তো ভাই কাণটা আবার মলে। ওঁব আশ মেটেনি এখনো!

মহিলাগণ। (তথাকথত)

যতীশ। আহা, কাণটার উপর যেন এক পশলা পুষ্পবৃষ্টি হয়ে গেল!

মালতী। তুমি এস, পিশিমা—একটু মিছরির পানি অন্ততঃ মুখে দেবে এসো।

পুরোহিত। হাঁ, চলুন। এঁরা আমোদ-আহ্লাদ করুন।

(পিশিমা, মালতী ও পুরোহিতের প্রস্থান)

মাধুরী। আমার কষ্ট হচ্ছে, প্রকাশবাবুর জ্ঞান।

যতীশ। আহা, বেচারী প্রকাশবাবু!

অনিল। মায়াবিনী স্নেহ!

স্নেহ। আবার আমার কেন?

অনিল। বেচারী fool ফুলের বোঝা বয়ে আনছে।

১ মহিলা। অথচ জানে না, কি ঢেঁকি তার বুকে পড়লো!

২ মহিলা। আর বকাবকি কেন? অনিল মাধুরীকে বাসবে চালান দি, এসো না।

অনিল। আমি প্রকাশের জ্ঞান অপেক্ষা করছি।

৩ মহিলা। একবার বাসবে বসে তারপর ফিরে এলেই ভালো হয় না?

[মালতীর পুনঃ প্রবেশ। তার সঙ্গে একজন ভৃত্য ফুলের ঝুড়ি লইয়া আসিল]

মালতী। প্রকাশবাবু ফুল পাঠিয়ে দেছেন—তিনি বাড়ীতে কাপড় ছেঁড়ে সেজেগুজে আসছেন। একে দিয়ে ফুল পাঠিয়ে দেছেন, পাছে দেবী হয়!

২ মহিলা। ও বাবা, এ যে ফুলের পাছাড় একেবারে! মাধুরী। বেচারী হুম্মান গন্ধমাদন বয়ে আনলো আর কি!

অনিল। হুম্মান বলা ঠিক নয়, মাধুরী—হুম্মানের বিশেষত্বটুকু থেকে বেচারী একান্তই বঞ্চিত।

১ মহিলা। সেটা ভিতবে ভিতরে পাকিয়ে আছে।

যতীশ। নাঃ, এ রীতিমত মানহানি!

মালতী। নে, ফুলের ঝুড়ি এখানে রেখে ভুই যা।

(ভৃত্যের প্রস্থান)

৩ মহিলা। এসো ভাই, এদের এবার সাজানো থাক।

১ মহিলা। ঠিক বলেচিস, ভাই রেণু।

মহিলাগণ। (ফুল দিয়া সাজাইতে সাজাইতে)

সজনি, সাজাবো ফুলে।

যুঁইয়েবি মালা গঁথে পরাবো চুলে।

মালতী দেবো ছুটি, কাণে হবে ঢুল;

বেলার কুঁড়ি নোলোক বলে হবে ডুল;—

চামেলি ব মালা বাঁধি বাহু-মূলে।

গোলাপ-কলি দিব অলকে গাঁথি;

চরণে কমল-মালা; নখেরে জাতী;

তার-হাব গঁথে দিব বরা বকুলে!

মালতী। ওগো দিদিমণিরা, বোঁঠাকরুণরা, বরকনেদেব বাসবে নিয়ে চলো না গো।

১ মহিলা। ঐ যে—প্রকাশবাবু আসছেন না?

অনিল। হ্যাঁ। মাধুরী, আমরা আড়ালে বাই চলো। স্নেহ, বেশ করে ঘোমটা টেনে দাঁও, ঘোমটা টেনে দাঁও।

(অনিল ও মাধুরীর অন্তরালে গমন)

প্রকাশের প্রবেশ

(মহিলাগণের সঘন হলুধ্বনি)

প্রকাশ। বিয়ে হয়ে গেছে?

১ মহিলা। হ্যাঁ—নির্কিঁয়ে সব চুকে গেছে।

প্রকাশ। স্নেহ কোথায়? ফুল কেমন হয়েছে?

২ মহিলা। চমৎকার!

প্রকাশ। আমায় ধন্যবাদ দিন যতীশবাবু। আমি সাহায্য না করলে আর এ বিয়ে হতো না মশায়।

যতীশ। জন্মে কখনও আপনার ক্ষণ শোধ দিতে পারবো না।

৩ মহিলা। আর জন্মে প্রকাশবাবু নিশ্চয় যতীশবাবুর কেউ ছিলেন।

৪ মহিলা। সতীন।

প্রকাশ। অনিলের সঙ্গে পথে আমার দেখা হলো। সব বললুম...বেচোবার মনে বেশ চোট লেগেছে—সাম-লাতে পারলো না—

অনিলের প্রবেশ

অনিল। তাই তারই বেগে একদম এখানে ছুটে এসেছি।

প্রকাশ। এ কি! অনিল! তোমার পরণে—

অনিল। বর-বেশ দেখে অবাক হচ্ছি! কিন্তু তোমার মুখে যে পপর পেলুম, তাতে আব এক মুহূর্ত্ত দেরী না করে চট করে এই বেশ ধরে ছুটে এসেছি। Sun set law ভারী strict দাদা, এসে খুব সময়ে খাজনা দিয়ে ফেলেছি। আমার তালুক লাটে চড়ায় কে?

প্রকাশ। সে কি! মাধবী

মাধবীর প্রবেশ

মাধবী। আমাকে ডাকচেন?

প্রকাশ। এ কি! ভেঁকি দেখছি আমি? এ তবে—  
মাধবী। যতীশবাবু নবোচ্চা স্ত্রী—আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী গ্রেহলতা দাসী। কেনে সঙ্গে কেমন মানিয়েছে, দেখুন। (গ্রেহব ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইল)

প্রকাশ। এ কি! এ সবের মানে?

অনিল। যতীশবাবু সঙ্গে গুঞ্জে এসেছেন—তার পর আমিও ঠিক সময়ে বর সঙ্গে হাজির—আমার দাবা আমি ছাড়বো কেন ভাই? first mortgage first charge আমার। সম্পত্তি দখল করলুম। যতীশবাবু ভুললোক—ওকেই বা গুপ্ত হাতে ফেরাই কি বলে? কাজেই গ্রেহময়ী গ্রেহলতাটিকে ওঁর হাতে তুলে দিলুম। দেখ দেখি, কেমন মানিয়েছে।

১ মহিলা। সাক্ষাৎ চরগোবী!

২ মহিলা। সাক্ষাৎ বলে সাক্ষাৎ! একেবারে ছুঁ ছোড়া চরগোবী!

৩ মহিলা। না হলে ঘবের শোভা হবে কেন?

প্রকাশ। বুঝছি, এ সব ফন্দি! আমাকে গাধা পেয়েচো, না? বেশ, আমি ছাড়ছি না। এ বিষয়ে তো null and void. আমি এখন আদালতে গিয়ে injunctionএর order নিয়ে আসবো।

যতীশ। আদালত আজ এখন রাত্রে বন্ধ হয়ে গেছে, মশায়! তবে কাল, ইয়া, দেখতে পাবেন। বেশ,

মশায়, caseটা আমার দেবেন! এসে অবধি এখনও একটাও case পাইনি। আর পাবোই বা কোথেকে? এধারেই ঘূবছি—এটর্নিপাড়ায় গেলুম ববে! আমি এক G. M.-এ আপনার application করতে রাজী আছি!

প্রকাশ। আবার ঠাট্টা!

অনিল। ঠাট্টা বলে ঠাট্টা। একেবারে ফৌজদারী ঠাট্টা! Culpable homicide amounting to murder!

প্রকাশ। আচ্ছা, বিষয়ে cancelled না হয়, trustএর ব্যবস্থামত বিষয়েব দফা দেখছি!

অনিল। সেও যে ভাই case-dismiss-এর ব্যবস্থা নিজেব হাতে করে রেখেচো। ঊনলুম, তুমি নিজেব হাতে গ্রেহকে কারখত লিখে যতীশবাবুর হাতে তুলে দিয়েছ।

প্রকাশ। ওঃ, এখন আমার চোখ খুলেছে। আমাকে দিচ্ছেই সব স্ববিধে ববে নিয়েছ! আমি বাদব, তাই স্ত্রীলোকের কথাই ভুলেছিলুম—কিছু বুঝিনি! আমার বেকুব, তাই গ্রেহকে বিয়ে কবতে চেয়ে-ছিলুম, মেয়েমানুষকে বিশ্বাস কবেছিলুম! যাক্, আমার পিতৃপুরুষের পুণ্য যে এ বিষয়ে হতনি। নাঃ, সাথে মেয়েমানুষের সখঞ্জে স্বাধরা কঠোর ব্যবস্থা করেছিলেন!

অনিল। মনের দুঃখে আর স্বাধদের সগোত্র বাপান্ত কবো কেন?

প্রকাশ। উঃ, খুব বেঁচে গেছি—এ জীবনে কখনো বিষে কচ্ছি না, আমি। মেয়েমানুষের অসাধ্য কিছু নেই, দেখছি! এই মেয়েমানুষকে লোকে বিয়ে করে, সখে থাকবার জন্ত। বেকুবী। যাক্, যা হয়েছে, বেশ হয়েছে। অনিলবাবু, তোমাদের আমোদ-প্রমোদ সাঙ্গ হলে সুবিধামত আমার সঙ্গে দেখা করো—আমি আর trustee থাকতে পারবো না।

অনিল। এ ঘটনার পর ও কষ্টটুকু তোমাকে আর কোন্ মুখে সহিতে বাল, বলো ভাই?

প্রকাশ। বেশ, তোমরা রঙ্গরস করো—আমি চললুম।

অনিল। সে কি! অমনি! না খেয়ে? একটু মিষ্টিমুখ না করে কি বিষে-বাড়ী থেকে যেতে আছে?

প্রকাশ। এ সব ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না, অনিল।

যতীশ। প্রকাশবাবু নেহাৎ যাবেন?

প্রকাশ। যতীশবাবু, আমার সঙ্গে আপনার তেমন আলাপ নেই, তবু বলি, কাজটা কি ভালো হলো?

যতীশ। আমার দোষ দিচ্ছেন, কেন! আমি যদি



আপনার চিঠি না দেখতুম, তাহলে কি আজ এখানে  
আসতুম ?

প্রকাশ। যান, যান, চালাকি করতে হবে না,  
মশায়।

অনিল। ষতীশ, কিছুতেই ওঁকে ছেড়ো না। মিষ্টিমুখ  
করাতেই হবে। ছোটো সন্দেশ নিদেন...

১ মহিলা। সত্যিই প্রকাশবাবু, আপনি হচ্ছেন মাধুরী-  
স্নেহের ভাইয়ের মত। এ সময় বাগারাগি করে চলে  
যাওয়া কি ভালো ? নেহাৎ যদি মিষ্টিমুখ না কবেন  
ত আমাদের একটা কথা না হয় শুনে যান !

প্রকাশ। কি কথা ?

মহিলাগণ। কথাটা হচ্ছে—

গীত

একটু আলো, একটু বাতাস, প্রয়োজন আমাদেরো !

না হলে বাঁচবো কেন ? প্রাণ তো মেয়েদেরো !

আমাদের চন্দ্রবদন দেখে কেউ ফেলে যদি,

ভাবের ঢেউ উথলে প্রাণে যদি কার বয় গো নদী,—

সেটা কি মোদেরই দোষ ? তাদেরই বেঁধে মেবো।

এ যে গো বঙ্গ-হাসি, এ যে গো সজ্জা মোতন—

বোঝ না কেন এ সব ?... না হলে উড়বে যে ধন !

আমাদের অস্ত্র কি আর ? সাধে কি পেছু ফেরো ?

নারীকে বেঁধে বশে কখনো আনা না যায়—

বাঁধনে আপনি বাধে, তবে তো লোটে সে পায়,

( নয় ) আঁটনি কষবে যত, তত হাস, ফস্কা গেরো !

স্ববনিকা



# নেপথ্য

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বন্ধু

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ বসু বি এন

করকমলেশু

## পূর্ব-কথা

একটা ফৌজদারীর মামলার উপর এই উপন্যাসের কাঠামো খাড়া করিয়াছি। প্লট নিছক কাল্পনিক নয়। জীবনের কয়টা টুকরার উপর কল্পনার রঙ ফলাইয়াছি।

মানুষের বাহিরের কাজ দেখিয়া আইন তার দোষ-গুণের বিচার করে। মনের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভবও নয়। আইন-কারকে দোষ দিই না। তবে বড় বড় চুরি-জুয়াচুরি খুন-জালিয়াতির তুলনায় মানুষের মনের উপর মানুষের যে অত্যাচার সমাজের বুকে অহরহ চলিয়াছে, তার একটু আভাস দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

বিলাতের ডাইভোস-কেশের রিপোর্ট পড়িয়া অনেকে ঘুণার হাসি হাসেন, কিন্তু দারুণ মর্শ্ব-দাহে অন্তর তাহাতে ভরিয়া উঠিবার কথা। মনের উপর কতখানি অত্যাচার হইলে বিলাতের স্বামি-স্ত্রী আদালতে ছোট্ট বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়! তেমন অত্যাচার এদেশেও কিরূপ অবাধে চলিতেছে, প্রহার না করিয়াও অবহেলা আর বিশ্বাসঘাতকতার বিষে কত বালিকাকে এদেশের পুরুষ হত্যা করিতেছে, ‘চুম্বকি’-চরিত্রে তাহারি একটু ইঙ্গিত দিয়াছি মাত্র। সমাজ কিন্তু অসাড় বসিয়া আছে। থাকুক,—নারীর এ ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস বুঝায় যাইবে না, এ বিশ্বাস রাখি।

১৭, মোহনবাগান রো, কলিকাতা ;

১২ ফাল্গুন, ১৩২৯।

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

# নেপথ্যে

আষাঢ় মাসের মেঘ ফাটিয়া অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। সাবান দিন কেহ সূর্যের মুখ দেখে নাই। জলে-কাষ চারিদিকে এমন বিশ্রী কদম্বা ভাব ফুটিয়াছে যে, যে-নভেলখানা খুলিয়া সাশিব পাবে বসিয়াছিলাম, বহু চেষ্টাতেও তাহাতে মন বসিতেছিল না। এই বাদলা-বাতের কাজল-কালে' আদ্যাবে বিশেষ করিয়া মনে জাগিতেছিল, মামলাটার কথা—যে মামলা কোর্টে সন্ধান করিয়া আসিয়াছি। বেচারি মেঘনাথ! তার সাজা হইয়া গিয়াছে। এক বছরবেল ছেল আর পাঁচশো টাকা জরিমানা।

কিন্তু সে নির্দোষ। তবে তার সে নির্দোষিতা এখনকার আদালতে সাক্ষী ডাকিয়া প্রমাণ করা যায় না! মনেব সে কি সবিস্তার কাহিনী! কত পল্লবিত ঘটনা। সে কথা আদালতে তোলা মূঢ়তা! আদালত হাসিয়া উঠিবে, ও-সব কথায় শুধু আদালতের সময় নষ্ট হয়,—ও সব প্রমাণ করা অসম্ভব! পাগলামি!

বই বাখয়া ধোঁয়াটে আকাশের পানে চাহিয়া বহিলাম। নিবিড় মেঘে আকাশ ঢাকা, আর স্বরস্বর-দ্বাবে বৃষ্টি ঝাবতেছে—যেন সমস্ত প্রকৃতির গা বেড়িয়া কে জলেব জাকির রচিয়া দিয়াছে!

সহসা জ্ঞা আসিয়া হাজিব, তাতে একটা ডিগে বধাব উপযোগী বিবিধ মুগ্ধোচ্চক খাচ্চা। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিল।

জ্ঞা বলিলেন,—না বাবু, আর পারা যায় না। কেবল জল আর জল! সেই ভোব থেকে নেমেছে—এব আর বরাম নেই!

আমি বলিলাম,—পথ-ঘাট বা হয়েছে, সে আর কহতব্য নয়। গাড়ী চলেছে, না, বজরা ভাসচে।

জ্ঞা বলিলেন,—কোটে তবু তো সেই পাঁচটা অবদি কাজ—পাঁচ মিনিট আগে বাড়ী ঢেকোনি। সেখানে কাজ-কন্ঠেব কমতি হয়নি তো! ত্রিষ্ট জলে মকদ্দমা কবতে লোক আসতেও ছাড়েনি। ধন্তি সখ, বাবা!

আমি বলিলাম,—সখ করে কি কেউ আর মকদ্দমা করে! প্রাণের দায়ে, মানের দায়ে, টাকার দায়ে লোক মামলা করতে আসে।

জ্ঞা বলিলেন,—আর না এলে তোমাদেরই বা চলে কি করে, বলো? ...আজ এই বর্ষায় ক'জনকে ভাসিয়ে এলে? আমার এই ব্যবসাটাকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞা প্রায়

ঠাট্টা-বিজ্রপ করেন। প্রায় বলেন, আর কেন? ছেড়ে দাও বাবু ও কাজ! লোকের ঝগড়া-ঝাঁটিতে মাথা দিয়ে তাদের উদ্বে তোলা বৈ নয়! লোকে স্বখে-শান্তিতে থাকুক!...ব্যবস্থা বেশ—পাঁচজনে ঝগড়া করবে, আর-পাঁচজনে পয়সা খেয়ে সেই ঝগড়ার নতুন নতুন ফন্দী বাব করে তাতে তাদের আরো মাতিয়ে তাতিয়ে তুলবে!

জ্ঞার কথায় এক এক সময় মনে হয়, লেখাপড়া শিখিয়া আচ্ছা ব্যবসা দাঁদিয়াছি বটে! প্রথম যখন এই ওকালতিতে প্রবৃত্ত হই,—অর্থাৎ যখন একেবারে জুনিয়াবির যুগ,—তখন সিনিয়াদের কাছে গিয়া বেচোবা আসামী মকেল যখন সামান্য ফীয়ে কাজ করাইবার ব্যাকুল নিবেদন লইয়া তাঁর পায়ে কাঁদিয়া পড়িয়াছে আর সিনিয়াব-মশায় পায়ণ-বুকে সে নিবেদন সবগে ঠেলিয়া বেচারাকে খেদাইয়া দিয়াছেন, আমার চিন্তা—কি বিদ্রোহী হইয়াই না তখন উঠিত! মনে হইত, সগর্জনে বলি, সামান্য ক'টা টাকার মায়া ছাড়ুন না মশায়! বেচারি বিপন্ন!...কিন্তু সাহস করিয়া মুখ খুলিতে পারি নাই। আর এখন? সামান্য ফী কাটিবার কথা কেহ বলিলে তার কাগজপত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া দিই! হায়রে, কোথায় গেল মিল স্পেন্সারের সেই বড় বড় কথা, ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রাণের সে ককণ উচ্ছ্বাস! জীবনটায় কালিয়ুলি মাথাইয়া এমন কদম্বা কালো কবিতা তুলিতেছি, পয়সার সিমেন্টে মাখিয়া প্রাণটাকে এমন কঠিন করিয়া গড়িতেছি, সে আর বলিবার নয়।

জ্ঞার কথায় সেদিনকার মকদ্দমার কাহিনীটুকু বর্ষায় এই বিপুল আঁধার-কালো বৃক্কের পটে বিদ্যুতের অক্ষরে ফুটিয়া উঠিল। বেচারি মেঘনাথ!

একটা নিখাস ফেলিয়া বলিলাম,—আজ এই বাদলা দেখে যম যেমন তার চুলী-জালায় কামাই দেয় নি, আমাদের চুলীও তেমন জালা ছিল।...একটা লোকের জেল হয়ে গেল এক বছর, আর জরিমানা।

জ্ঞা বলিলেন,—দোষ করে যদি জেলে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জগৎ হুংথ করতো কেন? ভগবানও তো রেয়াৎ করেন না দোষীকে সাজা দিতে!

আমি কহিলাম,—জানি না, ভগবান এ দোষটাকে কি চক্ষে দেখবেন,—কিন্তু মানুষের গড়া আইন একে রেয়াৎ করলে না।

স্ত্রী বলিলেন,—কি করেছিল?

আমি বলিলাম,—আগাগোড়া ব্যাপারটা তবে বলি, শোনো। কাল খবরের কাগজে হয়তো এ মকদ্দমার কথা বেরুবে যে একটা লোক—নাম মেঘনাথ সাহা—মনিবের দু'হাজার টাকা ভেঙ্গেছিল বলে তার এক বছর জেল আর পাঁচশো টাকা জরিমানা হয়েছে। সে একটা বদমায়েশ, শয়তান—এই বলেই তার পরিচয় সোকের মনে ছাপা হয়ে যাবে—সবাই তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে। কিন্তু তুমি শোনো সব, শুনে বুঝবে, এই মামলার ঐ ছোট্ট রিপোর্টটুকুর পিছনে কতখানি মিথ্যা, কতখানি নৃশংসতা,—মানুষের উপর মানুষের পৈশাচিক হিংসা কি ভয়ঙ্কর নৃত্য করছে, তার ইঙ্গিত পাবে। আরো বুঝবে, যা যা জ্বলে যায়, তাদের সবাই শয়তান নয়। তাদের মধ্যেও এমন সাধু আছে, যাদের পৈশাচিক স্বর্ণের সিংহাসন গলে ছলে ওঠে।

২

—মানসনাথ চৌধুরী মস্ত জমিদার। জমিদারী রাজশাহী না মালদহ অঞ্চলে। জমিদার বাবু থাকতেন কলকাতায়। জমিদার বলতে সচবাচর যা বোঝায় অর্থাৎ গদিয়ানী চাল, অকর্ম্মার চিপ, মোটা-সোটা জবুথবু একটা জীব, ইনি সে ধরণের ছিলেন না। লেখাপড়ার চর্চা এঁর বিলক্ষণ ছিল,—তা ছাড়া কলকাতায় শুধু মোসাহেব-বুন্দে পরিবৃত্ত হয়ে বাস করা, আর অস্থানে-কুস্থানে অর্থ ব্যয় করে বেড়ানোর দিক এঁর কোনদিন খেয়াল হয় নি। কলকাতায় ইনি ছ-চারটে কারবাব ফেঁদেছিলেন,—আর সেই কারবাবের স্যানেজার ছিল আমার এই বোঁরা মক্কেল মেঘনাথ সাহা। মেঘনাথ প্রায় বিশ বছর ধরে জমিদারের কাছে মাঁ নছারি করছিল। এর উপর বাবুর বিশ্বাস ছিল যেমন অশাধ, সে বিশ্বাসের অপব্যবহারও তেমনি তার দ্বারা কখনো হয় নি।

মানসনাথের স্ত্রী মারা যান পাঁচ ছ'বছর আগে। এই দুর্ঘটনার পর থেকে মানসনাথ সাংসারিক ব্যাপার থেকে মনকে ক্রমে গুড়িয়ে নিতে লাগলেন। ছেলে তারকনাথের বয়স তখন বিশ-বাইশ বৎসর। ছেলেটি প্রে'স-ডেলিতে পড়ছিল। ছেলের পড়াশোনা আব স্বভাব-চরিত্রের উপর বাপের দৃষ্টি বরাবর বেশ প্রখর ছিল—অর্থাৎ তার সাধ ছিল, ছেলেটিকে রীতিমত চৌগস করে গড়ে তুলবেন।

অকস্মাৎ স্ত্রী-বিয়োগ হলে সংসারের উপর থেকে তিনি যেমন দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন, ছেলের উপর থেকেও তেমনি সে দৃষ্টি সরে গেল। ফল হলো এই যে, এতদিনকার একটা দৃষ্টির আবরণের পাশ কাটিয়ে ছেলে বাহিরের পানে চক্ষু মেলে চাইতেই আশ-পাশ থেকে এমন ভিড়

এসে জমা হয়ে ছেলেটিকে ঘিরে দাঁড়ালো যে, সে যেন কেমন ধারা হয়ে গেল। ভিড়ের দলে কারো হাতে শ্রোভনের জাল, কারো মুখে রঙীন হাসি! ছেলেটি এই নুতনধর মোহে একটু একটু করে নিজেকে এনে সেই ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে' গেল।

কিন্তু ভিড়ের এমন স্বভাব যে সে তার কৌতূহল নিয়ে কখনো স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না—সে ঠেলে ঠেলে চলতেই থাকে। তবে কখনো এগিয়ে যায়, কখনো বা পেছিয়ে পড়ে। এমনি ঠেলায় এগুতে এগুতে পেছুতে পেছুতে তারকনাথ একদিন দেখলে যে সে বাপের সে-দৃষ্টির প্রাচীর লঙ্ঘন করে অনেক দূরে এসে পড়েছে,—সেখান থেকে চট করে ফেরা যায় না! ফিরতে গেলে ভিড়ের বাঁধনে টান পড়ে। তা ছাড়া ভিড় টানে, ডাকে, বলে, চলো, চলো! এর মধ্যে ফিরবে কি!

বছরখানেক পরে ভিড়ের মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি জাগিয়ে তারকনাথ যখন মাথা তুলে দাঁড়ালো, তখন সে ভিড়ের মধ্য থেকে বিস্তর পাওনাদারও গুণ্গোল করে উঠলো। অর্থাৎ তারকনাথ তখন এদের দলে সোঁদীন বলে নাম কিনে ফেলেছে—এবং সে নাম রক্ষা করতে গেলে যে পাবিমাণ টাকার দরকার, তারকনাথের হাতে তত টাকা ছোটটার অবসর বা স্বেযোগ তখনো ঘটে নি। কাবণ, বাপের টাকা-কড়ির তহবিল থাকতো এই মেঘনাথের কাছে।

বন্ধুদের পরামর্শে আব পাওনাদারদের তাড়নার তারকনাথ একদিন ভৃত্য মেঘনাথের কাছে এসে দাঁড়ালো; বললে,—টাকা চাই।

মেঘনাথ মনিবকেই মান্তো, মনিবের ছেলেকে নয়। সে বললে,—কিসের টাকা?

তারকনাথ আম্তা আম্তা করে বললে,—কিছু দেনা করে ফেলেচি!

দেনা! মেঘনাথ ভড়কে গেল। এ কথাটা এ সংসারে ঢুকে অবধি সে কাণে শোনেনি কখনো! সে বললে,—বাবুর হুকুম না পেলো টাকা দেবো কি করে?

তারকনাথ চোখ রাঙিয়ে বললে,—না হলে তারা নাশি করবে?

মেঘনাথ বললে,—বাবুকে বুঝিয়ে বলি।

তারকনাথ ভয় পেলে; ভয় পেয়েও গর্জ্জন ছাড়লো না। বললে,—খবরদার! বাবার কাণে যদি এ কথা যায়, তাহলে তোমার চাকরি থাকবে না!

মেঘনাথ হাসলো এ কথা শুনে; বললে,—তার জন্ত তোমাকে ভাবতে হবে না!

তারকনাথ আবার চোখ রাঙিয়ে উঠলো,—আমি বিষ খাবো, টাকা না দিলে।

মেঘনাথ বললে,—তাহলে বাবুকে বলি।

তারকনাথ মেঘনাথের হাত চেপে ধরে বললে,—  
আমায় রক্ষা করো।

মেঘনাথ বললে,—বদ্ সঙ্গ ছাড়া, বদ্ খেয়ালি  
ছাড়া।

তারকনাথ বললে,—ছাড়বো। কিন্তু টাকা ?

মেঘনাথ বললে,—কত ?

তারকনাথ বললে,—প্রায় দেড় হাজার।

একটু ভেবে মেঘনাথ বললে,—দেবো।

তারকনাথ বললে,—বাবা জানবে না, অথচ দিতে  
পারবে ?

মেঘনাথ বললে,—পারবো।

তারকনাথ বললে,—কি করে সে হবে ? কি বলে  
খাতায় খরচ লিখবে ?

মেঘনাথ বললে,—বাবুর টাকা থেকে দেবো না।

—তবে ?

—আমি নিজে থেকে দেবো।

তারকনাথ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে,—সে  
কি করে হয় ?

মেঘনাথ বললে,—আমাব জ্বর গায়ে গহনা আছে  
হু'একখানা।

তারকনাথ ইতস্তত করতে লাগলো, বললে,—সে  
হয় না।

মেঘনাথ হেসে বললে—কেন হবে না ! না হয় ধাব  
বলে নিয়ো। পরে শোধ করো।

খানিক ভেবে তারকনাথ বললে—বেশ ! হাণ্ডনোট  
লিখে দেবো।

মেঘনাথ বললে—হাণ্ডনোটের দরকার নেই। তুমি  
মনিব, আমি চাকর !

তারকনাথ বললে—তাও কি হয় ! হাণ্ডনোট  
নিতে হবে, না হলে আমি জেলেই যাবো, আটকাতে  
পারবে না।

মেঘনাথ বললে—তাতে পৌঁছব নেই। আচ্ছা,  
হাণ্ডনোটই দিয়ো। মোদা চাল গুথরে ফ্যালো। না  
হলে এর পর আর টাকার জোগাড় হবে কোথা থেকে।

তারকনাথ বললে—নিশ্চয় ! সে কথা আর বলতে।

টাকাটা জোগাড় হলো। তারক হাণ্ডনোট লিখে  
দিলে। মেঘনাথ সেটা হাতে নিয়ে একটু হাসলো।

৩

মাসখানেক তারকনাথ বেশ রইলো। কিন্তু সে ঐ  
মাসখানেক মাত্র। একবার যে বাহিরে আনন্দের স্বাদ  
পেয়েছে, সে কখনো থাকতে পারে সে বাহিরে ছেড়ে ?  
খুব সতর্কভাবে আবার সে বাহিরে আনাগোনা শুরু  
করলো।

কথাটা ক্রমে কেমন করে আভাসে-ইঙ্গিতে কর্তার  
কাণে পৌঁছলো। তিনি মেঘনাথকে ডেকে বললেন—  
তারকটা বয়ে গেছে, শুনচি।

মেঘনাথ যেন আকাশ থেকে পড়েছে এমন ভাব  
দেগিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কিছু বলল না।

কর্তা তারকনাথকে ডাকালেন, বললেন—এত টাকা  
পাছ কোথায় ?

তারকনাথ বক্তৃষ্টিতে মেঘনাথের পানে একবার  
তাকিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো। মনে মনে  
গর্জালো—বেইমান !

কর্তা বললেন—কলকাতা ছেড়ে সবাই দেশে যাচ্ছি,  
তোমার লেখাপড়াও সাজ কবো। ঢের হয়েছে ! আর  
এখানে থাকা হবে না।

বাপের মুগের উপর কথা কইবে, এমন সাধ্য ছেলের  
ছিল না। ছেলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

তাবপর সত্যই একদিন কর্তা তারকনাথকে নিয়ে  
দেশে চলে গেলেন, কলকাতার কাববাব দেখতে রইলো  
শুধু মেঘনাথ।

পাঁচ-ছ মাস পরে মেঘনাথের ডাক পড়লো দেশে।  
তারকেব বিবাহ।

এই বিবাহ-ব্যাপারের পিছনে মস্ত এক কাহিনী  
ছিল।

জমিদার-বাড়ীর অনতিদূরে এক গবীর ব্রাহ্মণ ছিল।  
কথকতা ছিল তার জীবিক। কর্তা দেশে ফিরে বাড়ীতে  
কথা দিলেন, আর এই কথকতার সূত্রে ব্রাহ্মণ-পরিবারের  
সঙ্গে জমিদার-বাড়ীর বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হলো। কথকের  
নাম কেশব ঠাকুর।

কেশব ঠাকুরের সংসারে তার জ্ঞী, এক ছেলে, আর  
মেয়ে—চুম্বিক। চুম্বিকির বয়স চোদ্দ-পনেরো বছর।  
ছেলেটি ছোট ; সাত-আট বছর বয়স। কেশব ঠাকুরের  
পয়সার অভাব খুব বেশী। জমিদার-বাড়ীতে প্রবেশ-পত্র  
পেতে চারিধার দিয়ে সে-বাড়ীটিকে সে ঘিরে কেলে।  
কথকতার সময় জ্ঞী-কস্তাও জমিদার-বাড়ীতে আসতে  
যেতে লাগলো। আজ মেয়ের একখানা কাপড় চাই, কাল  
জ্ঞীর কি একটা ব্রত, তার খরচ চাই—এমনি নানা  
আদারে কর্তাকে সে ব্যস্ত করতো। তার কথকতার তুষ্টি  
হয়ে কর্তা তার সে আদার রক্ষা করতেন।

কেশব ঠাকুর বুদ্ধিমান জীব। কর্তার শরীর একটু  
অসুস্থ হলে মেয়েকে তাঁর সেবা করতে পাঠাতো, নিজে  
গিয়ে মাথার হাত বুলিয়ে দিত—অর্থাৎ এ সবগুলোর  
দিকে তার এতটুকু শিথিলতা ছিল না। এরই ফাঁকে  
চুম্বিকির সঙ্গে কখন এক সময় যে তারকের আলাপ

পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, সে খবর কর্তা রাখেননি, রাখবার দরকারও তিনি বোধ করেননি। কারণ, তাবক দেশে এসে বাপের কাছে বসা, বাপের কাই-করমাস খাটা এমন কাজে বাপের মনের নষ্ট-বিখাসটুকুকে আবার জাগিয়ে তুলছিল।

চুম্কির সঙ্গে মেলা-মেশা তার চলছে, এ সংবাদ কেশব ঠাকুর আর তার জ্বরী অজানা ছিল না। কেশব ঠাকুর বাড়ীতে বসে আছে, তারক চুম্ করে গিয়ে হাজির। এসে তার কথকতার তারিফ করতে লাগলো। চুম্কি পাণ সেজে আনতো, কাছে বসতো। কত গল্পই হতো। কেশব ঠাকুরের জ্বীও হয়তো গল্প শ্রুত করে দিলে, নিজেদের অভাবের কথা, দেশের কথা, এমনি পাঁচ কথা; তারকও সে কথায় প্রাণ খুলে যোগ দিত। তারপর বেলা পড়ে আসচে দেখে ঠাকুর কথকতায় বেরিয়ে পড়তো, তারকের গল্প আর শেষ হতো না—কাজেই সে থেকে যেত! ক্রমে চুম্কির মাও সংসারের কাছে উঠে যেত, চুম্কি তখন তারকের সঙ্গে গল্প শ্রুত কবে দিত।

আলাপটার সূত্রপাত হয় এমনি ভাবে, কিন্তু ক্রমে সে আলাপ নিবিড় হয়ে উঠতে লাগল। কথকতা সেরে বাড়ী ফিরে ঠাকুর কতদিন দেখেচে, কলকাতার ইন্দ্রজাল-ময় কাহিনী আর বড়মাহুয়ার প্রলুব্ধ গল্পে বর্ণনায় তারক যেমন তন্ময়, চুম্কিও ঠিক তেমনি আগ্রহে সে সব গল্পের রস পান করছে। ঠাকুর এ সবের মধ্যে নির্দোষ সরল ভাবটুকু দেখতো। তবে তারক তরুণ যুবা আর চুম্কি তরুণী। এই সব গল্পের ফাঁকে ফাঁকে দুজনের মন যে দুজনের দিকে বহুদূর অগম্য হয়ে গেছে, এ খবর কেউ রাখেনি। চুম্কিও বোধ হয় নয়! সরলা গ্রাম্য বালিকা সে!

তারপর একদিন চুম্কির বিবাহের সন্ধর্ভ হয়ে গেল পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে। কর্তা খরচ দিতে বাজী হলেন। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটলো!

বরের এক আত্মীয় রমণী গায়ে হলুদের ছাঁদিন আগে কুটুম্ব-বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর দুর্দমনীয় সাধ হলো, বেড়াতে বেড়াতে গিয়ে মেয়েটিকে একবার দেখে আসবেন। ঐ তো ও-পাড়ার ঘর।

রোদ তখন পড়ে এসেছে। চুম্কিদের বাড়ীতে কেউ ছিল না। তিনি এসে দাওয়ার বসে ছিলেন, এমন সময় ঘরের মধ্যে একটা শব্দ হতে তিনি উঁকি দিয়ে দেখেন, চুম্কিকে বৃকে জড়িয়ে ধরে তারকনাথ!

তারক বলচে,—আজ বিদায় নিতে এসেছি, চুম্কি। তুমি শবের হতে চলছ, আর কি তোমায় দেখতে পাবো।

আত্মীয়টি পল্লীগ্রামে এলেও সে ধরণের লোক নন।

তাঁর রস-বোধ আছে—বাংলা উপজাতিও হুঁচকানো পড়ে

ফেলেছেন; এ রকম কথার অর্থ উপজাতি পড়ে যথেষ্ট তিনি বুঝতে পারেন। এ কথাটুকু শুনে বাকী তিনি কলনার সাহায্যে বৃকে নিয়ে পালিয়ে এলেন! এসে এই ব্যাপার রাষ্ট্র করে দিলেন।

লোকের মুখে মুখে এ কথাটা পল্লবিত হয়ে কর্তার কাণে এসে যখন পৌঁছল, তখন তিনি তার মধ্যে একটা বীভৎসতারও ইঙ্গিত পেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কেশব ঠাকুর ফোঁশ করে এসে পড়লো, বললে,—বরেরা বলেছে, ও মেয়ে নেবে না। উপায়?

কর্তা কিছু জানতেন বলে জিজ্ঞাসা করলেন,—কারণ?

কেশব ঠাকুর বললে,—তারক বাবাজী—বলেই সে কেঁদে উঠলো!

বিশী কুৎসিত জনরব আর সঙ্গে সঙ্গে এই কারা! কর্তা বিষম জলে তারককে ডাকালেন; বললেন—কৈফিয়ৎ?

তাবকনাথ চুপ কবে দাঁড়িয়ে রইলো! কর্তা বললেন,—বলো—

তারকনাথ বললে—চুম্কি নির্দোষ নিষ্পাপ!

কর্তা বললেন—আর তুমি?

তারকনাথ কোন ভয় না রেখেই বললে—মুহূর্তের দুর্বলতা মাত্র! আরো বললে, এর আগে সে কখনো চুম্কির অঙ্গ স্পর্শ করেনি বা এ-ভাবে তার মনে কখনো জাগেনি!

কেশব ঠাকুর বললে—ও মেয়ের উপায়? বলেই সে চোপেব জল মুছলো।

কর্তা বললেন,—খামো! তারকনাথকে বললেন—চুম্কিকে বিয়ে করতে পারো?

তাবকনাথ চুপ। কর্তা হাঁকলেন—বলো!

খুব আন্তে তারকনাথ বললে—বিয়ে?

কর্তা বললেন,—নয় তো কি! উপজাতির খেলা খেলতে এসেচো! বটে! কাপুক! জীবনটা উপজাতি নয়।

তারকনাথ বললে—বিয়ে! তা কেন?

কর্তা বললেন—বিয়ে তোমায় করতেই হবে! অত-বড় মেয়েকে তুমি যখন স্পর্শ করেচ, তখন সমাজে কেউ কি আর ওকে বিয়ে করতে চাইবে।

সকলে চুপ। কর্তা আবার বললেন,—যদি বিয়ে করতে না পারো, তবে কেন গিয়েছিলে তার কাণের কাছে ও-সব কথা বলতে? তার সামনে প্রলোভনের জাল পাততে?...তোমায় বিয়ে করতেই হবে চুম্কিকে। না হলে...

কর্তা এক মুহূর্ত থেমে আবার বললেন,—নাহলে আমি পণ করলুম,—তোমায় এক পয়সা দেবো না, ত্যজ্য-পূজ্য করবো। আর ঢ্যাট্টা দেব যে, চুম্কীকে যে বিয়ে করবে, আমার এই সমস্ত সম্পত্তি তার।

সেখানে আমলা-গোমস্তা হুঁচকানো আরো জড়ো

হয়েছিল। কারো মুখে কথা ফুটলো না—সকলে চুপ।  
কর্তা বললেন,—জবাব দাও। বিয়ে করতে পারবে?...  
বিয়ে করবে?

তারকনাথ ঘাড় তুলে বললে,—করবো!

কর্তা কেশব ঠাকুরকে বললেন,—বাও ঠাকুর।  
বলোবস্ত সব ঠিক রইলো। আমি গিয়ে এখন তোমার  
মেয়েকে আশীর্বাদ করে আসিগে, চলো। পরশুই গায়ে  
হলুদ—আর বিয়ের দিনও ঠিক এটিলো। শুধু বব বদল  
হলো। বর আমার কান্তিমান পুত্র জ্ঞানান তারকনাথ  
চৌধুরী।

কেশব কর্তার পায়ে কাছ লুটিয়ে পড়লো। কর্তা  
বললেন,—ভক্তি রাখো। ওঠো, বাড়ী যাও।

মেঘনাথ দেশে আসতে কর্তা তাকে সব কথা বল-  
লেন। শুনে মেঘনাথ বললে,—বেশ করেছেন। আপনার  
যোগ্য কাজ।

রাত্রে মেঘনাথের ঘরে মেঘনাথ শুতে যাবে, এমন  
সময় তারক এসে কঁদে পড়লো; বললে,—আমায়  
বীচাও। তোমার কথা বাবা শোনেন—বাবাকে বলো।  
নাহলে আমার জীবনটা চরমাব হয়ে যাবে। একটা  
হা-ঘবেব মেয়েকে বিয়ে! চুম্বিক হবে আমার জ্ঞী!—  
না, না।

মেঘনাথ বললে,—ঠাণ্ডা হয়ে বসো,—বোঝো  
ব্যাপার। সমস্ত ঘটনা খুলে বলো দিকিন।

তারক তখন মেঘনাথকে সব কথা খুলে বললে;  
কিছুই গোপন করলে না। শুনে মেঘনাথ বললে,—  
বলো দিকি তবে, তুমি তাকে বুকে জড়িয়ে ঐ সব কথা  
বলেছ, সে-ও যদি তোমায় ভালোবেসে থাকে?

তারক বলে উঠল,—হাই, হাই! পাড়ার্গেয়ে ছুও  
মেয়ে—সে অত বোঝে কি! আর বুঝলোই বা...

মেঘনাথ বললে,—তাই যদি তুমি তাকে পাড়ার্গেয়ে  
ছুত বলেই জানো, কেন গিয়েছিলে তবে ওরকম  
কেপেঙ্কারী করতে! পাঁচজনের কাছে মেয়েব যে নিষে  
হলো...

তারক বললে,—তোমায় সব বগছি, বাবাকেও  
বলেছি—মুহুরের দুর্বলতা! ওর কথা ভাবতে ভাবতে  
হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল। এমনও মনে হলো যে  
ওকে ভালোবাসি; ও পর হয়ে যাচ্ছে! তাই। কিন্তু  
বিয়ে.....তা হতে পারবে না।

মেঘনাথ বললে,—তার মানে? বিয়ে করবে না,  
অথচ ভালোবাসবে...অর্থাৎ?

তারক বললে,—অর্থাৎ-টর্থাৎ নেই, হঠাৎ মনে হলো।  
ওদের বাড়ী গিয়েছিলুম,—ওকে দেখে মনটা কেমন হয়ে  
গেল, তাই।

মেঘনাথ বললে,—তাই, এত-বড় অবিচার তুমি

করতে চাইছো! তোমার দুর্বলতার জন্ত সে একথা'র  
পড়ে থাকবে,—আর রাজ্য'র লোক আড়ল দেখিয়ে যত  
কুংসিত কথা বলবে, বিশ্রী ইঙ্গিত করবে! ওকে এ  
অবস্থায় যদি তুমি ত্যাগ করো, তাহলে ওর দশা কি হবে  
বলো দিকি? অথচ ও কি করেছে? ও তোমার গলা  
থরে বলতে যায়নি যে, ওগো তোমাকে না পেলে  
আমি মরি!

তারক চটে উঠলো; রেগে বললে,—তুমি আর বড়  
বড় কথা শুনিয়ো না। তোমার কাছে নীতি শিখতে  
আসিনি...বাবাকে তাহলে আমার হয়ে বলতে পারবে  
না?...কিছু টাকা ফেলে দিলে একটা পাত্রের অভাব হয়  
কখনো! এখানে না হয়, কলকাতায় হাজার হাজার  
পাত্র পাওয়া যাবে'খন।

মেঘনাথ বেশ শাস্তস্বরে বললে,—বাবু আমার সব  
কথা বলেছেন, আমার মতও জানতে চেয়েছিলেন।  
আমি বলেছি, তাঁর যোগ্য কাজ তিনি করেছেন।

—মোসাহেব, খোসামুদে—বলে তারকনাথ উঠলো।  
বললে,—আচ্ছা, এ্যায়সা দিন নোহ রাহগা। আমা'রো  
দিন আসবে, আসবে একদিন। বলে সে চলে গেল!

তারপর বিয়ে হয়ে গেল। কর্তা ঠিক বধূর যোগ্য  
আদরে-সম্মানে চুম্বিককে ঘরে নিলেন। গহনায় তার  
সর্দাপ মুড়ে দিলেন—মা বঁলে ডেকে তাকে বুকে চেপে  
ধরলেন। গর্বিবেব মেয়ে রাজরাণী হলো।

তারকের সঙ্গে তার মনের সম্বন্ধ কেমন দাঁড়ালো,  
বাইরের লোক তা জানতেও পারলো না; তবে বাহিরে  
তারকের এতটুকু বিদ্রোহীর ভাব কেউ দেখতে  
পেলো না। তার পর সংসার যেমন চলছিল, তেমনি  
চলতে লাগলো। মেঘনাথ কলকাতায় চলে এলো কার-  
বার দেখতে, আর কেশব ঠাকুর সপরিবারে এসে জমিদার-  
বাড়ীতে 'সাই নিলে।

এর বছরখানেক পরে মেঘনাথের ঘরে কতাদার  
আসন্ন হয়ে উঠলো। বিস্তর খুঁজে একটি পাত্র জুটলো—  
—কলেজে পড়চে—খাকবাব বাড়ী একখান 'আছে;  
দেশে জমিজমাও কিছু আছে। তারা চেয়ে বসলো,  
হু'হাজার টাকা।

এখন এ টাকার জোগাড় হয় কি করে! জ্বর গায়ের  
গহনাগুলি তারকেরদেনা মিটুতে সে তো বছকাল খয়রাৎ  
কবে বসেছে—তারক এখনো সে টাকা দেখনি! সে নিজে  
ফেরৎ না দিলে মেঘনাথ কখনো মুখ ফুটে বলতে পারে,  
—টাকাটা দাও গো, দরকার পড়েছে? প্রাণ গেলেও  
মেঘনাথ সে কথা বলতে পারবে না!

শেষে একদিন একটা সুযোগ ঘটল। কর্তা আবার  
হঠাৎ কলকাতায় এলেন সপরিবারে।



মেঘনাথ চুমকিকে দেখলো। ঘোবনের স্পর্শে তার রূপ উথলে উঠেছে বটে, কিন্তু মুখখানি কি এক বেদনায় ভরা! মেঘনাথের মনে পড়লো, তারকের সে রাত্রের সেই সব কথা। জ্বী বলে চুমকিকে সে কি গ্রহণ করেছে? চুমকির মুখ দেখে তা তো মনে হয় না। তবে কি সেই শাসন—সেটাকেই সে মনের মধ্যে বড় করে রেখেছে? চুমকি কি সে রূঢ় বিরূপ মনকে নিজের দিকে ফেবাত্তে পাবেনি?

সে একদিন বললে,—চুমকি মা, তোমার মুখখানি এমন শুকনো দেখছি, কেন? তবে কি...

কথটা মুখে বেধে গেল। প্রশ্ন আব কবা গেলো না। চুমকি যুঁহু হেসে বললে,—মুখ আমার শুকনো হবে কেন কাকা?

ছেলেবেলা থেকেই চুমকি মেঘনাথকে গ্রাম-সম্পর্কে বলে,—কাকা! গলাটা একটু সাক করে মেঘনাথ আবার বললে,—তারক যন্ত্র টক্ক কবে তো মা?

ছোট্ট কথটুকু! এ কথার জবাব মিললো না। তবে এই কথার আঘাতে চুমাক কতখানি মুষড়ে গেল, মেঘনাথের নজরে তা এড়ানো না।

চুমকি চলে গেল—আর মেঘনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

সেই দিনই রাত্রে কতটা মেঘনাথকে ডেকে বললেন,—তোমার বাড়ী গেছলুম হে আজ বিকেলে। ই্যা, তা তোমার মেয়ে শিবা যে বেশ বড় হয়েছে, দেখলুম। ওব বিয়ের সখন্ধ-টখন্ধ দেখচো?

মেঘনাথ তখন সব কথা খুলে বললে। কর্তা বললেন,—হু'হাজার টাকা! বেশ, ও টাকা আমি দেবো। ধার নয়। ও টাকা তোমার পাওনাও, এতদিন তুমি কাজ করছো, কখনো কিছু 'বোনাস' দিইনি তো। ভেবেছিলুম, এখন থাক—যেয়েদের বিয়ের সময় দেবো, সাজসজ্জা হবে, কাজে লাগবে।

মেঘনাথ যেন স্বর্গ হাতে পেলে। কৃতজ্ঞতার তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরলো না!

তার পর কথায় কথায় আরো তিন মাস কেটে গেল। কর্তা এর পর আর কোনদিন টাকার কথা পাড়েন নি—মেঘনাথও মুখ ফুটে সে কথা তুলতে পাবে নি।

এমনভাবে আরো ক'মাস কাটবার পর হঠাৎ একদিন কর্তার ঘরে মেঘনাথের ডাক পড়লো। তারক সেখানে উপস্থিত ছিল। মেঘনাথ আসতে কর্তা বললেন,—দ্যাখো মেঘনাথ, তোমাকে আমি একটা কথা বলে রাখি। আমি মারা যাবার পর কি হয় না হয় আমি দেখতে আসবো না; কিন্তু বর্তমান বৈতে আমি, আমার হুকুম রইলো, তারকের জন্ত যে মাসহারা বরাদ্দ করে দিছি, তার

উপর এক পাই-পরসা ওকে কেউ দেবে না। ওর চাল-চলন আবার একটু অজ্ঞ ধরণের হচ্ছে, দেখছি। কাল-

তারক ঘব থেকে সরে পড়বার উত্তোগ করছিল, কর্তা বললেন—দাঁড়াও।

তারক দাঁড়ালো।

কর্তা বললেন,—কাল বাত্রে বৌমার হঠাৎ খুব অসুখ হবে। আমাদের কেমন ঘুম হচ্ছিল না, হীককে ডাকালুম। সে আমাব পা টিপে দিচ্ছিল; হঠাৎ একটা কাতগানি শব্দ শুনে সে বলে উঠলো, কে কান্দচে, কর্তাবাবু। বলেই সে উঠে গেল, ফিবে এসে বললে, বৌমা মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন হঠাৎ,—খাটের কোণে লেগে মাথায় খুব চোট পেয়েছেন। আমি উঠে গেলুম,—গিয়ে দেখি, মাথা কেটে গেছে; আব দেবাজটা খোলা! কি ব্যাপার? বৌমা বললেন না! কিন্তু আমি তখন খোঁজ নিলুম, তারক বাবু কোথায়? রাত্রে উনি বাড়ী ছিলেন না। অবশ্য কেউ কিছু না বললেও এটুকু বুঝি, বাবু এই প্রথম বাহবাস নয়। কীঘের মুখে শুনলুম, আজ দুদিন বৌমার জ্বর,—তার উপর উনি এসে দেবাজের চাবি চেয়েছিলেন, বৌমা শুনতে পাননি—তাঁবও বসু সয়নি—বৌমার আঁচল থেকে চাবি নিয়ে তিনি দেবাজ খুঁজছিলেন,—দেবাজ-খোলার শব্দ পেয়ে বৌমা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েন, চোর ভেবে চাঁৎকার করেন, তখন বাবু তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একছড়া সোনার হার নিয়ে সরে পড়লেন। ব্যাপারটা তখন আমি জানতে পারি নি—আজ কথায়-কবায় সব কথা প্রকাশ হলো। কাল যে জানিনি, এটা তারক বাবুর সৌভাগ্য। নাহলে তখন আমি পুলিশে খবর দিতুম। যাক, আমার সাক কথা—তুমিও সাক্ষী থাকো—বিষয়-সম্পর্কে তারকবাবুর যদি বিন্দুমাত্র সোভ থাকে, তাহলে এই চৌধুরিত্তিটা বাড়ীতে না করে বাহিরে বরং তার চেঁচা দেখুন। নাহলে সমস্ত বিষয় আমি বৌমার হাতে দিয়ে যাবো,—আর ঐব জন্ত দুবেলা দুমুঠো অল্পের ব্যবস্থা শুধু থাকবে!...আর তোমাকেও বলি, তোমার উপর আর একটি ভাব দিলুম, আজ থেকে নজর রাখবে, সদর-দেউড়ী যেন রাত দশটায় বন্ধ হয়, আর তার পর ভিতর-দিকে চাবি বন্ধ হবে, সে চাবি থাকবে তোমার কাছে। সকালে উঠে আমি দেখতে চাই, রাত্রে কে বাড়ীতে ছিল, কে ছিল না। তা দেখা হলে আমার সামনে চাবি খোলা হবে। বুঝলে? তারপর তারকের পানে চেয়ে বললেন,—তুমি এখন যেতে পারো।

তারক চলে গেল। মেঘনাথও চলে আসছিল,—কর্তা একখানা ইন্সিগুর-খাম তার হাতে দিয়ে বললেন, এতে দু'হাজার টাকার একটা ছাঁও আছে, খাতায় জমা

করো। এটা ভাঙ্গিয়ে ভূমিই রাখো গে, তোমার মেয়ের বিয়ের টাকা।

কৃতজ্ঞতার মেঘনাথের বুক উথলে উঠলো। সে কর্তার পায়ে পড়বে ভাবছিল, কিন্তু ভয় হচ্ছিল, কর্তা এ-সব উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি পছন্দ করেন না! সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে,—এখন আপনার কাছেই টাকাটা এনে দি। দরকারের সময় নিয়ে যাবো।

কর্তা বললেন,—নাহে না, বোঝো না, আমার মন যা হয়েছে, সব সময় ভুল হয়ে যায়। কখন ভুলে যাবো আর তুমিও হাজার দরকার হলেও মুখ ফুটে চাইতে পারবে না—

মেঘনাথের মুখে খানিকক্ষণ কথা ফুটলো না। কর্তা বললেন,—খাতায় হুঁখানা জমা করে নাও, তারপর খরচ—দাঁড়ও, হ্যাঁ, ওটা একটু অজ-রকম করে লিখো—খন। আচ্ছা, খরচ লেখা এখন থাক—মেয়ের বিয়ের দিনই নাকি তাকে আশীর্বাদী বলে' খরচটা ফেলা যাবে। ও টাকা তারই তো প্রাপ্য, তোমার নয়। সেই ঠিক হবে। কি বল? আচ্ছা, এখন যাও—

কথাটা বলে' মেঘনাথকে কৃতজ্ঞতা জানাবার তিলাঙ্ক অরসর না দিয়েই কর্তা সে ঘর ত্যাগ কবলেন।

৫

তারপর মেঘনাথের সঙ্গে তাবকের কথাবার্তা এক রকম বন্ধ হয়ে গেল। মেঘনাথকে দেখলে তাবক ভিতরে ভিতরে গর্জ্জাতে থাকতো, আহত সাপের মত। এই সরকারটার সামনে তার মাথা বার-বার হেঁট করানো! বাপের উপর বাগ হতো খুব, মাঝে মাঝে ভাবতো, এ-সব অত্যাচারের প্রতিশোধ সে যদি তুলতে পারতো! কিন্তু কেমন করে তোলা যাবে? কেমন করে?

প্রতিশোধের আগুন ঠিকরে ছিটকে গিয়ে পড়তো বেচারী চুম্কির উপর। সেই তো এ বেড়া আগুনে তার জীবনকে দগ্ধে তুলেচে! তার সঙ্গে যদি দেখা না হতো, তাহলে মনের সে দুর্জলতা প্রকাশ পেতো না, আর চুম্কিকে নিজের জীবনের সঙ্গে এমনভাবে বেঁধেও ফিরতে হতো না! তারপর,—এ মেঘনাথ যদি একটু মনে করতো! কর্তা তার কথা শোনেন,—কর্তাকে একটু যদি সে বুঝিয়ে বলতো যে, কলকাতায় হাজার হাজার পাত্র মিলবে চুম্কির জন্ত—সেখান থেকে একটা ধরে এনে চুম্কিকে তার হাতে তুলে দেওয়া—হাজারখানেক টাকার ওয়াস্তা বৈ নয়—হাজার টাকা দিলে কত পাত্র লালারিত হয়ে ছুটে আসতো! তা নয়, সে সময় উনি সাধু মন্ত্রী সেজে বসলেন। কাপুরুষ পাণ্ডী মোসাহেব!

তারক ভারলে, যাক, কর্তা অমর নন,—একদিন তার দিমও আসবে। এখন গোলমাল না' করে সরে যাওয়া

যাক, তার পর সে দেখে নেবে, ঐ কথক কেশব ঠাকুরকে আর তার পাড়ারগেয়ে মেয়েটাকে!

চার-পাঁচদিন পরে এক কাণ্ড হলো। তখন গ্রীষ্ম-কাল। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। সদরের দোরের পাশে বাড়ীর মধ্যে একটা চাতাল ছিল, তার একটা জানালা ছিল বাস্তার দিকে। সেই জানালা খুলে তারি পাশে মেঘনাথ একখানা মাদুর বিছিয়ে পড়ে ছিল—ঘুম হচ্ছিল না মশাব কামড় আর গ্রীষ্মের জন্ত। এমন সময় খুব চাপা গলায় বাইরে থেকে কে ডাকলে,—মেঘনাথ দা!

মেঘনাথ চমকে উঠলো। এ যে তারক! ই্যা, এ তারি গলা!

তারক পথে দাঁড়িয়ে ডাকছিল,—মেঘনাথ দা! সদরের দোর তখন ভিতর থেকে তালা বন্ধ, আর সে চাপি মেঘনাথের কাছে।

মেঘনাথ চারিদিকে চেয়ে বললে,—এ কি! তুমি আবাব বাইরে বেরিয়েছ এই রাত্রে? কর্তার হুকুম—

মিনতি-ভরা স্বরে তারক বললে,—নেমন্তন্ন গেলুম, তারা ছাড়লে না, দেবী হয়ে গেল।

মেঘনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। কর্তাব যা হুকুম! সে যে কর্তার আদেশ কখনো অমান্য করেনি! আর এদিকে তারক—বেচারী তারক! ষত দুর্ভাগ্য হোক সে, তবু মাতৃহীন! আহা, অবুঝ বেচারী! হাজার দোষে দোষী হোক, সে যে এগনো ছেলেমানুষ! গৃহিণীর মৃত্যুর দিনের সেই করুণ দৃশ্য তার মনের পটে জলন্ত জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠলো। বিছানায় মার শিয়রে বসে ছিল তারক—তার দুই চোখে দর-বিগলিত অজ্ঞ-ধারা! সে সময় মেঘনাথই তাকে বুক চেপে নিয়েছিল!—তুল পথে সে গিয়েছে বটে, অন্ধ ঝোঁকে কাঁটার বনে গিয়ে পড়েছে—তাই বলে তাকে কি রক্ষা করা হবে না? না, না! মেঘনাথের সমস্ত অস্তর আবেগের এক প্রবল ঝড়ে হুলে উঠলো, না, না! আহা! ও যে এগনো ছেলেমানুষ! নেহাৎ মাতৃহীন বেচারী!

কিন্তু কর্তার বিশ্বাস! অমন অগাধ বিশ্বাস! তিনি যে তারককে শোধরাবার জন্তই এ-সব গণ্ডী টানচেন। এ তো নির্দম বিচারকের বিচার নয়, এ যে স্নেহশীল পিতার স্নেহের শাসন! তার মঙ্গলের জন্তই যে এ বেড়া, এ বন্ধনের সৃষ্টি! মেঘনাথ মুকিলে পড়লো। কি করবে সে—কি করবে?

ওদিকে তারক বললে,—দরজাটা খুলে দাও—

মেঘনাথ উঠে জানালায় ধাবে এলো, বললে,—আর

কখনো এমন কাজ করবে না, বলো? কর্তার হুকুম জানো তো!

তারক বললে,—জানি। কি করবো? তারা ছাড়লো না। সেখানে বলতেও পারলুম না যে বাড়ীতে বাবাব এই ব্যবস্থা। কথাটা কি ভালো শোনাতো?

মেঘনাথ বললে,—তুমি জানো, কর্তার কথা আমি কখনো অমান্য করি না। আজ সে কথা অমান্য করচি শুধু তোমার জন্ত। যে পাপ এতে হয়, তা মাথায় নিতে পারি, যদি তুমি কথা দাও যে, আর কখনো বাপের কথা অমান্য করবে না!

কাঁদ-কাঁদ স্বরে তারক বললে,—হ্যাঁ, তাই, তাই হবে—মেঘনাথ দা। লক্ষ্মীটি, তুমি দোর খুলে দাও। উপরে যেন কার সাড়া পাচ্ছি!

মেঘনাথ উঠে দোর খুলে দিলে অতি সাবধানে। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন আজ মনিবের কি মহামূল্য মণি-রত্ন অপহরণ করতে চলেছে!...ঠিক তো, চোরই সে! চোরের চেয়ে কোন্-খানটার কম! সেও যে আজ মনিবের অত বড় অমূল্য বিশ্বাস চুরি করতে চলেছে! তার গা কেঁপে উঠলো, পা টলছিল।

দোর খোলা হতে তারক বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো; আর একটি কথা না বলে একেবারে সে উপরে চলে গেল। মেঘনাথ দোবে চাবি লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

### ৬

পরের দিন মেঘনাথ এসে তার ঘরে তিসাব-পত্বর লিখে, এমন সময় কর্তা মানসনাথ সেখানে এলেন। এসে বললেন,—চাবি তো খুলে দিলে কাল, কিন্তু ওকে সামলাতে পারবে?

মেঘনাথ স্তম্ভিত! সে ভারী অপ্রতিভ দৃষ্টিতে কর্তার পানে চেয়েই চোখ নামিয়ে নিলে। এমন কুণ্ঠিত সে হয়ে পড়েছিল, যেন কত বড় অপরাধ করেছে! আর তারি লজ্জায় সে একেবারে মরমে মরে আছে! তার মুখে কোন কথা ফুটলো না!

কর্তা বললেন,—আমি ওকে শাসন করতে পারি না মেঘনাথ, এই হয়েছে মুক্টি! তবে ও বিপড়োলে,—বাঁর সম্ভান ও, আমার কাছে ওকে গচ্ছিত রেখে বিনি স্বর্গে গেছেন,—তাঁর কাছে এর পর দেখা হলে আমি ওর সম্বন্ধে কি কৈফিয়ৎ দেবো? তাঁর যে বড় সাধ ছিল, তাঁর ছেলে মানুষ হবে!...

একটু থেমে কর্তা আবার বললেন,—কালও যে রাত্রে ও বাড়ী ফেরনি, আমি তা জানতুম। একটু ভাবনাও হচ্ছিল, আমার এমন কড়া শাসন মানবে না? এ ভাবনাও হচ্ছিল, তুমি তো চাবি খুলবে না আমার কথা ঠেলে!

মাঝে মাঝে শুচ্ছিলুম, আর বাহিরের বারান্দায় এসে দেখচ্ছিলুম, ও এলো কি না। তুমি দরজার চাবী দিলে, সে শব্দ আমার কাণে গেল। আমি ভাবলুম, তাইতো, এখনো আসচে না! কি হবে? এরপর যদি বাড়ী ফেরে, কি করে দোর খোলাবে! তোমায় জানি, তুমি দোর খোলবার লোক নও!...এই বলে কর্তা একটা নিশ্বাস ফেললেন।

মেঘনাথ তখনো মাথা নীচু করে,—মাথা তোলবার তাব সামর্থ্য ছিল না। কর্তা বললেন,—তারপর একবার বারান্দায় আসতে তোমার কথা শুনলুম! কাণ খাড়া করে রইলুম। যে কথা বলে তুমি দোর খুলে দিলে, তাও শুনলুম! শুনে সে কি আনন্দ হলো—যে, হ্যাঁ, তুমি আমার কথার উপরই নির্ভর করবনি, আমার মনের ভিতরটা সবই ছেনে ফেলেছ।

মেঘনাথ বললে,—আমার ক্ষমা করুন। আপনার কথা ঠেলেছি বলে সেই অবধি আমার মনে অশান্তি জেগে রয়েছে। তার চোখ ছল-ছল করে এলো।

কর্তা বললেন,—তুমি ঠিক করেছিলে। ও অবস্থায় বাড়ীর দোর খুলে না দিলে ও তো জাহান্নামের খোলা দরজায় গিয়ে তখনি ঢুকে পড়তো।

এই অবধি বলে কর্তা থামলেন; মিনিট দুই পরে বললেন,—পারলুম না ওকে শোধরাতে!...সেই বিয়েই কাল হলো!...কেন হবে? বোঁমার কোন অপরাধ নেই। লক্ষ্মী!...হতভাগা যদি তাকে ভালো না বাসবে, তা হলে তাঁর তরুণ মনের সামনে অত-বড় প্রলোভনের ফাঁদ পাততে গেছলো কেন!...না, এর জন্তে যদি ও উৎসন্ন যেতে চায় তো ষাক! তাঁর সম্ভান হয়ে নারীর অমর্যাদা করবে? আমি তো প্রাণ থাকতে তা সহ করতে পারবো না।

পরের রাত্রে আবার তাই ঘটলো। ঠিক তেমনি সময়ে তারক এসে আবার ডাকলো,—মেঘনাথদা—

মেঘনাথ আজ রেগে উঠলো, বললে,—কাল ঐ কথার পর আজ রাত্রে আবার তুমি বাইরে আছ! আমি আজ দোর খুলবো না, কিছুতে নয়।

তারক মিনতির স্বরে বললে,—আর এই আজকের রাতটি শুধু। আর কখনো হবে না।

ইচ্ছা না থাকলেও মেঘনাথের মুখ দিয়ে তত কথা বেরিয়ে পড়লো। সে বললে,—তোমার কথার বিশ্বাস কি? তারপর দুজনেই চুপ। খানিকক্ষণ পরে তারক বললে,—দোর খুলবে না তা হলে?

মেঘনাথের অন্তর চিরে কি করুণ আর্ন্তনাদ উঠলো! সেটাকে কঠিনভাবে চেপে কোনমতে গলা সাফ করে

সে বলে উঠলো,—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। আমি কৰ্ত্তা-বাবুকে বলে আসি।

তারক বললে,—না, না। তা হলে দোর খুলে না, খুলে কাছ নেই। এষ্ট পথেই আমি রাত কাটাতে পারবো। সে বেশ নিরাপদ হবে'খন।

মেঘনাথ বললে,—রাগ করো না ভাই, আমি এখনি আসছি। কৰ্ত্তাবাবুর মত কবাবোই।

তারক বললে,—হ্যাঁ, তারপর এই বাত্রে বেগে তিনি আমার বা-ইচ্ছা-ভাই শোনান, আর নিশ্চিন্তি রাত্রে তাঁর ধমকে পাড়াপড়ণ চাকর-বাকর সবাই জেগে উঠুক, এবং আমার লাজ্জনা চোখে দেখে সকলে মুখ টিপে হাসুক—সে হবে তামাসা বেশ, না? কিন্তু আমার ও তামাসা দেখানোর সখ সম্প্রতি নেই। আমি চললুম, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে চাবি সামলে ঘুমোও।

আর এক মুহূর্ত্ত না দাঁড়িয়ে তারক তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে জানালার পাশ থেকে সরে গেল। ব্যথিত শরীহত আঁঠু জীবের মত মেঘনাথ তখনই উঠে চাবি খুলে পথে এসে দাঁড়ালো—সারা পথ জনহীন, স্তব্ধ। গায়েব আলোড়লো সার-সাব জ্বলছে—গিম-জর্জর বাতের মত স্নান!...কোথায় তারক!

মেঘনাথের মনে হলো, তার এই নিদারুণ অবস্থার আর বর্ষের হৃদয়-হীনতার সাক্ষী হয়ে আলোর খামগুলো দীপ্ত চোখে স্তম্ভিত দৃষ্টি নিয়ে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকক্ষণ পরে মাতালের মত পা দুটো টানতে টানতে টলতে টলতে সে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলো—ঢুক কদের মত তালার চাবি এঁটে মাজুরে গা গাড়ে গুয়ে পড়লো।

#### ৭

সকালে কৰ্ত্তাব কাছে গিয়ে সররের তাল-চাবি তাঁর পায়ের কাছে রেখে মেঘনাথ কাতর স্বরে বললে,—এর ভার আর কাকেও দিন। এত বড় বিখ্যাসেব যোগ্য নই আমি! সে শক্তি আমার অভাব।

কৰ্ত্তা বললেন,—কাল বুঝি তারক আবার অনেক রাত্রে এসেছিল?

মেঘনাথ বললে,—হ্যাঁ। কিন্তু আমি দোর খুলে দিইনি তাকে।...সে চলে গেল এই রাত্রে। চারিধার তখন নিশ্চিন্ত...

মেঘনাথের চোখের কোণে জল এলো।

কৰ্ত্তা খানিক স্তব্ধ থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন,—হতভাগা!...তার ভাগ্য! না হলে তার অভাব তো কিছু ছিল না!...যাক! এখনো বাড়ী ফেরেন?

—না, আমি তাকে খুঁজতে যাবো। তাই আপনার

অমুমতি চাইতে এসেছি। বলে মেঘনাথ কৰ্ত্তার মুখের পানে চেয়ে বইলো, নিতান্ত অদীর আগ্রহ নিয়ে।

কৰ্ত্তা বললেন,—যেতে পারো। প্রাণ খুলে আমি এ অমুমতি দিতে পাচ্ছি না,—তবে তোমার কৰ্ত্তব্য-বোধে যদি যেতে চাও তুমি, তাতে আমার আপত্তি নেই।

কাঁদ-কাঁদ গলায় মেঘনাথ বললে,—না, আপনি আপত্তি করবেন না। আপনার আপত্তি থাকলে আমি স্বর্গেও যেতে পারবো না।

অচপল শাস্ত্র স্বরে কৰ্ত্তা বললেন,—যাও।

মেঘনাথ বেরিয়ে গেল। এখানে-ওখানে পাঁচ জায়গায় ঘুরে সন্ধান নিয়ে-নিয়ে যেখানে তারককে পাওয়া গেল, সেখানে পা দিতে তার সারা অঙ্গ শিউরে উঠলো। ঘূর্ণায় ত্বখে সে যেন মরে গেল! এই বিশ্রী পল্লীর মধ্যে, এই ঘরে, ইতর দলেব সঙ্গে—ছি!

মেঘনাথকে দেখে তারক বলে উঠলো,—কি! দোরে চাবি লাগিয়ে রাখবে না? আমার আবাব আস্তানার অভাব!

মেঘনাথ তাবককে বুকেব মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, ধরে বললে,—এসো ভাই, ঘরে এসো! রাগ করো না।

—সরে বা তুই পিড়—বলে তারক নিজেকে মেঘনাথের গ্রাস থেকে সবলে ছিনিয়ে নিলে। মেঘনাথ সে অন্তর্কর্ত্ত ধাক্কা কোনমতে সামলে নিয়ে ছল-ছল কাতর চোখে বললে,—লো ভাই, বাড়ী চলো।

তারকের এক কথা,—না, যাবো না। মেঘনাথও নাছোড়-বন্দা। তখন একদল ইয়ার—তারার সেইখানেই ছিল,—তারককে টেনে পাণের বারান্দায় নিয়ে গেল। তারক একা,—ওদিকে এতগুলি হোকরা, সবাই এক-জোটা। এরা ভিতর থেকে তারককে কি করে উদ্ধার করা যায় ভেবে কোনো হৃদিশ না পেয়ে মেঘনাথ আকুল হয়ে উঠলো।

এমন সময় একটি কিশোরী সে ঘরে প্রবেশ করলো,—তাব মুখে একটা সিগারেট। মেঘনাথ তার পানে চেয়ে শিউরে উঠলো। কিশোরী হৃদয়ী, তার মুখে-চোখে কিসের কালি এমন ঘন ছোপ মেলেছে যে তার পানে হঠাৎ চোখ পড়লে কি এক আতঙ্কে সমস্ত প্রাণ হাহাকার করে বলে ওঠে,—নারীকে কি কালিতেই তুমি ডুবিয়ে নিয়েচো! প্রাণের মধ্য থেকে সমবেদনার একটা আর্ন্ত স্বর ডুকরে কেঁদে ওঠে! তার ঠোঁটজুটে যেন কে আগুনে পুড়িয়ে কালো করে দিয়েছে! কিশোরী এসে পুকখালি চঙে দাঁড়ালো, একটা হাত কোমরে রেখে; দাঁড়িয়ে মেঘনাথের পানে চেয়ে বললে,—আমার ঘরে গুণামি করতে এসেচো!

মেঘনাথ অত্যন্ত ভীত স্বরে বললে,—না।

বমণী গর্জিত উঠলো,—না তো কি! ধবপাকড় হচ্ছিল কিসের?

মেঘনাথ বললে,—তাবককে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেচি।

বমণী বললে,—তা যাও না নিয়ে। আমরা কি তাকে পাঁচায় পুবে বেখেছি না কি? গোলমাল দ্যাখো না—যেন চোর পড়েছে! না, ডাকাত পড়েছে! আমরা তোমাব তারককে বাস্তব-বন্দী করে রাখিনি—সে চুণী নয়, পান্না নয়—কোম্পানির কাগজ নয়। কত তারক অমন পায়ে পড়ে পিছলে সরে যাচ্ছে! হুঁঃ! তারপরেই সে বারান্দার লোকগুলির উদ্দেশ্যে বললে,—মাইরী ভাই স্তবল, যে যেতে চায়, তাকে গেতে দাও! ধরে রাখো কেন? এ সব চেষ্টামেচি আমার ভালো লাগে না।

একজন ছোকরা ঘবে ঢুকে বললে,—আমরা কি ওকে আটকে রেখেচি না কি, পাঁচু? ও যাবে না—এও ছাড়বে না।

বমণী গুরবে পাঁচুবিবি বললে,—তারক, তোমাব যা কাজ চুকিয়ে ফালো ভাই। যেতে হয় যাও, আর না যেতে চাও তো গোলমাল মিটিয়ে নাও।

তারক তখন সদলে ঘবে ঢুকলো—ঘবে ঢুকে বললে,—আমি বাড়ী যাবো না।

মেঘনাথ বলে উঠলো,—তোমাকে না নিয়ে আমি তো ফিরব না।

—বটে রে ইষ্টপিড! বলে তারক আক্রমণের উল্লাস করলে। পাঁচু বললে, না বাবু, ও সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা করতে হয় তো বাইবে গিয়ে কবো। এখানে দাঙ্গা করো তোমরা, শেষে আমি মরি থানা-পুলিশ কবে।

—পাঁচু! বলে তারক পাঁচুর হাত ধরলে, বললে,—তুমি বুঝেচো না!

পাঁচুর হাতের পানে সেই দণ্ডে মেঘনাথের নজর পড়লো। এ কি! ঐ ঘড়িওলা ব্রেশলেট—ও যে চুমকির জুজ এই চার মাস আগে কর্তা কিনে দিয়েছেন সাহেবদের দোকান থেকে! সেও কর্তার সঙ্গে গিয়েছিল। পছন্দ করবার সময় সেও যে হাতে কবে নেড়েচেড়ে দেখে ওর কারিগরির কত তাব্বিফ করেছিল!

রাগে তার সর্কান্ন জ্বলে উঠলো। ভাবলো, যাই চলে! কিন্তু না, কর্তার কাছে বড় মুখ কবে সে বলে এসেছে, তারককে নিয়ে সে বাড়ী ফিরবে! তাছাড়া এ ব্যাপাবের জুজ দায়ী সে-ই। সে যদি রাগে সদর খুলে দিত, তাহলে কি তারক এখানে এসে ভিড়তে পায়!

পাঁচু বললে,—না ভাই, আমার পষ্ট কথা, এ-সব ফ্যাসাদ আমি ভাল বাসি না।...মনে আছে সেই মিস্ত্রিদের বাড়ীর স্ত্রী-বীরের কথা? সেও এমনি এ-বাড়ী থেকে কিছুতে নড়বে না, তার বাপ মিলেও ছাড়বে না। শেষে

আমার নামে পুলিশ-কেশ জুড়ে দিলে! আমার গয়না নিয়ে টানাঠানি। বাপ মিলে নালিশ করলে কি, না,—ছেলে তাব মায়েব গয়না চুরি কবে এনেছে! ছোঁড়াকে আর আমাকে পুলিশ তখন থানায় টেনে নিয়ে গেল। পাড়ায় একেবারে কি সে টি-টিকার! সে-ও এই রকম প্রথমে সরকার আসে স্ত্রী-বীরকে ধরে নিয়ে যেতে! সে মামলায় আমার কম পরগা গলে গেছে! কি বে-ইজ্জতী! মাগো! শেষে বেতাই পাই স্ত্রী-বীরকে ছেড়ে দিয়ে!

এ কথায় মেঘনাথের একটু সাহস হলো। সে বললে,—বাবু হুকুম আছে, আমি ওকে নিয়ে যাবোই,—তা সে যেমন করে হোক!

পাঁচু বললে,—আমি বাবা কিছু জানি না। স্তবল, ফ্যাসাদ চুকিয়ে দাও ভাই। আমি এ-সব ঝামেলা ভালোবাসি না। বলে পাঁচু ঘব থেকে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ইয়াবের দলও সরে পড়লো।

তখন মেঘনাথ বললে,—ঘরে এসো তারক! শুনচো তো অপমানের কথা!

পাঁচুর ঐ-সব ইঙ্গিতে তারকেব একটু রাগ ধরেছিল। তারপর বজ্রব দল তাকে মেঘনাথের হাতে সমর্পণ কবে সরে পড়লো; পাঁচুও তাব তবফ নিয়ে একটা কথা বললে না!

মেঘনাথ বললে,—চলো।

তারক বললে,—যাবো। কিন্তু বাড়ীতে নয়। বাবার সামনে নয়। তুমি বাবাকে বলেচো এখানকার কথা?

মেঘনাথ বললে,—এখানকার কথা তিনি জ্ঞানেন না।

তারক বললে,—কি বলবে?

মেঘনাথ বললে,—আমার বাড়ী চলো। তারপর কর্তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁর মেজাজ ঠাণ্ডা করে তোমার নিয়ে যাবো।...কিন্তু একটা কথা...

তারক বললে,—কি?

মেঘনাথ বললে,—ওর হাতে যে ঘড়ি-ব্রেশলেট রয়েছে, ওটা তুমিই দিয়েচো?

তাবক বললে,—তার মানে?

মেঘনাথ বললে,—চুমকি-মাকে ঐ রকম গহনা কিনে দেওয়া হয়েছিল—তাই জিজ্ঞাসা করচি।

তারক বললে,—ও আমি নিয়ে যাবো। টাকা দেবার কথা ছিল, হাতে ছিল না, তাই...

মেঘনাথের মনে হলো, তাকে যেন হাজার বুদ্ধিকে পাকে-পাকে জড়িয়ে একসঙ্গে দংশন করলে। সে বললে,—ছি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে পাঁচুবিবি ঘরে ঢুকে বললে,—তুমি তো চললে, আর একটু পরেই যে খাট আসবে, তার টাকাটা রেখে যাও। নবাবী করে জর্ডার দিয়ে

এসেচো, এখন তার টাকা চোকাই কে? সে এসে  
চেষ্টামিটি করবে, আবার...

মেঘনাথ দেখলে, এ এক হাঁদ পেতেছে মন্দ নয়! সে  
বলে উঠলো,—কত টাকা?

দরজার পাশ থেকে সুবল বললে,—তিনশো  
পঁয়তাল্লিশ টাকা; আর কলি-ভাড়া বা লাগে।

তারক করুণ দৃষ্টিতে মেঘনাথের পানে চাইলে।  
মেঘনাথ সে দৃষ্টির অর্থ বুঝে নিলে। সে বললে,—ভাবনা  
কি! আমি ঘণ্টা দুই পরে এসে টাকা দিয়ে যাবো।  
বিলখানা নিয়ে তোমরা যেকো! তারপর তারকের হাত  
ধরে বললে,—চলে এসো।

তারক যন্ত্র-চালিতের মত মেঘনাথের সঙ্গে বাইরে  
এলো। সিঁড়িতে পা দেবামাত্র ঘরের মধ্যে একটা অষ্টহাসি  
উঠলো—সঙ্গে সঙ্গে পাঁচুর ব্যঙ্গ স্বর জাগলো,—টাকে  
নেই ইন্দ্রি, ভজ্বোরে গোবিন্দ! তারক জলে উঠে  
মেঘনাথের হাত ছিনিয়ে তিন লাফে এসে ঘরে ঢুকলো,  
বললে,—কি বললে?

পাঁচু বিছানার দিকে সরে গিয়ে বললে,—মারবে না  
কি? যে রকম কবে এলে...

মেঘনাথও তারকের সঙ্গে সঙ্গে এলো, বললে,—চলে  
এসো ভাই। বললই সে তারকের হাত ধরে ফেললে!  
তারক ধমকে দাঁড়িয়ে বললে,—ছোট লোক!

তারকের সে মৃতি দেখে পাঁচু ভয়ে চূপ করে রইলো।  
তারক বললে,—খাটের টাকা দেবো না—কি করবে  
তুমি?

পাঁচু বললে,—কি আবার করবো? যারা খাট পাঠাচ্ছে,  
তারাটই যা করবার করবে'খন। ওঃ! চোখ বাঙাচ্ছেন,  
জ্ঞানো না! বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা ঢুকব!

তারক বললে,—চোপ বও!

মেঘনাথ তারকের হাত ধরে একরকম হিঁচড়ে তাকে  
সেখান থেকে বার করে নিয়ে এলো। সামনেই একখানা  
খালি ট্যান্ড্রি দাঁড়িয়ে ছিল—তারককে তাতে বসিয়ে নিজের  
তার পাশে বসে ডাইভারকে সে বললে,—শ্রামপুকুর  
চলো।

মেঘনাথের বাড়ী শ্রামপুকুরে।

৮

তারককে নিয়ে মেঘনাথ নিজের বাড়ীতে এলো।  
ট্যান্ড্রিকে বিদায় করে সে তেল আর তোরালে এনে বললে,  
—নাও দিকি, চান করে ফ্যালো। চান করে দুটি খাও  
—খেয়ে এখানে ঘুমোও। বিকেলে বাড়ী নিয়ে  
যাবো।

তারক বললে,—তুমিও নেয়ে নাও।

মেঘনাথ বললে,—আমি—আজ্ঞা, নেয়েই নি।

নেয়ে খেয়ে আবার ওখানে যেতে হবে তো, খাটের দামটা  
দিয়ে আসতে হবে। নাহলে এখানে যদি আসে...

কথাটা কি বলে শেষ করবে, মেঘনাথ তো ভেবে  
পেলো না।

তারক বললে,—হ্যাঁ, ঐ আবার এক ফ্যাসাদ আছে।  
টাকা আছে তোমার?

চোখের কোণটা কুঁচকে তাজুল্লোর স্বরেই মেঘনাথ  
বললে,—সে হয়ে যাবে জোগাড়! তুমি চানু করো  
তো!

খেয়ে-দেয়ে তারক বাহিরের ঘরে গুয়ে পড়লো, মেঘনাথ  
ছুটলো সেই নরকে খাটের দাম নিয়ে। মেয়ের বিয়ের  
জ্ঞান কর্তী যে হুঁপু খানা তাকে দিয়েছিলেন, সেটা  
ভাঙ্গানো হয়েছিল, তা থেকে টাকা নিয়ে সে ছুটলো।

সারা পথ তার অসহ্য ভাবনা হচ্ছিল, খাট এখনো  
যদি না এসে থাকে, তাহলে প্রতীক্ষার সেই অসহ্য অধীর  
মূহূর্ত্তগুলো কি করে কোথায় সে কাটাবে! ঐ কদর্য  
জায়গায়? কিন্তু তার ভাগ্য-দেবতা প্রসন্ন  
ছিলেন। পথে সে খানিকক্ষণ পায়চারি করতেই খাটের  
মুটে এসে উদ্দয় হলো। তাদের সঙ্গে বাড়ীর মধ্যে তাকে  
আবার ঢুকতে হলো—উপর-তলার সেই ঘরে। সে  
ঘরে তখন দক্ষ্যজের অভিনয় চলেছে।

রমণী পাঁচুবার কর্কশ স্বর কাপুরুষগুলোর মিশ্র  
স্বরকে ছাপিয়ে ভংগনায় জেগে-জেগে উঠে, আর  
কাপুরুষের দল তাব বোমের আগুনে মিনতিব বারি বর্ষণ  
করতে। কথাবার্তা বা চলছিল, তা তারককে নিয়ে।  
তারকেও নামটুকু মেঘনাথের কানেও একবার গেল।  
মেঘনাথ উপরে উঠে ঘরের সামনে দাঁড়াতে তারা চমকে  
একেবারে স্তব্ধ হলো।

মেঘনাথ বললে,—খাট এসেছে। বিল দাও।

হাতের উজ্জ্বল ঘরখানাকে প্রকম্পিত করে বিলোল  
ভঙ্গীতে পাঁচু উঠে দাঁড়ালো; তার পর বাইরে এসে  
বললে,—ওমা, এই যে,—খাট এসেচে যে! তারপর  
একজনকে লক্ষ্য করে বললে,—দেখলি রে ভোলা, তুই  
বলছিলি, খাট আসবে না! সরকারটা মানা করে দিয়ে  
আসবে'খন।

ভোলা অত্যন্ত অপ্রতিভভাবে বলে উঠলো,—না,  
না, মরদ-কা বাত্ হাতী-কা দাঁত! হাজার হোক,  
ভদ্র লোক কথা দিয়েছে...

তাকে বাধা দিয়ে পাঁচু বলে উঠলো,—থাম্ বাবু,  
তোমার আর ভদ্রতার ব্যাখ্যানা শুনতে পারি না।

মেঘনাথ বললে,—কথাবার্তা তোমরা পরে করো  
বাহা। এখন খাট নাও, আর বিল দাও। দাম কেলে  
আমি বিদেয় হই।

এ কথায় পাঁচু একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লে,

বললে,—ও ভাই, শোনো এসে, একেবারে ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে দাওয়ান মশাই এসেছেন!

অপমানের ভয়ে মেঘনাথ পাণ্ডু মুখে দাঁড়িয়ে রইলো। ইয়ারের দল খাট নামিয়ে নিয়ে কুলিকে বললে,—বিল দাও ঐ বাবুটিকে।

কুলিরা মেঘনাথের হাতে বিল দিলে মেঘনাথ দাম চুকিয়ে তাতে সই নিলে, তারপর ঝড়ের গতিতে সে বাড়ী ছেড়ে পথে এসে দাঁড়ালো।

বাড়ী ফিরে সে দেখে, তাবক বিছানায় বসে আছে, ঘুমোয় নি। তাকে দেখে তারক বললে,—টাকা দিয়ে এলে নাকি?

মেঘনাথ তার পানে না চেয়েই বললে,—হ্যাঁ।

তারক বলে উঠলো,—ভারী অজ্ঞাব হলো। তার চেয়ে গোলায় গিয়ে মানা করে দিলেই ভালো হতো। খাটখানা না হয় তোমার ওখানে আপাততঃ আসতো; সে বেশ হতো। ওদেরও জ্বদ করে দেওয়া যেতো।

মেঘনাথ বললে,—না, তাতে তোমার অপমান হতো।

তারক বললে,—বয়ে যেত! ওদের কাছে আবাব অপমান! যেমন পাজী, তেমনি উপযুক্ত ওশু হতো তাহলে। ভারী ভুল হয়ে গেছে।

মেঘনাথ শাস্ত স্বরে বললে,—যাক ভাই, যা হয়ে গেছে, তার তো আর চারা নেই। এখন শুধবে যাও দিকি। কি লোকের কি বংশের ছেলে তুমি, ভাবো। ওরা তো পথের কুকুর! চাল নেই, চুলো নেই, ওদের সঙ্গে মিশতে লজ্জা হয় না তোমার? এখন থেকে প্রতিজ্ঞা করো, আবাব ও পথে পা দেবে না।

—আবার! বলে তারক এক মিনিট বাহিরের পানে তাকিয়ে রইলো, তাবপর একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে মেঘনাথের হাত ধরে কল্পিত স্বরে বললে,—তোমার এ উপকার কখনো ভুলবো না! তোমার হাজাব টাকা আমি খারি, তার উপর এটা। সব এবার শুধে দেবো। তুমি একখানা কাগজ আনো, আর একখানা এক আনার টিকিট, টাকার জন্ত একখানা হাণ্ডনোট লিখে দি।

মেঘনাথ বললে,—থাক, থাক, এর জন্ত বাস্তব হতে হবে না। সে হবে'খন।

উজ্জ্বলিত আগ্রহে তারক বললে,—না, না, আগে আনো কাগজ আর টিকিট, তারপর অজ্ঞ বখা।

মেঘনাথ বললে,—সে হবে'খন গো। এখন আর দেয়ী করে না, কর্তার কাছে যাই। সেই সকাল থেকে তোমার খপরের জন্ত তিনি অমনি হা-পিত্যেশ করে বসে আছেন ওদিকে..

তারক বললে,—কি বলবে বাবাকে?

মেঘনাথ বললে,—তাই ভাবচি।

তারক বললে,—আমায় বাঁচিয়ে বলো। বাবা যে-রকম রাগী...

মেঘনাথ বললে,—কোনো ভয় নেই। আমার তুমি শুধু কথা দাও যে আর ও পথ মাড়াবে না!

মেঘনাথের দুই হাত চেপে ধরে তারক বললে,—না, কখনো না। এই তোমার দুটি হাত ধরে বলচি। এবারকারের মত আমায় বাঁচাও।

—বেশ। বলে মেঘনাথ ঘরের কোণ থেকে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

৯

ফাঁড়া তখনকার মত কাটলো বটে, অর্থাৎ মেঘনাথের কথায় কর্তা শাস্ত রইলেন; কিন্তু তারকের বিরুদ্ধে কতকগুলো দুষ্ট গ্রহ দারুণ চক্রান্ত পাকিয়ে তুলছিল। হস্তাধিনেকেব মধ্যে এক বিপদ ঘটলো।

মেঘনাথকে দেখে পাঁচু যে একটু শিউরে উঠেছিল—তার একটা কাবণ সেই ঘড়ি-ব্রেশলেট। সেটার পামে মেঘনাথের সন্দ্বিদ্ধ দৃষ্টি অগ্নিকুলিঙ্গের মত বারবার ঠিকরে ঠিকরে পড়ছিল, সেটুকু পাঁচুর নজর এড়ায় নি। তাছাড়া এ-রকম ব্যাপারে আরো একবার সে ভারী বিপদে পড়েছিল,—বিলাগ বাবুর কাছ থেকে একখানা জড়োয়া গহনা উপহার পেয়ে। সে-বাবুটির হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হলো, হুম্ব করে একছড়া মুক্তোর কলার এনে দিলেন, তাবপর ছ'মাস না যেতেই বাবু হঠাৎ আবাব হুম্ব করে এসে বললেন, বাড়ীতে ও-গহনাটার দরকার পড়েচে, ওটা দাও! ওর বদলে অজ্ঞ কিছু দিছি। পাঁচু কিন্তু সেটা ছাড়তে পারেনি। বাবুর মিনতি-স্বর বজ্র-গর্জনে ধ্বনিত হলো, তবু না। বাবু তখন এক ফোঁজদারী মামলা জুড়ে ওয়ারেন্ট বার করে সে গহনা আদায় করেন। মেঘনাথকে এখানে দেখে ভয়ে তার বুক কঁপে কঁপে উঠেছিল—এ লোকটা তারককে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, নাছোড়বন্দা হয়ে। সে যদি এখন ফন্দী করে মামলা জুড়ে দেয় ঐ গহনার জন্ত! এ পথে রোজগার যেমন এক নিমেষে হয়, তেমনি লোকসান আর বিপদের আশঙ্কাও প্রতি মুহূর্তে! কত সতর্ক হয়ে যে চলতে হয়, তা সেই অন্তর্ধর্মীই জানেন। সেনাকি বড় বাগাহর মেয়ে...

ইয়ারেরা তখন এক উকিল ডেকে আনলো; তারপর শলা-পরামর্শের পর পাঁচুকে ফরিয়াদী করে পুলিশ কোর্টে এক মামলা রুজু হলো, তারক আর মেঘনাথের নামে। পাঁচুর নালিশ হলো এই যে, তারক তার ঘরে এসে জুলুম করতো; পাঁচু তাই তাকে সেখানে আসতে মানা করে। তারক সে মানা না শুনে চাকর মেঘনাথকে নিয়ে সেখানে আসে, প্রথমটা গাল-মন্দ চলে, তারপর ছুজনে

মিলে তার ঘরের ছবি, আলোর বাল্ব আর আয়না ভেঙ্গে দিয়েছে, তাকেও নির্দয়ভাবে লাথি-জুতো মেরে একেবারে রীতিমত জখম করেছে। প্রমাণ-স্বরূপ অঙ্গে সে আঘাতের নানা চিহ্নও আদালতে দেখিয়ে এলো।

আইনের বাঁধা কল—হাকিম শুধু তার চাকাটি ঘুরিয়ে দেবেন বৈ নয়। সেই বাঁধা কল থেকে অমনি শমন বার হলো হুজুরের নামে, পেনাল কোডের ৩২৩, ৪২৭, আর ৪৪৮ ধারা-মতে। তদ্বিরের পাকা চালে শমন চাপা পড়লো,—তখন আদালতের কলে ওয়ারেন্ট বেরুলো—এবং হঠাৎ একদিন অপরাহ্নে পুলিশ এসে মানস-নাথের দোরো হানা দিল,—আসামী হায় ?

হঠাৎ পুলিশের আবিরভাবে সমস্ত বাড়ী ত্রস্ত হয়ে উঠলো, কর্তার কাণেও খবর পৌঁছতে বিলম্ব হলো না। তিনি ব্যাপার জানবার পূর্বেই তারক আর মেঘনাথ গ্রেপ্তার হয়ে থানায় চালান হলো। বাড়ীর অল্প লোক-জন পাছু-পাছু ছুটে গিয়ে জামিন দাঁড়িয়ে তাদের খালাস করে নিয়ে এলো।

তাবপর এই মামলা এলো আমার হাতে। আর সেই তখন থেকেই মেঘনাথের সঙ্গে আমার পরিচয়।—

এইখানে বাধা দিয়া স্ত্রী বলিলেন,—সে মামলায় হলো কি ?

আমি বলিলাম,—ফেশে গেল। পাঁচুবিবি যে কটা সাক্ষী ঐ দল থেকে ঠিক করেছিল, তারা তো সব মিথ্যা সাক্ষী। ও-সব জায়গায় যারা কাড়ালেব মত ফেবে, তাদের বুদ্ধির দোঁড় আর কতটুকু! জেরার ভয় ছিল,—তাছাড়া গহনার ব্যাপার নিয়ে আমরা নালিশ করবো বলে ভয় দেখাতেই তারা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। তদ্বিরের অভাব হলো! পাঁচুও মচকালো। সে আর আদালতে হাজির হলো না। মামলা গেল কেটে।

স্ত্রী বললেন,—নালিশ করে তোমরা সে ত্রেণলেট আদায় করলে না কেন ?

আমি বলিলাম,—ওরা রাজী হলো না! তাছাড়া কর্তার এমন অসুখ হলো যে কোন মতে আদালতের হাজিরা কাটাতে পারলে এরাও গাঁটে! সেই সময় কর্তার কাছেই পরিচয় পাই, মেঘনাথ কত বড় বিধ্বাসী আর তার উপর কর্তার কতখানি নির্ভর! কর্তা তো কাজ-কারবার কিছুই দেখতেন না, বা-কিছু ভার ছিল মেঘনাথের উপর। যদি মনে করতো তো আজ মেঘনাথ মোটর চড়ে সহবের বৃকের উপর দিয়ে সতেজে চলতে পারতো।

স্ত্রী বললেন,—তারপর ?

আমি বলিলাম,—তারপরের ব্যাপার বড় কল্পণ!

১০

—কর্তার মনে ছেলের জন্ত দারুণ দুশ্চিন্তা কাঁটার মত বিধে ছিল,—বেদনায় সমস্ত অস্ত্র তাঁর টনটন করে উঠতো। যখন অসহ্য বোধ হতো তখন গুম্ হয়ে থাকতেন; কারো কাছে সে বেদনা প্রকাশ করতেন না। এর উপর যখন ঐ পতিতা নারী-সম্পর্কিত মামলার বিশ্রী ব্যাপার পাড়ায় হৈ-হৈ করে এসে দেখা দিলে, তখন তিনি তার আঘাত সহ্য করতে না পেয়ে রোগশয্যা গ্রহণ করলেন। মেঘনাথ তখন কায়-মনে প্রভুর রোগশয্যার পাশটিতে এসে আশ্রয় নিলে,—কোথায় পড়ে রইলো তার নিজের সংসার-চিন্তা, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, তারকের উচ্ছ্রান্ততার দিকে সতর্ক দৃষ্টি!

কর্তার রোগটা দাঁড়ালো শেষে অ্যাপোপ্লেক্সি! মাসে একবার হঠাৎ মুছাঁ হয়, তাতে এমন কাহিল হয়ে পড়েন যে, তার ধাকা সামলাতে এক মাস লাগে। কিন্তু সারবার জো কি! মাসখানেক যেই একটু ওঠবার সম্ভাবনা হয়, অমনি আবার মুছাঁ দেখা দেয়। ডাক্তার বলে গেল, জীবন-ঘড়ির কল-কজা আগাগোড়া বিগড়েছে, এ যা চলছে, কোনমতে দম থেয়ে, তেল পেয়ে—যে-কোন মুহূর্তে কাট করে স্ত্রীকে কেটে একদম বিকল হতে পারে! মেঘনাথ অকূল পাথারে পড়লো—এত বড় এষ্টেট ...দান-খয়রাতির উপর কতগুলো ছোট সংসার নিকল্লাটে চলে যাচ্ছে—এ কল থেমে গেলে অনেক কলই সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হবে তো!

কর্তার পাশটিতে বসে বসে সে অনেক কথা ভাবতো,—নিজের কথা, তারকের কথা, চুমকির কথা! তারকের সখকে তাব সন্দেহ হতো—যে-রকম হালকা মন তার, অসম্ভব তার পক্ষে পুরানো দল ছেড়ে পুরানো পথ ছেড়ে ঠিক পথে চলা। তবু সেদিকটার নজরও সে মাঝে মাঝে রাখছিল।

অসুখের মধ্যে কর্তা একদিন মেঘনাথকে বললেন,— ভালো কথা। তোমার মেয়ের বিয়ের কি করলে ?

মেঘনাথ বললে,—আজ্ঞে, আপনার অসুখের জন্ত ও-সব কথা বন্ধ রেখেছি।

কর্তা বললেন,—পাগল হয়েচো তুমি! আমার এ অসুখ সারবাব নয়। তুমি বিয়েটা দিয়ে ফেলো।' আমি দেখে যেতে চাই।

এ কথার দারুণ ইঙ্গিত এমন করুণ সুরে বেজে উঠলো যে মেঘনাথ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার চোখের সামনে থেকে যা-কিছু আলো-হাওয়া সব যেন চকিতে কোথায় উবে গেল! একটা জমট অন্ধকার আর গুমট এসে নিমেষে হুনিয়ার যত কিছু আলো আর হাওয়ার বৃকের উপর হিড় হিড় করে কালো পাথরের একখানা ভারী আবরণ টেনে



দিলে! কর্তা বললেন,—তারকের কিছুই করতে পারলুম না। ও ভালো হবে না, হতে পারবে না। যাক—কেন ভাবা? কেউ কারো ভালো-মন্দ নির্দেশ করে দিতে পারে না। চেষ্টা করেছি, কিছু হলো না। বলে তিনি একটা নিশ্বাস ফেললেন। তারপর আবার বললেন,—তবু দেখো। তোমার ভরসা...তাই বা কি করে হবে? ওকে যদি সুবুদ্ধি দিতে যাও, ও কি তা কাণে শুনবে? তুমিই ডাহলে ওর পরম শত্রু হবে। যাক, মিছে ভাবা! ...ভালো কথা, তুমি তোমার মেয়ের বিয়ের ঠিক-ঠাক করো। দেবী করো না।

এরপর মেয়ের বিয়ের জন্ত আর অপেক্ষা করা মেঘনাথ উচিত মনে করতে পারলো না। কিন্তু একটা মুশ্কিল ছিল। সেই ছুটির টাকা ভাঙ্গিয়ে সে তো পুরোপুরি হ' হাজার টাকা মজুত রেখেছিল—তা থেকে তারকের খাটের ব্যাপারে দাম-বাবদ তিনশোর উপর খরচ হয়ে গেছে। অথচ মাসিনার টাকা-কড়ি থেকে এমন কিছু বাঁচানো যায় না, যা দিয়ে পুঁজিয়ে তুলবে! এখন সে টাকা আসে কোথা থেকে? এদিকে কর্তা প্রতাহ তাগিদ দিচ্ছেন, দিন স্থির করো...!

অগত্যা মেঘনাথ গিয়ে ব্যাপারখানা তারকের কাছে খুলে বললে। শুনে তারক বললে,—তাই তো, এ কথা আগে আমার বলনি! তাছাড়া ও খাটের দাম দিতে তোমাকে আমি বারণ করেছিলুম, তুমি শুনলে না। মোক্কা, আমার জন্তই খরচ হয়েছে তো...তা উপস্থিত আমি দিতে পারছি না। তুমি কোনোখান থেকে জোগাড় কবো, এর পরে আমি শুধে দেবো।

মেঘনাথ বললে,—জোগাড় করা সহজ হবে কি?

তারক বললে—ভালো কথা, এক কাজ করো। বাড়ী ভাড়ার যে টাকা আদায় হয়ে আসচে, তা থেকে তিনশো টাকা আমার নামে নয় হাওলাত বলে নাও, তারপর আমিই সেটা আস্তে আস্তে শুপবো।

মেঘনাথ বললে,—কর্তাকে কি কৈফিয়ৎ দেবো?

তারক বললে,—তিনি কি আর খাতা দেখতে যাচ্ছেন এই শরীয়ে?

এই ভরসাতেই তারক এ কথাটুকু বলেছিল; কিন্তু মেঘনাথ তাতে রাজী হলো না।

তারক বললে,—আরে, টাকাটা না হয় নাই জমা করলে! এংপর আমার কাছ থেকে পেলে জমা করো, ব্যস, চুকে যাবে! এ তো আমারই নেওয়া—আমি হাত-খরচের টাকা থেকে ক্রমে ক্রমে শুধে দেবো, না হয় দিন দশ-বারো মধ্যে আর কোথাও থেকে ধার করে তোমার দিয়ে দেবো।

তারক অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করতে লাগলো, অথচ ঐ

টাকার জন্ত বিবাহের দিন পেছিয়ে দিলে কর্তা ব্যাপার-খানা জেনে ফেলবেন। তাইতো—

কিন্তু না, না, না! কর্তার টাকা তাঁর অজ্ঞানতে এমনভাবে নেওয়া...? না, এতবড় বিশ্বাসঘাতকের কাজ তার দ্বারা হবে না, মেয়ের বিয়ে না হয় যদি, তবু না!

বর-পক্ষকে মিনতি জানিয়ে একটু সময় সে চেয়ে নিলে, তারা রাজী হলো।

এং একদিন মেয়ের বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের পরদিন মেয়ে আর জামাইকে নিয়ে মেঘনাথ কর্তার কাছে আসবে প্রণাম করতে, এমন সময় খবর গেল, ভোর থেকে কর্তার অসুখ ভাবী বেড়েচে। কোথায় রইলো তখন বাসি বিয়ে, মেয়ে-বিলায়! মেঘনাথ কম্পিত বুকে ছুটলো কর্তাকে দেখতে। বাত্রে কর্তার কাছে সে যেতে পারেনি, কর্তাও মানা করেছিলেন। তবু কর্তার জন্ত নিবেদন করে খাবার সে এক ব্রাহ্মণের হাতে সন্ধ্যাবেলাতেই পাঠিয়েছিল। খবর পেয়েছিল, কর্তা খুব দ্রুত মনে সে উপহাস গ্রহণ কবেছেন, আর মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করেছেন।

মেঘনাথ ছুটে এসে দেখে, বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমেছে—সাবাদিন কল-চোড়া নানা যন্ত্রপাতি ছুঁচ ফোঁড়া নিয়ে ডাক্তারের দল হিমসিম খেয়ে গেল। কিছু ফল হলো না। সন্ধ্যার ঠিক পরক্ষণে কর্তা ইহলোকের সঙ্গে দেনা-পাওনা চুকিয়ে কোন্ অজানা লোকে যাত্রা করলেন!

এই মৃত্যুর কাঁক পেয়ে এমন দারুণ অশান্তি চৌধুরী-পরিবারে শত্রু-বাহিনীর মত ঢুকে পড়লো যে, কর্তার সুবক্ষিত ছুর্গের অধিবাসীদের পক্ষে সেটাকে বাস্তব বলে অনুভব করতে কিছু সময় লেগেছিল। কিন্তু সে কথা থাক।

এই মৃত্যু-ব্যাপারের পর মেঘনাথের অন্তঃ-চক্র কোন্ রকম দিয়ে কোথায় তাকে টেনে নিয়ে চললো, সে যেন একটা স্বপ্নের ব্যাপার! তবে এটার সূত্রপাত হলো চুমকিকে নিয়ে।

উপলক্ষ, কর্তার মৃত্যুর পূর্বদিনে চুমকির মেঘনাথের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাওয়ার সময় কর্তার কথায় সাজসজ্জা করে চুমকি যখন তাঁর ঘবে এলো তাঁকে প্রণাম করতে, কর্তা তখন তন্ন-তন্ন করে চুমকির সজ্জাভরণ দেখতে লাগলেন। ঘড়ি ত্রেণলেটের কথা উঠলো—সেটা কেন পরা হয়নি? পরে এসো...। এ কথায় খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর ক্রমে চুমকিকে প্রকাশ করতে হলো যে, তারক সেটা নিয়ে গেছে, তার এক বন্ধু দেখতে চেয়েছিল, বন্ধুর জ্বর জন্ত ঠিক ঐ প্যাটার্নের একটা গড়াবে, তাই।

চুমকি চলে গেল নিমন্ত্রণ রাখতে, আর তার অসাক্ষাতে

ডাক পড়লো তারকের। হুকুম হলো, গহনা কে বন্ধ নিয়েছে, তাকে চিঠি লেখো, গহনা এখনই ফেরত চাই। এতদিন গহনা আটকে রেখে এ কেমন বন্ধুত্ব করা! কর্তার মনে সন্দেহ যে ভাগছিল না, এমন নয়, একথাও তিনি বললেন। তারক প্রথমে চিঠি লেখার রাজী হয়ে সবে পড়ছিল, কর্তা বললেন,—উঁহু, এইখানে বসে লেখো দরওয়ান যাক্ সে চিঠি নিয়ে গহনা আনতে। তখন তারক একেবারে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো।

রাত্রে চুমকি নিমন্ত্রণ থেকে ফিরলে কর্তা তাকে ডাকালেন, ডাকিয়ে স্পষ্টই বললেন,—বৌমা, তুমি এ বাড়ীর গৃহিণী। ঐ বাড়ীতুলে হতভাগকে দেখো। সম্পত্তি তোমার, ওকে হাতে তুলে দেবে তবে ও পাবে—এই আমার আদেশ। কোনদিন স্বামী বলে ও যদি তোমার মনে শ্রদ্ধা জাগতে পাবে, তখন দান-পত্র করে এ সম্পত্তি ওকে ইচ্ছা হলে দিতে পারো। আমাব পৈত্রিক সম্পত্তি কল্‌কাতাব কতকগুলো বদ্ ইয়ার আর বদ্ জৌলোকের পায়ে ডালি দেবার জ্ঞান আমি যথের মত এতদিন রক্ষা করে আসিনি। আর তোমাব সব কাজে পরামর্শ দিতে রইলো ঐ মেঘনাথ। তাকে তুমি বিশ্বাস করো,—তাব মত এ পরিবারের হিতৈষী বন্ধু তুমি আর কাকেও পাবে না।

চুমকি তো অবাক! সে বেচারী খায়-দায়, পড়ে থাকে ঘরের একটুকো কোণে। তারক স্বামী বটে—বিবাহ হয়েছে, তাই স্বামী। না হলে স্ত্রীর দাবী, স্ত্রীর অধিকার নিয়ে তার সামনে দাঁড়াতে যাবার স্পৃহা কোনদিনই হয় নি! সেই চুমকি হবে এত বড় বাজ্যের অধীশ্বরী! আর তারক—তারই কুপাণু ভিখারী! এর চেয়ে বড় পরিহাস ছুনিয়ার আর কি হতে পারে?

কিন্তু এ-সব কল্পনাত্তেই বয়ে গেল। হঠাৎ এক দিন কর্তার মৃত্যু হলো; বিষয়-সম্পত্তির কোন ব্যবস্থাই করা হলো না। কাজেই উত্তরাধিকার-স্বত্রে তারক হলো তার একমাত্র মালিক।

কর্তা মারা যাবার পর তারক পূর্ব-মুষ্টিতে জেগে তো উঠলোই, তা ছাড়া তার মেজাজে তখন এমন রোজ রস ফুটলো যে তার আঁচের প্রার্থ্যে প্রথমে জ্বললো চুমকি, তারপর মেঘনাথ।

সেদিন ছপুর থেকে কর্তার আস্ বৈঠকখানায় ইয়ারদের নিয়ে প্রকাণ্ড মজলিস চলেছে,—গান আর পান-ভোজনের ঘট। এমন জমলো যে কিছুই আর বাচ-বিচার রইলো না। চাকর-খানসামার ফরমাস খাটিতে খাটিতে হাঙ্গরান হয়ে গেল,—চুমকির সেদিন পুরোনো জ্বরটা আবার খুব মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। মধ্যে মধ্যে তার জ্বর হচ্ছিল, কেউ সে খপর রাখতো না। কর্তার চোখে তার শুষ্ক মূর্তি দৈবাৎ ধরা পড়লে ডাক্তার আসতো,

ওষুধ আসতো। এখন কর্তা নেই,—কাজেই সে সব হাঙ্গামার আর কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

জরের ঘোরে অচেতনের মত চুমকি তার ঘরে পড়ে ছিল। মেঘনাথ কি-একটা কথা বলতে আসছিল,—এ অবস্থা দেখে সে চমকে উঠলো। বাইরে উৎসবের ঐ উদ্‌কাম নৃত্য, আর এখানে—

সে তখনই বাইরে এসে হীককে ডাকলে, বললে,—শীগ্‌গির ডাক্তার বাবুকে ডেকে আন দিকি।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজছিল। হীক বললে,—দাদাবাবু তাকে হোটেল থেকে বয়েছে গরম কাটলেট ভাজিয়ে আনতে।

মেঘনাথ জলে উঠে বললে,—রেখে দে তোর কাটলেট। আগে ডাক্তার বাবুর কাছে যা,—বৌমার বড্ড জ্বর।

হাজার হোক, হীক কর্তার আমলের লোক তো! বাবুদের জ্ঞান কাটলেট এনে তাঁদের মন-জোপানোর চেয়ে বৌমাব অস্থখে ডাক্তার ডাকতে ছোটাই তার দরকার, এটা সে বুঝলো; তাই সে তখনি ছুটলো ডাক্তারের বাড়ী।

যথাসময়ে ডাক্তার এলো, প্রেসক্‌পশন হলো; হীক আবার চললো ওষুধ কিনতে। বাবুরা বৈঠকখানায় তখন কাটলেটের দেখা না পেয়ে রেগে গরম হয়ে উঠেছেন। নতুন কর্তাবাবুর ঝাঁজালো স্ববে ডাক চলেছে ক্রমান্বয়ে,—হীক হীক, হীরে...

কোথায় হীক? হীক তখন ডিসপেন্সারীতে।

উপরে বৌমার ঘরে মেঘনাথের হাতে ওষুধের শিশি দিয়ে এসে হীক ভাবছিল, এবার যাবে কি হোটেল,—এমন সময় এক বাবু তাকে দেখে বললেন,—এই যে হীক। কাটলেট এনেছিস?

হীক বললে,—না। আনতে যাচ্ছি।

বাবুটি বললেন,—আনতে যাচ্ছিস! এখন?

তারক ভিতর থেকে বলে উঠলো,—কি হয়েছে হে?

বাবুটি বললেন,—তোমার খানসামা এখন যাচ্ছেন কাটলেট আনতে। এতক্ষণ তাঁর ফুরসৎ ছিল না!

—এখনো যায় নি?—বলে তারক সক্রোধে বাইরে এলো। বৈঠকখানায় তখন কে নাচের সঙ্গে গান ধরেছে,—

চুনরিয়াল লাল রঙি দে—

তারক বাইরে এসে হাঁকলো,—এখনো যাস নে তুই?

হীক বেশ সহজভাবেই জবাব দিলে,—না। এই যাচ্ছি।

তারক গর্জন করে উঠলো,—এতক্ষণ কি নবাবি করছিল হতভাগা?

হীক বললে,—বৌমার অস্থখ, ডাক্তার বাবুর কাছে গেলুম—তার মুখের কথা মুখেই রইলো—

তারক এগিয়ে এসে তার চুলের ঝুঁটি ধরে বললে—  
আমার হুকুম অমাজ্জ করে তোর কোন্ মনিবের আজ্ঞা  
মাথায় তুলতে গিয়েছিল।

হীক বলিল,—সেটা বেশী দরকারী।

—আবার মুখের ওপর কথা! বলে তারক ঠাস  
করে তার গালে এক প্রচণ্ড চড় বসিয়ে দিলে। হীক  
এটার জন্ত প্রস্তুত ছিল না, সে ঠিকরে শান-বাঁধানো  
উঠানে মুখ খুঁবে পড়লো। আর তার উপর তারকের  
প্রহার চললো সমানে, হুকুম আর গর্জনের সঙ্গে।

শব্দ শুনে বাড়ীর লোক-জন ছুটে এলো। মেঘনাথও  
এলো। তাড়াতাড়ি তারকের হাত থেকে হীককে  
ছাড়িয়ে নিয়ে সে বললে,—এ কি এ?

তারক বললে—অবাধ্যতার শাস্তি।

মেঘনাথ বললে,—কি অবাধ্যতা করেছে?

তারক বললে,—তোমায় তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে,  
না কি? ছোটলোক পাত্রী! সব আত্মা পেয়ে পেয়ে  
মাথায় চড়ে বসেচো, বটে!...ও সব আর চলছে না! যে  
যেমন, সে তেমন থাকবে, এই আমি দেখতে চাই।

মেঘনাথ গম্ভীর স্বরে বললে,—তারক...

তারক রুট স্বরে বললে,—বাবু বলো!...তারক!...  
আমি তোমার মনিব, এ কথা ভুলে যেয়ো না।

মেঘনাথ কোন জবাব দিলে না, গম্ভীর দৃষ্টি এক  
মুহূর্তের জন্ত তারকের মুখের উপর নিবদ্ধ করে হীককে  
ধরে তুললে, বললে,—ওঠো হীক! কলতলায় এসো।  
ঠোঁট, কেটে রক্ত পড়চে—দুটো কুলকুচি করবে এসো।

অত্যন্ত সহজ ভঙ্গীতে হীকর হাত ধরে মেঘনাথ তাকে  
নিয়ে কল-ঘরের দিকে চলে গেল। ভালো করে আপনার  
তেজ দেখাবার অবসর পেয়েও তেমন কবে সেটা  
দেখানো গেল না বলে তারক কতক নিরাশ চিন্তে বঙ্ক-  
মজলিসে ফিরে গিয়ে বসলো।

তারপর গৃহে বন্ধুদের উৎসব-আনন্দ আর ফুরায় না!  
তবে এর ধুম চলে রাত আটটা ন'টা অবধি; তারপরই  
বাহিরের আকর্ষণে একসঙ্গে কোথায় যে এরা অন্তর্ধান  
হয়ে যায়, তখন বাড়ী এমন স্তব্ধ গম্ভীর মুক্তি নিয়ে  
দাঁড়িয়ে থাকে যে দেখে মনে হয় না, একটু আগে এই-  
খানেই আমোদ-প্রমোদের অমন বজ্রা ব্যয়েছিল।

চুমকির অমুখ বাড়ের মুখেই চলেছিল,—তার জন্ত  
বাবুদের আমোদ-প্রমোদের কমতি হয়নি। মেঘনাথ  
আর হীক সমস্ত শ্রাণ-মন রোগীর সেবার উৎসর্গ করে  
দিলে। হিসাব-নিকাশের কাজ অস্ত্র সরকার দিয়ে চলতে  
লাগলো, মেঘনাথের সে দিকে মূক্তি মিলে ছিল। কর্তার  
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই টাকার তহবিল নতুন বাবুর খাশ-  
দখলে গেল। চুমকির অমুখে ঔষধ-পথ্যের কতক দাম  
সরকারী তহবিল থেকে আসছিল, কতক মেঘনাথ নিজের

গাঁট থেকে জোগান দিচ্ছিল। কিন্তু সেবার জামাই-  
বাড়ীতে একটা ভারী রকমের তত্ত্ব পাঠানোর হাজ্জাম  
পড়লো, তখন তার পক্ষে পয়সা জোগানো এক রকম  
অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাজেই একদিন সে আবার মাথা  
নত করে তারকের দবাববে হাজির হলো, বললে,—কিছু  
টাকা চাই।

তারক বললে,—কেন?

মেঘনাথ বললে,—বৌমার ওষুধ আর ডাক্তার...

তারক বললে,—ও বাবোমেসে রোগের জন্তে আমি  
বিষয় লুটিয়ে দিতে পারি না।

দুই চোখে হঠাৎ আগুন জ্বলে মেঘনাথ তার পানে  
তাকালো; পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলে, মিথ্যা  
এ স্বীকৃতি দেখানো! তবু মরিয়া হয়ে সে বললে,—বেশ,  
আমার নিজের টাকাই খরচ করবো। তুমি লক্ষ্মীছাড়া  
কাজে টাকা খরচ করতে পারো...

তারক বাধা দিয়ে বললে,—জিভটাকে একটু রাগ  
সামলে চালিয়ে। ভুলে যেয়ো না, কার সঙ্গে কথা  
কইচো!

আবার!...কিন্তু না, উপায় নেই! মেঘনাথ ধৈর্য্য  
রেখে বললে,—বেশ, তোমার টাকা চাই না। তোমার  
কাছে আমার কিছু পাওনা আছে তো,—আজ সেইটে  
শোধ করো। তাতেই যা হয়, দেখা যাবে।

তারক বললে,—আমাব কাছে পাওনা! তুমি যে  
অবাক করলে!

—মনে নেই?

—না, মনে পড়ছে না।

—হ্যাগুনোট...

—হ্যাগুনোট আছে না কি? নিয়ে এসো।

এ স্পষ্টায় মেঘনাথ আজ জলে উঠেছিল। সেও  
সহজে ছাড়বে না ঠিক করে ঘটানোবন্ধের মধ্যে হ্যাগু-  
নোটখানা এনে হাজির করলে, সেই দেড় হাজার টাকার  
হ্যাগুনোট।

তারক সেখানা নেড়ে-চেড়ে দেখে বললে,—এ যে  
তামাদি হয়ে গেছে।

—তা গেছে। ও হ্যাগুনোট শোধ করবার কথা  
কখনো মনে হয়নি আমার। আজও বলতুম না,—তবে  
আজ তোমায়ই দ্বীপ অমুখের জন্ত দরকার হয়েছে...

তারক বললে,—তুমি অতি মহৎ, তাই চূপ করে  
ছিল!—এর কত গুণ টাকা হ'হাত ভরে চালান  
করেচো?

—চূপ, চূপ, চূপ—মেঘনাথ গর্জন করে উঠলো। সে  
বললে,—আর যা বলো, বলো, ও কথা বলো না। কর্তাবাবু  
গেছেন, আজো তিন মাস হয় নি, তাঁর নিখাস-প্রশাস  
আজো এ বাড়ীর হাওয়ায় মিশে আছে এত বড় পাণ

কথা তোমার মুখে বেরুলে এ বাড়ীখানা ছড়মুড় কবে ভেঙ্গে তোমার মাথায় পড়বে।

তারক বললে,—শাপ-মণি দিচ্ছ আমাকে, আমার বাড়ীতে বসে ?

মেঘনাথ বললে,—না। তবে তুমি এত বড় কুল-জার হতে পারো!... আজ তুলে গেছ, একদিন ক'টা টাকার জগ্গ আমার কাছে কি মূর্তিতে এসে দাঁড়িয়েছিলে! তারপৰ আবার কত ব্যাপারে কৰ্ত্তাকে নতুন উঠল করতে দিই নি! হেবো না, তোমার জগ্গ সে সাহায্য করেছিলুম! যা করেছিলুম, সে শুধু তুমি স্বর্গীয় কৰ্ত্তার ছেলে বলে! পাছে তুমি অভিমানে তাঁর নামের মৰ্যাদা ধুলোয় লুটিয়ে দাও, তাই—আব কিছু প্রত্যাশায় নয়।

তারক এ সব কথা ধাক্কা সামলতে না পেয়ে কোন কথা না বলে মেঘনাথের দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে চলে গেল। মেঘনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে দাঁড়িয়ে রইলো,—ভাবলো, মুহূর্তের প্রকলিত্যয় সে এ কি ছেলে-মাসা করেছে! তারক সেদিনের ছেলে,—কি, ছি!

১২

চুমকি ওদিকে বায়না নিলে, ওষুধ সে খাবে না, কিছুতেই নয়। কেন খাওয়া? কি হবে সেবে? কি সুখের আশায়?

মেঘনাথ বললে,—লক্ষ্মী মা আমার, খাও।

চুমকি বললে,—কেন খাবো, বলো তো কাকা? আমার বাঁচাবার চেষ্টা করচো কেন? কি আমার জীবনের দাম?

মেঘনাথ বললে,—নিরাশ হচ্ছে কেন মা?

চুমকি বললে,—এখনো আমার আশা রাখতে বলো, কাকা?... স্ত্রীলোকের বিয়ে হয়, সে স্বামী পায়। আমি কি পেয়েছি?... আমার উপর যে প্রবঞ্চনা চলেছে... না কাকা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাঁচাবার চেষ্টা করো না। তুমি যদি আমার শুভার্থী হও, তাহলে এই আশীর্বাদ করো, যেন শীগ্গির আমি মুক্তি পাই।

মেঘনাথ বললে—তোমার বাবা? মা?

—তাঁরা জানেন, আমি বড়শোকের বোঁ, সুখে আছি। পাছে তাঁরা কিছু জানতে পারেন, এই জগ্গ এখানে তাঁদের আসতে আমি মানা করি, বলি,—ছি, জামাই-বাড়ী আসবে কি? আমার মাথা হেঁট হবে তাতে। খণ্ডর তাঁদের যে ব্যবস্থা করে গেছেন, তাতে তাঁদের অভাব হবে না কোনদিন।... আমি মলে তাঁরা ভাববেন, আমার বরাতে সুখ সহিলো না, তবু ভাগ্যবতী, সিংথে সিঁদুর বজায় রেখে মরেছি!

...বাঙালীর ঘরে এর চেয়ে মেয়ে-জন্মে সেরা ভাগ্য আর

কি আছে?... কিন্তু এই সিঁদুর কতখানি চোখের জল, আর কি বুক-ভাঙ্গা বেদনা সয়ে রাখতে হয়, তার 'খোঁজ কে বাখে!... চুমকি একটা নিশ্বাস ফেললে। মেঘনাথের হুই চোখে জল ঠেলে এলো।

চুমকি বললে,—কাকা, এর চেয়ে বড় প্রবঞ্চনা আর আছে? আমি গরীবের মেয়ে, আমি তো এ ঐশ্বর্যের লোভ একদিনও করিনি! আমার সমান-ঘরে যেতে পেলে বেঁধে-বেঁধে গতির খাটিয়ে সেখানে যে সুখ আমি পেতুম—চুমকির স্বর বেধে গেল।

মেঘনাথ চোখের জল মুছে বললে,—চুপ করো মা। ও সব কথা থাক।

একটা নিশ্বাস ফেলে চুমকি আবার বললে,—বড়-লোকেরা সদয় হয়ে গরীবের ঘরের মেয়ে নিতে গিয়ে যখন মহত্ব দেখান, তখন এটা কি তাঁরা ভাবে-ভঙ্গীতে বোঝান না যে, ওগো, আমাদের ঘরে মেয়ে দাও, ওকে সকল সুখে সুখী করে রাখবো। আব সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই গরীব বাপ তার বৃকের কল্কে ছিঁড়ে মেয়ে দেয় না কি? তার পব যখন সে মেয়ে স্বামী পায় না, তখন—এ কি প্রবঞ্চনা নয়?

মেঘনাথ বললে,—চুপ করো মা, এত বাঙালীর ঘরে সর্বত্র আছে। মেয়েদের উপর অত্যাচার...

চুমকি বললে,—মার-ধরই অত্যাচার নয়, কাকা। এই উপেক্ষা, আর স্ত্রীকে এই স্ত্রী বলে মানা নয়, মানুষ বলে মানা নয়,—এর চেয়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার কি আর আছে! হুঁঘা মার, মানুষের শরীরে তা সজ্জ হয়—কিন্তু মনের উপর এই মার, এর জালা কি অসহ...

মেঘনাথ বললে,—বুঝেছি মা, তোমার হৃৎকের অন্ত নেই। তবু একটা কথা মনে রেখো—ভগবান হৃৎক অমনি দেন না, নিশ্চয় তার মধ্যে তাঁর মস্ত উদ্বেগ আছে। এই হৃৎকে তোমার যা শিক্ষা হচ্ছে, তাব ফলে তোমার বাকী জীবনের জগ্গ তুমি নিজের মন থেকেই বিপুল সান্ত্বনা আর সুখ সংগ্রহ করতে পারবে, সুখ-হৃৎকের জগ্গ তোমার পবের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

—থাক কাকা, ও সব শিক্ষার আমার দাধ নেই। কচিও কোনদিন নেই।

—তবু মা, তোমার একটা কর্তব্য আছে তো সংসারের প্রতি। কৰ্ত্তা এ-সংসারের ভার তোমার হাতে দিয়ে গেছেন।

চুমকি বাধা দিয়ে বলে উঠলো,—কিন্তু তা পালন করার আমার কোনো শক্তি আছে কি? ঐ ত্র্যাকেটের উপর কাচের যে গোবা-পুতুলটা রয়েছে, ওটাকে যদি আপনি বলেন কাকা যে তুমি তোপ দেগে সামনের ঐ পাঁচিলটা উড়িয়ে দাও, বাড়ীটার আলো আশ্রুক, বাতাস আশ্রুক,—সে কি তা পারবে? ঐ নিকীর্ষ, প্রাণহীন

পুতুলটার কাছে এ-আশা করা পাগলামি ছাড়া আর কি! আমাকে কর্তব্য পালন করতে বলাও তেমনি!... আমি নিজী৷। ঐ পুতুলের সঙ্গে এইটুকু শুধু তফাৎ যে, আমি খাই দাই, বসি দাঁড়াই, জেগে থাকি ঘুমোই,—ও তাব কিছুই পারে না। নিজের ইচ্ছা কি সামর্থ্য বলে ওর যেমন কিছু নেই, আমাতো তেমনি।

মেঘনাথ বললে—কিন্তু তুমি নিজেই বলেচো মা, তুমি জেগে থাকো, বসো, দাঁড়াও, সেগুলোয় নিজের ইচ্ছা পাঠাও তো—তেমনি এ সংসারের কোনোদিকে কোনোদিন নিজের ইচ্ছাশ্রাটিয়েচো কি?—তুমি বলবে, তারক তোমার পানে চায়ই না, তা তোমার কথা শুনেবে কি? কিন্তু তুমি জোর কবে তোমার দিকে তার চোখকে চাওয়াও নি কেন? স্ত্রী বলে চুপ কবে এক কোণে পড়ে থাকলে চলে না তো। তুমি বখন স্ত্রী আর বাড়ীর বো, তখন দাঁড়াও দিকি সেই বাড়ীর বো আর তারকের স্ত্রী বর্ম্মি ধরে! কেনো মা, এ জগতে নিজীবকে সবাই পায়ে দলে যায়; কিন্তু কেউ যদি প্রাণের স্পন্দন একটু দেখায়, তাহলেই লোকে তাকে ঠেলে চলতে পারে না। এই যে তার সাহস দিনে দিনে আত্মপদ্ধি সীমা ছাড়াচ্ছে, এর একটা কারণ তোমার ঔদাসীন্ম। তুমি জোর করে তাব মধ্যে গিয়ে দাঁড়াও, তাব কাজে বাধা দাও, তার কথার মাঝে নিজের কথা ছুড়ে দাও, দেখবে, তারকের চমক ভাসবে! ক্রমে সে বুঝবে, না, একে ছেলাফেলা করা চলবে না, একে মানতে হবে। তোমার অভিমানই তোমার এ দুর্দশার কতক কারণ।

—তবে কি তুল পথে চলেছি আমি? বেশ কাকা, যদি সেবে উঠি, একবার তোমার পথেই চলে দেখবো। দাও ওষুধ।

ওষুধ সে খেলে। তারপর থেকে ওষুধ-পানি নিয়ে সে ষ্ঠিকৃষ্টি করেনি—কিন্তু হায়রে, বহুদিনকার চাপা বেদনার স্রোতের ঘায়ে যে-মন যে-দেহ ভিতরে ফেটে চৌচির হয়ে ছিল, জোড়া-তালিতে কতদিন সে টিকে থাকে! শেষে একদিন চরম মুহূর্ত্ত এসে উদয় হলো।

এই মুহূর্ত্তটি শুধু যে চূর্ম্মিকর জগৎ মুক্তি বহন করে এলো, তা নয়, মেঘনাথের ভাগ্যটাকেও এমন এক বাধনে কবে দিলে যে মেঘনাথের মুক্তির তাতে দম বন্ধ হবার সূচনা ঘটলো।

## ১০

সে এই ফান্সন মাসের কথা। সেদিন দোল-পূর্ণিমা। সকাল থেকে চূর্ম্মিক কেমন অচেতন অভিভূতের মত পড়ে ছিল। ডাক্তার আর ওষুধের ধূমে মেঘনাথ আর হীকু হিম্মিসম্মু থাকে, তবু একটু অধীর হয় নি হুজনে। মেঘনাথ সপরিবারে এসে কদিন চূর্ম্মিকর প্রাণ নিয়ে যমের সঙ্গে

লড়াই কবছিল। ডাক্তার বলেছিল,—এই পূর্ণিমার থাক্কা যদি কাটে, তবে আরো কিছুদিন যেতে পারে। অর্থাৎ ডাক্তার ত'টার দিন পূর্বে স্পষ্ট বলেছেন, যক্ষ্মা-রোগের ওষুধ আজ পর্যন্ত বার হয় নি।

শুনে মেঘনাথ চমকে উঠেছিল, যক্ষ্মা! সর্ব্বনাশ! তার কোন লক্ষণ তেমন দেখা যায় নি তো! খুব কাশি, কি মুখে রক্ত ওঠা। তবে? সে কেমন হতভয় হয়ে কলের মত কাঁজ করে যাচ্ছিল।

বাগানে বাবুদের দোলেব মাতন সেদিন সকাল থেকে পূর্ণভাবে জেগে উঠেছে। বেলা ফুটিয়ে আসতে বাবুরা আপাদ-মস্তক লাল-নৌল রঙে বাগ্নিরে বাড়ী ঢুকলেন—চাকর-পাকরকে হাঁক-ডাকের চোটে একটা হৈ-হৈ শব্দ পড়ে গেল। হীকু গেল মানা করতে, বোমার অত্যন্ত অসুখ বলে, তারা সম্মুখে গান ধরে দিলে,—

আজু হোলি খেলে নন্দলালা!

মেঘনাথ তখন গিয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ছুটো মাতালকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে বার করে দিলে।

মধুচক্রে খোঁচা দিলে যেমন হয়, তেমনি হলো তার-পরের অবস্থা। তারক চোখ বাড়িয়ে চাবুক ঘুরিয়ে বললে, নিকালো, আবি নিকালো।

মেঘনাথ বললে,—এই যে এখনি বেকুজি!...ওধারে উনি খাস টানছেন, ওঁব জীবনটুকু সাঙ্গ হোক, ওঁকে বিসর্জ্জনে নিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু রেহাই দাও। বেচারী আগাগোড়া জ্বলেছে, মরণের সময় একটু শান্তিতে তাকে মরতে দাও। সস্তীর দেহ বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আমোদ-আহ্লাদ পূর্ব্বো দমে জমিয়ে তুলো।

তারকের ভৈরব ছক্কাবের আর বিরাম নেই! ওধাবে চূর্ম্মিক মুতুশয্যায়, আর ওধারে হৈ-হৈ ব্যাপার! মেঘনাথের মনে হলো, যত্না যেন তার সেপাই-শাস্ত্রী নিয়ে আজ উৎসবে মেতেছে, দোরে হানা দিচ্ছে।

তারপর সব চুকলো। চূর্ম্মিক গেলে সঙ্গে সঙ্গে মেঘনাথ এ বাড়ীর ছায়া ত্যাগ করে গেল। হীকু দেশে চলে গেল, যাবার সময় বলে গেল, কলকাতার ছোকরা বাড়ালী বাবুর চাকরি সে আর করবে না। যে বাবুরা গলাধাক্কা খেয়ে অপমান ভুলতে পারে নি, তারা তারককে ওঙ্কাতে লাগলো, শোধ চাই। নাহলে তারা ইয়ার্কি দিতে আসবে না! আমোদের নব নব লীলাভূমিও আবিষ্কার করবে না—এমনি নানা ভয় দেখাতে লাগলো। ইয়ারদের দল এক-কাটা হলো। শোধ চাই, নাহলে এখনকার মজলিসে ইস্তফা দেবে।

তারক তখন ফন্দী আঁচতে লাগলো।...

ঠিক! ছত্তীর কথাটা সে শুনেছিল মেঘনাথের মুখে।

খাতা খুলে দেখে, ছত্তী-খবচ মেঘনাথের নামে। খাতায় লেখা, তাকে ছত্তী টাকা ভাঙ্গাতে দেওয়া হয়েছে। ছত্তী ভাঙ্গানোর পরে টাকাটা খাতায় জমা করা হয় নি। জমা করাই দস্তুর। কাছেই দাঁড়াচ্ছে, মেঘনাথের ঐ দু'হাজার টাকার গোল, তাছাড়া সেই তামাদি হ্যাণ্ডনোট আর কিছু ধার। মেঘলোব জন্ম যদি মেঘনাথ চেপে ধবে তাকে কোন দিন? তাব আগে পথ করা চাই। ট্রিকল এলেন; পবামর্শ চমলো; পুলিশে খবর পাঠানো হলো। থানা দেখে পুলিশ বসলে, এ তো পাকা কেশ! সাধা নির্দাশ। প্রমাণ খাতায়, আর সে খাতার লেখা মেঘনাথের নিজেব হাতে।

মেঘনাথ বেচারী কাশী-বাসেব উজোগ করছিল,— ছোট মেয়েটির সেইখানেই বিষেব কথা পাকা হয়ে গেছে। কাশী যাত্রার দু'দিন বাকী। পুলিশ এসে তাকে গ্রেপ্তার করলো। তারপব পুলিশ তাকে কোর্টে চালান দিল, বিচারের জ্ঞ।

কোর্টে চঠাং তাকে আমি দেখলুম, আসামীর কাঠ-গড়ায়। আমি তো তাকে চিনতুম! খবর নিলুম— কষ্টে জামিন করানো গেল। তারপব মেঘনাথ এসে এই বৃত্তান্ত আগাগোড়া আনাকে গুলে বললে।

কিন্তু হায়রে, ঐ দু'হাজার টাকা কত! যে তাকে দান করে গেছেন, তাব মেয়েব বিষেব বাজে খবচ লিখবেন বলেছিলেন শিবানীর আশীর্বাদী বলে, তা আর হলো কৈ! এ সব কথার প্রমাণ আদালতে গ্রাহ্য হয় না। লোকটার এত বড় আহুগত্য, এত দিনের ঢাকবি, খাটের দায় চোকানোর রসিদ, চুমকির রোগে সেবা—এগুলো প্রমাণ করা যায়, কিন্তু আইন ত তাতে সন্তুষ্ট হবে না! সে চায় ঐ দু'হাজারে দু'হাজার। টাকায় টাকা খাতাব

লেখায় মিলিয়ে দেওয়া চাই! হাকিমের দোষ কি! তিনি আইনের লাইন ধবে চলতে বাধ্য—একটু বে-লাইন হবার জো নেই! তাছাড়া মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করবার সাধ্য কারো নেই! তার উপর জেরায় গোটা-কতক কথা ছিঁজাসা করলে তাবক ভড়কে যে ছটো সত্য কথা বলে ফেলতো না, এমন বলা যায় না! ছত্তীর কথা এ মামলাব টেব আগে আমি শুনেছিলুম, সেই পাঁচুর মকদ্দমার সময়। জানতুম, তাই। আর এ কথা জানতো চুমকি, হীক; আব জানে তারক। কিন্তু সে ফরিদাদী, মিথ্যা বলতে সে তো প্রস্তুত হয়ে এসেছে!...ফল?

আইনের শারায় বেচারী মেঘনাথ জেলে গেল। আসামীর জবানবন্দী নেই, জেরা নেই। সাক্ষী-প্রমাণ হাজির না করলে তার কথায় বিশ্বাস করার পথও আইন নির্দেশ করে দেয় নি। কাছেই আদালত কি করবে? কিন্তু বাচিবের লোকের কাছে তাব কি পবিচয়ই না আজ বটলো। তার যথার্থ যা পরিচয়, জগতে তা চিব-গোপন থেকে গেল।

জেরা করার তার মানা ছিল—তাতে মনিবের নামে বসন্ত পড়বে! প্রাণ থাকতে দে তা সত্য করতে পারবে না। পাগল! না হলে তার আজ এ দুর্দশা!—

কাহিনী শেষ করিয়া স্ত্রীর পানে চাহিলাম, তাঁর হুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন,—একটা নির্দোষকে বাঁচাতে পারলে না, অথচ ওকালতির ব্যবসা করতে এখনো প্রবৃত্তি হয়! ছি!

হতাশভাবে আমি বলিলাম,—হুমুঠো অল্পেব সংস্থান না হলে কিসে হয়?

জ্ব কুঞ্চিত করিয়া স্ত্রী বলিলেন,—এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়াও চের ভালো!

# মনের মিল

( উপন্যাস )

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দল্লদী কবি

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

বঙ্কুবরেন্দ্র

# মনের মিল

## প্রথম পরিচ্ছেদ

ফুলচড়ি

কলিকাতার দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ছোট গ্রাম—ফুলচড়ি। গ্রামখানি ছোট তটের দিগন্ত, গ্রামের মধ্যে নানানলি, ঘের-ভিঙ্গার মাত্রা এমন প্রবল যে অনেক বড়-বড় বর্দ্ধিগ্রামও এ ব্যাপারে তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। পাড়ার-পাড়ায় স্বল্প দল—দলপতির প্রবল দৃষ্টি সর্বক্ষণ উদ্ভূত,—কোথায় কি ক্রটি ঘটিল, কাব পাণ হইতে কতটুকু চূর্ণ মসিল, সেট দিকে। বাঁধা আইন-কানুন, বাঁধা গুণী এমন টানা যে কাব বাধিবে কাহারো পা পড়িলে সর্বনাশ। লাক্তনা শিবস্বাবব স্বস্ত থাকে না, গ্রামে মুখ দেখানো ভার হইয়া ওঠে; এবং দলপতির নির্দেশ-মত প্রায়শ্চিত্ত কবিলে তবেই সে-মাত্রা বক্ষা।

অর্থাৎ সর্বক্ষণ পাড়ায় একটা-না-একটা বিষয়েব ঘোঁট চলিয়াছে। ও-পাড়ার শশী চক্রবর্তীর বিধবা ভাঙ্গ গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া মুখেব ঘোমটা খুলিয়া চরণ ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে না কি কথা কহিয়াছে! গ্রামের বো হইয়া এতখানি তার নির্লজ্জ আচরণ। অমনি শশী চক্রবর্তী নামে দলপতির পরোয়ানা জ্ঞাপিত হইল,—করাও বা-বাটী ব্রাহ্মণ-ভোজন—নহিলে একঘরে হইতে হইবে। চরণ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে কোনো উচ্যবাচ্য শুনা গেল না।

শশী এই সেদিন ভাইয়ের অসুখে ডাক্তারের জগ্ন নগদ একশোটি টাকা ধার করিয়াও ভাইকে দরিয়া ইহলোকে আটকাইয়া রাখিতে পারে নাই। পাড়ার সবার ঘরে ভিটার দলিল লইয়া গিয়াও তার জোবে টাকা ধার পায় নাই। বিধু মুখুয্যে টাকার আশ্রিত। এত বড় নির্লজ্জ স্বদেখার যে তার আর ভাড়া নাই। সে বলিয়া বসিল, দলিল লেখাপড়া কেবলই না হইলে সে টাকা দিতে পারিবে না। তা ছাড়া শশী স্বদেব যে-হাস বলিয়াছে, তা একেবারে অচল, হুঁসাধা ব্যাপার। শশীর পক্ষে সে স্বদে টাকা ধার লইলো ভিটা বাঁচানো সম্ভব হইবে না।

গৃহে ভাইয়ের প্রাণ তখন দেহ-পিথরের মধ্যে ছটফট করিতেছে—তার পাণ ছাড়িয়া নড়া চলে না। স্বদ না হয় খুব চড়া দিলাম, ভিট না হয় গেল। ভাইয়ের প্রাণের চেয়ে ভিটার দাম বেশী নয়! কিন্তু রেজেক্ট্রী অফিসে ছোট

তো সহজ ব্যাপার নয়! সেখানে দলিল রেজেক্ট্রী হইলে টাকা মিলিবে—তবে সেই টাকায় ঔষধ-পথ্য! দাদা অনেকের দায়ে মাথা দিয়াছে! পয়সার অভাবে সেই দাদা বিনা-চিকিৎসায় প্রাণ দিবে! বিধু মুখুয্যের দিকে কটমট করিয়া চাহিয়া দলিল আনিয়া শশী বেচারী শেষে এক পেশোয়ার-বাসী কাবুলীর দ্বারস্থ হইয়া টাকা ধার করিয়া ডাক্তারের পায়ে ধরিয়া দক্ষিণা দেয়! সে টাকা শোধ দেওয়া দূরব কথা—কাবুলীর পাগড়ি আর ঢিলা আলখাল্লা ঘূম-ভাগবণে তার আশে-পাশে ছায়াব মত কি বিভীষিকার মূর্তি ধরিয়া যে সাগক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিতেছে—আজও। এরা বলে কি না, বাবাটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাও! তাও বিনা দোষে!

শশী খিঁচাইয়া উঠিল, বলল—কতি নেহি! দাম্ভা গককো জাব, নোহ খিলায়েঙ্গা!

বিধবা ভ্রাতৃজ্ঞায়া বিন্দু স্বামি-বিয়োগের সত্ত্ব বেদনার উপরে লজ্জার বোঝা মাথায় বাঁহিয়া বলিল—ওঁদের মিছে কথা! চরণ ভট্টাচার্য্য এমন ইতর রসিকতা করেছিল... তার জবাবে ধমকে আমি বলেছিলুম—বুড়োর ঐ মুখ কাঁটার ঘায়ে যেতো করে দিতে পাবতুম তো ঠিক হতো!...ব্যাপার ভাই, এই!

শশী বলিল—চরণ ব্যাটা হলো আবার সহ বাঁড়ুয্যের ইয়ার। ব্যাটা ভট্টাচার্য্য, না, চামার। হু-ব্যাটার ভেতরের কথা জানি তো...ইং, মগের মুল্লুক পেয়েচে! না? ইংরেজের রাজত্ব, এখানে চোখ রাঙাস্ কি সাহসে? কক্ষনো বামুন খাওয়াবো না আমি! কেন, কিসেব জগে? তাও ঐ তো সব চামার বামুন!

বিন্দু কহিল,—কিন্তু ঠাকুবপো, ইংরেজের রাজত্ব হলো এরাই এ মুল্লুকের বিধাতা।

শশী কহিল,—ভূমি ভেবে না বৌঠাকরুণ, কোন্না দায়ে কোনো ব্যাটা কখনো মাথা দিতে আসে না—শুধু ঘরে বসে ভূমিক ছাড়বে। কে রাখে ওঁদের তোরাঙ্কা।

বিন্দু কহিল—ওরা একঘরে করবে, বলেচে!

শশী কহিল—বঁচে বাবে। কোনো ব্যাটাকে বাডীতে ডাকতে হবে না—কোনো ব্যাটা ছেলের বিষয়ে, পৈতৈয়, ভাতৈয়, হু'খানা কাঁচা ময়দার লুটি দেখিয়ে হু'টাকা চার টাকা লৌকিকতা আদায় করতে পারবে না!

ভ্রাতৃজ্ঞায়া কহিল,—তোমার দায়ে-অদায়ে...

শশী কহিল—কোনো ব্যাটা দেখেচে কোনোদিন?



দেখবে, তা আমি চাইনে! তবে আমিও ছাড়ি না। আমার মায়ের মত বড় ভাজ তুমি...তোমার নামে এত বড় মিথ্যা অপবাদ তুলেচে যে ব্যাটা, তাকে একবার দেখে নেবো আমি।

বিন্দু কহিল—তার মানে?

শশী কহিল,—মানে এখনো খতিয়ে দেখিনি বৌঠাকরুণ...তবে সে মানে যত ঘোরালোই হোক, আমি ছেড়ে দেবো না।

বিন্দু গভীর স্বরে ডাকিল,—ঠাকুরপো!

সে ডাকে আসন্ন বিপদের আশঙ্কা, এবং তার পিছনে কতখানি স্নেহের মাধুর্য্য যে মিশানো ছিল!...

শশী কহিল,—তোমার কোনো ভয় নেই, বৌঠাকরুণ। গাঁয়ে একটা মজা দেখিচি বেশ, যার পয়সার জোর আছে, সে যা-খুশী তাই করে যাচ্ছে—হুর্দল গরীবের উপবই শুধু যত জুলুম!

বিন্দুও চোখে নিরুপায়তার ছায়া আরো গাঢ় হইল। বিন্দু কহিল,—তবে? ...তোমার তো পয়সার জোর নেই, লোক-বলও নেই! কান্নেই...

শশী কহিল,—কান্নেই, ওদের হুক্মার মেনে চলতে হবে? বাবোটা মর্কটকে পাত পেতে খাওয়াবো?

বিন্দু শান্ত স্বরে কহিল,—তা নয় ভাই ঠাকুরপো... আমাকে নিয়েই তো কথা উঠেচে। আমি যদি এ ভিটে ত্যাগ করে যাই...

—বৌঠাকরুণ...

শশীর কথায় বাধা দিয়া ভ্রাতৃজায়া কহিল—জানি ভাই, এ ঘর ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে কত শক্ত! এ ঘর আমার...বেদনার ভ্রাতৃজায়াব কষ্ট রুদ্ধ হইয়া আসিল।

শশীর বৃকে এইটুকুই অনেকখানি আঘাতের বেদনা জাগাইয়া তুলিল। শশী কহিল,—এমনি অকথ্য অপবাদ মাথায় বয়ে তুমি থাকবে! ...তা হবে না বৌঠাকরুণ...আমি মরদ-বাছা। এ ভটচাষি বামুনকে আমি একবার তার টিকি আর নামাবলীর খোলোস ছাড়িয়ে সকলের চোখের সামনে ধরে দেবো,—এই আমার গণ! ...তোমার কোথাও যাওয়া হবে না, ওদেরো কথা শুনবো না! কি করবে ওরা? কত শক্তি?...ওদের সঙ্গে মিশে পাঁচ ঘরের ঘর আমি করতে চাই না। ডোম চাড়ালের দোবে দাঁড়াবো দশকার হলে—তবু ও ইলংদের ঘেঁষ কখনো সহিবো না!

আলোচনায় দেবরের জিদ আরো বাড়িল, কি করিতে শেষে কি কহিল,—এই ভাবিয়া বিন্দু চুপ করিল।

শশী তখন ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং কাঁধে একখানা উড়ানি ফেলিয়া একটা ছাতা লইয়া ঘরের বাহিরে

আসিতে বিন্দু কহিল,—কোথায় বেরুনো হচ্ছে, শুনি? বেলা এই বেড়ে উঠলো, আর এখন তোমার বার হবার সময়! তারপর কোন্ অবেলায় ফিরে কড়কড়ে ভাতগুলো খেতে বসবে! তার চেয়ে বাপু, স্বান করে খাও, আমি এখনি ভাত ধরে দিচ্ছি। বেকতে হয়, খেয়ে বেরোও।

শশী হাসিয়া কহিল,—তুমিও যেমন! বেশী দূর নয়, আমি যাচ্ছি ও পাড়ায় নিতাইয়ের কাছে। এখনি ফিরবো।

বিন্দু কহিল,—তোমার ফেরা তো! বেকলে কি আর তোমার ঘরের কথা মনে থাকে, ভাই!

বিন্দু ধামিল, পবে হাসিয়া কহিল,—ঐ ভুলেই তো বলি, একটা বৌ এনে দি, নাহলে ঘরে মন বসবে কেন?

শশী ফিরিয়া বিন্দুর পানে চাহিল, কহিল,—ও কথা পুরোনো হয়ে গেছে, বৌঠাকরুণ...তোমার ভয় নেই, আমি এখনি ফিরবো এবং ফিরে শীগগির করেই নেয়ে-পেয়ে নেবো। কেন না, আমাদের মস্ত একটা কাজ আছে—তাব কিনারা কতদূর হলো জানতে চলছি।

বিন্দু কহিল,—কাজটা কি, শুনি...

শশী কহিল,—মাছ ধরা গো, মাছ ধরা...

বিন্দু আর কোন কথা কহিল না; শশীও ছাতা খুলিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

ও-পাড়ায় নিতাইয়ের বাড়ী। সেখানে যাইতে হইলে সহ বাঁড়ুঘোর বাড়ী পার হইতে হয়। শশী আসিয়া সহ বাঁড়ুঘোর বাড়ীর সামনে পৌঁছিলে দেখিল, চরণ ভট্টাচার্য্য মহা উৎসাহে হাত নাড়িতে নাড়িতে সহর বাড়ী হইতে বাহিরে আসিতেছে। সঙ্গে আছে আরো তিন-চারিটা টাক-মাথা সমাজ-রক্ষী। চরণকে দেখিবামাত্র শশীর সর্বাঙ্গ জলিয়া উঠিল। শশীকে দেখিয়া চরণ কহিল—এই যে শশী! তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনটা কবে হচ্ছে হে?

শশী কহিল,—যেদিনই হোক, তোমার তো কোনো আশা দেখাচিনে...

চরণ কহিল—তার মানে?

শশী কহিল—তোমার মত বিটুলকে তো ব্রাহ্মণের দলে ডাকতে পারি না, অন্ততঃ আমার বাড়ীতে পাড়ায় বান্ধী বাদ কখনো নেমস্তন্ন কাঁচ, তাহলে তোমার ডাকবো নেন্দিন।

বাগে বাক্য-হারা হইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চরণ শশীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশী কহিল—তোমাকে খাওয়ানোর চেয়ে ছোটো ছাগল-গরু খাওয়ানো পুণ্য হয় অনেক বেশী।

এ-কথায় চরণ দাঁড়-দাঁড় করিয়া জলিয়া উঠিল।

চোখে আন্তর আলিয়া চরণ কহিল,—ভারী তেজ দেখি  
যে। চরণকে চেনো না? চরণ যদি মনে করে তো ও  
তেজ কোথায় থাকে, একবার দেখি।

শশী কহিল,—যেখানেই থাকুক, অন্ততঃ তুলে-পাড়ায়  
কি বাগ্‌দী-পাড়ায় তাকে পাবে না চরণচাঁদ ভট্টাচার্য!...  
কথাটা বলিয়া চরণের উত্তরের প্রতীক্ষামাত্র না করিয়া  
শশী চলিয়া গেল।

কথাটার মধ্যে অনেকখানি ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন ছিল। তুলে-  
পাড়ায় সঙ্গে না হোক বাগ্‌দী-পাড়ায় সঙ্গে চরণের  
একটু সম্পর্ক ছিল। প্রায়ই তাকে সে পাড়ায় দেখা  
বাইত। কাছাকাছি দেখিলে চরণ বলিত—এই সহ  
বাবুর পাওনা আদায় করতে আমায় আস।

অর্থাৎ বাগ্‌দী-পাড়ায় সদর কয়েক ঘর প্রজা ছিল।  
তাদের কাছ হইতে খাজনা আদায়ের অগ্র লোক থাকিলেও  
এ কাজটায় চরণ অগ্রসর হইয়া আসিত। এ জগৎ  
গোপন অন্তরালে কেত কেত বাগ্‌দী-পাড়ায় কোনো  
একটি বিশেষ পরিবারের সহিত চরণের বনিষ্ঠতার ইঙ্গিত  
করিত। তবে সমাজে সহ বাঁড়ুয়োর প্রতিপত্তি বিলক্ষণ  
এবং চরণ তাঁর বিশেষ অগ্রগৃহীত—এই দুই কারণে  
ব্যাপারটা লইয়া প্রকাশ্যে উত্থাপন বেশী আলোচনা করিতে  
কাহারো সাহসে কুলাইত না! কে জানে, এখানে ছোট  
একটি ইট ভুঁড়িলে কত বড় পাটকেল কোন দিক হইতে  
আসিয়া মাথায় পড়বে।

আজ প্রকাশ্যে শশীর এ ইঙ্গিতে চরণ একটু চমকিয়া  
উঠিল, পরক্ষণেই নিজেকে মন্থন করিয়া কহিল—টাকা  
আদায় করতে যাই বাগ্‌দী-পাড়ায়! তাতে কি হয়েছে!  
গঙ্গাস্নান না করে জল গ্রহণ কবি না আমি। সন্ধ্যা-  
আফ্রিক, এমন নিষ্ঠা...গামে আর কাব আছে, দেখিয়ে  
দিক না! ফকড ছোকরা, আমার সঙ্গে মধুরা কবে!  
আমার উপর ঠেশ দিয়ে ঘবে বাস কববে—এ বিধবা  
কাঁচা-বয়েসী ভাজ নিয়ে! জাখো মজা, কি হাস করি  
তোমার!...

কিন্তু নিশ্চল আক্রোশ! বাহ্যর উদ্বেগে এ আক্রোশ,  
সে তখন বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। চরণ একবার পথেব  
দিকে চাহিয়া ধমকিয়া দাঁড়াইল, তারপর গভীর একটা  
অভিসন্ধি মনে মনে আঁচিয়া লইয়া আবার সহ বাঁড়ুয়োর  
গৃহে প্রবেশ করিল—বাকী সমাজ-রক্ষার দল স্নানাদির  
বেলা হইতেছে বলিয়া বিদায় লইল। বিদায় লইবার  
সময় দেবু বলিয়া গেল,—যা হয় একটা স্থির করে  
ফ্যালো। এ সব সামাজিক ব্যাপারে গম-গছ করতে  
নেই ছে চরণ।

চরণ কহিল,—না, আজই হেস্ত-নেস্ত না করে  
মড়ুনি না!...

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিতাই

নিতাইয়ের গৃহে নিতাই কয়টা হাঁসের পালক হইতে  
ফাৎনা কাটিয়া ছিপে বাঁধিতেছে, এমন সময় বাতির  
হইতে শশী ডাকিল,—নিতাই আছো?

—কে? শশীদা...এসো!

নিতাইয়ের গৃহে সে ছাড়া দ্বিতীয় প্রাণী নাই, কাজেই  
তাব দ্বার সর্ধক্ষণ অব্যাহত! শশী নিতাইয়ের গৃহে গিয়া  
কহিল,—বেকবার আয়োজন পাকা তো?

নিতাই কহিল,—নিশ্চয়। তবে যাবার সময় এক  
বার বাগ্‌দী-পাড়া ঘুরে যেতে হবে, দাদা।

—বাগ্‌দীপাড়া?

নিতাই কহিল,—হ্যাঁ। উমেশের এক ভাইপো  
আপিসে ছুটি নিয়ে এসেচে—তার শরীর খারাপ, এখনো  
সারতে পারে নি। সে কাজ কবে বজবজের একটা পাট-  
কলে। তার ছুটি বাড়ানোব একখানা দরখাস্ত লিখে দিয়ে  
যেতে হবে। নইলে চাকরী খোঁজতে পারে, নয় তো  
জরিমানা হতে পারে। বেচারী!

শশী কহিল,—আমাদের কতদূর যেতে হবে শুনি?

নিতাই কহিল,—নতুনপাড়ায়। ঐ যে পাজী-  
সাহেবের নতুন ইন্ডুল হয়েছে না? তাব ঠিক পিছনে  
আবদুলের পুকুর—মস্ত পুকুর দাদা, আব মাছও তাতে  
প্রচুর। ধরে স্থখ পাবে।

শশী কহিল,—বাগ্‌দীপাড়া ঘুরে যেতে একটু ঘুর  
পড়বে না?

নিতাই কহিল,—কতটুকু বা। তেমনি আঘাটের  
বেলা! অন্ধকার হতে তোমার যাব নাম সাতটা। কত  
মাছ ধরবে, ধরো। এই আধ ঘণ্টা আগে দণ্ড এসেছিল,  
বেচারী মিনাত করে গেল। তখনি লিখে দিতুম—কাজ  
চুকে যেতো; কিন্তু সে ওদের সাহেবের আর আপিসের  
নাম লেখা কাগজটা বাড়ীতে ফেলে এসেচে। বললুম,  
সেই তো বেকজি খানিক পবে, যাবার সময় লিখে দিয়ে  
বাবো। তা তোমার ভয় নেই, দাদা। তোমাকে তাদের  
বাড়ী ঢুকতে হবে না, পাশে দাঁড়িয়ে থেকো! তোমার  
জানি তো, বামুন মাঘু, তায় ভট্টাচার্য বামুন—বাগ্‌দীর  
হায়া মাড়ালে জাত বাবে।

শশী কহিল,—আমি তাহলে চানটা সেয়েই তোমার  
এখানে আসবো। কি বলো নিতাই? তোমার কত  
দেবী এদিকে?

নিতাই কহিল,—বান্ধা আমার হয়ে গেছে।...

শশী কহিল,—দেখি, ছিপ কেমন হলো

নিতাই কহিল,—তোমারটা হয়ে গেছে, ঘরে আছে।  
আনাই। আমার ছইলটা লাগিয়ে নিলেই হয়।

এই কথা বলিয়া নিতাই ডাকিল,—কাশী ।

সে আহ্বানে দশ বছরের একটি ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। নিতাই কহিল—আমার ঘরের কোণে যে ছিপটা তৈরী করে রেখেছি, নিয়ে আস তো ভাই—

কাশী ছিপ আনিতে গেলে শশী কহিল,—এ ছেলেটিকে কৈ আগে তো দেখিনি !

নিতাই কহিল,—না। ও এই দিন কয়েক হলো এসেচে। এইখানেই আছে আমার কাছে। ছনিয়ায় ওর কেউ কোথাও নেই। ওর আসল নাম হলো, কাশিম—জাতে মুসলমান।

মুসলমান ! শশীর আশ্রয়ের সংস্কার একবার মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই এতটুকু হঠিয়া গেল। নিতাইয়ের ঘেন কেহ কোথাও নাই, সে গোঁয়াব-গোবিন্দ ! কিন্তু শশীও যে নিজেও গৃহে ভাঙ্গ আছে, বিগ্রহ আছে, তাড়াহা সমাজ ...-সমাজকে এই মাত্র প্রবল ভক্তাবে গর্জনে সে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। যত তুচ্ছ করুক, তবু সমাজ নামটার সঙ্গে কতখানি বিভীষিকা জড়ানো আছে ! সমাজকে চক্ষে না দেখিলেও সে বিভীষিকাটুকুকে তো প্রাণের কোণ হইতে একেবারে নির্মূলাকিত করিয়া দিতে পারে নাই ! সে চট্ করিয়া কোন জবাব দিতে পারিল না।

নিতাই কহিল,—আমাদের বোটের মাঝি ছিল, হানিফ,—ও সেই হানিফের ছেলে। হানিফের বো তো অনেক দিন আগে মাঝা গেছে। হানিফটা এক বছর ধরে কালাজবে ভুগে ভুগে সে দিন মারা গেল ! যোগে পড়ে অবধি এই ছেলের জন্ম ভেবে সে সারা হয়ে থাকতো। জাত-কুটুম কেউ এ-গোঁষে নেই, মাঝা বাবার সময় কাশিমকে আমার হাতে দিয়ে যায়—যাবার সময় বলে, দাদাবাবু, এটাকে মানুষ কবে দিয়ে !

নিতাই একটা নিখাস ফেলিল, তারপর হাসিয়া কহিল,—মানুষ কাকে বলে, জানি না ! নিজেও মানুষ হলুম না কোনো দিন। আমি কি করে একে মানুষ করি, বলো তো দাদা ? যাক, খেতে পরতে দিতে পারবো, তারপরে ওর নিজেও হাত, মানুষ হওয়া।

কাশী ওরফে কাশিম ছিপ লইয়া আসিলে নিতাই কহিল,—এই তোমার ছিপ।

ছিপ তো আসিয়াছে ! কিন্তু এ মুসলমানের হাত হইতে সে ছিপ লওয়া ! কেমন এক অশুচিভাষ শশীর মনটা ঝাঁ-ঝাঁ করিয়া উঠিল। এমন অনাচার ! নিতাই বৃষ্টি, বৃষ্টিয়া কহিল,—ছুঁতে পারচো না ! গঙ্গাজল চাই না কি ? বলো...এনে দি !

নিতাই উঠিয়া ঘর হইতে গঙ্গাজল আনিয়া ছিপ লইয়া সেটার গঙ্গাজল দিল। পরে কহিল,—এইবার হয়েছে ? খাশা চীজ বানিয়ে রেখেচো দাদা, এই

গঙ্গাজল ! একটু ছুঁলেই শুদ্ধি। খুন-খাবাপী ছাড়া আর বা-খুশী করো। খুন-খাবাপীটাও চলতো, কিন্তু আইন-পুলিশের বাজ্য কি না ! ভাবি তাই, গঙ্গাজল না থাকলে সংসারের অর্ধেক আনন্দ তো গয়াশ্রাৗ করতে হতো ! হাসি পায় মোক্ষা এই হেবে দাদা যে, সব মানুষকে এক বিধাতাই সৃষ্টি করেচেন তো ! তিনি যদি প্রতি হাতে গঙ্গাজল ব্যবহার করতেন, তাহলে কি ভগীরথের সাধ্য থাকতো, মা গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনেন ! ... মাঝে থেকে আমারাই কেউ মস্জিদ বানিয়ে, কেউ গঙ্গাজল তৈরী করে আলাদা হচ্ছি ! কাশিমকে তৈরী করতে ভগবান কি অশুদ্ধ হয়ে গেছেন ?

কথাটা খুব সহজ। ইহাতে শাস্ত্রের ভঙ্কার নাই,—এবং শশীর মন সেটাকে গ্রহণ করিবার জ্ঞান নিমেষে উন্মুখ হইয়া উঠিল। কিন্তু সংস্কার। ঘরের বিগ্রহের কথা মনে পড়িয়া গেল। তাঁর মুখে বিবক্তির বাজ্য !...শশী কোনো জবাব না দিয়া ছিপটা পরীক্ষা করিল, তারপর নিতাইকে কহিল,—তাহলে আমি চান পূজো-আর্চা, সব সেবে এখনি আসচি। মোক্ষা, তুমিও তৈরী হয়ে নাও ! ছিপটা এইখানেই থাকুক। কেন মিছে ব্যয়ে নিয়ে যাই ? এই পথ দিয়েই তো যাবো !

শশী চলিয়া গেল। নিতাই ছিপের কাজ সারিয়া উঠিল—এবং মাথায় তৈল লেপিয়া কাশীকে তেল মাখিতে বলিল ; কাশীর তেল মাখা হইলে তাকে লইয়া সে নদীতে স্নান করিতে গেল।

সারা পথ কাশীর কথা ভাবিতে ভাবিতে শশী গৃহে ফিরিল। বেচারী অনাথ। মুসলমানের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়া তার এমন কি অপবাদ হইয়াছে যে সে ভাসিয়া যাইবে ? তার যদি পীড়া হয়, ক্ষুধার কাতর হইয়া সে যদি পথে পড়িয়া থাকে তো তাকে বুক তুলিয়া ঘরে আনিয়া সেবার যত্নে তাকে আরাম করা...এটা বড় ? না, জাত বাঁচাইয়া তার কাছ হইতে সরিয়া পড়াতেই মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায় ? তবু মুসলমান ! গৃহে বিগ্রহ-পূজা কবিত্তে হইবে। ...মস্ত এক সমস্তা শশীর দ্বিধা-দীন নিশ্চিন্ত মনের মধ্যে জাগিয়া এক বিলী জোট পাকাইয়া তুলিল। নিতাই কেমন অবলীলায় ঐ মুসলমানের ছেলেকে গৃহে আনিয়া ঠাঁই দিয়াছে ! এ সমস্তার মীমাংসাই বা কে করে ? কাহাকে প্রশ্ন করিলেই বা সমাধান মিলিবে ?

গৃহে ফিরিতে বিম্ব কহিল,—কি ভাগ্যি ! এর মধ্যে ফিরেচো।

শশী কহিল,—ফিরলুম। আমি স্নান করে আসি, এসেই পূজা সেবে নেবো। তুমি ছুটি ভাতের ব্যবস্থা করে রাখো, বোঁঠাকরুণ।

বিম্ব কহিল,—তুমি আগে এসো তো। ভাত না পাও, তখন বলো।

শশী আর কালক্ষেপ না করিয়া স্থানে বাহিব হইল।  
স্নানান্তে পূজা সারিয়া আচাৰে বসিলে বিন্দু কহিল,—  
তোথায় যেতে হবে, শুনি ?

শশী কহিল,—মাছ ধরতে। বলেচি তো।

বিন্দু কহিল,—দজ্জি সব যা শোক। ধরে নিজে তো  
থাবে কত! কতকগুলো মাছ ধবে একে-তাকে বিলিয়ে  
কি সুখ পাও, জানি না।

শশী হাসিয়া কহিল—আসল সুখ বিলুণ্ডের নয় বৌ-  
ঠাকরুণ, আসল সুখ মাছ ধরা। কান্নার পানে চেয়ে  
যে বসে থাকি, লোকে হাসে—কি রাজ্য-জয়ের ফন্সী  
আঁটচি! তাবপব যখন একটি টানে পাঁচ সেব মাছটিকে  
ছাত্রায় তুলি, তখনকার আনন্দ...ওঃ, রাজ্য বাজ্য জয়  
কবে এসেও বৃষ্টি এমন আনন্দ পায না!

বিন্দু হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তা, অনর্থক এ প্রাণি-  
হত্যায় আনন্দ পাওয়া কি ভালো, ঠাকুবপো? জলেব  
মাছ জলেই থাকুক না, বাপু...

শশী কহিল,—ক্ষেপেচো বৌঠাকরুণ, জলেব মাছ জলে  
থাকবে যদি তো ছিপটার সৃষ্টি হলো কেন?

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—শোনো কথা। ছিপের জন্ত  
মাছ, না, মাছের জন্ত ছিপের সৃষ্টি।

শশী কহিল,—মন্দ বলে নি বৌঠাকরুণ! এমন  
একটা কথাই এত কিছুকণ আমার মনে জাগতে। সে  
কথা হলো এই যে, সমাজেব জন্ত মানুষ, না, মানুষের জন্ত  
সমাজ!

বিন্দু কহিল,—ইস্, তুমি বে একেবারে আধ্যাত্মিক  
হয়ে উঠলে!

শশী কহিল,—আমাদের ও-পাড়ার নিতাইকে জানো  
তো?

বিন্দু কহিল,—ঐ শ্রীধর চাটুযোব ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ। তা সে তো একা মানুষ। আজ  
তার ওখানে গিয়ে দেখি, দশ এগাবো বছরের একটি  
মুসলমানের ছেলেকে সে ঘরে এনে ঠাঁই দেছে। মাঠের  
ধারে পড়ে থাকবার ঠাঁই সে নয়, একেবারে নিজের ঘরের  
মধ্যে। ছেলেটার মা-বাপ ভাই-বন্ধু কেউ কোথাও নেই  
—যে তাকে মানুষ করে।

বিন্দু কহিল,—মুসলমানের ছেলে?

শশী কহিল,—হ্যাঁ গো! তাকে দেখে আমি তো  
চমকে উঠেছিলুম। ছেলেটির নাম কাশিম—নিতাই  
তার নাম দেছে কাশী। অর্থাৎ মুসলমানের ‘ম’ অক্ষরটা  
ছেঁটে দেছে। তাই ভাবছিলুম, আমাদের এই সচ্ছ  
বান্ধবের দল যদি টের পায়, তাহলে খাল্লা হয়ে  
উঠবে।

বিন্দু শিঙরিয়া কহিল,—সত্যি ভাই! এরা জানলে  
মারধর করতেও পারে বোধ হয়। নিতাই শুনেচি ভারী

একরোখা ছেলে। নিজে যা ভালো বোঝে, তা করতে  
কারো চোখ বাঙানি গ্রাহ্য করে না।

শশী কহিল,—ওই জন্তই তো আমি ওকে সবার চেয়ে  
ভালোবাসি। ভাবছিলাম, আমাদের কথাটা ওকে নয়  
বলি...

এ কথাব মধ্যে নিজের প্রতি কতখানি উত্তর প্রাণের  
ইঙ্গিত আছে, সেটুকু মনে করিয়া বিন্দু সসঙ্কোচে কহিল,  
—ঘরের কথা তার কাছে নাট বা বললে ঠাকুবপো...

শশী কহিল,—আমি একা, আর তুমি মেয়েমানুষ—  
একজনকে পাশে সহায় পেলে আমার পক্ষে লড়া কত  
সহজ হয় বলো দিকিন! নিতাই কারো তোয়াক্কা রাখে  
না! ওকে বলি...; তারপর দু'জনে মিলে ঐ চরণ  
ভট্টা বাটাকে দেখে নি একবার। ওর মোসাহেবির  
নিকেশ করি।

এই কথা বলিয়া নিতাইয়ের গৃহের পথে কিছু পূর্বে  
সহর বাড়ীর সম্মুখে চরণের সঙ্গে যে ব্যাপার ঘটয়াছিল,  
সেটুকুও শশী বিন্দুর কাছে বিবৃত করিল, করিয়া কহিল,  
—গ্যাটা চামার! ওর বাগদীপাড়ার খাতাঞ্জিখানা  
আবিষ্কার করতে হছে।

এ প্রসঙ্গে শশী আবো উত্তেজিত হইবে এবং সে  
উত্তেজনা যে তাকে কেন্দ্র করিয়াই বাড়িয়া উঠিবে, বিন্দুর  
তা নিঃসংশয়ে জানা ছিল। এ উত্তেজনা-প্রকাশে কোনো  
ফল নাই, মাঝে হঠাৎ পাড়ার বাস করার ব্যাপারেও  
ক্রমে অশান্তি, শঙ্কা ও হুঁশিয়ার জাগিতে পারে, ইহা  
ভাবিয়া ও-প্রসঙ্গে বাধা দিয়া বিন্দু কহিল,—তা ও ছেলে-  
টিকে নিতাই পেলে কোথায়?

শশী কহিল,—বললে, তাদের এক বোটের মাঝি ছিল  
হানিফ—তার ছেলে। ছেলেটিকে দেখলে মুসলমান  
বলে চট করে ধরা যায় না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—মুসলমান হলেই কি চেহারা  
উট্টো বকমের হবে? এমন পাগলের কথাও তো  
শুনি নি।

শশী কহিল,—আচ্ছা বৌঠাকরুণ, ঐ মুসলমানকে  
যদি আমি ছুঁই?

বিন্দু কহিল,—তার মানে?

শশী কহিল,—তার গায়ে পড়ে ছুঁতে মাছি না,  
অবশ্য। ধরো দৈবাতের কথা! যদি দৈবাত ছুঁয়ে  
ফেলি...?

এই অবধি বলিয়া শশী একবার খামিয়া বিন্দুর পানে  
চাহিল। বিন্দু কোনো জবাব না দিয়া সপ্রসন্ন মুষ্টিতে  
শশীর পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া সে আবার কহিল,—  
তাহলে আমার গোবরজলে নাইয়ে তবে বোধ হয় বাড়ী  
টুকতে দেবে...না?

বিন্দু বিষয়-ভয়া স্বরে কহিল,—কেন?

শশী কহিল,—নয়? সে যে মুসলমান! তোমাদের শাস্ত্রে মুসলমানকে একদম তফাতে রাখতে বলে --

বিন্দু কহিল—আমি তো ভাই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নই মুখ্য মেয়ে মানুষ। অত আচার-বিচারের মানেও বুঝি না। মুসলমানকে যে-বিধাতা গড়েছেন, আমাকেও তো তিনি গড়েছেন। না, বিধাতারও স্বধর্ম-বিধর্ম আছে?

প্রচুর উৎসাহে শশী কহিল,—স্বাথ কথাব এক কথা। ঠিক বলেচো বৌঠাকরুণ। নিতাইও তাই বলছিল। অর্থাৎ আমার ছিপগাছটা সেই ছোকরা ধরে ছিল, সেটা ছুঁতে আমাব কেনম বাধছিল। নিতাই তাই তাতে গঙ্গাজল ছিটিয়ে হেসে আমার হাতে দিলে, দিয়ে ঐ কথা বললে। .. আমার কিন্তু এমন সংস্কার যে এই সামান্য ব্যাপাবে দ্বিধা বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম, মুসলমানকে ছুঁয়ে বিগ্রহ পূজা করতে পারা যায় কি না!

বিন্দু কহিল,—কেন ভাই, তোমার দাদার কথা মনে পড়ে না? সেবার মুসলমান-পাড়ার আগুন লেগে যখন সব পুড়ে ছাটী হচ্ছিল, গাঁয়ের অত সব মাতব্বর লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজাই দেখছিল শুধু—তোমার দাদা থাকতে না পেয়ে ছুটে গিয়ে তাদের চালে উঠে চাল কেটে দেন! তাতে কতকগুলো চালা বাঁচে। তারপর মোড়লরা তাঁকে কত টিটকারী দেয়। তিনি বলেন, টিকি রক্ষে কবে মানুষ মবচে দেখলে টিকির জাত যায় না? আরে জাত যার মানুষকে মরণের দোর থেকে হাত ধরে টেনে বাঁচাতে গেলে, না? সেই অবধি সবাই তাঁকে তামাসা করতো, মৌলবী ভট্‌চাষি বলে!

শশী কহিল,—তোমার কথা শুনে বাঁচলুম বৌঠাকরুণ। ঐ বিশিষ্ট সংস্কারটা আমাব মনের সহজ ইচ্ছাব উপব এমন চেপে বসেছিল যে স্বান করতে গিয়েও তাকে সরাতে পারিনি! স্বান করতে করতে ভাবছিলাম, এই গঙ্গাব অগ্নি ঘাটে মুসলমান স্বান করুচে হয়তো, তাতে গঙ্গার কৈ জাত যাচ্ছে না, আব সেই গঙ্গার জল এনে ঠাকুরের পূজাও তো করি।

বিন্দু কহিল,—ঠাকুর সকলের মধ্যেই আছেন ভাই। হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান, এ সব ভেদ তো মানুষের মন-গড়। ছোট ছেলেটি যখন জন্ম নেয়, তখন সে টিকি নিয়ে আসে না, কল্মা পড়েও আসে না! তার হাসি-খেলায় সব ধর্মের সব-মানুষেরই প্রাণ গলে!

শশী কহিল,—মানুষ মানুষ—এ ছাড়া তার অন্য পরিচয় নেই—এই কথাটা ঠিক। তার পর স্বভাবের গুণে কেউ হয় বড়, কেউ ছোট। ঐ যে চরণ ভট্‌চাষি... তার চেয়ে এই মুসলমান কাশিমের দিকেই মন আমার ঝুঁকচে বটে!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মিশন স্কুল

মস্ত পুরুষ। হুই বন্ধুতে ছিপ ফেলিয়া ফাংনার দিকে চাতিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল। তিন ঘণ্টা ধরিয়া পণ্ডশ্রম সার হইয়াছে। নিতাইয়ের নির্দেশ-মত কাশিম মাঝে মাঝে জলে চার ফেলিয়া মস্ত-গোপীকে সবিশেষ প্রলুব্ধ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। সে বেচারীও বড় আশা করিয়া আসিয়াছে, কত মাছ উঠিবে! মাছ এ পর্যন্ত উঠিল না দেখিয়া নিতাই বা শশীর চিন্ত অস্থির না হইলেও, ছেলেমানুষ কাশিম নৈরাশ্রে শ্রাস্ত হইয়া পড়িল। মাছ ধরার ব্যাপাবে তার উৎসাহ ক্রমে নিবিয়া আসিতে-ছিল। এক ফাঁকে সরিয়া আসিয়া সে পাত্রীদের স্কুল-বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল।

মাঝারি আকারের একতলা বাড়ী। ফ্লোরের উপর হৃদিকে কাঠের রেলিং আঁটা টানা বারান্দা, মাঝখানে ঘরগুলি। এই ঘরগুলিতে ছেলেরা পড়াশুনা করে। ই বাড়ীর পাশেই বাংলা প্যাটার্নের ছোট একটি বাড়ী—আশে-পাশে সম্মুখে-পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা। এই খোলা জায়গার এক প্রান্তে ফ্লোরের উপর কতক-গুলো ঘর। বোর্ডিং, ডিস্‌পেন্সারী, রান্নাবাড়ী সেইদিকে। এই স্কুল-গৃহেব সামনে একধারে প্যারালেল বার, রিং, দোলনা প্রভৃতিতে সজ্জিত ক্রীড়াভূমি। আব এই স্কুলগৃহ, বাংলা প্রভৃতি সমস্তটা একই কম্পাউণ্ডে তারের বেড়ায় ঘেরা।

খেলার মাঠে দশ-বারো জন ছেলে ছুটিয়া মহা কলরবে খেলাধুলা করিতেছে। ছেলেদের বয়স সাত হইতে বারো বৎসর। কেহ দোল খাইতেছে, কেহ প্যারালেল বারে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে,—এবং কয়েকটি ছোট ছেলে একটা ফুটবল লইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। ইহাদের খেলাধুলার তদারক করিতেছে এক স্কুলবী কিশোরী বাঙালী—তাব পরণে কালা পাড় শাড়ী, ক্রেতে আঁটা, গায়ে সাদা ব্লাউজ, পায়ে জুতা-মোজা। কিশোরী পরম স্নেহে ছেলেদের খেলায় বোগ দিয়া তাদের খেলার আনন্দ অনেকখানি বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বেড়ার ওধারে দাঁড়াইয়া কাশিম খেলা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইল। সে যদি উহাদের ঐ দলে ভিড়িতে পারিত! উহাদের ঐ হাসি-কলরবে নিজের কণ্ঠ মিশাইবার একটু সুরোগ পাইত।...এমনি দেখা আর ভাবার মধ্যে তার কিশোর চিন্ত একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল।...

হঠাৎ ছেলেরা তার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে দেখিয়া তার চমক ভাঙ্গিল। ছেলেরা কি বলিতেছে?

ছেলেবা তাকেই ডাকিতেছিল—ওহে—এই...

চারিধারে একবার সে চাহিয়া দেখিল, না, কাছাকাছি আর তো কেহ নাই। এরা তবে...

ছেলেরা আগাইয়া আসিয়া কহিল,—আমাদের বলটা কুড়িয়ে দাও তো—

কাশিম তখন বাপাব বৃক্ষিল, বৃক্ষিয়া পাশে চাহিয়া দেখে, ফুটবলটা হৃদয়ে পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি সেটা কুড়াইয়া সে ছেলেদের দিকে ছুড়িয়া দিল। ছেলেরা বল পাঠিয়া মহানন্দে তাহাতে কিক্ মারিতে ছুটিল। আর কাশিম? ঐ বলটা যে সে স্পর্শ করিতে পাইয়াছে, ইহা ভাবিয়াই সে কৃতার্থ!

স্কুলের ঘরে ঘণ্টা পড়িল। কিশোরী তখন সকলকে আহ্বান করিল এবং ছেলের দল তার সে আহ্বানে এক মূহুর্তে খেলা ছাড়িয়া স্কুল-গৃহের দিকে ছুটিল। কিশোরী ডাকিল—মহাবীর...

সাদা চাপকান পরা একটি বালক ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। বলটি তাহাকে কুড়াইতে বলিয়া কিশোরী স্কুল-গৃহে চলিয়া গেল।

কাশিম সেই স্কুল-গৃহের দিকে তেমনি চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাথাব উপর বোম্ব তখন মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে, সে দিকে তার চক্ষু ছিল না। ঐ পড়ার বই ধরিয়া ঘূর্ণ করিয়া ওলা ও-কোন কল্পলোকের কি-বাক্তি সংগঠন করিতেছে... কাশিমকে কে তাহা বলিয়া দিবে? ও-লোকও এই আকাশ, এই বাতাস, এই গাছ-পালাব দীঘল জামল চায়া, পুকুরের এই কালো জল,—এই সবই আছে? না, কেবল পবীর স্বপ্নে, দৈত্যের ভয়ে ও-কল্পলোক পরিপূর্ণ? কাশিমের সারা চিন্তা ঐ কল্পলোকের একটু পরিচয় পাইবার জন্য অসহ্য আকুলতায় গুমরিয়া উঠিতে লাগিল।

হঠাৎ বৃষ্টির কাব্য বর্ষাব বারিধা বা বিপুল বেগে ঝরিয়া পড়িতে কাশিম সমকিয়া স্কুল-গৃহের ফটক পার হইয়া একেবারে টাঙ্গা বাবান্দ্র গিয়া উঠিল। ভিতরে ছেলেব দল তাকে দেখিয়া চোখ ফিরাইল। কি মছাই না ওই ছেলেটির—এমন বর্ষাব বাবিধা বা মাতন তুলিবার কি অধিকার! কাব্যে নিষেধ নাই, কোনো বাধা নাই! আর তারা...? কাশিম ভাবিতেছিল, এই মেঘের গন্ধকাণ্ডে ঢাওয়া দুনিয়াব মাঝে যেটুকু আলো, তা ঐ ঘরের মধ্যে ছেলেদের হাতের বইগুলার পাতাতেই বৃষ্টি সব গিয়া জড়ো হইয়াছে।

বৃষ্টির বিরাম নাই। নিবিড় কালো মেঘ আরো নিবিড়, আরো কালো হইয়া আসিল। বর্ষাব ধারা আরো বেগে নামিল। সে আঁধারে ঘরের মধ্যে বহির পাতায় ছাপা অক্ষরগুলি অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সামনের ক্লাশে সেই কিশোরী পড়াইতেছিল। কাশিমকে

লক্ষ্য করিয়া ক্লাশের একটি ছেলে বলিয়া উঠিল,—একটা ছেলে বাবান্দ্র ভিজচে...

কাশিমকে কিশোরী লক্ষ্য করিয়াছিল। কিশোরী বাতীরে আসিল, কাশিমকে দেখিয়া কহিল,—কোথা থেকে আসচো?

কাশিমের বিশ্বয়ের মাত্রা এমন বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সে কোনো জবাব দিতে পারিল না। কিশোরী তার পিঠে হাত রাখিয়া সম্মত কণ্ঠে কহিল,—তুমি তো আমাদের স্কুলে পড়ো না!

কাশিম এ কথায় খতমত খাইয়া গেল। হঠাৎ স্কুল-বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছে—হয়তো এ মন্ত অপরাধ। কুজিত হয়ে সে বলিল,—না।

কিশোরী কহিল,—কোথায় থাকো তুমি?

কাশিম কহিল,—দূরে—গাঁয়ে—ঐ বামুনপাড়ায়।

কিশোরী কহিল,—তোমার নাম?

কাশিম নিজের নাম বলিল। শুনিয়া কিশোরী বলিল,—কিন্তু তুমি তো মুসলমান। বামুনপাড়ায় থাকো যে।

কাশিম যেমন বৃক্ষিত, তেমনি ভাবেই জবাব দিল,—আমার বাবা মরে গেছে। কেউ নেই। তাই মনিব আমায় বাড়ীতে নিয়ে বেখেচেন।

কিশোরী কহিল,—লেখাপড়া করো না তুমি?

—না।

কিশোরী কহিল,—এই বৃষ্টিতে এখানে ভিজছিলে যে!

কাশিম বলিল, তাব মনিব কাছের পুকুরে মাছ ধরিগে আসিয়াছেন, সেও সঙ্গে আসিয়াছে। তার ভালো লাগে নাই, তাই ঘূবিত্তে ঘূবিত্তে এখানে আসিয়া ছেলেদের খেলা দেখিতেছিল, তাবপর বৃষ্টি নামিরাছে...

কিশোরী কহিল,—বড় ভিজ্জে গেছ যে। ভিজ্জে কাপড়ে থাকলে অসুখ হবে। ও-কাপড়টা ছাড়ো!

কাশিম কহিল, ছেলেবেলা হইতেই এ বকম ভেজা তার অভ্যাস আছে।

কিশোরী কহিল,—তা হয় না। ভিজ্জে কাপড় ছেড়ে ফ্যালো...কিছু খাবে?

কাশিম কহিল,—খাবো।

তার ক্ষুধা পাঠিয়াছিল। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির সামনে ক্ষুধার কথা বলিতে চিরদিন সে কুজিত থাকে। হয়তো এখনো আহা-রেব ইচ্ছা কিশোরীর কাছে প্রকাশ করিতে পারিত না; কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া এই আবহাওয়া কিশোরীর এই দরদ-মমতা তার প্রাণে এমন আকর্ষণের সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইহাদেব সঙ্গে মিশিতে, আলাপ করিতে, কথা কহিতে তার উৎসাহের আর সীমা পরি-সীমা বহিল না।

অদূরে উপবিষ্ট এক ভৃত্যকে কিশোরী ডাকিল,—  
বয়স...

বয়স আসিল। কিশোরী কহিল,—বিস্কিট, ওর  
লক্সেঞ্জেন্স ল্যাণ্ড।

ভৃত্য আদেশ-পালনে ছুটিল।

কিশোরী কাশিমকে প্রশ্ন করিল,—তোমার মনিবের  
নাম কি?

কাশিম বলিল,—নিতাই বাবু।

—হিন্দু? না, ব্রাহ্ম?

ব্রাহ্ম কথাটার অর্থ কাশিম বুঝিল, ব্রাহ্মণ। সে  
জবাব দিল,—হ্যাঁ, বাবু।

কিশোরী অবাধ হইয়া গেল। হিন্দু ব্রাহ্মণ হইয়া  
ফুলছড়ির মত পল্লীগ্রামে মুসলমান ছেলেকে আশ্রয়  
দেওয়া—এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার! সে কহিল—তোমার  
মনিব কি করেন?

কাশিম জবাব দিল,—তেনার পাঁচখানা গাদাবোট  
আছে। পাটের কলে খাটে।

—তঁাব আর কে-কে আছেন বাড়ীতে?

কাশিম কহিল—আর কেউ নেই। বাড়ীতে শুধু  
তিনি আছেন, আর এই আমি থাকি, আর একজন  
চাকর আছে, গোবরা।

কিশোরীর শ্রদ্ধা হইল এই নিতাই বাবুটির উপর।  
আবাল্য পাত্রীদের হাতে সে মানুষ হইয়াছে।  
ছেলেবেলার কথা যতদূর মনে পড়ে, সেই স্কেন্স বাবা,  
—মস্ত দাড়ি, প্রশস্ত ললাট, দীপ্ত চক্ষু, আর স্নেহভরা  
বুক! বড় হইলে বাইবেলে যীশুর কথা পড়িবার সময়  
তঁাব মুষ্টিটী যীশুখ্রীষ্ট-রূপে বালিকাচোখের সামনে উদয়  
হইয়াছে এবং আজও যীশুর কথা মনে হইলে সেই একান্ত  
দরদ আর স্নেহভরা মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভাসিয়া  
ওঠে! অতি-দরিদ্র অসহায় আতুরকে বুক পাতিয়া  
গ্রহণ করা—এ শুধু তাঁহারি পক্ষে সম্ভব ছিল। তাঁবপর  
খ্রীষ্টানদের সঙ্গে মিশিয়া এই কথাটী সে শিখিয়াছে,  
হিন্দুরা বিধর্ম্মকে—শুধু বিধর্ম্মকে কেন, ছোটলোকদের  
মধ্যে বহু জাতিকে হীন পশু মত অস্পৃশ্য জ্ঞান করে।

মানুষের উপর মানুষের এ ঘৃণা তাঁব বৃকে বাঁচিয়াছে  
চিরদিন, এবং তাই এ ঘৃণা যতখানি পাবে, কাটাইয়া সে  
ইতর-ভদ্রনির্কীর্ষে সকলের প্রতি দরদী হইবার প্রয়াস  
পাইয়া আসিতেছে। এই ভুলই সে লেখাপড়া শিখিয়া  
সংসার-জীবনের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ছেলে পড়াইবার  
ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। বেত লইয়া পড়া গিলাইবে,  
এ উদ্দেশ্য তাঁব মোটেই নাই। স্নেহ-মায়ায় ছাত্রদের মন  
যাহাতে ভরিয়া তুলিতে পারে, ইহাই তাঁব লক্ষ্য।

সম্প্রতি তাব মিশন হইতে ফুলছড়ির এ পাড়ার  
জমি লওয়া হয়; তাহাতে স্কুলও খোলা হয়। কিন্তু

গ্রামের সাবধানী ভদ্র-সম্প্রদায় সে স্কুলে ছেলে পাঠাইতে  
নাগাধ। ছেলেরা বাপ-পিতামহের ধর্ম্ম ভুলিয়া যীশু  
ভক্তিয়া যুগ্মান বনিবে শেষে! কাছাকাছি আর কোনো  
স্কুল নাই, সেই দূরে বজ্রবজ্র, না, কোথায় একটি আছে।  
ছেলেরা বৌদ্ধ-ঝড়ে মাঠ ভাজিয়া, ট্রেন ধরিয়া সেখানে  
ষায় লেখাপড়া শিখিতে। ফুলছড়ির স্কুল কাজেই খালি  
পড়িয়া রহিল।

তখন মিশনের কর্তৃপক্ষ অগাধ ছেলেদের জড়ো  
করিয়া এখানে পাঠাইয়া দিলেন—তারা বোর্ডিং-এ  
থাকে এবং এই স্কুলে লেখাপড়া করে। স্কুলের কর্ত্তা  
হইয়া আসিল এই কিশোরী। কিশোরীর নাম সূচিত্রা।  
পাত্রী জোস তার একটা বিলাতী নামও দিয়াছিল—  
সিসিল। সূচিত্রা নাম তাব মায়েব দেওয়া। ছেলে-  
বেলায় সিসিল-সূচিত্রা নামটাই চলিত ছিল। বড় হইয়া  
সে যখন সব বুদ্ধিতে শিখিল, তখন বিলাতী সিসিলটুকু  
বাদ দিয়া শুধু সূচিত্রা-নামই বজ্রায় রাখিল।

মিশনের সঙ্গে অনেক বর্ক কাঁরায়া সূচিত্রা বুঝাইয়া  
দিয়াছিল, ছেলেদের লেখাপড়া ও দেখাশুনার ভার  
পুরুষের হাতে দিলে ঠিক হইবে না। ছোটদের  
দেখাশুনার তাব দেওয়া উচিত নারীর হাতে। দরদে-  
স্নেহে চরিত্রকে গড়া যেমন সম্ভব হয়, ছেলেদের আদারও  
তেমনি মেয়েরা শুধু সহিতে পারে। তাদের স্ব-ব্রত-ব্রত-  
খুঁটিনাটি খপবও মেয়েরা বাঁধিতে জানে, এবং কাজেই  
সে খবর রাখিয়া চারিদিক বুঝিয়া তাব মনগুলিকে  
বাঁকাইয়া নোয়াইয়া অন্যায়ের অগ্রসর কবিয়া দিতে পারে।  
মিশন একথার মূল্য বুঝিয়া এ স্কুলের ভার তাব হাতেই  
অর্পণ করিল।

তাঁব সঙ্গে আর একটি মহিলা শিক্ষক আসিল, মেরি  
জোৎস্না, এবং একজন শিক্ষক—নীলকণ্ঠ শিখ। স্কুলের  
সংলগ্ন যে তিন কামরা বাংলাখানি আছে, তাঁরি ছুটি  
কামরা সূচিত্রাব; অপরটি জোৎস্নার। স্কুলের বাহিবে  
ছোট একখানি বাংলা—সেই বাংলায় নীলকণ্ঠ শিখ  
বাস করে।

সূচিত্রা এখানে আসিয়া ভদ্র-পল্লীতে লোক পাঠাইয়া  
বহু সাধ্য-সাধনাতেও যখন স্কুলে ছেলে পাঠানোর তাবের  
রাজী করাতে পাবিল না, তখন তাঁব মনে বেদনা  
জাগিল। সে বেদনায় ধৈর্য্য না হারাইয়া সে ইতর  
পল্লীর ঘরে ঘরে গিয়া পল্লীবাসীদের প্রথমে মিষ্ট ব্যবহারে  
ও মিষ্ট বচনে বিমুক্ত করিল; পরে ভালো কবিয়া বুঝাইয়া  
বিনা-বেতনে তাবের ছেলে-মেয়েদের আনিয়া স্কুলে  
ভর্ত্তি কবিয়া লইল। বেচারি অনাদৃত ইতর-সম্প্রদায়  
—দেশের লোকজনের কাছ হইতে দরদেব এতটুকু ছোট  
দৃষ্টিও কোনো দিন লাভ করে নাই—তাঁরা সূচিত্রার  
কথায় ও ব্যবহারে গলিয়া গেল এবং বিনা-বরচে

ছেলেগুলোকে লেখা-পড়া শিখাইলে, ভবিষ্যতে তাদের চাকরি মিলবে, চাকরির এমন সুযোগ বন্ধন আয়ত্তে, তখন সে সুযোগটুকু হেলায় হারাইয়া তাদের ভবিষ্যৎ পণ্ড করিতে তারা এক নিমেষ ইতস্ততঃ করিল না।

বয় লজ্জেন্স ও বিষ্ট অঁনিয়া দিলে সূচিত্রা কাশিমের হাতে সেগুলো দিয়া কহিল,—খাও।

কাশিম বিষ্ট মুখে দিল। সূচিত্রা বলিল,—তুমি স্কুলে পড়বে? তোমাব মনিবকে বলো, এখানে পড়লে পয়সা লাগবে না। বুঝলে?

কাশিম ষাড় নাড়িয়া জানাইল, একথা সে মনিবকে বলিবে।

সূচিত্রা কহিল,—তোমার মনিবের বাড়ী তোমায় কোনো কাজ-কর্ম কবতে হয়?

কাশিম কহিল,—না।

সূচিত্রা ভাবিল, মনিব বেশ ভালো লোক তো। পবের ছেলেকে ঘরে রাখিয়া খাইতে দেয়, অথচ তাকে খাটায় না। এমন স্বার্থজ্ঞান-হীন লোকও এ গ্রামে আছে!

খাওয়া চুকিলে কাশিমের মনে হইল, বহুক্ষণ সে পুকুর ছাড়িয়া এখানে আশ্রিয়া রহিয়াছে। সেখানে যদি কোনো প্রয়োজন থাকে? ব্যস্ত হইয়া সে কহিল,—আমি যাই।

সূচিত্রা কহিল,—ভিজ্ঞে কাপড় ছেড়ে তবে যাও।

কাশিম কহিল,—তাতে কি! আমাদের হামেশা জলে ভেজা অভ্যাস আছে।

সূচিত্রা কহিল,—তা হয় না। এই জলে ভিজলে সজ্জা অসুখ কববে,—বিশেষ ভিজ্ঞে কাপড়ে কতক্ষণ তোমায় থাকতে হবে! তার পব এই কাপড়েই তো বাড়ী ফিরবে। একটা ছাতাও আনিয়া দি। নিয়ে যাও।

কাশিম আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল,—বৃষ্টি ধরে গেলে নিয়ে যাবো'খন। বেশ, ছাতাই দিন। ওখানে ওঁরাও ভিজেন।

সূচিত্রা কহিল,—তোমার মনিব মাছ ধরতে এসেচেন—বললে না? তা এ বৃষ্টিতে কি মাছ পাবেন? বেশ, তুমি এক কাজ করো। ছাতা নিয়ে যাও—তাবা যদি পথে দাঁড়িয়ে ভেজেন, তাহলে এখানে আসতে বলো। তার পর বৃষ্টি ধরলে সব যাবেন।

ছাতা আসিল। কাশিম ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া গেল। পুকুর-ধারে গিয়া দেখে, নিতাই মস্ত একটা কচু পাতায় মাথা ঢাকিয়া ছিপ লইয়া তেমনি বসিয়া আছে, আর শশী এক গাছ-তলায় বসিয়া—শশীর পায়ের সামনে কটা মাছ।

মাছ দেখিয়া কাশিম আনন্দে লাফাইয়া উঠিল, উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—কখন ধরলেন? যেই আমি গেছি...না?

শশী কহিল,—একটা আমি ধরেছি, বাকীগুলো নিতাই ধবেচে।

কাশিম কহিল,—আপনি আর ভিজবেন না—ছাতা রয়েছে। নেবেন? কাশিম ছাতা আগাইয়া ধারল।

মুসলমানের হাতের স্পর্শ! সংস্কার আবার মাথা তুলিল। শশী ছাতার প্রয়োজন ছিল না। তবু ঐ সংস্কারকে চাপিয়া হত্যা করিবার জন্তই শুধু সে হাত বাড়াইয়া ছাতা লইল; তাবপর কাশিমের পানে চাহিয়া কহিল,—আমি গাছতলায় আছি, তত জল পাচ্ছি না। ছাতাটা বরং নিতাইকে দাও—কচুপাতা ছেড়ে ছাতার তলায় মাথাটা ওর রক্ষা পাক্!

কাশিম ছাতা লইয়া নিতাইয়ের কাছে গেল। এত বৃষ্টি—নিতাইয়ের সেদিকে ভ্রক্ষেপ নাই! সেই প্রচণ্ড বর্ষা মাথায় ধরিয়া ফাৎনাতে সমস্ত মন সঁপিয়া বসিয়া আছে! কাশিম অগত্যা ছাতা খুলিয়া নিতাইয়ের পিছনে দাঁড়াইয়া বহিল। আর আকাশ ছাপাইয়া বর্ষাব অবিরাম ধাবা বম্বাম্ব শব্দে মতিয়া মহাসাগব-সৃষ্টিব উল্লাস-কল্লনায় অঝোরে ঝরিতে লাগিল।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### সূচিত্রা

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বৃষ্টি থামিল। পথ একেবারে নদী-নালায় রূপান্তরিত হইয়াছে। মাছ ধরার পূর্ব শেষ করিয়া নিতাই কাশিমকে প্রণাম করিল,—এ ছাতা কোথায় পেলি রে?

কাশিম ছাতার বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। 'তাকে যে দরদ করিয়া স্কুলের মেম-মা খাবার খাইতে দিয়াছে, সে কথাও গোপন করিল না। শুনিয়া নিতাইয়ের মন স্কুলের মেম-মাব প্রতি প্রসন্নতায় ভবিয়া উঠিল। তবে যে সে শুনিয়াছিল, বিবি-মা লজ্জেন্সের জাল পাতিয়া এ দেশের ছেলেগুলোকে ক্রীষ্ট ধর্মে আসক্ত করিয়া তুলিবার সঙ্কল্পে স্কুল খুলিয়াছে এবং এজ্ঞা পল্লীর যত ইতরের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া মোহিনী মায়ায় তাদের মুগ্ধ করিয়া ছেলে-গুলোকে বিনা-বেতনে স্কুলে ঢুকাইয়াছে—এ সব কথা অলীক রটনামাত্র! নহিলে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে বাহিরের ছেলে কাশিমকে ডাকিয়া খাইতে দিবে কেন? আর এই জলে ভিজিয়া পাছে তার অসুখ হয়, ইহা ভাবিয়া তাকে বিশ্বাস করিয়া ছাতাই বা ছাড়িয়া দিবে কেন? নিতাই বলিল,—গোটা সাতক মাছ আছে—তা...তোমার কটা চাই, শশীদা?

শশী কহিল,—একটা তলেই হবে। খাবার লোক তো আমি একমেবাস্থিতিঃ.....

নিতাই কহিল,—পাড়ার কাউকে দেবে না?



শশী কহিল,—ঐ হতভাগাগুলোকে ? রাম বলো !

নিতাই কহিল,—বেশ, আমি একটানেবো। একটা দেবো গফুরকে,...তারই পুত্র কি না। বাকী থাকে তাহলে চারটে ! এ চারটে কাশিমের ঐ মেম-মাকে দিয়ে যাই।...এতগুলি ছেলে স্কুলে পড়ে—তারা খেলে তৃপ্তি হবে। কি বলো শশীদা ?

শশী কহিল—এত ভিজে এত মেহনৎ করে ধরা মাছ...তা খাবে ঐ খ্রীষ্টানগুলো ?

নিতাই কহিল,—কাকে দিতে চাও, বলো ? তোমার কোন পরম হিন্দু বন্ধু আছেন, বলো, বাকে দিলে তুমি তৃপ্তি পাবে ?

শশী কহিল,—তা বটে ! যত ব্যাটা স্বার্থপর বদ-মায়েস। খাবার নোলা বাদের এতখানি, তাদের দেওয়ার চেয়ে...

শশীর মুখের কথা লুফিয়া নিতাই কহিল,—এই নিরীক্সবোধী খ্রীষ্টানদের মুখে দিলে তৃপ্তি...কেমন ? আমিও তাই বলছিলাম। ভাবো ঠাটা শশীদা, ঘবে বসে পরচর্চা করলে কি আরামেই এদের দিন কাটতো, তা না কবে গাঁটের পয়সা ব্যয় করে বাদের মুখের পানে চাইতে কেউ নেই,—সেই সব বেচারীদের খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, বিছা দান করচে ! এত বড় বেকুব...তা এ মাছ ঐ বেকুবদেরই খাওয়ানো যাক। এরা গেয়ে আর কিছু না করুক, অন্ততঃ এ কথা বলবে না যে, হতভাগা-গুলো খেতে মাছ ধরলে, আর তাদের ঠকিয়ে সে-মাছে আমরা রসনার কি পরিতৃপ্তি সাধন করলাম !

শশী এ শ্লেষেব অর্থ পূরাপূরি উপলব্ধি করিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল,—বলেচো ঠিক কথা নিতাই ! তাই চলো। কাশিমের তরফ থেকে এতে ধন্যবাদও ভালো রকম জানানো হবে।

নিতাই কহিল,—অন্ততঃ হিন্দু যে ছাত্তার স্বর্ণ স্বীকার করে, এ কথাটা খ্রীষ্টানদের বোঝানো যাবে তো !

শশী এ কথার অর্থ ঠিক বুঝিল না, শুধু বলিল,—চলো তাহলে।

গাছে অনেকগুলো লতা হুলিতেছিল। একটা লতা ছিঁড়িয়া সেই লতার বান্ধিয়া কাশিম মাছগুলো হাতে খুলাইতে নিতাই কহিল,—তুই একা পারবিসে, কানী,—কতগুলো আমায় দে। ছাত্তাটা বরং তুই নে। আব ছিপ্ হুটো তুমি ধরো শশীদা।

তিনজনে তখন অগ্রসর হইল। স্কুলের ছুটি হইয়া গিয়াছে। কাছাকাছি যে-সব বাড়ী হইতে ছেলেরা স্কুলে যোজ পড়িতে আসে, তারা সকলে চলিয়া গিয়াছে। স্কুলের খেলার মাঠে ছেলেরা সেই বল লইয়া মাতামাতি করিতেছে ; এবং দালানের বারান্দায় বেলিঙে ভর দিয়া একটা ভৃত্য আছড় ণ্ণয়ে ঝাঁড়াইয়া আছে !

তিনজনে আসিয়া স্কুলের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং নিতাই সেই ভৃত্যকে হাতছানি দিয়া ডাকিল,—ওহে ছোকরা...

ভৃত্য কাছে আসিল। শশী নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া কহিল,—এর হাতে সমর্পণ করা ঠিক হবে না। কোথা থেকে মাছ এলো, কেন এলো, কেউ বুঝবে না। তাছাড়া ছাত্তাটা যদি উড়িয়ে ছায়—কি বলো ?

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল,—দেশের লোক, স্বধর্মী হয়তো, কিন্তু তাকে কতখানি অবিশ্বাস করি, বলো দিকিনি শশীদা !

শশী একটু অপ্রতিভ হইল, কহিল,—কি জানি ভাই, আমার মন হয়তো ভারী ছোট...

নিতাই কহিল,—মন ছোট নয়। অবিশ্বাস অমনি জাগে না, শশীদা। বহু পরীক্ষায় মন এই অবিশ্বাসকে স্থান দেছে। এক কতখানি দুর্ভাগ্য, বলো তো !

এইটুকু বলিয়া কাশিমের পানে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল,—মেম-মা বল্লি না ?

কাশিম ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

নিতাই তখন ভৃত্যকে কহিল,—মেম-মা কোথায় রে ?

ভৃত্য পদ-মর্ষাদা বুঝাইতে ঠোঁট একটু বাঁকাইল ; তারপর অবিলম্বে কণ্ঠে উত্তর দিল,—বাসায়।

নিতাই কহিল,—বাসা কোথায় ?

বাংলাব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ভৃত্য কহিল,—ঐ।

নিতাই কহিল,—একবার সেলাম জানিয়ে বল যে, তিনটি লোক এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। দরকার আছে।

ভৃত্য কহিল—এখন তিনি চান করচেন, তারপর চা-টা খাবেন—এখন দেখা হবে না।

নিতাই বিরক্ত হইয়া কহিল,—আবে মব্, রাশভারি করচে গাখো। তারপর বেশ চড়া গলায় কহিল—চা খাচ্ছেন, কি কি করচেন, তোর অত বজুতার দরকার কি ? বলচি, দরকার আছে—তুই খপর দে দিকিনি ! ছুঁচো কোথাকার !

নিতাইয়ের বাঁজালো কথায় ভৃত্য একটু বিচলিত হইল। সাহেব মনিবের কাছে সে কাজ করিতেছে, এমন বাঁজ দেশী লোকের কাছ হইতে কখনো প্রত্যাশা করিতে পারে না। কিন্তু নিতাইয়ের বলিষ্ঠ দেহ আর স্পষ্ট কঠিন বর্ক বাড়াইবার সাহস তার হইল না। সে কহিল,—কাট্ আছে ?

কাট ! নিতাই একটু অবাক হইয়া ভাবিল ! পর-ক্ষণে হো-হো-করিয়া হাসিয়া কহিল,—ও, কার্ড ! ব্যাটার সব দিকে কেতা ছুরন্ত দেখচি !...কাট নেই,

তবে মাছ আছে, আর এই ছাতা—তোর মেম-মার ছাতা। যা, বল্ গে যা, ছাতা ফিরিয়ে দিতে এসেছি।

ভৃত্য কহিল,—তা দাও না!

নিতাই কহিল—তোর হাতে দেবো না। তারপর ভৎসনায় স্বরে কহিল—তুই খপর দিবি কি না বল্? নাহলে আমার যা করার করি।

ভৃত্য এবাব বিবাক্তির স্রবে কহিল—আচ্ছা, দাঁড়াও, আমি খপর দি। বলিয়া সে চলিয়া গেল বাংলার দিকে।

নিতাই কহিল,—দেখলে শশীদা, এই পুঁচকে চাকর ছোঁড়াটার আশ্পর্শ! তোব মনিবের সঙ্গে দেখা করতে এসেচে ভদ্র লোক, তা গ্রাহ্য কববি নে! তাকে দাঁড় কবিয়ে হাজার কথা তুলবি! সমাজেবদোষ যে দাও সব ব্যাপারে—এখানে তো তোমাব সমাজ নেই—তবু এ ব্যাটা এ বকম প্রবৃত্তি কেন, বলো তো? এ আর কিছু নয়—কৃশিকা আর কুসংস্কার একে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেচে যে একটুখানি সাহেব-মনিবের ঘেঁষ পেয়ে নিজেকে প্রবল প্রতাপাবিহীত ভাবে নিয়েচে! কলকাতায় অনেক সাহেব-স্ববেব সঙ্গে আমার দেখাশুনা করতে হয় তো, সেখানেও দেখেছি, সাহেববা আমাদের তরু অগ্রাহ্য কবে না, যতখানি করে তাদের চাকর-নফর-কোথারী-চাপবাশির দল। তাবা আমাদের দেশের লোক! দেশের লোককে দেশের লোক যেমন হীন চক্ষে দেখে, বিদেশী-লোকে তেমন দেখে না! ডোম-চাঞ্চালকে বামুন-কায়েত যে-চোখে দেখে, এই সব ডোমচাঞ্চাল চাকর-বাকর সাহেবেব তাঁবে দু-দশ টাকাব চাকরি পেয়ে বামুন-কায়েতকেও ঠিক সেই চোখে দেখে। এরহস্য আবিষ্কার করার চেষ্টা করে দেখো,—এ সবের মূলে সেই এক কাবল—ক্ষমতার দর্প। তা সে ক্ষমতা যতই বাতাসে-ঝরা হোক, যতই পঙ্গু হোক!

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কোনো জবাব দিল না। নিতাই ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া যে-ছেলেটি ফুটবল লইয়া খেলা করিতেছিল, তাকে ডাকিল। সে কাছে আসিলে নিতাই প্রশ্ন করিল—তোমবা এই স্কুলেই থাকো?

সে বলিল,—হাঁ।

—তোমাদের মা-বাপ যে ছেড়ে দেছে?

—মা-বাপ নেই।

—কে আছে?

সে কহিল, তার এক মামা আছেন, তিনিই কেনো সূত্রে খপর পাইয়া তাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছেন। আর একটি ছেলে কাছে আসিল; তাকে প্রশ্ন করিতে সে কহিল, তার বড় ভাই শুল্ল-বাড়ীতে থাকে—সেখানে তার থাকা দুঃসহ ঠেকিতে এখানে পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল—তোমাদের খরচ-পত্র তাঁরা দেন?

দুঃসহই কহিল, খরচ লাগে না। এখানে তাদের বিনা-খরচায় থাকিতে ও লেখাপড়া শিখিতে পাঠাইয়াছে।

নিতাই কহিল—জাখো শশীদা, দেশের লোক,—নিজের ভাই, মামা স্বদের পুষতে চায় না, কোন্ মূলুক থেকে বিধর্মী এসে তাদের বুক তুলে নিয়ে লালন-পালন করচে! সত্যি, এদেব কথা শুনে এদের উপর আমার এমন শ্রদ্ধা হচ্ছে যে ভাবছি, সারা দেশের লোক যদি ছুঁড়মুঁড় করে আচ্ছ জর্ডানের জল মাথায় দিয়ে খীষ্টান হয়তো আমি হবির লুট দি! দূর, দূর, যত ব্যাটা সমাজপতি...খালি এক-ঘরের বন্দোবস্ত নিয়ে পড়ে আছে! এ জাতে আবাব মানুস, এ জাতের আবাব সমাজ।

নিতাই অসংবদ্ধ অনেক কথাই বলিতে লাগিল। এমন কথা নিতাইয়ের মুখে শশী নিত্য শোনে, এবং শুনিয়া শুনিয়া সমাজকে হীনতার পঙ্কে মজ্জিত দেখিয়া তার বিরুদ্ধে শশীর মনও থাকিয়া থাকিয়া কুঁশিয়া ওঠে! কিন্তু এমন করিয়া সব খুঁটিনাটিগুলি তার চোখে পড়ে না এবং সে খুঁটিনাটিগুলির সম্যক আলোচনাও তাব দ্বাৰা সকল সময় সম্ভব হয় না।

নিতাইয়ের কথার তাব চোখেব সামনে সমাজের শত-ক্ষত-জীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন বীভৎসতায় ভরিয়া উদয় হইল যে, সে শিরিষা উঠিল। তার মনে হইল, যদি তেমন শক্তি থাকিত তো প্রবল চপেটাঘাতে ঐ সমাজের দৃষ্টি এদিকে ফিরাইয়া ধরিয়া সে বলিত, এগুলি সাবাইয়া তোলা, নহিলে তোব অস্তিত্ব দু'দিন পরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে! কিন্তু কাকেই বা সে একথা বলিবে? তাই চুপ কবিয়া নিতাইয়ের পানে সে চাহিয়া রহিল।

ভৃত্য ফিবিয়া আসিয়া জানাইল, মেম-মা এখন আসিবেন এবং বাবুবা ইচ্ছা কবিলে ঘরে আসিয়া বসিতে পাবেন।

নিতাই কহিল,—থাক, ভিজ কাপড়ে আর ঘরে ঢোকে না। এইখানেই দাঁড়াই। তোরা মেম-মা যতক্ষণ না আসেন। তারপর শশীর দিকে চাহিয়া কহিল,—এখানে এই স্কুলটুকু খুলতে এদের কম বেগ পেতে হয়েছে, শশীদা! তুমি তো জানো সব! এই গ্রামে এত ভদ্রলোকের বাস, অথচ একটা স্কুল নেই। বাবা নিজে থেকে কিছু টাকা দিতে স্বীকার হয়ে ঐ সহু বাঁড়ুঘর দলকে সেধেছিলেন, সকলে মিলে কিছু কিছু টাকা দিয়ে একটা ছোটখাট স্কুল নিদেন খোলো। নাই হলো কোঠা-বাড়ী,—আটচালাতেই ছেলেরা পড়বে। একটা স্কুলের আবহাওয়ায় লোকের লেখা-পড়ার প্রবৃত্তি জাগে কতখানি! তা সহু বাঁড়ুঘর দল সে-কথা কাণে তুললে না। তারপর এরা যখন আমাদের পাড়াতে

জমি নিতে আসে, তখন গাঁয়ের লোক এককাটা হয়ে বললে, খ্রীষ্টান এসে বৃকের উপর বসবে ! আরে বাপু, 'তারা তো তাদের তলোয়ার দেখিয়ে বলচে না যে, সকলে খ্রীষ্টান হ'। যদিও এটা স্থির, তলোয়ার দূবেব কথা, এরা একগাছা চাবুক দেখিয়ে যদি বলে, যে না খ্রীষ্টান হবে, তার বৃকে এই চাবুক পড়বে, তাহলে ঐ চরণ ভট্টাচার্য্য, সহ বাঁড়ুঘোঁট সবার আগে ছুটেবে পাঁচি-পুঁথি ফেলে বাইবেল নিতে !...এরা এলো তাদের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে। বিনা-পরসায় লেখাপড়া শিখবে, তাছাড়া খেলাধুলা করবে—না, হিন্দু ধর্মেব যত ব্যাটা চুড়ামণি গর্জে উঠলো, তিলান্দি জমি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করা হবে না ! এরা তাই এলো এই মুসলমান-পাড়ায়,—এসে জমি নিলে, স্থল খুললে। তাও না হয় ছেলেদের স্থলে পড়তে পাঠা, তাতেও বাদ ! ক্ষতি ক'ব ?

নিতাইয়ের কথা শেষ হইল না, তার পূর্বেই সূচিরা আসিয়া বাবান্দার দাঁড়াইয়া ভৃত্যকে কহিল,—বাবুদেব ভিতরে নিয়ে আয়।

তার আবিভাবে নিতাই ও শশী বিন্ময়েব সমাধিহল না। কাশিম কহিল,—ঐ যে মেম-মা এসেচে !... ইনিই মেম-মা !

যেন সাক্ষাৎ দেবী-বাণীপাণি তাঁর কমল-আসন ছাড়িয়া ইঠ-কাঠে-গড়া বাড়াটায় আসিয়া দাঁড়াইলেন ! চোখে জ্যোতি আব আশা একেবারে ঝলমল কবিতোছে ! ভার্জিন মেরি ছাব নিতাই হু'চারিখানা বইয়ের পৃষ্ঠায় দেখিয়াছে...এ যেন ভার্জিন মেরি স্বয়ং !

শ্রদ্ধায় তার মাথা আপনি নত হইল ! সে সূচিরাব পানে চাহিল।

মুহু হাশ্বে সূচিরা কহিল,—আপনারা ভিতবে আসুন।

নিতাই ফটকের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল,—ভিজ্ঞে কাপড়...

সূচিরা কহিল,—তাতে কি ! আসুন আপনারা। এই যে সে ছেলেটি। এসো...তারপর ভৃত্যকে কহিল,—তিনখানা চেয়ার নিয়ে আয় বাবান্দার।

ভৃত্য আদেশ পালন করিলে সূচিরা বলিল,—বসুন আপনারা।

নিতাই কহিল,—আপনি আগে বসুন।

সূচিরা আসন গ্রহণ কবিলে নিতাই চেয়ার টানিয়া বসিল এবং শশীকে বসিতে বলিল। শশী বসিল। কাশিমকে দেখাইয়া নিতাই কহিল,—এই ছেলেটির মুখে আপনার করুণার কথা শুনে বড় শ্রদ্ধা হলো—তাই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্ত সামাজ্য ভেট এনেচি। এই মাছ-গুলি...যে ছেলেদের স্নেহে-মায়ায় আপনি এই বনবাস শিখোদার্থ্য করেচেন, তাদের তৃপ্তির জন্ত এই তুচ্ছ

ভেট...তারা যদি খায়, আমাদের পরিশ্রম তাহলে সার্থক হবে।

সূচিরাব মুখ এ-কথায় সম্মিত হইয়া উঠিল। সে বলিল,—আপনার কথায় বুঝি, আপনিই ঐ অনাথ মুসলমান ছেলেটিকে আশ্রয় দিয়েচেন। আপনারই নাম নিতাই বাবু ?

নিতাই কহিল,—আমার নাম নিতাই। সামাজিক ভাবে খ্রীনিতাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায়। ব্রাহ্মণ-সন্তান। গলায় যজ্ঞোপবীত...

সূচিরা কহিল—আপনার মহত্বের পবিচয় কিছু পেয়েচি একটু আগে আপনার ঐ কাশিমের কাছে !

নিতাই লজ্জায় মাথা নত করিল ; পরক্ষণে কহিল—মহত্ব-টহত্ব বড় বুঝি না—একটা অনাথ ছেলে, কেউ কোথাও নেই, অথচ নিজের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানের শক্তি হয় নি, যোগে দেখবে এমন জনেরও অভাব, তাই তাকে কাছে রেখে তার কষ্ট যতখানি হাল্কা করা যায়—এই শুধু !

সূচিরা কহিল—ক'জন তা করে ?

নিতাই কহিল—সকলের প্রবৃত্তি সমান নয়। তা-ছাড়া তাদের সংসার আছে, জীবী-পুত্র আছে। আমার এমন কেউ নেই যাকে দেখতে হয়। আমার বোটের কাববার—কতকগুলো মাঝি-মাল্লা আছে—তাদের কাছ থেকে হিসেব নেওয়া—বাস্ ! তারা আমাকে ভালোও বাসে, জুয়াচুরি-তঞ্চকতা করে না ! অর্থাৎ লোকের কাছ থেকে ভালো ব্যবহাব পাওয়া শক্ত ব্যাপার নয়। একটু মিলি কথা আর তাদের ব্যাখ্যায় একটু দবদ-বাস্ !

এ লোকটির হুটা কথাতেই সূচিরা বুঝিল, কতখানি মহৎ প্রাণ ঐ শক্ত পেশীর নীচে বৃকেব মধ্যে ঢল ঢল কবিতোছে ! সে কহিল,—এ কথা ঠিক !

নিতাই তৎক্ষণাৎ কহিল,—এই আপনারদের কথা...যে শিক্ষা পেয়েচেন, এবং যে-ভাবে বড় হয়েচেন, তাতে অন্ততঃ ঘরে বসে আরামে আপনি সময় কাটাতে পারতেন ! তা না করে এই সব ইতর লোক—ভদ্র-দল যাদের অস্পৃশ্য বলে দুগায় দূরে সরে যায়—এ-ভাবে তাদের সঙ্গ দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, তাদের নিয়ে যে এই বাস করচেন, এতে কতখানি মহত্ব প্রকাশ পাচ্ছে, বলুন তো ! আপনারা খ্রীষ্টান—আপনাদের পাত্রী সাহেবদের পরোক্ষে যে দত্তীর অভিসন্ধিই থাকুক, প্রত্যক্ষভাবে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করে, মনুষ্যত্ব আর মর্যাদা-বোধ শিখিয়ে তাদের কি উপকার না করচেন ! পাত্রীরা কি বোঝে না যে, একশোজন হিন্দু-মুসলমানকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার প্রচেষ্টা হয়তো একেবারে নিফল হবে ! তবু এই দান, আর মমতা—এতে তো কখনো কৃপণতা কবচে

না! দেশে দেশে এই যে-সব ইনষ্টিটিউশন তারা খুলে, তার গুট উদ্দেশ্য যাই থাক, কতখানি লোক-সেবা হচ্ছে তাতে। আমাদের ঐ সব ছোট লোকেবা—আমাদের আরাম দিতে বাদের সৃষ্টি হয়েছে ভাবি, তাদের পোটা-ঝরা নোংরা ছেলেগুলোকে চোখে দেখলেই যে আমরা ঘৃণায় শিউরে সবে যাঁই। আর আপনারা তাদের নাকের পোটা মুছিয়ে কোলে তুলে নেন!...ধর্ম? আমাদের সমাজেও বহু ধর্মদ্বন্দ্ব আছেন, তাঁরা সেখানে হাঁকচেন—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, দুনিয়া অশুচি! আপনারা সেখানে বলচেন, কাছে এসো, কাছে এসো, ভাই, মিতা বন্ধু তোমরা।...তাঁই ভাবি, এতখানি দবদেও সাবা দুনিয়া আছো কেন খুঁটান হয়ে যায় নি!

সুচিত্রা কহিল—আপনি ভাবচেন আমি খ্রীষ্টান? তা নই। আমার খুব ছোট বয়সে মা মারা যায়, খ্রীষ্টান পাঞ্জীর হাতে আমি মানুষ হই। তিনি আমায় আদর করে সিসিল বলে ডাকতেন,—এই বা। কখনো খ্রীষ্টান হতে বলেন নি, মাথায় জল ছিটিয়ে খুঁট-ধোয়ে দৌফা দিতেও চাননি কোনোদিন। অথচ তা করার কতখানি সুযোগ ছিল! কবলে অপবাধও হতো না। এতখানি স্নেহ, এমন আশ্রয় যে পেয়েচে, কৃতজ্ঞতার জগৎ হয়তো সে খুঁটান হতে পারতো! বিশেষ, আমি খুঁটান হলে কোনো দিক থেকে যখন কোনো নিষেধ উঠতো না এবং খুঁটান-হিন্দু যখন আমার কাছে সমান! বাইবেল যেমন পড়েছি, তেমনি রামায়ণ-মহাভারতও চাইবামাত্র পড়তে পেয়েছি। আমাকে এঁরা এক দিনের জগৎ প্রার্থ্য করেন নি, আমি খুঁটান হবো কি না?

নিতাই একটু বিম্বিত হইল, কহিল,—আপনি তাহলে খুঁটান নন! আমার ধারণা ছিল, খ্রীষ্টান ছাড়া এখানকার কর্তৃত্ব অখুঁটানের হাতে পড়তে পারে না! আশ্চর্য্য কথা বটে!

সুচিত্রা কহিল,—যাক, শুধু বাজে কথা হচ্ছে, অথচ আপনারা ভিক্ষে কাপড়ে অপেক্ষা করচেন।

নিতাই কহিল,—আজ তাহলে আসি। আপনায় বেসাবাকে বলুন, মাছগুলো নিয়ে যেতে—আব এই ছাতাটা। এর আব দরকার হবে না। বৃষ্টি থেমে গেছে।

সুচিত্রা কহিল—একদিন হুপুরবেলা এসে স্কুল দেখে যাবেন। কি রকম কাজ হচ্ছে,...হাজাব হোক, মুখ জ্বীলোক তো আমি!

হাসিয়া নিতাই কহিল,—আমায় বুঝি মস্ত পণ্ডিত পাকড়েচেন! সে যদি বলেন তো আমার এই শশীদা আছে। ওর দাদা কলকাতার কলেজে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর ভারী উচু মন ছিল। মারা গেছেন। আব শশীদা আমার সঙ্গে মাছ ধবে বেড়ালে কি হবে, ওর পড়াশোনা

বেশ আছে। ওকে বরং এই স্কুলে ভর্তি করে নিন, ছেলে পড়াবার জগৎ। হুপুর বেলার পুকুরের মাছগুলো অন্ততঃ নিশ্চয় আরামে বাঁচবে তাহলে!

শশীকে নমস্কার জানাইয়া সুচিত্রা কহিল,—আপনিও আসবেন দয়া করে এঁর সঙ্গে স্কুল দেখতে।

শশী কহিল,—আসবো।

তার পর বিদায় লইয়া নিতাই, শশী ও কাশিম প্রস্থান করিল।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর

সহ বাঁড়ুঘোর বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সেই পথ। সহর রোষকে মজলিস জমিয়াছে। তামাকুর সঙ্গে অনেকের অন্তর্গত পোড়ানোর নানা প্রান চলিয়াছিল। হঠাৎ সেই পথে শশীকে মাছ হাতে আসিতে দেখিয়া কয়েকজন উদর-পরায়ণের নজর টাটাইল। শিবু কহিল,—তাঁইতো হে শশী, মাছ কোথায় পেলে?

শশী হাসিয়া কহিল,—ও-পাড়ার তাল গাছে।

—তাল গাছে মাছ! সে আবার কি কথা?

শশী কহিল,—এ মজলিসের যোগ্য কথা নয় কি? পুকুরে মাছ মেলে...তা তো বোঝেন! তবে জিজ্ঞাসা কবচেন কেন?

শিবু কহিল,—জিজ্ঞাসার মানে, কার পুকুরে ধরলে? মাছটি তো নেহাৎ ছোট-খাট নয়।

শশী কহিল,—তাঁই বলুন। দান নিয়ে বাচ্ছি না এও বুঝচেন নিশ্চয়!...ওই খুঁটানী স্কুলের কাছে মস্ত পুকুর আছে, সেখানকার মাছ।

জানশঙ্কর কহিল,—মুসলমান-পাড়ায়?

শশী কহিল,—হাঁ। এ মাছ চোখে দেখলেন, জাত গেল না তো? না, আমি ধরেছি বলে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাতে হবে? তবে মাছটা মুসলমান নয়, খুঁটান নয়, পরম হিন্দু! এই দেখুন কত বড় টিকি!

বলিয়া সে মাছ-বাঁধা লতাখণ্ডটুকু দেখাইল।

মজলিসে চরণ ভট্টাচার্য্যও বিরাজ করিতেছিল। সে এবাবে কথা কহিল। চরণ কহিল,—সব কথাই ডেঁপোমি করা কেমন স্বভাব? না? মিষ্টির লক্ষণই তাই...

শশী কহিল,—কি করি বলুন, যোসাহেব বিজ্ঞাটুকু আয়ত্ত করতে পারিনি, আর বান্দীপাড়ায় ঘুরতেও শিখিনি!

চরণ কহিল,—বান্দীপাড়ায় ঘুরবে কি হুখে, বাপু? বাড়ী আছে তো...ঝাখো, এবারে কি হাল করি!... বুঝলেন সহবাবু, এবার একটা বিহিত করুন।

শশী কহিল,—বলু তোর সহবাবুকে—আমি তার

ভাঁবেদার নই, তার মোসাহেবি করেও আমাকে অন্ন সংগ্রহ করতে হয় না। কি ধার দারি সহ বাঁড়ষ্যের যে, কথায় কথায় সহ বাঁড়ষ্যের নাম করিস্!...কথাটা বলিয়া শশী রাগে গজ্জ, গজ্জ, করিতে করিতে চলিয়া গেল।

মজলিস তখন শশীর দণ্ডের সমুচিত দণ্ডদানের জন্ত বিবিধ উপায় আলোচনা শুরু করিল। যত তর্ক, যত আলোচনাই হোক, এটা স্থির যে, চাল কাটিলে বা ক্ষেতের ফল নষ্ট করিলে ফলটা অত্যন্ত সুনিশ্চিত ও প্রত্যক্ষ হয়—কিন্তু ফল্ করিয়া আদালতে যদি নালিশ করিয়া বসে? ইংরাজের রাজত্ব—সমাজের সে অপ্রতিহত শক্তি এই কারণেই মুয়ডাইয়া আছে! এক-ঘরে করা? তাহাতেই বা এমন কি বাজিবে! বিবাহ দিবে, এমন একটা ভয়ী বা কণ্ডাও নাই। এক ভাঙ্ক—বিধবা! তার নামটাতে কালি মাখাইয়া ধুলায় লুটাইয়া জবরদস্ত শোধলওয়া যায়, কিন্তু যদি সেটা গায়ে না মাখে! শশীর নিজের পুঙ্খবিলি আছে, প্রজা আছে, বাগান আছে, আর স্নান করিবার জন্ত আছে গঙ্গার ঘাট। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়িয়া দিলেও শশী ও তার ভাজ যে কোনো ভোয়াক রাখিবে, এমন মনে হয় না! চরণ সে পরিচয় ভালো করিয়াই পাইয়াছে। ঘোমটা দিয়া থাকিলে কি হয়, ঐ ভাজের কি রাজ্জ, কি তেজ্জ! শশীকে জন্ম করিবার খুব সঙ্গীন-রকমের কোনো উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া সহ বাঁড়ষ্যের দল নিফল আক্রোশে গুমরাইতে লাগিল।

গৃহে কিরিয়া মাছটা উঠানে ফেলিয়া শশী ডাকিল—বোঁঠাকরুণ...

বিন্দু ছিল রান্নাঘরে—উলুনে আগুন দিতেছিল। শশীর আস্থানে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল,—এই যে এসেচো! এ যে মস্ত মাছ! একা খাবে কি করে?

শশী কহিল—দেখো তখন, কি করে খাই। ভাজা করো, চচ্চড়ি রাঁধো, কোল রাঁধো...আমি সব মাছ খাবো! ব্যাটার একঘরে করবে বলে শাসিয়েচেনা? খাশা, খুব খাশা। ক্ষুধিতে খেয়ে বাঁচবো! কাকেও মাছের একটা আঁশ দান করতে হে। না।

হাসিয়া বিন্দু কহিল,—এই যে দার্শনিক তত্ত্বও বেশ শিখেচো, দেখচি!

শশীও হাসিল, হাসিয়া কহিল,—নয় বোঁঠাকরুণ? বাঁচা যায় তাহলে! কাঁঠাল এলো, দে ওকে। মাছ আনলুম, দে ভাগ তাকে। কেন দে বাপু, এসেচে, নিজে তৃপ্তি করে খাই! এক-ঘরের মজা কত, ওরা বুঝুক, আমরাও বুঝি। এবারে রোজ একটা করে মাছ ধরে আনবো, আর পাঁচজনকে দেখিয়ে খাবো। বুঝলে বোঁঠাকরুণ, মাছ আনছিলুম—দেখে শিবু গোসাঁইয়ের নোলায় জল ঝরছিল!

বিন্দু কহিল,—খামো, খামো, আর পরের কথা নিয়ে ঘোঁট করে না। মুখ-হাত ধোও, ধুয়ে কাপড় ছাড়ো। এই বৃষ্টি মাথার উপর দিয়ে গেছে—এখন অসুখ না হলে হয়! তুমি যাও, আমি বটি এনে মাছ কুটি। কুটে রান্না চাপিয়ে দি...

শশী মাছ রাখিয়া মখ-হাত ধুইয়া ভিজা কাপড় বদলাইল; বিন্দু তখন মাছ কোটার ব্যস্ত। শশী কহিল,—একবার ঘুরে আসি বোঁঠাকরুণ...

বিন্দু কহিল,—কোথায় যাওয়া হচ্ছে, শুনি...

শশী কহিল,—নিতাইয়ের কাছে। আজ এক মজা হয়েচে বোঁঠাকরুণ...পাজীরা একটা স্কুল খুলেচেনা সেই মুসলমান পাড়ার ওদিকে?

বিন্দু কহিল,—হ্যাঁ, সেখানে ওলাবিবির তলায় যেতে দেখেচি বটে!

শশী কহিল,—সেই ইস্কুল আজ দেখে এলুম। একটা বাঙালী মেয়ে সেই স্কুলের কর্তা নহ, কর্ত্রী। অর্থাৎ স্কুল দেখাশুনার ভার তাঁর উপর। মেয়েটি খ্রীষ্টান নয় দেখে এমন আনন্দ হলো। আমাদের বাঙালীর মেয়ে খালি রান্নাবান্না, বাটনাবাটার মস্ত না থেকে এত বড় কাজ করচে, যে-কাজে অনেক পুরুষ এগুতে ভয় পায়। বাঙালীর মেয়ের এ-মুর্তি...সত্যি বলচি বোঁঠাকরুণ, আমাদের শাস্ত্রে বিদ্যার দেবতাকে যে মেয়ে-মাছুষ বলা হয়েচে, সে খুব ঠিক! অত দরদ করে মমতা করে বিদ্যা কে শেখাতে পারে? মেয়েটিকে দেখে শাস্ত্রকারের তৈরী দেবী বীণাপাণির স্তবটুকু মনে পড়ছিল...যা শুভ্র-বস্ত্রাবৃত্তা, যা বীণা-বরদগুমুস্তিত-ভূজা যা শ্বেত-পদ্মাসীনী! তাঁকে দেখে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, স্কুলের চেয়ারে বসে নেই—মেয়েটি যেন শ্বেত-পদ্মে বিরাজ করচেন!

বিন্দু কহিল,—সত্যি?

শশী কহিল,—সত্যি বোঁঠাকরুণ! ভাখো, ছোট ছেলেকে মা যখন হাতে-খড়ি দিয়ে ক-খ শেখান, তখন ছেলে কত সহজে শেখে! কিন্তু তারপর পণ্ডিতের হাতে পড়ার ভার যেই পড়ে, অমনি সেই ছেলে ফাঁকির ফন্দী আবিষ্কারে মাথা খাটাতে লেগে যায়। আমার মনে হয়, স্কুলে ছোট ছেলেদের পড়ানোর ভার যদি মেয়েদের হাতে দেওয়া যায়, ঐ গুঁপো মাষ্টার-পণ্ডিতদের তাড়িয়ে, তাহলে ঢের ভালো হয়। পুরুষ মাষ্টার শুধু শাসন করতে জানে। ছেলেদের আশ্রয় মেনে দরদে-এসেচে তাকে পড়া শেখাতে পারে শুধু মেয়েমানুষ! এক তো, ধৈর্য্য না থাকলে ছেলেমেয়ে পড়ানো সম্ভব নয়—পুরুষ চিরদিন ধৈর্য্য-হারা! ধৈর্য্য যা, তা আছে শুধু মেয়েমানুষের!...

বিন্দু মুহু হাসিল। তার মনে হইল, তার নিজের কথা! এই যে, সংসারে তার কি কাজ! রান্না-বান্না ঘর-সংসার

দেখা। কতটুকু সময় বা! তারপর দিনের দীর্ঘ অবসর! এ যে কি করিয়া কাটে! এ সময়টায় যদি দুই-চারজন ছেলে-মেয়েকে লইয়া তাহাদের পড়াইতে পারিত, তাহাদের হাসি-খেলা-ধুলায় সঙ্গ দিয়া মাতুষ করিয়া তুলিবার কাজও পারিত!

শশী কহিল,—তুমি ভাবচো, মেয়েটি খ্রীষ্টান? মোটেই নয়। আমরাও তাই ভাবতুম। কিন্তু তিনি বললেন, তিনি খ্রীষ্টান নন। অন্যথা,—ছেলেবেলায় বাপ-মা হারিয়ে পাত্রীদের ঘরে মাতুষ হয়েচেন, লেখাপড়া শিখেচেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো কি না—তাই শুনলুম। একাদিন তাঁর স্কুল দেখতে যেতে বললেন...

বিন্দু কহিল,—যেহা। আর ফিরে এসে আমার তাঁর কথা বলো।

শশী কহিল,—নিশ্চয় বলবো।...তাহলে ঘুরে আসি...

বিন্দু কহিল,—শীগগির ফিরো ভাই। একলাটি থাকি...

শশী কহিল,—এখনি ফিরবো।

শশী চলিয়া গেল এবং বিন্দু মাছ কুটিয়া বান্না চড়াইয়া দাওয়ায় আসিয়া বসিল। দাওয়ার একটা আলো জ্বলিতেছিল। আলোর সামনে সে একখানা বই খুলিয়া বসিল।

কতক্ষণ বই পড়িতেছে—হঠাৎ একটা শব্দে চমকিয়া চাহিয়া বিন্দু দেখে, উঠানে একটা ছায়া পড়িয়াছে। মাতুষের ছায়া। বিন্দু সভয়ে প্রশ্ন করিল,—কে?

ছায়া নড়িল না। বিন্দু উঠিল। দাওয়ার এককোণে একটা লাঠি ছিল। লাঠিটি তার স্বামীর। সেট লাঠি হাতে লইয়া বিন্দু উঠানে নামিল,—গা একবার ছম্-ভম্ করিয়া উঠিল। ভয়ে। সে ভয় দাবিয়া বিন্দু কহিল,—কে? জবাব দাও।

তবু কোন সাড়া নাই,—ছায়া নিশ্চল। বিন্দু তখন আর একটু অগ্রসর হইল, কহিল,—জবাব না দিলে আমি এখনি চাঁচাবো। বলো, কে...?

ছায়া এবার নড়িল। বিন্দু লক্ষ্য করিয়া দেখে, উঠানে বড় চাপা গাছের আড়ালে একজন মাতুষ। সে চমকিয়া উঠিল, তারপর কহিল,—কে তুমি...? কথার সঙ্গে সঙ্গে হাতের লাঠি উদ্ধত করিয়া ধরিল এবং মন্থ-মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়া সম্মুখে লাঠি চালাইল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্দ্রনাদ তুলিয়া মূর্ত্তি ভুলুঙিত হইল। আকাশে ক্ষীণ চন্দ্রালোক—সে আলোর ভালো কিছু লক্ষ্য হয় না। তাড়াতাড়ি আলো আনিয়া বিন্দু দেখে, লোকটা পড়িয়া আছে!

ভয়ে তার আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। ঘটিতে জল লইয়া সে তার মুখে-চোখে দিল। লোকটা চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখে বক্ষ কটাক্ষ।

সর্বনাশ—এ কে? কাহাকেই বা সে এখন ডাকে? পাড়ার কাহাকেও ডাকিলে কেহ আসিবে না—মাঝে হইতে...

কি করা যায়? শশীর উপর রাগ হইল। এত রাত্রি হইতে চলিল, তবু তার গল্প আর শেষ হয় না! বাহির হইলে ঘরের কথা এমনি ভুলিতে থাকিতে হয়!...

তবু উপায় যখন নাই, তখন ভয়ে নিশ্চল থাকিলেও তো চলিবে না! ভগবানকে স্মরণ করিয়া লোকটার পানে চাহিয়া স্বদৃঢ় কর্তে সে কহিল,—চোর! এখনো পড়ে আছে! যাও এখনি...

লোকটা কাতর ভাব দেখাইয়া ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল,—আমার পায়ে চোট লেগেচে। উঠতে পারছি না...

বিন্দু কহিল,—যেমন করে পারো, যাও। নাহলে এখনি লোক ডাকবো। শেষে থানায় যেতে হবে!

লোকটা কহিল,—আমায় ধরে যদি একটু তুলে দাও, তাহলে চলে যাই। পুলিশে দিয়ে না—দোহাই!

এ-কথায় বিন্দুর মমতা জাগিল। সে তাব হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে উঠাইল। লোকটা উঠিয়া গায়ের কাপা বাড়িতেছে, এমন সময় বাহির হইতে কেহাঁকিল,—শশী আছে?

চরণ ভট্টাচার্য্যের গলা। বিন্দুর সর্বাস্র কঁপিয়া উঠিল। এক আপদ না যাইতে...

চকিতে চরণ আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল, তার পিছনে সহ বাঁড়ুখো, শিবু গোসাঁই প্রভৃতি। বিন্দু সসঙ্কোচে ঘুরে সরিয়া গেল। চরণ কহিল,—কে তুমি, বাপু?

লোকটা কহিল,—আজ্ঞে, আমি এঁদের আপনার লোক...অর্থাৎ—এবং এইটুকু বলিয়াই সে কোনমতে একটু অন্তরাল সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

বিন্দু অবাক! এইমাত্র যে উঠিতে পারিতেছিল না, সে এমন ফশ্ করিয়া ছুটিয়া পলাইল—আর ও কি বলিয়া! তবে কি...

এ যে কি, তা'ও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইল চরণের পরের কথায়!

চরণ কহিল,—দেখলেন সকলে! আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শশী চলে গেল, আর তার পরই ঐ লোকটা ফশ্ করে বাড়ীতে ঢুকলো! তাই আপনাদের খপর দিলুম। হুঁ! আমি চরণ ভট্টাচার্য্য—হুঁ'বেলা সন্ধ্যাহিক না করে জল গ্রহণ করি না—আমার অপমান! আমার মিথ্যাবাদী সাবাস্ত করা!

সহ বাঁড়ুখোর দল সম্মুখে কহিল,—এ তো ভালো কথা নয়...ক্ষেত্রে আমাদের কি মাতুষ ছিল। আর তার বিধবার এই রীত! গায়ের বুকে বসে! আশ্পর্শ কয় নয়!

কথার কথা বাড়িয়া উঠিতেছিল! এবং চরণের ইত্যর

ইঙ্গিত-ভরা টিপ্পনীসঙ্গে সে সব কথা এমন জটিল ও হৃৎসহ হইয়া উঠিল যে বিন্দু সে কথার আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। চোখের সামনে হইতে লঠনের আলো, আকাশের ঐ ক্ষীণ স্ফোৎস্ব দপ্ করিয়া নিবিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে কখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল! সে কম্পিত দেহে রোগ্যকের পাশে মূচ্ছিত হইয়া পড়িল।

ঠিক এমনি সময়ে শশী আসিয়া গৃহে ঢুকিল। উঠানে ভিড় দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইল। পরে যখন দেখিল, সে ভিড় ভ্রমাইয়াছে চরণ ভটাচাঞ্চ ও সহ বাঁড়ুয়োর দল, তখন বাগে জলিয়া সে চীৎকার তুলিল, —‘আমার বাড়ী ঢকেচো সব কোন্ সাহসে? বেরোও, এখনি বেরোও,—নাহলে সব খুন করবো।’

চরণ আপনার দেহকে একেবারে সঙ্কুচিত করিয়া চাপাগাড়ের অন্তরালে সরিয়া পড়িল। সহ কহিল,—‘কি মিছে চ্যাচামেচি করচো, পাগলের মত। তোমাব ভাজেব ব্যবহার ক্রমশঃ যে অসহ্য হয়ে উঠিলে,—সে পপর বাধো?’

শশী কহিল,—‘আমার ভাঙ্... তাঁর খপর আমি বাখবো। তোমাদেব সে খপবের ভাজে মাথা-বাখা কিসেব?’

শিবু কহিল—‘তুমি বাড়ী নেই, সে সময় অপব অচেনা পুরুষ এসে তোমাব ভাজেব সঙ্গে আলাপ করবে, এই বা গ্রামে থেকে আমরা সহ্য করবো কেন?’

শশী হুঙ্কার তুলিল,—‘কি!’

জ্ঞান কহিল,—‘কিসেব চোখ বাধাও! লোক-জন ডেকে আলাপ করার সখ যদি তাঁর হয় তো গ্রামের বাইরে চলে যান। এখানে আমরা এ-সব ববদান্ত করবো না। এতে থানা-পুলিশ করতে হয়, স্বীকার।’

বাড়ী-চড়া হইয়া এ ভাবে অপমান! শশী কহিল,—‘আমার ঘরে আমার লোক যা খুশী করবে, তোদের কি? বেবো সব, বলচি—নাহলে মাখা ফাটিয়ে দেবো... বলিয়া সে পাগলের মত লাটিগাছটা কুড়াইয়া একেবারে যেন নাচিয়া উঠিল। তার সে রুজ-মুর্জি দেখিয়া সহব দল ভয় পাইল এবং বিনা বাক্য-ব্যয়ে দ্রুত অপস্থত হইল।

তারা চলিয়া গেলে শশী রোগ্যকের দিকে করিয়া দেখে, বিন্দু মূচ্ছিতার মত পড়িয়া আছে। এরা কি কোনো অত্যাচার করিয়া গিয়াছে? উঠানে দাদাব লাটি, ওধারে জলের ঘটী পড়িয়া... ব্যাপার কি? শশী তাড়াতাড়ি বিন্দুর কাছে গিয়া ডাকিল,—‘বৌঠাকরুণ...’

বিন্দু চোখ মেলিয়া চাহিল, অতি ক্ষীণ স্বরে কহিল,—‘ঠাকুরপো—’

শশী বিন্দুকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তুলিল। বিন্দু বসিল। কিন্তু এ কি চেহারা বিন্দুর! যেন কতকাল আহ্বার নাই, কত দীর্ঘ দিন যেন মত্ত রোগে ভুগিয়াছে! চোখে-মুখে তেমনি কালির রেখা!

শশী কহিল,—‘কি হয়েছিল বৌঠাকরুণ?’

লজ্জায় ঘুণায় হুঃখে বিন্দুর যেন চেতনা ছিল না! অতি কষ্টে শশীর পানে চাহিয়া হতাশ ভগ্ন কণ্ঠস্বরে সে কহিল,—‘বলচি... আমার নিয়ে চলে! ঠাকুরপো।’

শশী বিন্দুকে ধরিয়া রোগ্যকে আনিয়া বসাইল। তাবপর উষ্মেগের উত্তেজনায় সে উঠানময় ঘুরিয়া বেড়াইল। বহুক্ষণ পরে বিন্দু ডাকিল,—‘ঠাকুরপো...’

শশী কাছে আসিলে বিন্দু ধীরে ধীরে সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শশী রাগে ফুলিয়া উঠিল,—‘এবার শশী বামুনকেও ওরা দেখবে,—পড়ে পড়ে খ্যাংলানি খাবো, খেয়ে পালাবো বা দম্বো, এমন শখা আমি নই! ঐ যত ব্যাটা গোঁড়াকে পা দিয়ে চেপে একবার ভালো করে ছানাবো, শশী বামুনের শক্তি কতখানি!—ঐ চকণে ব্যাটা... ফাঁসি-কাঠে ঝুলি যদি সেও আচ্ছা, ওকে কুস্তা দিয়ে খাওয়াবো—ওব বামনাগিরির শ্রাদ্ধ কববো তবে ছাড়বো!’

বিন্দু কহিল,—‘শোনো ঠাকুরপো, ও-সব পাগলামি ছাড়ো ভাই। ‘তুমি একা, ওবা অত লোক! কি কববে? শেষে তোমাব প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটে যদি? ওদের অসাধ্য কাজ নেই।’

এক অজানা আতকে বিন্দুর সর্ব-শরীর শিহরিয়া উঠিল।

শশী কহিল—‘তুমি কোনো ভয় কবো না। বাড়ীতে আমি ছিলুম না বলই ওদের ছাতি ফুলেছিল অতখানি! আমি বাড়ী ঢুকতেই ছুঁচোর মত সন্কেগেল! ওদের বড়াই শুধু দুর্বল মেয়ে-মাছুবেব সামনে!... আচ্ছা, যে-লোকটা প্রথমে ঢোকে, তাকে তুমি চিনতে পারো?’

বিন্দু কহিল,—‘না।’

শশী প্রশ্ন করিল,—‘দেখতে কেমন?’

বিন্দু কহিল,—‘তা কি দেখেচি লক্ষ্য করে! চোর ভেবে ভয়েই আবো সাবা। তবু সাহস করে লাটি নিয়ে এগিয়েছিলুম, ভেবেছিলুম, তোমার দাদাব লাটি! তাই কেমন বল পেয়েছিলুম। নাহলে আমায় তো জানো, চোবের নামে ভয়ে অজ্ঞান হই।’

শশী ভ্রুকৃষ্ণ করিয়া কহিল,—‘লাটি তার গায়ে লেগেছিল?’

বিন্দু কহিল,—‘পায়ে লেগেছিল।’

শশী কহিল,—‘তার চেহারা একেবারে লক্ষ্য কবোনি?’

বিন্দু কহিল,—‘মাখার কৌকড়ানো চুল, চোখের নীচে কালি, খোঁচা দাড়ি, আর গালে স্পুরির মত একটা কালো তিল!’

শশী কি ভাবিল, পরে একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল,—‘হঁ। ওদেরই দলের কেউ। সন্ধান নিছি। দেখি, তার বৃকের পাটা কত-বড়!’

## যষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## বিজলী

সুচিত্রা গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। স্কুল হইতে সোজা পথ গিয়াছে গঙ্গার ধারে। গঙ্গার ধারে কয়েকটা ইট-খোলা। ইট-খোলার পাশ দিয়া সে আসিয়া স্বেটিতে উঠিল।

স্কুলছড়িতে একটা কটন মিলও আছে—মিড্‌ল্যান্ড কটন মিল। এ কেটিটি সেই মিলের সংলগ্ন। নদীর লাল ঘোলা জল বৃষ্টিব পর শান্ত স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর বুকে কয়েকখানা নৌকা। তৃতের মত ক'জন লোক সে নৌকার বসিয়া ইলিশ-মাছ ধরিতেছে। সুচিত্রা স্বেটিতে আসিয়া ঐ জলে ধারে পা খুলাইয়া বসিল। জলের অগাধ প্রসাব...মন তাব কোন অজানা অসীমে ছুটিল।

সামনে ভবিষ্যৎ—তারো এমনি প্রসার। জীবনে চাহিবার তার কি আর আছে? এই ছেলেদের লইয়া খেলাধুলা করা, যতটুকু সাধ্য জানের বাতি ধরিয়া এই সব অবহেলিত বালক-বালিকার চিন্তে আলো জালিয়া তাদের জীবনে যতটুকু পাবে অস্পষ্টতার মাঝে আলো ধরিয়া দেওয়া...এ যে কত বড় কাজ! এরা যখন লেখা-পড়া শিখিয়া মানুষ হইবে, ইতর অবোলা পশুর মত পরের সর্বপ্রকার দাসত্ব শিরোধার্য করিয়া শুধু হুঁমুঠা অন্নের সংস্থান ঘটাইল এই কৃতার্থ হইবে না, জীবনের অর্থ বুঝিয়া বিরাট কর্তব্য-শালায় আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করিবে...সে শুভ উজ্জ্বল সুন্দর ভবিষ্যৎকে কল্পনার চোখে দেখিয়া সুচিত্রা কি তৃপ্তিই অনুভব করিল। কল্পনায় সে বতীন ছবি দেখিয়া তার মুখ-চোখ সম্মিত হইয়া উঠিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে ডাকিল,—সুচি..

চমকিয়া ফিরিয়া সুচিত্রা দেখে, পিছনে বিজলী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুচিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া কহিল—তুমি...!

বিজলী হাসিয়া জবাব দিল,—হ্যাঁ। তুমি ভাবনার এমন তন্ত্রর যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি, তা জানতে পাবো নি!...কি ভাবছিলে?

সুচিত্রা কহিল,—কত কি...

বিজলী অগ্রসর হইয়া সম্মুখে সুচিত্রার হাতখানি নিজের হাতে ধরিয়া কহিল,—কি ভাবছিলে, সুচি?

সুচিত্রা কহিল,—আমার স্কুলের কথা। ভাবছিলুম, এই যে ছেলেরা লেখাপড়া করচে, এরা যদি সত্য মানুষ হয়ে ওঠে কোনো দিন...জীবনের অর্থ বা লক্ষ্য যারা পুঙ্খানুপুঙ্খ বোঝেনি...সে কি চমৎকার হবে!

বিজলী কহিল,—তোমার এ পরিশ্রম কখনো নিফল হবে না, সুচি। তোমার হাতে সেই রূপকথার সোনার

কাঠি আছে। তুমি জানো না—সে সোনার কাঠির পরশ যে পাবে, মানুষ তাকে হতেই হবে।

সুচিত্রা বলিল—ও সব কথা থাক। তুমি আজ এই সন্ধ্যায় হঠাৎ এখানে যে?

বিজলী কহিল,—নেহাৎ হঠাৎ নয়। বাটার সাহেব দেখা করতে বলেছিল তাই এসেছি।

সুচিত্রা কহিল,—বাটার সাহেব?

বিজলী কহিল,—ওপারে যে পাটের কল আছে, তারি বড় সাহেব বাটার। সে আজ আমায় আসতে বলেছিল...এই অবধি বলিয়া বিজলী একবার থামিল, থামিয়া পরক্ষণে কহিল,—ওই মিলে আমি চাকরিব চেষ্টা করছিলুম। গাওয়ার সাহেব চিঠি দিয়েছিল...

সুচিত্রা কহিল,—তুমি তাহলে ইস্কুলের কাজ ছেড়ে দিচ্ছ?

বিজলী কহিল,—হ্যাঁ। তাতে ভবিষ্যৎ উন্নতির কি সম্ভাবনা আছে। স্কুল-মাষ্টারী করে কাটাবার জন্মই কি এ ছলভ নর-জন্ম গ্রহণ করেছি, সুচি? তার চেয়ে ঐ পাটের কলে ঢুকতে গেলে একদিন লক্ষপতি হবার সম্ভাবনা!

সুচিত্রা কহিল,—এ কি ভালো হলো?

বিজলী কহিল,—খুব ভালো। এই যে জীবনকে উপভোগ্য করবার জন্ম চারিদিকে বিচিত্র আয়োজন পড়ে রয়েছে, পরসী না থাকলে তার কোনোটাকেই আয়ত্ত করতে পারা যাবে না। খাওয়া-পরা নিয়ে উন্মত্ত থাকলেই তো চলবে না! সে খাওয়া-পবার মধ্যে বৈচিত্র্য চাই। তাছাড়া ভালো বাড়ী, মোটর, দাস-দাসী...এ-সবের কল্পনা করার শক্তিও যে লোপ পেয়ে যাবে সুচি, স্কুলে মাষ্টারি করতে করতে! জীবনকে আমি উপভোগ করতে চাই—শুধু বলে বেড়ানো নয়...

এ-কথার সুচিত্রার আজন্মের সংস্কারে বেশ আঘাত লাগিল। সে স্তব্ধ হইয়া বিজলীর পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ সেই বিজলী! পাজী সাহেব যাকে অনাথ অসহায় দেখিয়া বুক তুলিয়া নিজের গৃহে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন! সে আশ্রয় না পাইলে কোথায় কি দশায় যে থাকিত, তার কোন ঠিকানা নাই! পাজী সাহেব কতদিন বলিয়াছেন,—তোমরা ছ'জনে শিক্ষা-দানকেই জীবনের ব্রত করিয়ে। ভারতবর্ষে শিক্ষার বড় অভাব। এই শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্য আর মৃত্যু এত-বড় জাতিটাকে নষ্ট করিয়া দিতেছে, জীর্ণ কঙ্কালে পরিণত করিতেছে!

সুচিত্রা কোন কথা না বলিয়া বিজলীর পানে চাহিয়া রহিল। বিজলী কহিল,—কি দেখচো?

সুচিত্রা কহিল,—এর মধ্যে তুমি এতখানি বৈষয়িক হয়ে উঠেচো...তাই দেখছি।



বিজলী কহিল,—বৈষয়িক কথাটা ঠিক খাটে কি ? তা নয়। যখন মানুষ হয়ে জন্মেছি, তখন মানুষের মত বাস করতে চাই।

সুচিত্রা কহিল,—বিলাসিতা না হলে কি মানুষের মত বাস করা চলে না ? মানুষ আর বড়-মানুষ...দুটো এক বস্তু নয়।

বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—তোমার কথার মানে ঠিক বুঝতে পারলুম না।

সুচিত্রা কহিল,—কাদারের কাছে যে-প্রতিশ্রুতি...

বিজলী কহিল,—প্রতিশ্রুতি আবার কবে দিলুম!

সুচিত্রা কহিল,—কথায় না দি, তাঁর ইচ্ছা ছিল...

বাধা দিয়া বিজলী কহিল,—জানি। কিন্তু শক্তি থাকতে দারিদ্র্য বরণ করবো কেন ? এখন ? একলা আছি। যদি বিবাহ করি...যদি কেন ? বিবাহ তো করবো একদিন। একটা সংসার গড়ে তুলবো। সে সংসারের সব ভার, সব দায়িত্ব বহন করবার যোগ্যতা থাকা চাই। সে যোগ্যতা অর্জন না করে বাহিরের কটি প্রাণীকে এনে সংসার গড়বার চেষ্টায় তাদের উপর অবিচারই প্রকাশ পাবে সুচি...সংসারে একা থাকায় আর যার মতি থাকে, থাক! আমি নিঃসঙ্গ জীবনের পক্ষ-পাতী নই। কাজেই আর্থিক অবস্থা ভালো করা চাই। আর্থিক অবস্থা ভালো হলে, শুধু নিজের নয়...আবো পাঁচজনের অনেক উপকার।

বিজলী সুচিত্রার পানে দীপ্ত নেত্রে চাহিল, সুচিত্রা বিজলীর পানেই চাহিয়া ছিল। হৃৎকেন্দ্রের দৃষ্টি মিলিলে বিজলী হাসিল; হাসিয়া কহিল,—জানো তো সুচি, এ মনে কি আশা বয়ে আসে...জীবনের পথে পা দেওয়া ইস্তক...

সুচিত্রার দৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগিল। বিজলী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—তোমার নিম্নে যে সংসার পাতবো, সে সংসার বইবার যোগ্যতা থাকা চাই...তোমার স্বাচ্ছন্দ্যে কোথাও না বাধে।

সুচিত্রার মুখের উপর কে যেন অতর্কিতে আঘাত করিল। লজ্জায় সে মুখ নামাইল। তার কর্ণ-মূল অবধি লজ্জায় রাঙা, তপ্ত হইয়া উঠিল।

বিজলী কহিল,—আমার এ আশা কি হুঁশা, সুচি ? কথাটা বলিয়া সে সুচিত্রার হাত ধরিবার জন্তে অগ্রসর হইল।

সুচিত্রা হুঁপা সরিয়া গিয়া কহিল,—তা ভেবে দেখিনি কখনো।...ও কথা থাকুক। এই অবধি বলিয়া সে অল্প কথা পাড়িল, কহিল,—এই স্থলের কাজ আমার এত ভালো লাগচে যে, এক কাজ ফেলে অন্য কোনো দিকে আমি মন দিতে কখনো পারবো কি না, জানি না।...কথাটা বলিয়া সুচিত্রা শূন্য আকাশের পানে চাহিয়া

বহিল। বৃষ্টি, তার চোখের সম্মুখে ভবিষ্যতের সে অপকল্প ছবি ফুটিয়া উঠিতেছিল।

বিজলী কহিল,—কিন্তু জীবনের সার্থকতা তাতেই নয়, সুচি। একটা গৃহ, সংসার পেতে বসি...তাতে প্রচুর আনন্দ। এ কাজ হয়তো কালে নীরস প্রাণহীন হবে একদিন—কিন্তু যে-কাজে স্নেহের স্পর্শ, সে-কাজ কখনো বিরস হবার নয়।

সুচিত্রা কহিল,—এর মধ্যে স্নেহের অভাব কোথায় দেখলে ? এই সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে থেকে বাস করে স্নেহের অভাব কোনো দিন বোধ করবো না।

বিজলী কহিল,—যাক, ও নিয়ে এখন তর্ক তুলতে চাই না। যদি কোনো দিন যোগ্যতা অর্জন করতে পারি, সেদিন আমার প্রার্থনা নিয়ে তোমার দোরে এসে দাঁড়াবো। আমাদের জীবন এক সঙ্গে বেড়ে উঠে...এব মধ্যে ভগবানের কি কোনো ইঙ্গিত নেই ?

সুচিত্রা কহিল,—ও কথা থাক। এখন তোমার কাজের কথা বলো। রটারসাতের কাছ গিয়েছিলে ?

বিজলী কহিল,—গিয়েছিলুম। সাহেব নিতে রাজী। কেনই বা নেবে না ? একে মিশনারীদের কাছে মানুষ হয়েছি, তার উপর গাওড়ার সাহেবের সুরাশি। সাহেব আমার গ্র্যান্ডমাস্টার ম্যানেজার করবে। আপাততঃ দুশো টাকা মাহিনা। মাহিনা যাট হোক—অল্প পাঁচ রকম রোজগার আছে বিলক্ষণ। সাহেব নিজেরও সে-কথা বললে।

কথাটা বলিয়া বিজলী হাসিল। সুচিত্রা বিশ্বস্তপূর্ণ দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিয়া বহিল।

বিজলী কহিল,—কি ভাবচো ?

সুচিত্রা কহিল,—আবো পাঁচ রকমের মানে ? ঘুঘু ? বে-আইনী রোজগার ?

বিজলী কহিল,—বাইবেল মানলে সেই অর্থ দাঁড়ায়; কিন্তু ব্যবহারে এটা জায়-সঙ্গত দাঁড়িয়েচে। মনিব মিলওয়ালা তা জানে। আর তা জানে বলেই মাহিনার হার দুশোর উদ্ধে তুলতে চায় না। সাহেব স্পষ্ট বললে, দুশো টাকা মাহিনা হলে কি হয়, বুদ্ধি থাকলে মাসে হাজার দেড় হাজার টাকাও রোজগার করতে পারবে। তবে হুঁশিয়ার—কোম্পানিকে বাঁচিয়ে চলা চাই। তাহলে নিজের বাঁচতে পারবে।

যিকারে সুচিত্রার মন ভরিয়া উঠিল। সুচিত্রা কহিল,—ছি! লেখাপড়া শিখে এক কথা এমন অনায়াসে তুমি বলচো কি করে!

বিজলী কহিল,—তোমার পুঁথি-গত জীবনেই তুমি বদ্ধ হয়ে বইলে সুচিত্রা! সংসারকে লোকে কর্তৃ-ক্ষেত্র বলে কেন ? কর্তৃক্ষেত্রে নামলে পুঁথি বুদ্ধিকে বহু কাট-ছাঁট করতে হয়—নাহলে জীবন হয়

গজলিকা-প্রবাহে ভেসে চলে, নয়তো জীবন-স্রোতে  
পসুতা আসে। মাছুষ জড় পুতুল হয়ে দাঁড়ায়!

সুচিন্তা কহিল,—তোমার এ ফিলজফি আমি গ্রহণ  
করতে পারবো না, বিজলী!

বিজলী কহিল—ইস্কুলে ফিরবে?

সুচিন্তা কহিল,—একটু পরে ফিরবো।

বিজলী,—আচ্ছা, আমি যাই। আমার একটু কাজ  
আছে। চাকরিতে বাতাল হই, তারপর একদিন এসে  
দেখা করবো।

বিজলী চলিয়া গেল। সুচিন্তা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া  
রহিল—দৃষ্টি তার শূন্যে নিবদ্ধ।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ

#### পিঙ্গর-পর্ক

গৃহের সম্মুখে উঠানে একটা কাঠের টুলে নিতাই চুপ  
করিয়া বসিয়া ছিল। প্রভাতে সূর্য্য পেয়ারা গাছের  
পত্রাস্তবাল-পথে অজস্র কিরণ বর্ষণ করিতেছে।  
নিতাইয়ের পায়ের কাছে কতকগুলো পরিষ্কার চাঁচা  
বাঁধাষি।

কাশিম আসিয়া কহিল—কফি এনেচি।

নিতাই কহিল,—রেখে দে...

কাশিম কহিল,—ময়নাটা কোথায় রাখবো? খাঁচা  
যে এখন চাই।

কাল ঝড়ের মুখে একটা ময়না পাখী কোথা হইতে  
উড়িয়া আসিয়া দাওয়ার উপর পড়িয়াছিল—একেবারে  
মুচ্ছিত দেখে! বহু যত্নে সেবার পরিচর্য্যায় কাশিম তাকে  
বাঁচাইয়া তুলিয়াছে। ভোরে উঠিয়া নিতাই ও কাশিম  
দুজনে বাঁধার চাচিয়াছে, ময়নার খাঁচা তৈয়ার করিবার  
উদ্দেশ্যে। কাশিম গিয়াছিল নিতাইয়ের কথায় কফি-  
সংগে। ইতিমধ্যে নিতাইয়ের এই ভাবান্তর!

হঠাৎ নিতাইয়ের ভদ্রাস্ত্র দেখিয়া কাশিম বিস্মিত  
হইল। সে কহিল—খাঁচা হবে না?

নিতাই কহিল,—হবে'খন! একটা কথা হঠাৎ  
মাথায় এলো রে কাশী!

কি কথা?

নিতাই কহিল,—কাল এই ইস্কুল দেখলি তো?

কাশিম কহিল,—দেখেচি।

নিতাই কহিল,—বেশ ইস্কুল। পণ্ডিতের জলবিছুটি  
নেই, বেত নেই, কি আদরে, কি যত্নে লেখাপড়া  
শেখাচ্ছে এই গরীব ছেলেদের...

কাশিম হাঁ করিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল।

নিতাই কহিল,—আমাদের ধর্মে লেখাপড়ার যিনি

মালিক—যাঁর দ্বারায় মানুষ লেখাপড়া শেখে, তিনিও মেয়ে-  
মানুষ। তাঁর নাম জ্ঞানিস?

কাশিম কহিল—না।

নিতাই কহিল,—তুই একেবারে গাধা। দেখিসনে  
সেই শীতকালে ওপাড়ার মাঠে বারোয়ারী করে পূজো  
হলো...সরস্বতী পূজো? সেই ঘে রে রাশ-রাশ গাঁদা  
ফুলের মালা...

কাশিমের মনে পড়িল—সেই আনন্দ-দীপ্ত উৎসব!  
সে কহিল,—হাঁ...

নিতাই কহিল,—সেই সরস্বতী ঠাকুর হলেন লেখা-  
পড়ার দেবতা। এই ইস্কুলে সেই দেবতাকেই কাল দেখে  
এসেচি।

কথাব মর্ম্ম কাশিম ঠিক বুঝিতে পারিল না।

নিতাই কহিল, মেয়েদের কাছে লেখাপড়া শিখলে  
শেখা যায়। তারা বিচ্ছেদ ভয় ধরিয়ে দেয় না। তাই  
ভাবছিলুম, তোর দিনগুলো হেইয়ো-হেইয়ো কবেই  
কাটচে। এ তো ঠিক নয়। তুই লেখাপড়া শেখ। পরে  
ভালো হবে।

কাশিম নিরুত্তর রহিল।

নিতাই কহিল,—ওই ইস্কুলে তোকে পড়তে পাঠাবো।  
ভাবচি। জাত যাবে বলে ভয়ে কেউ শিউরে উঠবে না,  
তোকে কেউ দূব-ছাইও কোরবে না ওখানে। পড়বি  
ভালো। পড়াশুনা কবে এর পরে মানুষ হতেও পারবি—  
নিজের হাতে বোট ঠেলে দিন কাটাতে হবে না।

কথাটা কাশিমের মন লাগিল না। বেশ একটু বড়  
দল... কত খেলা-ধুলাব ব্যবস্থা আছে। এই যে মাঠের  
দু'ধাবে কাঠ পোঁতা...ছেলেরা বল খেলে। তার উপর  
বাঙালী মেমের আদব করিয়া কত-কি খাওয়ানো!  
তিনিও তো স্কুলে পড়ার কথা বলিলেন!

সম্মিত মুখে কাশিম কহিল,—পড়বো।

নিতাই কহিল,—পড়বি তো নিশ্চয়। তবে ভাবচি,  
ওখানেই থাকবি, না, বাড়ী থেকে রোজ ইস্কুলে যাবি!

এ ছটার মধ্যে কোন্টা ভালো—কাশিমের বুঝিবার  
শক্তি ছিল না। কাজেই নিতাইয়ের পানে সে নিরুত্তর  
চাহিয়া রহিল। নিতাইও সেই কথা ভাবিতেছিল।

এমন সময় দ্বারে শশীর গলা শুনা গেল। শশী  
কহিল,—নিতাই আছো?

নিতাই যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল...সহসা এ আহ্বানে  
জাগিয়া সে দ্বার-প্রান্তে চাহিল। শশী ততক্ষণে চৌকাঠ  
ছাড়াইয়া উঠানে পা দিয়াছে। নিতাই কহিল—এসো  
শশীদা। কি খপর?

শশী কহিল,—খপর গুরুতর,—ভাই এসেচি।  
তোমাকে এর বিহিত করতে হবে ভাই। আমি একা...  
আমার দোসর চাই এ ব্যাপারে।

শশীর স্বরে উত্তেজনা। নিতাই বেশ একটু বিষয় বোধ করিল। নিতাই কহিল,—কি ব্যাপার, বলো তো! কাশিমকে সে আদেশ করিল,—আর একটা টুল আনতো রে, কাশী।

কাশিম ছুটি টুল আনিতো। নিতাই কহিল—তোমার মুখ-চোখ দেখে মনে হচ্ছে...

কথা শেষ হইল না। শশী কহিল—গুরুতর ব্যাপার, বললুম তো!

কাশিম টুল আনিয়া দিলে শশী বসিল। বসিয়া কালিকার ঘটনা নিতাইকে খুলিয়া বলিল। শুনিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—বুলো কি! এত বড় আশ্চর্য্য!

শশী কহিল—খানায় যেতে পারতুম—কিন্তু ওদের পরসর বল আছে, তাছাড়া দলে বড়।

নিতাই কহিল—খানা কিসেব! আমরা কি ও ছুঁচোগুলোকে শিক্ষা দিতে পারি না—নিজেরা?

এ কথায় শশীর উৎসাহ বাড়িয়া গেল। সে কহিল,—তাইতো তোমার কাছে এসেছি।

একটু পূর্বে নিতাই বাণীর কমল-বনের স্বপ্ন দেখিতেছিল; শশীর কথায় সে স্বপ্ন ফাঁশিয়া গেল,—বাণীর কমল-বনে যেন বিদ্যুতের চমক বহিল! হুজনে বহুক্ষণ স্তব্ধ বসিয়া...

সহসা সে-স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নিতাই ডাকিল,—ওরে কাশিম...

কাশিম সেই বাঁখাবির কাঠিগুলা লইয়া অদূরে নাড়া-চাড়া করিতেছিল, নিতাইয়ের আহ্বানে মুখ তুলিয়া তাব পানে চাহিল। নিতাই কহিল—তুই সেই চবণ ভট্টাচার্য্যকে জানিস?

কাশিম বিমূঢ়ের মত কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—না।

প্রদীপ্ত স্বরে নিতাই কহিল,—জানিস বৈ কি! সেই যে ফেরি-বাটে সেদিন তোকে মারতে উঠেছিল,—তুই গঙ্গায় নেমে জল ছুড়িছিলি...আর সেই নৌকো থেকে নামতে যার গায়ে জল লাগে...

কাশিম উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিল—ও—তিনি? তেনাকে চিনি বৈ কি।

নিতাই কহিল,—তবেই আর কি! আচ্ছা, তোকে এক কাজ করতে হবে...

শশী কহিল,—মার-ধর করবে?

নিতাই কহিল,—বদি করি?

নিতাই গভীর দৃষ্টিতে শশীর পানে চাহিয়া রহিল। শশী কহিল,—ওরা মজা পাবে। না, না, মার-ধর নয়! শেষে ফ্যাসাদ বাধে যদি—

নিতাই হাসিল, হাসিয়া কহিল—দাঙ্গা চাও না

তাহলে? বেশ,—দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবো না। তবে শিক্ষা দিতে হবে—এমন শিক্ষা চাই মোক্ষা, যাতে বাছাধনরা বোকে, দলে ভারী না হলেও এরা ফন্দী-কিকিরে ওস্তাদ!

শশী কহিল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই। সেই হলই ভালো হয়। তবে এক টিলে যদি সব-কটাকে মানা যায়...

নিতাই কহিল,—তাহলে একটু ভাবতে দাও। আমি ঐ খাঁচাটা তৈরী করতে করতে একটা উপায় ঠিক কবি। গাঁচা না হলে কাশীর ময়না পাখী নিরাশ্রয় থাকবে কি না!

নিতাই উঠিল, উঠিয়া কহিল,—ওরে কাশিম, আর...তোর খাঁচাটা আগে বানিয়ে দি...

কাশিম মহা-আগ্রহে নিতাইয়ের-হাতে বাঁখারিগুলা তুলিয়া দিল। নিতাই গাঁচা তৈয়ারীর কাজে মনঃসংযোগ করিল।

গাছের ডালে বসিয়া একটা বৃষু ডাকিতেছিল—কেমন তার উদ্যাস সুর! সে সুরে শশীর মন এই সমাজপতিদের দৌরাঙ্কুরে চিন্তা ছাড়িয়া ধীরে ধীরে স্কুল-গৃহের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সেই বাণীরূপিনী তরুণী...বিশ্বের আলোয় শতদল ফুটাইয়া তাহাবি পাপভির উপর পা রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছেন! অপূর্ব সে দৃশ্য! সহসা নিতাই ডাকিল,—শশীদা...

শশী চমকিয়া নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—সেই বান্দীপাড়ার যদি আমাদের ছাউনি ফেলি?

শশী কহিল,—সে কথা তো সবাই জানে। ওতে আর প্রতিকারের উপায় কি হবে?

নিতাই কহিল,—ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের করে তোলা যায়।

সপ্রসন্ন দৃষ্টিতে শশী কহিল—কি রকমটা হবে, বুঝতে পারি না।

নিতাই কহিল,—একটা ফন্দী মাথায় এসেচে! এমন জাল পাতবো, ভাবচি, যাতে সে জালে ওদেব কই-কাতলাগুলোকেও গাঁথতে পারি!...সহ বাঁড়,যেও সেখানে যায় না, ভাবে?

শশী কহিল,—হয়তো যায়...কিন্তু আমি ঠিক বুঝি না, নিতাই, ওদিক দিয়ে কিছু করা যাবে কি না...

শশীর মুখের পানে নিতাই ক্ষণেক চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল,—সে লোকটাকে চেনো? যে ছুঁচোটো বাড়ীতে সেঁথিয়েছিল?

শশী কহিল,—তার নাম-ধাম জানি না, তবে দেখলে চিনতে পারবো বৈ কি। চোট লেগেচে, তার উপর গালে নাকি আব আছে!

নিতাই কহিল,—তবে চলো, এ-কাজটা সেবে এক

বার আমেরিকা অবিকারে বেরুই। সে লোকটার পাত্তা যদি মেলে, তাহলে আমাদের প্রতিকারের অল্প উপায়ও স্থির করা যাবে।

শশী কহিল,—বেশ। তুমি তাহলে কাজ সেবে নাও।

ক্ষিপ্ত কৌশলে নিতাই তখনি খাঁচা গড়িয়া ফেলিল, খাঁচা তৈয়ার হইলে কাশিমকে কহিল,—এই মে তোর খাঁচা—পাখীটাকে খাঁচায় রাখ...কিন্তু শুধু রাখলেই চলবে না। খাওয়াব কি ব্যবস্থা করলি?

কাশিম কহিল,—কেন? চাতু। সন্ধ্যালেই আমি ছিকর দোকান থেকে কিনে এনেছি। শেতেও দিয়েছি!

নিতাই কহিল,—এক কাজ কর...কলা দিস্—আর খুঁজেপেতে ত্যালাকুচো আন্ দিকি...ওরা খেতে ভারী ভালোবাসে। বুঝলি?

খাঁচা হাতে তুলিয়া বাড় নাড়িয়া কাশিম কহিল—ত্যালাকুচো এখনি আনচি।

কাশিম চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে নিতাই কহিল—দাঁড়াও দাদা...আমি একটা জামা গায়ে দিয়ে নি। ভদ্র-পাড়ায় যাচ্ছি, ভদ্র-বেশে যাওয়াই উচিত।... কি বলো?

হাসিয়া শশী কহিল,—তা বটে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### সুচিত্রার স্বপ্ন

স্কুলের বারান্দায় বসিয়া সুচিত্রা একথানা চিঠি পড়িতেছিল। চিঠি ইংরাজীতে, টাইপ করা। মিশন্-হোম হইতে আসিয়াছে। সেক্রেটারী লিখিয়াছেন,—ফুলছড়ির স্কুলে বোর্ডিংয়ের জন্য পাকা ঘর তৈয়ারীর প্রস্তাব সোসাইটি মঞ্জুর করিয়াছে; এবং মিশন্-হোম তার ব্যয়-নির্বাহের জন্য এক হাজার টাকা শীঘ্র পাঠাইবে। তাছাড়া চাঁদার যে-প্রতিশ্রুতি মিলিয়াছে, হিসাবে দেখা যাইতেছে, তাহাতেও প্রায় সাত-আটশো টাকা সংগ্রহ হইবে। এ টাকাগুলি সুচিত্রার কাছে পাঠানো হইতেছে। কাজ শুরু করিয়া দেওয়া হোক...কন্ট্রাক্টারও শীঘ্র আসিবে। তবে সুচিত্রাকেই সকল ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।

সুচিত্রা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। ছেলেমেয়ের সংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে, তাহাতে এ ঘর কুলানো পরে সম্ভব হইবে না। তাছাড়া পাতার ঘর—বেশী জোরে জল-ঝড় হইলে ঘর রক্ষা করা দায়! এবং মেয়েদের ও ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র ঘর চাই। কয়েক মাস ধরিয়া লেখালেখির ফলে মিশন্-হোম তাব প্রস্তাব যে মঞ্জুর করিয়াছে, ইহাতে সুচিত্রার আনন্দের সীমা রহিল না।

একটা বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, দুয়ারা গ্রামের যে-ছেলেটি জ্বর-গায়ে বাড়ী গিয়াছিল, তার সে জ্বর খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। তার বাপ, না খুড়া, কে আসিয়াছে দেখা করিতে। ছেলেটির চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে নয়।

সুচিত্রা তখনি উঠিল। স্কুলের প্রান্তরসীমায় ক্যান্সেলের পাশ ডাক্তার স্বাস দত্তর আস্তানা। সুচিত্রা তার কাছে ছুটিল। ডাক্তার তখন ছোট ডিসপেন্সারিতে ঝাঁড়াইয়া একটা শিশি ধুইতেছিল। সুচিত্রা কহিল,—আপনাকে এখনি একবার যেতে হবে আমার সঙ্গে ঐ দুয়ারায়। স্কুলের একটি ছেলের খুব জ্বর...

স্বাস ডাক্তার কহিল—আমি দশ মিনিটে তৈরী হচ্ছি। তাদের ওখান থেকে লোক এসেচে?

সুচিত্রা কহিল—এসেচে। আমিও সঙ্গে যাবো।

—আপনি!

ডাক্তার সবিম্বয়ে সুচিত্রার পানে চাহিল।

সুচিত্রা কহিল,—বেড়াতে বেড়াতে যাবো'খুন।

সুচিত্রা আসিয়া লোকটির সঙ্গে দেখা করিল, তাকে আশ্বাস দিয়া সংবাদ লইল, দুয়ারা কত দূরে!

লোকটি কহিল, ফুলছড়ির পরেই দুয়ারা।

সুচিত্রা নিজেকে সজ্জিত করিয়া লইল। তারপর ডাক্তার আসিল বাইসিক্লে লইয়া। বাইসিক্লে আর চড়া হইল না। তিন জনে দুয়ারায় যাত্রা করিল। ফুলছড়ির বাগ্দি-পাড়া ছাড়াইয়া দুয়ারা! মাঠের প্রান্তে কয়েকখানা পাতার কুঁড়ে—দারিদ্র্যের জীর্ণতায় ঘেরা। নোংরা পল্লী।

সুচিত্রা কহিল,—এ নোংরায় অসুখ করবে না?

স্বাস ডাক্তার কহিল,—এরা বেঁচে থাকে কি করে, সেইটেই ভাববার কথা!

সুচিত্রা কহিল—গ্রামের জমিদার শুধু খাজনা আদায় করে। এরা কিসে ভালো থাকবে, সেদিকে এতটুকু লক্ষ্য নেই।

স্বাস হাসিল, হাসিয়া কহিল—তার কি দায় পড়েচে যে অত দেখবে! তার সম্পর্ক তো টাকার সঙ্গে...

সুচিত্রা কহিল—আমাদের স্কুল এ জায়গায় খুলে বড় ভালো কাজই করা হয়েছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হলে তাদের হুগতি যদি ঘোচে...

রোগীর গৃহও তেমনি...বেন একটা ছোট গহ্বর! আলো-বাতাসের চিহ্ন নাই। ঘরে কে আছে, তাও লক্ষ্য হয় না।

আলো চাওয়া হইল—একটা কেরোসিনের ডিপা আসিল।

সুচিত্রা তাহা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল; কহিল—নিয়ে যাও ও আলো। ওই কেরোসিনের বোঁয়ার রোগীর বিপদ ঘটবে।

যোগী দেখা হইল—কেশ্, নিউমোনিয়া। তবে খুব সাংঘাতিক হয় নাই। কিন্তু এ যোগের পরিচর্যা এখানে কি করিয়া হয় ?

সুচিত্রা বুঝাইয়া বলিল, স্কুলে ছেলেটিকে লইয়া চলো—সেখানে হাসপাতাল আছে। ছেলের মা-বাপ সঙ্গে থাকিবে, চিকিৎসার সুবিধা হইবে।

বহু আলোচনার তাগিদে রাজী করা গেল। সুচিত্রার মূর্তি, সুচিত্রার মুখের কথা...তারা গলিয়া গেল। তাছাড়া তারা তো পরিচয় পাইয়াছে—গরীব-দুঃখী বলিয়া কেহ সংবাদ লয় না; আর ইনি কত সাধিয়া ছেলের লেখা-পড়ার ভার লইয়াছেন! এমন দরদ-ভরা কথা...গরীব-দুঃখী আর ইহাতে ভুলিবে না? এমন কথা তো তারা কখনো শোনে নাই—পরের কাজ হইতে পায় শুধু আদেশের ভৃঙ্কি, তাড়া, চিরস্বায়ের তীব্র হস্তার!

সুচিত্রা কহিল—ভুলি পাওয়া যাবে ?

ছেলেটির বাপ কহিল—আমি কোলে করে নিয়ে যাবো।

সুচিত্রা কহিল—বেশ ঢাকা দিয়ে নিয়ে চলো। ডাক্তার বাবু বাইসিক্লে য়াচ্ছেন, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো।...

কথার্ত্তা পাকা হইলে আয়োজনে বিলম্ব ঘটিল না। ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া তার বাপ সলীম তখন পথে বাতির হইল। সুচিত্রা ও ডাক্তার সঙ্গে চলিল। সুচিত্রা কহিল—আপনি আবার হাঁটবেন কেন ডাক্তার বাবু? আপনি বাইসিক্লে চড়ে এগিয়ে যান।

সুহাস কহিল—একসঙ্গে বাচ্ছি, মন্দ কি!

সুচিত্রা কহিল—আপনি আগেই যান। এর বিছানার ব্যবস্থা করিয়ে ফেলুন। আমরা আস্তে আস্তে বাচ্ছি...

সুহাস রাজী হইল না। সুচিত্রার অল্পবোধের অন্ত নাই। অগত্যা সুহাসকে বাইসিক্লে চড়িয়া অঙ্গসর হইতে হইল।

সুচিত্রা তখন সলীমের সঙ্গে তার স্বরূপের কথা পাড়িল। বেচারী সলীম! একটু ক্ষেত-খামার আছে। সংসাবে নিজে আর বড় ছেলে—দু'জনে ক্ষেতে কাজ করে। কতকগুলো গরু আছে, হাঁস আছে। গরুর দুধ গ্রামের কেহ লয় না—জাতে সে মুসলমান...তাই; ভিন্ন গ্রামের এক গোয়ালার কাছে দুধ বেচিয়া আসে। গরজ সলীমেব, কাজেই দামে তার পোষার না! ইংস ডিম দেয়—ডিম বেচিয়া দু' পয়সা আসে,—তবে জুলুমও আছে। ফুলছড়ির বাবুরা বা-খুশী দাম দেয়। জমিদার বাঁড়ম্বের মেজাজ ভারী কড়া। খাজনার পয়সা ঠিক দিনে দেওয়া চাই। না দিলে অকথা, কুকথার অন্ত থাকে না...কথার উপর তার লোকের হাতে কাণ মলা

প্রভৃতিও ঘটিয়া বাচ, গরু-বাহুর অবধি লইয়া বাইতে কণ্ঠ্য করে না!

সুচিত্রা কহিল—গরু-বাহুর নিয়ে যার? আদালতের হুকুমে?

সলীম কহিল—না। ওরাই আদালত, মা...

সুচিত্রা কহিল—বটে! তা তো নিয়ে যেতে পারবে না। আইন নয়।

নিখাস ফেলিয়া সলীম কহিল—ওরাই আইন-আদালত। গরীবের আর আইন-আদালত কোথায়?

সুচিত্রা কহিল—হু...

এমনি কথায় কথায় সকলে যখন স্কুল-গৃহে আসিয়া পৌছিল, বেলা তখন সাড়ে ন'টা বাজিয়া গিয়াছে। সুহাস ডাক্তার ব্যবস্থাদি করিয়া রাখিয়াছে। স্তবরাং কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটিল না।

সলীমের ছেলের ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া সলীমের স্থান-নির্দেশান্তে সুচিত্রা স্কুলে ফিরিয়া দেখে, বিজলী আসিয়া বসিয়া আছে। সুচিত্রাকে দেখিয়া হাসিয়া বিজলী কহিল—Good morning Miss Florence Nightingale...

সুচিত্রা কহিল,—তার পায়ের ধুলো হবার যোগ্যতা যেন অর্জন করতে পারি, সেই প্রার্থনাই করো বিজলী...

বিজলী কোনো কথা কহিল না...হির দৃষ্টিতে সুচিত্রার পানে চাহিয়া রহিল।

সুচিত্রা কহিল—কি খপর? চাকরি হলো?

হাসি-মুখে বিজলী কহিল—নিশ্চয়...

সুচিত্রা কহিল—ভালো!...তা, চাকরিতে না গিয়ে এখানে এসময়?

বিজলী কহিল—একটু কাজ ছিল...

সুচিত্রা কহিল—কি?

বিজলী কহিল,—তুমি যে পুণ্য-ব্রতই নাও সুচিত্রা, একটা কথা শুধু মনে রেখো...

সুচিত্রা কহিল—কি কথা? বলো...

বিজলী কহিল,—আমার ভবিষ্যৎ-রচনার এই যে আয়োজন, এ আয়োজনটুকু তোমার সমর্থনার জন্ত...

কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া সুচিত্রা বিজলীর পানে চাহিল। বিজলী তার সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিল। সে একটা নিখাস ফেলিয়া কহিল—মানে, ছেলেবেলার দু' দিক থেকে এসে দু'জনে একসঙ্গে মিশেছি। আমাদের হাসি-গল্প একসঙ্গে...স্বপ্ন অনেক গড়েছি, তাও একসঙ্গে...আমাদের জীবনটুকু এমনি একসঙ্গে মিশে বয়ে বেন চলে চিরদিন...সেই আশাটুকু যদি শুধু পাই...

সুচিত্রা দিগন্তের পানে চাহিয়া রহিল। তার দৃষ্টি উদাস। সে যেন কালের যবনিকার অন্তবালে বদ্ধ হুব ভবিষ্যৎ দেখিবার চেষ্টা করিতেছে!

বিজলী সূচিত্রার কাছে অগ্রসব হইয়া আসিল—  
সূচিত্রার একখানা হাত নিজের হাতে লইয়া ডাকিল—  
সূচিত্রা...

সূচিত্রা কেমন চমকিয়া উঠিল... ধীরে ধীরে হাত মুক্ত  
করিল।

বিজলী কহিল—বলো...

সূচিত্রা কহিল—সে-সব কথা কখনো ভেবে দেখিনি  
বিজলী... কি বলবো?

বিজলী কহিল—কিছু নেই বলবার? ফাদার তো  
এমন আভাসও...

সূচিত্রা কহিল—আমার নিজের ভবিষ্যতের কথা  
কখনো ভাবিনি হেমন করে...

বিজলী কহিল—ধাঁট ভাবো, নিজেকে একেবারে  
ভাসিয়ে দিয়ে না।...তোমার নিজের জীবনের দাম অল্প  
নয়। এ পৃথিবীতে ও-জীবনের দাম বোঝে, এমন  
লোকও আছে...

সূচিত্রা কহিল—ভেবে দেখবো...

বিজলী কহিল—তাঁই দেখো।

## নবম পরিচ্ছেদ

### তারিণী

সে লোকটির পাক্তা পাইতে বিলম্ব ঘটিল না। তার  
নাম তারিণী। চরণের দূর-সম্পর্কের সম্পর্কী। আর  
কোথাও আস্তানা না পাইয়া চরণের স্ত্রীর কাছে আসিয়া  
জুটিয়াছে—চরণের লাঞ্ছিত-জুতা অন্নান বদনে হাসিয়া  
সহিতে হয়। নিকুপায় দেখিয়া চরণ অগত্যা চূপ করিয়া  
গিয়াছে। পত্নী তার পক্ষ লইয়াছে—কাজেই চূপ করা  
ছাড়া গতাস্ত্র ছিল না।

এখন, এই লোকটাকেই চরণ ধরিয়াছে—তার বদ-  
মায়েসীর অভিসন্ধিতে ঘুরাইবার জন্ত। কথায় বলে,  
দাকে বাধো, সেই বাধে...এ কথা যে কতখানি খাঁটি,  
চরণ আজ তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছে।

তারিণীও যোগ্য সাক্ষ্যদ। চরণ এক পা আগাইতে  
বলিলে, সে চলে চার পা। স্ত্রতন্ত্রাত্তর পশার হইল—  
শুধু চরণের কাছে নয়, চরণের অভিভাবক শ্রীযুক্ত সদয়  
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও।

নিতাই আর শশী বাগদীগাড়ার ঘুরিতেছিল...সেই  
পাড়ার এক কুটীর হইতে অকস্মাৎ তারিণী বাহির হইল;  
তাকে দেখিয়াই শশী কহিল—এই লোক...

নিতাই কহিল—ঠিক বলচো?

শশী কহিল—ভুল হতে পারে না। ঐ যে গালে  
আব।

বাস্! নিতাই অমনি গিয়া সবলে তার হাত ধরিল,  
কহিল—দাঁড়া...

তারিণী ভড়কাইয়া গেল। হঠাৎ এমন...

মুখখানা কাঁচুমাচু করিয়া সে কহিল—তুটো তরকারীর  
চেষ্টার এসেছিলুম...

তরকারী! তাতা হইলে ইহার মধ্যে আরো গুট  
বহস্ত আছে!

নিতাই কহিল—হাত তো খালি দেখচি! তরকারী  
কৈ?

সপ্রতিভ ভঙ্গীতে তারিণী কহিল—ওবেলার নিয়ে  
যাবো, তাই বলতে এসেছিলুম...

—কার কাছে বলতে এসেচো? চলো, মোকাবেলা  
করে দাও।

নিতাইয়ের স্বর কড়া—তাহাতে আদেশের স্বর!  
তারিণী আবার ভড়কাইল।...করণ দৃষ্টিতে সে নিতাইয়ের  
পানে চাহিল। নিতাই ছাড়িবার লোক নয়...বিশেষ  
ইহার অন্তরালে যখন রহস্তের আভাস পাওয়া  
গিয়াছে!...

তারিণীর পা আর চলিতে চায় না...অথচ চলিতেই  
হইবে! নিতাই ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে...নিতাইয়ের  
গায়ে বেশ জোর। আর এই নিমেষের দর্শনে তারিণী  
এটুকু বুঝিয়াছে, নিতাই লোকটি ভালো মানুষ নয়!

যে-দ্বার মাড়াইয়া এইমাত্র আসিয়াছে, সেই দ্বারে  
গিয়া আবার দাঁড়াইতে হইল। নিতাই কহিল—কে  
তোমার লোক, বলো।

তারিণীর চোখে আবার সেই করুণ দৃষ্টি। নিতাই  
তাহাতে তুলিবার পাত্র নয়! তার মনে একটা কথা...

তারিণী কহিল—সে মেয়ে-লোক।

নিতাই ছঙ্কার দিল, কহিল—মেয়ে-লোকই হোক,  
আর যে-লোকই হোক, ডাকো। আমি মোকাবেলা  
করতে চাই। তোমার বকম দেখে মনে হচ্ছে, তোমার  
মতলব ভালো নয়।

তারিণী এ কথায় একেবারে অবাক হইয়া গেল।  
নিতাই তাকে ধাক্কা দিয়া কহিল—ডাকো...

তার চীৎকার গৃহমধ্যেও বিস্তর জাগাইয়া তুলিয়াছিল।  
এক প্রৌঢ়া রমণী দ্বার-প্রান্তে উঁকি দিল, কহিল—কি  
হয়েচে গা?

নিতাই কহিল—এ লোকটি এখানে তোমাদের বাড়ী  
কেন এসেছিল? এ দেখচি, বামন...

রমণী কহিল—এসেছিল, ওর খুশী। তাব জবাবদিহি  
কিসের বলো তো, ঠাকুর?

নিতাই পাড়ার ছেলে—তাকে সকলেই চেনে।

নিতাই কহিল,—আমি জবাবদিহি চাই...নাহলে একে  
এখনি টেনে নিয়ে যাবো সহ বাবুর কাছে।

বমণী কহিল—আমাদের ভট্‌চাষি মশাইয়ের একটু কাজ ছিল...তাই খাজনার তাগাদায় এসেছিল এ-পাড়ায়।

—বটে! নিতাই তারিণীর পানে চাহিয়া কহিল—  
কি গো, এ কি বলে?

তারিণী নিকৃপায় দৃষ্টিতে নিকন্তবে নিতাইয়ের পানে চাহিল।

নিতাই সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া বমণীকে কহিল—  
কত খাজনা দিয়েছো?

বমণী কহিল,—আজ দিইনি। আর একদিন আসতে  
বলেছি।

নিতাই কহিল—চেক-মুড়ি কৈ? বলিয়া তারিণীর  
পানে চাহিল।

বমণী কহিল—সকালবেলা কি আমেলা কবচো ঠাকুর  
খামার দোরে? আর কিছু কাজ নেই?

নিতাই দেখিল, বমণীর বসনা বেশ খর-খার। জী-  
লোকেব সঙ্গে তর্ক করিবে কি! সে তারিণীকে ধরিয়া  
হ্যাঁচকা দিল, দিয়া কহিল—চলো, তোমার ছাড়চি না।  
একেবারে সহ বাবু কাছে নিয়ে যাবো। চেক-মুড়ি নেই,  
কিছু না,—এদের কাছে খাজনা চাইতে আসো, একথা  
জানানো দরকাব।

তারিণী প্রমাদ গণিল। সে এখানে আসে অতি  
নিঃশব্দে এবং গোপনে। তারিণীর এখানে আসা চরণ  
পঙ্কজ করে না...নিষেধ করিয়াছে, বলিয়াছে—ওবা  
ছোটলোক...ও-পাড়ার বাসু নে, একঘবে হতে হবে!...  
কিন্তু সে কথার পবও...চরণের বাতায়তে কোতুলী  
হইয়া তারিণী আসিতেছিল। আসিয়া ঐ ক্ষেত্রমণি ওরফে  
ক্ষেতুর বড়-সবা, তার সাক্ষা তামাকুর প্রসাদ...সে যেন  
বাজাব আদর! ক্ষেতু তাকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া  
দিয়াছে, কোনো ভয় নেই, তুমি এসো! ঠাকুর। আমি  
তোমারি। এখন ধরা পড়িয়া গেলে...

নিতাই তারিণীকে টানিয়া পথে বাতির করিল। ক্ষেতু  
ষায়-প্রান্তে দাঁড়াইয়া কি কতকগুলো বকিতে লাগিল।  
নিতাই তা কাণে তুলিল না...শশী শুধু ক্ষেতুব নাসিকার  
দোহুল প্রকাণ্ড নথটার পানে বাব বার চাহিয়া দেখিতে  
ছিল। ঐ মুখ...নাক আছে কি না, বুঝা যায় না—শুধু  
ঐ নথের প্রসাদে...সে ভাবিতেছিল, পুণ্যে কথিত সেই  
সুদর্শন-চক্র! স্থান-কাল ভুলিয়া-বাই-চাল পৃথনার নাকে  
আসিয়া আটকাইয়া গেল কি করিয়া?...  
মোড় বাকিতে ক্ষেতুর ঘর অদৃশ্য হইল। তারিণী  
তখন নিতাইয়ের পায়ে পড়িল, কাদিয়া কহিল—আমার  
আশ্রয়টুকু কেড়ে নেবেন না।

আশ্রয়! আশ্রয় কাড়িয়া লইব! বিষয়-ভরা  
দৃষ্টিতে নিতাই তারিণীর পানে চাহিল।

দায়ে পড়িয়া তারিণীকে তখন সত্য কথা প্রকাশ  
করিতে হইল। সে চরণের সম্বন্ধী...তার কোনো  
কূলে কেহ নাই...অন্ন নাই, আশ্রয় জোটে না—  
জুটাইবার সামর্থ্যের অভাব। তাই গালি-প্রহার-  
লাখি...সব সহিয়া এখানে চরণের গৃহে পড়িয়া আছে—  
আহার বা জোটে, বলিবার নয়। আব সর্বপ্রকার  
বদমায়েশীতে...কি করিবে? সে একান্ত অসহায়, নিকৃ-  
পায়! এখানে চরণের ফরমাশ খাটিতে আসিয়াছিল...  
এবং তার উপর ঐ ক্ষেত্রমণির কেমন নজর পড়ে! ক্ষেতু  
ভারী যত্ন করে, আদব করে, কাপড় কিনিয়া দিচ্ছিল,  
একজোড়া জুতা, এই ছাতাটা...ক্ষেতু ভারী ভালো।  
চরণ সন্তোষ করিয়াছিল...কিন্তু ক্ষেতুর অত যত্ন...  
তাহাড়া তাকে একটু যত্ন করে, এমন লোক জগতে কেহ  
নাই!

নিতাইয়ের চিত্তে শয়তান বিজয়-গর্বে নাচিয়া  
উঠিল। বাঃ, চরণের হইয়াছে। সে কহিল—এঁর  
বাড়ী সন্ধ্যাবেলায় উৎপাত করতে গিয়েছিলে?

তারিণী সব কবুল কাবল, সবিনয়ে জানাইল, শুধু  
চরণের আদেশে!

নিতাই কহিল—হঁ। তারপর কি চিন্তা করিল;  
করিয়া কহিল—আমি তোমার আশ্রয় দেবো, টাকাও  
মিলবে, আমার একটি কাজ করতে হবে কিন্তু।

—কি কাজ? তারিণীর বুক হুলিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—আমি চরণকে জড় করতে চাই!

তারিণী সোৎসাহে কহিল—তাতে আমি খুব রাজী।  
আমায় যা পীড়ন করে...দায়ে পড়ে সব সয়ে থাকি!

নিতাই কহিল—কোনো ভয় নেই। আমি তোমার  
দেখবো! কিন্তু যদি বেইমানী করো—তা হলে হাড়  
ভেঙ্গে দেবো। আমি খানা পুণিশের ভয় করি না।  
আমার নাম নিতাই—কি রকম চক্কাস্ত...পাঁচ জনকে  
জিজ্ঞাসা করে ভেনো।

নিতাই নামটি তারিণীর অজ্ঞাত নয়। সত্ত বাবুর  
আসরে এ নাম সে শুনিয়াছে...

তারিণী নিতাইয়ের পানে চাহিয়া কহিল—বেশ,  
আমি করবো, আমার যা বলবেন...

নিতাই কহিল—পৈতে ছুঁয়ে বলো...

তারিণী তখন হাতে পৈতা জড়াইল, কহিল—তুমি যা  
বলবে, শুনবো...

নিতাই কহিল—বলো, কখনো বেইমানী করবেন না।

মন্ত্র পড়িবার ভঙ্গীতে তারিণী কহিল—কখনো বেই-  
মানী করবো না।

নিতাই কহিল—আচ্ছা, তাহলে এসো এখন আমার  
বাড়ী...সেখানে গিয়ে সব কথা হবে।...

ঘণ্টাখানেক বসিয়া পরামর্শাদি করিয়া নিতাই

তারিণীকে বিদায় দিল; বলিয়া দিল,—আমার লোক তোমার ডাকতে যাবে...সে শুধু বলবে, প্রভু ডাকচে; আমার নাম করবে না। বাস, অমনি তুমি চলে আসবে। অন্তথা না হয়...

কুন্তল চিন্তে তারিণী কহিল—কখনো হবে না।

তারিণী বিদায় লইল। শশী কহিল—আমিও আসি। মতলব যা ফেঁদেচো...

হাসিয়া নিতাই কহিল—দাঁড়াও না, এট এক জালে সব ব্যাটাকে বন্দী করবে।

—তারপর?

নিতাই কহিল—তারপর যা,—তা ভাবতে দাও। অতদূর ভাবতে গেলে কাজ করা চলে না। ক্রমে ক্রমে ভেবে স্থির করা যাবে।

শশী কহিল—তাহলে আসি।

নিতাই কহিল—এসো।

শশী চলিয়া গেলে নিতাই ডাকিল—কাশী...

কাশিম কহিল—কেন?

নিতাই কহিল—চটপট, ষাওয়া দাওয়া গেরে নিতে হবে। ওবেলার স্থলে যাবো—তাকে ভর্ত্তি করতে...

কাশিম কহিল—আজই?

নিতাই কহিল—হ্যাঁরে...শুভ কাজ দেবী করা ঠিক নয়।

স্নানাহার সারিয়া ওবেলার প্রতীক্ষায় কিছু থাকা গেল না। নিতাই কহিল—কি কাজ আছে হবে? কিছু নেই তো...চ' এখন বাই। স্থলটি আমার ভারী ভালো লেগেচে।

কাশিমের মনও তাই চাটিতেছিল! সেই কলরব, সেই আনন্দ!

সেই বাগান...সুচিত্রা বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল,—পাশে দুটি মেয়ে। তাবাও একরাশ সূতার বাণ্ডিল পাকাইতেছে।

নিতাই আসিয়া কহিল—নমস্কার।

সুচিত্রা চাহিয়া দেখিল। তার মুখ সম্মিত চইয়া উঠিল। সুচিত্রা কহিল,—আসুন...

সুচিত্রা চেরার দেখাইয়া দিলে নিতাই বসিল। সুচিত্রা কহিল—তাই...?

নিতাই কহিল—একটু কাজে এলুম।

সুচিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নিতাইয়ের পানে চাছিল। নিতাইও চাহিয়াছিল...ঐ কালো দুটি চোখের তারা...ও যেন এই আশার-ভরা দুনিয়ার মাঝখানে আনন্দের দুটি দীপ...কি আশার-বতীন আলোর দীপ্তি ও দুই গোখে! ও দৃষ্টির সামনে সারা দুনিয়ার রঙ যেন বদলাইয়া যায়।

নিতাই কহিল—এই ছেলেটি...এর লেখাপড়া কিছু

হচ্ছে না—শুধু আমার করমাশ খেটে দিন কাটায়। ওর সর্কনাশ করচি—এ তো ঠিক নয়।

সুচিত্রার দুই চোখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। নিতাই কহিল,—একে আজই আপনার স্থলে ভর্ত্তি করে নিন। বাড়ী থেকেই রোজ আসবে-যাবে। মাহিনা দেবো—অমনি-পড়বে না। কেন মাহিনা দেবে না? আমি যখন দিতে পারি...এমনিতেই তো আপনাদের কত খরচ—আমি ফাঁকি দিতে চাই না।

সুচিত্রা শূণী-মনে কহিল—বেশ...বলিয়া একটি ছেলেকে আদেশ করিল,—মতিবাবুকে ডেকে আনো তো...

মতিবাবু স্থূলবে কেবাণী। ছেলেটি মতিবাবুকে ডাকিয়া আনিলে সুচিত্রা তাকে বলিয়া দিল—এ ছেলেটি ভর্ত্তি হবে...এব নাম-ধাম সব লিখে নিন। ফ্রী নয়; এরা মাহিনে দেবেন...

মতিবাবু কাশিমকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। নিতাই উঠিযেছিল, সুচিত্রা কহিল,—আপনি বসুন...

নিতাই কহিল—ওর পরিচয়-টরিচয়গুলো...

সুচিত্রা কহিল—খাতা-পত্র নিয়ে মতিবাবু এটোখানেই আসবেন।

তাহাই হইল। 'ত' একটি কথার পর নিতাই কহিল,—আমি যদি আপনাদেব ফণ্ডে মাসিক টাঙ্গা কিছু দিতে চাই, নেবেন?

সুচিত্রা কহিল,—দরকার নেই। তাব চেয়ে আপনি এদের খেলা-ধুলার আয়োজন করুন। আপনি নিশ্চয় স্পোর্টস-ম্যান...

হাসিয়া নিতাই কহিল—চেহাবা দেখে তাই মনে হয়?...এককালে চর্চা করেচি বটে...যখন কলকাতায় থাকতুম। তারপর চারিধার থেকে আত্মীয়-স্বজনরা খশে সয়ে পড়লো...এমন অকস্মাত...মন খারাপ হলো! লেখাপড়া, খেলাধুলা—সব ছেড়ে গাঁয়ে এলে বসলুম। এসে দেখি, এখানে সব জঞ্জালে ভরা। সে জঞ্জাল সরাতে গেলুম—পারলুম না। লোকগুলো ঐ জঞ্জাল আঁকড়ে থাকতে চায়। জঞ্জাল সরাতে গেলে বিজ্ঞাট বাধে। বুস্তোর বলে ঘরে বসলুম। যা মনে আসে, তাই করি...শ্রেয়, inodolent life!

প্রাণ-খোলা কথা। এ কথার সুচিত্রা চমৎকৃত হইল। সে কি বলিতে বাইতেছিল, নিতাই তার পূর্বেই কহিল,—দৈবাৎ এ ধারে মাছ ধরতে এসে আপনার স্থল দেখলুম! আপনাকে দেখলুম...যেন যেত কমলধল-বাসিনী বাণী! মন সে অবধি কাজ চাইছে। জীবন যেন নূতন মূর্তি নিয়ে জেগে উঠেছে। কুড়ের মত পড়ে থাকার জন্ত জীবন নয়—যা তা করে কাটিয়ে দেবারও নয়। মাহুষের করবার অনেক কাজ!...



বিশেষ আপনায় এই কাজে যদি যোগ দিতে পারি—  
আপনাদের কাজে যদি মনের যোগ স্থাপন করবার সুযোগ  
পাই, তাহলে আমি বেঁচে বাই।

সুচিত্রা কহিল—তুনে ভারী আনন্দ হলো। কাজের  
লোক দরকার। আমি একা... আরো দু' এক জায়গায়  
চেষ্টা করেচি... কিন্তু কেবলি বিজ্ঞপ পেয়েচি!... শুধু  
বিজ্ঞপ নয়...

সুচিত্রা ধামিল, পরে গম্ভীর স্ববে কহিল—ইতব  
টাকা-টপ্পনীরও অভাব ঘটেনি! সকলে বলে, মেয়ে-  
মন্দ।

নিতাই গর্জিয়া উঠিল—হতভাগা দেশ! নিজেদের  
ভালো নিষেধ কখনো কববে না। অপরে করতে এলে  
তাতেও সর্ব্ব্বকমে বাধা দেবে।

বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, সেট সলীমের ছেলের  
স্বয়ং একটু কমিয়াছে। সে একটু ভালো আছে।

সুচিত্রা কহিল—চলুন, আপনাকে সব দেখাই!  
একটি ছেলে বাড়ীতে ভুগছিল—তাকে এখানে এনে  
তার চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিতাইয়ের মনে আনন্দের বান ডাকিল। প্রাণের  
আবেগে সে কি বলিতে যাইতেছিল, সহসা নিজেকে  
সম্বরণ কবিয়া লইল।

সুচিত্রা ডাকিল—আসবেন?

—নিশ্চয়..

দুজনে চলিল। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড ডাক্তারখানায়  
সলীমের ছেলেকে দেখিয়া ফিরিবার সময় সুচিত্রা সহসা  
ধমকিয়া দাঁড়াইল, কহিল,...ও কে?

একটা বড় গাছের দিকে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।  
নিতাই চাহিয়া দেখে, একজন লোক। ভদ্র বেশ।  
গাছের আড়ালে আশ্রয়গোপন করিতেছে।

কে? মনে একটা সন্দেহ আসিল। কেত কোনো  
মন্দ অভিপ্রায়ে...?

নিতাই দৃঢ়ভাবে গাছের দিকে চলিল। লোকটা...?  
ছুটিয়া গিয়া নিতাই তার হাত ধবিল, সবিস্ময়ে  
ডাকিল...শশী...

তাই। সে-লোক শশী। নিতাই কহিল...লুকোচ্ছ  
যে?

—লুকোবো কেন?...এমনি এসেছিলুম...

—লুকোবার কিছু নেই সত্যি। এসে যা দেখছি,...  
চমৎকার। কাশীকে আজ স্থলে ভর্তি করে দিলুম।...

কথার সঙ্গে সঙ্গে শশীর হাত ধবিল নিতাই তাকে  
একেবারে টানিয়া লইয়া চলিল। সুচিত্রা স্তম্ভিতের মত  
দাঁড়াইয়া। নিতাই কহিল—শত্রু-পক্ষ নয়...মিত্র। আমার  
সেই বন্ধু শশী।

## দশম পরিচ্ছেদ

শয়তান

আরো সাত-আট দিন পরের কথা।

বেলা বাবোটা বাজিয়া গিয়াছে! সুচিত্রা নিশ্চল  
বসিয়া আছে। তার সামনে দাঁড়াইয়া বিজলী। বিজলীর  
মুখে-চোখে উষেগ। চারিদিক স্তব্ধ... শুধু সূর্য-আকাশ-  
চাঁদী দু' একটা চিলের চীৎকাব মাঝে মাঝে সেই স্তব্ধতার  
গায়ে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিজলী কহিল,—না হলে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ  
চুরমার হয়ে যাবে। মাসখানেকের জন্য শুধু...আমায়  
বক্ষা করো, সুচিত্রা।

বিজলী একেবারে সুচিত্রার পারের উপর লুটাইয়া  
পড়িল।

সুচিত্রা কহিল,—কি করো, বিজলী। ওঠো।

তার স্বর বেদনায় কাতর!

বিজলী কহিল,—এ স্থল-ফণ্ডের প্রায় আড়াই হাজার  
টাকা তোমার কাছে আছে, পরশু ডাকে এসেছে। আমি  
জানি। তা থেকে শুধু এক হাজার... এক মাসের জন্ম  
আমায় দাও—দাও। তোমাদের এখনো তিন মাস  
দেবী বাড়ী তোলবার। আমি এক মাসের মধ্যেই শোধ  
কবে দেবো।

সুচিত্রা কহিল—কিন্তু ও-টাকার আমার কি  
অধিকার! পরের টাকা...ও থেকে তোমায় কি করে  
দাও দি? এ যে কত বড় অন্তর্য...

বিজলী কহিল,—তুমি এ-টাকা চুপি করচো না,  
খরচও করচো না...তোমার বাজ্ঞে এক মাস পড়ে  
থাকবে...কোনো দরকারে লাগবে না। আর এই  
একমাস ও-টাকা যদি আমার কাছে থাকে, তোমার  
লোকসান নেই,—অথচ আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ তাতে  
গড়ে উঠবে...উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! একমাসের মধ্যেই এ-  
টাকা আমি শোধ দেবো। তার নড়চড় হবে না।

সুচিত্রা কোনো কথা কহিল না! বিজলীর কাকূতির  
অন্ত নাই। সুচিত্রা তবু অবিলম্বে শেষে বিজলী এক  
কাজ করিল। দেওয়ালের গায়ে একখানা বড় খুপী  
টানানো ছিল, দেওয়ালের শোভার জন্ত বটে, বিপদে  
আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যেও বটে,—বিজলী চট করিয়া সেটা হাতে  
লইয়া থিয়েটারী ভঙ্গিতে কহিল,—এটুকু দয়া যদি না  
করো, তাহলে আমি বাঁচবো না...এই খুপী বুকে বসিয়ে  
সব শেষ করে দেবো। যদি জীবনের এমন সুযোগ  
হারাই, তাহলে কি কাজ এ জীবনে...

কথাটা বলিয়া বিজলী বুকের উপর খুপী ধবিল।  
সুচিত্রা দেখিল। সে চমকিয়া উঠিল, কহিল,—কি  
করো? আঃ!

বিজলী তেমনি অভিনয়ের ভঙ্গীতে কহিল,—এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, সূচিত্রা।

সূচিত্রা খুপী কাড়িয়া লইল। বিজলী কহিল,—এ জীবন শেষ করতে আরো হাজার পথ খোলা আছে। সে পথ তো তুমি বন্ধ করতে পাববে না! ..

বিজলী খামিল, পরে স্ববে আরো চমক লাগাইয়া কহিল—যার ভবিষ্যৎ নেই, তার জীবনের প্রয়োজন থাকতে পাবে না। ...এ জেনেও তুমি অটল...কিন্তু এর জগৎ দাগী তুমিই হবে সূচিত্রা।

বিজলীর দুই চোখে জল দেখা দিল। সে গমনোদ্ভত হইল।

সূচিত্রার বকের মধ্যে যা হইতেছিল...সে ডাকিল,—বিজলী...

বিজলী ফিরিল।

সূচিত্রা কহিল—এ পরের টাকা...

বিজলী বলিল—আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? শুধু একমাস...এ টাকা জমা দিলে আমি কেশিয়ারী-চাকরিটা হাতে পাই। পাঁচশো টাকা মাহিনা।...কাজে বাতাল হলে একমাসের পাঁচশো টাকা মাহিনা আগাম চাপ্রদা শক্ত হবে না।...চাইলে তা পাবেই। লক্ষ্মীটি, দয়া করো, সূচিত্রা...আমার রক্ষা করো...

সঙ্গে সঙ্গে সূচিত্রার পায়ে আবার সে লুটাইয়া পড়িল।

সূচিত্রার পায়ে তলা হইতে বিশ্ব-ভ্রমণ কোথায় সরিয়া যাইতেছিল!...সেই বিজলী! সূচিত্রা চাহিয়া দেখে, বিজলীর চোখে জল! সূচিত্রার মন দুগিল। সে কহিল—ঠিক এক মাসে দেবে? কিন্তু পরের টাকা আমার বুক কাঁপচে।

বিজলী কহিল—আমি পাকা লেখাপড়া করে দিচ্ছি...

নারীর মন। সহস্র কর্তব্যের মধ্যেও সে মমতা ছাড়িতে পারে না। চোখে জলে মনের মাটি ভিজিয়া গলিয়া যায়!...

যন্ত্র-চালিতের মত স্ববে গিয়া সূচিত্রা সিন্দুক খুলিল...এবং একতড়া নোট...তার মাথা ঘুরিতেছিল, চোখে সে অন্ধকার দেখিল!..

সেই অন্ধকারের আবছায়ার মধ্যেই বিজলী কাগজ লইয়া তাহাতে কি সব লিখিল। লিগিয়া সূচিত্রাব চোখের সামনে ধরিল...বিজলীর মুখে কৃতজ্ঞতার গদগদ বচন...ভগবানের নাম! সে যেন বিহ্বলিত একটা ঝলক বহিয়া গেল...তারপর যখন সচেতন সূচিত্রার চোখের সামনে বিশ্বভ্রমণ আবার তার স্বরূপে দেখা দিল, তখন বিজলী চলিয়া গিয়াছে, এক হাজার টাকার বদলে পড়িয়া আছে একখানা হাণ্ডনোট...টিকিটের উপর বিজলীর নাম সঠি। সঠিতে সেই অপূর্ণ কায়দা! সে যেন বিদ্রোহ হাসি!

সেটা সূচিত্রার হাতে বহিল। চোখের সামনে আলো আবার নিবিল। কাছে একখানা চেয়ারে অবসন্নের মত সূচিত্রা বসিয়া পড়িল; বসিয়া চক্ষু মুদিল।...

নিতাইয়ের আস্থানে সূচিত্রা চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। একটা বড় নিখাস কিছুতেই সে রোধ করিতে পারিল না। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছিল! স্বপ্ন মিলায় না। আলোর কালো কালো কি ও সব উড়িতেছে!

নিতাই কহিল—ও-লোকটা কেন এসেছিল? ঐ স্ট্র-পরা বাঙালী সাহেব?

সূচিত্রা কহিল—ও বিজলী।

নিজের স্ববে নিজেই সে চমকিয়া উঠিল। এ যেন কোন্ পাতালের অতল তল হইতে আব-কে কথা কহিল!

নিতাই কহিল—যেই হোক, ও ভারী বেশ-বাজ...

বেশ-বাজ। সূচিত্রাব চোখে বিশ্বয় ও আতঙ্ক...সীমাহীন পাখাবের মত।

নিতাই কহিল—ও আর ঐ মিলের অচিন্ত্য...দু'জনে ভারী ভাব। কলকাতার মাঠে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার স্বপ্ন দেখে দিবা-রাত্র। চাকরি খুঁইয়েচে...ক্যাশ্ ভেঙ্গেছিল বলে। তারা ছাড়বে কেন? কাণ ধরে আদায় কবে নিবেচে...পুলিশে খবর অবদি দিয়েছিল।

তাই। তাই। সূচিত্রার পায়ে তলা হইতে দুনিয়া সরিয়া যাইতেছিল...সে বুঝি কোন্ অন্ধকার রসাতলে নামিয়া যাইবে। পায়েব নীচে আশ্রয়ের চিহ্নও নাই!...

সূচিত্রা কহিল,—কত টাকা দিতে হয়েছে জানেন?

নিতাই কহিল,—শুনেচি হাজার বারোশো টাকা।...কিন্তু ও কি...আপনার মুখ বে সাদা হয়ে গেল। এর মানে? আপনার কোনো আত্মীয়?

সূচিত্রা একটা নিখাস চাপিয়া কহিল,—এক রকম আত্মীয়ই। কিন্তু এমন উৎসর্গ গেছে। আমার স্বপ্নের অগোচর।...

সূচিত্রার মাথা ঘুরিতেছিল। সে চক্ষু মুদিল।...

পনেরো দিন পরের কথা।

এ পনেরো দিন সূচিত্রার কি ভাবে কাটিয়াছে, তা শুধু তার অন্তর্দীপ্তিই জানেন। নিতাই নিত্য আসে। তাব সঙ্গে সূচিত্রার অনেক কথা...এ সব কথার অন্তরালে বেদনার কাঁটার বেঁধা সূচিত্রার রক্তাক্ত মনের পরিচয় নিতাইয়ের অজ্ঞাত রহিল না। তবে কিসের বেদনা, এটুকু জানা গেল না। সে প্রশ্ন নিতাই কোনো দিন করিতে পারিল না...কেমন এক দ্বিধায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হইয়া আসে! অথচ জানিবার কি আগ্রহ!

সেদিনও কথা-বার্তা হইতেছিল—এমন সময় ডাক আসিল। টাইপ-করা একটা বড় খাম। হাতে লইতে সূচিত্রা কাঁপিয়া উঠিল। চিঠি খুলিয়া পড়িতে...সর্ব-নাশ! সে অফুট আঁর্ন্ত রব তুলিল। নিতাই তার পানে চাহিল।

সূচিত্রা কহিল,—কি হবে? এঁা...

কথা শেষ হইল না। নিতাই তার পানে চাহিল। সূচিত্রার মুখ বিবর্ণ...যেন সে ভূত দেখিয়াছে, এমনি আতঙ্কে পরিপূর্ণ। সূচিত্রা চিঠিখানা তার হাতে আগাইয়া দিল।

নিতাই চিঠি পড়িল। মিশন হোম্ হইতে চিঠি আসিয়াছে। সাহেব লিখিয়াছেন, এঞ্জিনিয়ার প্রতীকে লইয়া কালই তিনি ফুলছড়িতে আসিতেছেন।...

সূচিত্রাও হুই চোখে জল। সূচিত্রা কহিল,—উপায়?

নিতাই কহিল,—আমাকে সব কথা বলতে পারেন। আমি আঁচে যেন সব বুঝি। কিন্তু...

সূচিত্রা সব কথা খুলিয়া বলিল...বিজলীর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক, তাও গোপন করিল না। শুনিয়া নিতাই কহিল,—বটে। আমি উপায় দেখি।...

কিন্তু এক বিপদ বাধিল। তারিণীর সাহায্যে যে জাল পাতিরাছে...সে জাল আজ টানা চাই। নহিলে সে কাজ ফাঁশিয়া যাইবে। অথচ বিজলীকেও চাই, আজই...হুটাই সমান শয়তান। হুটাকেই আয়ত্ত করা চাই।

সূচিত্রার হুই চোখে জলেব বিরাম নাই। নিতাই কহিল,—ভয় সেই। আমার শক্তিতে বিশ্বাস হচ্ছে না?...বেশ, প্রমাণ নেবেন। আমি তাহলে বসবো না। এখন চলি তার সন্ধানে।

নিতাই উঠিল। উঠিয়া গুহে ফিরিয়া সে দেখে, তারিণী আসিয়া বসিয়া আছে। তারিণী কহিল,—চরণকে ক্ষেত্ৰ রাজী করিয়েছে, ক্ষেত্ৰ সেই বোনঝী এসেছে। তার এক ছেলে —সেই ছেলের অল্পপ্রাশন। আজ। ক্ষেত্ৰ বাড়াতেই হবে। খরচ-পত্র চরণ দিচ্ছে—সব ঠিক। এই থেকেই কায়দা করা সম্ভব হবে না?

নিতাই কি ভাবিল, ভাবিয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিল,—ঠিক হয়েছে। এক কাজ করো তারিণী...

তারিণী নিতাইয়ের পানে চাহিল। নিতাই কহিল,—চরণ ওখানে দেখা-শুনা করতে থাকবে নিশ্চয়?

তারিণী কহিল,—নিশ্চয়। আমিই বাজার করে দিয়েছি। ক্ষেত্ৰ বললে, আজই খাওয়া-দাওয়া। চরণকে সে বলেছে। চরণ রাজী না হয়ে করে কি! ক্ষেত্ৰ বা কাণ্ড বাধিয়েছিল—ওঃ, কলকাতার থিয়েটার দেখেচেন? একেবারে যেন সেই থিয়েটারের সেবা এ্যাক্ট্রেশের মত ভঙ্গী।

সোৎসায়ে তারিণীর পিঠ চাপড়াইয়া নিতাই কহিল,—ঠিক হয়েছে। এক কাজ করো তারিণী...ক্ষেত্ৰকে ঠিক বাবো, আদ্যার ধরে থাকে যেন! এই আনন্দের কাজে চরণকে ওখানে পোলাও খাওয়াতে হবে। তারপর...

তারিণী কহিল,—বেশ, আমি তাহলে এখন যাই। রাতে ভোজ।

নিতাই কহিল,—তুমি যাও। ক্ষেত্ৰকে দিয়ে এই কাজটি করতেই হবে—যেমন করে পারো। এক কাজ যদি পারো, তাহলে কেজা মাঝ দিবা।...তুমি শুধু এসে আমার খপরটুকু দিয়ে ঘেরো—তাবপর যা করবার, আমি করবো।

তারিণী খুশী-মনে চলিয়া গেল।

নিতাই তখন ডাকিল,—শশী—

শশী অধরে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, কহিল,—কি?

নিতাই শশীকে সব কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া শশী তার পানে চাহিল।

নিতাই কহিল,—সহ বাবুকে খপরটুকু দিতে হবে। তারপর যত চাই-মশাইকে ও-বাড়ীতে নিয়ে খেতে পাবলে চরণের মরণ অনিশ্চিত! যেমন ছুঁচো, পাঞ্জী...

শশী কহিল,—তা বলে বামুনের জাত মারবে?

হাসিয়া নিতাই কহিল,—জাতের ওর কি আছে? ক্ষেত্ৰ হাতেই অন্ন মুখে দিলেই বুদ্ধি জাত যায়? অথচ গুর ঘরেই চরণের বাস। জাত-বিচারের চমৎকার আইডিয়া!

শশী কহিল,—তা বটে!

সহ লোকটির সহস্র দোষের মধ্যে একটি গুণ আছে—জাতের ব্যাপারে ভগ্নাণি করে না। দয়ামাত্রাবর্জিত হৃদয় হইলেও জাতের সংস্কার বাঁচাইয়া চলে। চরণের সম্বন্ধে বে-কুংসা রটি যাচ্ছে, সেটা অতিরঞ্জিত ভাবিয়া সহ ক্ষমার চক্ষে দেখে।

নিতাই কহিল,—আমি একবার বেকাজি। তারিণী ফিরলে তাকে বসিয়ে রেখো। আমার সঙ্গে দেখা না করে সে যেন যায় না। কাজটি সুসম্পন্ন করা চাই। আজ রাতে। এমন সুযোগ আর মিলবে না।

শশী কহিল,—তা সুসম্পন্ন হবে।

—বেশ। বলিয়া কাঁধে উড়ানি ফেলিয়া নিতাই বাতির হইবার উদ্যোগ করিল। শশী কহিল—কোথায় চললে?

নিতাই কহিল,—আর এক শয়তানের সন্ধানে। এও ভয়বশী শয়তান। এর চাপ আর-এক কাঠি উপরে...

কথার অর্থ না বুঝিয়া শশী নিতাইয়ের পানে চাহিয়া রহিল। নিতাই কহিল—কোতুল একটু সখণ করো—পরে সব জানতে পারবে।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞা-দিগ্গজ

সারাদিন পাতি-পাতি খুঁজিয়াও বিজ্ঞানীর সন্ধান মিলিল না। যে-মিলে সে চাকরির কথা বলিয়াছিল, সেখানে সন্ধান লইতে সংবাদ মিলিল, বিজ্ঞানীর চাকরি এখানে হয় নাই। সাহেব তাকে তিন দিন পরখ করিয়াই জবাব দিয়াছে।

সন্ধ্যার পর নিতাই স্কুলে ফিরিল। সূচিরা ?...

যেবে বিজ্ঞানায় দেহ-ভার বুটাইয়া সূচিরা পড়িয়া আছে। নিতাই দেখিল, তাকে ডাকিল না; ...নিঃশব্দে বারান্দায় আসিয়া বসিল।

ছেলে-মেয়েরা স্তিমিত আলোর ছায়া-মুষ্টির মত খাওয়া-দাওয়া সারিয়া পড়িতে বসিল। নিতাই তেমনি কাঠ হইয়া বসিয়া বহিল। প্রহরের পর প্রহর অন্তীত হইয়া চলিল।...

রাত্রি সাড়ে নটা...জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে। সূচিরা উঠিয়া বারান্দায় আসিল, আসিয়া নিতাইকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল।

নিতাই কহিল—সে আগাগোড়া মিথ্যা কথা বলেছে। ও মিলে তার চাকরি নেই।

সূচিরা কহিল,—আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—তার পর ?

—সে বলেচে, জেল বাঁচাতে সে-টাকা ব্যয় করেছে। তার হাতে কিছু নেই। টাকা সে এখন দিতে পারবে না।

নিতাই এমন সাক্ষাৎয়ের কথাই ভাবিয়াছিল। সূচিরা কহিল—তার উপর সে হাঁকিয়ে দেছে। বলে,—এক মাসের কড়াবে টাকা নিষেছি—পনেরো দিনের কড়াবে নয়! এক মাস পরে টাকা না পাও, নাগিশ করো।

বিষম রোবে জলিয়া নিতাই একেবারে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—কোথার সে শয়তান ?

সূচিরা কহিল,—ষ্টেশনের কাছে তার এক বন্ধুর বাড়ী—সেইখানে সে আছে। বন্ধুর নাম অক্ষয় বাবু। কাল সকালে কলকাতায় যাবে।

—পালাবে ? পালাতে দিচ্ছে কে ? বলিয়াই নিতাই উঠিল। সূচিরা কহিল,—কোথায় যাচ্ছেন ?

—সেই অক্ষয়ের বাড়ী। যতক্ষণ শাস, ততক্ষণ আশ।...এখনো ক'ণ্ঠী সময় আছে, এ সময়টুকুর সদ্য-বহার করি। কিন্তু তার আগে শশীর একটা বরাত আছে।

সূচিরা নিবেদন তুলিতেছিল, সে নিবেদন তোলার পূর্বেই নিতাই বীর-দর্পে দীর্ঘ দেহ লইয়া সরিয়া পড়িল। তাই তো,—ক্ষেতুর গৃহে আর এক শয়তানের খানস ডিঁড়িবার আয়োজন বেশ পাকা করিয়া তোলা

হইয়াছে। সে-কাজের এমন সুযোগ আর মিলবে না ! তারিণী, শশী প্রভৃতি সেখানে তার প্রতীকার পথ চাফিয়া আছে। বিজ্ঞানীকে ধরিবার পূর্বে সেখানে বাওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞানী তো কাল সকালে কলকাতায় পলাইবে—তাকে বাগাইবার সময় এখনো নিঃশেষ হয় নাই ! অথচ ক্ষেতুর গৃহে অন্ন-উৎসব...রাত প্রায় দশটা বাজিতে চলিল—এই তো মাহেন্দ্র-ক্ষণ !...

নিতাই গতির বেগ দ্রুত করিয়া বান্দোপাড়ার পথে চলিল। মাথার উপর আকাশ-ভরা জ্যোৎস্না—বাতাসের দোলায় গাছের পাতার মৃদু মধুর !

দূর হইতে অস্পষ্ট কলরব শুনা গেল। ঐ যে ক্ষেতুর গৃহ !...

নিতাই আসিয়া দেখে, বাহিরে এক গাছতলায় শশী ও তারিণী দাঁড়াইয়া আছে। নিতাইকে দেখিয়া তারিণী কহিল—আমি ভিতবে যাবো না। তবে ক্ষেতুকে সাফ বলেছি, এ কাজ যদি না পারো তো এ গাঁ থেকে আমার বাস ওঠাতে হবে। ক্ষেতু দিয়া গেলেচে, চরণকে অন্ন সে খাওয়াবেই।

নিতাই কহিল,—সহ বাঁড়ুষোদের খপর দিয়েচো শশী ?

শশী কহিল,—উড়ো চিঠি দিয়েছি। তাছাড়া সহুর এক মাসজুতো ভাই আছে না...রমানাথ ? তাকে লোভ দেখিয়েছি, ঐ পাক্সীদের ইঙ্কুল দেখতে দিনের বেলায় যাবো। সে ভাব করতে চায় সূচিয়ার সঙ্গে...

নিতাই কহিল,—তার মানে ?

শশী কহিল,—বেচারীর চাকরি নেই। বি-এ ফেল করে সে এসে সহকে ধবে, কিছু টাকা ধার দাও...ব্যবসা করবো। তা সহ বলেচে, ধার দিতে রাজী আছে, রমানাথের একটু জমি আছে কলকাতায়, সে-জমির যদি তার কাছে রমানাথ বন্ধক রাখে। ঐ জমির উপর সহর খুব লোভ। বেচারী বলছিল, যদি এ চাকরি পায়, তাহলে আর সহর বিষয়-বুদ্ধির মধ্যে তাকে পড়তে হবে না ! অর্থাৎ ঐ জমির জন্ত রমানাথকে সহ একটু বন্ধ-আত্তিও করতে হুদিন।

নিতাই কহিল,—কি করে সে জানলে, আমরা স্কুলে যাই ?

শশী কহিল,—সেখানে সে একদিন আমাদের দেখেছিল।...

নিতাই কহিল,—তা, রমানাথ কি করবে ?

শশী কহিল,—সহর দলকে গিয়ে সে বলেচে,—চরণ ভট্টাচার্য্য সকলের নাম ডুবুলো—ক্ষেতুর বাড়ী আজ নেমস্তন্ন থাকে ! সহ বলেচে, যতক্ষণ সে দেখতে চায় ... রমানাথ এতক্ষণ এখানে ছিল,—দশ-বারো মিনিট হলো, সহরের ডাকতে গেছে।

—বেশ! বলিয়া নিতাই তারিণী পানে চাহিল,  
কহিল—এ বজ্র আমরা দেখি কি করে?

তারিণী কহিল,—চুপি-চুপি আসুন—সে ব্যবস্থা  
করেছি। ক্ষেতুর ঘরের পাশে ঢেঁকিশালে একটা কাপড়  
টানিয়ে রাখা হয়েছে—পর্দার মত। ওদিকে ছোট  
জানলার গরাদ ভাঙ্গা—সেদিক দিয়ে ঢেঁকিশালে ঢকে  
আমাদের বসে থাকতে হবে।...আসুন আমার সঙ্গে...

নিতাই কহিল,—তার পর সহসা এলে...?

তারিণী কহিল,—আমি বাইরে থাকবো—খপর  
দেবো। ক্ষেতুকে ইশারা করলেই চরণের সামনে সে  
ভাতের খালা এগিয়ে দেবে...

নিতাই ও শশীকে লইয়া তারিণী ঢেঁকিশালে ঢুকিল।  
উঠানে ক্ষেতুর দল আহারে বসিয়াছে। চরণ চুপ  
করিয়া ক্ষেতুর ঘরে তক্তাপোষে বসিয়া তামাক  
টানিতেছে।...তারিণী দ্বারে করাঘাত করিল। সন্তপণে...  
ভনিয়া ক্ষেতু বাহিরে আসিল।

তারিণী মুহূর্তের কহিল,—শুভ কাজে আর বিলম্ব  
কেন, ক্ষেতুরাণী?

ক্ষেতু হাত নাড়িয়া কহিল,—বামনের জাত মারচি  
তোমার কথা—এর পরে তুমি যেন আমার পায়ে ঠেলো  
না, দেখো।

তারিণী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, না...

তারিণী নিঃশব্দে সরিয়া পড়িল। ক্ষেতু ঘরে গিয়া  
চরণকে কহিল—তোমার ভাত আনি...

চরণ চমকিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া কহিল,—  
ভাতটায় আমার তৃপ্তি, খাইয়ে তোমার তৃপ্তি—হ' নথর  
তৃপ্তি হয়ে যাবে।

ক্ষেতু কহিল,—ও-সব বিটকেন্টি আমি ভনচি না।  
আজ একটা আমোদের কাজ। এতে যদি বাগড়া তোলা,  
তাহলে সত্যি বলচি, আমি তোমার মুখ দর্শন করবো  
না।

চরণ হতাশ দৃষ্টিতে ক্ষেতুর পানে চাহিল।

ক্ষেতু কহিল,—আমার কাছে বামনাই ফলিয়ে না,  
ঠাকুর। আমি তোমাক সঙ্গে দিচ্ছি, হুকোর জল  
আছে—সে জল আমার ছোঁওয়া। আগুন আর জল...  
দুই আছে—তার সঙ্গে তামাক আর টিকে, কেমন তো?  
পোলাওতেও ঐ আগুন আর জল—শুধু তামাক-টিকের  
বদলে চাল আর মশলা—এই না...? তবে

চরণ কহিল,—এটা কাঠ-সংযোগে কি না...কথায়  
বলে, কাঠে জ্বাত যায় না।...

হাসিয়া ক্ষেতু কহিল,—আচ্ছা বাবু, পিড়িতে বসে  
বেয়ো...কাঠের যোগ থাকবে তাহলে। না খেলে আমি  
মাথা খুঁড়ে মরবো...সত্যি! কে জানবে? শুধু তুমি  
আর আমি...

চরণ কহিল, আমার আজ বস্ত্রমবাসের সেই  
বিছাদিগগজ না করে আর ছাড়বে না, দেখচি! বাকু,  
মহাজনেব পথ। তার ছিল আশমানি, আর আমার তুমি।

—সে আবার কি?

চরণ কহিল,—সে এক মজার গল্প। বলবো'খন।  
এখন নাও, ছাড়বে না তো...তোমার সন্তোষের জন্ত কি  
না করতে পারি!—তবে, চুপি চুপি...বুঝলে ক্ষেতু...  
আর পাঁচ যেটা-বেটি জানলে...

ভয় নেই গো ঠাকুরমশাই, সে জ্ঞান আমার আছে।  
বামনের জাত মারচি জানলে এ গাঁয়ে কি আমার কেউ  
আস্ত রাখবে? সে-ভয় আমার নেই?

—এই, এই, বোঝো তো এ গাঁয়ে শাসন কত কড়া!

ক্ষেতু চলিয়া গেল। চরণ বসিয়া চালের বাতা গণিতে  
লাগিল।

নিতাই ও শশী কথাগুলো শুনি। নিতাই শশীর গায়ে  
ঠালা দিয়া কহিল,—সমান্তরালের কাণ্ড দেখচো?

শশী কহিল—চুপ!

ক্ষেতু খালায় অন্ন বাড়িয়া আনি। মাটির ভাঁড়ে  
ঝোল, খালায় বিবিধ তরকারী।

ক্ষেতু কহিল,—খাইয়ে দি, হাত অগুজ্ব নাই  
করলে!—তাছাড়া হাতে গন্ধ থাকবে। শুধু মুখ দিয়ে  
খাবে বৈ তো নয়। আঁচিয়ে পাণ আর তামাক গেলেই  
চুকে যাবে।

চরণ কহিল—বেশ বৃদ্ধি করেচো! কিন্তু দোরে খিল  
দাও। কেউ যদি এসে পড়ে?

ক্ষেতু কহিল,—কেউ আসবে না। ভয় নেই। তাছাড়া  
কেউ আসে তো ভাববে, আমি খাচ্ছি! আমার হাতে  
ভাত—তোমার হাত খালি দেখবে তো! তুমি ঐ  
পালঙেই বসে থাকো—আমি গরম তুলে তোমার মুখে  
দি।...

তাছাই হইল। নিতাইয়ের অস্বস্তির অন্ত নাই। সে  
ওদিকে প্রহর গণিতে লাগিল...সহবাসের কখন আসবে!

চরণ আরামে গ্রাস লইতেছিল। ক্ষেতু কহিল—  
কেমন রান্না হয়েছে?

চরণ কহিল—বেশ। এমন কখনো খাইনি, ক্ষেতু  
—সত্যি বলচি। কে রাঁধলে?

ক্ষেতু কহিল—আমার বোনকী-জামাই। সে হুগ-  
লিতে এক সাহেবের বাবুজি কি না—রান্না-বান্না  
জানে।

চরণ কহিল,—বিলিতি খান! তাই বলে! এমন  
খানা খায় বলেই না এরা রাজত্ব করে! আর আমরা  
যেমন শাক পাতা খাই, তেমন দাসত্ব করে যরচি।

ভোজ্যের স্বাদে চরণ জাভের কথা ভুলিয়া গেল।  
মাংস খাইতে খাইতে চরণ কহিল,—দাঁতের সে জোর

নেই ক্ষেতু...নাহলে...আচ্ছা, তোমার এই বোনঝী-  
জামাইটি কিছু দিন আছে তো এখন ?

ক্ষেতু কহিল,—না। ছুটি মেনে কৈ ? কালই  
বিকলে চলে যাবে।

একথানা ভাড় চিবাটবান লোভ চরণ ছাড়িতে পারিল  
না।...কাজেই তত্কাপোন হইতে নামিয়া হাত দিয়া সেটা  
বাগাটিয়া ধরিল, ধবিয়া কামড় দিল।

বেচারী ! সহসা দ্বারপ্রান্তে স্বর ফুটিল,—ইস্...এ  
যে সত্যই মহোৎসব লাগিয়েচো হে চরণ !

এ স্বর...? চরণ চমকিয়া উঠিল। কম্পিত হাত  
হইতে ছাগলের ভাড় পড়িয়া গেল। চাতিয়া চরণ দেখে,  
সর্বনাশ ! দ্বাবে দাঁড়াইয়া সহু বাঁড়য্যে, বমানাথ এবং  
...কে যে নাই ! ক্ষেতু কি ইহাদেরও নিমন্ত্রণ  
করিয়াছে ?

সহু কহিল,—খুব বামুন ভূমি ! বাঃ !

নিতাই ও শশী ঢেঁকিশাল হইতে বাহিরে আসিল।  
নিতাই কহিল,—আমরা সাক্ষী, বাঁড়য্যে মশাই। এই  
চরণকে দিয়ে দেশ-ভুক্ত সকলের জাত মেরেচেন আপনি।  
এর সামাজিক বিচিত্র যদি না হয়, আমরা কাছারিতে  
নাগিল করবো। জাত-মারাব অপবাধে জেলও হয় নাকি  
শুনেচি।

সহু কহিল,—আমি ছাড়বো না হে। এর বিচিত্র  
আমি করবোই।...চরণ...

আর চরণ। চরণ তখন একেবারে মাটীতে মিশিতে  
চলিয়াছে।

মাথায় ঘোমটা টানিয়া সঙ্গজ ভঙ্গীতে ক্ষেতু পাশ  
কাটাটয়া ঘব হইতে কখন যে ইতিমধ্যে সরিয়া  
পড়িয়াছে...

নিতাই কহিল,—এব বিচিত্র যদি না করেন, তাহলে  
আমরা উপায় দেখবো। ঐ পাট্রীদের ধরবো...জাত যদি  
যায়, তাহলে আমরা খুঁটান হবো।

সহু কহিল,—এইখানেই থেকে যাও চরণ। গায়ে  
আর ভাড়-চোষা মুখ দেখিয়ে না। দেখালে তোমায়  
রক্ষা করবাব সাধ্য আমাদেব থাকবে না।

নিতাই কহিল,—ওঁকে সংপরামর্শ দিয়েচেন। তা  
উনি রাজী—উনি নিজেই বলছিলেন, উনি নাকি  
বিজাদিগুজ্ঞ আব ক্ষেতু ওঁর আশমানী।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### ভাগ্য-চক্র

সারা রাত্রি নিতাইয়ের আর দেখা নাই !—রাত্রিটা  
সুচিত্রার যে-বিভীষিকার মধ্যে কাটিল...বুঝি নরক-যন্ত্রণা  
বলিয়া যে কথা আছে, সে নরক-যন্ত্রণাও তাহার কাছে  
অতি-তুচ্ছ !

সকালে সেই রোজ, সেই বাতাস ! তবু হুনিয়ার  
মুখেব কালি আর ঘোচে না।—সাহেবের আসিবার কথা  
নটায়।...নাই, উপায় নাই,—কোনো উপায় নাই !  
এই কালি মুখে মাখিয়াই তাঁদের সামনে দাঁড়াইতে  
হইবে। নিজের মুখে সে কবুল করিবে, করিয়া বিচার  
চাতিবে—যত বড় কঠিন শাস্তি হোক, বুক পাতিয়া সে  
তা গ্রহণ করিবে !

চা-সমেত চায়েব পেয়াল টেবিলে পড়িয়া বহিল।  
ছেলেরা আসিল। পড়াশুনা...

সুচিত্রা কহিল—আমাব শরীর বড় খাবাপ, আজ  
ক্লাশ নিতে পারবো না। তোমরা পড়ো গে।

ছেলেরা সুচিত্রার মুখের পানে চাছিল। ও-মুখ  
এমন মলিন তাবা পূর্বে কখনও দেখে নাই ! তাবা  
বিলায় লইল !

খবর পাইয়া স্ত্রহাস ছুটিয়া আসিল। তার মুখ-  
চোখে উদ্বেগের ছায়া। স্ত্রহাস কহিল,—কি অশুভ ?

সুচিত্রা সহু কণ্ঠে কহিল,—এমন কিছু নয়। বাজে  
ভালো ঘুম হয় নি, তাই কেমন আলগা...

স্ত্রহাস কহিল,—তাই বলুন। সময়টা খাবাপ কি  
না—ভয় হয়েছিল।

সহু হাসিয়া সুচিত্রা কহিল—ভয়ের কারণ নেই।  
আপনি যান।

স্ত্রহাস চলিয়া গেল। সুচিত্রা পথের পানে চাছিল ;  
পরে ঘড়ির পানে। ঘড়িব ছোট কাঁটা আটটার ঘর পার  
হইয়াছে, নটাব ঘর এখন বুঝি ধরে। সুচিত্রা মুখ-হাত  
ধুইতে গেল।

সাক হইয়া সে আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল, পথের  
পানে চাতিয়া রহিল। বড় বড় গাছ ছায়া মেলিয়া  
দাঁড়াইয়া আছে, বাতাসে পত্র-পল্লব সহু হুলিতেছে !  
চারিদিকে জীবনের স্পন্দন ! দীপ্ত শ্রী !...তার মনে শুধু  
সকালেই ভয়ের ছমছমানি !

ঐ না...ঐ...কতকগুলো শুভ্র মৃষ্টি ? তাই !  
সুচিত্রা চক্ষু মুদিল, একান্ত আগ্রহে ভগবানকে ডাকিল—  
O Father, That art in Heaven...

সাহেব আসিলেন—সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি। সুচিত্রা  
ঈশ্বরের অভ্যর্থনা করিল !

চারিদিক দেখিয়া সাহেব প্রাণ খুলিলেন, কহিলেন,—

ইনি শীঘ্র কাজ শুরু করবেন! তুমি ওঁর হাতে টাকা দিয়ে যাও, সূচিভা। উনি তিন মাসে কাজ শেষ কবে দেবেন। সাহেবের মুখ সখিত।

এঞ্জিনিয়ার রাঙালী। হাসিয়া তিনি কহিলেন—  
আপনার কি সখ্যাতিই যে করছিলেন সাহেব...বল-  
ছিলেন, she is an angel।

সূচিভা গাঢ় কণ্ঠে কহিল—টাকা আনি।

সে ঘরে ঢুকিল...সিঁদুক খুলিল। Miracle...? তেমন miracle ঘটে না?...মহাভারতে সে পড়িয়াছে, দ্রৌপদী নারায়ণকে ডাকিয়াছিলেন, তাঁর...লজ্জা রক্ষার জ্ঞান! নারায়ণ সে ডাক শুনিয়াছিলেন! আজ তারও দ্রৌপদীর দশা! বুঝি দ্রৌপদীও চেয়েও বড় বিপদ। টোরেব কাজ করিয়াছে সে। কত বড় কলঙ্ক! তাই সে ভাবিতেছিল, ভগবান কি তার ডাক শুনিবেন না? Miracle-এব সৃষ্টি কববেন না?

বুকখানা নিমেষের জ্ঞান স্পন্দিত হইল। কিন্তু কিছু ঘটিল না! কোথায় miracle!...টাকা গনিয়া যতবার দেখে, ততবারই কম হয়—সেই এক হাজার কম। তার নিজের সক্ষম? গনিয়া দেখে, তিনশো বত্রিশ টাকা! বাকী ছ'শো আটশটি টাকা চাই!...কোনো উপায় নাই? ভগবান...ভগবান, তোমার অসামর্থ্য কিছু নাই। তুমি মনে কবিলে...মান রাখো, মান রাখো, দুস্কল-চিন্তা নাবীর মান ইজ্জৎ রক্ষা করো প্রভু।

কে শুনিবে? মানুষের শয়তানীর পূর্ব শয়তানী দেখিয়া ভগবান আজ চক্ষু মুদ্রিয়াছেন। তাঁর বিরক্তি ধরিয়াছে, ঘৃণা ধরিয়াছে, মানুষের ডাক তাই তিনি আস কাণে তোলেন না।

উপায়?

হুনিয়া হালতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ঐ গাছপালা মাঠ-বাট...মাথার উপর ঐ বৌদ্ধ-আলোকিত নীল নিখল আকাশও...!

উপায় আছে। একটিমাত্র উপায়! তাহাতে লজ্জা রক্ষা পাইবে—আর কিছু না হোক!...সেই উপায়ই...

টেবিলের উপর টাকার থলি ও বিজ্ঞপত্র হাণ্ডনোট রাখিয়া সূচিভা পিছনের দ্বার-পথে বাতির হইয়া গেল... বুঝি নিতাইয়ের সন্ধানে। তার গতি চোবের মত সতর্ক কম্পিত।

দীর্ঘ পথ। খোলা মাঠ, বন, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাপ, পুকুর, ডোবা, খানা, নালা...কদম্ব-তাব সঙ্গে চাক-তাব বিচিত্র মিলন...। সূচিভার মনে হইল, শয়তানীর সঙ্গে ককণার মিলনের মত বড় মধুর!

কিন্তু নিতাইয়ের কাছে সে কেন চলিয়াছে? নিতাই

কি করিবে? কেন করিবে?...কি বলিয়া সেই বা ককণা ভিক্ষা চাহিবে? বৃকে তাব তীব্র বহি-দাহ! সে দাহে তীক্ষ্ণ জ্বালা!

সামনে ঐ পুকুর। বৃকে কালো জল। পুকুর ডাকিতেছিল—তোমার ও জ্বালা আমি জুড়াইয়া দিব। এসো, আমাব বৃকে এসো।

নিমেষের ইঙ্গিত। কাণের কাছে মনও কহিল—  
গাই চলো। সব কুংসা, সব গ্রানি জুড়াইবে চলো!

সূচিভা পুকুরে নামিল—আঃ, কি শীতল জল! কি আশাব উল্লাসে ভরা। কি স্বপ্ন আশ্রম এ জলের কোলে...

হুনিয়াব আলো বিদ্যুতের চমক দিয়া পরক্ষণে দপ করিয়া নিবিয়া গেল। সব অন্ধকার...দিকে দিকে কেবলি বন কালো অন্ধকার।...

যখন সূচিভা চোখ মেলিল, ঘরে এক-ঘন লোক। সাহেব এঞ্জিনিয়ার, স্তম্ভাস ডাক্তার আব নিতাই। নিতাইয়ের চোখে তীব্র আগ্রহ!

সাহেব কহিলেন—জলে ডুবলো কি করে? ওদিকে গেল কখন?

নিতাই কহিল,—টাকা এখানে রাখা নিরাপদ নয় বলে আমার কাছে বেগেছিলেন। তারপর আমার কাছে যাছিলেন, পিছল পথ—কেমন পা হড়কে জলে পড়ে যান। ভাগ্যে আমি ঐ পথে আসছিলুম...

সাহেব কহিলেন—Thank God; And He never means harm to the good.

নিতাই কহিল,—তাই।

সূচিভার লুপ্ত চেতনা কিরাইতে বিলম্ব ঘটিল না। নিতাই খুব সময়ে এ পথে আসিয়াছিল। সূচিভা জলে হাবুডুবু খাইতেছিল—পথের ধাবেই পুকুর। জলও খুব বেশী ছিল না। শুশ্রূষায়-সেবায় কলবের সাবান্দিন কাটিয়া গেল। বৈকালে সাহেব সন্দেশ বিদায় লইলেন।

নিতাই তাঁদের বিদায় দিয়া বাবান্দায় আসিয়া বসিল। সূচিভা দাঁড়াইয়াছিল। আকাশে একটা পাখী উড়িতেছে, সূচিভা তাব পানে চাহিয়াছিল। সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সূচিভা কহিল—এত টাকা আপনি কেন দিলেন?

নিতাই কহিল, ও-কথা মুখে আনবেন না,—টাকা এমন পড়েছিল বৈ তো নয়! তবে বিজ্ঞলীকে শিক্ষা দা দিয়েছি, তা তার হাড়ে হাড়ে গাঁথা থাকবে।...সকাল অবধি যখন কিছু আদায় হলো না, তখন বাড়ী দিবে এসে টাকার যোগাড় করে ফেললুম।

সুচিত্রা কহিল—কিন্তু এ স্বপ্ন...

নিতাই সুচিত্রার পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,— সঙ্গে বেখে আপনার কাছে হাত দিতে দিলেই এ স্বপ্ন শোধ হবে।

সুচিত্রা চাহিল,—তাব মুখের পানে...দৃষ্টিতে গভীর কৃতজ্ঞতা!

নিতাই কহিল,—আমার ছন্দাড়া জীবনের মাঝখানে আসতে বলতে পারি না, তবে আমার কৰ্ম্মহীন অলস জীবনে আপনি যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেচেন... আপনার আদর্শ...

সুচিত্রাব চোখের দৃষ্টিতে কি আবেগ! আবেগের অধীভতার সে চলিয়া পড়িতেছিল! নিতাই ক্ষিপ্ত তাকে ধরিয়া ফেলিল। সুচিত্রার দেহে যেন বিদ্যুৎ বহিয়া গেল! মুখে রক্তিম আভা ফুটিল। নিতাই তা লক্ষ্য করিল।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই কহিল,—শরতান কিন্তু একটা কথা ঠিক বলেছিল, জীবনের পথে সাথী চাই, মনকে সৰ্ব্বদা যে উদ্দীপ্ত রাখবে!

সুচিত্রার মুখ ফুটিল। সে কহিল,—সে যোগ্যতা কি আমার আছে?

নিতাই চমকিয়া উঠিল। সে কহিল,—যোগ্যতা! আপনার যোগ্যতা! আমিই অযোগ্য...তাই মনের স্পর্শ...

সুচিত্রা কহিল,—ও কথা বলবেন না। আমি আপনার পায়ে চিরদিন বিক্রীত রইলুম। কে আমি, অথচ কি দিয়ে আমার মান, আমার ইজ্জৎ আপনি রক্ষা করেচেন! কিন্তু...আমার দেবার কি আছে? তার উপর...

নিতাই সুচিত্রার হাত ধরিয়া কহিল,—তাব উপর কি?

সুচিত্রা কহিল,—আমি অনাথা! খুঁটানো স্বপ্নে খুঁটানোর অঙ্গে প্রতিপালিত...

নিতাই কহিল,—হিন্দু-খৃষ্টান এ ভেদ মানুষের তৈরী। আমরা মানুষ...একই বিধাতার হাতে গড়া মানুষ। শুধু সঙ্কীর্ণ মন নিয়ে এই হিন্দু-মুসলমান-খৃষ্টানের ভেদ রচা মস্ত ব্যবধান গড়ে তুলি পরস্পরের মধ্যে। এ ভেদ আমরা মানবো না...। মানুষে-মানুষে মনের-মিল চাই। সে মিল ঘটাতে পারলে এ পৃথিবী সৃষ্টির সার্থকতার ভরে উঠবে! সেই সার্থকতা যাতে লাভ করতে পারি, আসুন, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের জীবন মিটিয়ে এক-লক্ষ্যে বইয়ে দি...

সুচিত্রা কহিল,—তাই হোক!

তার স্বর মৃদু, কোমল। সে-স্বরে রাছোর মাদুরী আর আরাম! আর দুই চোখের দৃষ্টি? আনন্দের আবেশে পবিপূর্ণ!

শেষ



# ସୂର୍ଯ୍ୟ

ଶ୍ରୀମୌରୀନ୍ଦ୍ରଯୋହନ ସୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ

# সুদূর

নবীন কবির পক্ষে ভক্ত পাঠক-লাভ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কমলের সে সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল।

বিপিন ছিল কমলের আশৈশব বন্ধু। এক গ্রামে দুজনের বাস। কমলের বাপ গামের জমিদার, বিপিন সেই গ্রামেরই এক গৃহস্থ-ঘরের ছেলে। গ্রামের স্কুলে বিপিনের শিরে সবস্বতীভূত রূপা অকুণ্ঠিত ধারে বর্ষিত হইলেও কমলের ভাগ্যে তাব অভাব ঘটে নাই। বিপিনের জ্ঞান অনেকখানি রূপা বর্ষণ করিয়া অবশিষ্টটুকু কমলকে দান করিয়া সবস্বতী দেবী প্রসন্ন ছিলেন। ক্রমে বিপিন প্রথম স্থান অধিকার কবিত, কিন্তু দ্বিতীয় স্থানটিতে কমলেবই ছিল অপ্রতি অধিকার। স্কুলের ছুটির পর কমল যখন নিজেদের ছাদে উঠিয়া ঘুড়ি উড়াইত, বিপিনের তখন সে ছাদে অব্যাহত প্রবেশলাভ ঘটত। বিপিন দরাই দিত, কমল ঘুড়ি উড়াইত। স্তায় মাগা দিবাব কল্পনা কমলের মনে উদ্ভিত হইবামাত্র বোতল-চূর ও বেলেব আঠা প্রভৃতি সবজাম লইয়া বিপিন কোথা হইতে নিমেষ-মধ্যে আবির্ভূত হইত, তাহা দেখিয়া কমলেরও তাক লাগিয়া যাইত। সে শুধু কিম্বদন্তি শ্রমে বিপিনের পানে চাহিয়া থাকিত।

একপে অর্থগত দারুণ বৈষম্যের ব্যবধান-সত্ত্বেও ছুটি তরুণ-হৃদয় আশৈশব একসঙ্গে পাশাপাশি থাকিয়া এক হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা একই স্রোতে বহিয়া চলিয়াছিল। তার পর এটাল পাশ করিয়া দুই বন্ধুতে কলিকাতাব কলেজে পড়িতে আসিল।

গ্রামের স্মৃতি পবন-শিখিত কুঞ্জ-তলে গ্রামার শিবের মধুর স্পর্শ যে-হৃদয়ে কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ ঘটাইতে সক্ষম হয় নাই, সহরের কদম্ব আকাশ ও কদম্ব বাতাস সে-প্রতিভা জাগাইয়া তুলিল। সহসা এক দিন নক্ষত্র-খচিত 'আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া আপনার গ্রামের কথা ভাবিতে ভাবিতে পাথর ঠেলিয়া কমলের প্রাণে নিরবের মতই ভাব-ভাষা বিচিত্র ছন্দে কবিতার স্বাক্ষরে ঝরিয়া পড়িল। কমল কবিতা লিখিল। গ্রামের সেই ভাড়া ঘাট, জীর্ণ শিব-মন্দির, খেলার মাঠ ও নিভৃত ছাদেব কোণ এক অপকণ মহিমায় মণ্ডিত হইয়া কমলের বিবহ-তপ্ত প্রাণে সজীব সুন্দর মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিল। মাঘের আদব, ভাইয়ের ভালবাসা, আত্মীয়-পরিজনের স্নেহ দূরত্বের ব্যবধান ঠেলিয়া কমলের মনকে এক অনাস্বাদিত অপূর্ণ আনন্দ-বসে অভিসিক্ত করিয়া তুলিল।

সে রাত্রে কমলেব ঘুম হইল না। কখন সকাল হইবে, বিপিন আসিবে? কবিতা লিখিয়া সুখ নাই, কাহাকেও তা' পড়ানো চাই! সে পড়ানোও আবার যাকে-তাকে নয়। প্রাণেব যে প্রিয়জন, প্রাণের সমস্ত অলি-গলির যে সন্ধান জানে, তাকে চাই। যে শুধু কবিতার ছত্র দেখিয়া তারিফ করিবে না, এই ছত্রগুলির অন্তরাল দিয়া একেবারে অতি সহজে কবিতা মনের মধ্যে প্রবেশ করিবে, কবিতাব মর্ম্ম বুঝিবে, তাকে, তাকেই পড়ানো চাই। সে লোক বিপিন।

এই রাত্রে যদি সমস্ত সহব-বাসী ছুটিয়া আসিয়া কমলকে বলে, এগো তরুণ কবি, আমরা আসিয়াছি, শুনাও, শুনাও, তোমাব কবিতা শুনাও! তাহাতে কমলের তত আনন্দ হইবে না, যতখানি হইবে, একবাব যদি বিপিন শুধু আসে! নিভৃত তার পাশে বসিয়া বিপিনকে যদি এক কবিতা সে পড়িয়া শুনাইতে পারে, তবেই তার কবিতা লেখা সার্থক হয়! অধীর আগ্রহে একরূপ বিনিমুগ্ধভাবেই কমলের সে ব্যক্তি কাটিল।

সকালে বিপিন আসিয়া কমলেব বাসা উপস্থিত। নিত্য সে প্রাতঃস্মরণ সারিয়া কমলেব এখানে চা খাইতে আসে; আঙ্গুর আসিল। কিন্তু চায়ের সঙ্গে সে আঙ্গুর কমলের কবিতার-নিঃসারিত যে আনন্দ-বস পান করিল, তাহাতে জুড়িয়া গেল। মুখ কিম্বদন্তি বন্ধুর ললাটে জয়-টাকা পবাইয়া বিপিন সে দিন যখন বিদায় লইল, তখন বেলা নটা বাজিয়া গিয়াছে।

সেদিন হইতে বিপিন ও কমলের মিলন-সূত্রে আর-একটা নূতন গ্রন্থি পড়িল। বন্ধন দৃঢ়তর হইল। তরুণ কবি বিশ্বল নেশায় কবিতা লিখিয়া যািতে লাগিল এবং ভক্ত পাঠক নিত্য আসিয়া কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে কবির কণ্ঠে আশা-প্রশংসাব বিজয়-মাল্য পবাইয়া দিতে এতটুকু অবহেলা রাখিল না।

তার পর ঝড় উঠিল। মানব-জীবনে এ ঝড় নূতন নয়,—এ ঝড় নিত্য বয়। এ ঝড়ে নিকট দূর হইয়া যায়, দূর নিকটে আসে। এ ঝড় বন্ধুকে বন্ধুর পাশ হইতে ছিনাইয়া দূরে ফেলিয়া দেয়, বন্ধুত্ব সভাব নূতন আগন্তুককে টানিয়া আনিয়া মহা সমাদরে আসন বিছাইয়া বসাইয়া দেয়।

কমল ও বিপিনের জীবনেও এ ঝড় দেখা দিল। সহসা একদিন প্রাতে উঠিয়া কমল দেখে, বিপিন নাই!

পরসার জগৎ—সংসারের জগৎ বিপিন কোথায় কত দূবে  
সবিস্য গিয়াছে। এ দূরত্বে চিঠির শৃঙ্খলে কিছুদিন  
বাঁধিয়া রাখা গেলেও চিরদিন বাঁধিয়া রাখা যায় না।  
চিঠি কাগজের শৃঙ্খল—কতটুকুই তার বল! সভায়  
এ দিকে নিত্য নূতন নূতন লোক আসিয়া দেখা দিতেছে  
—কত দিন তাদের ঠেকাইয়া রাখা যায়! তাদের  
কোলাহলে বাধ্য হইয়া তাদের পানে চাহিতেই হইবে।  
তাদের দাবী তারা ছাড়িবে কেন? যখন তাবা পাশে  
আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাদের ঠেলিয়া চলিয়া  
যাইবার সাধ্য কি!

যশ! কি তাহাতে মোহ আছে। কি সে কুহক  
জানে। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠে চড়িয়া শ্রোতের ফুলের  
মত ভাসিয়া যখন কমলেক কবিতাগুলি বঙ্গবাসী নব-  
নারীর অন্তর-ভট চুঁইয়া যাইতে লাগিল, তখন তার পক্ষে  
চিঠির হুর্গে বসিয়া দূব-গত বন্ধুর পানে চাহিয়া থাকা  
হৃদয় হইয়া উঠিল। এখন কমল আর বিপিনের কবি  
নয়, এখন সে সকলের কবি, বাঙালীর কবি! বিপিন  
শুধু আর তার একটিমাত্র পাঠক নয়, এখন তার পাঠক-  
সংখ্যা বহু।

একের কাছে আগে সে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া  
ধরিত, তাহাতে স্মৃতি ছিল। এখন একেব জায়গায়  
অনেক আসিয়া জুটিয়াছে। অনেকেও স্মৃতি আছে, তাব  
উপর অনেকে আব-একটা অতিরিক্ত-কিছু—নেশা!  
নেশার শক্তি অসাধারণ—সে শক্তি এড়ানো তরুণ কবির  
সামর্থ্যের বাহিরে।

বেচারি বিপিন কোন্ সূদূব গৃহ-কোণে পড়িয়া আছে।  
যাৱা কলরব-কোলাহলের মধ্যে থাকে, তাদের একটা স্মৃতি  
আছে—স্মৃতি তাদের জ্বালাইতে যায় না। স্মৃতি হ্রস্ব  
হইলেও নাবী; নাবীর মতই তার সহজ কুঠা আছে।  
তাই সে ভিড়ে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু যাৱা বিরহ-  
মান নীরব গৃহ-কোণে পড়িয়া থাকে, স্মৃতি তাদের  
বড় জ্বালায়! বিপিনেরও তাই ঘটয়াছিল।

একা সে এক কোণে নিৱালায় পড়িয়া থাকিত, স্মৃতি  
তাহাকে ছাড়িত না। নিভৃত বিজন ঘরের কোণ!  
বাহিরের কলরব সেখানে গিয়া পৌঁছায় না। নীরব  
অবসরে সে তার স্মৃতির দেওয়া পুঁথিখানা খুলিয়া বসে।  
পুঁথি জীর্ণ হইয়াছে, তবু তার কয়টা পৃষ্ঠা এখনও উজ্জ্বল  
রহিয়াছে! সেই পাতাগুলার পানে মৌন-মুক বিপিন  
চাহিয়া থাকে। চোখ তার জলে ভরিয়া যায়। স্বাপ্ন-সা  
চোখে পুঁথির পাতা মিলাইয়া আসে। নূতন ছবি  
অজ্ঞাতে তার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া ওঠে। সে ছবি  
কমলের। পত্র-পুষ্প খচিত আলোর লহবে ভূষিত  
যিৱাট সভা-মণ্ডপ—সে মণ্ডপের এক পাশে উচ্চ বেদী।  
বেদীর উপর বসিয়া কমল গান ধরিয়াছে। শিরে তার

মণিময় মুকুট, ললাটে চন্দন-তিলক, ওষ্ঠে হাসি, মুখে  
স্বর্গীয় জ্যোতি। আর তারই চারিধার ঘেঘিয়া সারা বাঙ-  
লার লোক বসিয়া আবেশ-বিস্মলভাবে সে গীতি-সুখ  
পান করিয়া ধন্য হইতেছে! সে সভায় সকলে আছে,  
সকলের উপর দিয়া কবির প্রসন্ন স্নেহ হস্ত অজস্র  
ধাবে বহিয়া চলিয়াছে! নাই শুধু সেখা বিপিন। কৈ,  
কবির চোখ বিপিনকে খুঁজিতেছে না তো!

না, আজ আর বিপিনকে তার প্রয়োজন নাই! স্মর  
সাধিতে হয় নিরুজ্জনে। সে সময় একজন,—একজনের  
শুধু পাশে থাকা প্রয়োজন! যদি ভুল হয়, সে শুধরাইয়া  
দিবে! যদি ঠিক হয়, সে তারিফ করিবে! আজ স্মর  
সাধা হইয়াছে,—আজ আর তাকে কি প্রয়োজন!

উপবে উঠিবার সময় সিঁড়ির প্রয়োজন—কিন্তু উপরে  
উঠিয়া সিঁড়ির পানে চাহিয়া থাকা মূঢ়তা! সিঁড়ির কাজ  
তখন ফুরাইয়াছে। নামিবার বখন প্রয়োজন নাই,  
তখন সে সিঁড়ি রহিল কি গেল, তা দেখিয়া কাজ কি!

কমলের স্মৃতি কাব্যের ক্ষেত্র ছাড়াইয়া ক্রমে নাট-  
কের ক্ষেত্রে দেখা দিল। দুই মাস ধরিয়া বাঙলার  
সংবাদ-পত্রে মাসিক পত্রে হৃদ্ধি বাজিতেছিল, কবির  
কমলকুমার নাটক লিখিয়াছেন। বাঙলার প্রধান নাট্য-  
শালা হায়ক বঙ্গমঞ্চে সে নাটকের অভিনয় হইবে।  
মহাসমারোহে নূতন নাটকের মহলা চলিতেছে।

স্বপ্নের প্রবাসে বসিয়া বিপিন সে হৃদ্ধি-নাদ কাণে  
শুনিল। তার মাথার মধ্যে রক্ত তোলপাড় করিয়া  
উঠিল। এ সেই কমল! তার কমল! সে আজ বাঙলার  
সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! আব সে...

বিপিনের চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল!  
এই তার হস্তাক্ষর! এই তার হৃদয়! চিঠির পর চিঠি  
খুলিয়া বিপিন পড়িতে লাগিল। কৃপণের ধনের মতই  
চিঠিগুলিকে সে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। এই সেই প্রথম  
চিঠি। আট পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া চিঠি! ভাস্কর্য কূলে কূলে  
ভরা নদীর মত কমলের সমস্ত হৃদয়টুকু এই আট পৃষ্ঠায়  
লুটাইয়া পড়িয়া আছে! তার পর...? চিঠির পাতার  
সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও গুড়াইয়া গিয়াছে! শেষে—আজ  
তিন বৎসর চিঠির আব দেখা নাই। শেষ চিঠিখানি তিন  
বৎসর পূর্বের লেখা। শুধু দুইটি ছত্র—“মাসিক-  
পত্রের তাড়ায় চিঠি দিতে অবসর পাই না। ক্ষমা  
করো! কেমন আছ?”

শুধু এই কয়টি কথা। ‘অবসর পাই না!’—এক-  
খানা চিঠি দিবার অবসর হয় না? এত কাজ। বিপিনের  
সমস্ত বুকখানাকে নাড়া দিয়া একটা প্রবল নিশ্বাস বড়ের  
মতই বেগে ছুটিয়া বাহির হইল। এ চিঠি নয়, বিদ্যুৎ-  
শিখা। এ শিখা বিপিনের প্রাণখানাকে পুড়াইয়া ছাই  
করিয়া দিয়াছে।

বিশ্বের কাকূতি-মিনতি করিয়া এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বিপিন কলিকাতায় আসিল। সেদিন শনিবার। হাবড়ার পুল পার হইতেই রাস্তায় একটা বাড়ীর দেওয়ালের উপর বিপিনের নজর পড়িল। নানা বঙের চিত্র-বিচিত্র করা বড় অক্ষরে ও কি লেখা।—কবির কমলকুমার রায়ের নূতন পঞ্চাঙ্গ নাটক, মণি-হার।

উত্তেজনার বিপিনের মাথার শিরা দপ্, দপ্, করিয়া উঠিল, বুকের মাধ্য বস্তু নাচিয়া উঠিল।

সন্ধ্যার পর নাট্যশালাব সম্মুখে গিয়া সে দেখে, কি ভিড়। সারা সত্তর যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সকলের মুখে মণি-হারের কথা, কমলের কথা! দলে দলে লোক টিকিট কিনিয়া নাট্যশালায় প্রবেশ করিতেছে। বিপিন উদ্গ্রীব-চিন্তে কার আশায় চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। আলোর চমক দিয়া ট্রামগাড়ী ধামিয়া আরোহী নামাইয়া আবার ছুটিয়া চলিয়াছে। মোটর, জুড়ি সশব্দে আসিয়া নাট্যশালায় সম্মুখে দাঁড়াইতেছে। বিপিন চারিদিকে চাহিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত সঙ্কুচিতভাবে আপনার মনিব্যাগ খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিল। টাকাটি বাহির করিয়া আবার চারিধারে চাহিয়া দেখিল। যেন সে অতি-বড় অপরাধী।—যেন সে চুরি করিতে চলিয়াছে এমনি বিবর্ণ তার মুখ, এমনই দীপ্তিহীন তার দুই চোখ! তার মনে হইল, ভিড়ের মধ্য হইতে বস লোক ব্যঙ্গ-কৌতুকভরা দৃষ্টিতে যেন তারই পানে চাহিয়া আছে। বিপিনের পা কাঁপিতেছে, গা টলিতেছে। মাতালের মত টলিতে টলিতে গিয়া টিকিট-ঘরে কোনমতে টাকাটা ফেলিয়া দিয়া সে একখানি টিকিট কিনিল, কিনিয়া দ্রুতপদে নাট্যশালায় মধ্যে প্রবেশ করিল।

নাট্যশালা তখন লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। অধীর দর্শকের কলরব-কোলাহল বিশূল জঙ্গ-কল্লোলের মত গুনিতেছিল। কেহ সিগারেট টানিতেছে, কেহ পান খাইতেছে। সম্মুখে পটের পিছনে এখনই যে বিরাট ছন্দ জাগিয়া উঠিবে, নিঃশেষে তাহা উপভোগ করিবার সজ্জা সকলে যেন প্রস্তুত হইতেছে।

ঐক্যতান বাজিল। এইবার! বিপিনের অঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হইতেছিল। একবার সে উপরেব পানে চাহিল। ঐ যে রাজাসনে বসিয়া...কমল! পাশে তার অসংখ্য ভক্ত! কমলের মুখে কুণ্ঠিত স্মিত হাস্য-রেখা! দর্শকের পানে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতেই যেন সে চাহিয়া দেখিতেছিল? কমল কি তাকে দেখিবে না? বিপিন কোথা হইতে আসিয়াছে? কেন আসিয়াছে? কিসের আকর্ষণে? সে কি তা বুঝিবে না? যদি না বোঝে?

বিপিনের মনে হইল, একবার সে চাঁৎকার করিয়া বলে,—হে বন্ধু, তোমার এ শুভ আনন্দের মুহূর্তে তোমারই সহিত আনন্দের কণা উপভোগ করিতে আসিয়াছি। এই অব্যত দর্শকবৃন্দের মুগ্ধ স্তুতি-কণ্ঠের সহিত আমি আমার কণ্ঠ মিলাইতে আসিয়াছি!

কিন্তু হায়, সে কথা কেমন করিয়া সে বলে! সে কথা কে মানিবে? বাজাসনে কবির পাশে আজ তার ঠাঁই নাই! সে আজ এই সাধারণ দর্শকের মত নিতান্ত একজন এক-টাকার দর্শক মাত্র!

পট উঠিল। একটা আনন্দ-সন্তোষনায় দর্শকের দল স্তব্ধ হইল। অভিনয় আরম্ভ হইল। প্রতি অঙ্কের প্রতি দৃষ্টের মধ্য দিয়া দর্শকের মন তন্ময়ভাবে চলিয়া কৌন্ অদৃশ্য স্বপ্নলোকে বিলীন হইয়া গেল।

যখন অভিনয় থামিল, মুগ্ধ দর্শকদল সহসা তখন চেতনা-লাভে ফুটু লইল! এ গান এখনই থামিল! এ যেন কোন নিগূণ ঐন্দ্রজালিক আপনার মায়ার-বস্তির বলে স্নান ধরণী-তলে স্বর্গের এক উজ্জ্বল অংশ ছিঁড়িয়া আনিয়াছিল! দর্শকের দল মুগ্ধ কৃতজ্ঞ চিন্তে নাট্যকারের জয়-গানে নাট্যশালা মুখরিত করিয়া তুলিল।

বিপিন আবার উপরের পানে চাহিল। কমল চলিয়া যাইতেছে—সার্থকতার বিরাট আনন্দে তার মুখ ভরিয়া গিয়াছে! বিপিন দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে বাহিরে আসিল।

নাট্যশালায় সম্মুখে দাঁড়াইয়া একখানা মোটর গাড়ী বিজয়গর্ভে যেন ফুসিতেছে! কমল আসিয়া গাড়ীতে বসিল, সঙ্গে জ্বরও তিন-চারজন ভক্ত আসিয়া উঠিল। জমকালো পোষাক-পরা কয়েকজন দর্শক আসিয়া কমলের কণ্ঠে পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। প্রশংসার ষটা পড়িয়া গেল। বিপিন দূরে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিল।

তাহার মনে একটা দারুণ জ্বালা গর্জিয়া উঠিতেছিল! চোর! চোর ইহারা! কমলকে তার কাছ হইতে ইহারাই চুরি করিয়া রাখিয়াছে! প্রশংসা ইহাদের ওষ্ঠাধ্রে শুধু লাগিয়া আছে! হৃদয়ের গোপন তল অবধি তার শিকড়টা পৌঁছিয়াছে কি না, সন্দেহ!

ইহাদেরই কথায়, ইহাদেরই অলস চাটুবাণীতে কমল এতখানি ভুলিয়া রহিয়াছে! বিপিনের মনে হইল, দুরন্ত রোষে ইহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সকলকে সে তাড়াইয়া দেয়—কমলকে আপনার দুই বাহুর নিবিড় বন্ধনে চাপিয়া ধরিয়া বলে, বন্ধু, কাদের কথায় তুমি ভুলিয়া রহিয়াছ! ইহারা তোমার হৃদয়ের কি খপব রাখে। শুধু বাহিরের একটুখানি দেখিয়াছে বৈ নয়! তুমি এস আমার হৃদয়ের মধ্যে! যে-হৃদয়ে শুধু তোমারই আসন, তোমারই ঠাঁই! ইহাদের কাজ আছে, কলরব

আছে, আরও অনেক আছে ! কিন্তু আমার শুধু তুমি  
আছ, শুধু তুমি আছ, শুধু তুমি ! কবি তুমি, মাহুষ তুমি,  
কমল তুমি...

কিন্তু কিছুই বলা হইল না ! মোটের গাড়ী কমলকে  
বুকে লইয়া চলিয়া গেল । বিপিনের যখন চেতনা হইল,  
তখন সে দেখিল, দর্শকের দলে গাড়ী ভাড়া করিবার বিষম

গণ্ডগোল চলিয়াছে এবং কাঠের পুতুলের মত নিস্পন্দভাবে  
সে নাট্যশালায় গাড়ী বারান্দার একটা খাম ধরিয়া  
দাঁড়াইয়া আছে । তাব চোখের সম্মুখে পথের আলোকলা  
কুয়াশা-মলিন নক্ষত্রের মত মিট মিট করিয়া জ্বলিতেছে  
এবং দর্শকের কোলাহল কানে আসিয়া বাড়িতেছে  
স্বপ্নশ্রুত ধ্বনির মত অস্পষ্ট !

# স্বখাত সলিল

বৈশাখ মাসে অনঙ্গব বিবাহ হইয়াছে। বপু চুনি জমিদারের মেয়ে! ক'দিন মাত্র শশুববাড়ীতে থাকিয়া আবার পল্লীগ্রামে বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। অনঙ্গর এবার পাশের পড়া—পাছে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়, সেজন্য মা বোকে আব আনেন নাট। উচ্ছা থাকিলেও ছেলের পাশের পূর্বে আনিবাব জো নাই।

চুনি লেখাপড়া তেমন জানে না। বিবাহের কথা-বার্তা চলিবার সময় তার বর্ণ-পরিচয় হয়। তবে ফুল-শয্যা বাক্রে অনঙ্গর কাতর মিনতিতে গলিয়া চুনি কথা দিচ্ছিল, এই ক'মাসের মধ্যে দিদির কাছে সে লেখাপড়া ভালো করিয়া শিখিয়া ফেলিবে। দিদি ননী বাল-বিধবা; পিত্রালয়েই থাকে। তাতাকেও অনঙ্গ পাঠে প্রকায়ে জানাইয়াছে, লেখাপড়া যে না জানে,—তা সে পুরুষ হোক, আর নারীই হোক, তার জীবন একেবাবে ব্যর্থ। এমন কি, তার সংস্পর্শে যে আসে, তার জীবনও ব্যর্থ হইয়া যায়। ননী ভরসা দিয়াছে, বাড়ীতে তেমন কোন কাজ নাই, চুনিকে সে নিজে ভালো করিয়া পড়াইবে এবং লেখাপড়া শিখাইয়া অচিবে তাতাকে অনঙ্গব যোগ্যা করিয়া দিবে।

চুনি চলিয়া যাওয়ার পর হইতে—হোক সে দু'দিনের আলাপ পরিচয়—অনঙ্গর দিন কি কবিয়া কাটিতেছে, তা সেই জানে। জৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র—উঃ, চারিটা মাস গিয়াছে! না যুগ গিয়াছে! বৈশাখ মাসে চুনির সঙ্গে দেখা,—সে যে, স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়! আবাব কবে দেখা হইবে, কে জানে!

পূজার সময় অনঙ্গর শ্বশুর বৈদ্যনকে বিস্তব প্রণাম জানাইয়া চিঠি লিখিলেন, বাড়ীতে পূজা, জামাতা বাবাজীকে একবার পাঠাইলে সকলে কৃতার্থ হন; দেশের লোকও তাতাকে দেখিবার জন্ম ব্যাকুল। অন্তত পূজার সময় ঐ কটা দিনের জন্ম—অবশ্য বাবাজীর পড়ার যদি কোন ক্ষতি না হয়, বাবাজীকে পাঠাইতে পারিলে তাঁহার অম্লগুণীত হইবেন। তাঁহার মাতৃদেবীর সনির্বন্ধ অনুবোধ। অনুমতি পাইলে তিনি লোক পাঠাইবেন।

অনঙ্গ আত্মাবে বসিয়াছিল। মা আসিয়া শ্বশুরের চিঠি পড়াইয়া বলিলেন,—কি রে, বাবি?

অনঙ্গ জলের গ্লাস মুখে তুলিয়াছিল; একটা বিধম থাইয়া গ্লাস নামাইল। মা বলিলেন,—বাট, বাট! তা তথ, বাপু, তোর যদি পড়ার ক্ষতি না হয় বুকিস্—

পড়ার ক্ষতি! পড়া! পড়া! জীবনটা যেন শুধু নোট মুখস্থ করবার জন্ম সৃষ্টি হইয়াছিল! পরীক্ষায় পাশ হইলেই মাগুষ চতুর্ভূজ হইবে! আর কোন কাজ নাই! মনটাকে আনন্দ-রস দিবাব প্রয়োজন নাই! শুধু কলেজের কেতাৎশুলা ষ্টীম-বোলাবের মত মনটাকে অহোবাক্ত লিখিয়া বিজ্ঞাটাকে হাড়ে হাড়ে গাঁথিয়া দিলেই জল্ভ নব-জন্ম সার্থক হইবে আব কি!

অনঙ্গ একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিল,—কোথায় নামতে হয়, কি রাস্তা—

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোকে তো আর তত্ত্ব দিয়ে পাঠাচ্ছি না, বাপু—তাদের লোক এসে নিয়ে যাবে।

—কবে যেতে হবে?

—ষষ্ঠীর দিন না হয় বাস্—তাঁই লিখে দেবো।

—কিন্তু বিজ্ঞার প্রণাম আমি তোমাব পায়েই কবতে চাই, মা—সকলের আগে তোমার প্রণাম করা চাই।

ছেলের কথা শুনিয়া মার মন ভিজিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—তা কতক্ষণেরই বা পথ! নবমীর দিন রাত্রেব গাড়ীতে বেরুলে বিজ্ঞাব দিন হুপুর বেলায় এখানে এসে পৌছতে পারবি'খন।

অনঙ্গর বুকটা ধক্ কবিয়া উঠিল। এতখানি ভক্তি দেখাইয়া এটুকু সে বিলক্ষণ আশা করিয়াছিল যে, মাও স্নেহ-বাৎসল্য দেখাইবেন, এবং পূজার ছুটিটা শ্বশুর-বাড়ীতে কাটাইয়া আসিতে বলিবেন! আহা, তাদের কি সাধ যায় না, নূতন জামাইটিকে লইয়া দু'দিন আমোদ-আহ্লাদ কবে! কিন্তু তাহা ঘটিল না।

তখন সে ভাবিল, যাক্, কত দিন, কত দিন পরে চুনির সঙ্গে দেখা হইবে! সেই কবে বৈশাখের এক শিঙা উষায় হুজনে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে—চুনি যখন গাড়ীতে ওঠে, অনঙ্গ তখন নিজের ঘরে বিছানায় পড়িয়াছিল। আসন্ন বিবহ-বেদনার বুক তার ভারী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্দম গৃহ! বিদায়ের পূর্বে চুনির সঙ্গে দেখা করানোটা কেহ উচিত বলিয়া মনে কবে নাই! তারপর চিঠি-পত্র লিখিয়া সেই সঙ্গ পরিচয়টুকুকে জাগাইয়া রাখিবাবও কোন উপায় ছিল না! কে জানে, আবাব নূতন করিয়া পরিচয় খালাইতে হইবে কি না! এখানে তাঁহার মন মুহূর্তের জন্ম চুনির কথা ভুলিতে পারে না—বই খুলিয়া সে বসে মাত্র, কিন্তু মন তার বড়ান্ ফাল্গুনে চড়িয়া সেই অজানা পল্লী'ব কোন্ গৃহ-কোণে অহরহ এক বালিকার পিছনে

উত্তল! হাওয়ার মতই ঘুরিয়া মরে! চুনি কি সেখানে বসিয়া তার কথা এমন করিয়া ভাবে?

সপ্তমীর দিন বেলা বারোটোর সময় অনঙ্গ স্বপ্ন-বাড়ী পৌঁছিল। অতীতের ধুম দেখিয়া সে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিশ্বাসের পর স্বপ্ন-আত্মার সারিয়া লইতেই দিদি-শান্তী বলিলেন,—একটু গড়িয়ে নাও, ভাই—রাত্রি গাড়ীতে ঘুম হয়নি ভালো।

এক সন্ধ্যায় সম্ভাবনায় অনঙ্গর প্রাণ নাচিয়া উঠিল। সে নিরীক সন্ধ্যা জানাইয়া দিদিশান্তীর অমুসরণ করিল।

দক্ষিণের এক বড় ঘরের মেসের উপর গদি-পাতা পাটি-বিছানো বিছানা ছিল। দিদি-শান্তীর ইচ্ছিতে অনঙ্গ আসিয়া বিছানায় বসিল। দিদিশান্তী তাকে শুইতে বলিয়া সঙ্গিনী বালিকার দলকে তর্জনের সুরে আদেশ দিলেন,—তোরা সব চলে আর দিকিন্—ও একটু ঘুমক।

এক-জনের আসার আশায় এ-পাশ ও-পাশ গড়াইয়া অনঙ্গর শেষে বিরক্তি ধরিল—সে কিন্তু আসিল না। অনঙ্গর মনটা ক্ষেপিয়া উঠিবার মত হইল—এ কি ব্যবহার! সে কি তোমাদের এখানে তুইখানা লুচি খাইতে আসিয়াছে, না, তোমাদের জমিদারী-পুঁজুর সমারোহ দেখাইয়া তোমরা তাব তাক লাগাইয়া দিতে চাও! সে কোনটারই ধার ধারে না। সে আসিয়াছে শুধু মিলনের ব্যগ্র প্রত্যাশা লইয়া—বিরহের ঘানি মুহিতে! সে কথাটা কেহই খেয়াল করিবে না?

অনঙ্গ ভাবিল, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকার সঙ্গে দেখা হইলে ইহার একটা বোঝা-পড়া সে করিয়া লইবে, স্বপ্নের পুত্র-দুটি নেহাৎ নাবালক—তারা তাদের এই নূতন ভগ্নপতিটির কাছে ঘেঁষ দিতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ করিল। দুই হইতে অনেকখানি সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াই তারা তাদের কৌতুহল পূরণ করিয়া লইল। অনঙ্গ ভাবিল, তাহাদের একবার কাছে পাইলেও নয় চুনির কথাটা সে পাড়িয়া দেখে!

প্রকাণ্ড বাড়ী লোকের ভিড়ে গম্-গম্ করিতেছে। নানা চেহারার বিভিন্ন নর-নারী তাহাকে দেখিয়া কৌতুহল মিটাইয়া লইতেছে। কিন্তু হায়, কোথায় তার সেই আপন-নার জন—চিরবাহিতা প্রিয়া! তার চিন্তে কি এক-বিন্দু কৌতুহল নাই! চুনি কি তাহাকে ডুলিয়া গেল? কথাটা মনে হইতে এক গুঢ় বেদনায় প্রাণ তাব বন্ধন করিয়া উঠিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

এমন সময় শুভবসনা এক কিশোরী আসিয়া মৃদু কোমল কণ্ঠে ডাকিল,—অনঙ্গ—

অনঙ্গ করিয়া দেখে, জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা ননীবালা।

স্বপ্নের মুখে সংঘর্ষের শাস্ত মাধুর্য, ঠোঁটের কোণে সরল হাসির দীপ্তি! সমস্ত অবয়বে লজ্জার এক কমনীয় লালিত্য ফুটিয়া রহিয়াছে। ননীর হাতে স্বৈত-পাথরের ছোট একখানি রেকাবি। রেকাবিতে জলখাবার। ননী স্বপ্নের দিকে চাইয়া ডাকিল,—আসন নিয়ে এলি বিন্দু?

এক প্রোচা দাসী আসিয়া আসন পাতিয়া দিল; ননী জলখাবারের রেকাবি নামাইয়া কহিল,—নাও ভাই, বসো। স্বপ্নবাড়ীর স্বয়ং-স্বীন আচরণে একটু পূর্বের অনঙ্গর ভারী রাগ ধরিয়াছিল। কিন্তু এ মূর্তির এই স্নেহময় সরল কণ্ঠস্বরে সে বাগ মুহূর্তে সরিয়া গেল। ইহার কথাব প্রতিবাদ করা নিষ্ঠুরতা! অনঙ্গ গিয়া আসনে বসিল।

ননী কহিল,—ওবেলায় পূজোর কাজে ব্যস্ত ছিলুম, তাই আসতে পারিনি, ভাই। কিছু মনে করো না। চুনিকে এত বোঝালুম, ঠাকুমা কত টানটানি করলে, তা মেয়ে একেবারে লজ্জায় ঘাড় শুঁজে পড়ে বৈল। এত লোকজনের মাঝে—ছেলেমানুষ কি না—লজ্জায় আসতে পারলে না। এই গোলমাল! তা তুমি তো ছু-চায় দিন আছ!

অনঙ্গ ঘাড় হেঁট করিয়া জানাইল, না, কালই তাকে ঘাইতে হইবে—কাল নেহাৎ না। ঘটে ত নবমীর দিনে যাওয়া চাইই। বাড়ীতে বিস্তর কাজ—দুইদিনের জগ্গ যে এই আসিতে হইয়াছে, সে একেবারে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি বারোটোর সময় যাত্রা আরম্ভ হইল। জমিদার-বাড়ীর প্রকাণ্ড উঠান লোকে লোকারণ্য। স্বপ্নের নব-জামাতাকে লইয়া আসবে বসিলেন; অনঙ্গ প্রমাদ গণিল। গেল বে, আজ রাত্রিও বুঝি চুনির সঙ্গে দেখার আশা একবারে ঘুচিয়া গেল! রাগে তার সর্বস্ব জ্বলিয়া উঠিল। এ কি অসহ্য বেয়াদবি! হাতে পাইয়া এমন ভাবে অপমান করা! হও না তোমরা জমিদার—হোক না কেন তোমাদের লক্ষ টাকা। আর—দেশের লোক আর সরকারের কাছে থাকুক না তোমাদের খাতির। অনঙ্গ জামাই! তারও একটা প্রাপ্য খাতির আছে! সে তো আর পাড়ারগায়েব অঙ্গ ভূত নয় যে যাত্রার সং দেখাইয়া জুলাইয়া দিবে! সে কি এতটা পথ কষ্ট করিয়া আসিয়াছে, তোমাদের এই পল্লীগ্রামের মজলিসে বসিয়া ঐ লক্ষ্মীছাড়া তামাসা দেখিবার জগ্গ?

অথচ এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোন ইঙ্গিত করা ভালো দেখায় না—আজ্ঞা-সম্মানে যা লাগে। অনঙ্গ ভাবিল, একটা কিকির করা যাক!

সে সেই আসরে বসিয়াই নিজের ভাণ করিল। ঔষধ ধরিল। স্বপ্নের কহিলেন,—তোমার ঘুম পাচ্ছে। তুমি ঘুমিয়ে পড়োগে বাবা—

তখনই ভূত্যের প্রতি আদেশ প্রচার হইল। ভূত্য

জামাইবাবুকে উপরকার ঘরে আনিয়া খাটের উপর শয্যা দেখাইয়া দিল।

রাত্রেও আশাব সেই নিষ্ঠুর চল-অভিনয়! ঘরের বাহিরে কাহারও নুপুরের সরসেব মৃত বাগিণী বাজিয়া উঠিল না—কাহাবও চরণ-শব্দ পাওয়া গেল না। অনঙ্গর বুকটা অসহ্য দুঃখে ফাটিয়া পড়িবার মত হইল। শুইয়া শুইয়া রাগে সে ফুটিতেছিল। প্রতিশোধ লইবার দারুণ বাসনা মনের মধ্যে বিষম ঝড় তুলিয়া দিল। তীব্র জ্বালায় অস্থি-পঞ্জরগুলো জ্বলিয়া ছাই হইতে লাগিল। তার পর এই অকরণ আচরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে জানিতেও পারিল না।

সহসা তার মনে হইল, পায়ের তলায় কে যেন আসিয়া বসিয়াছে! কার যেন কোমল স্পর্শ! চুনির? অনঙ্গ চোখ খুলিল?

না। পায়ের কাছে নির্ঝাঁক মুক্তি নির্ঝাঁক-ভাবে বসিয়া রহিল। থাক্ বসিয়া—অনঙ্গ কখনই চুনির পানে চাহিয়া দেখিবে না, কোন কথা কহিবে না! রাত্রিটা কোন মতে পোহাইলে হয়, সকলের প্রাণে প্রতিশোধের এমন মূৰ্খল হানিয়া সে প্রস্থান করিবে! কাহারো সঙ্গে কথা কহিবে না—এখানে জল স্পর্শ করিবে না—ছই-চারিটা কথা যদি কহিতে হয়, ত তাহাতে এমন রাজ সে মিশাইয়া দিবে যে সকলে বুঝিবে, হাঁ, এ একটা মাহু! ইহার খাতিব করা চাই! জমিদারের জামাই বলিয়া সে যে অনাদর সহিয়া পোষা কুকুরটির মত। নরও আবদারে লেজ নাড়িবে, তখন পাত্র সে নহ!

ঐ যে পদ্মতলোনা উঠিয়া দাঁড়াইল! অনঙ্গ চোখ চাহিল না। চুনি আসিয়া তার বকের উপর মুখ রাখিল, কহিল,—আমায় মাপ করো লক্ষ্মীটি, লোকের ভিড়ে আমি আসতে পারিনি—পাছে সকলে ঠাটা করে!

অনঙ্গ তবু কোন কথা কহিল না। সে বড় বেদনা পাইয়াছে! এত বড় অপমান, এত সহজে তা ক্ষমা করা চলে না। চুনি বকে মাথা রাখিয়া কহিল,—কথা কবে না?

রাগে অনঙ্গর সমস্ত মনটা তখনও জ্বলিতেছে। চুনিকে সজোরে ঠেলিয়া সে বুক হইতে সরাইয়া দিল। একটা শব্দ হইল। অনঙ্গর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল—সভয়ে উঠিয়া বসিয়া দেখে, কোথায় চুনি! কোথায় কে! এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখিতেছিল। স্বপ্নের যোবে পাণ-বালিশটাকে চুনি কল্লনা করিয়া ঠেলা দিয়া একেবারে খাটের নীচে ফেলিয়া দিয়াছে! বাহিরে জুড়ির ঝল তখন চীৎকার স্বরে গান ধরিয়াছে,

ও রাই বসে আছ নিজে ছেড়ে যার আসার আশায়—  
ওগো, যামিনী সে পোহায় শুখে চন্দ্রাবলীর বাসায়।

যাত্রা খুব জমিয়া গিয়াছে!

পরদিন সকালে অনঙ্গ জানাইল, আজ তাকে বাড়ী ফিরিতে হইবে। না গেলে বিস্তর ক্ষতি হইবে! যাওয়া চাইট!

গ্রাসিকা ননীবালা আসিয়া বুঝাইল, খুন্সুর বুঝাইলেন, দিদি-শান্তীও বিস্তর কথা পাড়িলেন, কিন্তু অনঙ্গর সঙ্কল্প অটল, অচল। অগত্যা সকলে হাল ছাড়িয়া দিলেন।

বেলা তিনটায় টেন। বারোটার সময় আহার শেষ হইলে ননীবালা চুনিকে অনঙ্গর ঘরে টানিয়া আনিল এবং একটা পুঁটুলি মত ঘরের কোণে ধুপ্, করিয়া তাকে নিক্ষেপ করিয়া বাহির হইতে চটপট দ্বারে শিকল টানিয়া দিল।

অনঙ্গ কোন কথা না কহিয়া খাটের উপর গভীর মুখে বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এমন-ভাবে কাটিয়া গেলে সে এক-নিশ্বাসে কহিল,—আমি চললুম চুনি, তোমার হাতে বাতাস লাগবে এবার। আর কখনো তোমার পথে বিঘ্ন হয়ে এসে দাঁড়াবো না। তুমি এখানে পরম স্থখে নিশ্চিন্ত চিন্তে থাকতে পাবে। ভেবো, তোমার লক্ষ্মীছাড়া স্বামীটা মরেছে, তোমার আপদ দূর হয়েছে—আজ থেকে তোমায় আমি মুক্তি দিলুম! তোমার ছুটি, ছুটি, চিরদিনের জগা ছুটি!

এত বড়-বড় কথাই খোঁচা যার প্রতি নিক্ষেপ করা হইল, সে খোঁচা কিন্তু তার গায়ে ঝাঁপিলও না! কাপড়ের আবরণে কুণ্ডলী পাকাইয়া সে বসিয়া রহিল।

অনঙ্গ ভারী ব্যথিত হইল। এমন কথাগুলো যে-কোন উপজ্ঞাসে বা কবিতায় গুঞ্জিয়া দিলে কতখানি করুণ রস উথলাইয়া তুলিতে পারিত, পাঠকের স্বাস্রোপ হইয়া যাইত, চোখ ছল-ছল করিত—আর সেগুলো কি না এই মূর্খ অজ্ঞ বালিকার বাক্যবিন্যাসের কঠিন অঙ্গে ঠেকিয়া একেবারে বার্থ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল! তাহা অদৃষ্ট, এ কথায় পাষাণী প্রিয়া একটু চঞ্চল হইল না! এ দুঃখে যে রাখিবার ঠাই নাই।

অনঙ্গ উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া চুনির মুখের কাপড় টানিয়া সৰু সৰু কণ্ঠে ডাকিল,—চুনি—

চুনি চমকিয়া তার আশ্রিত নয়নের এমন একটি নিকর সজল দৃষ্টি অনঙ্গর মুখের উপর স্থাপিত করিল যে, তাহাতে অনঙ্গর সর্কশরীর ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। সে-চোখের ভাষা বড় করুণ, বড় তীব্র! সকল মৌনতাকে নিমেষে সে মুখের করিয়া তুলিল।

অনঙ্গ চুনির হাত ধরিয়া তাহাকে খাটে বসাইল। বড় সুন্দর মুখখানি—নিজা-হীনতার সুস্পষ্ট স্নানিয়া সে সৌন্দর্য্যে বেশ মধুর একটি লালিত্যের ছায়াপাত করিয়াছে।

অনঙ্গর সংবম টুটিল। সে সেই মুখখানি অজস্র



চুশনে ভরাইয়া দিল। তারপর অনেক কথা সে বলিয়া গেল—এ কয়মাস চুনির অদর্শনে কি অসহ্য যন্ত্রণা সে ভোগ করিয়াছে। পূজার নিমন্ত্রণ কতখানি আশা বুকে লইয়া সে এখানে আসিয়াছিল। পূজা দেখিতে সে এখানে আসে নাই, যাত্রা শুনিতে আসে নাই। সে আসিয়াছিল শুধু তার জীবন-সর্ব্বশ্ব চুনির এই সুন্দর মুখখানি দেখিবার জন্ত, তার সঙ্গে দুটা প্রাণের কথা কহিবার জন্ত।

চুনি মাথা নীচু করিয়া সব কথা শুনিল—তারপর ম্লান চোখে স্বামীর পানে ফিরিয়া চাহিল। যেজন্ত তাকে এ ঘরে পাঠানো হইয়াছে, সেটা কোনমতে বলিয়া ফেলিলেই দায়-মুক্ত হয়—সেটুকু বলিবার জন্ত সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। বৈশ্বকর্ণ এ ঘরে থাকিলে গঙ্গাজলের কাছে প্রকাণ্ড কৈফিয়ৎ দিতে হইবে—এক-বাড়ী লোকের তীব্র বিজ্ঞপ-দৃষ্টির সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মত দাঁড়াইতে হইবে,—টিটকারী বড় অন্ন সহিতে হইবে না! সে বড় গলা করিয়া সঙ্গিনীদের বলিয়াছিল,—ববকে দেখবার জন্তে আমার অমন প্রাণ ছটফট করে না।

বৈশ্বকর্ণ এখানে থাকিলে এ দর্প কোথায় থাকিবে, তাই স্বামীর বক্তৃতা খামিলে প্রথম অবসরে সেই কথাটাই সে পাড়িয়া বলিল। অদর্শন, বিবহ-যন্ত্রণা,—এ-সবের কোন ধার সে ধারিত না—মা ও ঠাকুমার শেখানো ব্লিষ্ট আওড়াইয়া গেল। চুনি কহিল,—আজ তোমার থাকবার কথা ছিল তো! সকলেই বলছে, থাকো না।

—থাকা হয় না, চুনি।

—মা বলছিল, ঠাকুমা বলছিল, দাদি বলছিল—আজ তুমি মনে করলে থাকতে পারতে।

—পারতুম, চুনি, কিন্তু এখন আর থাকা যায় না। কাল রাত্রে তুমি যদি একটাবার আসতে, তাহলে আজ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারতুম।

—তবে যে বগছো, তোমার কি কাজ আছে—সেখানে!

চুনির মুখে কোঁতকের দুই হাসি ফুটিল।

অনঙ্গ বলিল,—সে কাজ এ ক’দিন পরেও হতে পারতো।

—তবে বুঝি কাজের কথা মিছে করে বলেছো? চুনির ঠোঁটের হাসিটুকু আরও স্পষ্ট হইল।

অনঙ্গ গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—তাই বটে! তোমার উপর অভিমান কবেই বলেছি। কি জন্তে এখানে থাকবো? কেন থাকবো? তোমার সঙ্গে দু’দিন মোটে দেখা হলো না—কাল রাত্রে এলে না কেন? যাত্রা শুনিতে বসে?

—হ্যাঁ।

অনঙ্গ আবার একটা খোঁচা দিবার অভিপ্রায়ে কহিল,—যাত্রা কেমন শুনলে?

সুস্পষ্ট সহজ স্বরে উত্তর মিলিল,—বেশ! তুমি উঠে গেলে কেন? বাবার কাছে বসেছিলে, আমি চিকের আড়াল থেকে দেখছিলুম! তোমার বুঝি ভালো লাগছিল না?

অনঙ্গ কহিল,—না। পরক্ষণে একটু হাসিয়া সে আবার বলিল,—তুমি আমার চিনতে পেরেছিলে! সেই তো কবে দেখেচ!

চুনি হাসিয়া বলিল,—বাবে, তা বুঝি মানুষ চিনতে পারে না? তার উপর তোমার সে ফটোগ্রাফ-খানা মা বে বাঁধিয়ে আমাদের ঘবে টাঙ্গিয়ে বেবেছে!

—সে ফটোগ্রাফ তুমি বোজ দাখো! লজ্জা করে না? কেউ যদি ধরে ফেলে?

—সে ঘবে চব্বিশ ঘণ্টাই তো লোক থাকে না!

এ কথায় অনঙ্গ আনন্দ পাইল। তবে তো চুনি পাখাগী নয়—তার হৃদয় আছে।

বাহির হইতে ননী কহিল,—তোমার গাড়ী তৈরি, অনঙ্গ।

চুনি খাট হইতে ঝাঁপাইয়া একেবারে দূরে সরিয়া গেল, মুহূর্ত্তে কহিল,—তাহলে আসি। মাকে তাতলে বলবো যে, আজ তোমায় যেতেই হবে?

এ কথাই কোন উত্তর আর অনঙ্গ দিতে পারিল না। তার চোখে জল আসিয়াছিল। নিজেই চঠকারিতায় নিজেই উপর রাগও না ধরিয়াছিল, এমন নয়। নিজেই সে অধৈর্য্যে ঝাঁকে নিজের স্তব্ধটুকুকে পায়ে চালিয়া গুঁড়া করিয়া দিয়াছে! তাই কলিকাতায় ফিরিবার এমন কি প্রয়োজন ছিল? কিছু না! তবে? শুধু রাগেই মাথায় কথার কথা বলিয়া ফেলিয়াছে বৈ নয়। কিন্তু সেই কথাটুকুর জন্তই যে কোনমতে আর থাকিয়া যাওয়া যায় না! লোকে কি ভাবিবে? প্রকৃত কারণটা এখনই প্রকাশ হইয়া পড়িবে—সকলে পরিহাসের হাসি হাসিবে! ওদিকে আবার গাড়ী অবধি প্রস্তুত!

নিজের নিবৃত্তিতার কথা ভাবিয়া তার প্রাণটা হায়-হায় করিয়া উঠিল। বাস্তবপাণী হওয়ার এই ফল! ওবে লক্ষ্মীছাড়া, ওবে ধৈর্য্যহারা, আর একটু যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতিস্! আর-একটু—!

ননী ঘরে ঢুকিয়া বলিল,—নেহাং চললে ভাই! আমাদের বড় কষ্ট রইলো কিন্তু! ভালো কবে দুটো কথা পরীক্ষা কইতে পেলুম না! কি করবো বলো,—তোমার কাজের ক্ষতি হবে বলচো,—কাজেই আমরা আর জেদ করতে পারি না। মা কিন্তু বড় দুঃখ করছিলেন।

অনঙ্গ ভাবিল, না হয় সে কাজের কথা বলিয়া

ফেলিয়াছে, তাহাতে মহাভাবত এমন অশ্রু হইয়া গিয়াছে যে তোমরা আর-একটু বেদ কবিত্তে পারো না? সকলে মিলিয়া আর-একটু বেদ কবিলেই যে থাকিয়া যাই! ওগো, করো গো, একবার তোমরা একটু বেদের অনুরোধ করো!

কিন্তু হায়, সে অনুরোধ, সে জের কেহ করিল না। নিদিশান্ত্রী শুধু বলিলেন—বড়দিনের ছুটিতে আবার এসো, দাদা—এবারে আমোদ-আহ্লাদ কিছুই হলো না!

শান্ত্রী পলাগামের মেয়ে,—জমিদারী বাড়ীর পুরাতন প্রথা ঠেলিয়া জামাইয়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারেন না—অবগুঠনের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া নৌববে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বেচারী অনঙ্গকে বাইতে হইল। বাইবার সময় নিদিশান্ত্রীর দিকে চাহিয়া বাহিরে ঠোঁটের কোণে জোর করিয়া একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিলেও ভিতরটা তার ধু-ধু করিয়া জ্বলিয়া বাইতেছিল।

গাড়ী ষ্টেশনের দিকে ছুটিল। পথের দুইধারে বাগানের সারি—বাগানের গাছ-পালা, শান্ত্রী স্বপ্ন পল্লীর এই শ্রামল জী, সমস্তই অনঙ্গর চোখে ঝাপসা ঠেকিতেছিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

এখনও যে আশা মোটে নাই, এমন নয়! ট্রেনখানা

যদি কোন-গতিকে ফেল করা যায়! আহা, তেমন ভাগ্য...

ঐ রেল-লাইন দেখা যায়। সিগনাল কৈ পড়িয়া নাই! অনঙ্গ ঘড়ি খুঁসিয়া দেখে, ট্রেনের সময় উৎরাইয়া গিয়াছে! তার আঁধার চিত্তে আশার একটু ক্ষীণ বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল। আঃ!

কিন্তু ষ্টেশনে গিয়া শুনিল, টাইম হইয়া গিয়াছে বটে, তবে ট্রেন লেট! স্বপ্নের যে কণ্ঠচরিত্রটি সঙ্গে আসিয়াছিল, সে কহিল,—আঃ, বাচাৎগেল। ট্রেন ফেল কবে ফেললে আজ আমার কম বকুনি খেতে হতো! বাবু বিশেষ বলে দিয়েছেন, ট্রেন ধরিয়ে দেওয়া চাই, নাহলে আপনাদের ক্ষতি হয়ে যাবে।

কণ্ঠচরিত্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া পকেট হইতে ডিপা বাহির করিয়া একটা পাণ মুখে দিল, এবং বিড়ি কিনিবার উদ্দেশ্যে চুফট-ওয়ারালার সন্ধানে সরিয়া পড়িল।

অনঙ্গ অত্যন্ত হতাশভাবে প্লাট-ফর্মের বেঞ্চে আসিয়া বসিল। তার মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ কবিত্তেছিল। মনে হইল, চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আলোক-বিন্দুতে পরিণত হইয়া একটা ভরস্বর রকমে প্রেত-নৃত্য শুরু করিয়া দিয়াছে!

এমন সময় ঢং-ঢং-ঢং-ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং রেলের কুলি হাঁকিল,—কলকাতা-যানে-ওয়ারাল গাড়ী ছোড়া—টিকেট—টিকেট!

# চিঠি

পাড়াগাঁয়েব অনেক দিনের পুর্বোনা ভাঙ্গা-চোরা একখানা বাড়ী। তাবি শাপ বাঁধানো দাওয়া, মাঝে-মাঝে চটা উঠে গেছে। সেই দাওয়ার একধারে বায়ো বছরের একটি ছেলে, পাশে কড়ির দোয়াত আর শরের কলম; কাছে বসে এক বুদ্ধা নারী। তাকে লক্ষ্য করে ছেলেটি বললে,—কি লিখতে হবে, বলো পিশিমা? আমি আবার এখনি ও-পাড়ায় যাত্রা শুরুতে যাবো।

ছেলেটি যাকে পিশিমা বললে, ছেলেব দল গ্রাম-সম্পর্কে তাকে পিশি বলে ডাকে। তা-ছাড়া তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই।

বুদ্ধা বললে,—আমাব ফেলিকে একখানা চিঠি লিখতে হবে, বাবা। আজ চার বছর তার কোন খবর পাটিনি।

ফেলি তার ভাইব্বী; মা আঁতুড়ে মাবা গেলে এই পিশিই তাকে কোলে তুলে নেয়, মানুষ করে। এই পিশিকেই সে মা বলে জানে।

বুদ্ধার দুই চোখ চল-চল করে এলো। মনের মধ্যে চার বৎসর পূর্বেরকার এক করুণ বিদায়-দৃশ্য জেগে উঠলো। বাড়ীর সামনে তাল-নারকেলের ছায়ায়-সেবা খানিকটা খোলা জায়গা—সেইখানে পাকী নামানো ছিল। ফেলি খন্তর-বাড়ী যাবে। জামাই বোজগেরে হয়েছে, ফেলিকে এবার নিজের কাছে নিয়ে যাবে। জামাই গরদের কোটের উপর সোনার ঘড়ি-চেন ঝুলিয়ে গন্তীর মুখে আশে-পাশে পায়চারি কবে ফিরছিল। আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে পিশি এসে ফেলিকে পাকীতে তুলে দিলে। মেয়েবও দুই চোখে সাগর বয়ে এলো। পাকী উঠিয়ে বেজারাবা যখন শাওলা-পড়া পুকুরটাকে বাঁয়ে রেখে মেটে রাস্তা ধরে জাম গাছের ওধাবে মোড় বঁকলো, মেয়ে ফেলি তখন পালকীর দুই দরজা ঠেলে সরিয়ে রাপসা-চোখে দূর থেকে পিশির পানে চেয়ে ছিল। সকালের উঠন্ত সূর্য্যের স্নিগ্ধ রোদ্দটুকু তাল-গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে তার মুখের উপর ঝবে-ঝবে পড়ছিল। পিশিমা নিজের চোখের জলে অস্পষ্ট দৃষ্টি দিয়েও তা বেশ স্পষ্ট দেখেছিল। সে-চোখের সে-দৃষ্টি এখনো তার মনে গাথা বয়েছে,—সে কি ভোলবার গা!.....তাবব এই চার বছর ফেলির কাছ থেকে একপানি চিঠি আসেনি! পিশি নিজে লিখতে জানে না; পাড়ার একে-তাকে ধরে মাঝে-মাঝে অমন কত চিঠি যে লিখিয়েছে—তার একখানারও জবাব দিতে নেই?....সে কি সব তুলে গেল? পিশির আর কে আছে? কেউ না! সেই

পিশিকে খপর দিতে সে সময় পায় না! সে বইল কি গেল, তারও কোন উদ্দেশ্য নিতে নেই!.....পিশির বুকটা ছাঁৎ করে উঠলো—কে জানে, তার ফেলিই যদি না থাকে! থাকলে সত্যি কি আর সে পিশির খোঁজ নিত না!....পিশির নিজের যাবার উপায় নেই, সে হলো জামাই-বাড়ী! এত দিনে নাহলে সে অমন দশবার ছুটে যেত!

পাড়াগাঁয়ের ডাকওয়ালা হস্তায় দু'দিন এসে চিঠি বিলি কবে যায়। যে-যে দিন তার আসবার পালা, পিশি তাব আশা-পথ চেয়ে বসে থাকে। দূর থেকে তাকে আসতে দেখে প্রাণ যে কি আশায় ভবে ওঠে! উচ্ছ্বসিত আবেগে পিশি প্রশ্ন করে—আমার চিঠি এনেছ, বাবা?

ডাক-ওয়ালা তার খলি না দেখেই বলে,—না, চিঠি নেই গো।

বেচারীব সমস্ত মন অমনি নিজীব অচেতন হয়ে পড়ে। শরীরেব সমস্ত বাঁধান বেন এলিয়ে আসে! সে ভাবে, আমি গরিব, আমাব কেউ নেই, তাই কোম্পানির লোক ডাকওয়ালা আমাকে গ্রাহ্য করে না। চিঠি নিয়ে আসে না!

পাড়ার পাঁচজনকে তখন সে ধরে। তারা বলে, এখনো চিঠির জবাব আসবার সময় আছে!

এখনো সময় আছে! সময় আছে তাহলে! আঃ!

আশাব আশায় দিনেব পর দিন গিয়ে একটা মাসও যখন যায়-যায় হয়, তখন বেচারীর আর সোয়াস্তি থাকে না! আবার একজনকে ধরে বসে, ওগো, ঠিকানাটা ভালো কবে পষ্ট করে এবাব একখানা চিঠি বেশ গুছিয়ে লিখে দাও না গা!

এমনি আশা-নিরাশাব মধ্যে দিয়েই বুড়ীর দিন কেটে যায়!

আজ যে-ছেলেটির কাছে সে চিঠি লেখাতে এসেছিল, সে ছেলেটির লেখা-পড়ায় বেশ নাম-ডাক বেবিয়েছে। তাই শুনে চিঠি লেখাবাব পক্ষে সে খুব পাকা লোক হবে ভবেই বুড়ী তাব বাড়ী এসেছিল, তাকে দিয়ে চিঠি লেখাতে! ছেলেটির নাম বিপিন।

বিপিন প্রথমেই 'কল্যাণববু' পাঠ লিখে বুড়ীর মুখের পানে চেয়ে বললে,—কি লিখবো পিশিমা, বল?

বুড়ী বললে,—লেখো, তুমি কেমন আছ? জামাই কেমন আছেন? বাড়ীর সকলে কেমন আছে? অনেক

দিন কোন খপর পাঠিনি বলে আমার মন বড় অস্থির হয়েছে। এবারে যেন সে চিঠির জবাব দেয়। তাবপর লেখো, আমি ভাল আছি। দুজনকে আশীর্বাদ জানাও, এই আর কি সব কথা।

বুদ্ধা একটি-একটি করে কথা বলে যেতে লাগলো— আর বিপিন তার ছাত্রবৃত্তি-পাশ কবা বিচার বছরে সেই কথাগুলোকে বাড়িয়ে তার উপর হু-পোঁছ বণ্ড দিয়ে লিখে চললো। পিশিমার যা লেখবার ছিল, সে সব কথা শেষ কবে বিপিন বললে,—ঠিকানা কি লিখব?

এই যে বাবা, ঠিকানা। বলে বুদ্ধা আঁচলের খুঁট খুলে ভাঁজ-করা ময়লা একটা চিবকুট বার করলে। বিপিন সেটা দেখে ঠিকানা লিখলে।

বুদ্ধা বললে,—মুড়ে ফেলচো যে! আর কিছু লিখবে না?

—আর জায়গা নেই।

বুদ্ধাব বুক কৈপে উঠল। জায়গা নেই! আর জায়গা নেই!

কিন্তু লেখবার যে এখনো অনেক কথা আছে। এর মধ্যে জায়গা ফুরিয়ে গেল! কাল সারা রাত যখন চোখে ঘুম আসছিল না, তখন ফেলিকে কি লিখবে, সে সব কথা ভেবে ঠিক করে ফেলেছিল। সে যে অনেক কথা। চাব বছরে খপর দেবার মত কত ঘটনাই গাঁয়ে ঘটে গেছে। নদীটায় চড়া পড়েছে, বোসেদেব অত-বড় পুকুর ঝাঁজি হয়ে একেবারে সরবার অযুগিয়া হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেজ্ঞা জলের ভারী কষ্ট হচ্ছে! তবে গে গাঁয়েব টেঁপি, পুঁটি, ভুতো, সারদা—এদের বিয়ে হয়ে গেছে; দান্তর ঠাকুমা মাবা গেছে; ওদের নন্দব একটি ছেলে হয়েছে—এই সেদিন খুব শীল পড়ে দস্ত-পুকুরেব অত যে মাছ সব মরে গেছে—এমন কত ব্যাপার যে ঘটে গেছে। প্রত্যেক খপরটির দাম আছে। চাব পাতা চিঠি লেখা হয়ে গেল, অথচ এতগুলো খপর,—সবই একেবারে বাকী রইলো!

একটা নিশ্বাস ফেলে খামে-মোড়া চিঠি নিয়ে বৃড়ী উঠে দাঁড়ালো; তারপর বিপিনকে অজ্ঞপ্র আশীর্বাদ করে বেচারী সেই চিঠি হাতে করে চললো, চাব ফ্রোশ দূরে সদরের ডাক-ঘর, সে চিঠি ডাকে দিতে।

সহরের মধ্যে ছোট্ট স্বরূপের পরিষ্কার বাড়ী। খাটের উপরে শুয়ে এক সুন্দরী কিশোরী একখানা উপজাস পড়ছে—পাশে অঘেল-রুখ-পাতা ছোট বিছানায় একটি কচি ছেলে ঘুমুছিল। কিশোরী উপজাস পড়ছে, আর মাঝে মাঝে বুক সে কি এক অসহ্য আবেগ নিয়ে চোখ তুলে কচি ছেলেটির পানে ফিরে ফিরে চেয়ে-চেয়ে দেখছে।

হঠাৎ এক তরুণ যুবা ঘরে এসে বললে,—তোমাব একটা চিঠি গো। বোধ হয়, তোমাব পিশিমা-লিখেছেন।

কিশোরী উঠে চিঠি পড়তে লাগলো। অক্ষরগুলো কাব হাতের, জানা নেই—কিন্তু কথাগুলো পিশিমার বটে! স্নেহের সেই শত কাকুতিতে ভরা, আবেগে অধীর...এ পিশিমারই চিঠি বটে!

কিন্তু এ অহুযোগ ঠিক নয়। চিঠি কি সে লেখেন? না, লেখা হয় নি। আজ লেখা হলো না, কাল লিখবখ'ন এই বলে ফেলে-ফেলেই রেখেছিল, লেখা আর হয়ে ওঠে নি। তাইত!...একটু দেবী হয়ে গেছে বটে! কিন্তু সে দেবী খালি সময়ের অভাবের জগাই না! সংসারের কাজ-কর্ম আছে, চাবধার দেখাশোনা, তারপর ঐ কচি ছেলের ঝঙ্কি,...ঝঙ্কি কি কম!

স্বামীকে সে বললে,—হ্যাঁগা, একদিন পিশিমার কাছে গেলে হয় না?

স্বামী বললে,—কি করে হয়! এই ছোট্ট ছেলে নিয়ে পাড়ারগায়ে যাওয়া...!

কিশোরীর মনে একটু যা লাগলো। সেই পাড়ারগায়ে তার জীবন কেটেছে! আর সে ভালোই কেটেছে! এই পাড়ারগায়েবই মেটে পথ, শ্রাওলা-পড়া পুকুর, শিউলি-তলা, ভাড়া মন্দির—তাব কত আনন্দের জিনিষ ছিল! আব আজ সে পাড়ারগায়ে তাব ছেলের যাবার উপায় নেই! পকাশ রকমেব নিষেধ মস্ত বেড়া তুলে দাঁড়িয়ে আছে!

পিশিমা? আহা, বেচারী! সংসারে সে-ছাড়া তার যে আর কেউ নেই! তাকে কোলে-পিঠে করে, তারই মুখ চেয়ে পিশিমা এই বান্ধন-হারা সংসারে একটা মস্ত বান্ধন পেয়েছিল। সংসার আবার তার সামনে সহস্র প্রলোভন বিস্তার করেছিল। আজ পিশিব আর কি আছে? কে আছে? কেউ না, কিছু না।

সে ভাবলে, আজ দুপুর বেলায় সে পিশিমাকে চিঠি লিখবে—মস্ত চিঠি। খোকার কথা, নিজের কথা সব লিখবে। তা-ছাড়া পিশিমাকে একবার আসবাব কথাও লিখবে! কেন পিশিমা আসবে না? জামাই-বাড়ী। ওঃ,—ভারী ব্যয়ে গেছে তাতে! খোকাকে পিশি দেখবে না? আহা, খোকাব খপরও তাকে দেওয়া হয় নি!

দুপুর বেলায় সে চিঠির কাগজ নিয়ে বসলো, পিশিমাকে চিঠি লিখতে। আকাশেব পানে চেয়ে সে অনেক কথা ভাবতে লাগলো। কি লিখবে, কি বলে কোন কথাটি দিয়ে চিঠি আরম্ভ করবে, মোলায়েম করে কি কি কথা লিখলে পিশিমার এত দিনের এই দীর্ঘ ব্যথা জুড়িয়ে দিতে পারবে,—ভবে তার একটা নিশানা করে সে লিখলে,—

ঐচরণেবু...

স্বামী এসে সামনে দাঁড়ালো, বললে,—কি করচো গাঃ?

—চিঠি লিখছি।

—এখন চিঠি লেখা থাক্। এসো, একটু বেড়িয়ে আসি। ববানগরে একটা বাগান ঠিক করা হয়েছে। আরো দু-তিনজন বন্ধু তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যাবে, সেখানে চড়ি-ভাতি হবে। নৌকা অবধি ঠিক। নাও, উঠে পড়ো।

—চিঠিখানা লিখে নি গো,—একটু দাঁড়াও।

—না, না, ফিরে এসে লিখো'খন।

চিঠি আব লেখা হলো না। ব্রাহ্ম ধরণে ঘুরিয়ে ভালো শাড়ী পরে তাতে ক্রচ এঁটে কিশোরী তখন স্বামীর হাত ধরে গিয়ে গাঙতে উঠলো, গাঙী করে ঘাটে এসে নৌকো

—নৌকোয় কবে একেবারে ববানগরে বাগানেব ঘাটে আসা হলো। বাসি, রেণু, তমাল, পরী—সবাই এসেছে। কতদিন পরে সকলের সঙ্গে দেখা। আনন্দ সেখানে একেবারে যেন উছলে পড়ছিল।

সেই আনন্দের মধ্যে কিশোরী এসে আপনার মনটাকে ছেড়ে দিলে! এ আনন্দে কোথায় ভেসে গেল পাড়ারগাঁয়ের সেই অনাড়ম্বর ভাস্কি-চোরা বাড়ী-ঘরের ছোট্ট স্মৃতিটুকু! কোথায় ভেসে গেল স্নেহময়ী পিশিমার ভাবনায়-আকুল চোখের সে ছল-ছল দৃষ্টি বা!

সন্ধ্যার সময় সকলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন অত আনন্দ-হাসি-গল্পের মধ্যে থেকে-থেকে একটা বেদনা কিশোরীর প্রাণে ভয়ানক বাজছিল!

বাড়ী ফিরে এসে দেখে, ছেলের গা গরম, পুড়ে যাচ্ছে! খুব জ্বর! কাজেই চিঠি আব সে-রাত্রে লেখা হলো না!

# দাগী

তখন আমার জুনিয়ারির পালা। সাবাদিন কোটে খুরিয়া রোজ ও ধুলা খাটয়া গৃহ ফিরি; প্রাণে বৈবাগ্যের বাসনা দেখা দিয়াছে।

বেশ মনে পড়ে, সেদিন সকাল হঠাতে বাদলা শুরু হইয়াছে—পথে কাদা, আকাশে মেঘ, চারিদিকে বিষম নিধানন্দ ভাব,—হাতে কোন কাজ ছিল না। হাকিম সদানন্দ সেন একটা একশ'দশ ধারার মামলা করিতে-ছিলেন। একটু বস পাইবার আশায় তাঁর এজলাসে আসিয়া বসিলাম।

আসামী এক বাঙালী বুবা—গায়েব বঙ তামার মত, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পবনে ময়লা কাপড়, সঙ্গে একটা তালি-দেওয়া ছিটের কামিজ। কাঠগড়ার বেলিতে মাথার ভর রাখিয়া মুগ গুঁজিয়া সে দাঁড়াইয়াছিল; পুলিশ হঠাতে প্রায় ত্রিশ জন সাক্ষীর জবানবন্দী লওয়া হইতে-ছিল। কয়েকজন দোকানদার, কয়টা পতিভা নারী, দুই-চারিজন পাণ্ডরাল—সকলেই হলফ লইয়া সাক্ষ্য দিতেছিল, আসামী এক ভীষণ গুণ্ডা, কোন কাজ-কন্স করে না; যখন তখন তাদের কাছে আসিয়া জুলুম করিয়া ভয় দেখাইয়া নেশা ভাঙ কবিবার পয়সা আদায় করে—বে-গোছ দেখিলে নাকি ছুরি ডঁচাইতে ছাড়ে না। প্রাণের ভয়ে সাক্ষীর দল কেহ চার আনা, কেহ সাত পয়সা, কেহ বা পাঁচ সিকাও কখনও কখনও তাহাকে দিয়া ফেলিয়া প্রাণে প্রাণে খুব বক্ষা পাইয়া গিয়াছে। এই পয়সা কেহ দিয়াছে এক মাস পূর্বে; কেহ বছর-খানেক, কেহ-বা আবার দেড় বছর পূর্বে। উঠাব বিক্রেতে কোন দিন কেহ আদালতে নালিশ করে নাই বা পুলিশে কোন ডায়েরী লেখায় নাই।

লোকটার চেহারা দেখিলে মনে হয়, সে চিবকগ্ন,—অত্যন্ত কৃশ দেহ, পেশীগুলি নিতান্ত ক্ষীণ দুর্বল। অথচ সে এমন জুলুম-জবরদস্তি করিয়া এই সব যগু জোয়ান দোকানদার আর ভীমমূর্তি বারঙ্গনাদেব কাছ হইতে পয়সা আদায় করিয়া থাকে,—শুনিয়া প্রাণে কেমন একটা বিষম-কৌতূহলের সঞ্চার হইল।

একজন বন্ধু কহিলেন,—এসো না হে, এব হুয়ে দাঁড়ানো বাক্ !

আমি কহিলাম,—পয়সা দেবে কে ?

বন্ধু কহিলেন,—কি এমন পাঁচশ' দশ বোজগার করা যাচ্ছে যে পয়সাঃ হুঃখে মরে যাব! অমনি একবার পবখ করি। এই ত বাবিশ সাক্ষী—

অপর বন্ধু কহিলেন,—বিনা পয়সায় দাঁড়িয়ে লোকটাকে জেলে ঠেলবো? পয়সা পেলে তবু নেমক-হারামি পাপটা ঘটতো না।

আমি কহিলাম,—মশ্ন নয়। শাস্ত্রেও আছে, শতমারী ভবেৎ বৈজ্ঞ। তা এ হবে আমাদের নাশাব ওয়ান্।

হাকিমের অহুমতি চাহিলাম। তিনি বিরক্ত চিত্তে কহিলেন,—ওব আবার উকিল দেওয়া কি! পাঁচ বাবের দাগী।

আমরা নাছোড়বন্দা—আসামীকে জনান্তিকে রাজী কবাইয়াছিলাম; হাকিম অগত্যা অহুমতি দিলেন। আমরা আসামীর জামিনটা একটু কবাইয়া দিতে বলিলাম। হাকিম বক্র দৃষ্টিতে সে প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। আমরা অমনি মোক্তাব নারায়ণবাবুকে আনিয়া পয়সা ব্যয় করিয়া তাহার জামিন কবাইয়া লইলাম।

পুলিশের দাবোগা তখন কোট বাবুকে কি-একখানা মোটা কাগজ দেখাইতেছিল। হাকিমের সৈদিকে নজর পড়িল। হাকিম কহিলেন,—কি ওটা ?

দাবোগা সসব্রমে হাকিমের হাতে সেটি দিয়া কহিল,—আসামীর কাছে সম্পত্তির মধ্যে এই ছবিখানা শুণু পাওয়া গেছে।

হাকিম ছবিখানার পানে চাহিয়া পবক্ষণে আসামীর দিকে চাহিলেন। চোরের মত কুণ্ঠিত দৃষ্টি। মুখ তাঁর নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল—কপালে বেশ স্পষ্ট স্বৈদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বাসয়া তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আপনাব খাশ্-কামরায় উঠিয়া গেলেন; কোনোদিকে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

আমরা অবাক হইয়া গেলাম। কি এমন ফটোগ্রাফ—কার ফটোগ্রাফ যে সূহৃদে এই ইন্দ্রজালের সৃষ্টি!

ফটোখানা হাকিমের টেবিলে পড়িয়াছিল। কোট বাবুর খোসামোদ করিয়া চাহিয়া লইলাম। এক জ্বীলোকের ফটো—মুন্দর! কুণ্ঠিত সজ্জিত কৃষ্ণ কেশ-দামের মধ্যে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরীর মুখ! ছবিখানি অত্যন্ত পুরাতন—কালের নিশ্বাসে ঈষৎ অস্পষ্ট ও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।

পেঙ্কার, আয়লা সকলেই কৌতূহলী হইয়া পড়িল।

এমন কড়া হাকিম—সাজা দিতে অধ্বিতীয়—সে বিবয়ে

বাণের খাতির যিনি রাখিতে জানেন না, এ ছবিতে  
হঠাৎ তাঁর এমন পরিবর্তন ঘটিল কেন ?

সকলেই আসামীর পানে চাছিল—এ দিকে তাব  
জ্ঞপ্তিও ছিল না ! আমিদের কাগজ সচি করিয়া  
নাবাণ মোক্তারের সচি এক কোণে বসিয়া সে তখন দিয়া  
গল্প জুড়িয়া দিয়াছে ।

পবদিন সকালে আসামীকে ধরিয়া পড়িলাম, ও ছবি  
কান ? বলিতে হইবে ।

আসামী প্রথমে কিছুতে বলিতে চাহে না—শেষে  
বিস্তব পীড়াপিড়িতে কহিল, ও ছবি তার মতা জননী !

তাবপর সে আপনাব জীবনের কাচিনী বলিল ।  
তার নাম মাখন ।

মাখন বলিল,—আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন  
আমার মা মাঝা যান । বাবা পাগলের মত হইলেন ।  
তিনি তখন এম-এ পড়িতেছেন ; পরীক্ষা-পড়া সব  
চাড়িয়া আমার বৃকে টানিয়া বাহিরের ঘরে দিবাবাত্র  
পড়িয়া থাকিতেন । আত্মীয়-বন্ধু দল ঘাড়ে পড়িয়া তাঁর  
সে ভীষণ শোকাগ্নি নিবাহিতার চেষ্টা জুড়িয়া দিল ।

পুরুষ মানুষের শোক, তার আবার স্ত্রী-বিয়েগের—  
মুচিতে বড় বিলম্ব হয় না—তবে ঠিক ঐযথটি দেওয়া  
চাই । সেই ঐযথেরই ব্যস্ততা হইল । বাবা আবার  
বিবাহ করিলেন । নূতন মা এক বড় চাকুরের কন্ডা ।  
সমস্ত দুঃখ-বেদনা-নিবানন্দ মুছিয়া তিনি একদিন  
আমাদের গৃহে সাম্রাজ্যীর আসন পাতিয়া বসিয়া  
গেলেন । বাবার মুখে অচিরে আবার হাসি দেখা দিল—  
মাত্রা আগেকার চেয়েও বেশী !

আমি কিন্তু তাঁর পানে আর ঘেঁষ দিলাম না ।  
প্রথম হইতেই কি কবুদি ঘটিল । নূতন মার উপর  
বাগ পরিয়াছিল । নিজের মাকে হারাইয়া একটা সাঙুনা  
এই ছিল, বাবাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করিয়াছি !  
এতখানি লাভে মা-তাবানোর লোকসানটা মনেও জাগ  
নাই ! কিন্তু নূতন মা আমার কাছ হইতে বাবাকে  
একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিলেন ! আমার পানে ফিরিয়া  
চাহিবাব অবকাশ বাবাকে তিনি দিতে পারিতেন না !  
আমার বেশ মনে পড়ে, মা যখন বাঁচিয়া ছিলেন, দুপূর্ব-  
বেলা তিনি নিত্ৰা গৈলে আমি বাহিরের ঘরে জানলার  
ধারে আসিয়া দাঁড়াইতাম, দেখিতাম, ঠিক পথের অপূর  
পাশে নিমগাছের তলায় একটু ছায়ায় আড়াল পাইয়া  
একটা কুয় কুয় সেখানে পড়িয়া থাকে—অত্যন্ত কক্ষ  
মুন্নি—নিতান্ত নিঃসহায়, বেচারী ! বাবার এই পরি-  
বর্তনে আমার নিজের মন ঠিক সেই কুয়টার মত  
যেন এক অসীম বেদনায় বা খাইয়া তেমনিই নিঃসঙ্গ

কৃতিভাবে পড়িয়া থাকিত । অথচ উপায় ছিল না ।  
একদিন জোব করিয়া বাবার আদব কাড়িতে গিয়াছিলাম  
—নূতন মা তাড়া দিলেন,—পড়া নেই, শোনা নেই,  
বুড়োখাড়ি ছেলে, খালি ধেই ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছেন ।

দুঃখে আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল । কিন্তু জোব  
করিয়া কান্না রোধ করিলাম—এই পাখাণী কাছ  
চোখেব জল ফেলিব ? না, কখনও না ! বাবার  
পানে একবার চাছিলাম, বাবার মুখ নিকপায় কুঠায়  
যেন সাদা হইয়া গিয়াছে ! গতিক বৃষ্টিয়া আমি সে ঘর  
তাগ করিলাম ।

বাড়ীতে আত্মীয় যে কেহ না ছিল, এমন নয় । তবে  
সকলেই নিজের লইয়া ব্যস্ত । স্থলে বাইতাম । ইংরাজী  
বইয়ে একটা গল্প পড়িয়াছিলাম—কি-একটা দেশের তখন  
অত্যন্ত অরাজক অবস্থা । সে যেমন কহিয়া পারে, শুধু  
নিজের জিনিষ-পত্র সামলাইতে দারুণ ব্যস্ত, আশে-  
পাশে কত নিরীহ দুর্বল অত্যাচাবে চীৎকার জুড়িয়া  
দিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কাহারও অবসর নাই,—  
আমাদের বাড়ীর দশা তখন ঠিক সেই বকম ! মাঝার  
উপর শত্রু অভিভাবক নাই,—বাবা বাড়ীর বড় ছেলে—  
অপরে জাতি-কুটুম মাত্র, তারা উৎসব-আমোদের সময়  
দস্ত মেলিয়া সম্মুখে আসিয়া হাঙ্গির হইতে জানে, বিপদের  
লক্ষণ বুঝিলে নিমেষে কোথায় চম্পট দেয় ।

এই ভাবে ভাঙ্গা মৌকার মত জীবনটাকে যখন  
টানিয়া লইয়া ফিরিতেছি, তখন সহসা এক দমকা হাওয়া  
দেখা দিল । বাবা এম-এ ফেল করিয়া বসিলেন এবং  
তাব ছুটি-চারি মাস বাদে নূতন যন্ত্রের স্তপারিশ ও  
জোগাড়ের জেবে এক দিন হাকিম হইয়া দেশান্তরে  
চলিয়া গেলেন ।

আমাকেও বাবার সঙ্গে লইয়া বাইবার কথা ছিল—  
কিন্তু হঠাৎ যাত্রা-কালে নূতন মা বিশেষ বিবেচনা করিয়া  
পরামর্শ দিলেন, তাহাতে আমার মঙ্গল হইবে না । কাণ,   
হাকিমি চাকুরি লইয়া বাবাকে সাত ঘাটের জল খাইয়া  
ফিবিতে হইবে—আমি সঙ্গে থাকিলে আমার পড়াশুনার  
বিষম ব্যাঘাত ঘটিবে এবং তাব অবশুস্তাবী কলঙ্করূপ  
আমাব উজ্জল ভবিষ্যৎকু একদম মাটি হইয়া যাইবে,  
তাব উপর বিদেশ-বিভূঁই, সেখানকার জল-হাওয়া আমার  
ধাতে সহিবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি । স্ত্রীলোকদের  
দূরদর্শিতা সখকে সহসা বাবার অত্যন্ত আস্থা দেখা গেল ।  
কাজেই তিনি মাসফারাব আশা দিয়া আমাকে জাতির  
দলে রাখিয়া গেলেন ।

আমি কোন কথা কহিলাম না । আমাব কেমন তাক  
লাগিয়া গিয়াছিল । মনে হইতেছিল, এ বিশ্ব-বঙ্গভূমে  
কোথায় কি অভিনয় চলিতেছে, আমার যেন তা শুধু

দেখিবার পালা। এ অভিনয়ে আমাকে নামিতে হইবে না! আমাব জন্ত এখানে কোন ভূমিকাই যেন নির্দিষ্ট নাই! স্বাপুর মত অচল চিত্তে আমি বাড়িতে পড়িয়া রহিলাম।

মাখন বলিতে লাগিল,—দুই-তিন বৎসর এক বকমে কাটিয়া গেল। তাপ পব একদিন বড় কাকা বলিলেন,—বাড়ী বিক্রী হইয়া গেছে। তোমার বাবাই এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। আমবা নানা দিকে ছাড়িয়ে পড়েছি—তোমার পক্ষে এখন তোমার বাবার কাছে যাওয়াই উচিত।

বড় কাকার কথার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বৃষ্টিতে বিলম্ব হইল না। সাধারণ দশ বৎসর বয়সে বাঙালীর ছেলেরা এসব বিষয় বড় একটা বৃষ্টিতে পারে না—কিন্তু মা-হারা ছেলে—বিশেষ আমার মত অবস্থায় পড়িলে বুদ্ধি 'ভাব' একটু চট করিয়াই বাড়িয়া ওঠে।

সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। কেবলই ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় যাই? কি কবি?

একবার ভাবিলাম, বাবাব কাছে যাই। বাবা তখন খুলনার ওদিকে কোথায় এক মহকুমাব হাকিম। কিন্তু পরক্ষণেই বিমাতাব সেই বোধ-রুদ্ধ মুখ ও কঠিন দৃষ্টির কথা মনে পড়িতে সে বাসনা কপূরব মত উবিয়া গেল! ভাবিলাম, সেখানে যাওয়ার চেয়ে পথে পথে ভিক্ষা করিয়া বেড়ানোতেও ঢেব আরাম, ঢেব সুখ!

ষরের দেওয়ালে মার একখানি ক্রেমে আঁটা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সারা রাত্রি প্রদীপের অমৃজ্জল আলোর সেখানার পানে চাহিয়াই চোখের জল ফেলিলাম। মার শোক সে রাত্রে নূতন কবিতা বৃকে বাজিল। শেষে সেই ছবিখানাকে মাত্র সঞ্চল করিয়া পরণেব দুই চারিখানা কাপড় লইয়া ভোরের দিকে বাড়ী ছাড়িলাম।

সম্মুখে দীর্ঘ পথ পড়িয়া আছে। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত সেই পথে চলিতে শুরু করিলাম। মাথার উপর তরুণ স্নিগ্ধ সূর্য্য ক্রমে রুদ্ধ সূর্য্যে রক্ত আঁখি মেলিয়া দেখা দিল। সে দিকে দৃকপাতমাত্র না করিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—সূর্য্য হার মানিয়া শেষে আবার শান্ত-শীতল সূর্য্য ধরিয়া মুহূ হাসিয়া দিগন্তের কোলে সরিয়া পড়িল, তবু আমি চলিয়াছি! হাঁটু পর্য্যন্ত ধূল্য ভরিয়া গিয়াছে, দারুণ পিপাসা গলার মধ্যে যেন ছুঁচ ফুটাইতেছে, এমন বেদনা বোধ হইতেছিল! কিন্তু কোথায় বসিব? এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে আমার যে তিলদ্বি স্থান নাই!

যাক, সে পথের কষ্ট আর খুলিয়া বলিয়া কাজ নাই। শেষে আশ্রয় মিলিল। এক গৃহস্থের বাড়ী বাগন মাজার কাজে লাগিয়া গেলাম। চার বৎসর কাঙ্গ করিলাম।

মন্দ লাগিত না। আরামও পাইতাম। এক একবার মনে হইত, আমার বাপ হাকিম। আর আমি? তখনই হাসি আসিত। কিন্তু একদিনের জন্ত ক্ষোভ জাগে নাই।

আমার নিশ্বাসে বুঝি কি বিষ ছিল! নহিলে বাড়ীর কর্তা একদিন গ্রামান্তর হইতে জ্বর গায়ে বাড়ী কিরিয়া বে-বিছানা লইলেন, সে বিছানা আব তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হয় না কেন? মৃত্যু তাঁকে আপনার কোলে টানিয়া লইল। পাখীর বাসায় ঢিল ছুড়িলে মুহূর্ত্তে যেমন তা ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যায়, মনিবেব গৃহের দশা ঠিক তেমনি ঘটিল। আমি আবার পথে বাতির হইলাম। বাবা তখন কটকে,—আমার এক ভাইয়ের জন্মাৎসবের ধূমে আশ্বহারা!

তার পর এই সহর কলিকাতায় আসিলাম। এ এক মজাব দেশ! যারা এখানে স্মৃখী, বাবা বড় লোক, তারা কারও পানে কিরিয়া না চাহিলেও দুঃখী-গরিবেব দল সাধিয়া কথা কয়, ডাকিয়া তই মুঠা খাইতে দেয়।

এক ঠাকুর-বাড়ীতে আস্তানা মিলিল। কিছুদিন সেখানে পূজারীর মন জোগাইয়া কাটাইয়া দিলাম; কিন্তু টিকিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোথা হইতে এক অদৃশ্য রজু কোন্ এক অজানা পথে আমার টানিতেছিল!

তিন-চার বৎসর এখানে-ওখানে ঘুরিয়া একটা হোটেলের চাকরি কবিতো আসিলাম। সেখানে বিশ্বের যত বিদেহ, কলহ, নীচতা, স্বার্থ এক বিপুল যড়যন্ত্র পাকাইয়া বসিয়া আছে, হিংসার জোট বিছানো আছে—তাহাতে পা বাধিল। সেই যড়যন্ত্রেব মধ্যে পড়িয়া একেবারে আদালতেব দ্বারে গড়াইয়া পড়িলাম।

হোটেলের কর্তার এক প্রৌঢ়া প্রণয়িনী ছিল—আমাব উপর না কি তার একটু অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল। নেপথ্যে ইহার ইঙ্গিতাভিনয় চলিতেছিল, তার আভাসমাত্র আমার পাইবার সুরোগ ঘটে নাই—ইতিমধ্যে কর্তার মনে কেমন করিয়া সন্দেহ হইল—সে একেবারে থালা-ঘটি-সমেত চুরির চার্জ দিয়া আমাকে পুলিশের হাতে তুলিয়া দিল। আমি কেমন হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম। ব্যাপারখানা ভালো করিয়া বুঝিবার পূর্বে হাকিমের রায় বাহির হইয়া গেল—তিন মাসের জন্ত আমার জেলের ব্যবস্থা।

জেলের গাড়ীতে বসিয়া সতাই সেদিন প্রাণ ভরিয়া হাসিয়াছিলাম—বাঃ, আশ্রয়হীন আমি, আজ এখানে, কাল সেখানে ভাসিয়া বেড়াইতেছিলাম, ভগবান আজ আমায় দিব্য আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন তো! আর অন্নের ভাবনা ভাবিতে হইবে না, পড়িয়া ঘুমাইবার জন্ত ছাদ-ঢাকা একটু ঠাঁইও অনায়াসে মিলিবে!



তিন মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। ভিক্ষা মাগিয়া দিন কাটিত। একদিন রাত্রে বাজারে যাত্রা হইতেছে শুনিয়া সেই দিকে চলিলাম। পথে পাচার-ওয়ালা পাকড়াও করিয়া থানায় চালান দিল। কাস্ত-কস্ম নাই বলিয়া হাকিম ছ'মাসের জামিন চাহিয়া বসিলেন। কে আমার জামিন হইবে? ছ'মাসের জঙ্গ আবার জেলে চলিলাম।

ছ'মাস পরে জেল হইতে ফিরিয়া আসিলাম। একটা মন্দিরের বোয়াকে পড়িয়া থাকিতাম। পূজারীর সহিত একটা যাত্রীব বগড়া বাধিল। পূজারী যাত্রীর বোচকা সবাইয়া রাখিয়াছিল। পুলিশ আসিতে দেখি, বোচকাটা আমাব কাছে। আমি ঘুমাইতেছিলাম। গুঁতা মারিয়া পুলিশ ঘুম ভাঙাইয়া বোচকা দেখাইয়া বলিল,—ব্যাটা চোব, চল থানায়।

আমি অবাক! আবাব জেলে চলিলাম।

এবার জেলে বসিয়া স্থির করিলাম, এই পথই ভালো। বাহিরে যখন নিরাপদ হইবাব সম্ভাবনা নাই,—কাজ করিতে গেলে লোকে চোব বলিয়া ধবাইয়া দিবে, কাজের চেষ্টায় পথে বাহির হইলে হাকিম সদর্পে জামিন চাহিবে—তার চেয়ে জেলে থাকিলে বাঁধাবাধিব আর ভয় থাকিবে না, কলেব গুঁতা হইতেও রক্ষা পাইব।

এবারে জেল হইতে ফিদিলাম,—অদৃষ্ট প্রসন্ন মূর্তিতে অভ্যর্থনা করিল। এক বড়লোকেব কাছে চাকরি মিলিল। জেলেই এক বন্ধু জুটিয়াছিল—আমার সমবয়সী। সে তার মনিবের খুব স্তম্ভাতি কবিত। তার মনিব ইস্তফ কোকেন-ওয়ালা। সে তার অধীনে থাকিয়া কোকেন বেচিত। মনিবের যত্নের ক্রটি নাই। কোকেন বেচায় আশঙ্কা খুব, অথচ লাভের সীমা নাই। ধরা পড়িলে মনিব বেশ মোটা টাকা ব্যয় কবিয়া বড উকিল লাগাইয়া বাঁচাইবার যথেষ্ট চেষ্টা কবে। বরাত্তে যদি জেল ঘটে, ঘটুক—ফিরিয়া কিছু মনিবের কাছে রীতিমত বখশিশ মেল।

সেই চাকরি লইলাম। দুঃসাহসের কাজ, সন্দেহ নাই। কিন্তু বন্ধু ঠিক বলিয়াছিল, লাভ ইহাতে বিলক্ষণ! এই কোকেন লইয়া আরও দু'বাব জেল খাটিয়া আসিলাম।

শেষবারে ফিরিয়া কিন্তু পুনর্মুখিক! কোকেন-ওয়ালা মনিব এক খুনী মাঝগার আসামী হইয়া বিচাবে দীপান্তরে চালান হইয়া গিয়াছে। আমি চারিধার অন্ধকার দেখিলাম। হাতে টাকা ছিল না। কোনমতে কিছু জোগাড় করিয়া একবার ভদ্রলোক সাজিয়া বাবার সহিত দেখা করিব, ভাবিলাম। তার পর একবার এমন একটা কীর্তির কাজ করিব, যাতে দেশের বৃকে আমার নাম চিরকালের জঙ্গ ফোদা থাকে, বাবাব মুখ উজ্জল হয়।

একটা দল জড়ো করিলাম। রাত্রে উন্টাডিসির বিখ্যাত মহাজন ঘনশ্রাম সাধুর্থাব তহবিল চলিয়াছিল, লোকেব মাথায়। তাদের ঘাড়ে পড়িয়া সেই তহবিলে ছোঁ দিলাম। মোটা টাকা তাতে আসিল।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার অবকাশ মিলিল না, পুলিশ আসিয়া গ্রেপ্তার করিল। এই হাকিমের কাছেই চালান দিল। এ হাকিম বড কড়া—ভালো লোক বলিয়া নাম-ডাক আছে—আমাব পূর্ব-শাস্তির বহর দেখিয়া একেবারে দেড় বৎসরের জঙ্গ জেলে আমাব নিরাপদ নীড়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তার পর এই উৎপাত! এবার কিন্তু এ সব কাল্পনিক ব্যাপাব! দেড়মাস জেল হইতে ফিরিয়াছি—শরীর এই! দেহে বল নাই—মনে ক্ষুধি নাই। মার ছবি লইয়া একেবারে দেশে গিয়া সেই আশানে পড়িয়া সব শেষ করিব ভাবিয়া পথে বাহির হইয়াছিলাম। কিন্তু গোলযোগ ঘটিল। বাস্তাব মোড়ে এক ষার্ড ক্লাশ গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এক জমান্দার আসিয়া গাড়োয়ানের উপর তর্ক করে! গাড়োয়ান বেচারী সস্ত্রস্ত। আমি গায়ে পড়িয়া তাব পক্ষ লইলাম। জমান্দারের কোপ পড়িল আমাব উপর—তার এক জুড়িদার নিমেষেকোখা হইতে আসিয়া আমায় সনাক্ত করিল, এ ব্যাটা পুনানো দাগী। জমান্দার আমার ধরিয়া থানায় আনিল। দু' দিন কোনমতে দড়ি বাঁধিয়া ঘুরাইয়া এই একশো দশ ধাবায় শেষে চালান দিয়াছে। সাক্ষীগুলা কোখা হইতে যে আসিল, কিছুই জানি না। আমি উহাদের কখনো চক্ষে দেখি নাই। যে পাডাব লোক উহারা, সে পাডার পথেও কোনদিন হাঁটি নাই! অথচ উহাবা সকলে হলফ লইয়া সটান জুলুম-জবাবদস্তিব কথা বলিয়া গেল।

মাখন চূপ করিল।

আমি কহিলাম,—তোমাব বাবার নাম কি? তিনি এখনও বেঁচে আছেন?

মাখন বলিল,—সে খপবে কি হবে, বাবু?

আমি কহিলাম,—হাকিমের কাছে প্রকাশ করে বললে সুবিচার প্রত্যাশা কবতে পারি।

মাখনের চোখ-দুইটা সহসা যেন জ্বলিয়া উঠিল, বজ্র-স্বরে সে কহিল,—কি বললেন? সুবিচার! এই হাকিমের কাছে? অসম্ভব! যদি সে আশা থাকতো, তাহলে আজ এজলাসে গুর ঠাঁই না হয়ে আমাব পাশে সেই আসামীর কাঠগড়ায় ওকে দাঁড়াতে দেখতুম। আমার এ হৃদিশার জঙ্গ কে দায়ী? আমি, না, ও? যদি ভগবান থাকেন, তিনি এব বিচার করবেন! হাকিম হয়ে বসে লোকের বিচার কবচেন উনি?

মাখন ফুঁশিতে লাগিল।

আমি বলিলাম,—থাক ও কথা। তোমার বাপের নামটা বলো না! কিছু উপায় হবে।

—কিসের উপায়? কোন উপায় করতে হবে না, বাবু! যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিগ্নান্ন। ও কি করবে আমার? জেলে দেবে? দিক্। ভগবান সব লিখে রাখেন! ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে ওঁর যদি পৌরুষ হয়, হোক!

আমি কহিলাম,—এ আবাব কি বকতে শুরু করলে, মাখন?

—তবু বুঝতে পারছেন না, বাবু? ওই তো আমার বাপ, ঐ সদানন্দ সেন—আপনাদের হাকিম—

আমি চমকিয়া উঠিলাম। হাকিম সদানন্দ সেন! সেদিন ছবি দেখিয়া হাকিমের সে চিন্ত-বিকারের কথা মনে পড়িল। ব্যাপারটা জলের মত সাক্ষ্য হইয়া গেল! আমি মাখনের পানে চাহিলাম। তার চোখ দিয়া তখন বেন আশ্বিন বাহির হইতেছে।

# নিশীথে

গভীর রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া আকুল আর্তনাদ উঠিল,—আগুন লেগেছে! আগুন।

স্বপ্ন নর-নারী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। কোথায়? আশঙ্কায় তাহাদের বুক কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল।

তাড়াতাড়ি জাননার পানে সকলে ছুটিয়া আসিল। এই দূরে অগ্নির লেলিহান শিখা গর্জিয়া উঠিয়াছে—চারিদিক যেন কে লাল রঙে রাঙাইয়া দিয়াছে। যেন নিশীথিনীর কমনীয় কোমল কণ্ঠে কে তীক্ষ্ণ ছুরি বসাইয়া দিয়াছে! নিশীথিনীর কণ্ঠ ছিঁড়িয়া উষ্ণ লোহিত বস্ত্রধারা উৎসের মত ঝরিয়া পড়িয়াছে!

উন্মাদের মত ব্যগ্র লোকজন আগুন লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া চলিল।

সহবেব প্রান্তে গরিবদের বস্ত্র—দীন-দুঃখীর মাথা ঠুঁ জিবার আশ্রয়, খড়ে-ছাওয়া জীর্ণ পাতার ঘর। তাহার উপর হতাশনের রোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছে। রক্ষা নাই—রক্ষা নাই। এ কদম রোয়ানল খামাইবার এতটুকু সামর্থ্য জীর্ণ পাতার ঘরের জীর্ণ বন্ধালের কোথাও নাই, কোথাও নাই!

সারা দিন ধরিয়া গরিবের দল, ধর্মীর চলিবার পথ হইতে কাঁটা বাছিরা তুলিতে গিয়া দেহের রক্ত পাত করিয়া আসিয়াছে, বিলাসীর সজ্জিত ভবনে সম্ভোগের উপকরণ সাজাইয়া এক মুঠা গ্নেব ছোঁগাড় করিয়া ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে জী-পুঞ্জের মধুর সঙ্গ-লাভে বেচারি দিনের শ্রান্তি ভুলিয়া সুখে নিদ্রা বাইতে-ছিল। তাহাদের এ নিশ্চিন্ত নিদ্রা-স্বপ্ন নির্ভর ভাগ্য-দেবতার সন্মুখ হইল না,—তাই তাহার উষ্ণ নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহান দরিদ্রদের সর্ব্ব্ব বৃষি-বা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যায়!

না ছেলেকে কোলে ছুলিয়া, স্বামী জ্ঞাকে বৃকে ধরিয়া পাগলের মত ঘর ছাড়িয়া বাহিরে ছুটিয়া। মৃত্যুব দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে—ওরে, কে কোথায় আছিস, আর, আর, মৃত্যু কোল পাতিয়াছে, ছুটিয়া আয়!

নিদ্রা বাইবার পূর্ব্বক্ষণে অদৃষ্টে ধিকার দিয়া মৃত্যুকে আহ্বান করিয়াছিল, মৃত্যুকে এখন সম্মুখে দেখিয়া তাহার কাছ হইতে দূরে পলাইবার জগ্গ সেও অধীর আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়াছে!

পাশাপাশি অসংখ্য ঘর। স্বপ্ন-দুঃখ, হর্ষ-বেদনার

বন্দভূমি। এই অসংখ্য ঘরে মুহূর্ত্তে একটা চাকল্য সাড়া দিয়া উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কৃষ্ণ শিখা ঘর-গুলিকে বিদ্যুতের মতই চিরিয়া দিয়া গেল।

একটি ঘরে কণ্ঠ স্বামী দুর্বল দেহে পড়িয়া ছিল। জ্ঞার সহিত পূর্ব্বাহ্নে তার বিষম কলহ হইয়া গিয়াছিল। জ্ঞাকে অকথা গালি দিয়া স্বামী তাড়াইয়া দিয়াছিল। জ্ঞাও সতেজে স্বামীর মুখের উপর বলিয়া গিয়াছিল,—এই চল্লুম, যদি আর কখনও ফিরি—জ্ঞা একটা উৎকট শপথ করিয়া বিদায় লইয়াছিল।

এখন পথে দাঁড়াইয়া জ্ঞা আগুনের পানে চাহিল। চোখে পলক নাই। পুতুলের চিত্র-করা চোখের মতই তাহার দুই চোখ। বৃকের মধ্যে কদম অভিমান হিংসার আবরণ পরিয়া সাপের মত কুঁশিতেছিল।

আগুন দাউ-দাউ করিয়া জলিয়া উঠিয়াছে। এক জায়গা হইতে অপব জায়গায় লাফাইয়া ছুটিয়াছে। সে যেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য! প্রলয়ঙ্করী কপালিনীর তীক্ষ্ণ ঝর্পণ যেন নিশীথের গাঢ় অন্ধকার কাটিয়া ঝক্-ঝক্ করিয়া জলিয়া উঠিতেছে! সহসা নারীর ভাপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল। উন্মাদের মত ছুটিয়া সে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিল।

বাহিরে দাঁড়াইয়া কৌতূহলী দর্শকের দল তামাসা দেখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসব হয়, কাহার সাধ্য! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চোখ তাহাদের ঠিকরিয়া পড়িবার মত হইল। সকলে কলরব করিয়া উঠিল! কলরব করা ছাড়া আর উপায় ছিল না! দক্ষ বংশধর ফট্, ফট্ করিয়া ফাটিয়া বাহির মত আকাশে লাফাইয়া উঠিতেছে। অগ্নির সাগর,—চারিদিকে অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে! ব্রজার আজ ক্ষুধা আগিয়াছে! বতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, ততক্ষণ মুক্তি নাই, মুক্তি নাই, কাহারও মুক্তি নাই!

সহসা দূরে ঢঙ-ঢঙ ঢঙ-ঢঙ করিয়া ঘণ্টা বাজিল। এ...এ দমকল—দমকল আসিতেছে! আঃ, বাঁচা গেল! এতক্ষণে দর্শকের দল নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মুক্তির আরাম এই গাড়ীখানার পিঠে চড়িয়া এতক্ষণে আসিয়া দেখা দিয়াছে!

গাড়ী আসিয়া পড়িল। নল ঢালাইয়া আগুন নিবাইবার উদ্যোগে সকলে লাগিয়া গেল। মুখে

কাহারও কথা নাই। হাত-পাগুলি কলেব মত ক্ষিপ্ত সহজ গতিতে কাঁচ সারিয়া বাইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ধরাধরি করিয়া সকলে একটা জলন্ত পদার্থ বাহিরে লইয়া আসিল। দর্শকের দল ঠোঁট বাঁকাইয়া, বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিঙ্গন-বদ্ধ ছুটি প্রাণী। একটি পুরুষ, অপবটি নারী। দর্শকেরা শিহরিয়া উঠিল। এ সেই নারী—ঈশ্বাদের মত কিছুক্ষণ-পূর্বে যে ঐ আগুনের মুখে ছুটিয়া গিয়াছিল। এই কতক্ষণ-পূর্বে যে শপথ করিয়া স্বামীর কাছে চির-বিদায় লইয়া আসিয়াছিল, স্বচ্ছায় সে অনঙ্গ-সাগবে ঝাঁপ দিয়া কল্প স্বামাকে বাঁচাইবে, আসিয়াছিল—না পারিয়া স্বামীর সতিত সহমরণে গিয়াছে।

আগুন নিবিয়া গিয়াছে। দেখিবাব আর কিছুই নাই। দর্শকের দলও নিখাস ফেলিয়া গৃহে ফিবিয়া আরাম পাইয়া বাঁচিয়াছে। দমকল চলিয়া গিয়াছে। এখনও দূর হইতে তাহার ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট আসিয়া কানে বাজিতেছে। দন্ধ ভ্রমস্থ প রাত্রির কালিমাকে আরও ঘন করিয়া তুলিয়াছে, এবং সেই কৃষ্ণ ভ্রমস্থপের স্রমুখে আশ্রয়হীন উপায়হীন নরনারীর দল পাথবেব

মূর্ত্তিব মত নির্ঝাঁক বসিয়া আছে! তাহারা গৃহহীন, রিক্ত, সর্ব-হাবা! এত দুঃখে কান্দিতে কাহারও চোখে এক ফোঁটা জল অবধি নাই! সে জলটুকু আগুনের আঁচে শুকাইয়া গিয়াছে।

জড়পিণ্ডের মত মৌন মুক সকলে তাল পাকাইয়া বসিয়া ছিল। সব তাহাদের ফুবাইয়া গিয়াছে। কাল আবার রাত্রি পোহাইয়া দিনের আলো দেখা দিবে, সে সম্ভাবনার কথা কাহাবও মনে ছিল না! তাহারা শুধু ভাবিতেছিল, এত কোলাহল, এত লোকজন, আলো ও কোলাহলেব এমন সমারোহ এইমাত্র যেখানে ফুটিয়াছিল, মুহূর্ত্তের অবসরে মৃত্যুর সঘন নিবিড় স্তব্ধতায় সে-সব কোথায় চাপা পড়িয়া গেল।

যেন একটা স্বপ্ন চকিতে সকলকে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। লোক-জন, ছুটিছুটি, গোলমাল—সে যেন ছোয়াবের জল—উচ্ছ্বসিত নদীবক্ষ ছাপাইয়া তাঁরে আদিয়া উঠিয়াছিল, এখন কোতূহল-পরিতৃপ্তি অবদানে ভাঁটাব টান ধবিয়াছে। সে উচ্ছ্বসিত জলবাশি কোথায় সরিয়া গিয়াছে, আব তাহাবা জলে ভাসা কাটি-কুটাগুলার মতই তাঁরে আপনাদেব কুংসিত দৈগ্ধের মূর্ত্তি লইয়া পড়িয়া আছে। জল তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধবণীব আবর্জনা বলিয়া ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

# ফেল-জামিন

আমি ক্যাম্বেলের পাশ নেটিভ ডাক্তার। সাত ঘাটের জল খাইয়া সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি জেলে বদল হইয়াছি।

বেলা তখন পড়িয়া আসিয়াছে। বাসাব সম্মুখে একটু খোলা জায়গা ছিল; সেইখানে ইচ্ছিতেয়াবে বসিয়া ববরের কাগজ পড়িতেছিলাম, এমন সময় একটা ওয়ার্ডার ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, জেলে এক ‘অ্যাক্সিডেন্ট কেশ’ হইয়াছে। উমেশ কয়েদী পাথর-ভাঙ্গা মুণ্ডর নিজের মাথায় মারিয়া মাথা ভাঙ্গিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। এখনই আমাকে বাইতে হইবে! ডাক্তার সাহেবের কাছেও লোক ছুটিয়াছে।

তাড়াতাড়ি জেলে ছুটিলাম। আমার বাসা হইতে জেল দশ মিনিটের পথ।

জেলে গিয়া দেখি, লোকটা বেহুঁশ হইয়া বহিয়াছে। কপাল ছেঁচিয়া গিয়াছে! বস্ত্রাক্রান্তি ব্যাপার!

একটু আশস্ত হইলাম—মাথাটা একেবারে ভাঙ্গে নাই! তখনি প্রয়োজন-মত ঔষধ-ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করিলাম। নাড়ী টিপিয়া, জ্বর আছে। ইতিমধ্যে ডাক্তার সাহেবও আসিয়া পড়িলেন। ব্যাণ্ডেজ দেনিয়া রিপোর্ট লিখিতে বলিয়া তিনি ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

ইহার চার-পাঁচ দিন পরে—ঠিক তখন ভোর হইয়াছে,—সারা রাত্রি ধরিয়া চীৎকার করিয়া আলাইয়া ছোট ছেলেটা সবেমাত্র ঘুমাইয়া ঘুমাইবার একটু অবকাশ দিয়াছে—আমিও ঘড়ির পান চাচিয়া চক্ষু মুদিবার কল্পনা করিতেছি, এমন সময় ওয়ার্ডার আসিয়া বহির্দ্বারে উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল,—বাবু—

ভাল উৎপাত! বিবর্ত চিত্তে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। ওয়ার্ডার সেলাম করিয়া জানাইল, সেই উমেশ কয়েদী শেষরাত্রি হইতে বিষম বায়না ধরিয়াছে, ডাক্তার বাবুকে একবার ডাকিয়া দাও। কিছুতেই তাহাকে ধামানো বাইতেছে না। বকিয়া বুঝাইয়া সকলে হার মানিয়া গিয়াছে! তাই শেষে—

লোকটার সবে জ্বর ছাড়িয়াছে। কাল রাত্রেও তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছি, অনেকটা ভালো আছে। আবার পাছে কোন উৎপাত বাধাইয়া তোলে,—কান্দেই জামা গায়ে দিয়া জেলে চলিলাম।

উমেশের বিছানার পাশে আসিয়া দেখি, বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে পড়িয়া আছে। গায়ে হাত দিলাম, জ্বর নাই। উমেশ ফিরিয়া চাহিল, চোখ দুইটা ফুলিয়া

উঠিয়াছে। বুঝিলাম, সে খুব কাদিয়াছে। আমি কহিলাম, কি হয়েছে উমেশ? ডাকছিল কেন?

উমেশের চোখে জল দেখা দিল। ফুঁপাইয়া সে কহিল,—বাবু, কেন আমার বাঁচালেন? আজ ক’দিন মনের মধ্যে কি আগুন জ্বলছে, তা যদি বুঝতেন!

ভাবিলাম, লোকটার অহুতাপ হইয়াছে! সে কহিল,—মরণ কিছুতেই দেখা দেয় না! কত দিন জলবো, তাও জানি না। সব তাই আমি শেষ করে দিতে গেছলুম, কিন্তু ধবে বেঁধে আবার টেনে তুললেন, কেন? মাথা ছোড়া দিয়ে কি কববেন? মনকে আমার ঠিক করে দিতে পারবেন না তো।

তাহাকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে দুই-চারিটা হিত-কথা পাড়িলাম; কিন্তু উমেশ কহিল, ও-সবে কোন ফল নাই! যে গাছের শিকড় কাটিয়া গিয়াছে, তাহাতে জল-ঢালা কেন?

আমি তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলাম। উমেশ কহিল,—এ সতরে আমার পানে কেউ ফিরে চায় নি, শুধু আপনি চেয়েছেন। আপনার প্রাণেই একটু মায়া আছে, দেখছি। আপনাকে সব কথা খুলে বলছি, শুনুন। শুনে বলুন, এত কাণ্ডের পর কেউ যদি মরতে চায়, তাতে বাধা দিতে আছে কি না!

সে তখন আপনার জীবনের কাহিনী বলিতে শুরু করিল।

উমেশ বলিল,—সে আজ তিন বৎসরের কথা। রাণীগঞ্জের হাটে গিয়াছিলাম গরু কিনিতে। আমার বাড়ী জিয়ালিতে। দামোদরের উপরে জিয়ালি,—ছোট গ্রাম।

গরু কিনিয়া ফিরিবার পথে এক মুদির দোকানে বিশ্রাম করিতেছিলাম। সেখানে এক লোকের মুখে শুনিলাম, দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ধমান ভাসিয়া গিয়াছে। এমন জল সে তল্লাটে কোনকালে কেহ চোখে দেখে নাই। লোকের ঘর-বাড়ী, গরু-বাজুর সে জলের স্রোতে কোথায় সব ভাসিয়া গিয়াছে!

শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। আমার জিয়ালি? লোকটা কহিল, জিয়ালির কোন চিহ্ন নাই! বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া সে যেন সাগরের স্রষ্টি হইয়াছে! কাটা ছাগলের মত প্রাণটা ধড়ফড় করিয়া উঠিল! জিয়ালি গিয়াছে? তার মানে,—আমার সব গিয়াছে? ঘরে কণা জ্বী,

আদরের মেয়ে দুলালী, ক্ষেত-খামার, গরু-বাছুর,—সব  
—সব গিয়াছে ? কিছু নাই ?

দোকানীর ঘরে গরু গাধা ছুটিয়া পথে বাহির  
হইলাম। পেটে কদিন অন্তর পড়ে নাই, ক্ষুধায় নাড়ী  
ছিঁড়িয়া বাইতেছে—তবু সাত-আট ঘণ্টা পুরা দমে  
চলিয়া বর্ধমানের প্রান্তে আসিয়া পৌঁছিলাম। তাব পর  
মেঠো পথ জলের তলায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। যে-  
ধারে চাই, কেবল জল। বড় মাঠ বিলের আকার ধারণ  
করিয়াছে, আর তাহারই মধ্যে-মধ্যে ছই চাবিটা বড় বড়  
গাছ শুক প্রহরীর মত মাথা তুলিয়া খাড়া দাঁড়াইয়া  
আছে। সূর্য্য বখন অন্তর বাইতেছে,—তাহার সে লাল  
আলো জলে যেন সিঁদূর গুলিয়া দিয়াছে।

আমার চোখের সম্মুখে সে লাল জল রক্তনদীর মত  
টক-টক কবিত্তেছিল। পথ নাই, পথ নাই—চারিদিকে  
জল...জল! উপায় কি! মাথা ঝাঁ-ঝাঁ কবিত্তেছিল।  
গীতবাইয়া গৃহে দ্রিবিব ভাবিয়া জলে নামিবার উল্লোম  
কবিত্তেছি, এমন সময় ফাঁড়ির এক চৌকিদার আমায়  
ধরিয়া ফেলিল। আমি কাঁদিয়া মিনতি করিলাম,—  
ছাড়িয়া দাও গো,—আমাব সব যায়।

সে কহিল, তাহার ছাড়িবার ভকম নাই। পাছে  
কেহ জলে নামে, তাই বোধ কবিবার জন্ম সেখানে সে  
মোতায়েন আছে। আমায় ছাড়িয়া গাফিলির দণ্ডস্বরূপ  
দশটাকাব চাকরি সে খোয়াইতে পারে না। চাকরির  
উপর তাব জান-বাজ্জার নির্ভর।

বেশী জিদ ধরিলে আমার সে থানার জিন্মা করিয়া  
দিবে, এমন ভয়ও দেখাইতে ছাড়িল না।

আমি কেমন হতভম্বের মত বসিয়া পড়িলাম।  
চোখের সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী অঁধাবে ভবিয়া  
গেল।

উমেশ বলিতে লাগিল,—কতক্ষণ সেই ভাবে বসিয়া  
ছিলাম, জানি না—চোখের সামনে মাথার উপর দিয়া  
আধার রাত্রি পোহাইয়া গেল—আবার সূর্য্য উঠিল।  
সূর্য্যের তাপ গায়ে লাগার আমার হুঁশ্ হইল। তখন  
সে স্থান ত্যাগ করিয়া আমি অন্ত পথে চলিলাম।  
চৌকিদার বাধা দিল না।

তাবপর কোনমতে কোনো খানে হাঁটু-ভোর জল  
ভাঙ্গিয়া, কোন খানে বা সাতবাইয়া গ্রামে ফিরিলাম।  
কিন্তু কোথায় গ্রাম! কোথায় ঘর! কোথায় স্ত্রী!  
কোথায় বা মেয়ে! দামোদর এক-নিশ্বাসে সমস্ত গ্রাম  
করিয়াছে। মাথার মব্যে ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল।  
আমি শুইয়া পড়িলাম। ঘুমে চোখ ছাইয়া আসিল।

যখন চোখ মেলিলাম, তখন দেখি, এক কানাতের  
ঘরে শুইয়া আছি। পাশে একটি বাবু বসিয়া আছেন।  
প্রথমটা কিছু খেয়াল হইল না। কিন্তু পাশ ফিরিতে

একটা নিশ্বাস পড়িল। অমনি মেয়ের মত কালো স্মৃতি  
মনের উপর ঘনাইয়া আসিল। চোখে জল ঝরিল।

বাবুদের চেষ্ঠায় মেয়ে মিলিল। স্ত্রীকে পাওয়া গেল  
না। মেয়ে আসিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল,  
কাঁদিয়া কহিল,—মা ?

তেরো বছরের মেয়ে—তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম  
না, আমাদের কি সর্কনাশ হইয়াছে! বুঝাইবই বা কি  
করিয়া! তাহাকে বুকে চাপিতে চোখের জলে বুক  
ভরিয়া গেল। সাজানো ঘর, সাজানো সংসার দেখিয়া  
বাতীর বাতিব হইয়াছিলাম—ফিবিয়া দেখি, ভোজবাজির  
মত কোথায় সব মিলাইয়া গিয়াছে! জীবনে দুঃস্বপ্ন  
মায়ায় অনেক দেখে,—কিন্তু এ সত্য যে সে স্বপ্নের  
অগোচর!

ভাবিলাম, স্ত্রী যে পথে গিয়াছে, দুলালীকে বুক  
করিয়া সেই পথের পথিক হই। সব যদি গেল তো এ  
গুঁড়টুকুকে লইয়া কোথায় রহিব! চোখের একটি পলক-  
পাত—এ গুঁড় উবিত্তে কতক্ষণ!

বাবু বাবু মনটাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন!  
তাঁহাব বলিলেন, মেয়ের মুখ চাহিয়া আবার আমায় গা  
ঝাড়িয়া উঠিতে হইবে। গলা টিপিয়া ইহাকে মারিতে  
পাবি না! মেয়ের পানে চাহিলাম, তাহাব চোখের  
কোণে জলের দাগ তখনও মিলাইয়া যায় নাই। সেই  
ঝাপসা জল-ভবা দৃষ্টিতে কি মমতাই মাঝানো ছিল!  
মরা হইল না। তাহাকে হাতে কবিত্ত মাঝা—না, সে  
অসম্ভব!

কিন্তু কি দিয়া বাঁচাইব? ঘর নাই। ধুধু প্রান্তরে  
কি দিয়া আবাব ঘর বাঁধিব? কি খাইয়া বাঁচিব? এ  
বয়সে নূতন করিয়া সংগ্রহের আর সামর্থ্য নাই!  
তাহার উপর ডাগব মেয়ে, আজ বাদে কাল বিবাহ দিতে  
হইবে। পাহাড়েব মত দুর্ভাবনার ভারী বোঝা মাথার  
উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। আমি পাগল হইয়া উঠিলাম।

বাবুর দল কহিলেন, সহরে যাও। কলিকাতার  
পথে পয়সা ছড়ানো আছে। অতীতের সমস্ত স্মৃতি  
মুছিয়া মেয়ের মুখ চাহিয়া নূতন করিয়া আবার সব  
গড়িয়া তোলো!

তাঁহাদের মুখের উপর কোন কথা বলিতে পারিলাম  
না। তাঁহারা গাঁটের পয়সা দিয়া টিকিট কিনিয়া  
আমাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিলেন; সঙ্গে খরচ কিছু  
গুঁজিয়া দিতে তুলিলেন না। চোখের জল মুছিয়া মেয়ের  
হাত ধরিয়া সহর কলিকাতায় আসিলাম।

অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া, লোকজন। সকলেই ব্যস্ত,  
অধীর—এ এক সমারোহ ব্যাপার! এ ভিড়ের চাপে  
পড়িয়া পিষিয়া ধূলা হইয়া বাইতে হয়! যেদিকে লোক  
চলিয়াছে, সেই দিকে তাহাদের পিছনে চলিতে আরম্ভ

করিলাম। গঙ্গার প্রকাণ্ড পুল পার হইলাম। ভিড়ের আর বিরাম নাই! কোলাহল অবিরাম! কোন্ পথে যাই? কোথায় গিয়া একটু আশ্রয় পাই?

হাঁটিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। হুলালী আমার জুড়াইয়া ধরিয়া বলিল,—আর চলতে পারিচি না বাবা। কোথাও একটু বসবে, চলো।

কোথায় বসি! বড় বড় বাড়ী—সব ছাদ গিয়া যেন আকাশে ঠেকিয়াছে! লোকেব কোলাহলে চারিদিক গম-গম করিতেছে! কোনো বাড়ীর সম্মুখে ছোট একটু রোয়াক। সেখানেও বসিবার ঠাই নাই, রঙ-বেরঙের সামগ্রী লইয়া লোকেবা বেচা-কেনা করিতেছে। নিরুপায় হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া পড়িলাম। জনশ্রোতের প্রবল আঘাতে কোথায় ছিটকাইয়া সরিয়া গেলাম। দাঁড়াইবাব সাধ্য কি! মেয়েটাকে ধরিয়া টানিয়া কোনমতে একটা খাবারের দোকানের সম্মুখে আসিলাম। হুলালীকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—কিছু খাবি, মা?

উদ্গীৰ্ণ নয়নে হুলালী আমার পানে চাহিল। দোকানে ঢুকিয়া কিছু খাবার কিনিয়া তাকে দিলাম। নিজে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল খাইলাম। একটু শ্বস্ব হইলে দোকানীর সহিত আলাপ শুরু করিলাম।

বন্ধমান হইতে আসিয়াছি শুনিয়া দোকানী মহা-উৎসাহে আলাপে যোগ দিল। কেমন জল, কাহার কি রহিল-গেল,—তাহারই বিস্তৃত বিবরণ খুঁটিয়া-খুঁটিয়া সে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ক্রমে শ্রোতা জুটিল বিস্তর। সকলেরই শুনিবার কি আগ্রহ! কি কৌতূহল! মনে মনে ভাবিলাম, আঃ, ভগবান খুব আশ্রয় মিলাইয়া দিয়াছেন। মেয়েটাকে লইয়া এবারে বৃষ্টি জুড়াইতে পাইলাম।

কিন্তু কিছু পরে ভুল ভাঙ্গিল। শুনিবার সব কথা শেষ হইয়া গেলে দোকানী কহিল,—তা হলে এসো, কস্তা। আমার দোকানে লোকজন আসচে—ঠাই জুড়ে চোপব দিন বসে থাকলে তো আমার চলবে না। পাশ দাও।

হুলালী ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বড় শ্রান্তির পর বড় আরামেব ঘুম। সে ঘুম ভাঙ্গাইতে মমতা হইল। কিন্তু দোকানী পর, শুনিবে কেন?

তাঁহার অমুরোধের সুর ক্রমে ঢড়া হইয়া উঠিল। একটা ভৎসনাও মিলিল। অগত্যা বাধ্য হইয়া হুলালীকে উঠাইয়া আবার পথে বাহির হইলাম। ঘুমে সে ঢুলিয়া পড়িতেছিল—পা ভালো সরিতেছিল না। টানিয়া তাকে লইয়া ফুটপাথে এক গাছতলায় বসিয়া পড়িলাম। হুলালী আমার গায়ে ঠেপ দিয়া চক্ষু মুদিল।

কিন্তু বরাত মন্দ—শান্তি মিলিবে কেন? এক

পাহারওয়ালা আসিয়া কহিল, বাস্তা বন্ধ করিয়া বসিলে চলিবে না! চোখ বাড়াইয়া সে উঠাইয়া দিল। আবার বাস্তায় দাঁড়াইলাম।

সেই রোজ্রতন্তু পথে কষ্টের আর সীমা ছিল না! বড় বাড়ী দেখিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি,—এমন দাঁতা কেহ নাই যে শুধু-একটু মাথা গুঁবিবার ঠাই দেয়? বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে গেলে গালপাটাওয়ালা মোটা দরওয়ানের দল হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া তাড়া করে। দুই দিন দুই রাত্রি ধরিয়া কত ঘুরিলাম, কোথাও আশ্রয় মিলিল না!

তৃতীয় দিনে এক গলির মধ্যে দিয়া চলিয়া একটা বাড়ীর বোয়াকে আসিয়া বসিলাম। হুঁচাব পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়াছিলাম, মেয়ের মুখে দিলাম—নিজেও কিছু খাইয়া লইলাম। বাস্তাব কল্লেব জলে তুষা নিবারণ করিলাম। তারপর একবার দেবতার নাম স্মরণ করিয়া এক বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া ডাকিলাম,—বাবু—

সম্মুখের ঘরে বসিয়া এক বাবু গড়গড়ার নল টানিতে ছিলেন। নিকটে বিচানাব উপর বাঁয়া তবলা প্রভৃতি বাজের সরঞ্জাম পড়িয়া আছে। চোখ তুলিয়া তিনি কহিলেন,—কি চাস?

একটা লোক ভিতর হইতে হুটিয়া আসিয়া বলিল,—বাড়ীতে ব্যামো, ভিক্ষে মিলবে না—পথ ত্যাগ!

হুলালী জড়সড়ভাবে আমার বুকে মুখ লুকাইল। আমি কাতর স্বরে কহিলাম,—ভিক্ষে আমি চাই না, বাবা। চাকরি চাই।

বাবুট কটমট্ করিয়া চাছিলেন—মেয়ের পানেও একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে ভুলিলেন না। বাবু বলিলেন,—তোরা জামিন কেউ আছে?

জামিন! কথটা কাণে নুতন ঠেকিল। অর্থ বৃথিলাম না। বাবুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাতিয়া রহিলাম। বাবু বলিলেন,—তুই চোর কি ছাঁচোটোড়—তাব পরিচয় কে দেবে?

আমি কহিলাম, আমি চোর বা ছাঁচোটোড় নহি। নিজের হুঃখের কাহিনী নিবেদন করিলাম। বাবু মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—ও-সব লোককে চাকরি দেওয়া যায় না, বাবু। তোমাকে জানে-শোনে, এমন লোক আনতে পাবো তো মিলতে পারে—আমাব জামাইয়ের বাড়ী এক জন লোকেব দরকাব ছিল বটে। তা তোমাব সঙ্গে দেখিচি আবার একটা মেয়ে! বয়সও তার সুবিধের নয়!

কাঁদিয়া বাবু পায়ে ধরিলাম—গৃহ-হীন আশ্রয়-হীন, নিতান্ত অসহায় আমি! বাবুর কিন্তু সেই এক কথা, অজানা অচেনা লোককে চাকরি দিয়া তিনি দায়ে ঠেকিতে পারেন না। তার উপর ঘাড়ে এক বুড়ো-ধাড়ি মেয়ে!

মুখ চুণ করিয়া আবার পথে বাহির হইলাম। বাড়ী-বাড়ী ঘুরিলাম। সব জায়গায় সেই এক কথা। অজানা অচেনা লোকের জ্ঞান এ মল্লকে ঠাঁই নাই। তবে আমি যাই কোথা? খাঁ কি? এ কি ভীষণ শাস্তি, ভগবান!

ক্রমে গাঁটের পয়সা ফুরাইয়া আসিল। যেদিন শেষ পয়সাটি বাহির হইয়া আমার একেবারে সম্বলহীন রিক্ত করিয়া দিল, সেদিন ঘুরিতে ঘুরিতে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিল। ছলাপী কানিতেছিল। ক্ষুধায় তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সারাদিন এক গলির মোড়ে বসিয়া রহিলাম; ছলাপী আমার কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। আমি তাহার মুখে-চোখে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইলাম। যাতাব খাইতে কিছু জ্বোটে না—নিজ্ঞা তাহার প্রতি বড় সদয়। নিমেষে ছলাপী ঘুমাইয়া পড়িল। আমি তাহাব কপালের উপর হঠতে কেণের গুচ্ছ সরাইতে সরাইতে কত কথাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি গরীব চালা—কিন্তু দেশে আমার দ্বার হইতে কোন ভিখারী-অভিধি অতৃপ্ত বৃকে কোনদিন ফিরিয়া যায় নাই। সেই আমি,—আজ পথের কাদালের অধম! শেষে স্থির করিলাম, ভিক্ষাই করিব। দেখি, সহরে ভিক্ষা মেলে কি না!

সহরের উপর দাকণ অভিমানে জন্মিয়াছিল। এত বড় বিরাট শরীর লইয়া সম্ভিজত সহর পড়িয়া আছে—গলির মোড়ে সাবাদিন বিষন্ন মুখে আমি বসিয়া—আমায় দেখিয়া লোকের দয়া না হোক—এই কচি মেয়ে-টার শুক্লান মুখ দেখিয়াও কাহারও দয়া হইবে না। সারাদিন আমার সম্মুখ দিয়া এত লোক আসিল-গেল, কৈ কেহ তো একবার ফিরিয়া চাহিল না, জিজ্ঞাসা করিল না—কেন আমরা বসিয়া আছি? কি চাই? কি আমাদের দুঃখ?

আশ্চর্য্য! এ কি আমার সেই ছোট গ্রামে সেই দাবিদ্ভের পুরীতে সম্ভব হইত! পকাশ জন লোক আসিয়া গায়ে পড়িয়া সাহায্য করিত! আর এই এত বড় সহর—পাষণ—পাষণ সহর! লোকেব এখানে প্রাণ নাই, মন নাই, ভিতরে পাষণ পুরিয়া নিজেদের লইয়া সব ছুটাছুটি করিয়া মবিতছে!

বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছিল। সম্মুখে এক বাবু চুপুট টানিতে টানিতে পথে চলিয়াছিলেন—গলায় কুলের মালা, ফিট্-ফাট্ পোষাক। গলির মোড়ে আব কোন লোক নাই। তাঁহারই কাছে ভিক্ষার জ্ঞান প্রথম হাত পাত্তিব স্থির করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ডাকিলাম,—বাবু—

বাবু ফিরিয়া চাহিলেন। আমার জিত কেমন জড়াইয়া গেল। কি বলিব? কখনও ভিক্ষা চাহি নাই—ভিক্ষা চাহিতে বাধ-বাধ ঠেকিল। তবু যখন কথা আরম্ভ

করিয়াছি, তখন তাহা শেষ করিতেই হইবে! কোনমতে বল সংগ্রহ করিলাম, কহিলাম,—আজ দুদিন কিছু খাইনি বাবা, সঙ্গে এই মেয়ে—এর মুণের দিকে চেয়েও না হয়—

বাবু মেয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ যেমন দৃষ্টিতে ফিরিয়া চায়, দৃষ্টি ঠিক তেমনি!

আমি সে দৃষ্টি লক্ষ্য করিলাম। সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। ইচ্ছা হইল, এখনই উহার টুটি টিপিয়া চোখ-জুটাকে টানিয়া বাহির করিয়া দিই!

বাবু বলিলেন,—তাইতো—মেয়েটি তোর দেখছি খাশ! তা এক কাজ করুন—পয়সার দুঃখ থাকবে না! আমার সঙ্গে আয় মেয়েকে নিয়ে। আমি থাকবার ঠাঁই দেখিয়ে দেবো। সুখে থাকবি ছুজনে।

কথাগুলো যেন বাজেব মত শুনাইল। কলিকাতার অনেক কীর্ত্তি কথা গ্রামে বসিয়া শুনিয়াছিলাম। আমি বাবুব পানে কটমট করিয়া চাহিলাম। বাবু ভুড়কাইয়া সবিস্ময় গেল। আপদ চুকিল। আমিও নিশ্বাস ফেলিলাম।

আমার মাথায় তখন একটা মতলব দেখা দিল। চমৎকার! ঠিক!

ছলাপীকে উঠাইলাম। পথে মই ঘাড়ে করিয়া একটা লোক অলো জালিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গঙ্গাব তীরে বাইবার পথ কোন্ দিকে? সে বলিল, বাঁয়ে ঘুরিয়া মোজা পশ্চিমে গেলে গঙ্গাব তীরে পৌছিবে।

ছলাপীকে কোনমতে টানিয়া গঙ্গাবতীরে আসিলাম।

স্নিগ্ধ শীতল বাতাসে সব জালা জুড়াইয়া গেল। চারিধাবে আঁধার নামিতেছিল। মাঝে গঙ্গায় ছু-চারি-খানি নৌকা হইতে আলোক-রাখি আসিয়া জলে পড়িয়াছে। তীরের কাছে কতকগুলো বোট বাঁধা—সেখানে মাঝিরা রান্নাবান্নার আগোজনে ব্যস্ত। দূরে এক জোটব উপর বসিয়া কে গান গাহিতেছে—বড় করুণ স্বর! আমার তপ্ত প্রাণে সে স্বর মাতিয়া উঠিল। চারিধাব শান্ত, কি-এক আবেশে ভরা! ঘাটে তখন দুই-চারিটা কুলি স্নান করিতেছিল। আমি ঘাটের বাঁধানে সিঁড়িব উপর বসিয়া রহিলাম।

এই শান্ত নীরবতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর উপর এক বার চোখ বুলাইয়া লইলাম। ঘরে-ঘরে আনন্দের কোলাহল উঠিয়াছে—দিনের শেষে সকলে শান্তির কোলে মাথা গুঁজিয়া বিরাম পাইয়াছে।

অতীতের কথা মনে পড়িল। সারাদিন ক্ষেত-খামাব দেখা-শুনাব পর গৃহে ফিরিতাম—প্রদীপের আলোয় আলো-করা ছোট ঘর—স্ত্রীর আদরে, মেয়ের আদারে সে ঘর উজ্জ্বল। সে ঘরে ঢুকিয়া দিনের



শব ক্রান্তি নিমেষে ভুলিয়া যাইতাম। সে কি সুখ—কি আরাম! কোন্ পাণে আমার সে স্বপ্ন—সে আশ্রয় কপূর্বের মত আজ উবিয়া গেল। গেল যদি তো এ-মেয়েটা কেন আটকাইয়া রহিল? এ যে শিকলের মত আমাকে আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিল। না, এ শিকল কাটিতে হইবে—কাটিব। না কাটিতে পারি, এই শিকল গলায় বাঁধিয়া সব শেষ করিয়া দিব।

কুলিয়া চলিয়া গিয়াছিল—রাত্রি তখন গভীর। ঘোড়ের উপর জীবনের কোলাহলটুকু নিঃসাড় হইয়া পড়িয়াছে। হুলালীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিলাম। মৃৎ চেউ তটের কোলে আছড়াইয়া পড়িতেছে—সে যেন মুমূর্ষুর কাতর বিলাপের মতই করুণ, বেদনাময়! সে সুর আমাকে ডাকিতেছিল। প্রাণ আমার নাচিয়া উঠিল। কোমরভোর জল ছাড়িয়া আর-একটু অগ্রসর হইলাম। হুলালা ডাকিল,—বাবা—

আমি কহিলাম,—চুপ! ডুব দে। সব জালা জুড়িয়ে যাবে।

হুলালা ডুব দিল না; কাঁদিয়া আবার ডাকিল,—বাবা—

আবার অমন কবিয়া ডাকে! আমার রাগ ধরিল। তাহার ঘাড়টা টিপিয়া তাকে ডুবাইয়া দিলাম—বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিলাম। একটা পৈশাচিক বাসনা মনের মধ্যে গর্জিয়া উঠিয়াছিল—সে গর্জন আমি স্পষ্ট কানে শুনিতেছিলাম। আমার মাথায় খুন চাপিয়াছিল।

হুলালা প্রাণপণে যুঝিতেছিল। তাহার মরিবার ইচ্ছা নাই,—সে মরিবে না!

নিতান্ত অব্যবহৃত ভাগ্য মেয়ে! এত দুঃখেও তাহার বাঁচিবার সাধ! শেষে তাহারই জয় হইল। বোধ হয়, বাপেব স্নেহ-হৃৎকল হাত মুহূর্তেব জগৎ কেমন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল! সে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। আমি হারিলাম। তাকে চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। জল খাইয়া উঠিয়া কাশিয়া সে ডাকিল,—বাবা, ও বাবা—মবে যাবো, আমি মবে যাবো গো!

আমি ভৎসনা করিয়া কহিলাম,—এত কষ্টেও তোর বাঁচিবার সাধ হয়?

—আমি মরতে পারবো না, বাবা। হুলালা ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে কাল্লায় আমার রাক্ষসের প্রাণ নিমেষের জগৎ গলিয়া গেল। কিন্তু তখনই ভাবিলাম, না, এ মায়া ভালো নয়। হুলালাকে মরিতে হইবে—মরা ছাড়া উপায় নাই! সারা পৃথিবীর উপর রাগ ধরিয়াছিল!

মাথার উপর অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল—আমি তীব্র নক্ষত্রগুলার পানে চাহিলাম। মনে হইল,

মেয়েকে মারিয়া, নিজে মরিয়া হুনিয়ার এই এত-বড় শয়তানীর এতখানি নির্দয়তার চূড়ান্ত শোধ গ্রহণ করি—উহারা তাহার সাক্ষ্য থাকুক!

অনেক চেষ্টা করিয়া হুলালাকে ডুবাইতে পারিলাম না। প্রাণপণ শক্তিতে সে জীবনের জগৎ সংগ্রাম করিতেছে। মনে হইল, তাকে ভুলিয়া ঐ শাণের সিঁড়িতে আছড়াইয়া ফেলি!

হুলালাকে কোলে তুলিলাম। সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আমার বুকে মুখ গুঁজিয়া—মাগো—বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ও কি! কাতাকে ডাকে? আমার হাত-পা থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাকে আছাড় দিতে হাত আর উঠিল না। হুলালা আবার ডাকিল,—ও বাবা, আমার মেবে ফেলো না গো, আমি মরতে পারবো না।

তারে অবোধ,—সে-কি অধীর আগ্রহে নিশ্চিন্ত দিশ্বাসে আমাকে সে চাপিয়া ধরিল। আমার চোখ ফাটিয়া জল বাঁধি হইল। তাহার মুখে অজস্র চুমা দিয়া আমি কহিলাম,—না মা, মরতে হবে না। আয়, দুজনেই বেঁচে থাকি—ঘেঁটুকু কষ্ট বাকী আছে, নিঃশেষে আর তা ভোগ করি।

হুলালাকে লইয়া ঘাটে উঠিলাম। মরা হইল না। সে স্বপ্ন কেন হারাইলাম! একটা ক্ষণ—না হারাইলে এ মনস্তাপ আজ সজিতে হইত না! জেলে বাস ঘটত না!

উমেশ চুপ করিল। আমি কহিলাম,—চুপ করো, উমেশ। আর আমি শুনতে চাই না।

উমেশ কহিল,—না বাবু, আর একটু শুয়ে—দয়া করে শুয়ে—আমার প্রাণ জলে যাচ্ছে!

আমি কহিলাম,—আজ্ঞা, বলো।

উমেশ বলিতে লাগিল,—সে রাত্রি ঘাটেব চাতালে পড়িয়া রহিলাম। পরদিন উঠিয়া দেখি, হুলালীর চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল হইয়া হইয়াছে—গা আগুনের মত গরম। প্রবল জ্বর।

সেদিন বুঝি কি-একটা যোগ ছিল। ভোর হইতে না হইতে ঘাটে খুব ভিড় দেখা গেল। ঘোমটার মুখ-ঢাকা কচি বৌ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—কেহই আর ঘবে নিশ্চিন্ত ছিল না—সকলেই স্বান সারিয়া পুণ্য সাবিয়া হাসিয়া হাসাইয়া আসিল,—চলিয়া গেল। দুই-চারিজন চালটা-আলুটা বিতরণ করিতে কার্পণ্য করিল না। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প। আমার ভাগ্যেও কিছু চাল ও তরকারী মিলিল। কিন্তু তা লইয়া কি করিব? কাঁচা চাল মানুষ কত চিবাইবে? কাঁচা আনাড়-তরকারীও কিছু খাওয়া যায় না।

মাথায় বুদ্ধি জোগাইল। বেলা তখন আবার পড়িয়া আসিয়াছে, এক বোটের মাঝির কাছে গিয়া চালগুলো তাহাকে চালিয়া দিলাম, বলিলাম,—ভাই, চালগুলো নাও, নিয়ে এই আলু ক'টা আমার পুড়িয়ে দাও। আজ দুদিন আহার জোটে নি।

মাঝি বাবু নয়, ভদ্র নয়—তাই সে অত জামিন-জানান সন্ধান করিল না—হতভাপদেণ দিল না; তাহার দয়া হইল। সে বলিল,—চালগুলো সেদ্ধ করে দেবো? কিন্তু জাতে আমি মুসলমান।

ভাবিলাম, ওবে আমার জাত! আগে জান, না, আগে জাত! কিন্তু না, আমার ছলানী! জবের ঘরে পড়িয়া আছে—হু' দিন তাহার অন্ন জোটে নাই—আর আমি ভাত গিলিব কোন্ মুখে! বলিলাম,—না,—ভাত চাই না, শুধু আলু ক'টা পুড়িয়ে দাও।

সেই পোড়া খালু আনিয়া ছলানীকে ডাকিলাম,—মা—

অতিকষ্টে ছলানী চোপ মেলিল। আমি কহিলাম,—এই নে মা, পা,—

ছলানী আলু-পোড়া খাটিল; আমার বলিল,—তুমি একটা খাও, বাবা।

চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে পোড়া আলু মুখে দিলাম। সে বেন অমৃত!

সন্ধ্যার দিকে ছলানীও জ্বর ছাড়িল; সে কথাবার্তা কহিল। আমার প্রাণ একটু শান্ত হইল। ছলানী বলিল,—বাবা, চলো, বাড়ী যাই। এখানে এমন-করে ঘুবে কি কবে বাঁচবো?

সে কথা আমারও মনে হইয়াছিল। কিন্তু বাড়ী কোথায় যে ফিবব! জলের স্রোতে বাড়ীর চিহ্ন অবশি মুজিয়া গিয়াছে! আর ফিববই বা কি করিয়া? বেলের ভাড়া চাই—বিনা পয়সায় বেলে কেহ বাইতে দিবে না। সকল পথই আজ আমাদের বন্ধ! এই সহরের পাষাণ-প্রাচীরেব মধ্যে পড়িয়া থাকিতে হইবে। না পারি, ঐ পাষাণেব দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মরা ভিন্ন মুক্তির আজ আর কোন উপায় নাই।

আবার বাত্রি আসিল। মাথার উপর আকাশে একরাশ নক্ষত্র আসর জমকাইয়া বসিল। তাহার নীরব নেত্রে যেন আমাদের পানে চাতিয়া আছে! মানুষ কত দুঃখ সহিতে পারে, সহিয়া বাঁচিয়া থাকে, বিজ্ঞপ-ভরা চোখে বৃষ্টি তাহার তাহাই দেখিতেছিল।

তখন বোধ হয় মাঝ-রাত্রি—একটু ঘুম আসিয়াছিল—সহসা একটা হুপ্পাদপ্ শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চোখ চাহিয়া উঠিয়া দেখি, ছলানী পাশে নাই! কোথায় সে...দাঁড়াইয়া গঙ্গার পানে চাহিলাম—স্থির জল, মুহু তরঙ্গভঙ্গে গান গাহিতেছে।

আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। ঘাটের উপরে যে চাতাল, সেখানে আসি-লাম—দেখি, ঘাটের উপর পথে একখানা ঘোড়ার গাড়ী। তিন-চারিটা লোক বাস্ত হইয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিয়া ষার বন্ধ করিয়া কহিল,—যাও—

স্তব্ধ আকাশে বাজ্ যেমন হাঁকিয়া যায়, ঠিক তেমনই শব্দ করিয়া গাড়ীখানা ছুটিল! আমার মনে হইল, গাড়ীর মধ্যে কে যেন 'বাবা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল! কাঁদিয়া নীরব হইল। এ কি, এ না আমার ছলানী? ছলানীকে চোবে চুরি কবিয়াছে—সে গঙ্গায় যায় নাই!

পাগলের মত গাড়ী লক্ষ্য করিয়া আমি ছুটলাম। কিছু হইল না। দুর্ভাগ্য পা। কি তাহার শক্তি যে গাড়ীর সঙ্গে সমানে ছুটিবে! হাঁফাইয়া শেষে একটা মোড়ের উপর বসিয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম, আর কেন মায়া! শিকল যদি এমনি করিয়া ডিঁড়িল তো ছিঁড়ুক! সে শিকলের পিছনে ছুটিয়া কি ফল! যাক্—যে-ছোট সম্বলটুকু বাকী ছিল, তার বহুপুর্বেই যাইবার কথা—তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কথা নয়! গেল যদি—যাক্।

সব বন্ধন কাটিয়া গিয়াছে! আঁ কি মুক্তি—কি আরাম। এখন ঐ গঙ্গার কোলে পবন নিশ্চিন্ত চিত্তে গিয়া আশ্রয় লইতে পারিব। প্রাণে অত্যন্ত উল্লাস হইল—হাতা কবিতা হাসিয়া উঠলাম। সে হাসির শব্দে চারিধার হুঁসিয়া উঠিল! আমিও সে স্বরে কাঁপিয়া উঠিলাম! তাবপব একবার প্রাণ ভরিয়া বিশ্রাম করিয়া লইব ভাবিয়া সেই বাস্তব একবারে শুইয়া চোখ বুজিলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। যেন আমার সেই দেশেব ঘরে পরম স্তম্বে শুইয়া আছি, ছলানী আসিয়া ঠেলা দিয়া ডাকিতেছে,—বাবা—

ধড়মাড়িয়া উঠিলাম। একটা মানুষ সত্যি ঠেলা দিয়া ডাকিতেছিল,—এই-যো।

চোখ মুছিয়া চাহিলাম,—সে ছলানী নয়, লাগ-পাগড়ী-মাথায় এক পাহারওয়াল! সে আমার ঠেলা দিয়া দাঁড় করাইল,—হাতটা আঁটিয়া ধরিয়া গালি দিল, কহিল, আমি পাকা চোর; আমাকে থানায় যাইতে হইবে!

কোন কথা বলিলাম না—তাহার ইঙ্গিতে চলিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর মধ্যে সে আমার লইয়া আসিল। ছোট ঘর—টেবিল-চেয়ারে সাজানো! একধারে একটা বেঞ্চের উপর গাণা-প্রমাণ বাঁধানো বাত। টেবিলের উপর আলো জ্বলিতেছে, আর তাহার সম্মুখে বেঞ্চে বসিয়া টেবিলে মাথা রাখিয়া একটা লোক

ঘুমাইতেছে। পাহারওয়াল আমায় দাঁড় করাইয়া তাকে ডাকিল,—বাবু—

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। পাহারওয়াল সটান বলিয়া গেল, আমি পথে ঘুরিতেছিলাম। তাকে দেখিয়া পলাইবার চেষ্টা করি। সুবা হওয়ায় দৌড়িয়া গিয়া সে আমায় ধরিয়া ফেলে। ‘কাজ-কাম’ আমায় কিছুই নাই!

বাবু পিঁচাইয়া আমায় গালি দিল, আমাদের জ্বালায় একদণ্ড তাহার চোখ বুজিবাব অবসর মিলিবে না? প্রকাণ্ড খাতা টানিয়া কি-সব লিখিয়া বাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার ঘর-বাড়ী কোথায়? কাজ-কর্ম কিছু করি কি না?

আমি বলিলাম, কাজ-কর্মের চেষ্টায় সহবে আসিয়াছিলাম—তার পর যাহা ঘটিয়াছে, সব খুলিয়া বলিলাম। বাবুটি পাহারওয়ালকে কহিল,—ঘাটে নিয়ে যা একে। তদন্ত করে আর।

পাহারওয়াল বিরক্ত চিত্তে আমাকে লইয়া বাহিরে আসিল, একটা দড়ি বাঁধিয়া পথে আমায় খানিকটা ঘুরাইয়া এক পানওয়ালীকে ঘুম হইতে তুলিয়া তাকে দিয়া পাণ সাজাইয়া খাইয়া বিড়ি টানিয়া গল্প করিয়া আবার থানায় ফিরিল, ঘাটে গেল না।

তারপর আদালতে বথাসময়ে আমায় চালান দেওয়া হইল। সেখানে পাহারওয়ালটা একটা কাঠের পিঁজরায় দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল, যে আমার কাজ-কর্ম কিছু নাই। অনেক রাত্রে পথে ঘুরিতেছিলাম—তাকে দেখিয়া পলাইবার উদ্যোগ করিলে সে আমায় ধরিয়া ফেলে! তার পর আমায়ই কথামত দুই-চারি জায়গায় ঘুরিয়া সে তত্ত্ব লয়—সকলে বলে, আমাকে চেনে না!

হাকিম জিজ্ঞাসা করিল,—কি রে? তোর কাজ-কাম কিছু আছে?

ভাবিয়াছিলাম, কথা কহিব না—কিন্তু কহিতে হইল।

এতক্ষণ হাজতে বসিয়া চোর-ডাকাতের মুখে শুনিতে-ছিলাম, আমার জেল হইবে! আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম—কি দোষ করিয়াছি যে, জেলে যাইব? খাইতে পাই না—ঘর নাই, আশ্রয় নাই। ভগবান নিষ্ঠুর বাজ ফেলিয়া সব পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছেন, তাই মেয়েকে লইয়া পয়সা-উপার্জনের চেষ্টায় সহরে আসিয়াছিলাম—সে পয়সাও গতর খাটাইয়া উপার্জন করিব! সহরে ডাকিয়া কেহ একদিন জিজ্ঞাসা করে নাই, কোথা হইতে আসিলাম—কি চাই? চাকরির সন্ধানে ঘুরিয়া কেবল কটু কথা ও হিতোপদেশ শুনিয়া আসিয়াছি—তাহাতে কি এমন অপরাধ করিলাম যে, জেলে যাইব! হাকিমকে কহিলাম,—চাকরি নেই,

হজুর—তাই তার চেষ্টায় সহবে এসেছি! এসে কিছুই মেলে নি, একমুঠো অন্ন অবধি না! মেয়েটাকে শেষে চোরে চুরি করে নিয়ে গেছে!

হাকিমের মুখের ভাবে বোধ হইল, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তারে অভাগা—ভগবান যাহার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহেন না, ক্ষুদ্র মানুষ তাহার পানে চাহিয়া দেখিবে, এমন আশা তুই এখনও করিস!

হাকিম কাগজে কি-সব লিখিয়া লইয়া আমাকে কহিলেন,—একে ছেঁবা করবি? সাক্ষী দিবি?

জেবা! সাক্ষী! তাব অর্থ? কিসের বা সাক্ষী?

আমি একবার চোখ তুলিয়া চারিদিকে চাছিলাম। কাঠের পিঁজরার মধ্যে একটা দর্শনীয় পশুব মত দাঁড়াইয়া-ছিলাম। এক-খাদ্যলত লোক আমার পানে চাহিয়া—আমি মাথা নীচু করিলাম। হাকিম গর্জন করিয়া উঠিলেন,—ছেঁবা করবি?

আবার সেই উদ্ভট শব্দ। যে কথার অর্থ বুঝি না—তাহার কি করবি? বেকবেব মত আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। হাকিম হুঙ্কার তুলিলেন,—একে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাস?

আমি ঘাড় নাড়িলাম—না। এমন করিয়া মিথ্যা যে সাজাইয়া বলিতে পারি, তাকে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব? যাহার দিকে চাহিতে ঘৃণা করে—তাহার সহিত কথা কহিব?

হাকিম হুকুম দিলেন,—সে যেন গানের বাঁধা গানের মত এক-নিখাসে তিনি বলিয়া গেলেন,—ভ'মাসেব জন্ত পঞ্চাশ টাকা জামিন, না দিলে ছ'মাস জেল।

ছোট ছেলেরা সাধা কাগজে যেমন কালির দাগ টানিয়া নিমেষে শুভ্র কাগজখানাকে কালো করিয়া দেয়, হাকিমের কলমের আঁচড় আমার লগাটে তেমনি করিয়া খানিকটা কালি লেপিয়া দিল। সন্ধ্যার সময় আঁটা গাড়ীতে চড়িয়া অসংখ্য চোর-ডাকাত-খুনীর সঙ্গী হইয়া আমি জেলে আসিলাম।

জেলে বসিয়া মৃত্যুর কথা কেবলই মনে হইত। এক এক সময় ভাবিতাম, মাথায় মুণ্ডর মারিয়া, না হয় প্রাচীরে মাথা ঠুকিয়া সব শেষ করিয়া দি। কিন্তু একটা সাধ মনের মধ্যে উঁকি দিয়া আমায় মবিত্তে দিত না। সে সাধ—একবার শোণ তুলিব। যাহার মিথ্যা কথায় বিকৃত সকল-হাওয়া হইয়াও স্বাধীন আমি এই-সব বন্দমা-য়েসের দলে পড়িয়া জেলে পাথর ভাস্তিতেছি, আমার শুভ্র জীবনে ছয়মাস ধরিয়া কেবল কলঙ্কের কালো কালি মাখাইয়াছি,—দেই পায়েৎবে সেই মিথ্যাব একবার চূড়ান্ত শাস্তি দিব। জেলের সঙ্গীরা আমায় টিটকারি দিত, আমি বোকা—মিড! জেল খাটিতেছি! ইহাতে মজা নাই, কেবল সাড়া আছে। চুরি করিয়া, লোককে

মারিয়া-ধরিয়া জেলে আসিলে তাকেই বলে, জেল! নহিলে এ শুধু অদৃষ্টের ভোগ। তাহার বেশ ক্ষুর্ভিত স্তরে বলিত, যাহার উদবে অন্ত নাই, জেল তো তাহার কালীর অন্তস্র। কথাটা নেহাৎ মন্দ শুনাইত না।

ছয়মাস পরে জেল হইতে বাহির হইলাম। বাহির হইয়াই—সেই পথের কথা প্রথমে মনে পড়িল। জোর করিয়া দুগালীকে ভুলিলাম—শ্রীকে ভুলিলাম—নিজের অতীত ভুলিলাম! সে সব কথা মনে পড়িলে মন দুর্বল হয়, সমস্ত শক্তি উবিয়া যায়।

ঘুরিতে ঘুরিতে সন্ধ্যার পর সেই পাহারওয়ালাকে দেখিলাম—সেই মোটা শরীর—বিপুল গৌফ-নাড়িতে সমাচ্ছন্ন বিশ্রী মুখ। সে সেই পানবন্দোক্তানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পান চিবাইতে চিবাইতে পানওয়ালীর সঙ্গে রঙ্গ-বহুস্ত কবিত্তেছিল। দেখিয়া আমার প্রাণে দৈত্য নাচিয়া উঠিল। বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িলাম। দাড়ি ধরিয়া সবলে টানিয়া তাকে ভূমে ফেলিলাম—তার পর অঙ্গ কিল-চড় লাথিতে তাকে বিপদান্ত করিয়া দিলাম। আমার জ্ঞান ছিল না—চোখের সম্মুখে মহা কালী লোল রসনা-মেলিয়া নৃত্য করিতেছিল—করাগিনী কালীকে সেদিন যেন আমি সত্যই প্রত্যক্ষ করিলাম। নৃমুণ্ড-মালিনীর সে কি ভীষণ নৃত্য! চকিতে সে দৃশ্য সরিয়া গেল—চোখের সম্মুখে রক্তের নদী বহিল।

বিস্তর লোক আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল—

পাহারওয়াল। তখন রক্তে স্নান করিয়া অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

তার পর আবার সেই আদালতে হাকিম, উকিল ও পেয়ারার ভিড়ের মধ্যে হাজির হইলাম। পাহারওয়াল। কোনমতে প্রাণে রক্ষা পাইল—কিন্তু তাহার সে ভান্স নাক আর খাড়া হইল না।

আমার দুই বৎসর জেলের ছকুম হইল। স্থির হইয়াই সে শাস্তির আদেশ শুনিলাম। যখন ডক্ হইতে আমায় লইয়া গেল, তখন সে পাহারওয়াল। একদিকে দাঁড়াইয়াছিল—ভান্স নাক—কাটা কপাল—ফাটা মাথা—মাথায় তখনও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া আমি ভাজতে আসিলাম। মনে আনন্দ হইল—জয়ের আনন্দ! সেবার বিনা-দোষে জেলে ঢুকিয়াছিলাম। এবার মনে ক্ষোভ রহিল না, দোষ করিয়া জেলে চলিয়াছি।

উমেশ স্থির হইল। সে ফুঁশিতেছিল। চোখ দুটা জলিতেছিল। সে আরও-কিছু বলিবে মনে হইতেছিল—একটু যেন জিগাইয়া লইতেছে! এমন সময় ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। উমেশ কহিল,—বাবু—

আমি কহিলাম,—বেলা হয়ে যাচ্ছে উমেশ, এখন আবার বেরুতে হবে—। কাজ-কর্ম চুকিয়ে দুপুরবেলা এসে বাকিটুকু শুনবো'খন।

উমেশ কোন কথা কহিল না, আমার পানে চাহিয়া রহিল,—উদাস, ককণ দৃষ্টি!

# যুক্তি

সেদিন রবিবার। ভোর হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঠাণ্ডা জলো হাওয়াব ঘোঁরাঝাও অতিরিক্ত বাড়িয়াছিল। দোতলার বৈঠকধানার সানি প্রভৃতি রীতিমত আঁটিয়া সিগারেটের ধোঁয়ার সহিত বাঙলা মাসিক পত্রের প্রবন্ধের গবেষণাপূর্ণ ভাবগুস্তা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে ছিলাম। কলিকাতার বাস্তাগুলি ছোটখাট নদীব মত হইয়া উঠিয়াছে। দুই-একটা দুবস্ত পল্লী-বালক কলার ভেলা জলে ভাসাইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে সাঁতার কাটিতে-ছিল; তাহাদের সম্ভরণের শব্দ ও উচ্চকণ্ঠের কলবোল মধ্যে মধ্যে আর্দ্র বায়ু-প্রবাহে ভাসিয়া আসিয়া আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছিল।

এমন সময়ে বেহারী আসিয়া কহিল,—একটি বাবু এসেচেন।

এই বর্ষায় বাবু! কোনো ছুরদুষ্ঠ মক্কেল ছাড়া আর কে!

—উপরে নিয়ে আয়—বলিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলাম, এবং ফ্রান্সে সাটের বোতামগুলি আঁটিয়া গলাবন্ধে গলাটা একটু জড়াইয়া অতিথির জগা প্রস্তুত হইয়া বলিলাম। আগন্তুক কক্ষ প্রবেশ করিল। আবে, এ যে প্রিয়বন্ধু সতীশ! আমি সোৎসাহে ঢেয়াবখানা সৈলিয়া দুই হাত সঘিয়া আসিয়া বিজ্ঞাসা করিলাম,—কি হে, সতীশ যে! কবে এলে আশ্রা থেকে?

সতীশ আশ্রায় ডাক্তারি করে।

—চার-পাঁচদিন হলো।

—তা এত বৃষ্টিতে কষ্ট করে এলে কেন? আব কি সময় ছিল না?

—না ভাই, বেশীদিন থাকতে পারব না। বিশেষ দরকারে পড়েই আসতে হয়েছে—আবার পরন্তু বোধ হয় যেতে হবে! এ ক'দিন আসতেই পারিনি; আবার যাবার সময় একবার শ্রীরামপুর হয়ে যেতে হবে।—

শ্রীরামপুরে সতীশের খুঁতবালয়।

—ছেলেমেয়েরা কোথায়?

—আশ্রায়।

তার পর অনেক কথাবার্তা হইল। আর্টেশনব বন্ধু-যুগলের সে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়া কাহারও বিরক্তি-ভাজন হইতে ইচ্ছা করি না।

সে আজ প্রায় দশ-বারো বৎসরের কথা। সতীশের পিতা তখন হুগলীর সবজজ ছিলেন; সতীশরা আমাদের

প্রতিবাদী ছিল। পরস্পরের ছাড়াছাড়ির পর সতীশেব সঙ্গে আমার কংগ্রেস-মণ্ডপে যা ছ'-একবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে।

অনেক কথাবার্তা ও কুণল প্রশ্নাদির পর সতীশ কহিল,—কাব্যচর্চা চলছে কেমন?

সতীশ লোকটা কবি! সাহিত্য-সমাজে তাহাব প্রতিপত্তি নিতান্ত অল্প নয়।

আমি কহিলাম,—মোটো নয়!

বিফাবিত নয়নে সতীশ কহিল—বলো কি হে?

আমি কহিলাম,—হাঁ গুরুদেব! সে বোগ থেকে মুক্তি পেয়েচি!

সতীশ কহিল,—ঠাণ্ডা?

আমি কহিলাম,—তেমন হঠাৎ নয় হে ভায়া। গুট কারণ আছে!

—কি, বলেই ফ্যালো না।

সিগারেটের টিনটা সতীশের দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া আমি কহিলাম,—তবে শোনো—

যখন সতীশ ও আমি এন্টান্স ক্লাসে পড়ি, প্রায়ই তখন Literaty Associationএ সতীশ স্ব-বচিত্ত কবিতা পাঠ করিয়া সকলের নিকট বাতহা পাইত। সেই সময় ব্যগ্র কৌতুহলে একদিন সতীশকে বলিলাম,—আমাকে কবিতা লিখতে শেখাবে? সতীশ হাসিয়া বলিয়াছিল,—একটু ভাবতে শেখো, আপনিই লিখতে পাববে! ঐ দেখ চাঁদ, ঐ দেখ গঙ্গার ঢেউ, ঐ দেখ মেঘেব ছুটোছুটি। একটু ভাবো। দেখবে, ও-সকলে কত কবিত্ব!

আমি গদগদ ভাবে ভক্ত শিষ্যের মত সতীশের কথা শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। কিন্তু হা অদৃষ্ট! সমস্ত চাঁদখানা নিংড়াইয়া সেই ছেলেবেলার কাপাশে বুড়ীর গল্প ছাড়া আর কোন ভাব পাইলাম না; নিরাশচিত্তে ভাবিলাম, আমার Brainটা কি dry!

লোকে বলে, যজ্ঞ কবিলে রত্ন মেলে! চেষ্টার আজ অসভ্য জাপান সভ্যতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিয়াছে; এবং চেষ্টার বলেই নাকি বণিকের জাতি ইংরাজ পৃথিবীর সর্বত্র আপনার অমোঘ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে! হুর্লভ-তপস্শাস্ত্রগতা কবিতা-দেবীও দীর্ঘকাল আমার কালি-কলমের অন্ত্যাচার নীরবে সহিতে পারিলেন না; তাহাকে দর্শন দিতে হইল!

যেদিন ভাল বাঁধানো খাতায় সবদে ও বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিলাম,—

হে প্রতাপ ভারতের বীরচূড়ামণি,  
অদ্ভুত বীরত্ব তব কেমনে বাখানি।

সেইদিন হইতে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে কোথা  
হইতে একটা গুরুত্ব আসিয়া আমাকে বেঁটন করিল।  
সতীশ কবিতা দেখিয়া কহিল—বাঃ, এই যে কিছু কিছু  
ভাবতে শিখিচো! বুঝলে ভাই, Poetry লেখার প্রধান  
mystery হচ্ছে thoughtfulness, ভাবুকতা, তন্ময়তা!

আমি বিজ্ঞের চায় মাথা নাড়িয়া কহিলাম,—সে  
কথা খুব বুঝি—আমাকে আর কি বোঝাবে ভাই?

তাহার পবিত্র

হে ঈশ্বর, অবাক্ত অচিন্ত্য,  
ধরণী না রহিলে কে তোমাকে জানত?

... ..

ওগো নদী, কোথা যাও কুলকুল বেয়ে?  
কাহাব উদ্দেশ্যে, কহ, কোন গান গেয়ে?

... ..

ওগো স্তম্ভবী নীলবসনা,  
শিথিল কবরী, কুম্ভ অবিচ্ছে,  
কি করিছ, অয়ি শোভনা।

প্রভৃতি রাশি রাশি কবিতা আমার মগজ হইতে  
বাতির হইয়া পাতাব পৃষ্ঠায় শোভা পাঠিতে লাগিল।  
তখন আমাকে বাধা দেয়, কার সাধ্য? গিরিদেশ ভেদ  
করিয়া একবার যখন শ্রোতস্থতী ছুটিয়া চলিয়াছে, তখন  
কে তাহার গতিবোধ করে? আমার কবিতা-প্রবাহিণীতে  
প্রকৃতই বান ডাকিয়াছিল, কিন্তু কেমন করিয়া ভাঁটা  
পড়িল, তাহাই এখন বলিতে বসিয়াছি।

সতীশ সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—বলো, আমি খুব  
মন দিয়ে শুনি।

আমি বলিতে লাগিলাম—

এন্ট্রান্স পাশ করিয়া তুমি লাহোর চলিয়া গেলে,  
আমি প্রেসিডেন্সিতে পড়িব বলিয়া কলিকাতায় আসি-  
লাম। হোস্টেলে না থাকিয়া বেনেটোলার একটা কক্ষ  
অধিকার করিলাম, এ সকল সংবাদ নূতন করিয়া আর  
কি দিব? তুমি সমস্তই জানো।

এফ্-এ ক্লাশটার আমার প্রতিভা তেমন ক্ষুণ্ণি পাইল  
না। নূতন কলিকাতায় যাইয়া মিটিং এ্যাটেণ্ড করিয়া  
ও বিয়েটার দেখিয়া কাব্যচর্চার বড় একটা অবকাশ  
মিলিত না; সেই জন্ত এফ্-এ পরীক্ষার ফলটা কিছু  
ভালো হইয়াছিল। পরে যখন বি-এ পড়িতে লাগিলাম  
এবং কলিকাতার নাগরিক জীবনে একটু অভ্যস্ত হইয়া  
পড়িলাম, সহরের মস্ততা ও ব্যস্ত ভাব অবসাদের তৃফান  
তুলিয়া আমাকে আকুল করিল, তখন আবার আমার  
সেই মরক্কো-বাঁধানো স্বদৃশ খাতাখানি খুলিয়া কাব্যচর্চায়  
মন দিলাম। যেসব সকল ছাত্রই এই আকস্মিক প্রাবনে

অগাধিক চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই মেলে আমার  
পাশের ঘরেই গোপাল নামে একটি নিরীহ ছাত্র বাস  
করিত। সে বিপন কলেজে পড়িত। বেচারীর বাড়ী  
বারাশতে। আমার কবিতা-প্রাবন তাহাকেও কিঞ্চিৎ  
বিহ্বল করিয়াছিল—সে কেমন তন্ময় হইয়া আমার  
কবিতা পাঠ করিত, এবং প্রশংসমান নেত্রে আমার প্রতি  
চাহিয়া কহিত,—মম্বথ, এটার বড় excellent ভাব।  
কিন্তু সত্যনাথ নামক একটি ছাত্র তাহা শুনিয়া নিতান্ত  
অধীরভাবে বলিয়া উঠিত,—ভাব বলে ভাব! একেবারে  
যাহ ব'নে যেতে হয়। এ ভাব যখন জমাট বাঁধবে,  
তখন মাইকেল রবি যে কোথায় ভেসে যাবে, তার  
টিকানা নেই!

আমি মনের ভাব মনে চাপিয়া রাস্কেলের মত  
কামনা করিতাম, এবং সেই অবসরে গোপালের সঙ্গে  
সত্যনাথের একটা ছোট-খাট কুক্ষক্ষেত্রের যুদ্ধ বাধিয়া  
যাইত। সত্যনাথ দূর সম্পর্কে বড়-বোঁদীর কি বকম ভাই  
হইত, স্তবরাং আমি তাহার তীল মস্তবাগুলি নিঃশব্দে  
গলাধঃকরণ করিতাম।

শুধু এইটুকু করিয়া যদি ক্ষান্ত থাকিতাম, তাহা  
হইলে বুঝি পরে আর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত না।  
কিন্তু আমি মাত্রা ছাড়াইয়া চলিলাম। বন্ধিমচন্দ্র ও  
মেরি করেলি হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যোপন্যাসিক  
পরগচন্দ্রের পুস্তক পর্য্যন্ত সবই আমি ক্রম করিতে  
লাগিলাম। পাঠ্য পুস্তকগুলোকে নিতান্ত তাচ্ছল্য করিয়া  
দূরে ফেলিয়া রাখিতাম।

উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া আমি “প্রেমিকা” নামে  
একখানা নাতিবৃহৎ কাব্য লিখিয়া ফেলিলাম। গোপাল  
তাহা পড়িয়া বই হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল,—  
ওঃ, it is second বিভাপতি! সত্যনাথ কিন্তু ছ'পাত  
উন্টাইয়া কহিল,—

চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে!

ভস্মরাশি করে ফেল কর্ণনাশা-জলে।

আমি মনে মনে সত্যনাথের আত্মশ্রদ্ধের ব্যবস্থা  
করিয়া কম্পিত ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম—ষ্টুপিড, রাব্কেল,  
তুমি যদি কখনও আমার লেখা পড়ো তো তোমার অতি  
বড় দিব্য আছে।

গোপাল আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া কহিল,  
—সত্যর মত হিংস্রটে যদি দুটি থাকে! সত্যনাথ কহিল,  
—তা বলে তোমার মত ধোঁসামুদি করে আমি কারও  
মাথা খেতে পারি না।

যাক—এটা তুমি বেশ জানো, উপন্যাসের আর একটা  
নাম প্রেমের শ্রাদ্ধ! এই এতগুলো প্রেম-কাহিনীর চর্চা  
করিয়া আমার হৃদয়ে যে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই,  
তাহা মনে করিয়ে না। একে যোমাসের কবি, তার

উপর এই সকল রাশীকৃত উপজ্ঞাসের পুঞ্জীভূত প্রেম ভীষণ কথিয়া আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। আমি সর্বদা শঙ্কিত থাকিতাম, কখন আমার এই স্বদেশ-পরিবাণ্ডে স্বরক্ষিত কৃষিত কেশগুচ্ছে পরিশোভিত কবি-জ্যোতিষিত মাধুর্য্য-পূর্ণ মুখখানির উপর কোন কিশোরী তাহার কঙ্কলকৃষ্ণ নয়নের একটা কটাক্ষ-শর নিক্ষেপ করিয়া আমাকে সম্পূর্ণ জখম করিয়া ফেলে। এ জগতে তরুণ কবিকে অনেক সামলাইয়া চলিতে হয়।

এই স্থানে চুরোটিকার ক্ষুদ্র জীবন ভস্ম হওয়ায় একটি নবীন চুরোটিকা গ্রহণ করিতে হইল।

সতীশ ব্যগ্রভাবে কহিল,—তার পর ?

আমিও চুরোটিকাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইয়া একটি দীর্ঘ ‘আকর্ষণ’ের পর কুণ্ডলীকৃত ধূম উড়াইয়া কহিলাম,—তার পর আর কি। এক দিন রবিবাবুর সেই—

প্রেমের ফাঁদ পাতা জুবনে,

কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে ?

গানটাব অর্থ মধ্যে মধ্যে অমুভব করিলাম।

আমাদের মেশের সম্মুখে একখানি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছিল। তাহার অধিকারী নন্দাবু হাইকোর্টের একজন বিখ্যাত উকিল। একদিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটা হইতে একটি সুমিষ্ট কঠোর সঙ্গীতোচ্ছ্বাস আমাদের মেশস্থ ছাত্রগণের পাঠের বিশেষ ক্যাষাত জম্মাইল। আমার কক্ষ হইতে নন্দাবুর দ্বিঃতলের হল-ঘব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। গোপাল ছুটিয়া আসিয়া আমাকে কহিল,—মহু শুনচো ? কে গাইছে ভাই, দিবিয়া গলা !

আমি জানালাব কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম, কহিলাম,—ঐ যে একটি মেয়ে গান গাচ্ছে।

বালিকা তখন গাহিতেছিল,—

অলি বার বার ফিরে যায়

অলি বার বাব ফিরে আসে

তবে তো ফুল বিকাশে।

গান শুনিয়া নন্দাবুর পরিবারবর্গের সঙ্গে আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হইল। আমার এক সহপাঠীর নিকট নন্দাবুর পুত্র শরৎকুমারের নাম শুনিয়াছিলাম; শরৎ মেডিকেল কলেজে খাড়া ইয়ারের ছাত্র। তাঁহার সহিত আলাপের বেশ একটা সুযোগ ঘটিল। এক দিন ফুটবলের ম্যাচ দেখিব বলিয়া মেশ হইতে বাহির হইয়া দেখি, শরৎকুমারের ম্যাচ দেখিবার জগ্ন বাহির হইয়াছেন। অবাচিতভাবে তাঁহার সহিত আলাপ করিলাম,—কোন কোন প্রেয়ার ভালো খেলে, কোন দলের জিতিবার সম্ভাবনা—প্রভৃতি। অল্পকালের আলাপে শরতের সহিত বেশ একটু সৌহার্দ্য জম্মাইল। একদিন সন্ধ্যার সময় গোল-দীঘিতে বেড়াইতে বেড়াইতে শরৎকে আমি কহিলাম,

—আপনাদের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে গান হয়, শুনতে পাই। আপনি কি গাইতে পারেন ?

শরৎ কহিল,—ও ! আপনি গানের কথা বলছেন ! ও লীলা গায়, আমার ছোট বোন। হ্যাঁ, নেহাৎ মন্দ গায় না !

আমি কহিলাম,—মন্দ কি ? বেশ সুন্দর গায়। আমি পড়াশুনা ছেড়ে গান শুনতে বসে যাই !

শরৎ কহিল,—সে গান আপনার এত ভালো লাগে ! বেশ, কাল রাত্রে আমাদের বাড়ী আপনাব নিমন্ত্রণ রইলো। গান শুনতে যাবেন, আর যদি আপত্তি না থাকে তা হলে এখানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করবেন।

কিরূপ পুলক-কম্পিত স্বরে শরৎকুমারকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, তাহা সহজেই বুদ্ধিতে পারিতেছি !

শরৎ তারমোনিয়মে স্বর প্রদান করিয়া লীলাকে কহিল,—লীলা, রবিবাবুর সেই গানটা গাও !

লীলা প্রথমে একটু সঙ্কোচের ভাব দেখাইল। আমি কহিলাম,—গাও না ! লজ্জা কি ?

এই কয়টি কথা বলিতে আমার সমস্ত শবীর কটকিত হইয়া উঠিল।

অবশেষে লীলা আমার কথায় একটুও মনোযোগ না করিয়া গাহিতে লাগিল,—

সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি নন্দন-ফুলহার !

তুমি অনন্ত নব বসন্ত অত্নবে আমার।

সেই সরলা বালিকার সরল কণ্ঠোচ্ছ্বাসে যে অপূর্ণ বীণাধ্বনি বঙ্কত হইয়া উঠিল, তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হইয়া পড়িলাম। আমার মানস-নয়নের সম্মুখে একটি মাধুরী-মণ্ডিত স্বপ্নপুরী ফুটিয়া উঠিল। জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া, বালিকার অস্তিত্ব ভুলিয়া আমি মনে করিলাম, কোথায় কোন সুখময় নিভৃত কোণে একটি প্রণয়িনী নায়িকা তাহার সুন্দর হৃদয়রঞ্জন নায়কের উদ্দেশে প্রাণের অপূর্ণ ভক্তি-উচ্ছ্বাস নিবেদন করিতেছে ! অনেকগুলি গান হইল বটে, কিন্তু সেই স্বর-রঞ্জন বন্দনাগীতির অপূর্ণ বীণাধ্বর মোহের তুফানে আমাকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট রাখিল।

মস্ত-চালিতের মত মেশে ফিরিলাম। সে রাত্রে শয্যাশয়ন করিয়া বাব বার বার বালিকার কথা ভাবিতে লাগিলাম। বেশ মেয়েটি ! যেমন সুন্দরী, তেমন গুণবতী ! আহা, লীলাব সহিত যদি আমার বিবাহ হয় ! আমার মনে হইল, তাহা হইলে বুদ্ধি, আমি জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী হই এবং আমার এই মরক্কো-বাঁধা কবিতার খাতাখানি সমস্ত কবিতা-সমেত লীলার অঙ্গুলি-হেলনে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিতে পারি।

মনে করিলাম, সকালে গোপালকে ডাকিয়া স্পষ্ট

বলিব, আমি লীলাকে ভালোবাসি; তাহা বা আমাদের পান্টা ঘষ, বিবাহে বাধা নাই; কোন রকমে যোগাড় করিয়া তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ, ঘটাইয়া দাও। কিন্তু সকালে গোপাল যখন আমার ঘরে ঢা পান করিতে আসিল, তখন তাহাকে দেখিয়া ভাবিলাম, ছি, ছি, এ কথাগুলো একে বল্লে এখনই আমাকে পাগল মনে করে হেসে উড়িয়ে দেবে। আট বৎসরের মেয়ে লীলা, তাকে দেখে একজন কবির প্রেম! মেসওদ্ধ একটা কলেঙ্কারী হয়ে পড়েছিল আর কি! ছি, ছি, লীলা লজ্জার কথা!

ইহার দুই একদিন পরে ঠাব থিয়েটারে সকলে মিলিয়া মলিনা-বিকাশ ও বিবাহ-বিভ্রাটের অভিনয় দেখিতে গেলাম। পরদিন অভিনয়ের সমালোচনা হইতেছে, এমন সময় সত্যনাথ কহিল,—ওর ভেতর বিবাহ-বিভ্রাটটা খুব ভাল, মলিনা-বিকাশটা প্রেক্, গাঁজাখুরি! খালি প্রেম, প্রেম! জ্বালাতন করে মেরেছিল!

আমি কহিলাম,—কি! প্রেম গাঁজাখুরি হলো! এমন না হলে বিচ্ছেদ।

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—গাঁজাখুরি নয়তো কি দাদা? It is the production of an idle brain—কৈ, এ পর্যন্ত কাকেও প্রেমে পড়তে দেখে-লুম না তো!

আমি কহিলাম,—কবিদের কথাগুলো তবে সব উড়িয়ে দিতে চাও? কালিদাস, সম্ভবতঃ, বক্ষিমবাবু এঁরা প্রেম নিয়ে এত মাথা ঘামালেন—

এই সময় আমার মুখের কথা লুকিয়া গোপাল বলিয়া উঠিল—সে সব হলো গাঁজাখুরি, আব আমাদের সত্যনাথ বাবু যা বললেন, তাই প্রব সত্য!

আমি গদগদ স্বরে কহিলাম,—প্রেম মিথ্যা! আহা, যদি জগতে কিছু সত্য থাকে তো সে প্রেম।

সত্যনাথ আবার হাসিতে হাসিতে কহিল,—কি তে ভায়া, অত রাগ কেন? কারো প্রেমে পড়েছ নাকি?

আমি মুখ বিকৃত করিয়া ভ্রূদ্ধ স্বরে কহিলাম,—বাও, বাও, তোমার সকল কথায় তামাসা ভালো লাগে না।

বাস্তবিক, প্রেমের মহিমায় আমি কেমন অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম!

মামুষের আভাবিক দৌর্বল্যবশতঃ হউক বা যে কারণে হউক, যে-গোপাল আমাকে উচ্চমঞ্চে চড়াইয়া প্রশংসাকুল নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমি সেই উচ্চ মঞ্চে বসিয়া সেই নিরীহ বেচারির কর্ণমর্দন করিতে কিছুমাত্র বিধাবোধ করিতাম না। বাস্তবিক ইদানীং আমি গোপালের উপর যথেষ্ট উপদ্রব করিতাম। এক দিন সন্ধ্যার সময় সামান্য একটা তামাসায় গোপালের

সহিত আমার বগড়া হইয়া গেল। হতভাগা গোপাল, যাহাকে আমি প্রথম ভাগের গোপালের মত স্তবোধ ও শাস্ত্র মনে করিতাম, সেট কি না বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সত্যনাথকে সব বলিয়া দিল! এই জন্তই কথায় বলে, ভবিতব্য অখণ্ডনীয়।

পবদিন কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিমর্ষভাবে আপনায় কঁকে বসিয়া আছি, এমন সময় সত্যনাথ আমার কঁকে প্রবেশ করিল; সত্যনাথ কহিল,—ই্যারে ময়ু, এ কি শুনিছ? আমি বিবস্ত্রভাবে কহিলাম,—কি আবার? সত্যনাথ কহিল,—শুনচি, তুই নাকি প্রেমে পড়ে গেছিস? আমি উদ্ধতভাবে কহিলাম,—মিথ্যা কথা। কে বললে? সত্যনাথ কহিল,—গোপাল বললে! তুই নাকি তাকে সব কথা বলেছিস!

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলাম,—পাজি, শূয়াব মিথ্যা কথা বলেছে।

সত্যনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,—আনিও তাই বলি! দেগিস্ ভাই, হুঁশিয়াব! গামনে এগ্জামিন—প্রেমে পড়তে হয়তো একজামিনের পর পড়িস্, এখন নয়।

আমি কহিলাম,—ছাখো সত্যনাথ, আমার সম্বন্ধে তোমার অত মাথা ব্যথা করা আমাব বড় খাবাপ লাগে। কেন তুমি আমাকে জ্বালাতন কবো?

সত্যনাথ গভীর স্বরে কহিল,—কারণ তোমাদের সঙ্গে আমাব একটু সম্পর্ক আছে;—আমি প্রকৃত তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

আমি উত্তেজিত স্বরে কহিলাম,—You are too impertinent! তোমার সঙ্গে আমাব কোন সম্পর্ক স্বীকার কবি না।

সত্যনাথ ধীরে ধীরে আমার কক্ষ ত্যাগ করিল।

সেবার পূজার ছুটিতে বাড়ী গেলাম না; দাদাকে লিখিলাম, বাড়ীতে নানা গোলমালে পড়ার ক্ষতি হইতে পারে, এখানে পড়াশুনা নির্বিঘ্নে চলিবে বলিয়া আশা হয়—ইত্যাদি। দাদা লিখিলেন,—বাহা ভালো বুঝিবে তাই করিষো।

বিজ্ঞার দিন আমি কতগুলো সেণ্ট্ সাবান আর একখানি বিবাবুর গানের বহি লইয়া শরৎদের বাড়ী চলিলাম। শরতের সহিত দেখা করিয়া এসেঙ্গের বাক্সটা দিয়া কহিলাম,—তাই পূজার উপহার। শরৎ হাসিয়া কহিল,—এ আবার কি পাগলামি! এ-সব কেন?

আমি কহিলাম,—পূজার দিনে আত্মীয়-বন্ধুকে উপহার দিতে হয়। পরে কহিলাম,—লীলা কোথায়? শরৎ কহিল,—কেন? ওগুলো দেখি!—সাবানের বাস্কেট গায় ও বইখানার উপর লেখা ছিল, “শ্রীমতী লীলার জন্ত



পূজার উপহার।" শব্দ কহিল, লীলাকে আবার এ-সব দেওয়া কেন ?

সত্যই তো, শব্দকে উপহার দিবার অধিকার আছে, কিন্তু লীলাকে এ সব কেন ? ইহার কি সহস্র দেওয়া যায় ? সত্য কথাটা বলিব ? ছি !

সহসা একটা উত্তর যোগাইল। তাড়াতাড়ি কহিলাম,—সে বেশ গান গাইতে পারে কিনা, তাই তার appreciation করে তাকে পুরস্কার দেওয়া যাচ্ছে—এক বাস্তব দেশী সাবান আর একখানা ববিবাবু গানেব বই।

এমন সময় লীলা সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। লীলা কহিল,—বড়শা, বাবা তোমাকে ওপরে ডাকছেন—আমাদের ভাসান দেখতে নিয়ে যেতে হবে।

—ওরে লীলা, তোর সঙ্গে কি প্রাইজ এসেছে দেখ—বলিয়া শব্দ উপরে চলিয়া গেল।

আমি তখন লীলার হস্তে উপহার দ্রব্য দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলাম,—লীলা, এগুলি তোমার !

লীলা প্রফুল্ল ভাবে কহিল,—বাঃ, এ বেশ তো ! এ বুঝি দেশী সাবান ? বেশ গন্ধ—না মনুবাবু ?

আমি কহিলাম,—হাঁ !

অল্পক্ষণ পরে লীলা কহিল,—কিন্তু মনুবাবু, ছোটনা জানতে পারলে আমাকে মেবে হবে এ সাবান কেড়ে নেবে। সেদিন বড়শা আমাকে কেমন একটা পুতুল কিনে দিয়েছিল, ছোটনা কেড়ে নিয়েছে। ছোটনা বড় মাঝে আমাকে।

আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলাম,—না না, কেড়ে নেবে না, আমি শব্দকে বলে দেবো এখন।

—তাই দেবেন। বলিয়া লীলা তেলের শিশিটা দেখিতে লাগিল।

মহ বায়ু কুন্তলগুচ্ছ উড়াইয়া তাহার কপালের উপর ফেলিতেছিল, আমি মুগ্ধভাবে তাহা দেখিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে আবার ডাকিলাম,—লীলা—

—কেন মনুবাবু ?

—তুমি আমাকে ভালোবাস ?

—হ্যাঁ।

—কত ভালোবাস ?—

—খু-উ-ব্।

সরলা বালিকা—এ তো প্রেমিকার কথা নয়। এ কথাটা আমার দিকে অগ্নান বদনে চাহিয়া বলিয়া ফেলিলে ! এতটুকু সঙ্কোচ হইল না ? প্রেম যে সঙ্কোচময় ! হায় ! এটা বুঝি তবে উপহার-দানের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ একটা নীরস কর্তব্য-পালন। আমি নাছোড়বান্দা ভাবে আবার কহিলাম,—লীলা, আমি তোমার বিয়ের জন্য খুব ভালো সৎকর করছি।

—খ্যৎ ! বলিয়া লীলা ছুটিয়া পলাইল ; অবশ্য

পলাইবার সময় উপহার দ্রব্যগুলি লইয়া যাইতে সে তুল করিল না। হায়, এ জগতে নারী-হৃদয় কি স্বার্থপর !

ইহার পরে বাহা ঘটিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া লই। "গাথিকা" কাব্যখানা লিখিতেই অনেক সময় কাটিয়া গেল ; তাহার ফলে দাঁড়াইল এই যে, সে-বৎসর পরীক্ষায় তিনটি বিষয়ই equilateral triangle এর তিনটি side এর মত সমানভাবে ফেল হইয়া বসিলাম ! সত্যনাথ ডবল অনার লইয়া পাশ হইল। ফেল হইয়া যখন জানিলাম যে, গোপালটা ফেল হইয়াছে, তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম। সে হতভাগা যদি পাশ করিত, তাহা হইলে আমাকে আশ্চর্য্য করিতে হইয়াছিল আর কি !

দাদা বলিলেন,—আমাদের কেউ কখনও ফেল হয় নি, তুমি প্রথম ফেল হল।

আমি এখন মস্তকে কহিলাম,—বি-এটা আজ কাল বড় stiff হয়েছে, পাশ করাটা কেবল chance !

—সেজন্য তুমি ফেল হওনি তোমার ফেল হবার কারণ, তুমি একটুও পড়নি

আমি কিছু বলিলাম না। দাদা আবার বলিলেন,—খালি ছাই ভয় লিখলে কি চলে ? ও সব পাগলামী যাবে কবে ? যদি একটুও লিখতে পারতে, তাহলেও না হয় কথা ছিল। কবি হওয়া যতটা সহজ ঠাওরাও, তত সহজ নয়।

দাদা আবার বাগতে লাগিলেন,—তোমার উপর অনেকটা শ্রীশ্রী করেছিলুম, কিন্তু তুমি তেমন শাস্তি দিয়েছ। বেশ, বড় হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, যা' ভালো বুঝবে, তাই করো।

দাদা চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাহিরে মেজ দাদার কথা শুনিলাম। মেজদাদা বলিলেন,—খালি বখানি করবে, তা' পাশ হবে কেমন করে ? এতো ছেলে-বেলা নয় ! তুমি কভা কবে দুটো কথা বলতে পারবে না ? দাদা গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—এত বড় ছেলেকে কি আব বলবো ! যার নিজের একটু আত্ম-সম্মান-জ্ঞান নেই, তাকে বলেই বা ফল কি ! মেজদাদা বলিলেন,—এবার হুগলিতে পড়ুক, অমন ছেলেকে কলিকাতায় পাঠিয়ে আর বিশ্বাস নেই।

এত বড় কথা ! একে ফেল হওয়ার অসহ্য দুঃখ, তাহাতে একবিন্দু সাহস নাহি, কেবল লাজনা ! আমি বড় ক্ষুব্ধ হইলাম, প্রবল দিক্কার আসিয়া আমাব সমস্ত দুঃখ অতিক্রম করিল ; আমি অশ্রু সঞ্চরণ করিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে বৌদি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—ছি ভাই ঠাকুরপো, কীদমে আছে কি ? ফেল কি হয় না ? ও সব অমূল্য।

কল্পস্বরে আমি কহিলাম,—না বৌদি, অদৃষ্টের কোন দোষ নেই! আমার নিজের সমস্ত দোষ।

বৌদি অঞ্চল দিয়া আমার অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন,—তোমার দাদা বড় দুঃখ করছিলেন। উনি বলছিলেন, তুমি যে ফেল হবে, এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। ও সব পাশ-ফেল হওয়া অদেষ্ঠে করে ভাই। তার জন্ত কান্দে না। ছি! এ বছর তুমি নি, আর বছর হবে।

আমি কহিলাম,—না বৌদি, দাদার কাছে কি বলে মুখ দেখাবো। মেজরা কত গাল দিলেন।

বৌদি বলিলেন,—মেজ ঠাকুরপো রাগ করেছে, তার কারণ আছে। তোমাদের মেশেব একটা ছেলে বড় দিনের সময় ওকে লিখেছিল যে, তুমি নাকি কোন্ উকিলের মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেচো। তাব নামে পত্র লেখো, সাবান-টাবান কত কি কিনে উপহার দাও, তাদের বাড়ী গান শুনতে যাও, পড়াশুনা করো না,—সেইজন্তই ও-সব কথা বলেছে। সত্যি, এ বকম ঠাট্টা করা তার পক্ষে ভারি অজ্ঞান হয়েছিল।

বৌদিকে আমি মার মত ভালোবাসি। তাঁহার মুখে এই কথা শুনিয়া লজ্জায় আমি মস্তক নত কহিলাম। আমার মনে হইল, আজ বৃষ্টি বিশেষ লোক লাঞ্ছনার দণ্ড তুলিয়া আমাকে চূর্ণ করিবার জন্ত চকস হইয়া উঠিয়াছে।

কল্পস্বরে আমি কহিলাম,—বৌদি, তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করছি, এ বৎসর সব আমোদ-আহ্লাদ বিসর্জন দেবো, হুগলিতেই পড়বো। যদি পাশ হই, তবেই সকলের সঙ্গে মিশবো, নাহলে—

আমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বৌদি কহিলেন,—এখন এসো, তোমাকে ডাকবার জন্ত মা আমাকে পার্টিয়ে দিলেন। আমার কথা তুমি কোন দিন অগ্রাহ করনি—আমাকে তুমি চিরকাল

ভালবাস,—আমার উপর কখনও রাগ করো না! এসো লক্ষ্মী ভাইটি, এস, স্নান করবে এসো।

বৌদির অমূল্য স্নেহে আমি তাঁর ক্রীতদাস—তাঁর স্নেহের অনুরোধ এড়াইতে পারিলাম না।

সেই দিন রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বে আমি শ্রীমতী কবিতা স্মারী ও শ্রীমান্ প্রেম-স্মারকে প্রণাম করিয়া কহিলাম,—দোহাই দেবী, দোহাই দেব! এ লাক্ষিত দীন দরিত্রকে মুক্তি দাও। আমাকে লইয়া যথেষ্ট খেলা করিয়াছ। এখন অনুগ্রহ করো, মুক্তি দাও।

তার পরদিন হইতে উভয়েই অন্তর্জ্ঞান হইলেন!

তবে শ্রীমতী স্নেহের মত বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীমান কিন্তু বেলা দেবীর অঞ্চল ধরিয়া আসিয়া আবার আমার স্বন্ধে ভর করিয়াছেন।

সত্যি কহিল,—আর লীলা?

আমি কহিলাম,—আমার বিবাহের ছ' মাস পরে আমারই যত্নে ও আগ্রহে আমার একমাত্র শ্রাসকস্মারের সঙ্গে তার পরিণয় সম্পাদিত হয়েছে। বাঙালীর মেয়ে ডে'পোমির জন্ত চিবপ্রসিদ্ধ, এ কথাটা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করে না,—সেই তো লীলা, এখন স্বস্তর-বাড়ী গেলে তারই practical joke-এর চোটে আমাকে ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তে হয়!—হ্যাঁ, ভালো কথা হে! আজ এখানেই গেয়ে যাও। বৃষ্টিব দিনে খিচুড়ি-টিচুড়ি হচ্ছে। শ্রীমতী বেলা নিজের হাতে সব তৈরী করছেন।

সত্যি কহিল,—চমৎকার বলেচো তো! সে খাশা হবে। মোদ্দা, বেশ একটি romantic comedyর যোগাড় করে তুলেছিলে!

আমি হাসিয়া কহিলাম,—হ্যাঁ, তবে comedyটা কিছু farcical!

# বোমায় বেকুবি

ছিলুম মিহিজামের স্মরণপাহাড়ীতে শিবরাম বাবুর অতিথি হয়ে। সকালে-বিকালে প্রাণপণে বেড়ানো, জুপুর আর রাত্রে নলিনীর গান শোন!—দিনগুলো বেপথোয়া কেটে যাচ্ছিল। সেদিন সকালে চায়ের সঙ্গে মিহিজামের উৎকৃষ্ট জিলাপী ভোজন করছি, এমন সময় মধুপুর থেকে নিমন্ত্রণ-পত্র এসে হাজির! নলিনী গেয়ে উঠালা,—যত্ন-পতি, মধুপুর চলো।

ট্রেন বেলী আটটায়। চটপট সকলে তোয়েব হয়ে ষ্টেশনে ছুটলুম। ষ্টেশনের দক্ষিণে রূপনারায়ণপুরের বাক অঙ্কচন্দ্রাকৃতি রূপ ধরে পড়ে আছে—পাহাড়গুলো ওধারে দাঁড়িয়ে তাদের ভীমকাস্তি রূপ নিয়ে। গিরিজা বেঞ্চে বসে সিগারেট ধরালে, নলিনী টিকিট কিন্তে গেলো—১১১ নম্বরের, অর্থাৎ খার্ড ক্লাশের টিকিট। আমি প্লাট-ফর্মে পায়েচাতি করতে লাগলুম।

ষথানময়ে ট্রেন এসে হাজির হলে তিনজনে ইউরো-পীয়ান ছাপ খাঁটা একখানা খার্ডক্লাশ কম্পার্টমেন্টে উঠে বসলুম। সে-কামরায় একটা অপূর্ণ-মূর্তি লোক বসে-ছিল। মাথার চুল তার উন্মোখস্কা, পাংসা লম্বা দাড়ি—সেগুলোর দিকে দাড়ির মালিকের মোটে লক্ষ্য ছিল না—নেহাং বুনাভাবে অথবের মধ্যে তার স্বাভাবিক গতিতে সে দাড়ি বেড়ে উঠেছে। তার গতি বোধ কববার বা তাকে ছেঁটে-কেটে দেবার জ্ঞান কোন দিন তার মালিক যে হাত উঠিয়েছে, তা মনে হয় না। লোকটার মূর্তি সংয়ের মত!

ট্রেনে চড়ে নলিনী গান ধরে দিলে,—আজ আমাদের ছুটা রে ভাই আজ আমাদের ছুটা!

গিরিজা তন্দ্রাস্তিমিত-নেত্রে সে-গানের মাধুর্য উপভোগ করতে লাগলো, আর আমি সেই লোকটাকে খুব সন্দিগ্ধভাবে লক্ষ্য করছিলাম।

লোকটার আকৃতি থেকে মনে সন্দেহের কেমন একটা কালো ছায়া ঘনিষে উঠেছিল। এ-গানের দিকে তার হৃৎ ছিল না। কামরায় গান চলেছে, এ ব্যাপারটি যেন সে বোঝে নি! সে বাইরের পানে তাকাচ্ছিল মাঝে মাঝে, আর আমাদের উপর দিয়েও থেকে থেকে এক-একবার দৃষ্টির পশলা বুলিয়ে নিচ্ছিল। সঙ্গে তার একটা পুঁটলি, ময়লা কাপড়ে বাঁধা। কখনো বা সেই পুঁটলির গায়ে কাণ পাতছিল, যেন অত্যন্ত কাহিলি বোগীব বৃকের কাছে কাণ নিয়ে গিয়ে কোন নিপুণ ডাক্তার তার

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া পরীক্ষা করছে,—তেমনি অথগু মনো-যোগে তেমন সম্ভরণে!

ট্রেন জামতাড়া ছাড়িয়ে কক্ষাটাবে পৌঁছল। লোকটা বরাবর ঠিক এক ভাবে বসে—একই ভঙ্গীতে। নড়া-চড়া তার রহিত, যেন মাটির পুতুল!

ট্রেন কক্ষাটার ছাড়ালে লোকটা ঘুম ঢুলে পড়লো।

আমি তখন চকল হয়ে উঠলুম—কক্ষাটার আর মধু-পুরের মাঝখানে মদনকোটার কাছে পাঞ্জাব মেল সেদিন যে তিন-তলার সমান উচু লাইন ছেড়ে একেবারে মাঠের গভীর গহ্বরে ঝরে পড়েচে, তাই দেখবার জ্ঞে!

ট্রেন চলেছে মুহূর্ত্ত গমনে—সামনে অব্যবহিত মাঠ পড়ে আছে নিগন্ত-রেখার তট ঘেঁসে, অঙ্গে তার সবুজের চেউ খেলে যাচ্ছে। স্বচ্ছ নির্মল আকাশ মাথার উপর বিরাট স্তব্ধতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাই দেখছি। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ট্রেন ক্রমে জয়ন্তীর পুলে উঠলো। উপরে একটা ঘড়-ঘড় শব্দ সুরু হলো, আর নীচে, বহু নীচে কোথায় কোন্ পাতাল-পুরীর বৃকে বালিব বিপুল বিস্তার—তার গা চিরে চিরে জ্বলের স্রব ধারা কোথাও বধে চলেছে,—কোথাও বা বন্ধ জল। এত নীচু যে চেয়ে দেখতে গেলে চোখ ঠিকরে যায়। আকাশে বকের পীতি উড়ে চলেছে—ধানের ক্ষেতে কোথাও বা তারা বসছে। ট্রেন ক্রমে মদনকোটা পেলো। তার পরেই লাইনের পশ্চিম দিকে গাড়ীর চাকা, ভাঙা এঞ্জিন।

আমাব শরীর শিউরে উঠলো। উঃ, কি প্রকাণ্ড হত্যা-শালা এখানে গড়ে উঠেছিল সেদিন সেই গভীর রাত্রে। আমার গা ছম্ছম্ করছিল—ফিরে বন্ধুদের বললুম—এখনো ভাঙ্গা গাড়া পড়ে আছে হে!

কিন্তু কে শোনে, সে কথা! গায়ক আর শ্রোতা দুজনে তখনো গানের সুরে, সুরের নেশায় বিভোর মগ্ণ। নলিনী তখন গাইছে,—

মেঘের কোলে কোলে

যায় রে চলে বকের পীতি!

তখনি আবাব সেই উল্লুটে স্বাতীটির পানে আমার নজর পড়লো। সে বেশ ঘুমুচ্ছে, তার সেই পুঁটলিটির উপর একখানি হাত রেখে। পুঁটলির মধ্য থেকে একটা বাদামী কাগজের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। আমার ভারী

কোঁতুহল হলো, কি চীজ যে এত যত্নে ওটাকে আঁকড়ে রয়েছে! নিশ্চয় চোরাই মাল! কিছু চুরি করে দেশে পালাচ্ছে। কিন্তু না—দেশ কি—এ তো দেখছি, বাঙালী! তবে?

অজ্ঞায় কোঁতুহল, সন্দেহ নাই—তবু সে কোঁতুহল দমন করতে পারলুম না। আস্তে আস্তে উঁকি দিয়ে তার তল্লা পরীক্ষায় অগ্রসর হলুম। একটু ঝুঁকতে শুনি, পুঁটলির মধ্যে থেকে একটা কি আওয়াজ হচ্ছে! যেন কি কল চলছে!

ফশ্ কবে মনে হলো—তাইতো, মধুপুরের সামনে ট্রেন ডি-রেল করবার জগা ষ্ট্রাইকাররা চেষ্টা করেছিল, এ তাদেরই একজন নয় তো? হয়তো আর কোথাও আর-কোন বড় রকমের বিপদ বাধাবাব জগা অগ্রসর হয়ে চলেছে! ওর পুঁটলিতে বোমা নেই তো?

গা ছম্ ছম্ কবে উঠলো। মদনকোটর ঐ গ্রাম-প্রান্তরে অমনি আতত নব-নারীদের বস্ত্রাক্রম মুগ্ধলাব শ্রুতি আমার মনেব মধ্যে তার দারুণ লোমহর্ষণ ছবি ফুটিয়ে জেগে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে হীরোর রূপে সারা দেশের সামনে ফুটে ওঠবার এক দুর্দমনীয় লোভও জন্মালো। এই লোভ মুহূর্তের জগা আমার উদ্ভাস্ত করে তুললে—আমি যেন জ্ঞান হারালুম!

তারপর কখন যে নিমেষে মধ্যে আমি তার হাতের থাঙ্গ থেকে সেই পুঁটলিটা ছিনিয়ে নিলুম,—সেটা হাতে ভাবী ঠেকেছিল,—আব সে অকস্মৎ ঘুম ভেঙে দাঁড়িয়ে উঠে আমার সিংহের মত বিক্রমে আক্রমণ করলে, আমি তাব সে আক্রমণ ব্যর্থ করে পুঁটলিটা ছুড়ে বাইবে ফেলে দিলুম—তার কিছুই খেয়াল ছিল না। হঠাৎ জ্ঞান হলে দেখলুম, গিরিজা আব নলিনী দুজনে আমাদেব মাঝখানে

দাঁড়িয়ে রয়েছে, আর সে লোকটা পাগলের মত কখনো মাথা চাপড়াচ্ছে, কখনো বসে পড়ছে, কখনো বা দাঁড়িয়ে উঠে কক্ষবরে আমার গাল দিচ্ছে! আমি তো হতভয়।

হঠাৎ লোকটা বিড় বিড় করে কি বকে ট্রেনের এ্যালার্ম সিগনাল টেনে দিলে—মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনখানা খট্ করে থেমে গেল। তাবপর বিপুল গগুগোল বাধলো।

গার্ড, ড্রাইভার, যাত্রী—সদলে ছুটে এলো এবং সেই বিপর্যয় গগুগোল থেকে আসল ব্যাপার বোঝা গেল, লোকটা ঘড়িওয়ালো—মধুপুরে কোন্ বাজা বাড়ী তৈরী করাচ্ছেন, তাঁর বাড়ীর টাওয়ারে একটা ঘড়িব জগা অর্ডার দেন কলকাতায়। লোকটা সেই ঘড়ি দস্তুরমত রেগুলেট করে সবত্রে নিয়ে আসছিল মধুপুরে, সেটাকে টাওয়ারে বসাবার জগা। আমি তার সেই ঘড়ি ছুড়ে ফেলে দিয়েছি!

আমার কৈফিয়ৎ তলব হলো। আমি বললুম, মদন-কোটাব সেই কাণ্ডের চিহ্ন দেখে আগাব মাথা কেমন বিগড়ে গেছিলো! আমি ভেবেছিলুম, লোকটা ষ্ট্রাইকার, আর তার তল্লাতে বোমা! তাই সেটা ফেলে দিয়েছি।

হুঁচারজন কুলি গিয়ে ঘড়িটা তুলে আনলো। আচ্ছা জান্ তাব! প্যাকেট খুলে দেখা গেল, ঘড়িটা দিব্য চলছে—কোনোখানে জখম হয়নি!

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হলো না—জের গড়ালো আদালত পর্যন্ত। সেখানে লড়ালড়ি করার পর হাকিম আমার ছেড়ে দিলেন—mistake of facts বলে।

পশ্চিম-যাত্রাটা সেবাব খুব দীর্ঘ হয়েছিল—এখন তিন বহব আর ওভাবে পা বাড়াবো না, স্থির করে নেবেছি।

# দেশের জন্য

১

জানুয়ারি মাস। মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাসে হাড অবধি ঝন্ ঝন্ করিতেছে। অতিরিক্ত বরফ পড়ার দরুণ শীতটা খুবই বাড়িয়াছিল।

পাড়ারগাঁ। মেটে বাস্তা দিয়া কতকগুলি লোক শব বহিয়া আনিতেছিল। বেতাবাদেব প্রক্ষে ঝোলা; তাহাবই মণ্ডে মৃতের দেহ; ঝোলাব চাবিধার ধব ধবে সাদা কাপড়ে ঢাকা।

ঝোলাব পিছনে একটি লোক; বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর। সে একখানি বিকশ গাড়ী টানিয়া আনিতে-ছিল। গাড়ীতে ছোট ছোট ছেলে—মুখ দুটি শুকাইয়া গিয়াছে—গায়ে একখানি লাল কল্ল অড়ানো, তবু তাহাদের শীত ভাঙ্গিতেছে না।

ঝোলাব মধ্যে তাহাদের মার মৃত দেহ। যে বিকশ টানিতেছিল, সে তাহাদের বাপ। রাত্রি ঘুম ভাঙ্গিলে তারা চাতিয়া দেখে, ছোট ঘরখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে, মার মুখে কথা নাই—আর মার হাতখানি ধরিয়া মার বিছানায়া বসিয়া তাহাদের বাপ কাঁদিতোছিল।

তাবপর বাপ যখন একটিও কথা না বসিয়া, তাহাদের মুখে চুমা দিয়া বিকশতে বসাইয়া দিল, তখন তাহারা মনে করিল, বুঝি অজ্ঞ দিনেব মত বেড়াইতে চলিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞ দিনেব মত বাপের মুখে আশ্বাস নাই—‘মাটির দিকে চাতিয়া দীরে দীরে সে বিকশ টানিতেছিল, মুখে কথা নাই। দেখিয়া শুনিয়া ছেলেহুটির মন কি এক হুঃখে ভরিয়া আছে।

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া সকলে সহরের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। চারিধারে তখন আঁধার নামিতেছে, এবং ছেলেহুটির চোখেও ঘূমে ভরিয়া আসিয়াছিল।

চোখ মেলিয়া তাবা দেখে, মন্দিরের মেঝেয় মাহুরের উপর শুইয়া আছে। উঠিয়া ছোট ছোট খালায় দুইজনে ভাত খাইল, আর ছোট পেয়ালা ভরিয়া দু’পেয়ালা চা।

তাবপর বিকশ চড়িয়া বাড়ী ফিবিয়া আসা। আতা, বাড়ী। সুখের বাড়ী! কিন্তু মা কোথায়? মাব বিছানা খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে। কোথায় মা? ছোট খোকা মাকে না পাইয়া কাঁদে! সূর্যের আলো ঘবে আসিয়া পড়িয়াছিল। জানালাব ধারে বাপ ঝাঁড়াইয়া আছে, তার চোখে জল।

২

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ। আকাশে-বাতাসে বসন্তের ঢেউ লাগিয়াছিল। বারান্দায় ছোট গাছগুলিতে নীল ও সাদা বড়ের অসংখ্য ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মিষ্ট গন্ধে সমস্ত গ্রামখানি ভরপূর।

বিকশ গাড়ীর আড্ডায় ‘তক্তকে’ সাজানো গাড়ী-গুলি। পাশে বেচারাগুলি বসিয়া-দাঁড়াইয়া ‘পাইপ’ টানিতেছে—কেহ-বা গল্প করিতেছে! দূবে ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। ব্যাপার কি জানিবার পূর্বে একটি লোক ‘খবরা’ ‘খবরা’ বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

সকলে বিহ্বলেব মত কানিয়া উঠিল! যে যেখানে ছিল, খবর কিনিবার জগা সকলেই ছুটিয়া আসিল। ছুটি করিয়া “সেনে’র বিনিময়ে এক এক খণ্ড কাগজ কিনিয়া ফেলিল। পথে রীতিমত ভিড় জমিয়া গেল।

যুদ্ধ বাধিয়াছে! যুদ্ধ! সকলেব প্রাণে জোয়ার বহিয়া গেল। নারী, বালক, বোন্ধা—সকলের মনে বাজনা বাজিয়া উঠিল! উত্তেজনায়া বক্ত নাচিয়া উঠিল! দেশেব জগা আছ কাছ করিবার সমস্ত আসিয়াছে!

সকলের ডাক পড়িয়াছে। সকলকে যাইতে হইবে। বিধবা জননীবা একমাত্র পুত্র, আতুবা ও নারী ভিন্ন সকল-কেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। টোকাটিকে তো বটেই! এখন এই ছেলেগুলিভ ভার কে লয়! আর, এই মাতৃহারা ছোট শিশুটি? কাহারো হাতে ইহাদের ভার দিতে পালিলেই নিশ্চিন্ত মনে যুদ্ধে বাওয়া যায়!

সারা দিন ধরিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়ানো সার হইল, ...কেহই ছেলেগুলিভ ভার লইতে চাছিল না!

পবদিন খোকাকে থলিভ মধ্যে লইয়া পৃষ্ঠে বাধিয়া, বড় ছেলেটিকে বিকশতে বসাইয়া সে পথে পথে ঘুরিল; আছ চিরদিনেব জগা ছেলেগুলিকে সে বিগাইয়া দিবে! কিন্তু লইবে কে? সকলেবই নিজেদের ঝঞ্জাট আছে—বেচারাকে কেহই সাহায্য করিল না।

৩

কাল তাহাকে সৈন্তদলে যোগ দিতে হইবে। নহিলে কারাদণ্ড। বিচারে সকলের সম্মুখে কুকুর-বিড়ালের মত তাহাকে গুলি করা হইবে! বন্দুকের গুলিতে মৃত্যু!

কি সে লজ্জা, কি সে অপমান। কথাটা ভাবিয়া তার বুক ছুঁ-ছুঁ করিয়া উঠিল। মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিল।

ধীরে ধীরে বিছানা জাড়িয়া সে উঠিল। ছেলে তিনটি ঘুমাইতেছিল। ঘরের আলো নিভ-নিভ হইয়া আসিয়াছে—ছেলেদের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু বড় ছুরিখানা কোথায় থাকিত, টোকিটির তাহা মনে ছিল।

হাঁ—এই সে ছুরি! বাঁট দেওয়া বড় ছুরি, তাহার শৈশবের সঙ্গী! ইহাবই সাহায্যে কত জঙ্গল সে পরিষ্কার করিয়াছে, কত চোবের প্রাণ নিষাছে! হাত বুলাইয়া টোকিটি দেখিল, এখনও ধার পড়িয়া যায় নাই! তবে এক-আধ জারগায় মরিচা ধরিয়াছে। শাণ দিলে ভালোই হয়। ধীরে ধীরে শাণ-পাথরখানি খুঁজিয়া সে বাহির করিল।

'শুশ্ব'! পাথরে ছুরি ঘষা হইল। ছুরিখানা জীবন্ত মানুষের মত শব্দ করিল, 'শুশ্ব'! সেই নিভ-নিভ আলোতে একবার সে ছেলেদের মুখের পানে চাহিল। কি নিশ্চিন্ত ঘুম! নিশ্বাসের শব্দটুকু শুধু শুনা যাইতেছে, আর কিছু না, এমন নিশ্চিন্ত।

দূবে মন্দিরের ঘটাঘ বাজাটোর ঘা পড়িল। কি ভীষণ শব্দ! একটি ছেলে পাণ করিল। তাহার হাতখানা লেপেব বাহিরে পড়িল। টোকিটি তাহাদের শিয়রে স্থির হইয়া বসিল। ঘরের আলোটুকু দপ করিয়া নিভিয়া গেল।

অন্ধকার! চোখে কিছু দেখা যায় না। আগে থোকা! কি জানি, যদি তাব চঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া যায়! যদি সে চীৎকার করিয়া ওঠে! সে শব্দে আর দুইটির ঘুম ভাঙিতে পারে! তাহা হইলে সব ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

আহা, ছোট গলাটুকু! কি নরম! ঠিক জায়গাটি! আপানীরা জানে, কোথায় ছুরি বসাইলে ব্যথা অল্প লাগে।

তার পর, মেজোটি! শীঘ্র—এখনো হাতে বল আছে, হাত দৃঢ় আছে! বড়টির ঐ ঘুম ভাঙিল না?

না। সে আবামে ঘুমাইতেছে। এইবার তার পালা! এটিই না প্রথম? আর এখন শেষ চিহ্নটুকু। এই তো সে দিনের কথা। নাম-করণের জন্ত কিশোরী স্ত্রীর কোলে ছেলেটি নিয়া সে মন্দিরে গিয়াছিল। তাহার হাতে কবচ বাঁধিয়া দেওয়া হইল—কবচের গুণে হৃদয়খানি সকল গুণে ভূষিত হইবে,—মন সাহসে পূর্ণ হইবে। সে তো এই সেরিনের কথা! কিন্তু আজ? আহা!

হাত কাঁপিয়া উঠিল! একবার!

কপাল হইতে এক ফোঁটা ঘাম বরিয়া ছুরির বাঁটে পড়িল। ছুরিখানা হাত হইতে পিছলাইয়া যায়! তবে কি পারিবে না? এত হুঁসল হাত! না! কখনও না।

শেষ! সব শেষ! বলি শেষ! দেহগুলি কবলে জড়াইয়া সে বিকশতে তুলিল—তার পর বিকশ টেলিয়া পথে বাহির হইল।

আর কিছুদিন পূর্বে এই পথেই সে বাহির হইয়াছিল। সে দিন তাহার চোখে জল ছিল, কিন্তু আঁজ নাই! সে দিন আপনার বলিতে যেন কিছু ছিল, আজ কিছু নাই, কেহ নাই—আছে শুধু নিজের জন্মভূমি। দেশ! সোনার দেশ!

তখন রাত্রি শেষ। পাহাড়ের পিছনে চাঁদ উঠিতেছিল! তাহারই আলোকে কবরের স্থানটুকু খুঁজিয়া লওয়া যায়।

ছেলে তিনটিকে তাহাদের মাঘের পাঘের কাছে শোয়াইয়া সে কবরে মাটি চাপা দিল; উপবে ছোট ছোট তালের চারা রোপণ করিল। কি আশ্রমেই ছেলেগুলি এখন ঘুমাইয়া বাঁচবে! আঃ! সে-ও যদি আজ তাদের পাশে একটু স্থান করিয়া লইতে পারিত!

কিন্তু না! তার জঙ্গ বিদেশের সমরক্ষেত্র বুক পাতিয়া রাখিয়াছে, সেইখানে সে বিবাম লাভ করিবে। এখানে তার স্থান নাই! চলো টোকিটি, এখানে নয়।

টোকিটি হাঁটু গাড়িয়া ভগবানকে একবার ডাকিল।

৪

ভোরের আলো ফুটিতেছে। ধীরে ধীরে টোকিটি মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরে সোপানের নিম্নে পাথরের চৌবাচ্চার জল ছিল। দেব-দর্শনে আসিয়া পাপীরা এই জলে হাতের কালিমা ধুইয়া ফেলে। ভালো করিয়া এই ভলে সে হাত ধুইল।

হাত ধুইয়া সে আচার্য্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একে একে সব কথা বলিল। আরো বলিল,—এখানকার কাজ আমার শেষ। এখন রাজার জঙ্গ নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। এখানি নিন—এই শেষ! আর আমার কিছু নাই। মন্দিরের দ্বারে আমার বিকশ আছে, সেখানিও রাখিবেন! এখন আমি বিকশ—সর্বস্বাস্থ্য।

কথা শেষ করিয়া লাল কবলখানি আচার্য্যের হাতে সে তুলিয়া দিল, তার পর ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

৫

মার্চ মাস। ব্রিহৎ প্রভাত। সমস্ত সহর সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দশ হাজার পতাকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝলঝল করিতেছে। পথে আবার লোকের ভিড়। সৈন্য-বারিকের ফটকের সম্মুখে ভিড় আরও বেশী! এখনি সৈন্যদল বাহির হইবে।

তেরো বাঁজিয়া উঠিল। সৈন্তদের নাম-ডাক আবস্ত হইল। স্বদেশে বুঝি এই শেষ নাম-ডাক।

—টোকিচি মৎসুসিমা!

—হাজির!

দশ মিনিট মাত্র! উৎসাহে, আনন্দে, গর্কে, সৈন্তদল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সবার চেয়ে অধিক আনন্দ, অধিক উৎসাহ, অধিক গর্ক, আজ টোকিচির!

খুনী? হাঁ, অপরের চক্ষে খুনী হইতে পারে! কিন্তু আপানোর চক্ষে সে মহাপুরুষ! জন্মভূমির বেদীর সম্মুখে সে কি আজ আপনাদের অস্তিত্ব অবধি বলি দেয় নাই?

দেশের জন্ম কি আজ সর্ব্ব স্বত্যাগ করে নাই? আপনাদের বলিতে আজ আর সে কিছু রাখে নাই। দেশের জন্ম সব,—সমস্ত দান করিয়াছে।

\* \* \* \*

দূরে পাহাড়ের ধারে ছোট গ্রামে এক আচার্য্য কবচ বিতরণ করেন। এ কবচ ধারণ করিলে নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কবচগুলি তিনি স্বহস্তে রচনা করেন। সেগুলি এমন কিছু অদ্ভুত সামগ্রী নহে, ছোট কপালী সূতার জড়ানো রক্ত-মাখা কবচের টুকরা।

# লক্ষ্মীলাভ

১

জুল সিকো একজন পাকা ব্যবসাদার। কড়াক্রান্তি-টপ তাতার হিসাবে বাদ পড়িত না। লোকে বলিত, জুল সিকোর লক্ষ্মীশ্রী আছে! কিন্তু এই লক্ষ্মীশ্রীটুকু অর্জন করিতে জুল সিকোকে কি পরিমাণ বুদ্ধি খেলাইতে হইত, লোকে তাতার বড় খোঁজ রাখিত না।

সিকোর বাড়ীর পাশে মাগ্নোবেব বাগান-বাড়ী। মাগ্নোব বৃদ্ধ—সংসারে পুরানো চাকর জন ভিন্ন তাতার দ্বিতীয় সঙ্গী নাই।

মাগ্নোবেব জমিটুকু উপর সিকোর লোভ পড়িয়াছিল। কিন্তু মাগ্নোর কিছুতে সেটুকু ছাড়িবে না। সে জিন ধরিয়া বসিয়াছে,—এখানে জন্ম লইয়াছি, এখানেই মরিব!

মাগ্নোবেব বয়স বাতান্তর বয়স। তাড় কয়খানি এখনো বেশ মজবুত। তাতার দেহশিগুটাকে এখনো কিছুকাল ধরিয়া রাখিতে সমর্থ বলিয়া মনে হইত।

মাগ্নোবেব বাড়ীর দ্বারে আসিয়া সিকো প্রায় তাতার পবন লইত। কোনদিন সে মাগ্নোরকে এতটুকু অপ্রসন্ন দেখে নাই, ইতাই ছিল সিকোর প্রধান বেদনা!

একদিন সিকো আব স্থির থাকিতে পারিল না। মাগ্নোরের নিকট আসিয়া ডাকিল,—মাগ্নোর!

—কেন?

—তুমি তা হলে তোমার জমিটুকু বেচেবেনা? তোমারি ভালোব জন্ম বলজিলুম।

না! বার বার ও কথা আর কেন?

সিকো কহিল, বেশ!—তা আচ্ছা, একটা বন্দোবস্ত করলে হয় না? দু'পক্ষেই তাতে লাভ আছে।

মাগ্নোর কহিল,—কি?

—তুমি জমিটুকু আমাকে বেচে ফেল—অথচ দখল ছেড়ে না। অর্থাৎ, কথাটা এট—

মাগ্নোর বলিল।

সিকো বলিল,—ব্যাপারটা তবে খুলে বলি—প্রতি মাসে তুমি আমার কাছ থেকে নব্বই টাকা পাবে—অথচ তুমি এই জমিতেই বাস করো—কোন তফাৎ নয়—সিক এখন ধৈর্যমণ্ড আছে! কেবল প্রতি মাসে ঐ টাকাটা পাবে। বুঝেছ?

মাগ্নোর কথাটা ভালো বুঝিল না, তবে এইটুকু বুঝিল যে, ইহার মধ্যে বেশ একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে!

সে কহিল,—তা বঝলুম, কিন্তু তোমার লাভ? তুমি তো জমি পাচ্ছে না!

সিকো মুগ্ধ হাঙ্গিল। সে কহিল,—“তাতে কি এসে যায়? যত দিন তুমি বেঁচে থাকবে, তত দিন কে তোমার দখল ছাড়ায়? কেবল তুমি উকিলের বাড়ী গিয়ে একখানি দলিলে সচি করে দেবে যে, তোমার মৃত্যুর পর এই জমিতে আমার অধিকার, ওয়ারীশনক্রমে। তোমার পুত্র-পৌত্র নাই, মৃত্যুর পর কোথাকার দূর-সম্পর্কীয় কতকগুলো ভাইপো-ভাইকী, যারা তোমার সুখ-দুঃখের কোন খোঁজ-খবর চায় না—তারা এই জমি নেবে! তাদের দেবার চেয়ে আমাকে দেওয়াটা সঙ্গত নয় কি? বিশেষ, আরো যখন তুমি মাসে মাসে আমার কাছ থেকে এই টাকাটা পাবে? লাভটি তোমারই মাগ্নোব—আমার শুধু ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা!

বৃদ্ধ বিস্মিত হইল! এতগুলো টাকা! কোন ক্ষতি নাই—বিন্দুমাত্র অস্ববিধা নাই! মাগ্নোর কহিল,—“একটু ভাবিয়া দেখি সিকো, কাল তোমাকে জানাবো!”

সিকো মুগ্ধ হাঙ্গিয়া গুঠে ফিবি। তাতার আশ্রয় খুব আনন্দ হইয়াছিল—যুদ্ধ-জয়ের পর প্রায় নৃপতির যেমন আনন্দ হয়, সিকোর আনন্দ তাতার অপেক্ষা কিছুমাত্র নূন নহে!

সোদন রাতে মাগ্নোরের ভাল নিদ্রা হইল না! প্রস্তাবটা লোভনীয়, কিন্তু অযাচিতভাবে সিকোর এতখানি ক্ষতি স্বীকার করায় সার্থকতা কি! মাগ্নোর অস্থির হইয়া উঠিল।

পূর্বদিন প্রত্যুষে মাগ্নোর চুপি চুপি একজন উকিলের নিকট গিয়া ব্যাপারখানা খুলিয়া বলিল।

উকিল কহিল,—মোট নব্বই টাকা? তাহাকে বলো, একশ কুড়ি টাকা মাসে চাই—যদি রাজী হয়, এখনি লেখাপড়া করিয়া ফেল! দলিলখানা আমি দেখিয়া দিতে প্রস্তুত আছি!

এক কথায়, মাসে একশ কুড়ি টাকা!

মাগ্নোর ভাবিতেছিল, সিকো কেন আসিতে দেখা করিতেছে!

সিকো শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মাসে একশ কুড়ি টাকা! না, না! একটু অতিরিক্ত হইয়া পড়িতেছে!

মাগ্নোর বুঝাইল, কদিনই বা সে বাচিবে? আর বড়



জোর পাঁচ ছয় বৎসর! তাহার শরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে—তাহা হইলে, মাসে একশ কুড়ি টাকা করিয়া ধবিলে, বৎসরে এক হাজার চারশ চল্লিশ টাকা! ছয় বৎসরে, আট হাজার ছ'শ চল্লিশ টাকা মাত্র! তেমনি সম্পত্তির দাম যে পনেরো হাজার টাকা! ধরিতে গেলে, সিকোর লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। এই সেদিনই যে, সন্ধ্যার সময় মাগ্নোরের বৃকে তঠাৎ ব্যথা ধরিয়াছিল, খুব সামলাইয়া গিয়াছে। তেমন ব্যথা আর একদিন ধবিলেই সব শেষ হইয়া যাউবে! তখন—

সিকো কহিল,—না, না, তোমার যা শরীর—তুমি এখনো পনেরো কুড়ি বৎসর বাঁচবে। তুমি ত আমাকেই মরতে দেখবে! ইত্যাদি।”

পরদিনটা টাকার আলোচনায় কাটিয়া গেল। মাগ্নোর কিছুতে ছাড়িবার পাত্র নহে—অগত্যা সিকো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাগ্নোরের সার্ভে সম্মতি দিল।

উকিলের বাড়ী দলিল লেখাপড়া হইয়া গেল।

## ২

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মাগ্নোরের শরীর ও স্বাস্থ্য, সিকোর আশা-আনন্দের পরিবর্তে, হ্রাস্তাব কাবণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসায় সিকোকে কোন দিন ক্ষতি স্বীকাব করিতে হয় নাই, কিন্তু এখন এ কি বিপদ!

যখনই সিকো মাগ্নোরের সন্তি সাক্ষাৎ করিতে আসে, তখনই আপনাব জ্বরদৃষ্টের কথা ভাবিয়া সে শিচবিয়া ওঠে। তাহাব সমস্ত হৃদয় ধ্বনিত করিয়া বাসনা গর্জ্জাইতে থাকে,—কবে তুমি মরিবে!

সিকো কি কবিবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারে না। তাহাব মনে হয়, মাগ্নোরের বৃকে ছবি বসাইয়া দেয়! রাত্রে নিদ্রা নাই। জীবন-ভার ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল।

সিকো আসিয়া মাগ্নোরকে কহিল,—আজ আমার বাড়ী তোমার নিমন্ত্রণ। কি বলো, মাগ্নোর?

মাগ্নোর আপ্যায়িতভাবে কহিল,—ধন্যবাদ, সিকো!

আবার, ধন্যবাদ! হুঃ, জুয়াচোর—মবিবার নামটি নাই, তোমার! ধন্যবাদ?

সিকো হতাশ হইল। মাগ্নোর অধিক কিছু আহা

করিল না—শুধু একটু ফলমূল—একটু কটি-মাখন, আর একটু ঝোল!

সিকো অনেক পীড়াপীড়ি করিল, এত আয়োজন—এমন খুড়ি, রোষ্ট ফাউল, মটন চপ্—কফি, কিছু না? একটু ব্র্যাণ্ডি?

মাগ্নোর কহিল,—একটু! এক পাত্র—শুধু তোমার অনুরোধে।

সিকো হাঁকিল,—বোজালি, ব্র্যাণ্ডি! খুব ভালো ব্র্যাণ্ডি—স্পেশালটা—”

মাগ্নোর এক নিশ্বাসে পান করিল। সিকো আবার গ্লাসে ব্র্যাণ্ডি ঢালিল। মাগ্নোর অনুরোধ এড়াইতে পারিল না, কহিল,—চমৎকার!

সিকো কহিল,—তোমাকে কিছু পার্টিয়ে দেবো। তোমাব এই শরীর—একটু-আবটুতে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা!

কিছুদিন পরে পাড়ায় রাষ্ট্র হইল, এই বৃদ্ধবয়সে মাগ্নোর অতিরিক্ত ব্র্যাণ্ডি পান করিতেছে। সে নিজে বোতল রাগিয়া দিয়াছে—কেত জানে না, কোথায় রাখে!

সিকো প্রতিবেশীর কাছে কহিল,—বড় দুঃখের কথা! এত বারণ করি, কিছুতে শোনে না। ব্র্যাণ্ডি পায় বা কোথা? আনিয়া দেয় কে? হায়, হায়, এমন করিয়া শরীরটাকে নষ্ট করিতে বসিয়াছে!

ইহার ঠিক পরদিন প্রত্যুয়ে মাগ্নোরকে শয্যা হইতে উঠিতে না দেখিয়া, পুবােনো ভৃত্য কোনমতে দ্বার খুলিয়া দেখে, শয্যাব উপর মাগ্নোরের মৃতদেহ! তাহাব মূখে সাদা ফেনা জমিয়া রহিয়াছে। মাথাটা বালিশের পাশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে! শয্যাব নিয়ে একটা খালি বোতল—সেটি সাধারণ ব্র্যাণ্ডিব বোতলের মত নহে।

সংবাদ পাঠিয়া সিকো ছুটিয়া আসিল। ঢাকবের সাহায্যে বাস্তু খুলিয়া দলিলখানি পকেটে রাখিল। ক্রমে পাড়াব লোকে ঘর ভরিয়া গেল!

শিবে করাঘাত করিয়া সিকো কহিল,—আমার যেন আজ পিতৃ-বিয়োগ হয়েছ। বৃদ্ধকে আমি নিজের বাপের মত দেখতুম! আতা—কোথা থেকে এই লক্ষ্মী-ছাড়া ব্র্যাণ্ডি ধরে নিজের মৃত্যু ডেকে আনলে!

সিকো কমালে চোখ মুছিল। তাহার এই উচ্ছ্বসিত ভক্তিব আতিশয্যে পাড়ার লোক চমৎকৃত হইয়া গেল।

# বুষ্টি

১

সম্রাট সিং-ও-এ মন্দির প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া-  
ছিলেন।

বয়স অল্প, কাঁচের মনটি করুণায় ভরা! চারিদিকে  
অতুল ঐশ্বর্য, আমোদ, বিলাস, তবু দীন-দুঃখীর কথাটুকু  
তিনি কখনও ভোলেন না।

বুষ্টি পড়িতেছে! মুগ্ধ ধারে, অবিশ্রাম বুষ্টি!  
চারিদিকে, গাছপালা ফুলপল্লব যেন চোখেব জল  
ফেলিতেছে।

সম্রাটের স্থায় করুণায় ভরিয়া উঠিল। পথের দিকে  
তিনি চাতিয়াছিলেন, কহিলেন,—আহা, ঐ লোকটির কি  
কষ্ট! এই অবিশ্রাম বুষ্টিতে পথে চলেছে, মাথায় একটা  
টুপি নাই! পশ্চাতে কিরিয়া বয়সকে সম্বোধন  
করিয়া কহিলেন,—খানি জানিতে চাই, আমার পিকিনে  
এমন হতভাগা ক'খন আছে—মাথায় একটা টুপি  
দিবারও যাদের সামর্থ্য নাই!

অবনত শিবে সুঙ-হি-সাঙ, উত্তর দিল,—খুঁচের আঁর  
ভাষ্য, সর্বশাস্ত্রমান রাজবাৎসল্য, আপনাব আজ্ঞা  
শিরোধার্য! সূর্যাস্তের পূর্বে এ সংবাদ রাজগোচরে  
আসিবে!

সম্রাটের মুখে হাসি দেখা দিল। সুঙ-হি-সাঙ, নিমেষে  
প্রধান মন্ত্রী সান্-চি-সানের সম্মুখে উপস্থিত হইল।  
তখনো তাহার কথা কহিবাব শক্তি ছিল না—ব্যস্ততা-  
বশত খাস রক্ত হইবার উপক্রম। প্রধান মন্ত্রীর প্রাপ্য  
জ্যায় সম্মানটুকু তাঁহাকে প্রদান করিতে রাজবয়স  
ভুলিয়া গিয়াছিল!

কষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া সুঙ-হি-সাঙ, কহিল,—বিশেষ  
আনন্দ, আমাদের সর্বময় প্রভু আজ বিরক্ত হইয়া-  
ছেন! এত বড় বেয়াদব এই লোকগুলা, মাথায় টুপি  
না দিয়া পথে চলে! সম্রাট তাহাদের ব্যবহারে বিরক্ত  
হইয়াছেন! তিনি জানিতে চান, এমন লোক পিকিনে  
কতগুলা আছে।

এতদূর স্পষ্টা, তাদের? সান্-চি-সান্ ক্রোধে কাঁপিয়া  
উঠিলেন। তখন সেনাপতি পি-হি-ভোর তলব পড়িল।

পি-হি-ভো নতশিরে মন্ত্রীকে অভিবাदन করিয়া সম্মুখে  
দাঁড়াইলে মন্ত্রী কহিলেন—দুঃসংবাদ আছে। মহারাজ  
রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়াছেন!

বিস্ময়-স্তম্ভিত পি-হি-ভো উত্তর করিল,—“সে কি?

রাজ্যে এমন একটা ছায়া-নিবিড় কানন নাই, বা’ পিকি-  
নের পথ ও প্রাসাদের মধ্যে আবরণের সৃষ্টি করে?”

সান্-চি সান্ কহিলেন,—কেমন করিয়া এ ব্যাপার  
ঘটিল, আমা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে  
লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, ইহাদের  
জন্ম সর্বময় সম্রাট আজ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন!  
পিকিনে এমন বদমায়েশ লোক কতগুলা আছে, তিনি  
আজই জানিতে চাহেন। ব্যবস্থা করো।

স্বস্থানে ফিরিয়া পি-হি-ভো অমুচববৃন্দকে আদেশ  
দিল,—ডাকো সেই বুড়া কুব্জ জুব-সাঙটাকে! এখন!

নগর-রক্ষক বৃক জুব-সাঙ, কম্পিত দেহে, শক্তি মনে  
সেনাপতির সম্মুখে অগিয়া যখন তাহার পদপ্রান্তে আশ্রয়  
প্রার্থনা করিয়া দাঁড়াইল, তখন পি-হি-ভো তিরস্কার-বাণে  
তাঁহাকে রীতিমত চর্জ্বিত করিয়া তুলিল।

—বেয়াদব, পাণ্ডী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার জগ কি  
আজ আমরা সকলে রাজবোঝাললে দগ্ধ হইব?

জুব-সাঙ, সভয়ে কহিল,—জুবের ক্রোধের কারণ  
জানিলে সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। নচেৎ অপানার  
কথার মধ্য ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।

—বুড়া কুব্জ, এত বড় নগর বলা কি তোমার কাজ?  
কতকগুল, শূকরের পাল চবাও গয়া! চান-সম্রাট স্বয়ং  
নগরে বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! পথে কতকগুল  
বেয়াদব, ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় তাহাদের টুপি জোটে  
না! সূর্যাস্তকাল সময় দিলাম—এমন বেয়াদব  
পিকিনে কতগুলা আছে, সংবাদ আনো!

ভূমিতে তিনবার শিরস্পর্শ করিয়া জুব-সাঙ, কহিল,  
এখনি প্রভুর আজ্ঞা পালিত হইবে।

কথা শেষ করিয়া জুব-সাঙ, নিমেষে সে স্থান ত্যাগ  
করিল। তখন অবিলম্বে বাহিরে বৃহৎ ঘন্টার চৌকি-  
দারদিগের তলব পড়িল।

—হতভাগা, ভূতের দল, তোমাদের জীবন্ত পুড়াইয়া  
মারিলেও রাগ মিটে না। এমন করিয়া তোমরা সহবে  
চৌকী দাও! বুষ্টিতে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে  
চলে, নজর রাখো না? যাও, এখন এক ঘন্টার মধ্যে  
মাথায় যাদের টুপি নাই, তাদের ধরিয়া আমার কাছে  
হাজির করো!”

চৌকিদারের দল গালি খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল  
এবং চকিতে পিকিনের পথে-ঘাটে টুপিহীন লোক ধরিবার  
জন্ম চূড়ান্ত ব্যবস্থা হইয়া গেল।

—ধরে, পাকড়াও—শেষ সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।  
বিড়াল যেমন করিয়া ইন্দুর ধরে, তেমনি করিয়া চৌকি-  
দারগুলা লোক ধরিতে লাগিল! প্রাণীয়েব পাশে,  
বাগানের বেড়ার পিছনে, নদীর ধারে, বৃক্ষের শাখায়,  
যেখানে যে-বেচারী লুকাইয়া ছিল, কোন স্থানই চৌকিদার-  
দিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। আধ  
ঘণ্টার মধ্যে পিকিনের কাবাপ্রাঙ্গণ এষ্ট সব টুপিহীন  
অভাগাদের করুণ আর্তিনাদে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

জুব-সাঙ, সগর্ভের জিজ্ঞাসা করিল,—গুপ্তিতে কত  
হবে?

চৌকিদারেরা কহিল,—বিশ হাজার আটশ একাত্তর  
জন!

জুব-সাঙ, হকুম দিল,—সবার মাথা কাটো...

আধ-ঘণ্টার মধ্যে কাবাপ্রাঙ্গণে বিশ হাজার আটশ  
একাত্তর জন হতভাগ্য চীনবাসী শিরোহীন দেহ গড়া-  
গড়ি বাইতে লাগিল।

সংবাদ লইয়া, জুব-সাঙ, পি-হি-ভোর সম্মুখে উপস্থিত  
হইল। পি-হি-ভো আসিয়া সান্-চি-সান্কে, ও সান্-চি  
সান গুঙ-হি-সাঙকে সংবাদ-জ্ঞাপন করিল।

## ২

সন্ধ্যা নামিতেছিল। নয়, শাস্ত সন্ধ্যা। বৃষ্টি থামিয়া  
গিয়াছে। বায়ুস্পর্শে বৃক্ষপত্র ঝিঝ ঝিঝ করিয়া কাঁপি-  
তেছে এবং পল্লব হইতে হীরার টুংরার মত বৃষ্টি-বিন্দু  
ভূমিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। স্নিগ্ধ বাতাসে পাখীর  
গানে, মধুর পুষ্প-স্বরভিতে সারা আকাশ ভরিয়া গিয়াছে।  
সমস্ত বাগান যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছে। কেমন-একটা  
ওজ্জ্বল্য ও আনন্দ যেন চারিদিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছে!

ঈশ্বরের পুত্র ও প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট লি-ও-এ

যাতারনে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ণ শোভা দেখিতেছিলেন।  
চারিদিকে এত শোভা! এমন সৌন্দর্য! তবু তিনি সেই  
অভাগাদের কথা ভুলিয়া যান নাই।

গুঙ-হি-সাঙের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন,—ভালো  
কথা! সেই অভাগাদের সংখ্যা নিয়াছিলে? আহা,  
বেচারারা একটা টুপি অবশি মাথায় দিতে পার না!

মন্তক নত করিয়া গুঙ-হি-সাঙ কহিল,—ভৃত্যগণ  
প্রভুর আজ্ঞা তখনি পালন করিয়াছে!

—এমন অভাগা ক'জন আছে? সত্য করিয়া বলো,  
মিথ্যা বলিয়ো না।

এক হাত আপনাব বক্ষে রাখিয়া, অপর হাত  
আকাশের দিকে তুলিয়া, গুঙ-হি-সাঙ অকম্পিত কণ্ঠে  
স্পষ্টভাবে বলিল,—সারা পিকিনে এমন এমন হতভাগা  
একজনও নাই, যার মাথায় টুপি দিবার সামর্থ্য নাই।  
প্রভুর সম্মুখে শপথ করিয়া এক কথা বলিতেছি!

অপূর্ণ উল্লাসে সম্রাটের প্রশান্ত বদন সমুজ্জ্বল হইয়া  
উঠিল। মুগ্ধকণ্ঠে তিনি কহিলেন,—স্বপ্নের রাজ্য। সোনার  
বেশ! আর কি প্রথা আমি যে, আমার বাজ্যে দৈন্ত নাই,  
দাখিয়া নাই, দুঃখ নাই! ইচ্ছিতে প্রজার দুঃখ-ক্লেশ  
দূর হয়।

গুঙ-হি-সাঙ, বারবার আভূমি প্রণত হইয়া সম্রাটকে  
সম্মান প্রদর্শন করিল।

সম্রাটের মুখে হাসি দেখিয়া প্রাসাদের সকলে আজ  
আনন্দ লাভ করিল।

প্রত্যাহর্গেব প্রতি সমধিক স্নেহাভ্যুগের পুরুষাব-  
সরণ সান্-চি সান্, পি-হি-ভো ও জুব-সাঙ, বিশিষ্ট  
বাহোপাধিতে ভূষিত হইল। সমগ্র নগরে আনন্দোৎসব  
পড়িয়া গেল। বিংশ-সহস্রাধিক নর-কঙ্কালে সমগ্র পিকি-  
নের আনন্দ-কোলাহল এতটুকু রোধ করিতে পারিল না।

# সহযাত্রী

সংবাদপত্রে যেদিন সিনিব সচিত্ত আমার বিবাহ-বার্তা ঘোষিত হইল, সেদিন আমার বন্ধবান্ধবের মধ্যে একটা হলধূল বাধিয়া গিয়াছিল। আমার বিবাহ? যে চিরকাল বিবাহিত জীবনকে একটা ভার বলিয়া তর্ক করিয়া আসিয়াছে! এবং বিবাহ কাহার সচিত্ত? না, নিতান্ত আত্মপরায়ণা এক নারী, যাঁহাব সচিত্ত কাহাবো কখনো বনিয়না নাই! হলধূল বাধিবাব কথা বটে!

বন্ধু সিসিল আগিয়া কহিল,—বাপাৰ কি, বলো দিকি? প্রেমের ফাঁদে হুঙ্কনে পা দিলে কেমন কবে?

আমি কহিলাম, ট্রেণে।

সিসিল কহিল,—ট্রেণে? এমন বিশী জায়গা—নাকো-চোখে কলার গুঁড়া অনর্গল প্রবেশ করবে—একটা কর্কশ ঘট-ঘট ট্রেণের শব্দ—না আছে পাখিব গান, না আছে গাছের ছায়া—প্রাণটা পবিত্রাচি ডাক ছাড়ে। সে স্থানটা প্রেমের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠিলো?

সিসিল হাসিতে লাগিল।

আমি কহিলাম,—প্রেমের পক্ষে সব চেয়ে সুন্দর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে ঐ ট্রেণ। কেউ কোথাও নাই, বাহিরে কর্মস্রোতের বিপুল গর্জন, ভিতরে দুটি প্রাণী—এমন স্রোতাগ, এমন অবসর, কি নিতান্ত লোভনীয় নয়?

কবিত্ব আমাকে মোটে স্পর্শ করিত না—কিন্তু ইদানিং কথাগুলো কেমন সাদাসিধা গোছের হইত না!

সিসিল কহিল, বাপাৰখানা খুলে বলো।

একটা সিগার ধরাইয়া সিসিল চেয়ারখানি টানিয়া আমার পাশে ঘোঁসিয়া বসিল।

আমি কহিলাম,—এমন বিশেষ কিছু বলিবাব নাই! তবু শোনো,—

আমি বলিতে আরম্ভ কবিলাম,—এই সেদিনের ঘটনা! ফেব্রুয়ারি মাসের কথা! ‘নাইসে’ মেলা দেখিবার জগা বেলা ৮-৫৫ মিনিটের ট্রেণে উঠিলাম—রাত্রের ট্রেণ আমি মোটে পছন্দ করি না। ঘুম হয় না। তাই প্রথম রাতেই ট্রেণ মাসেল পৌঁছিলে নামিয়া রাবিটার মত সেখানে ওয়েটিং কমে বিশ্রাম করিব, স্থির কবিলাম!—এবং পরদিন সকালের ট্রেণ ধরিয়া বেলা দুইটা নাগাদ নাইসে পৌঁছিব।

ষ্টেশনে উঃ সে কি ভীড়! ষ্টেশন-মাষ্টারের অহুগহে একখানি কামরা বেশ দখল করিয়াছিলাম। সে কামরায় সঙ্গীর মধ্যে কেবল লম্বা-কোট-পর্য্য আর একটি ভদ্রলোক! তিন-চারিটা ষ্টেশনের পর তিনি নামিবেন,

তখন সম্পূর্ণ কামরাখানি একলা আমারি অধিকারে অসিবে! একেলা! কেবল ট্রেণে চড়িবাব সময় এই স্বার্থপর নিঃসঙ্গ ভাবটি এত আবেশের, এত আকাঙ্ক্ষার!

দুটা ঘটা পড়িয়াছে—ট্রেণ এখন ছাড়িবে—এমন সময় কামরায় সমুখে রীতিমত গোগমাল বাধিয়া গেল!

একটি জীলোক—পরিষ্কার কণ্ঠে তীব্রস্বরে কহিতেছে—না, মশায়, না—আমার ঘুমোবার জগা স্বতন্ত্র কামরা চাইই। ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহাকে বুঝাইতেছে—এখানে সে কামরা দেওয়া বাইতে পারে না—এখন সকল সাড়ে আটটা! সন্ধ্যার সময় সে কামরা মিলিবে!

—কোথায় মিলিবে? আমাকে কতদূর বাইতে হইবে! ইত্যাদি মুহূর্ত্তে ভাবনার জীলোকটি ষ্টেশন-মাষ্টারকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

এমন সময় তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল। জীলোকটি প্রচুর লগেজ লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কহিল,—এ কি, কামরায় হুঙ্কন লোক!

ষ্টেশন-মাষ্টার বিরক্তির সচিত্ত কহিল,—তা বলে, আপনাব জগা একখানা পুরা গাড়ী তো ছাড়িয়া দিতে পারি না।

—বেশ—টেলিগ্রাম করো—বেন ঘুমোবার গাড়ী পরের ষ্টেশনে পাই। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

জীলোকটির সচিত্ত পাঁচ ছয়টা ব্যাগ এবং শীতের কাপড়চোপড় প্রভৃতি অসংখ্য!

তখন প্রচণ্ড শীত। কুয়াশায় সারাদিন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কামরার সার্শি বন্ধ—তাহারি ভিতর দিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবলই কুয়াশা—কুয়াশা! বাহিরটা আগাগোড়া যেন কে জমাট বরফে ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

জীলোকটি সত্যিই দেখিতে বেশ! সেই ‘রাগ-বাগ’ ভাবে মুখখানিকে বেন আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

সঙ্গীটি খুব গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। খণ্ডের কাগজের মধ্যে তিনি এমন নিবিষ্টচিত্ত যে, ভগতের আর কোনদিকে চাহিয়া দেখিবাব তাঁহার অবসর ছিল না। প্রবৃত্তিও বুদ্ধি নাই!

তখন বেলা সাড়ে এগারোটা। ষ্টেশনের কুলি অভ্যস্ত বুসি হাঁকিয়া গেল, লাভোচি।

আমাদের গম্ভীর সঙ্গীটি কাগজের তাড়া প্রভৃতি লইয়া নামিয়া গেলেন। ‘ষ্টেশন-মাষ্টার’, ‘ইনস্পেক্টর’ প্রভৃতি শব্দে স্থানটা মুগ্ধবিত করিয়া জীলোকটি আবাব স্থির হইয়া বসিল। গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

বাগে, ছুগে, অপমানে জ্বীলোকটি কামবাব এক-  
কোণে বসিয়া রহিল। আমি কাগজ বাগিয়া নিয়া নিতান্ত  
নিঃশব্দে মত তাহার প্রতি কৌতুহল দৃষ্টি নিক্ষেপ  
করিতেছিলাম। কি স্ত্রে আসাপ করা যায়, ইহাই  
ছিল আমার একমাত্র চিন্তা।—“জানাপাটা খুলিয়া দিব ?”  
শীত প্রচণ্ড—এ সব মামুলি ভূমিকা নিতান্ত  
অসঙ্গত। জানাপা বন্ধ আছেই,—শীতে গুলিবার কথা  
তোলা নির্বুদ্ধিতা বটে।

ক্রমে নিস্তব্ধতা অসহ্য হইয়া উঠিল। একটা  
নূতন বকমে আসাপের স্বরপাত করিতে হইবে। কিন্তু  
কি কথা কতিব ? কি কথা ?

ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন  
সময় ট্রেন টোনায়ে আসিয়া পৌঁছিল। কুলি তাঁকিল,  
—টোনার—এখানে পঁচিশ মিনিট ট্রেন থাকিবে।

আমাব সহযাত্রিনী ধীরে ধীরে ব্যাগ নামাইয়া, লগেজ  
প্রতি গণিয়া প্র্যাটফর্মে নামিল। তখন বেলা  
তিনটা। ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।  
সহযাত্রিনী কিছুদূর অগ্রসর হইলে আমিও ভোজনালয়  
উদ্দেশ্যে তাহাব অনুসরণ করিলাম।

টেবিলে বিলক্ষণ ভিড়। নানারঙের পোষাকে,  
নানারূপ মূর্তি হাসি-গল্প-গুজবের সজ্জিত ভোজনে ব্যস্ত।  
কিন্তু এ সকলের প্রতি আমার আদৌ দৃষ্টি ছিল না—  
পাশেই যবে ভোজন বতাহ সহযাত্রিনীর প্রতি আমার  
আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল।

ভোজনাদি শেষ করিয়া প্র্যাটফর্মে আমার  
কামবাব সম্মুখে আসিয়া আমি সিগারেট ধরাইলাম।  
পঁচিশ মিনিট শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাত্রীরা দলে-দলে  
আসিয়া আপন আপন কামরা অধিকার করিতেছে।  
আমিও আসিয়া বসিলাম। সহসা দেখিলাম,—আমার  
সহযাত্রিনীটি ওধারের প্র্যাটফর্মে বুকষ্টলে বসি কিনিতে  
ব্যস্ত।

আমি শঙ্কিত হইলাম। ট্রেন এখন ছাড়িবে।  
প্র্যাটফর্ম হইতে এ সময়টুকুর মধ্যে আসিয়া-পড়া অসম্ভব।  
সর্বনাশ ! বেচারীর ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি  
এখানে পড়িয়া। ট্রেন ছাড়িয়া দিলে, সারারাত্রি এ শীতে  
কি অসহ্য কষ্টই হইবে !

গার্ডের বাঁশী বাজিল—আর উপায় নাই ! আমি  
তাড়াতাড়ি ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি প্র্যাটফর্মে দিকে  
ছুড়িয়া দিলাম। নিকটে একটা কুলী দাঁড়াইয়াছিল,  
তাহাকে কহিলাম, মেমসাহেবের জিনিস !

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল—আমি প্রাণপণ বলে  
তাহার লগেজ প্র্যাটফর্মে ছুড়িতেছি !

—এ কি, এ কি, মশায় !

পশ্চাতে কিরিয়া দেখি, আমাব সহযাত্রিনী !

উঃ, আমি কি ভুল করিয়াছি ! বুকষ্টলেব জ্বীলোক-  
টিকে আমাব সহযাত্রিনী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম ! কি  
বিপদ !

সহযাত্রিনী কহিল, আমার ব্যাগ ? লগেজ ? কে  
চুরি করিল ?

সে আমার প্রতি চাহিল। কি সে উগ্ধ, জ্বীলোক  
দৃষ্টি ! জীবনে তাহা তুলিব না।

আমি কহিলাম,—আমার স্বর বাগিয়া যাইতেছিল—  
ভুল করিয়া আমি প্র্যাটফর্মে ফেলিয়া দিয়াছি...

—ভুল। আমার লগেজ ?

—হাঁ, ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি ! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য  
মন্দ ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম—আপনি বৃষ্টি ট্রেন  
ধরিতে পারিলেন না—এই প্রচণ্ড শীতে আপনার কষ্ট  
হইবে ভাবিয়াই আমি আপনার জিনিসপত্র প্র্যাটফর্মে  
একটা কুলির জিম্মায় সব ছুড়িয়া দিয়াছি। পূর্বের ট্রেনে  
টেলগ্রাম করিয়া দিব। কোন ভাবনা নাই। আমি  
নিজে না হয়, টোনায়ে কিরিয়া আপনার লগেজ লইয়া  
আসিব ! আপনার মত পোষাক-পরা, এমন স্তম্ভরী  
আর একটি মহিলাকে দেখিয়া, আমি ভুল করিয়া  
বসিয়াছি। ক্ষমা করিবেন ! একনিশ্বাসে কথাগুলি  
বর্ণনা গেলাম।

জ্বীলোকটি কহিল,—বেশ করিয়াছেন, মশায়,—এখন  
আমার উপায় ? এই প্রচণ্ড শীতে আমার একখানা  
গরম কাপড় নাই !

কথাটা ভাবিবাব বটে ! আমি কহিলাম, আমার  
আলষ্টাব—যদি কিছু মনে না করেন—খুলিয়া দিতেছি,  
আর আমাব এই ব্যাগখানা বেশ গরম ! বোধ হয়,  
বিশেষ অস্থবিধা হইবে না !

ধন্যবাদ ! কোন প্রয়োজন নাই, মশায় ! জ্বী-  
লোকটি চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া রহিল।

আমার মনের অবস্থা তখন ? মনে হইতেছিল,  
ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়ি ! এমন বিপদেও মামুষ  
পড়ে !

আমি কহিলাম,—যদি কিছু মনে না করেন, তো—  
আমার ব্যাগখানা।

কোন দবকার নাই। আমি তো আপনাকে কিছু  
বলি নাই, মশায়।

আঃ, কি জালা সে স্ববে !

আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম ! কহিলাম,—আপনি যদি  
এই ব্যাগ ও আলষ্টাব না লন তো আমি এখন ট্রেন  
হইতে লাফাইয়া পড়িব, এখন—

আমি কামবাব দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যই, তখনো লাফাইয়া পড়িতাম ! মাথার মধ্যে  
তখন আগুন জ্বলিতেছিল, কোন জ্ঞান ছিল না—

দ্বালোকটি আমার হাত ধরিল, বাগ ও আলষ্টার গ্রহণ করিল। আমি যেন কতক আশস্ত হইলাম!

দ্বালোকটি কহিল,—আপনার যে শীত লাগছে।

আমি কহিলাম,—কিছু না!

শীত খুবই প্রচণ্ড বটে! কিন্তু আমার পাপের ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত।

তার পর নানা কথাবার্তা! ভালো মনে নাই, কারণ, তখন আমার অসহ্য শীত লাগিতেছিল! কিন্তু আমি প্রাণ দিতে উদ্বৃত্ত ছিলাম, এত শীত আমার কাছে অতি তৃচ্ছ।

রাত্রি সাড়ে সাতটায় ডিঙ্কনে পৌছিলাম। টোনারে টেলিগ্রাম কবিয়া দিলাম। শীতে একেবারে জমিয়া যাইবার উপক্রম!

রাত্রি সাড়ে আটটায় মেকান! যাত্রীণী শয়ন-কাম-রার কথা ভুলিয়া গিয়াছে!

রাত্রি সাড়ে নটায় ভালে। মহিলাটির কথা অম্পষ্ট

শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার হাতে-পায়ে কোন সাড় ছিল না! নাক জ্বালা করিতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল! তার পর আর কিছু মনে পড়ে না।

যখন চোখ চাহিলাম, তখন দেখি, সম্মুখ কক্ষে শুইয়া আছি! পাশে—আমার সহযাত্রী। আমি কহিলাম,—আপনি? আপনার লগেজ?

সে কহিল,—আমার জিনিষ-পত্র আমি পাইয়াছি,—আপনি নিশ্চিন্ত হোন। এমন করিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হয়?

সে স্বরে কি আশ্বাস, কি করুণা! স্বর্গের বীণাও বুঝি এমন মধুর নয়!

অচেন্তন অবস্থায় সিরি আমাকে মার্শেলে আত্মীয়ের বাটী লইয়া আসিয়াছে! পরদিন নাইসে গেলাম। সহযাত্রী সিরি এবারও আমার সঙ্গিনী। আর বেশী কি বলিব? এক সপ্তাহ পরে বিবাহ!

সিসিল আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল,—সাবাস!”

# প্রায়শ্চিত্ত

১

রত্নের সহিত যখন এশ্বি গ্রামের সুন্দরী বালিকা কারেণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিগণ একটা ভাবী বিপদের সূচনা আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে সুগাজের অভাব ছিল না। সুন্দর, সবল, অবস্থাগন্ন সকল পাত্রই আনন্দের সহিত কারেণের পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিল। তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া বনবাসী কাঠুরিয়া রত্নকে বিবাহ কবিত্তে কারেণের এত আগ্রহের কারণ কি, ইহা ভাবিয়া প্রতিবেশিগণ অত্যাধিক বিষয় প্রকাশ করিল।

কারেণের মাতা বা পিতা কেহই জীবিত ছিল না। সে পিতৃব্যের সংসাবে ভারের মত হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তাব বিবাহে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী মুক্তির আভাস পাইয়া সানন্দে সম্মতি দান কবিল। রত্নের সুগঠিত বাল্যে দেহ, নয়নের ঈষৎ-উজ্জ্বল্য গ্রামের অল্প পুণ্য অপেক্ষা সহজেই কারেণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। রত্নের প্রকৃতি ছিল উগ্র, কিন্তু কারেণের প্রেমের অনাবিল ধারায় সে দগ্ধতার তাপ শাস্ত হইবে না কি? সেই জন্তই প্রান্তবেশিনীবর্গের বিক্রম ও বিবাহের মধ্যে একটি নিম্মল প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া তাহার বন-ভবনে যাইবার সময় কারেণ অগ্নে প্রতীক দিখা এ আশঙ্কা করে নাই।

রত্ন, কাঠুরিয়া। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যে তার ক্ষুদ্র কুটীর। নিকটো দ্বিতীয় মহুয়ের বাস নাই বলিলেও অত্যাধিক হয় না। কাঠারও সাহিত রত্ন বড় একটা মিশিত না—মজল রত্নের অশান্ত উগ্র প্রকৃতির কাছে অগ্নের ঘোঁষতে ঢাকিত না। এই রত্নের হাত ধরিয়া, ইহার উপর প্রেমের অসীম নির্ভর স্থাপন করিয়া কারেণ স্বামিগৃহে পদার্পণ করিল।

প্রায়কাল। নির্জন বনের কোলে জীবন বড় মধুময়। সারাদিন রত্ন বনে-বনে কাঠ কাটিয়া বেড়ায়; কারেণ এখার-ওখার ঘূষিয়া ফলমূল কুড়ায়,—কখনো বা ছায়া-যেবা বুটীরেব সম্মুখে বসিয়া আশা-কাপড় শেলাই করে, কোন দিন দূর হইতে রত্নের কুটারের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দিন বা তাহা শুনা যায় না। তার পর সন্ধ্যার আধার নামে, কাজ-কর্ম শেষ করিয়া, স্বামীর জন্ত আহাৰ্য্য প্রস্তুত করিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় কারেণ পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণতলে বসিয়া থাকে, গাছের আড়ালে, বাঙ্গা মেঘের মধ্যে স্নিগ্ধ সূর্য হারাইয়া যায়—চারিদিক চন্দ্ৰের বজ্রতরঙ্গিধারায় উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, রত্ন,

আসিয়া কাঠের বোঝা নামাইয়া কারেণকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়—তাব সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুষন করে! জগতে তখন কারেণের আর কোন অভাব থাকে না।

প্রীয়েব পব শরৎ আসে। বিহ্বল পবন মাতেয়ায়া হইয়া ওঠে—গাছের ডাল নাড়া দিয়া, বিকট হাসিতে সে সকলেব ত্রাস জাগাইয়া তোলে! দিনগুলিও ক্রমে হ্রস্ব ও নীরস হইয়া আসে; এবং হিমের প্রবলতায় কােণে অগ্নিকুণ্ডের পাশে আশ্রয় লয়! রাজে কম্পিত দেহে শযায় কারেণের চোখে কিছুতে যখন ঘুম আসে না, তখন বাহিরে বায়ু গর্জিতে থাকে, এবং কারেণের মন কি এক ভয়ে আকুল হইয়া ওঠে।

রত্নের মনে পরিবর্তন ঘটয়াছে। তার মুখে এখন আর সে হাসি নাই! দিনান্তে কাজের শেষে সে যখন গৃহে আসে, দ্বার জগ্ন সে হাসি-আনন্দটুকু আর সে লইয়া আসে না। এখন তার মুখ গম্ভীর—কারেণ যাচিয়া আদর লইতে গিয়া প্রায় নিরাশ হয়। বোঝার কারণ।

কারেণের মনে স্তব্ধ নাই! তাব সে উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। দ্বাবপ্রান্তে বসিয়া পানীর মত অসঙ্কোচে সে কত গান গাচ্চ—শৈশবেব সে মধুর গানগুলি এখন আর গাহিতে পারে না। কে যেন বক্ষে আবাহন করে; কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! কি যন্ত্রণা—কি দুঃখ! কারেণ ভাবে, বুঝা এ জীবন! কখনো সে ভাবে, কোথাও পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় যাইবে? পিতৃব্যের গৃহ মনে পড়ে—সহস্র অযত্ন-অনাদরবেব মধ্যেও শৈশবেব সে গৃহ আজ স্বর্গের মত তার কাছে স্নিগ্ধ মনোবদ্য বলিয়া মনে হয়! কিন্তু সে বে বহু দূরে—দুর্গম পথ—প্রচণ্ড শীত—কাজেই মনের সাধ মনে থাকিয়া যায়।

নববর্ষেব শুরু সন্ধ্যায় কারেণের এক কণ্ঠা জ্বলিল। চোখের জল মুছিয়া কােণ কণ্ঠার মুখে চুষন কবিল। কণ্ঠা দেখিয়া রত্ন বিবর্ত্ত হইয়া উঠিল। যদি গুল হইত, গালা হইতেন কি কাবত, বলা যায় না—কিন্তু এ যে কণ্ঠা! সৌ কি শুণু এই অপদার্থ নানা উলার জন্ত যাচিয়া মরিবে আর ইহার আশ্রমে বসিয়া তাহার শ্রমলব্ধ আহাৰ্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? একটা দ্বী,—সে-ই ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে—তাহার উপর আবাব কণ্ঠা! রত্ন উগ্রস্ববে দ্বীকে কহিল,—শেষে একটা কণ্ঠা প্রসব করিয়া বাসিলে?

কারণ চক্ষু মুদ্রিল। সে কি বিধাতার নিকট কায়মানাবাক্যে পুস্ত্রের জ্ঞান প্রার্থনা কবে নাই? কিন্তু হায়, এ যে বজা! একান্ত হুঁচকানী সে! নিতান্ত উপায়হীন, অসহায়।

মেয়েটি তখন এক মাসের। বল্‌ফ্‌ সকালে বাজারে গিয়াছিল—রায়ে আর গৃহে ফিরে নাই। সারারাত্রি কাবেণ মেয়েটিকে বুকেব মধ্যে লইয়া অধীরভাবে তাহার পথ চাতিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে ক্ষুধিত নেকড়েব ভীষণ চীৎকার, আর ভিতরে কাম্পিত চিত্তে বসিয়া কাবেণ একাকিনী!

সে বৎসব শীত প্রচণ্ড ছিল, এবং এই ক্ষুধিত পশুগুলি আহা রেব সন্ধানে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কবিত্তে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না।

স্বামীব নিকট বসিয়া কাবেণ কত নিঃশব্দ পথিকের করুণ কাহিনী শুনিয়াছে! এত দারুণ শীতে গৃহচরা, পথচারী পথিক বরফের মধ্যে অবশতন্ত্র লইয়া ক্ষুধাতুর অবস্থায় নেকড়ের মুখে প্রাণ দিয়াছে। শিশুব কলহাস্ত-মুগবিত্ত কত কুটীর শিশুতারা হইয়াছে। স্ত্রণয়্যা-শায়িত কত দম্পতী নেকড়েব নিষ্ঠুর ঘাসে পড়িয়াছে! তাই স্বামীর দগ্ধ ভাবিয়া একাকিনী কাবেণ স্বামীব অল্পপুষ্টিভিত্তে সাবাবাতি কি কষ্টে ভোগ কবিয়াছে!

ভোবের আলো ফুটিয়া উঠিল। তুষারাবৃত বনের উপর সূর্যের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, কাবেণেব মনে জীবনের আশা আবার নূতন করিয়া জাগিল।

দিবা দ্বিপ্রহরে বল্‌ফ্‌ গৃহে ফিবি। বদ্‌ সঙ্গীতলাব গহিত সারাবাত্রি বসিয়া সে মত্তপান কবিয়াছে। তাই, মেজাজ অত্যন্ত কফ। সে আসিয়া দেখে, কোণে বসিয়া কাবেণ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে; কপালে শীর্ণ হাতখানি বুলাইতেছে। কাবেণ চাতিয়াই দেখিল, স্বামীর কি এ কক্ষ শুক মুঠি! মুখে না আছে কোমলতা, না আছে লালিত্য। একটা ভূব হিংসায় বল্‌ফের চোখ দুটা যেন জলিতেছে। কাবেণ ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কতকৈ পার্শ্বের বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বল্‌ফের আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। কার্যে অপটু এই মেয়েটা পুতুলের মত অসার, কুৎসিত! সে গর্জিয়া উঠিল,—কি? সমস্ত দিন তুমি বসে থাক্বে, কোলে ঐ মেয়েটা! আব কোন কাজ নাই তোমার! নেকড়েগুলি তোমাকে গ্রাস কবে না কেন? যাও, আমার জ্ঞান খাবার নিয়ে এসো। না হলে এখনই ঐ মেয়ে-শুদ্ধ তোমাকে বরফের মধ্যে তাড়িয়ে দেবো! যাও, দাঁড়ালে চলবে না!

আহা হাদি শেষ কবিয়া স্বকে কুঠার লইয়া বল্‌ফ্‌ বনে বাহির হইয়া গেল। রুদ্ধ বেদনায় কাবেণ গৃহের

কোণে বসিয়া রহিল, আহা রে কবিল না। আহা রে কুচি নাই, জীবনেও তার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া মরা যায়! দুর্ভিসহ এ জীবন-ভার বহিবার কমতা তার নাই! আর সহ্যও হয় না! ঐ ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলি,—একবার তাহাদের সম্মুখে গিয়া ডাকি,—‘তোরা আয়, আয়, আমার এ ব্যর্থ জীবন লইয়া তোদেরও ক্ষুধাব শাস্তি হোক, আমারো সকল জালা জুড়াক!’

কিন্তু মেয়েটি! আহা, স্তম্ভর মুখখানি তার! মিটি-মিটি চাহনিত কতখানি নির্ভরতা, কতখানি আশ্বাস! ছোট হাতটি নাড়িয়া-চাড়িয়া সে মায়ের আদর কুড়াইতে চায়! আহা, অবোধ! জানে না, তার মায়ের শক্তি কতটুকু! বুকের মধ্যে চাপিয়া তার কচি বাঙা ঠোটে অজস্র চুমা ছাড়া হতভাগিনী মায়ের দিবার যে আর কিছু নাই বে বাজা, কিছু নাই!

শীতের ছোট বেলি নিমেষে ফুরাইয়া গেল। চোখেব জল মুছিয়া কাবেণ দীপ জালিল। ধোবে ধোবে জানালার কাছে সেটি বাগিয়া দিল। তাহাবট ক্ষীণ আলোক বেথায় পথ চিনিয়া স্বামী গৃহে ফিবিবে। ঘূমে কাবেণের চোখ আচ্ছন্ন হইয়া আশিয়াছে—শিশুকে বুকেব মধ্যে চাপিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল। ঠাণ্ডা বাতাসে কাবেণের হাড় অবধি কাঁপিয়া উঠিল। বাসিয়া চোখ মুছিয়া সে দেখে, বল্‌ফ্‌। মূর্তি তার আরো ভীষণ, আরো কঠোর! বল্‌ফ্‌ কুঠারখানা ভূমিতে ফেলিয়া দিল। কাঠ কাটিতে গিয়া আশ্রয় তার একটা আঙুলের কিয়দংশ ছিল হইয়া গিয়াছিল! তখনও ক্ষতস্থানে জালা ছিল! রাগের মাত্রা তাই বাড়িয়াছিল। বল্‌ফ্‌ কহিল,—কি? আর কোন কাজ নাই, শুধু ঘুম! আর ঐ মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে! কষ্ট কবিয়া একটুকুবা কটা যদি আমি সংগ্রহ করি, তাতে আবার তুমি ভাগ বসাইতে চাও! যাও, বাহির হইয়া যাও, এ ঘরে আব এক দণ্ড নয়! নিজে বোজগাব করিয়া লইয়া এসো, আমি আব পারিব না।

ভীত কাম্পিত কণ্ঠে কাবেণ কহিল,—কিন্তু—কিন্তু বল্‌ফ্‌, আমি আজ কিছুই খাই নাই—

বল্‌ফ্‌ কহিল,—‘কোন কথা শুনিতে চাই না। যাও বা না যাও, এ ঘরে থাকা হইবে না! যাও!’

কাবেণ কাঁবিয়া ফেলিল,—‘বল্‌ফ্‌, বল্‌ফ্‌, আমাকে তাড়াইয়া দিবে? তুমি জানো, এ রাতে বনে বাহির হইলে নেকড়েরা এখন আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে! আরো জানো, আমার শরীর এখন অসুস্থ, চলিতে পারি না—দুর্বল আমি। তার উপর আমি চলিয়া গেলে তোমার মেয়েব অবস্থাই বা কি হইবে? আমারি বা কোথায় আর স্থান আছে?’



রল্ফ কহিল,—কি ? তুমি মনে করেছ, আমি ঐ মেয়েটাকে নিয়ে বসে থাকব ! কখনো না ! ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও ! তোমাদের কারো এখানে স্থান নাই ! কোথায় যাবে, তা আমি জানি না ! তবে এখানে থাকা হবে না ! এসো, বেরিয়ে এসো ।”

কাবেরের হাত ধরিয়া রল্ফ আকর্ষণ করিল, কহিল, নাও, তোমার মেয়েকে নাও ।

কাবের মেয়েটাকে বুকে তুলিয়া লইল । রল্ফ কাবেরের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে গৃহের বাহর করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল ।

বাহিরে বাতাসে কাবের দাঁড়াইতে পারিতেছিল না । তুষারের কণাগুলি তাব মুখে-চোখে বাব-বার উড়িয়া পড়িতেছিল । প্রাণপণ বলে কম্পিত-কণ্ঠে কাবের ডাকিল,—রল্ফ—রল্ফ—আজ বাত্রিটা শুধু থাকিতে দাও ! কাল সকালে চলিয়া যাইব । আজ রাত্রি—বাত্রিটুকু শুধু । দ্বা-কণ্ঠকে এমনভাবে হত্যা করো না । বল্ফ—রল্ফ—

কাবের ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কঁাদিতেছিল । কিন্তু কোথায় রল্ফ ?

সে বসিয়া পড়িল । তাব হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছে । দ্বার বন্ধ করিয়া বল্ফ অগ্নির সম্মুখে আসিয়া বসিল । পকেট হইতে ছোট শিশি বাহির করিয়া লোহিত তরল পদার্থটুকু সে গলাধঃকরণ করিল । তাব পর একটা পাইপ ধবাইয়া নিজের মনে কহিল,—আঃ ! একটা রাত্রি আগামে কাটাইব । অশ্রু—অশ্রু—চাবি-ধার হইতে একটা নিবানন্দ ভাব যেন আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল !

বাহিরে বায়ু গর্জিতেছে । তুষারের টুকরাগুলি দরজা-জানালায় টুকটুক করিয়া আসিয়া ঘা দিতেছে । ক্ষুব্ধ নেকড়ে ভাবণ চীৎকার স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর শুনা যাইতেছিল !

একটা বোতলের ছিপি খুলিতে খুলিতে রল্ফ কহিল,—বাঃ চারিদিকে যেন আজ আনন্দের উৎসব লাগিয়াছে !

৩

পরের বৎসব—তেমনই প্রচণ্ড শীত । ঘরের বাহির হওয়া যায় না ! অনশনে নেকড়ের গ্রাসে গ্রামের লোক প্রাণ হারাইতেছে ।

প্রতি নেকড়ের মাথা-পিছু যথেষ্ট পুষ্কব ঘোষিত হইয়াছে ! শিকারীর দল বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—শীতজর্রব নিস্তব্ধ বাত্রে তাদের বংশাধ্বনি ও কুরুবগুণাব চীৎকার এই ভীষণভাবে মনোও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে !

রল্ফের বাড়ীর পাশ দিয়া তারা চলিয়া যায়—পুরানো কাহিনী মনে পড়ে, তাদের কঠোর প্রাণ শিহরিয়া ওঠে !

কাবের ও তার কণ্ঠার অন্তর্ধানের পর গ্রামের লোক

রল্ফের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল । রল্ফ বলিয়াছিল, গ্রামে ফিরিয়া সে দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই । খুঁজিতে খুঁজিতে পথে সে রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড ও কয়েক-টুকরা অস্থি দেখিতে পায় । তাহা দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারে—কাবের হয়তো, বনে রল্ফের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল । তাব পর, নেকড়ের গ্রাসে—হায়, হায়, কি দুর্দৃষ্ট রল্ফেব !

গ্রামের লোক কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করে না । তারা বলে, রল্ফই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া পথে অস্থি ও বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে ! নিশ্চয় ।

৪

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল । রল্ফ আশুনের কাছে বসিয়া হাত-পা গরম করিতেছে ! সহসা সে শুনিল, দ্বারে কে আঘাত করিতেছে !

কোন পথচারী পথিক আবার কি ! তাব জ্ঞান রল্ফ এ বিশ্রাম-অবস্থায় নষ্ট করিতে পারে না । এখনও দ্বারে ঘা দিতেছে ? আবার ? কি নিগঞ্জ !

রল্ফ দ্বাৰেব দিকে চাহিয়া কহিল,—দাও ঘা, যত ইচ্ছা, দাও । আমার বাড়া আমার নিজের জন্ত—বরফ-মাখা ভিখারীগুলার জন্ত নয় ।

কিন্তু নারীকণ্ঠে কে ঐ ডাকে না ? বেশ সুস্পষ্ট, মিষ্ট সুর !

রল্ফ, রল্ফ, দ্বার খোল । শীঘ্র দ্বার খোল । বড় দরকার !—

এ কি, তাহাবই নাম ধরিয়া ডাকে যে ! রল্ফ ভাবিল, কে এ নারী ? কি চায় ? একাকিনী অস-হায় অবস্থায়, এই ভীষণ সন্ধ্যায় নারী পথে বাহিব হইয়াছে ! আবার রল্ফের বাড়ীতে আশ্রয় চায় ! বিষয়েব কথা ! এ কি তাহারই কোনও পূর্ব-প্রণয়নী ! প্রেম-অভিব্যক্তিব পক্ষে কাল ও স্থান বেশ অনুকূল বটে ! এই প্রচণ্ড শীত ! ভীষণ সন্ধ্যা ! কি এ প্রেমিকা !

রল্ফ দ্বাৰে দ্বাৰে তার খুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে গরম কাগড়ে আপাদমস্তক আবৃত, মুক্তকুণ্ডলা অপূর্ণাঙ্কলা কিশোরী মূর্তি ! কেশদাম আশুপ্লব লুটিত ! এই ঘন-তুষারপাতের মধ্য দিয়া চণ্ডিয়া আসিলেও কি অপূর্ণ লাভণ্যময়ী !

রল্ফ অনেকক্ষণ স্থির নয়নে দেখিতে লাগিল, পরে কহিল,—“তুমি আশ্রয় চাও ? কিন্তু ভীষণ বাত্রে একাকিনী বাহিব হইয়াছ যে ! বড় দুঃসাহস তোমার ! ঐ শোনো নেকড়ের চীৎকার ।”

কিশোরী মূর্তকণ্ঠে কহিল,—দুঃসাহস নয় ! এই বনেই আমি থাকি ! রাত্রি ভীষণ বটে, কিন্তু আমার কর্তব্য

কঠোর! আমি তোমাকে নিয়ে খাবার জন্ত এসেছি! এখন এস বল্ফ, এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়।

বল্ফের দেহের মধ্য দিয়া একটা সূদূর ভয়ের বিদ্যুৎ-শিখা যেন বহিয়া গেল। তবু কি, তাতা জীবনে বোধ হয় বল্ফ আত্ম প্রথম অতীব করিল!

বল্ফ কহিল, কি হু—

—চপ।—কিশোরী ক'হল,—কিন্তু না! এস—এখনই—

‘না’ বলিবার শক্তি যেন বল্ফের ছিল না। সে যন্ত্রণালিতির মত দ্বিতীয় বাক্য ব্যতিবেকে কিশোরীর অনুসরণ করিল।

\* \* \*

বনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে। গাছপালা যেন ভাঙিয়া পড়িবে! তাতার উপর, এই কনকনে বাতাস তাড়ে গিয়া ঝিকিঝিকি করিল।

বল্ফ, কাঁপতে-কাঁপিতে কহিল,—হে, কি শীত।

কিশোরী বল্ফের দিকে দ্রিষ্টিয়া চাহিল, কহিল,—হাঁ, খুব শীত। যেদিন কাবেণকে তার শিশুর সতিত গৃহে বা হঠাৎ তাড়িয়া দিয়াছিলে, সেদিনও ঠিক এমন শীত ছিল!”

বল্ফের দেহ কম্পিত হইল। এ অপরিচিতা নারী কাবেণের কথা ক'বিয়া জানিল?

কিছুক্ষণের জন্ত কাতারও মুখে কথা নাই। পায়েৰ কাছে বহক প'ড়কা গুঁড়া হইয়া যাইতেছে! দূরে হঠাৎ নেকড়েৱ চীৎকার শুনা গেল। বল্ফ কহিল,—ঐ নেকড়ে! আঃ, আমি যদি আমার বন্ধু বা কুঠারটা সঙ্গে আনিতাম! শেষে নেকড়েৱ মুখে প্রাণ দিব!

কিশোরী কহিল,—সেদিনও নেকড়েগুলি এমন ক্ষুধিত ছিল, তাদের দংশন এমন ভীষণ ছিল, যেদিন কাবেণ ও তার কজা এই বনে প্রাণ হারায়!

বল্ফ চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে তুমি, বলো!

কিশোরী গভীরকণ্ঠে কহিল,—এখান জানিবে, ব্যস্ত হয়ে না।

আবার জুজনে চলিতে লাগিল। বাতাস আরও গর্জন করিতে লাগিল, শীত আরও প্রচণ্ড হইল। বল্ফের দেহ অবশ হইয়া আসিল। তার নাক-মুখ বহিয়া টুং-টুং করিয়া ছুঁ ফেঁটা রক্ত পড়িল।

বরফের উপর বল্ফ বসিয়া পড়িল, বদ্ধভাবে কহিল,—আমাকে মারিয়া ফেল, আব আমি হাঁটিতে পারি না।

হঠাৎ বল্ফ চাহিয়া দেখে, এ সেই স্থান! এখানে কাবেণের রক্তমাখা বস্ত্রগু সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল। এত ভূয়ঃপাত্তেও সে রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই! ঐ না ওখানে বরফটা এখনো লাল টুকটুক করিতেছে! উঃ!

কিশোরী কহিল,—বল্ফ, মনে পড়ে?

বল্ফ দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিশোরীর চোখ দুটি যেন তারার মত জ্বলিতেছে। জাহ্নলুপ্তি কেশের উপর স্বর্ণ ঝরিতেছে!

বল্ফ কহিল,—কি?

কিশোরী কহিল,—এই স্থান—মনে পড়ে?

বল্ফ চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে তুমি? বলো, বলো, তুমি দানবী, না দেবী, না উন্মাদিনী। কি তুমি চাও? কেন তুমি আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে? তুমি কি জানো না, এখনই হয় প্রচণ্ড শীতে, নয় নেকড়েৱ গ্রাসে প্রাণ হারাইব? আঃ! এই ভয়ঙ্কর সময়ে এখনও তোমার মুখে হাসি? ওঃ! কে তুমি? পাখাণী, নারী তুমি?

কিশোরী গভীরকণ্ঠে কহিল,—ঠিক এক বৎসর পূর্বে, এই স্থানে অসহায় অবস্থায়, এমনই ভাবে কাবেণ কি প্রাণ হারায় নাই? বল্ফ, তার কথা এত শীঘ্র তুমি ভুলিয়া গেলে। বেচারী কাবেণ!

বল্ফের আপাদ-মস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কিশোরীর হাত ধরিয়া চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কোথায় লুকাইল? সে কি তবে ছায়া? বিভীষিকা? কাতার অনুসরণ করিয়া সে এতদূর আসিয়াছে? বল্ফের শির ভগ্ন বরফের উপর লুপ্তি হইতেছিল। কাতার মুছ কণ্ঠে বল্ফ কহিল,—তুমি কে, তা বলবে না?

বল্ফ শুনিল, দূর হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে কে কহিল,—আমি নিয়্যাত। যে কাজ কবেছ, তাব প্রাতিফল দেবার জন্ত আমি এসেছি! পাপ কবে কেউ বিধাতার রাজ্যে পরিভ্রাণ পায় না। নির্দোষ বা দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে পরিভ্রাণ নেই! কেহ শীঘ্র ফল ভোগ কবে, কেহ বা ছাদন পূরে! আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! ঐ শোনো, নেকড়েৱ চীৎকার! আরও কাছে! ঐ দেখ, দূরে ছায়ার মত কি ছুটিয়া আসে! আমি আদি...

দিনের আলোয় গ্রামের লোক দেখিল, বরফের উপর কতকগুলি অস্থিগু ও একটা রক্তাক্ত জামা পড়িয়া রহিয়াছে। এ নামা বল্ফের না? কিন্তু বন্ধু বা কুঠার ভুলিয়া বল্ফ এমন অবস্থায় বনে আসিল কেন? অমৃত্যুপেব জালায়? না, চিন্তার তাড়নায়? কে উত্তর দিবে? বল্ফের মৃত্যুব কারণ কি, কেহ জানিল না! মুক বনানী সে গোপন রহস্য মানুষের কাছে ভাঙিল না! শুধু পত্রমণ্ডলে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল!

# মুক্তার মালা

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত

## কুশী-লব

ব্রজেন্দ্র	...	...	পনাচ্য যুবক—বয়স ত্রিশ বৎসর।
লীলা	...	...	ঐ স্ত্রী—বয়স একুশ বৎসর।
বিন্দু	...	...	লীলার দাসী।

দৃশ্য—লীলার কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

[ কক্ষমধ্যে একধারে একখানি বৃহৎ দর্পণ, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লীলা সাজসজ্জায় ব্যস্ত। পাশে অলঙ্কারাদি ছড়ানো রহিয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের মাহুলা-লয়ে তাহার মামাতো ভাইয়েব বিবাহোপলক্ষে প্রীতি-ভোজন, সন্ধ্যাবেলা নিমন্ত্রণে যাইবে। সংসারে ব্রজেন্দ্রনাথের বিধবা মাতা ও অগ্ন্যন্ত পোষ্যবর্গ আছেন। লীলা ধনি-কন্ডা, আদরের বধু এবং শিক্ষিতা। ]

লীলা। যত তাড়াতাড়ি করত যাই, ততই একটা না একটা বিভ্রাট ঘটে! ক্রটি আবার কোথা গেল? ভালো জ্বালা! (খুঁজিয়া ক্রট আঁটিতে লাগিল) এঁরো আজ দেখা নেই! যাবার আগে একটু দেখা হবে, তার জোকি! কি মহাকাশে ঘোরেন, তাও বুঝি না। দিবারাত্রি টো-টো-টো! ভালো লাগে? হুঁদণ্ড আমার সঙ্গে কথা কবার সময় হয় না, পাঁছে স্ত্রৈণ হয়ে পড়েন! ঐ যে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে! কোকিলের ডাক শোনা গেছে! বসন্ত তা হলে আসছেন! (ব্লাউশের বোতাম আঁটিতে লাগিল।)

ব্রজেন্দ্রনাথের প্রবেশ

ব্রজেন্দ্র। মরি, মরি এ কি রূপ হেরি!

জীবন্ত মাদুরী,—

দেবী কোন্ পশিয়াছে গেছে

লাবণ্য উথলে, সারা অঙ্গ ব্যক্তি—

না, আব পারি না। বাপ! কাবু কি ভীষণ ব্যাপার!

লীলা। থামো, থামো। বাঙলা সাহিত্যের গলা টিপে আর খুন করো না।

ব্রজেন্দ্র। যথা আজ্ঞা, স্থলোচনে।

লীলা। তুমি বে দেখছি, অভিনয় আরম্ভ কবে দিলে।

ব্রজেন্দ্র। বটে! এটা অভিনয়-মঞ্চ নয়! আমার ভুল হয়েছিল! তুমি এমন সাজিত সুন্দর দেখে, ব্রজেন্দ্র-গেহে 'লক্ষ্মীরিয়ং অমৃতবর্তি-নন্দনয়ো' হয়ে দাঁড়িয়ে আছ—সে দিন টাবু দেখে এসেছি—এখনো তার নেশা ছাড়েনি।

লীলা। বেশ, আব বিভ্রমে কাজ নেই! প্রকৃতিস্থ হও।

ব্রজেন্দ্র। যথা আজ্ঞা! তবে অকস্মাৎ এ অধীনকে মোহিনাবেশে প্রলুব্ধ করবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিলো জানতে পারি?

লীলা। তুমি মজার লোক দেখছি। হাবুঠাকুরপোর বিয়ের আজ বোঁভাত না? ভুলে বসে আছো, যাবে না বুঝি?

ব্রজেন্দ্র। (উদরে হস্ত রাখিয়া) সেটা একেবারে ভুলে বসেছিলুম। তাতো না, না হলে গাঁটের পরস্য বার কবে হোটেলের কতকগুলো কুপন্য গলাধঃকরণ করে এলুম!

লীলা। এমন পেটুক যদি জন্মে দেখে থাকি! এক মুহূর্ত্ত যদি না খেলেন, তো মুহূর্ত্ত যাবার উপক্রম।

ব্রজেন্দ্র। অপবাদ যখন দিলে, তখন স্পষ্টই বলি, সম্প্রতি এ-টু অপর-স্বভাব জন্ম কাতর হয়ে পড়েছি।

(লীলাকে চুপন কারল)

লীলা। আঃ,—চাডো। (মুখ সবাইয়া লইল।)

ব্রজেন্দ্র। ইতর জনকে মিষ্টান্ন থেকে বঞ্চিত করতে চাও? তা রে পাবাণী।

লীলা। জাখো, তোমার ও সংখের খিয়েটার-মিয়েটার-গুলো ছাডো দিকি? দুদণ্ড স্থির হয়ে কথা কবার জো নেই—নাট্টের গং আওড়াতে বসলে!

ব্রজেন্দ্র। তবে দেখুন—মহীয়সী মণ্ডলে, এ অশম আপনায় কাজে গেছলো—(পকেট হইতে ছোট বাস্ত্র বাহির করিয়া মুক্তার মালা বাহির করিল) এই নাও।

লীলা। বাঃ বেশ তো! এ তোমাদের টেটের নকল মুক্তো বুঝি? ছোট খুড়ির গলায় সে দিন দেখেছিলুম—দেখে কিছু দয়া যায় না।

ব্রজেন্দ্র। তুমি যে জল্পরী হয়ে উঠলে! কারো অন্ন আর লাখবে না দেখছি।

লীলা। তার মানে?

ব্রজেন্দ্র। এটি আসল মুক্তার মালা। তোমার জ্ঞান কিনে আনলুম। সত্যেনের দ্বীর্ঘ ছিল, ডোয়া গহনা সে আগাগোড়া এচেবে। তাই আনলুম। তোমার যদি পছন্দ হয় রাখি। কি বলো?

লীলা। কত দাম?

ব্রজেন্দ্র। দাম শুনলে তবে বুঝি পছন্দ হবে! বাঃ! পছন্দর standard বেশ। তা এর দাম নেহাৎ মন্দ নয়।

লীলা। কত?

ব্রজেন্দ্র। আটশ' টাকা।

লীলা। আটশ' টাকা?

ব্রজেন্দ্র। সন্দেহ হচ্ছে?

লীলা। মা দেখেছেন?

ব্রজেন্দ্র। না—দেখিয়ে তুমি! মা সেদিন মুক্তার মালার কথা বলছিলেন।

লীলা। তাহলে নেওয়া যাক্। আজই দাও, হাবু-ঠাকুরপাদের বাড়ী গলায় দিয়ে যাই।

ব্রজেন্দ্র। এখনো দাম দেওয়া হয়নি। তা এখন শোনো, দোহাই তোমার—ও নকল হীরে-মুক্তোগুলো আর পরো না। জি! যে একটু জানে, তাব চোখে ধরা পড়তে দেবী হয় না!—কি যে ঢেউ উঠেছে। টেটেরা পরসা বড় লুঠ করলে না! কতকগুলো ধুলোমাটি যা-তা দিয়ে—আচ্ছা টাকাটা কামালে!

লীলা। ছোট খুড়ি অনেকগুলো জিনিস নিয়েছেন—ঠিক এই বকম সন্সার মালা নিয়েছেন—দাম মোটে ষোল টাকা! (গলায় পারল)

ব্রজেন্দ্র। জাখো লীলা, এখন আসল কথা শোনো—জিনিসটা কিনতে কিছু পরসা লেগেছে—এটি যেন ইয়ারিং আন্টার মত হারিয়ে বসে না,—জিনিসপত্রে একটু বন্ধ

শেখো। জিনিস হাবানোব বন্ধ যদি খেতাব মেলবার সম্ভাবনা থাকতো তো তুমি 'মহারাজা'-টাক্স গোছ একটা খেতাব পেতে। অন্তঃঃ 'কাইসাব-ই হিন্দ' গোনায় মেডেল। এবছর কটা জিনিস হারিয়েছ দেখি,—আংটি দুটো, পাথর বসানো, আর সেই সাপ মুখোটা,—আর ইয়ারিং একটা, সোনার শাঁখা, টিকণি। ওঃ, এ যে সংখ্যা করা যায় না।

লীলা। আচ্ছা, আচ্ছা, থামো। আমি কি ইচ্ছে করে হারাই?

ব্রজেন্দ্র। না। তাদের তাত-পা আছে, জোর জবরদস্তি করে সব ছুটে পালায়।

লীলা। আচ্ছা গো আচ্ছা—আব ঠাট্টা করতে হবে না—এবার খুব যত্ন করে রাখবো, তখন দেখো!

ব্রজেন্দ্র। বেশ, তোমরা তবে যাও। হাবুদের বাড়ী আমি রাত্রে যাব, এখন আবার ইলেক্ট্রিক লাইন সারবার জ্ঞান লোক এসেছে। দেখিগে, বাইবে বসে আছে। তোমরা ফিব্কে বেশী দেবী করে না।

[প্রস্থান।

লীলা। (দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া) নাঃ—আমারই দোষ! কেমন যে কুড়োম দবে—গহনাগুলো খুলে কোথায় ফেলি, কিছু ছঁস থাকে না। এবার থেকে আগে গহনাগুলোব ব্যবস্থা কব্বো, (মুক্তার মালা খুলিয়া টেবিলে রাখিল) কামাসখানা বার কবি।

বিন্দু। ওগো বৌদিদি, মা একবার ডাকছেন—তাঁর কি দরকার—এখনি তুমি একবার এসো।

লীলা। কেন রে?

বিন্দু। তা আমি জানি না ;—বললেন, শীগগির একবার আসতে বল।

লীলা। চ'!

[লীলা প্রস্থান

বিন্দু। বাঃ, বেশ হার দেখছি! দাদাবাবু বুঝি আজ কিনে এনেছেন। কই, এত দিন দেখিনি। জা' হ'লে আমাদেরো বখশিস্ নোবো, বৌদির কাছ থেকে। গহনা হাবালে বকুনি খাবো, আর নতুন গহনা হলে বুঝি বখশিস্ পাবো না? বা রে! বাই বলিগে।

[প্রস্থান

(ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। বকিয়ে দাঁড়ালে বোটা! (মুক্তার মালা দেখিয়া) দেখেচো, এত করে সাবধান হতে বললুম—তা গ্রাস্থ নেই! এখানে বেশ ফেলে বেধে চলে গেছে! নতুন চাকব-বাকব! এখনি যদি কেউ তুলে নেয়! যদি

না নেয়, তা'রা গাধা! নাঃ—লীলাকে নিয়ে আর পারা গেল না! ভাগ্যে আমি এলুম! দাঁড়াও—জন্ম কর্ছ। (মুক্তার মালা হাতে তুলিয়া) কোথায় এখন লুকিয়ে রাখি? (পকেট হইতে রূপার ডিবা বাতির করিয়া) বেশ হয়েছে—এর মধ্যে পুরে পকেটে রেখে দি। ভারী জন্ম হবে'খন। (ডিবার মধ্যে হার রাখিবে, এমন সময় বিন্দুর পুনঃ-প্রবেশ)

বিন্দু। ও কি গা, দাদাবাবু? ডিপের মধ্যে হার রাখ্যো কেন? ও—বুকেচি—লুকিয়ে রাখ্যো?

ব্রজেন্দ্র। কে? বিন্দু! দেখ দেখি তোব বৌদিব আক্কেল! সামনে এমন ফেলে গেছে, নতুন লোক-জন এখনি কে নেবে'খন—তার পর খান-ফৌজদারী কেব মরি আমি! তুই তাকে বলিসনি যে আমি রেখেছি! যদি তোর বৌদি খোঁজ করে বলিসনি। আমি যে এ হবে এসেছি, তাও বলিসনি। যদি জিজ্ঞাসা করে বলিস—আলো সাবাবার জগু ইলেকট্রিক আসো-ওয়াল এসেছিল।

বিন্দু। বাঃ, বাঃ, বেশ হবে। কিন্তু আমার বখশিস্ চাই!

ব্রজেন্দ্র। আচ্ছা, আচ্ছা।

[প্রস্থান।

বিন্দু। ঐ বুঝি বৌদিদি আসছে—শ্রামিও লুকেট একটু।

[প্রস্থান।

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

লীলা। (টেবিলের নিকট আসিয়া) কৈ—মালাছড়া কোথায় গেল? বাঃ, কোথা রাখলুম আবার? এই খানেই বেখে গেছলুম! নাঃ, আমার মাথা খুঁড়ে মরুতে ইচ্ছে হচ্ছে! মাগো! শুনলে এখনি কি বলবে! তা বলে একটুও ঘর থেকে কি মানুষ বেরোবে না? আচ্ছা, গেরো! (চতুর্দিকে অন্বেষণ) কোথাও যদি পাই। টেবিলের উপর রেখেছিলুম, বেশ মনে আছে আমার! চোর যেন ওৎ পেতে বসেছিল! নাঃ, এমন হলে আর পারি না! বাবা রে,—আমার ডাক ছেড়ে কীদতে ইচ্ছে হচ্ছে!—বিন্দু—বিন্দু—(নেপথ্যে—বিন্দু। কেন গা বৌদি?)

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। ডাকচো?

লীলা। আচ্ছা, আমি চলে যাবার পর, এ' ঘরে কেউ এসেছিল?

বিন্দু। আমি বাবু পানকট্টা ধুতে গেছলুম।

লীলা। আহা, তোকে বলছি না। বলি—আব কেউ এসেছিল কি না, জানিস?

বিন্দু। আমি কি করে জানবো গো? আমার তো আর ঘাড়ে পিঠে চোখ নেই!

লীলা। আ মব, আবার চেষ্টা! বলি, দেখেছিছ কি কাউকে?

বিন্দু। কেন গা, বৌদি?

লীলা। এমন জিজ্ঞাসা করছি—(টেবিলের নীচে খুঁজিতে লাগিল)

বিন্দু। কিছু হারিয়েছ নাকি, বৌদি?

লীলা। দেখ, কাউকে বলিসনি, মস্ত বিপদে পড়েছি আমি! মুক্তার হার,—নতুন,—একবারে আটশ টাকা দাম, তোর দাদাবাবু এখনি এনে দিয়েছেন—মা এখনো দেখেন নি! এই খানে বেখে আমি মার কাছে গেছলুম—এসে আর দেখতে পাচ্ছি না। কে নিলে? আমারো যেমন গেরো—যদি সঙ্গে নিয়ে যেতুম!

বিন্দু। ও মা, বলো কি গো? ঐ যে মিসেরা বেরিয়ে গেল, তাহ'লে তাদের কাজ নয় তো বৌদি?

বিন্দু। কোন মিসে?

বিন্দু। কেন, ঐ যে আলোওয়াল মিসে গো বৌদি, ইলেকট্রিক আলো সাবো। ও মা, দিনে ডাকাতি?—আম্পর্কিও কম নয়। এ কথা এখনি দাদাবাবুকে বলতে হবে—খানা-পুলিস ডাকুক। ও মা, এ কি কথা'গো!

লীলা। কিন্তু, এখন তুই চূপ কর! তুই কাকেও বলিস নে কিছু! সে আমি বলবো'খন! আগে তুই এক কাজ কর দেখি! ছোট খুঁড়ি কাছে চট করে যা—তার কাছে থেকে তার মুক্তার মালা ছড়াটি চেয়ে নিয়ে আয়—আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি!

বিন্দু। তা বেন বাচ্ছি দৌদি, কিন্তু এত টাকার জিনিসটা! দেবী করা কি ভালো? কি জানি বাবু তুমি কি বোঝো! বড় মানুষের বড় কথা!

লীলা। আয় তুই, আমি চিঠি দিচ্ছি।

[প্রস্থান

বিন্দু। ও মা, এ কি কথা গো—(বলিতে বলিতে সবিস্ময়ে লীলার অহসরণ করিল।)

(ব্রজেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। কৈ? কোথায় গেল? হাবুদের বাড়ী চলে গেল না কি? হাবের খোঁজ না করেই? নারী-চরিত্র বটে! এখনি একটা বক্তৃতা করে কেলতে পারি কিন্তু শ্রোতার অভাব। আরে, এই যে

আসছেন। বাঃ! গলায় মুক্তার মালাও দেখাচ্—  
কি বদ্বিগ্ধালম?

( লীলার পুনঃ প্রবেশ )

কি গো, এখনো তোমরা যাওনি? তোমাদের  
সাহসসজ্জা করুণে বে কর্ণবাড়ীর লুচি-তবকাবী ফুবিরে  
গেল।

লীলা। না—এই যে যাচ্ছি! দেখি, মাব দেবী কত!

[ প্রস্থান

ব্রজেন্দ্র। তাই তো! এ মালা পেলে কোথায়?  
ফস্ কবে আমি জিজ্ঞাসা করতেও পাচ্ছি না। এই যে  
বিন্দু—

( বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ )

বিন্দু। ও মালা কোথায় পেলে?

বিন্দু। আমাকে বলতে মানা করেছে বৌদি।

ব্রজেন্দ্র। নে—বল্—একটা টাকা দোবো'খন।

বিন্দু। আমাকে বৃত্তি ঘুসখোর পেলে—দাদাবাবু?

ব্রজেন্দ্র। আবার জাকামি কবে! বল্ না।

বিন্দু। হার খুঁজে না পেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে,  
কে এসেছিল এ ঘরে। আমি বল্‌লুম, ইলো ঠিক্ অলা-  
ওলা। তখন চপিচপি ছোট খুঁড়ির কাছ থেকে তাঁর  
হার আনতে বল্‌ল। আমি এনে দিলুম। এই যে  
বৌদি—

ব্রজেন্দ্র। আমার জন্ত পান আন তো বিন্দু।

[ বিন্দুর প্রস্থান

( লীলার পুনঃ প্রবেশ )

লীলা। এই যে তুমি! মা তোমাকে ডাকছেন—বৌ  
দেখবার জন্ত গিনি চাই—না—কি চাই!

ব্রজেন্দ্র। এখনো তোমাদেব হলো না—ষ্টেজ নামতে  
যাচ্ছ না তো!

[ প্রস্থান।

( বিন্দুর পান লইয়া পুনঃ প্রবেশ )

বিন্দু। দাদাবাবুর ডিপে কোথা গা বৌদি? পান  
চাইলেন!

লীলা। দে আমার কাছে। (পান লইল) তুই  
কিছু বলিস্নি তো বিন্দু?

বিন্দু। তুমি ক্ষেপেচো বৌদি? তেমন বিন্দু পাওনি।

লীলা। তাই তো বিন্দু, যেতে আমার একটুও পা  
সরছে না। অত টাকার জিনিষটা হাবালুম—বুড়ো  
মাগী! ছিঃ, ছিঃ!

বিন্দু। তাই তো বৌদি!

লীলা। রাত্রে ঘিরে এসে বলবো—এখন বললে হৈ  
টে পড়ে যাবে, এসে আব একবার ভালো করে খুঁজবো!  
না হলে মার খেয়ে মরবে সব চাকর-বাকরগুলো!

বিন্দু। সে আর পেয়েছ! গে মিলে পাকা চোর!

লীলা। পালাবে কোথায়? অত টাকার জিনিষ!  
যাই আমিই পান নিয়ে!

[ প্রস্থান

( ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ )

ব্রজেন্দ্র। মেয়েদের নিয়ে সংসার করার চেয়ে বনে  
যাওয়া ভালো! সময়ের গলা টিপে খুন করতে এমন আব  
ছুটি নেই! জালাখ্যাপার দল সব! কই, পান কই?

বিন্দু। বৌদি যে নে' গেল। বাঃ!

ব্রজেন্দ্র। ( টেবিলে ডিবে রাখিয়া জামা খুলিয়া বসিল  
এবং সিগারেট ধরাইল; পরে, মনে-মনে গান ধরিল—

“কেন হবে রাগা সে যে যাবে চলে,  
মিলন-যামিনী গত হলো।”

( লীলার পুনঃ প্রবেশ )

লীলা। এই যে তুমি! পান নিয়ে ঘুবে বেড়াচ্ছি  
আমি—যেন লুকোচুরি খেলা!

( বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ )

বিন্দু। দাদাবাবু, মাখ'না বললে, সঙ্গীত সমাজ থেকে  
কে একজন বাবু এসেছেন।

ব্রজেন্দ্র। ( লাফাইয়া উঠিল ) ভক্টু! আঃ, বাঁচলুম!  
বিহার্দালের তারিখটা এবার ঠিক করে ফেলা যাবে!  
ওগো, তোমরা আব দেবী করো না।

লীলা। না। এই যে মা! আল্লিকটা সেরে নিলেই  
আমবা যাচ্ছি!

[ ব্রজেন্দ্রনাথের প্রস্থান

দেখচো, পান নেবেন, তা আর হুঁস নেই! এই যে  
ডিপে। বিন্দু, পানগুলো বাইবে পাঠিয়ে দে তো—আরো  
গোটাকত বেনী করে দিস্—কে সব ভজলোক এসেছেন!  
( ডিপে খুলিয়া ) বাঃ, এই যে আমার মুক্তার মালা। এ  
তবে ঠিক কাজ! বিন্দু, এই দেখ আমার হার। তোর  
দাদাবাবু লুকিয়ে রেখে জব্দ করছিল!

বিন্দু। তুমিও বদ্ব করে দাও, বৌদি!

লীলা। আঃ, প্রাণটা বাঁচলো! দেখদেখি অম্মায়!  
উঃ, আমাকে একটু আভাষ দিলেন না। দাঁড়াও,  
আমিও জব্দ করছি। ডিপেটা বারান্ডার ধারে রেখে দিইগে,  
খালি ডিপে ওখানে দেখে বাবুসাহেব চমকে উঠবেন!  
বিন্দু, তুই অগ্ন ডিপেতে পান পাঠিয়ে দে। নিজের মালা  
গলায় দি। ছোটখুড়ির মালাছড়াটা তারপর দিয়ে আসিস!

বিন্দু। যা বলবে বৌদি আমি তাই করবো!

লীলা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে!

(ব্রজেন্দ্রনাথের পুনঃ প্রবেশ)

ব্রজেন্দ্র। ডিপেটা কোথায় রাখলুম! তাই তো!

(লীলার পুনঃ প্রবেশ)

তোমার গলায় টেটের মুক্তো কেন?

লীলা। টেটের মুক্তো! তুমিই বললে, আসল!

ব্রজেন্দ্র। সে তো আমি যে ছড়া এনেছিলুম।

লীলা। বাঃ, এই তো সে ছড়া।

ব্রজেন্দ্র। আমার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়!

হীবা জ্বরং দেখে বুড়ো হয়ে গেলুম।

লীলা। বেশ বাবু, তুমিই বললে, আসল মুক্তো, দাম 'আটশ' টাকা।

ব্রজেন্দ্র। আব লুকোচ্ছ কেন? ছোটখুড়ির কাছ থেকে হার চেয়ে এনেছ! আমি কি জানি না?

লীলা। কে বললে?

ব্রজেন্দ্র। বিন্দু।

লীলা। ও সে তো একবার এনেছিলুম—দুটো মিলিয়ে দেখবার জ্ঞা!

ব্রজেন্দ্র। বটে! বিন্দু বললে দাদাবাবু, বৌদির নতুন হার চুরি গেছে, পুলিশে খবর দাও। বৌদি ভয়ে বলেনি—ছোটখুড়ির কাছ থেকে চুপিচুপি তাঁর হার চেয়ে আনালে।

লীলা। সত্যি একোমার হার।

ব্রজেন্দ্র। আবার, মিছে কথা।

লীলা। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

ব্রজেন্দ্র। (গম্ভীর কণ্ঠে) লীলা—

(বিন্দুর পুনঃ প্রবেশ)

বিন্দু। দাদাবাবু, তোমার ডিপে ঐ বাবাণ্ডার কোণে পড়েছিল।

ব্রজেন্দ্র। (সাম্যে) এঁয়া। (ডিপে লইয়া তাহা খুলিয়া ঝালি দেখিয়া) লীলা, সর্বনাশ হয়েছে।

লীলা। কি?

ব্রজেন্দ্র। চুরি! চুরি—

লীলা। ও মা, কি চুরি হলো?

ব্রজেন্দ্র। তবে খুলে বলি! তোমার হার টেবিলে পড়ে ছিল, তোমাকে শিক্ষার দেবার জ্ঞা আমি ডিপের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলুম—তারপর ডিপেটা কোথায় ফেলেছিলুম, মনে ছিল না। এখন দেখছি, কে ডিপে খুলে সে হার নিয়েছে। এখন সমস্ত চাকর-দাসীর ঘরে-বাক্সে তল্লাস করবো। দারোয়ানকে বলে দি, সদর খিড়কী সব বন্ধ করে দিচ্—কেউ যেন না বাহিরে যায়।

বিন্দু। ও মা কি সর্বনাশ গো! সেই বামুন ছোঁড়া নতুন এসেছিল—সে যে এইমাত্র মিনিকারেণে যাকে বলে চলে গেল। তার কাজ নয় তো?

ব্রজেন্দ্র। এঁয়া! তবে এ তারি কাজ! দারোয়ান—  
[শশব্যস্তে গমনোদ্ভূত।

লীলা। চূপ চূপ! বিন্দু, তুই দারোয়ানকে বলগে যা ত...

[বিন্দুর প্রস্থান]

ব্রজেন্দ্র। এখন ডেকো না—আমি নিজে যাই।

লীলা। শোনো...

ব্রজেন্দ্র। কি?

লীলা। আমাকে মাপ করো! সে হার আমি নিয়েছি।

ব্রজেন্দ্র। ডিপে থেকে?

লীলা। হাঁ। এই যে গলায় রয়েছে আমার।

ব্রজেন্দ্র। ছোটখুড়ির হার?

লীলা। বিন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। হাব খুঁজে না পেয়ে ভাবলুম, বাত্রে এসে আর একবার খুঁজবো। তারপর তোমাকে বলবো। আবার ভাবলুম, দাদাকে দিয়ে আমার ছ-চারখানা সোনাব গহনা বিক্রী করে চুপিচুপি মুক্তোর মালা কেনাবো। তুমি এই ঘবে ডিপে রেখে গেছলে—বাতিবে পান পাঠাবার জ্ঞা তোমার ডিপে খুলে দেখি আমার সেই মুক্তোর মালা তার ভিতরে রয়েছে। তাই, তোমাকে একটু জব্দ করেছি। তুমি আমাকে জব্দ কবছিলে, তা'পি শোধ দিয়েছি আমি!

ব্রজেন্দ্র। বেশ করেচো!

লীলা। এখন দেখলে, ভুল সকলেরই হয়!

ব্রজেন্দ্র। আঃ, তবু ভালো বে পাওয়া গেছে!

লীলা। নিপুণ জহা—হীরে-জহরং চেনো খুব, না? টেটেব হার নয়?

ব্রজেন্দ্র। যাক্ সে কথা—তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে আমাদের জয়লাভ বে অসম্ভব। লীলা, এখন এসো সন্ধি করা যাক্!

লীলা। বহুৎ আচ্ছা!

[ব্রজেন্দ্র লীলাব অধরে চুষন করিল।]

ব্রজেন্দ্র। (স্বর করিয়া)—

"আজি কোন্ ধন হতে বিশ্বে আমাণে

কোন্ জনে করে বঞ্চিত!

তব চরণ-কমল রতন বেগুকা—"

লীলা। চূপ!

(নেপথ্যে বিন্দু। বৌদি, মার আফ্রিক সারা হয়েছে—তুমি এসো।)

লীলা। তবে আসি!

ব্রজেন্দ্র। যখা আজ্ঞা!

# দু'দিক

[ নাটিকা ]

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## দু'দিক

শান্তি। তুমি খামো। আমার ও সব কাব্য ভালো  
দৃশ্য—পশ্চিমের এক বাংলা-বাড়ীর সামনে ঢাকা-বারান্দা।  
হুধারে বেগি। বারান্দার সিঁড়ির উপর কয়েকটি টবে  
তাগী ফোটন প্রভৃতি; দালানে ইজি চেয়ার, বেতের  
ক'থানা চেয়ার, টপ্পর। ইজিচেয়ারে বসিয়া শিবানী গান  
গাহিতেছে। শান্তি মাঝে-মাঝে ঘর হইতে বাহিরে  
আসিতেছে,—কখনো চায়ের পেয়ালা, কখনো খাবারের  
ডিশ্ বহিয়া। তিনটি পেয়ালায় চা ও দুধ ঢালিয়া সে  
চিনি মিশাইল; পরে শিবানীর পানে ঢাহিয়া দাঁড়াইয়া  
রহিল। শিবানীর গান থামিলে তবে সে কথা কহিল।

শিবানী।

গান

তুমি আসবে পাশে, জানি, জানি!  
আমার আশা সফল হবে, মানি, মানি।  
তবু হুধে রহে বখন, পায় না আঁখি—  
আমার নিখিল আঁধারে যে আসে ঢাকি!  
বেদনে মন দোলে, বুক হারায় বাগী!  
তোমা-ভাষা-নিমেষে যুগ অহুমানি।

শান্তি। নাঃ, তোমরা বেশ মজাব লোক! কেউ  
আমাকে গান গাইচো—ক'থো এখনো দেখা নেই!  
বেশ! কখন কি হবে, বুঝতে পারি না!  
শিবানী। তুই মোকদ্দ ভারী ধড়ফড়ে, শান্তি। তুখ্ না  
দু'দণ্ডে আকাশের পানে চেয়ে! দেশে তো  
আকাশ দেখতে পাস্ না! আর এখানে...

লাগে না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তোমার  
হলো? ইয়াগা, শুনচো?

[ নেপথ্য হইতে অনাদি। এই যে, স্নান সেবে  
বেবিয়েচি—মাথা আঁচড়াচ্ছি ]

শান্তি। এদিকে চা জুড়িয়ে শরবৎ হয়ে গেল। দূর  
হোক্ গে—যার ষা-খুশী কগো! আমি দাঁড়াতে  
পারি না। খাই। এইনাও তোমার পেয়ালা, শিবুদি।  
শিবানী। আমি এখন খাবো না। উনি...

শান্তি। তোমার উনি আবার এখন কোন্‌র রোমছন  
করতে লাগলেন। না বাপু, যত দায় যেন আমারি!  
...আমি খাই। অত নিষ্ঠা আমার নেই...

( চেয়ারে বসিয়া চা-পানে রত )

শিবানী। একটা কাজে বেরিয়েচেন...

শান্তি। আমরা এলুম,—অতিথি! অতিথির খাতিরে  
কাজে না হয় দু'দিন একটু চিল্ দিতেন! চিরদিন  
তো থাকবো না...

শিবানী। তা বটে,—তুই হলি সম্পর্কে জালিকা... নব-  
ফুল-মালিকা! তোর একটু খাতির দরকার। তা  
আমি জানি। তবে মাহুষটাকে চিনি স্তো...চাল-  
ভারি।

শান্তি। (চা-পান) আত্ম আনন্দ অনন্ত বাবু...বোঝা-  
পড়া করবো। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) তুমি কি  
মুজরোয় যাবে না কি—ইয়া গা? তোমার চুল বাঁধা  
যে আঁব শেষ হয় না!



[ গায়ে গেঞ্জি, পায়ে স্ফাণ্ডাল, সজ্জিত-কেশ অনাদির প্রবেশ; তার কাঁধে তোয়ালে; তোয়ালেয় সে কাণের জল মুছিতেছিল ]

অনাদি। ইস্, ভয়ানক চটতং! না?

শান্তি। বয়ে গেছে! তুমি কি মাহুব যে তোমার উপর চটবো! তা নয়...চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!... তাই বলা। খাও এখন ঐ ঠাণ্ডা চা। আমি আর ফিরে-ফিরতি তৈরী করতে পারবো না।

অনাদি। দেখছেন দাঁদ...আপনার ভদ্রীর স্বামি-সেবার নিদর্শন!

শান্তি। খামো। স্বামী আছো, স্বামীই আছো—তা বলে চাক্ষুশখট্টা অত গলবস্ত্র হয়ে মশাই-মশাই করতে পারবো না আমি। সেবার যদি এতই কাঙাল ছিলে তো আমার টপকে শিবুদিকে বিয়ে করতে পারো নি!

অনাদি। (গম্ভীর কণ্ঠে) শান্তি...

শান্তি। এতে আবার শান্তি কি! শিবুদিত নিষ্ঠা দেখচো? অনন্তবাবু আসেন নি, শিবুদি বসে বিরত-সজ্জিত গাইচে! চাটুকুও মুখে দেবে না। তাঁর খাওয়ার আগে খেলে পৃথিবী পাছে ভূমিকম্পে ভুলে ওঠে! সূর্য্য পাছে কক্ষচ্যুত হয়! আমার অত নিষ্ঠা নেই। স্বামী স্বামী—খাওয়া খাওয়া—যার যেমন কদর, তাই করবো! আমি চা চেয়ে নিয়েছি।

অনাদি। বেশ কবেচো। চা-ই খাবো!... (চা-পানে রত)

শান্তি। চা খেয়ে নাও—তার পর আজ কি বন্দোবস্ত হয়েছে, জানো?

অনাদি। কি?

শান্তি। আমরা যাবো এখন জলঙ্গী পাহাড়ে। সেখানে বৈকালিক জলযোগ...

অনাদি। কৈ, শুনি নি তো!

শান্তি। তোমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ব্যবস্থা করেছি। অনন্তবাবু তো বলেছিলেন, দেড়টা নাগাদ ফিরবেন—আজ তাঁর কোর্টে তেমন কাজ নেই।

অনাদি। তাহলে তিনি গৃহ-পথে যাত্রা করেচেন। এলেন বলে...

শান্তি। ওবে উচ্ছা...

বেয়ারার প্রবেশ

টিফিন-বাক্স গুছিয়ে নিয়েচিস?

উচ্ছা ওরফে উৎসব। হ্যাঁ...

শান্তি। তোরা তাহলে এগিয়ে যা। ষ্টোভটা নিস্ সসে, আর স্পিরিটের বোতল।

[ বেয়ারার প্রস্থান

শান্তি। অনন্তবাবুর এখনো দেখা নেই! মক্কেলের পকেট কাটতে এমন মত্ত যে হুনিয়া ভুলে বসেচেন! অনাদি। পকেট কাটতে হয় তোমাদের জন্ত! তা সে কথা থাক! আমার কিছু খেতে দিতে বলুন দিদি, আমার ভারী ক্ষিদে পেয়েচে।

শান্তি। মা গো! তোমার হয়েচে কি। বেলা এই এগারোটার খেয়ে বেরিয়েছিলে...মাংস, ডিম...এখন বেলা দুটো বাজে।

অনাদি। তাই নাকি! আমার মনে হচ্ছে, মাংস-খানেক কিছু মুখে দিইনি!

শান্তি। শুনচো ভাই!

শিবানী। দে না শান্তি হু'খানা লুচি ভেজে...

শান্তি। না। এখন আব খাবে না। কোথায় কি! তা ছাড়া এদের পাঠালুম—আবার এখন লুচি ভাজার হাদ্দাম! না, তা হবে না। চা খেয়েচো, আর ঐ রুটি আছে—হু'খানি পেতে পারো। বাস!

অনাদি। অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান!...

বোঝো না তা, পশ্চিমের হাওয়ার খিদে চতুর্গুণ হয়েছে!

শান্তি। না, এসব লক্ষ্যছাড়া কাণ্ড আমি দেখতে পারি না।

অনাদি। শুনলেন দিদি!

শিবানী। এতোর অন্ডায়, শান্তি। তুমি বসো ভাই, আমি লুচি ভেজে দিছি। (উঠিল)

শান্তি। (হাত ধরয়া নিবৃত্ত কবির) না, খবদ্বার। তোমার তো বাবো মাংস ওকে নিয়ে ঘর করতে হবে না, শিবুদি! চাল বিগড়ে শেষে আমার মাথা খাবে!

শিবানী। ভয় নেই রে! তোর ঘবকল্লায় ভাগ বসাতে যাবো না আমি!...কি খাবে, ভাই? বলো...

অনাদি। (সানখাসে) নিকপায়!...জলঙ্গীতে যেতেই হবে!

শান্তি। কেন—তাতে কোথায় বাধচে, শুনি?

অনাদি। সেজন্ত নয়। মানে, দাদার যদি কোনো কাজ থাকে...

শান্তি। কাজ থাকলেও আমি শুনবো না! (অনাদির হাতে রিষ্ট-ওয়ার চ দেখিয়া) দুটো বাজতে দশ মিনিট! আর দশ মিনিট অনন্ত বাবুর জন্ত অপেক্ষা করবো। তার মধ্যে না আসেন, আমরা চলে যাবো। কি বলো! শিবুদি?

শিবানী। তোরা এগোস্—আমি ঠকে নিয়ে যাবো'খন উনি এলে।

শান্তি। তা জানি। একটু আমাদের ব্যবস্থা করেছি আমি, তাতে বিঘ্ন ঘটবেই। আমার অদৃষ্ট

অনাদি। কথাটা আমার ঠেঁশ দিয়ে হলো—না?  
শান্তি। কাকেও আমি ঠেঁশ দিইনি। নিজের অদৃষ্টের  
কথা বলছি।

অনাদি। কেন—তোমার অদৃষ্টটা মন্দ কোন্‌খানে?

আমার মত স্বামী পেয়েচো—নারী-স্বম্বের যা চরম  
সৌভাগ্য। আপনি কি বলেন, দিদি?

শিবানী। নিশ্চয়! তোর কত দাপট সয় বল  
দিবিনি বেচারী। চন্দ্রিশ ঘণ্টা ওর সঙ্গে তুই যা  
করিস...সর্বক্ষণ তোর মেছাজ তেতে আছে।

শান্তি। বেশ, বেশ! আমি বদ, আমি পাজী, আমি  
সকলের শ্রবের কাঁটা!...কাকেও যেতে হবে না  
আমার সঙ্গে। তোমরা থাকো—বসে বসে আনন্দ  
পাও! আমি—আমি—(স্ব ক'ম্পত হইল; সে  
ক্রত ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল)

শিবানী। (বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল)

অনাদি। দেখলেন তো দিদি! আচ্ছা, আপনি বলুন,  
আমার কি অপরাধ?

শিবানী। তুমিই ভাই আদরে-আদবে ওর মাথাটি  
পেয়েচো!...এঁদের তো দেখচো—এ কালের হলে  
কি হয়—কি ভয় করি আমি!

অনাদি। দেখি, কোথায় গেলেন।

শিবানী। আমার কথা শোনো—তুমি বসো। আপনি  
আসবে'খন।...এ বে উনি এলেন—

[কোটের ফেরত অনন্তর প্রবেশ;

চাপকান-আঁটা। শিবানী উঠিয়া অভ্যর্থনার্থে

অগ্রসর হইল; অনন্তর পাগেব জুতা-

মোজা চাপকান খুঁদিয়া দিল, ও

বাতাস করিতে উজ্জত; সেই

অবস্থায় অনন্তর কক্ষ-মধ্যে

প্রবেশ—শিবানী

পিছনে চালল]

অনাদি। দাদা বেশ আছে। দিদিকে কি বশীভূতই  
করেনেন! দাদা যদি বলেন, জল উঁচু—অমনি দিদি  
বলেন, তাই। সর্বদা মুখে মুখে আছেন! আর  
আমার ইনি? ভায় রে, কলেজে যাওয়ার সময় কি  
কল্পনাই করতুম! সংসার পেতে বসবো, কাজ থেকে  
ফিরলে শ্রী এসে সাদরে অভ্যর্থনা করবে, এমনি কবে  
জামা-জুতো ছাড়বো গিয়ে—ছুটে শরবতের গ্লাস এনে  
মুখে দরবে! (নিশ্বাস) শ্রী এমন বাধ্য হয়—কোনো  
নভেলে পড়িনি। পুরাণও নয়—mythological  
dramaতেও না। সংসার পাতলুম। কাজে বেরুই,  
কাজ থেকে ফিরিও...কিন্তু সে কল্পনাব আদরাটুকু  
চিরদিন অজানা রয়ে গেল। এখানে এসে দিদির

হাতে দাদার সেবা দেখে মনটা লোলুপ হয়ে ওঠে!  
শান্তির ঐ মেছাজ তিরিকি...

[কোঁচা গুজিতে গুজিতে অনন্ত; সঙ্গে শিবানীর প্রবেশ]

অনন্ত। শান্তি অমন গুম হয়ে বসে কেন গা? এক  
পর্ব হয়ে গেছে বুঝি!

শিবানী। হলো বৈ কি। (পাখার বীজন)

অনন্ত। সহরের ঢাল! ভায়া ওকে মাটি করেছে!  
এ রকম ছিল না ও।

অনাদি। আপনি আর এ দোষ দেবেন না, দাদা।  
আমি মাটি করিনি। উনি মাটি ছিলেন। সে  
মাটিতে ওকে গড়তে পারলুম না আপনার মতন।  
অনন্ত। (হাসিয়া) গড়বার বুদ্ধি চাই হে—কৌশল  
চাই!

শিবানী। (সবিনয়ে) চা দেবো?

অনন্ত। দাও। পেয়ালায় ঢালা কার চা?

শিবানী। ওরা পেয়েচে। আমার পেয়ালা, শান্তি দেছে।  
অনন্ত। খাও নি?

শিবানী। তোমার আগে? আমার তো ভীমরতি  
ধরেনি।...আমি চা করে আনি। হ্যা, আর কি  
খাবে? লুচি ভেজে দেবো?

অনন্ত। না। শুধু হটো ডিম পোচ্ কবে দাও...

শিবানী। আনি। (প্রস্থান)

অনন্ত। তার পর...কি নিয়ে হলো আর?

অনাদি। কিছু হয়নি দাদা। খাওয়া নিয়ে কথা  
হচ্ছিল। আমি বললুম, লুচি খাবো। দিদি  
বললেন, ভেজে দি। শান্তি বললে,—না। এই।

অনন্ত। এতে আপত্তিটা কিসের?

অনাদি। এঁরা ঠিক কবেচেন সকলে জলদীতে আজ  
যাবেন। বৈকালিক জলযোগ হবে সেখানে।  
চাকরদের পাঠিয়েচেন। শান্তি বললে, আবার  
এখানে খাওয়াব ফ্যাসাদ কবা! এঁর আর কি!  
একটু পরিহাস মাত্র—মানে, ঠিক seriously নয়।

অনন্ত। (হাসিয়া) তুমি ভারী স্তব্ধ! শান্তিব দোষ  
যদি-বা শোধবাতো—তোমার এই ভাবেই সে  
আরো জোর পায়। জ্বীলোক যতই প্রাণের  
প্রিয় হোক, তাকে দাবে রাখা চাই, ভায়া।  
না হলে অশান্তির সীমা থাকে না। ওদের কথা  
বেখে একটু চলেছো, কি, অমনি পেয়ে বসেচো! ভারী  
বিশ্রী জ্ঞাত...

অনাদি। দাদার ভূয়োদর্শিতা আছে।

অনন্ত। আরে ভাই, ভূয়োদর্শিতা নয়। আমাদের  
হলো superior intellect—এটা মানো তো?  
ওরা যত লেখাপড়াই শিখুক—reasonএর

facultyটা মোটে জাগে না। এই ছাখো না, আমাকে কিছু বগতে হলো না—তোমার দিদি ছুটলো নিজেকে থেকে খাবার তৈরী করতে! কর্তব্যজ্ঞান আছে। থাকে না—এ জিনিষটা শিখতে হয়।

অনাদি। কিন্তু জ্ঞান সঙ্গে সর্লক্ষণ কর্তব্য-জ্ঞান সজাগ রেখে বাস করতে হলে সংসার যে গুরু মশায়ের পাঠশালা হয়ে উঠবে। স্বামী সর্লক্ষণ বেত উঁচিয়ে থাকবে, আর জ্ঞানী ভয়ে তটস্থ!

অনন্ত। উপায় কি! এখানে ঘর করতে হচ্ছে inferior or no-intellect এর সঙ্গে। পুরুষ-পুরুষে ঘর করা হতো, তা হলে এমনিতে সামঞ্জস্য ঘটতো—both equal intellects!

অনাদি। সামঞ্জস্য! ওরে বাপ যে—এর চেয়ে ভীষণ অসামঞ্জস্য মহাম্মনি বেদব্যাসও কল্পনা করতে পারতেন না!

শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। এইখানেই থাকে? না—আজ আবাব শান্তি ধরেচে, সকলে জলঙ্গীতে যাবো...সেইখানে?

অনন্ত। এখন জলঙ্গীতে? কৈ, সে কথা তো ছিল না। আমি জানি না। তোমরা দুই বোনে বৃষ্টি স্থির কবেচো?

শিবানী। শান্তির বড় সাধ...

অনন্ত। তোমারো? কিন্তু...আমি যেতে পারবো না তো! আমার এক বন্ধু আসচেন...

অনাদি। সে কি—সব যে ঠিক।

অনন্ত। তোমরা যাও—আমার যাওয়া হবে না। কি করে যাই?

শিবানী। তা হলে আমিও যাবো না, ভাই। তোমরা মিছে দেবী করো না। শান্তির ইচ্ছা হয়েচে, যাও হ'জনে। (অনন্তের প্রতি) তুমি থাকে এসো... আমি গরম গরম ভেজে দেবো।

[অনন্ত ও শিবানীর প্রস্থান]

অনাদি। কিছু বুঝতে পারি না। এক এক সময় মনে হয়, শান্তির বাড়াবাড়ি। কিন্তু দাদার মত অতখানি গাঙ্গীর্ষ আর কর্তব্য-জ্ঞান...নাঃ, সমস্তা!...বাই হোক, বেচারী রাগ করেছে,—ডাকি। জলঙ্গীতে যাই। একটু আমোদ চায় শান্তি...আহা! এই যে আসচে।...

শান্তির প্রবেশ

অনাদি। ওগো, একটা কথা শুনাচো?

শান্তি। (টেবলের উপর হঠাতে কাপ প্রভৃতি লইতে উত্তত) কি?

অনাদি। দাদা যাবেন না, স্ততবাং দিদিও। তাই বলছিলুম—(শান্তি স্থির দৃষ্টিতে অনাদির পানে চাহিল) আজ না হয় জলঙ্গী যাওয়া থাক...

শান্তি। আমি যাবো। তোমাদের যার খুশী হয় যেয়ো, যার খুশী না হয় যেয়ো না। আমি তো পায়ে ধরে কাকেও যাবার জ্ঞান সাধটি না।

অনাদি। সব-তাতেই রাগ করো কেন—তাই না হুং! তানয়। বলছিলুম, ভালো দেখাবে কি? আমারও উদের অতিথি...

শান্তি। এতে রাগাগাগির ব্যাপার কি আছে! অনন্ত-বাবুর কাছ আছে—তাই যেতে পারবেন না। আমার কাছ নেই, যাবো।

অনাদি। আমার কেমন-কেমন বোধ হয়।

শান্তি। তাহলে যেয়ো না...

অনাদি। তুমি?

শান্তি। যাবো।... (পেয়লা প্রভৃতি লইল; গমনোত্তত)

অনাদি। একলা যাবে? আমি না গেলেও?

শান্তি। হাঁ।

[প্রস্থান]

অনাদি। এইখানে বাধে। ওরা দুটিতে কেমন! দাদা যাবেন না—দিদি তাই গেলেন না। রাগ তো কবলেন না! আব শান্তি...? না,—দাদার কথা ঠিক।...কিন্তু এখন কি করানো সম্ভব?...এইটুকু বা অস্বস্তি...শান্তি কেন যে এ অশান্তি জাগিয়ে তোলে!...

(চেয়াবে বসিয়া শূন্যপানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিল)

শিবানীর প্রবেশ

শিবানী। তোয়ালেখানা দাও তো, ভাই। (তোয়ালে লইয়া) শান্তি চললো সে! তুমি যাবে না?

অনাদি। না।

শিবানী। সে কি! ও জানে, তুমি যাবে না?

অনাদি। জানে।

শিবানী। তবু? (ওষ্ঠ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া তোয়ালে-সহ প্রস্থান)

অনাদি। এরা কি ভাবে?...ঈশ্বর? হবে! আমি যে কড়া হতে পারি না! জ্ঞানী—তাকে চোখ বাঙাবো? অসম্ভব! শান্তির কোনো ইচ্ছায় কখনো বাদ সাধিনি, তা চাই না। তবে আমি চাই, শান্তি আমার একটু মাহুঁক...আমার প্রাণের পানে একটু চেয়ে দেখুক! কথায় কথায় বাগ, এটা যায় কিসে! দিদিদের ধরি...ওঁরা যদি পোষ মানিয়ে দিতে পারেন।

অনন্ত ও শিবানীর প্রবেশ

অনন্ত। গেল তো?

অনাদি। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হ্যাঁ।

অনন্ত। (হাসিয়া) তুমিই ওকে বিগড়ে দেছ! স্বামীর  
ছায়া হবে স্ত্রী... স্বামীর ইচ্ছায় ওঠা-বসা করবে।...

তোমার দিকে দেখচো কো?

অনাদি। দেখছি বৈ কি।

শিবানী। থাক, আর ব্যাখ্যানের কাজ নেই। শাস্তি  
কি মানুষ! পাগল। যত বয়স হচ্ছে, ততই  
পাগলামি বাড়তে।

অনন্ত। তুমি একটু শক্ত হও। এই তোমার দিদি—  
আমার সেবার ঠর জীবন অর্পণ করেচেন! ঠর সামনে  
বলা উচিত নয়, কিন্তু সত্য কথা বলেই বলছি,  
এই হলো এদেশের নারীর আদর্শ।... তবে এ-আদর্শে  
স্ত্রী-জাতিকে অনুপ্রাণিত করতে হলে স্বামীরও  
তেমনি হওয়া চাই—অর্থাত্ শক্তিমান—পুরুষ!

অনাদি। হঁ! (বলিয়া গভীরভাবে প্রশংসা কবিল)

অনন্ত। বোধ হয় মান-ভঙ্গনে গেল!

শিবানী। হবে! (দীর্ঘনিশ্বাসে শূন্য নয়নে চাহিয়া রহিল)

অনন্ত। তুমি তোমার ভগ্নীকে একটু বুঝিয়ে—সত্যি!  
সমবয়সী—হুজনে, ছেলেবেলা থেকেই তোমাদের  
অন্তরঙ্গতা...

শিবানী। হুঁদিন আমার এখানে বেড়াতে এসেচে।  
তার মধ্যে এত সহুপদেশ...

অনন্ত। উপদেশ সব সময়ে দেওয়া চলে। হিংসা  
মনোহারা চ ছলভং বচ:।... আমার মাথার পাকা-  
চুলগুলো দেখে দাও তো!

শিবানী। (পাকাচুল তুলিতে ব্যস্ত)

অনন্ত। আলো কথা, আচ্ছ বে নিশীথের ওখানে  
নেমস্তর গো, বাত্রে—মনে আছে? কমিশনার  
সাচেবকে সে পাটি দিচ্ছে। যাবে তো তোমরা?

শিবানী। তুমি যদি বলো...

অনন্ত। আমার বলা কেন! তোমাকেও তো নিমন্ত্রণ  
করেচে নিশীথ।

শিবানী। তোমার অনিচ্ছায় হবে আমি কি করি?

অনন্ত। তা করবে না। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বও কিছু  
রাখবে না তা বলে?

শিবানী। (কিছু বলিল না, একবার আকাশের পানে  
চাহিল, পবে চুল তোলায় ব্যস্ত)

উচ্ছার প্রবেশ

অনন্ত। কি রে?

উচ্ছা। নথয়ল বব্ব কহ হতে নোক অসচি, খতা-পত্র  
নিষে।

অনন্ত। জ্বালালে!

শিবানী। এখনি আবাব ঐ-সব নিয়ে বসবে? জিরুলে...

অনন্ত। (বাণা দিয়া) না। উপায় নেই। কর্তব্য  
আগে! তাছাড়া এতে হু' পরমা ধরে আসবে।

[ উচ্ছা ও অনন্তর প্রস্থান

শিবানী। (স্থির হইয়া দেখিল, পরে বিরক্ত হইয়া ইকি  
চোয়াবে বাসিল) এটী হলো স্ত্রীর কর্তব্য! মুখের পানে  
চাইতে কেউ নেই। উনি কেবল কাজ নিয়ে ব্যস্ত!  
আমি? একলা মানুষ কি করে থাকবো, বোঝেন না।  
কেবল হুকুম তামিল করো! জীবনে আর কিছু  
নেই! আমোদ নয়, আহ্লাদ নয়—শুধু হুকুম পাবার  
জ্ঞা তৈরী থাকবো সারাংশ... নিজে বসজ্জন  
দিয়ে। অনাদি আর শাস্তি—দুজনে যত খিটিমিটি  
বাধুক, তবু মনের স্বে আছে। আমি শুধু আদর্শ  
নিয়ে বাস করছি। ভাগ্যে একটু গান গাইবার  
অনুমতি ছিল। না হলে গেচলুম আর কি! (গুণ-  
গুণ করিয়া গান দ্বিল)

[ পায়ে-চোট অনাদি ও তাব হাত ধরিয়া শাস্তির প্রবেশ;  
শিবানীর গান বন্ধ হইল ]

শিবানী। [ উদ্বিগ্নভাবে ] কি হলো?

শাস্তি। বাইসিকল থেকে পড়ে পায়ে চোট লাগিয়েচেন।  
একদণ্ড যদি আমার স্বস্তি থাকে!

শিবানী। বাইসিকল চড়ে গেল কেন?

শাস্তি। চাঁ! বললেন তো, উনি জলস্রী যাবেন না,  
আমি চলে গেলুম। শেষে আবাব আমার পিছনে  
ধাওয়া করলেন। মায়া উথলে উঠলো, বোধ হয়!...  
তা না হয় গেলেন! কিন্তু বাইসিকলে যাবার কি  
দরকার ছিল! পথে এক পাল গরু আসছিল। বাসু,  
তাদের বাঁচাতে গিয়ে পড়লেন উণ্টে! সারা পথ  
ধরে আনচি।

শিবানী। বাইসিকল?

শাস্তি। যাদের গরু, তাদের একটা লোক বয়ে আনলে!  
শত্ৰু... শত্ৰু! তুমি জানো না শিবুদি, আমার  
কি জ্বালাতন করে! সংসারে অরুচি ধরে গেল!...  
(অনাদির প্রতি) নাও, বসো দয়া করে!... দিদি  
ভাই, তোমরা ধরে জাম্বাক আছে?

শিবানী। আছে।

শাস্তি। দাও তো না, থাক, আমিই আনছি।

[ প্রস্থান

শিবানী। খুব লেগেচে?

অনাদি। (চাবিদিকে চাতিয়া) চুপ! বিশেষ লাগেনি।  
ওর মেজাজ না চটে, অথচ জলঙ্গী বন্ধ হয়, তাই  
একটা ধাপ্পা! চালাকি!

শিবানী। তুমি তো খুব লোক, দেখচি।

অনাদি। সত্যি ন্দি, কি যে ওর গৌ। বেশ তো বাপু,  
আজ যখন কেউ যাচ্ছে না, তখন না হয় থাক  
—বিশেষ, রাত্রে আবার নিশীথ বাবু বাড়ী পাটি  
আছে— (স্বচ্ছন্দভাবে বসিল,—পায়েব কথা ভুলিয়া  
গেল)

শিবানী। হুঁ! তাহলে...

(শান্তি প্রবেশ, তাব হাতে জাখাক। অনাদিকে  
সহজভাবে বসিতে দেখিয়া শান্তির বিষয়)

শান্তি। পা সেরে গেছে—এই যে! একটু আগে পা  
মুড়তে পারছিলে না...

অনাদি। না, না, না—ভারী ব্যথা গো। উঃ!...দ্বিদি  
বললেন, হোক ব্যথা, পা মোড়বাব চেঁচা কবো  
—না হলে আড়ষ্ট থাকতে হবে। তাই...

শান্তি। তাই! বটে! আমি নেকি—কিছু বুঝি না?

[ দ্রুত প্রস্থান

অনাদি। নাঃ, মুন্সিল বাবলো দেখচি।

শিবানী। তোমাদো অজায় আছে! তুমিও বিটিমিটি  
বাধাতে কম গুস্তাদ নও! সেই বেবিয়েছিলে, না হয়  
জলঙ্গীতে যেতে!

অনাদি। হুঁ! তাই বা। দেখি, বড় রাগ কবেচে!

[ প্রস্থান।

শিবানী (দেখিয়া) এদের জীবনই জীবন!...

অনন্তর প্রবেশ

কাজ চুকলো?

অনন্ত। মুক্তি পেয়েচি। কাল সকালে আসবে।

শিবানী। এখন তো কাজ নেই?

অনন্ত। না!...অনাদির সি হলো? খোঁড়াতে খোঁড়াতে  
এলো...

শিবানী। পায়ে চোট লেগেচে।

অনন্ত। কোথায় গেল?

শিবানী। শান্তি বুঝি জাখাক মালিশ করচে।

অনাদির প্রবেশ

অনাদি। নাঃ, দুর্ভাগ্য গৌ। আর পারা যায় না। ক্ষণে  
ক্ষণে যদি এমন বিদ্রোহ চমকায়...(হতাশভাবে  
চেয়ারে বসিয়া পড়িল, Hopeless!)

অনন্ত। নিশীথের ওখানে রাত্রে যাচ্ছে তো ভায়া?

অনাদি। যেতে হবে বৈ কি! ও আবার আমার বন্ধু—  
বহু দিনের বন্ধু।

শিবানী। শান্তির সঙ্গেও কথাবাতা কয়...

অনাদি। হ্যাঁ। আমার ওখানে বহুবার অতিথি হয়েছে।  
অর্থাৎ কলকাতায় গেলেই...দ্বিদির গানও শুনেছে  
সে দিন। ভাবী সুখ্যাতি করছিল।

অনন্ত। বটে। কৈ, আমায় তো সে কথা বলেনি!  
(শিবানীর প্রতি) তুমিও আমায় বলেনি!

শিবানী। এমন বড় কথা তো নয়! তাছাড়া গাইছিলুম,  
হঠাৎ এসে পড়লেন...

অনন্ত। হুঁ! (চিন্তাবিষ্ট)

শিবানী। অপবাদ হয়েছে?

অনন্ত। গান শোনানো অপবাদ নয়—তবে আমি  
জানতুম না। (গম্ভীর ভাব)

শিবানী। সত্যি আমার মনে ছিল না।

অনন্ত। মনে থাকা উচিত ছিল। স্বামীর কাছে জীব  
কোনো বিষয়ে গোপনতা থাকবে না।

শিবানী। আর কখনও হবে না। এবাব মাপ করো।  
অনন্ত। করবো। পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাও।...

(শিবানী কথামত পায়ে হাত দিল).. তাই বটে  
আমায় বলছিল, শিবানী দেবীও পাটিতে আসটেন  
তো?

শিবানী। (স্থির লক্ষ্যে স্বামীর পানে চাছিল)

অনন্ত। শান্তি কোথা গেল? বাগ? গৌসি-ঘর?

অনাদি। আমায় দীক্ষা দাও দাদা!—তুমি আমার গুরু  
—কি করে শান্তিকে বশ কবি, বলো!

অনন্ত। (সহাস্তে) মাসখানেক তা হলে সস্ত্রোক থেকে  
বাড় এখানো... আব ছ্যাবলামি ছাড়ো...গম্ভীর  
হও...স্ত্রীর তরিকণ স্ত্রী-বশ করাব বিষয়ে প্রথম সূত্র  
হলো ঐ গান্ধীজী—হাস্তব্রস মোটে নয়। কোঁতুক-  
পরিহাস বিষয়ের মত ত্যাগ করা চাই।

অনাদি। মুন্সিল!

অনন্ত। শান্তিকে ডাকো তো...

শিবানী। ঐ আসচে। উদাসিনীর বেশ!

(উদাসভাবে শান্তি আসিয়া চেয়ারে বসিল;  
তার মূর্তি গম্ভীর)

অনন্ত। কোথায় পড়লে হে অনাদি? বাগলো কোথায়?  
অনাদি। পায়ে...

অনন্ত। শান্তি কোথায় ছিল?

অনাদি। হাত দশেক আগে—আমি পড়ে গেলুম...

অনাদি। শান্তি... (শান্তি ফিরিয়া চাছিল, তার মুখে  
হাসি)

শান্তি। সে বা মূর্তি! ধপাস করে পথের উপর পড়লেন!

সর্ব্বাঙ্গে ধুলো! গুরুগুলো ভয় পেয়ে কষে দৌড় দিলে।

প্রথমে হেসে উঠেছিলুম। তখন কি জানি, উনি।

অনাদি। তুমি হাসচো। আমার লাগলো। এমন

দুর্ঘটনা! আর তুমি আমার স্ত্রী!

শান্তি। বা রে, কিছু হয়নি তো। সত্যি অনন্ত বাবু,

সে-মুঠি যদি দেখতেন! ধূলয় ধূসর নন্দকিশোর

গান আছে না? ঠিক তেমনি!

অনাদি। (গম্ভীর স্বরে) শান্তি...

শান্তি। কেন? না বাপু, হাসতে দাও... আমি সে

চেহারা ভুলতে পারছি না!

অনাদি। এ হাসি স্ত্রীর উচিত? স্বামীর দুর্দশা স্ত্রীকে

হাসির খোবাক জোগাবে?

অনন্ত। (জনাস্তিকে) বেশ, বেশ। এমনভাবে স্বরু

করো। সুযোগ মিলেচে।

অনাদি। শান্তি...

শান্তি। বাইসিক্লট ছিটকে কোথায় গিয়ে পড়েচে!

ধূলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। দেখে হেসে বাঁচিনে।

শেষে দেখি, আমারি জীবনবল্লভ—হল ড ছবি

ফুটিয়েচেন। হাঃ হাঃ হাঃ।

অনাদি। তোমার হাসি আমার ভালো লাগে না, শান্তি।

এতটুকু দরদ নেই, মায়া নেই! হাসচো?

শান্তি। এখন হাসবো না কেন? বা রে! যদি পায়ে

চোট লাগতো...

অনাদি। লাগেনি বলে হুংগ হচ্ছে—না?

শান্তি। সত্যি ভাই দিদি, সে ছবি যদি দেখতে! হাঃ

—হাঃ! না, আমি হাসি চাপতে পাচ্ছি না, আমি

হেসে নি। হাঃ—হাঃ—হাঃ (হাসিতে হাসিতে

প্রস্থান)

অনাদি। অসহ্য! সত্যি... (উঠিয়া দাঁড়াইল)

শিবানী। অনাদি...শোনো।

অনাদি। শোনবার কিছু নেই, দিদি। সংসারে আমার

পীতবাগ ঘটচে!...কে জানে, এই চোট-ভিতরে যদি

serious হয়ে থাকে? তা থেকে টিটেনাস্ হতে

পারে...আর শাস্তিও এই হাসি।

শিবানী। না ভাই, চোট লাগলে তুমি এমন সহজভাবে

চলাফেরা কর্তে পারতে না!...সে দুশ্চিন্তার কারণ

ঘটেনি, সত্যি!

অনাদি। শান্তি আপনার বোন—তাই একথা বলচেন

আপনি। তাছাড়া শান্তি তো জানে না, ভিতরে

কি injury হয়েছে। সেদিক একটা দুশ্চিন্তা নেই?

যদি দাদা এমন পড়ে যেতেন, আপনি নিশ্চিন্ত

থাকতে পারতেন? না, এমন ভাবে হাসতেন?

অনন্ত। Impossible! তবে বলি, শোনো একদিনের

কথা...

দাগী মুক্তার প্রবেশ

মুক্ত। মাসিমা তোমায় ডাকচেন, মা।

শিবানী। আমায়? যাচ্ছি—বলগে। (মুক্তার

প্রস্থান) বোধ হয়, নিজের অন্তায় বুঝেচে। কেন

ডাকে, শুনে আসি।

অনাদি। দিদি...

শিবানী। শুনে এখন আসচি। তুমি মিছে রাগ

করচো, ভাই। তোমার কিছু হয়নি। আমি

শান্তিকে ডেকে আনিচি।

[প্রস্থান

অনাদি। আপনার পায়ে ধূলো দিন, দাদা। আপনি

ভাগ্যবান—হ্যাঁ, আপনারদের দাম্পত্য-জীবন

বাড়ানীর আদর্শ।

অনন্ত। শুধু হাতেও গুণ, ভায়া! আমি কখনো স্ত্রীর

কাছে তবল হই না। সেই ফুলশয্যার রাত্রেই

বুঝিয়ে দিয়েছিলুম, বলেছিলুম, আমি চাই স্ত্রীর

কাছ থেকে কণ্ঠ্য-পাণন।

অনাদি। কিন্তু আমিও তো স্ত্রীকে মাথায় তুলে নৃত্য

করে বেড়াচ্চেন...

অনন্ত। তুমি ওকে বোঝাও যে, স্ত্রী স্বামীর ছায়া—

দাস্তবৃত্ত ছাড়া স্ত্রীর দ্বিতীয় কর্তব্য নেই! এ

আমাদের সনাতন আদর্শ! বিলিতি আব-হাওয়ার

সখী-ভাব সংসারে অশাস্ত আনে!

অনাদি। কিন্তু...

অনন্ত। এর মধ্যে কিন্তু নেই। স্বামীকে কড়া হতে

হবে। মিষ্টি হয়েচো কি স্ত্রীজাত আপনি পিপড়ের

মত সে মিষ্টিটুকু গ্রাস করে বসবে। স্ত্রী যা ধরবে,

তার ঠিক উল্টোটি করবে।...তার মতকে স্বীকার

করা মুঢ়তা—তাতে নিজের যদি বাধে, তবু। এই

হলো পলিশি...বুঝলে?

অনাদি। আচ্ছা, যে ক'দিন এখানে আছি, প্রাকটিক

করি। তবে কি জানেন দাদা, ভয় হয়...

অনন্ত। ভয়!

অনাদি। হ্যাঁ, যদি রাগ করে কাপড়ে কেবোসিন ছেলে

বসে!...যে-রকম অভিমানী! কলকাতায় অভি-

মানের ফলে হু' একটা এমন কাণ্ড যে ঘটেনি, তা

নয়।

অনন্ত। বেখে দাও তোমার কেবোসিন! প্রাণ

জিনিষটার মায়া সামান্য নয়, ভায়া!...

অনাদি। অভিমানে দেওয়ালে যে-রকম মাথা ঠোকে,

দেখেন নি তো!...তবু দেখি, মহাজনো যেন গতঃ

সঃ পছন্দ। আপনার কথা মেনেই চলবো এখন

থেকে।

অনন্ত। হুঁ! স্ত্রীকে যদি আঙুলের ডগায় রেখে না

যোরাতে পাবলুম, তা হলে পুরুষ-মাতৃ হযে  
জন্মালুম কেন? আর বিবাহই বা করলুম কেন?  
অনাদি। হঁ। যা বলেচেন।...এই বে আসচেন...  
অনন্ত। নরম হযো না...খবর্দার। আমি শাসন  
করতে পারতুম! কিন্তু কি জানো, একে ছোট, তায়  
শালী—তায় এখানে দুদিনের অতিথি! তার উপর  
আজ সে অপরের স্ত্রী।...তুমি কড়া হও। স্ত্রী  
দেখবে পায়ে লুটিয়ে থাকবে। দেখচো তো তোমার  
দিদিকে!

অনাদি। দেখচি বৈ কি।

#### শিবানী ও শান্তির প্রবেশ

শিবানী। আর ছেলেমানুষী করিস নে শান্তি...সত্যি।  
অনন্ত। গলে যেয়ো না, ভায়া...  
শিবানী। এবার তোমাদের সন্ধি হোক, অনাদি...  
অনন্ত। এ বিষয়ে তোমার মধ্যস্থতা ঠিক নয়, শিবানী।  
অন্তরোধে ঢেঁকি গেলা গেলেও স্বামি-স্ত্রীর মনান্তরে...  
শিবানী। আচ্ছা।  
অনাদি। (লক্ষ্য করিয়া) আশ্চর্য্য...একটু ইঙ্গিত!  
দিদি অমনি চুপ। রাগ নয়না বাঃ, মন্ত্রশক্তি  
একেই বলে!  
অনন্ত। (জনান্তিকে) সিক খেকো...টলো না।  
খবর্দার!

অনাদি। (জনান্তিকে) না।  
অনন্ত। শিবানী, এসো তুমি আমার সঙ্গে। শান্তি,  
স্বামীর অব্যাহতা ঠিক নয়। তোমার দিদিকে পাশে  
দেখেও তুমি নারীর কর্তব্য বুঝলে না! অনাদির  
কাছে তুমি অপরাধ—নাচ চাও।

#### [ অনন্ত ও শিবানীর প্রস্থান ]

অনাদি। শান্তি... (হাত ধরিল)  
শান্তি। যাও...! (হাত ছাড়াইয়া) কি করেচি মহা-পাপ  
যে অনন্ত বাবুর কাছে আমার এমন অপদস্থ করা...  
অনাদি। সত্যি, আমি কিছু জানি না।  
শান্তি। না, জানো না!...কি...তুমি চাও কি।  
দাস্তা?  
অনাদি। না।  
শান্তি। চাইলেও আমি তা করতে পারবো না—  
আমার স্পষ্ট কথা। আমি মাতৃ—তা ছাড়া সে  
ভাব গোড়া থেকে আমার বোঝাওনি কেন?...স্ত্রী  
স্বামীকে ভালো বাসবে, যত্ন করবে, আদর করবে—  
এই বুঝি। তাবলে তার হুকুমের চাকরানী নয় সে...  
অনাদি। আহ, ভুল বুঝো না, শান্তি...আমি, অর্থাৎ  
অনন্তবাবু...মানে, বুঝচো কি না, তোমার দিদি...

শান্তি। কোনো মানে বুঝতে চাই না।...আসল কথা,  
অমনি দাস্তা চাও যদি, বেশ...তাই হবে। তা হলে  
হাসি চেয়ো না, গান চেয়ো না, গল্প চেয়ো না। শুধু  
অমৃগত দাসের ভক্তি নিয়ে খুশী থাকতে হবে।  
অনাদি। বামচন্দ্র! আমি তা চাই না—চাইনি কোনো  
দিন। আমি তো টিকিধারী গুরুজী নই, আমি স্বামী।  
শান্তি। কেন—ভোল বদলাবার দরকার কি! উপদেশ  
পেয়েচো। গুরুর উপদেশ! তাই আমি হবো।  
তোমার পড়ার কথায় হেসেছিলুম, সে-হাসির জন্ত  
মাপ করো। জীবনে আর কখনো এমন পাপ  
করবো না। কখনো আর আমার হাসতে দেখবে না!  
অনাদি। কে তা চাইছে?...শান্তি...  
শান্তি। কি আদেশ? বলো...  
অনাদি। তোমার ও-গল্পের কথা শুনে চাইছি না...  
শান্তি। (করজোড়ে) কি করতে হবে, শুনি...  
অনাদি। (সহসা কাতরভাবে) পায়ের সেধানটা...  
উঃ না, দেখচি, তুচ্ছ নয়—বুকেটা অবশি কেমন  
যেন টেনে ধরচে।  
শান্তি। এঁয়া!...কিন্তু পায়ের কোথাও ছুড়ে যায়নি তো।  
অনাদি। কে জানে, ভিতরে হেমেরজ...পা হঠাৎ টেনে-  
টেনে ধরচে যেন। Heartএ rush করবে না তো  
সমস্ত রক্ত! উঃ (পায়ে হাত দিয়া ধলুকের মত  
ঝাঁকিয়া রহিল)  
শান্তি। (উদ্ভিন্ন ভাব) ডাক্তার ডাকাই?  
অনাদি। না, না, ব্যস্ত হবাব মত নয়। মাথাটা একটু  
কেমন টিপ্, টিপ্, কবচে! (পাল্শ্, দেখিয়া)  
জ্বর...? না, নয়। পাল্শ্টা তবে...  
শান্তি। শোবে চলো...আমি ডাক্তার ডাকাতে বলি।...  
ওগো, শুনচো?  
অনাদি। না, না—আমি বসতে চাই। শোবো না।  
তোমার কথায় শুতে হবে? বটে! না। আমার  
শ্রৈল ভেবেচো? না। আমি শ্রৈল নই। না,  
আমি শোবো না।  
শান্তি। রাগ করচো কেন?  
অনাদি। রাগ কিসের! আর যদি কবি?...তোমার  
কথায় রাগ ত্যাগ করতে হবে?  
শান্তি। (চোখের দৃষ্টিতে কাতরতা)  
অনাদি। (হাসিল) ...হঃ হঃ হলো?...আমারো এমন  
হঃ হঃ হঃ, যখন তুমি সামান্য কথায় ঝড়ার তোলো।  
কি! এখনো গভীর! বেশ বাপু, চলো...শুভেই  
যাই। হঃ, এইখানেই আমার দুর্ভাগ্য! আর সে  
দুর্ভাগ্যের স্রবোগ...স্বাশা আছে!...ধাকো, তাই  
ধাকো! এখন ধরো হাত...নিরে চলো...বাছি।  
[ শান্তির হাত ধরিয়া অনাদির প্রস্থান ]

অনন্তর প্রবেশ

আসিয়া একখানা চেয়ারে সে বসিল, মুখ গভীর।

[ নেপথ্যে শিবানী। আস না ভাই শান্তি—জাখ না, কোন্ শাড়ীখানা পবে পাটিতে যাবো। এই হেলিওট্রোপখানা? না, ঐ লাল ক্রেপ-ডিশীন? ]

শান্তি। হেলিওট্রোপে তোমাকে চমৎকার মানায়।

শিবানী। সঠিক? না। ...লাল ক্রেপ-ডিশীনটা বৃষ্টি মানায় না? জাখ তো। ]

[ অন্য উৎকর্ষ হইয়া এ কথা শুনি। তাবন্দ কুদিত হইল। ]

অনাদি। দাশ যে ধ্যানস্থ হলেন! সহসা এ ভাব?

অনন্ত। ( নিশ্বাস ফেলিয়া ) ভাবচি।

অনাদি। কিসেব ভাবনা? কোনো মক্লেস জাল কণ্-কাবাব টেবী পাচ্ছে বৃষ্টি?

অনন্ত। তোমার ছাব্বাসমি ছাড়ে হে! জীবনটা লঘু নয়। কর্তব্যের কাঁটা চারিদিকে।

অনাদি। আপনি কতব্য ভাবুন, আমি হালকাভাবেই পথে চলি। এতে খোঁচা ফোটে, তবে সে মশক-দংশনেব মত। একটু জ্বালা, একটু ফোলা—তখন ভুলে যাই। কিন্তু কর্তব্যের কাঁটা। বাপ বে, হামি-গুশী ঘুচিয়ে দেবল কাঁটা বেড়ে পথ চলা! Life would not be worth living!

শিবানী ও শান্তির প্রবেশ

শিবানীর হাতে লাল ক্রেপ শাড়ী, শান্তির হাতে

হেলিওট্রোপ শিক শাড়ী।

শান্তি। আচ্ছা, আপনি দেখুন তো অনন্ত বাবু। আমাদের দুই বোন তর্ক হয়েছে। আমি বলছি, যাকে নিশীথ বাবুর ওখানে নেমস্তন্নয় এখানা পবে যেয়ো, মানাবে ভালো। শিবুদি বলচে, লালখানায় ওকে ভালো দেবায়। বলুন তো আপনি!

অনন্ত। ( জ্বক্কিত কিয়া শিবানীর পানে চাহিল, কোনো কথা কহিল না; সে দৃষ্টিতে শিবানী কাঁটা হইয়া উঠিল। তার মুখেব হাসি ঢকিতে মিসাইয়া গেল )

অনাদি। আমি বিচার করছি। নিজেব চোখের তুলির জুজু তো সাজ-সজ্জা নয়। সাজ-সজ্জাব উদ্দেশ্য হলো, পরেব চোখে ভালো লাগা।

অনন্ত। ( গভীর স্বরে ) শিবানী...

শিবানী। ( মলিন নয়নে অনন্তর পানে চাহিল, পবক্ষণে দৃষ্টি নত করিল )

অনন্ত। নিশীথ গান শুনে তারিফ করেছে, তাতে সন্তুষ্ট হওনি! সাজে তাকে আবও বিমুগ্ধ করতে চাও...না?

শান্তি। ( রুচ স্ববে ) অনন্ত বাবু...

অনন্ত। ( সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া ) তুমি পাটিতে যাবে না! আমার আদেশ...( কথাটা বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল )

শান্তি। এ কি বল্চেন আপনি! এ-ভাবে শিবুদিকে অপমান...

অনন্ত। অপমান!

শান্তি। নিশ্চয়। ...আমার স্বামী যদি এমন কথা আমায় বলতো...

অনন্ত। তোমাব কথা হচ্ছে না, শান্তি। তুমি যদি স্ত্রীবা আদর্শ পালন করতে...

অনাদি। মাপ করবেন, দাদা। এ বিচার আপনার Jurisdictionএর বাইরে।...দিদি...

অনন্ত। তোমরা এমন ঢকল হলে কেন! যাকে এ-কথা বলেচি, এ আদেশ পালন করতে তাব কোথাও বাধে না। আমার শিক্ষায় মনকে বাবনা-বর্জিত করবাব শক্তি সে প্রচুর অর্জন করেছে।

শান্তি। কি গো, গুরুব কাছে এ শিক্ষা নিচ্ছ তো!...

আমি মোক্কা এমন আদর্শ-পত্নী হতে পাববো না। তা তুমি আমায় ত্যাগ কবো, আব যাই কবো!

অনাদি। ( চোখের দৃষ্টিতে শান্তিকে ইঙ্গিত জানাইল )

অনন্ত। কাপড় বেখে দাও গে, শিবানী। ভালো কথা, আমার একটা বাঙলা দলিল তোমায় নকল কবে দিতে হবে। বড় দলিল। তোমায় দিই। লিখতে সুরু করবে, চলো। ...

[ অনন্ত ও তার পিছনে ছাব্বাসমি শিবানীর প্রস্থান ]

অনাদি ও শান্তি অপলক নেক্রে উভয়ের পানে চাহিয়া বহিল।

ক্ষণেকের জুজু উভয়ের মুখে কথা বাহিব হইল না। ]

অনাদি। শান্তি...

শান্তি। ( দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অনাদির পানে চাহিল )

অনাদি। কি ভাবচো?

শান্তি। এখানে না এলেই ভালো করতুম! এই কি কপোত-কপোতীর প্রেম? এবই নাম নির্ভা? তোমাব সঙ্গে ঝগড়া করি, কথা-কাটাকাটি কবি...

অনাদি। ( বাধা দিয়া ) উত্তম কবো। চিবদিন তাই করবে। এ শ্রদ্ধা-ভক্তির চেয়ে সে কলহ-বিবাদ ঢেব ভালো। স্ত্রীর বুকের উপর বুট-জুতো পরে দাঁড়িয়ে তাঁব বুকের পাঁজর ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছ থেকে এ বশুতা আদায় করতে আমি চাই না। জীবন অসহ হবে। কি নিয়ে বাস করবো তা হলে?



# নয়া যুগের নাট্য-ঠাট

( নক্সা )

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

## নয়া যুগের নাট্য-ঠাট

বাঙলায় নাটক নাই। তাব কাবণ, কোনো মনস্বী লেখক নাটক লিখিবাব চেষ্টা করেন নাই। এ আমার কথা নয়। এ-কথা ছাপার অক্ষবে মাসিক-পত্রে এক বিগ্গজ লেখক লিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, বাঙলায় নাটক লেখার শক্তি আছে তাঁব, আব তাঁব দুটি বজুর! এই ত্রিমূর্তি ছাড়া নাটক লেখার শক্তি বাঙালীর মধ্যে আব কারো নাই! নাটক যে কি পদার্থ, তা শুধু এঁরাই জানেন। তাঁবা যে-সব আলোচনা করেন, সে আলোচনায় কি পাণ্ডিত্য! তাঁদের লেখা বাঙলা ঠিক বুঝা যায় না। কাবণ, তাঁদের কলমের ধাক্কায় ব্যাকবণ, idiom একেবাবে মুখ খুবড়াইয়া আছাড় খাইতে থাকে! প্রতিভার লক্ষণই এই নিজেব প্রভাব এমনি ভীষণভাবেই সে প্রকটিত করে।

তাঁদের বক্তব্য আমি প্রাণপণে বুঝিবাব চেষ্টা করি-য়াছি। একটা কথা বেশ বুঝিয়াছি, অর্থাৎ যাহাই লেখো না কেন, প্রল্লেম্ থাকা চাই। ত্রিওমেটিব প্রল্লেম্ নয়, এ্যালজেব্রার প্রল্লেম্ নয়—এ প্রল্লেম্ বার্ভার্ড'শ'র প্রল্লেম্, ইবশেনেব প্রল্লেম্, ফ্রয়েডের প্রল্লেম্। \*

\* ই'হার ভাবেন, এই সব বড় বড় নাম ফাঁদিলে লোকের তাক লাগিয়া যাইবে! আমরা তাক লাগিয়াছিল—তাবণর দেখি, হা ভগবান্, বার্ভার্ড'শ, ইবশেন এঁদের লেখা বই বাজারে পাওয়া যায়; দাম বেশী নয়—এবং যে-ইংরাজী ভাষায় এ-সব বই লেখা, তা আপনি-আমিও পড়িয়া বুঝিতে পারি। আমি পড়িয়া দেখিয়াছি। অতএব নাটক লেখার বিজ্ঞা আমাবই বা কেন আয়ত্ত না

এঁরা একটা কথা বলেন,—যে, বাঙলায় নাটকের আকারে ছাপা যে সব বই নাটক নাম ধরিয়া বাচিব হইয়াছে, তাহাতে শুধু সেই সীতা-সাবিত্রীর পা বিয়া টানা, নয় শিবাজী-প্রতাপসিংহ, আকবর-জিৎসীকে ঘোড়ায় চড়াইয়া চীংকাব করা আছে। এ-সবে নাটক হয় না। যদি বলেন সেক্সপীয়র, মালেরী, গ্যাটে, ভিক্টর হুগো—তাঁবাও এমনি সব ব্যাপার লইয়া নাটক লিখিয়াছেন? কিন্তু আপনাবা এ খবর রাখেন, এই সব প্রতিভার বর-পুত্ররা সেক্সপীয়রকে আমোল দিতে নারাজ? নাটক হয় বাঙালীর প্রাণ কইয়া মোচড় দিতে পারিলে। কিন্তু বাঙালীর জীবনে কোন্ সমস্যা প্রবস? আমবা জানি, অন্ন-সমস্যা সব চেয়ে বড় সমস্যা! কিন্তু হা-অন্ন বো-অন্ন করিলে নাটকে রস-বস্তুর সন্ধান মিলিবে না। Sex চাই। অথচ বিবাহের পূর্বে বাঙালীর লভ্ হয় না। মেয়েদের খুব ছেলেবেলায় বিবাহ দেওয়া হয়—এই জগা বিবাহে সাহিত্যেব বড় ক্ষতি হইতেছে। কিন্তু বক্তৃতা দিয়া

হইবে? ঐ সব বই পড়িয়া সেই সব বইয়ের প্রল্লেম বাঙলা ভাষায় নাট্যাকাবে ছাড়িলেই বাঙলা নাটক বনিবে! সামাজিক নর-নারী'ব নাম থাকিলেই হইল,—তাদের dialogueএ হাইড্, পার্ক, হাম্‌বুর্গ যতই থাকুক—বাঙালীর মুখের কথা বাঙলায় দিলেই ব্যস! তবে একটা কথা, এই যে বেচাবা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাটক লিখিয়া গেলেন, সেগুলাব কি গতি হইবে? নাটক কি, না বুঝিয়া তাঁরা কি লিখিয়া গিয়াছেন, কে তাহা বুঝাইয়া দিবে?

যখন 'দেখ দূর কব' যাটবে না, তখন থাকুক বালা-বিবাহ। সত্যিকাকে অগত্যা illicit love লইয়া কব কর্তব্য-পালন করিতে হইবে। সেইটাই হইবে প্রেমের। অতএব সে-কথাও আলোচনা না করিয়া একেবারে ক'খানি প্রেমোন্মত্ত নাটকের আদর্শ পাঠক-পাঠিকার সামনে ধরিতে চাই। দেখা যাক, নাটক-চীন বাংলা সাহিত্যে সাতজন নায়কের পুস্তন 'জাহাতে' কব' যায কি না। Sexট একমাত্র মানব-জীবনের সমস্যা। বাহ্যিক দেশ আত্ম ও কথা মানুষক,—দুশো, পাঁচশো, নয় হাজার বৎসর পরে তাকে এ সমস্যা মানিতেই হইবে। কেন মানিবে? সে কবাব পবে। কেন মানিবে না, আগে তার জবাব আপনারা দিন তো।

আত্মপরিচয় সাধনা কর? ভুল। এ ভুল ধারণা ভুলিতে হইবে। যাহা আত্ম নাই, তাহা কাল আসিবে না—এ-কথা কে বলিবে পাবে? কালো হৃদয় নিববদ্বি-বিপুল চ পৃথ্বী। এট সে এ দেশে এককালে নিউমনিয়া ছিল না, প্লেগ ছিল না, কালে আসিয়া উদয় হইয়াছে; 'ইনফ্লুয়েন্স'—তা'ও আসিয়াছে! এমনি কত নব নব রোগ আসিয়া আসন ঘাড়িয়া বসিয়াছে। অত বড় কপালী-মাপেণ 'মাম্প' আসিল! প্রলয়ও তেমনি আসিবে। নবির কাজ বল্লনার সাহায্যে অনাগতকে 'স্বাগত' অনর্থনা কব। অতএব আপনাদের যুক্তিতে সারবত্তা নাই। জুনিয়রে নাটক ফাঁদিয়া কর্ণক্ষেতে অবতরণ কব' যাক।

পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটক কি লেখা চলে না? থুব চলে। তবে তাহাতে modern note চাই। যেমন, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তীর কাহিনী ধব' যাক।

'সীতাকে লইয়া নাটক লিখিতে গেলে চাই সীতাকে নব্য নারী বানাওয়া তোলা। সীতাকে বাম অগ্নি-পরীক্ষা নিতে বলিলে সীতাব অমন কাঁদিয়া পাতাল-প্রবেশ চব'বে না। নয়া যুগের নয়া আইনে সীতা ফৌশ করিয়া বলিবে,—পরীক্ষা? আমার পরীক্ষা চাও তুমি? পরীক্ষা চেয়ে আমার নারীত্বের অপমান করবে? আমি দেবো না পরীক্ষা। সামনে এই বিপুল পৃথ্বী... এই পৃথ্বীর বুকে বরণ করবো আমি আমার এই পিপাসু হৃদয় নিয়ে... ইত্যাদি।

'সাবিত্রী'কে লইয়া নাটক লিখিতে হইলে ঐ অন্ধ দ্রুমৎসেনকে কাবাগারে পুরিয়া রাখিতে হইবে। সত্য-বানকে ছাড়িয়া দাও সেনা সংগ্রহ করিতে বক্তৃতার সাহায্যে। সাবিত্রী তার বাপকে বলিবে,—আমার বিয়ের ভাবনা তুমি ভাববে কি জগৎ? আমি নিজে স্বামী বেছে নেবো। এই কথা বলিয়া সাবিত্রী গৃহত্যাগ করিবে; নাদীর অধিকার লাভের জগৎ দেশে দেশে নারীর দল লইয়া উত্তেজক বক্তৃতা করিবে। তারপর হঠাৎ এ দলের সঙ্গে

সত্যবানের দলের দেখা; এবং দু'দল মিলিয়া অন্ধ দ্রুমৎসেনকে উদ্ধার করিবে; এবং 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা হইলে সত্যবানের গলায় সাবিত্রী ববমাল্য দিবে—স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার পুরস্কার-স্বরূপ।

'দময়ন্তী' নাটকে চাই হংস-মারকত নলের সহিত দময়ন্তীর প্রেম-পত্র চালানো—সে কথা ফাঁশ হইবার ভয়ে দময়ন্তীর পিতা বিবাহের আয়োজন করিবেন, ইত্যাদি।

কিন্তু পৌরাণিক নাটক পবের কথা। আগে চাই রক্ত-মাংসের নাটক। সে নাটক লেখা চাই বাঙালার Slum-life লইয়া। নহিলে সবজাস্তার দল গর্জন তুলিবে। তারা রবীন্দ্রনাথকে ও এ-ওঁরাশ্বের জগৎ ছাড়িয়া দেয় নাই। তা ছাড়া এ-পথে ধাঁ করিয়া পশার জমিবে।

নাটকের পাত্র-পাত্রীর তালিকা চাই সর্বাগ্রে। আমি সে তালিকা গোপন করিব না।

মোধো ছুতার—নায়ক; তার স্ত্রী বিরাজী—নায়িকা। মোধোর বিধবা মা আছে—সংসারের আবর্জনা। নাটকে তার কাজ, চড়া স্বর তোলা—যাহাতে নায়িকার চিত্তে বিবোধ-হেতু Pathos জন্মাট বোধ। সেই উদ্দেশ্যে নাটকে তাকে স্থান দিতে হইবে। আরও কতকগুলো পল্লীবাগী জীব চাই—এরা নায়িকার চরিত্র ফুটাইবে; আব থাকিবে এই অন্ধকারের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত ছিটাইতে তরুণ কবি বিজলীলাল।

## প্রথম অঙ্ক

মোধো ছুতারের ঘর। সন্ধ্যাকাল। বিজলী খোঁপা

বাঁধিয়া তাহাতে ফুল গুঁজিতেছে। এমন সময়

মোধো মদ খাইয়া ঘরে ফিরিল।

ফিরিয়া ডাকিল,—কৈ...?

বিরাজী। কেনে?

মোধো। দুখানা শসা কুচিয়ে দে তো!... আর এই বোতলটা রাখ...

বিরাজী। (মুখ-ঝামটা দিয়া) আমাকে কেনা বাঁদী পেয়েচিস! বটে! ওই বিষ গিলে আসবি, আর...

মোধো। বিষ নয় যে, এতে মজা আছে। সায়াদিন কাটার পর এ খেলে আরাম মেলে! বোতল রাখ...

বিরাজী। (খোঁপার ফুল গুঁজিতে গুঁজিতে) আমি পারবো না! কি হাওয়াই বইছে... আমি এখন ঘাটে যাবো... গা ধুতে!

মোধো। বটে! ঘাটে তোর কে আছে যে...

বিরাজী। ছোট নোকের মত বকো না বলচি!

মোধো। ছোট নোক! কে ছোট নোক, বিরাজী?

আমি? হাঃ—হাঃ—হাঃ—ওবে, এই ছোট নোকই

রাজ্য চালাচ্ছে—এই ছোটনোকই মহাশয় গন্ধীর মাথার মণি আজ!

[এ কথায় Depressed class-এর উপর দরদ জাগানোর ইঙ্গিত সকলে লক্ষ্য করিবেন!]

বিরাজী। তা হোক। আমি তোমার ইতরুণিতে সহায় হতে পারবো না।

মোখো। তার মানে?

বিরাজী। ও মনের বোতল ছোঁবো না।

মোখো। বটে! এ শিক্ষা কোথায় পেলি? বিরাজী... বিরাজী। খবরদার! ডাকতে হয়, বিরাজ বল ডাক... বিক বন্। বিরাজী নয়!...আমার চিত্ত আজ জেগেছে এই ফাগুনের হাওয়ায়! সে নিজেকে খুঁজে পেয়েচে...তার কি পিপাসা, কিসের ক্ষুধা...

[নেপথ্যে গান; এ গান বিজলীলাল গাহিতেছিল]

(গান)

ফাগুন হাওয়ায় মন জলে রে, মন জলে।

বক ঘরের অন্ধকারে ছন্দ হা রে বনবলে কৈ, বনবলে!

[গান শুনিয়া বিরাজী চঞ্চল হইয়া উঠিল। দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল]

মোখো। কোথা যাস?

বিরাজী। ঐ! ঐ আমার ডাক এসেচে...

(গান)

আমার মন মানে না রে

উধাও হয়ে ভাসচে সে যে

স্বরের কিনারে।

ঘরে এই অন্ধকারের হাঙ্গামারে

মন ভরে রে, মন ভরে।

সে হাঁপিয়ে মরে, হাঁপিয়ে মরে।

বাইরে বাইরে, চাই রে তাই রে

পরশ দিয়ে বাঁচাই তারে।

[আপনার যদি বলেন, ছুতোবের ঘরে ছুতোবের বোঁ এ গান গায় কি বলিয়া? তার উত্তরে আমি বলি, ছুতোবের ঘরে থাকিলে কি হইবে, বিরাজী নারী, eternal নারী; তার বৃক্ক ক্ষুধা নারীও যুমাইয়া ছিল; আজ কবির গানে সে সুপ্ত নারীও জাগিয়া উঠিয়াছে! জাগরণীর পালিশে ভাষায় জ্বলন্ত খোলে। দস্যু স্বত্বাকরের সুপ্ত চেতনা জাগিতে সেও একদিন গাহিয়া উঠিয়াছিল,—মা নিবাদ ইত্যাদি। নজীর আছে।]

মোখো। আরে মন্—ক্ষেপালি যে!

বিরাজী। এত দিন ক্ষেপেছিলুম—আজ ক্ষ্যাপামি সেরে গেছে। আমি চল্লুম...

মোখো। ঘর-দোর?

বিরাজী। প্রাণ যখন জেগেছে, তখন কি সে এই ছোট গণ্ডীর মধ্যে আর থাকতে পারে? আজ সারা দুনিয়ায় আমাব ঘর...আমি নারী! আমি তরুণী!

[প্রস্থান]

মোখো। বাঃ—এ যে ভেলু! যাক—কে কার! এ দুনিয়ায় বোতলই সার! (মদ্যপান)

(মোদোর মা শ্রামা প্রবেশ করিল)

শ্রামা। বোঁ গেল কোথায় রে?

মোখো। ওর প্রাণ জেগেচে...ওকে আটকো না...

শ্রামা। তা বলে ঘাটে ছুটবে—এই সন্ধ্যাবেলায়? বোঁ মাহুষ!

মোখো। বোঁ নয়, মা, মাহুষ। আগে মাহুষ, তার পর বোঁ...মাহুষকে মানো মা। মাহুষের বড় কেউ নয়। শ্রামা। কিছু বুঝি না এ-সব হৈয়ালি। উহুন জলে যাচ্ছে, ভাত চাপাবে, তা না বোঁ চললো প্রাণ জেগেছে বলে ঘাটে। অনাছিটি কাণ্ড।

[প্রস্থান]

মোখো। এ সংস্কার। কাটা সহজ নয়। বাধনের পর বাধন আসে। এ বাধন কাটতে পারলে সব দর্শা! ...বাঃ! (মদ্যপান)

## বিতান অক্ষ

নদীর ঘাট। ঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া বিজলীলাল বাঁশী বাজাইতেছে। বিরাজী আসিয়া দাঁড়াইল।

বাঁশী বামিলে খোঁপা হইতে একটু ফুল

লইয়া সে বিজলীলালের হাতে দিল।

বিজলী উঠিয়া বিরাজীর হাত

ধরিল। তার পর

কথাবার্তা শুরু।

বিজলী। তুমি এসেচো?

বিরাজী। এসেছি। ও গান, ও বাঁশী শুনে কি আর ঘরে থাকা যায়?

বিজলী। ঠিক। এ যুক্তির ডাক! বাধন-কাটার মন্ত্র! বিরাজী। সে যুগে রাখাব এই দশা ঘটেছিল; শ্রামের বাঁশী শুনে...

বিজলী। ঠিক তা নয়। সে বাঁশীর মধ্যে কামনাব সুর ছিল। আজকের এ সুরে নিছক যুক্তির হাওয়া...

বিরাজী। এ হওয়ার পরশ আমাব সব বাধন শিখল করেছে। দেখচো না, আমি কাঁপচি?

বিজলী। স্থির হয়ে বসো, বিরাজ! ...আকাশের পানে চেয়ে তাকাও...কি দেখচো?

বিবাজী। একটি, দুটি, তিনটি তারা...

বিজলী। ঠিক...তিনটি মাত্র তারা। চাবটি নয়, দুটি নয়! এর মানে বোঝো?

বিবাজী। না। বসো...

বিজলী। নাবী, নাবীর স্বামী, আর প্রণয়ী...নিখিলে আছে এই তিন জন।

বিবাজী। ( বিহ্বল দৃষ্টিতে বিজলীর পানে চাহিল )

বিজলী। 'তাই নাবীর চিত্তে দুটি ধারা অজর অমরকাল ধরে প্রবাহিত। একটি ধারা স্বামীর ঘবর্ণার কাছে গিয়ে মিশেচে—যে স্বামী অন্ন ভোগায়, বস্ত্র ভোগায়, থাকবার ঠাই দেয়; আর এক ধারা ঐ চিত্ত-মাগবে গিয়ে মিশেচে, প্রণয়ী—যে শুধু প্রাণ-মনের খোঁজকে দেবে, বচনে-চুবনে অশ্রু-গগের পশরা বয়ে প্রাণ-মন পূরকে তৃপ্ত করবে। এই প্রণয়ীর সঙ্গেই নাবীর যা কিছু প্রাণের নারবাব। সংসারের সব কলরব-কোলাহল ঠেলে রেখে দিনান্তে নিশীথে এই প্রণয়ীর পাশে নাবী আসবে গানিমুক্ত চিত্ত নিয়ে.. আলো-হাসি-গানের উৎসব জাগাতে!

বিবাজী। ( পূরক দাঁপুতে দুই চোখ ভরিয়া উঠিল )  
তাই হোক, কবি! আমি এসেছি...

বিজলী। এসেচো আমার প্রাণের প্রিয়া...আমার শত যুগের সাধনার চিয়া...এসো, এসো ( বক্ষ-লগ্ন কবিতা চুপন )

( নেপথ্যে মোধো। কোথায় গেলি বো? )

বিবাজী। ঐ আসচে...ধরো, ধরো আমার... ( বিজলীকে আরো জোরে আঁকড়াইয়া ধরিল )

বিজলী। আসচে। তাই তো! উপায়?

মোদোর প্রবেশ

মোদো। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি মাতাল...আমি স্বামী।  
...বিবাজী...

বিবাজী। তোমার সংসারের সব কর্তব্য সেয়ে তবে আমি এসেছি। আমার মন, নাবীর মন...সেও তৃপ্তি চায়...  
মোদো। চায়? এই নার তৃপ্তির গেলিস...

( মজ দান )

বিবাজী। যাতে পুরুষের তৃপ্তি, নাবীর তৃপ্তি তাতে নয়...তাতে নয়...

মোদো। কিন্তু এর জগৎ তৈরী ছিলুম না। তা...  
বেশ, ভাবতে হলো...( মজ পান )

বিবাজী। তুমি ভাবো...আমরা এই গোপুলির বাগে প্রাণের কলঙ্গন...

বিজলী। বাঁশী শুনেবে?

বিবাজী। না। গান...প্রাণের গান। এমন গান গাও কবি,  
যাতে ভেঙ্গে ছমড়ে আমি তোমার বুকে মিশে যাই!

বিজলী। ( গান ধরিল )

গান

বীশেব বাঁশী...তার সুরে ফাশি...

ফাঁশ লাগাই গো, নীরব প্রাণে!

কাজে লাজ দে, আর চুটে সহি

অকাজে আয় গানে-গানে!

টাকাব পিছে-পিছে ধাওয়া, মাথা খাওয়া,

মাথা—সে অন্ধি তুচ্ছ।

তায় ইজ্জৎ কি, খুব বুকেচি,

ভয় কি লোকের কুচ্ছ!

নারীর প্রাণের ভালোবাসা,

চোখে তাব চাউনি খাসা—

বাঁধি সব এই সুরের তানে!

শ্রামার প্রবেশ

শ্রামা। এ দেখেও মদ গিলচিস? কোথাকারি নির্ধিগ্নে হুই!

মোদো। চূপ কব্ মা...আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে!...

কিছু বুঝতে পারচি না...বুঝতে দে ( মজ পান )

বিবাজী। পিয়, পিয়...

বিজলী। পিয়া, পিয়া...

( বৃক্ষশাখে পাপিয়া ডাকিল—পিয় পিয় পিয় )

ঐ শোনো...সারা নিখিল পিয়ার জগৎ আকুল  
অর্জুরব তুলচে! সুন্দর নিখিল! আমরা ও  
সুন্দর হবো।

## তৃতীয় অঙ্ক

বাগ্ৰি প্রভাত হইয়াছে। দৃশ্য—মোদোর গৃহ।  
দাওয়ায় বসিয়া মোদো, বিজলী, বিবাজী।

বিজলী। ভাবা শেষ হলো?

মোদো। হয়েছে। তোমাদের কথাই ঠিক। নাবীর  
চিত্তে দুই ধারা,—এক ধারা সংসারে; আর এক ধারা  
পরদেশী সেইয়ায়...

বিবাজী। নাথ, স্বামী...

মোদো। প্রিয়তমে, শ্রী।

বিবাজী। তুমি সত্যি মহৎ।

মোদো। এতে মহত্ব নেই, বিবাজী। এক কালের ভেয়ী-  
রব। স্বামী সংসারের অভাব মেটাবার জগৎ।  
প্রাণের সঙ্গে তার কোনো কারবার নেই। প্রাণ  
সেখানে সঙ্কুচিত হবে, সঙ্কীর্ণ হবে। প্রাণের কার-  
বার বাটের প্রণয়ী-জনের সঙ্গে—ঐ আকাশের মত  
যার মুক্ত দবাঙ্গ প্রাণ, তাকে এই ছোট্ট সংসারের মধ্যে  
বঁধে বাখবাব চেঁচী মূঢ়তা!

বিজলী। তাই। বিরাজ...

বিরাজী। বিজলী... আমার অন্ধকার প্রাণের আকাশে  
তুমি বিজলীর চকিত-চমক... তবু তার আলোয়  
হুনিয়া আমার আলো হয়ে উঠেচে।

মোদো। এ ভোরের আলো, বিরাজী...

বিরাজী। আমার প্রাণ তাই বিভোর হয়েছে! একটু  
পরে রবি-কর দীপ্ত প্রথর হবে।

বিজলী। সংসার এ দিবালোকে তোমায় ডাকচে, যাও...  
তার পব সংসারের দাবী চুকিয়ে তোমার কুটার-  
প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যায়, আমার প্রতীক্ষায়... চান  
আলোব হাসি হেসে কাণের কাছে গাইবে... জাগো,  
জাগো...

বিরাজী। তখন প্রণয়ের আহ্বান!... এইখানেই নারী  
নারী... খুঁড়ি, ভুল হচ্ছিল নব নারী!... প্রেমের  
অভিষেক হয়েছে তার। এই রূপে নারী ভেগে উঠুক  
পটা গলিত সংসারের বাঁধন কেটে মুক্তির ধারায় নব-  
ম্রাত হয়ে...

বিজলী। তাই হোক.

মোদো। মাঠে! মাঠে!

### সবনিকা

এ নাটক লিখিবাব শাক্ত সমাজ বিকশিত কবিতা  
হটলে ছেলেদের নব-বর্ণ-পরিচয়ের প্রয়োজন। তাহা  
একটি শব্দ দিলাম। আমাদের নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে  
নব-বর্ণপরিচয়ে পোক্ত হইলে আত তরুণ বয়সেই  
Sex-তত্ত্বে অসীম জ্ঞানলাভের সুযোগ মিলিবে। নিম্ন  
তপশীলে নব-বর্ণপরিচয়টুকু বর্ণিত হইল।

### নবপর্যায় বর্ণ-পরিচয়

“অ—য় অঙ্গরব আসচে তেড়ে; আ—য়  
আমি আনি থাবো কেড়ে”—অধুনা বাতিল হইয়াছে।  
তার বদলে

(নব-বর্ণ)

অলক ছুঁয়ে বইছে বাতাস।

আলতা পায়ে পরাণ মাতাস্।

ইয়ারিং ছুটি ভুলছে কাণে।

ঈক্ষণে তীর-গুচ্ছ হানে।

ঐতুরাজের মলয় ঝরে।

৯-লি ৯-লি প্রণয়-জরে।

এলো খোঁপায় মানস দোলে।

ঐ বাঁশীতে পরাণ ভোলে।

ও-বাড়ীর ঐ জান্না খোলা।

তব্বৎ দোলায় প্রাণের দোলা।

(ব্যঞ্জন-বর্ণ)

কাজল-চোখে চাউনি মিটে।

খোঁপার বাহার চিনির ছিটে।

গাজল-গানে লাগায় কাঁশি।

যুগযুগান্তে ঠোঁটের হাসি।

ঙ-বাদড়া, নেইকো ভাষা।

চুড়ির দাগে চিত্র ঠাণা।

ছাদের পানে চেয়েই আছি।

জান্নাতে যুগ দেখলে বাচি।

ঝলক-হাণির আরাম কত।

ঞ-বাদড়া ও'র মত।

টুকটুকে দুই নিটোল গাল।

ঠে টি হু'খানি ডাগিম-বাধা।

ডগদগ-বুক প্রেম-স্বপনে।

ঢল নাই তার স্মৃতিবনে।

ণয় নিজস্ত দিল-পরাণ।

তরুণ প্রাণে সবজী-বাগ্।

থমকে থামা চলাব কালে।

দয়দ জানায় পুরো চালে।

প্রভু আমি তোমায় পেলে।

নয়, দূর ছাই বাই গে ভেগে।

পর নারী গো, পবাণ প্রিয়া।

ফরদা প্রাণ, দরাজ হিয়া।

বাঁধন নাই, না মান্ বাধা।

ভরসা যুগ, আর প্রাণ সাধা।

মন যে রূপের ধান-পাগল।

যুগ-বাণী,—তাপ, তাপ অগল।

ঝঙ-নেশায় বৃন্দ দিল্ বৃথাব।

লান ঠোটে তুই তব্ চুনিয়।

বিলোল চোখ দিল্ ও'তায়।

শাড়ীর পাড় চোখ মাতায়।

স্বাট বছর? তায় লজ্জা কি?

সঙ্গে চাই দিল্-সঙ্গিনী।

হাতনে হাত দে, দিলমে দিল্।

ক্ষয় না প্রথম একটি তিল।

এই ভাবে নব-পর্যায় বর্ণ-পরিচয় ঘটলে বাঙালীর  
কামনা পূরিবে, অর্থাৎ ছ'মাত্র বৎসর বয়সে বাঙালী  
বালক Sex-তত্ত্বে তত্ত্বভূষণ হইবে এবং তার ফলে যে  
গান, যে কবিতা, যে গল্প উপজাস বা নাটক সে  
গড়িবে, তার থাকায় হুনিয়া ঘুণীচক্রে হুনিয়া সেই  
বৈকুণ্ঠলোকে গিয়া ঠেকিবে—সে সম্বন্ধে অকুতোভয়ে  
ভবিষ্যৎ-বাণী প্রচার করিতেছি।

# জাতীয় নাটকের প্লট

( নক্সা )

সৌরীন্দ্রমোহন যুখোপাধ্যায়

## জাতীয় নাটকের প্লট

আজ বাঙালীর দুর্দিন ঘুটিয়াছে। বাঙালী বিশ্ব-সাহিত্য-সভায় দস্তভরে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছে। বাঙালী এত দিনে তার নাটকের অভাব মোচন করিয়াছে। বাঙলা নাটকের নামে বঙ্গমঞ্চে যে গদ্যর আঞ্চালন, কোদণ্ড-টঙ্কার, যে প্রণব-বাস-রঞ্জিত নৃপুং-নিরঞ্জনর আমদানি হইয়াছিল, তাহা যে বাঙলার নিজস্ব বস্তু নয়, তাহাতে যে বাঙালীর পবিত্র কোনো দিন পরিষ্কৃত হয় নাই, এ কথা আমরা তারস্বরে বারবার ঘোষণা করিয়াছি এবং বৃন্দাবনের শ্রীধার মত পথের পানে চাহিয়া আকুল প্রতীক্ষায় বসিয়া ডাকিতেছিলাম—কোথায় আডো হে বাঙলা নাট-মঞ্চের আমন্ত্রণ, এসো। এসো তোমার বাঁশী লইয়া, বাঙলা ব্রজে গোপ-গোপিকার প্রাণের কথাটুকু দে-বাঁশীর স্ববে বাঙলার গগনে পবনে ভরিয়া তোলো।

আজ আমাদের সে পথ চাওয়া সার্থক হইয়াছে! বাঙলার নাট-মঞ্চে আমন্ত্রণ আসিয়াছেন। জানেন পাঠক, তিনি কে? তিনি আমাদের তরুণ বন্ধু শ্রীযুক্ত বেচারাম গুপ্ত। তাঁর নব-নাটক “মুক্ত বন্ধ-দ্বার” বাঙলা নাট্য-কলার গলায় আজ “গার্লান্ড” ফুলাইয়া দিয়াছে!

শুধু আমন্ত্রণ আসেন নাই! তাঁর চেলাবর্গ—সেই শ্রীদাম স্তদাম প্রভৃতি সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁদের লেখা নাট্য-সমালোচনার নামাবলী আজ ঘুড়ি হইয়া বাঙলার আকাশে উড়িতেছে! দেখিয়া কাক-চিলেবা ভয়ে বাসায় গিয়া ঢুকিতেছে!

প্রথমে আমরা ‘বন্ধ-দ্বার’ নাটকের আলোচনা করি।

সেদিন হংসেশ্বর বঙ্গমঞ্চে তার যে অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি, তার আব তুলনা নাই! A nation is known by its theatre. যে নাটক সত্তা দেখিয়াছি, সে নাটকে বিশ্ব-সভায় বাঙলা প্রবেশ কেহ আর আটকাইতে পারিবে না। এমনি নাট্যচর্চা ছাড়িয়া যতই খন্দর পক্কন, যতই লবণ তৈয়ারী ককন, দেশমাতা জাগিবেন না, জাগিবেন না!...

প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ কবিলাম,—কি প্রচণ্ড ভিড় টেলিয়া! উঃ, রথের মেলায় এমন ভিড় দেখি নাই। এমন যে চৈত্রেব সঙ্ঘ বাহির হইল সেদিন, তা দেখিতে লোকের ভিড়ে কলোয় ষ্ট্রীট আগাগোড়া ভরিয়া গিয়াছিল—তার চেয়েও বেশী ভিড়। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভাবিলাম, হাঁ, জাগিয়াছে, দেশবাসীর নাট্য-কুলকুলিনী জাগিয়াছে! জীতা রহো বাঙালী দর্শক...তুমি এত সহজে থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে মজিয়া এমন মাতনে মাতিতে পারো—ধন্য, ধন্য তুমি হে!

সাড়ে সাতটায় অভিনয় হইবার কথা, কিন্তু প্রথম রজনী কি না, কাজেই রাত্রি পোনে দশটায় যবনিকা উঠিল। এই দীর্ঘ কালটুকু পর্দার বাহিরে দর্শকের নাট্য-রস পিপাসা বাড়াইবার এই যে ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থা খুব সমীচীন! সর্বতোভাবে আমরা এ ব্যবস্থার সমর্থন করি। প্রথম পটোস্তোজন হইলে দেখি—সজ্জিত ড্রিং-রুম। দোফ, কোর্চ, পিয়ানো, রেডিও-সেট—অর্থাৎ সরঞ্জাম একেবারে আপ-টু-ডেট। কাণের পাশে কে এক বিমুঢ়াঙ্গ কহিল—এ কি সাধারণ বাঙালীর ঘর?

সামনের শীট হইতে আর এক জন কহিল,—  
সাধারণ বাঙালীর ঘরে শুধু ধামা আব কুলো! তা  
নিয়ে নাট্য-রচনা হয় না বাপু। তুমি ধামো...

হুটা কথাবটুকু মাত্র। কিন্তু হুটি কথাতে আমাব  
মনে চিন্তার সমুদ্র আলোড়িয়া উঠিল। সাধারণ বস্তু  
নাটকের subject হইতে পাবে না ঠিক। নাটকে চাই  
অসাধারণের ব্যঙ্গনা...কিন্তু যাক্ সে কথা!

নাটকের গল্পটুকু এখন খুলিয়া বলি। মাঝে মাঝে  
কোটেসন দিব। ভাড়া হইতে বাঙালী বুঝবে, তাব  
নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করিবাব কি ব্যবস্থা হইয়াছে!

প্রথম দৃশ্যে ডয়িং-রুম। ঘবে একটি টেবিল।  
টেবিলের উপরে স্তপাকার চিঠি, খবরের কাগজ...টেবি-  
লেব সামনে চেয়াবে বসিয়া অক্ষান্ত। প্রোগামে  
লেখা ছিল, প্রথম দৃশ্যে অক্ষান্ত; তার পাশে একটি  
খানসামা...

পট উঠিবামাত্র অক্ষান্ত ক্ষিপ্ত হস্তে চিঠিগুলো লইয়া  
পড়িতে লাগিল। যত বড় চিঠিই হোক, হাতে পরিবামাত্র  
পড়া শেষ! তুচ্ছ ব্যাপার। নিপুণ অভিনেতার এই ক্ষুদ্র  
ইঙ্গিতে বুঝিলাম, অক্ষান্ত দ্বিতীয় কক্ষা ব্যক্তি...হু'একখানা  
চিঠির ছ'চাবিটা ছত্র অক্ষান্ত উচ্চকণ্ঠে পাঠ করিল...

"গন্ধনাথ কি লিগচে? তিশিঙুনো বিক্রী হয়েচে,  
পঞ্চাশ হাজাব টাকা লাভ...হু'...

হাপাগলার কুমাব-বাহাদুরেব বাড়ী নাচেব গানের  
জলসা...বুধবাব। আচ্ছা...

বালিগঞ্জের বাড়ী...তোকুমার নবাব ভাড়া নিচ্ছে.  
মাসে ভাড়া দেড় হাজাব...এক মাসের ভাড়া আগাম  
দেছে। বটে ..."

আমরা চমৎকৃত! হু'চারিটা নিপুণ ইঙ্গিতে নাট্যকার  
বুঝাইয়া দিয়াছেন, অক্ষান্ত টাকাব কুমার-চারিদিকে  
তার ব্যবসায় প্রসার...মালিন্দী বাঙলা দেশ জুড়িয়া  
আঁচল পাতিয়াছেন, আর রাজ্যেব টাকা সে-আঁচলে  
বাঁধিয়া এই অক্ষান্তেব গৃহে...বাঃ, এই তো চাই! মুহু  
ইঙ্গিতে অসীমের এমন আভাস! যারা নাটক লিগিতে  
চান, তাঁরা এ মঞ্চটুকু ছদয়ঙ্গম করুন।

একটা বেসার আসিয়া ঘবে ঢুকিল, কহিল,—জী...  
অক্ষান্ত মুখ তুলিলেন, কহিলেন,—বাঃ...?

—জী ভজুর ..

কাগজপত্রের মধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া অক্ষান্ত অকমনস্ক-  
ভাবে কহিলেন,—তোব বহু-জী এসেচেন?

—জী...

—আব কেউ এসেছিল...?

—অশোক বাবু...

—আচ্ছা, যাও...

বেহারী চলিয়া গেল। এই যে সাতবী কেতার

সাজানো ঘর, অথচ অক্ষান্তের পূর্বে ধৃতি এবং জীকে  
মেম-সাহেব না বলিয়া বহু-জী বলিয়া নির্দেশ—ইহাতে  
কতপানি শক্তির পরিচয় পাই! চমৎকৃত হইলাম।  
এই তো জাতীয় ভাবের বিকাশ! অপূর্ণ! তার উপর এই  
মুহু ইঙ্গিত...‘বহু-জী’ অক্ষান্ত প্রৌঢ়; জীব সম্বন্ধে  
‘গিন্নী-মা’ না বলিয়া বলিলেন, ‘বহু-জী’। আর এই  
অশোক বাবু! হুনিয়ায় এত লোকজন থাকিতে এই  
অশোক বাবু নামটুকু...কি নিবিড় বহু স্মৃতি হইয়াছে  
...এই তো নাটকের সমস্তা—ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের জায়  
দর্শকের মনে এ সমস্তা ছায়া বিস্তার কবে!...

অক্ষান্ত একখানা খবরের কাগজ খুলিয়া পাতায়  
পাতায় দৃষ্টি ছুটাইলেন—মোটরের বেগে...

পিছনের ঘর খুলিয়া প্রবেশ করিলেন. কপূর।...

প্রোগামে পরিচয়-লিপি দেখিলাম, কপূর।...কে?  
“অক্ষান্তের বিবাহবন্ধনাবন্ধা পত্নী!”

পরিচয়-লিপিতে এই যে বিশেষণটুকু ‘বিবাহ-বন্ধন-  
বন্ধা পত্নী’। পত্নী-মাত্রই তো ‘বিবাহ-বন্ধনাবন্ধা,’  
তথাপি এ বিশেষণ। এই দিকটায় মন সচেতন হইল...  
বিবাহবন্ধা নয়! ‘বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধা—এ ‘বন্ধন’  
কথটুকু...এ যুগের, এ যে অমোঘ সমস্তা। বাঃ!  
হৃদয়ের পাঞ্চজ্ঞ-নিদান!...

কপূর। দেখিতে স্ত্রী...বয়সে তকলী...ছিপছিপে  
দেহ...যেন সেই স্ফুরিণী পল্লবিনী লতা! বাঙলাব নাট্য-  
মঞ্চে এমন স্ত্রী দেহ দেখা যায় না! কেমন হাওয়ার গুণ  
...বাঙলা বদমঞ্চে বতি, শতী, জীরাধা—এতদিন যাদের  
দেখিয়াছি, সকলেবই স্থূল বপু! এ বদমঞ্চাধ্যক্ষের  
বাহাহুবি আছে—এমন স্ত্রীশরীর-বারিণী অভিনেত্রী  
পাইয়াছেন।

কপূর। আসিয়া প্রচণ্ডভাবে একটা কোঁচে বসিয়া  
পড়িলেন...

পাশে একটা শূণ্যপক্ষীয় দর্শক ছিল। সে মস্তব্য  
করিল,—এ কোম্পানি কাকেও মাতিনা দেয় না। তাই  
এদেব ‘হীরাইন’ এমন যোগা।

অক্ষান্ত কাগজ বাখিয়া কাজ বাখিয়া উঠিয়া আসিলেন,  
কপূর। একখানি হাত নিজেব হাতে সাদরে চাপিয়া  
ধবিলেন, কহিলেন,—বড় শ্রান্ত হয়েচো...

হাত নাড়িয়া অধীরভাবে কপূর। কহিলেন,—শ্রান্তি,  
শ্রান্তি, স্তম্ভের শ্রান্তি...

অক্ষান্ত শশব্যস্তে কহিলেন—চা আনতে বলবো?  
লিমনেড? আইসক্রীম...

কপূর। মুখে বিরজিব চিহ্ন! তিনি কহিলেন,—না,  
না, না...

অক্ষান্ত কহিলেন—কোথায় গেছে?

কপূর। কহিলেন—মিটিংয়ে। আজ আমাদের

নারীমুক্তি প্রচারিণী সভার মিটিং ছিল।...তা তুমি কি এখন বেকবে ?

তাঁব চোখে আগ্রহ যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

অস্বস্ত কহিলেন—হ্যাঁ, আমাদের দবন্দ-নাট্যের সভার স্পেশাল মিটিং আছে। একবার...

কপূর কহিলেন—যাও। নিষ্ঠুর পুরুষ...

অস্বস্ত কহিলেন—কঠোর কর্তব্য আবো কঠিন হয় তোমার জুড়টি-স্পর্শে। ভেবেছিলুম, বায়োম্বোপে যাবো তোমায় নিয়ে...টেলিফোন করছিলুম তুমি নীটেব জুগ...

বাধা দিয়া কপূর কহিলেন—থাক, থাক, কোনো প্রয়োজন নেই।

কপূর উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তার পর টেবিলের উপরকার কাগজপত্র ঘাটিলেন...পবক্ষণে স্বামীর পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—অশোক তোমার সঙ্গে যাবে ?...

অস্বস্তের চোখে মমতার দৃষ্টি...হুঁসেকণ্ড নীরবে চাহিয়া তিনি কহিলেন—কেন ?

কপূর কহিলেন—না...এমন কিছু কারণ নেই... তবে বায়োম্বোপের কথা তুললে। তাই। সে থাকলে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম...

অস্বস্ত স্থির দৃষ্টিতে কপূরার পানে চাহিলেন, তার পর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তুমি জানো কপূর, ঐ অশোকের চিন্তায় আমি কতখানি কাতর। দেখেচো ওর মুখে ভাব ? চোখে ভঙ্গ ? কি বেদনায় ও দিনান্তের ফুলের মত স্নান, মলিন হয়ে থাকে ! আমাদের স্নেহে ওর বেদনা মুছে নিতে পাবচি না...

কপূর বিশ্বর-ভরা দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন।

অস্বস্ত কহিলেন—ও কেমন স'রে স'বে থাকে ! কি ভাবে ! দার্য নগসে ওর বুকের বেদনা পুঞ্জিত হয়ে ওঠে...প্রাণপণে ও তাকে চেপে ধবে...ওর বুকের মধ্যে অহনিশি একটা সংগ্রাম চলেছে...বিপুল সংগ্রাম। আমার কি সন্দেহ হয়, জানো ?

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কপূর কহিলেন—কি সন্দেহ ? তাঁব মুখ বিবর্ণ হইল, দেহ-লতা ঈষৎ শিহবিয়া উঠিল।

অস্বস্ত কহিলেন—বেচারি গোথ হয় প্রণয়-বিষে জর্জরিত হচ্ছে। সে বিষ...

কথা শেষ হইল না। অস্বস্ত টেবিলের উপর হইতে কতকগুলি কাগজ-পত্র গুছাইয়া হাতে লইলেন... কপূর এ দিকে মুখে-চোখে ভাবেব বিচিত্র বিষয় বহাইতে লাগিলেন...বুকে হাত দিলেন, বুঝি, বুক ফাটিবার উপক্রম হইয়াছে ! সেটা সামলাইলেন, তার পর জুড়টি, পরক্ষণে বিস্ফারিত চক্ষু...আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁব ভাব ফুটিতে লাগিল...অস্বস্ত সে দিকে চাহিলেন না... একদিকে হুঙ্কার হুঙ্কার ভাণ্ডার...এ যে কত

বড় নাটকীয় আর্ট—যাঁরা বার্ডা শর নাটকের বাঙলা সমালোচনা লেখেন, তাঁরাই শুধু বুঝিবেন।

সহসা কাগজপত্র টেবিলের একধারে রাগিয়া অস্বস্ত কপূরার কাছে আসিলেন, সম্মুখে ডাকিলেন,—কপূর...

কপূর চমকিলেন,—স্বামীর পানে চাহিলেন,—মুখে কোনো ভাব নাই...স্থির দৃষ্টি !

অস্বস্ত কহিলেন—বেচারি ! একা থাকে নিছের মনে। তুমি কাছে ডেকে দবন্দ-ভাবে হুঁটারটে কথা বলো...তার কি বেদনা...অতি সহ্য স্নেহেব পবশে তা জানতে চেয়ে !

অস্বস্ত স্তব্ধ হইলেন, তার পর স্বগত ( উচ্চকণ্ঠে ) কহিলেন,—ওব মাকে আমি বলেছিলুম, আমি ওকে দেখবো। হুঁজাগিনি...

কপূর অগ্রসব হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—অশোককে তুমি আগে থেকেই জানতে ?

—ওকে নয়, ওব মাকেও জানতুম। বেচারী লালিয়া...

—ওর মা...?

—হ্যাঁ, ওব মায়ের নাম লালিয়া। বহুকাল পূর্বে... তখন আমার প্রথম যৌবন...ছনিয়া বঙে বড়ীন—শুধু ফাগুনের হাওয়ায় দিনগুলো সাবানের ফেনার মত উড়ে উড়ে চলেছে... ( দীর্ঘশ্বাস ) তার পর তাঁব বিয়ে হলো...সে চলে গেল দুবে...বিদেশে, বহুদুবে...আমি তখন প্রোবেট নিয়ে সম্পত্তি হাতে পেয়েছি...তার সে রূপলী...রক্ত কমলের মত আঁকা আছে এ চিত্র-পটে...আজো, আজো...এতটুকু বিবর্ণ হয়নি...

কপূর বুকে হাত রাখিলেন, তাঁব পর আপনাকে সম্বরণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—তার পর আর জাপোনি তাকে ?

—না।

—তোমাকে কোনো চিঠি লেখেনি ?

—একখানি মাত্র। তাতে লিখেছিল, তার হুঁথের অন্ত নেই। বেদনার তার শবীৰ-মন অসহ্য যাতনা ভোগ করচে অহনিশি...অশোকের চিন্তায় সে কাতর...

—তাঁব পর ?

—তাঁব পর তুমি জানো—সেই মধুপুর যাচ্ছিলুম—হাবডার পোলের উপর...উদাস মনে অশোক চলছিল, আমার মোটরে ধাক্কা লেগে পড়ে গেল। টোট্ লাগেনি। আমি তাকে গাড়ীতে তুলে নিলুম। তার পকেটে ছবি ছিল। একখানি ফটো ! দেখে আমি চমকে উঠলুম...জিজ্ঞাসা করলুম, কাঁব ছবি ? অশোক বললে,—তার মা'ব...স্নেহময়ী মা'র...হুঁথিনি মা'র ! সে ছবি দেখে আমি তাকে চিনলুম...সে ছবি লালিয়ার।



কপূরী কহিলেন,—মনে পড়ে...আমার বিয়ের ছ'মাস পরেব কথা। অশোক জানে...?

—কি?

—যে তুমি তার মাকে জানো?

—না। তার মা'র কথা আমি কোনো দিন তুলিনি।

ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চাটিটা বাজিল। অস্বস্তি কহিলেন,—চারটে বাজলো। ঠঃ! আমার দাঁড়ানো চলো না। চললুম...

অস্বস্তি চলিয়া গেলেন। কপূরী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন। তার পর গান শরিলেন,—

কোন ফুলের আজ মন ছুঁলে হয়,

দিল্‌ ভুলে যায় দুঃখ তার?

গন্ধ-ভাগল ফাঙন-পাগল মনের আগল ছিন্নাকাব!...

খাশা গান! যেমন কঠ, তেমনি সুর! গজলে

মশগুল সকলে!...

গানব শেষে ধীরে ধীরে এক তকণের প্রবেশ। দীর্ঘ কেশ উষ্ণ-শুক—মলিন মুখ...স্বীর্ণ বেশ...উদাসীন মুষ্টি। মেলো-ডামার তরুণ তাপসের মত...আর একালের কবিতার-খাতা-হাতে সম্পাদকের দ্বাবে-ঘোরা তরুণ কবি প্রতিচ্ছবি!

কপূরী তাকে দেখিয়া ছুটিয়া তার বক্ষে মাথা রাখিল, ঝিকিল,—অশোক...প্রিয়তম...

বুঝা গেল এই সে অশোক, লালিমার পুত্র, হাবড়ার পুলে যাকে অস্বস্তি মোটরের তলা হঠাতে কুড়াইয়া ঘবে আনিয়াছেন!

অশোক হুঁপা হঠিয়া গিয়া কহিলেন,—চুপ। এ কি বলচো...নারী?

কপূরী উন্মাদের মত অধীৰ সঠে কহিলেন,—নারী! নারী বলেই এ কথা বলতে পেরেচি। পুরুষ ভীক কাপুরুষ, আর নারী সাহসিকা শক্তি, তাই বলতে পেরেচি! শোনো তরুণ অশোক, এই নারীর প্রণয়-পদাঘাতে তোমার হৃদয়-পুষ্প মুঞ্জরিত হবে। নারীর এ কঠ নীববতা মানবে না...এই ফাঙন হাওয়ায় ঐ ফুলবনের পাণিষাব মত সে গেয়ে উঠে—বিনা-আয়াসে তার বৃকের সঞ্চিত বাণী...এ আর সহ হয় না, অশোক...জীবন অসহ্য হয়েছে...আমাব! এই প্রাসাদ, এই উপবন, মোটর, দাসদাসী...বিলাস-ভূষণ...

কপূরী অশোকের হাত ধরিয়া টানিয়া তাকে কোঁচে বসাইল, এবং নিজে তার পায়েব কাছে বসিয়া কহিল—মনে পড়ে সেই হাবড়ার পুল...চারদিকে ধূ-ধু-প্রসারী আকাশ, নীচে কলনাদিনী গঙ্গা...গঙ্গার বৃকে সেই অসীম আকুল তবঙ্গোচ্ছ্বাস...আমার পানে বেপথু দৃষ্টিতে চাইলে! আমার প্রাণ-গঙ্গায় অমনি কি কলবব উঠলো...কি ঢেউ ছুটলো! সে ঢেউ বৃকে বেঁধে আর থাকতে পারি না...

তোমার ও-দৃষ্টিতে ভগীবথের 'আস্থান' বাজচে অহরহ... শিবের ভটাজাল আমার এই বৃক-গঙ্গাকে আর ধরে রাখতে পারচে না...

অশোক নীরাক। নিবাত-নিঃশব্দ দীপেব মত তার চোখের দৃষ্টি।

কপূরী কহিল,—চলো...চলে যাউ আমরা লোকালয় ছেড়ে দূরে...বতদূরে। যেখানে পাখীর প্রেম-কাকলী—বজ্র-জ্বরের অবাদ মিলবে সব বাজচে...যেখানে মানুষ কঠিন হাতে বচা আইন দিয়ে বিধ-নিষেধ তুলে প্রাচীর গড়তে পারেনি...চীন, জাপান, তিব্বত, ইরান, আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গল...যেখানে বলবে...নিভৃত পর্ষত-কন্দবে...

অশোক বাতাসত গাছের পাতাব মত কাঁপিতে লাগিল।

কপূরী উচ্ছ্বসিত আবেগে কহিল,—প্রথম সেই হুঁ চোখের দৃষ্টি যখন মিললো, আমার মনে হলো, জগতে যেন আজ প্রথম আমার দৃষ্টি উন্মীলিত হয়েছে!...ছনিয়া বঙে রঙীন দেখলুম।...

এই অবাদ বলিয়া কপূরী অশোকের বৃকে মুখ ঢাকিল। অশোক তাকে আশ্বাস দিয়া কহিল,—যাবো, যাবো, তোমায় নিয়ে চলে যাবো...যেখানে বলবে, কাকুনজুয়ার হিমশৃঙ্গে...যেখানে আজ ছালোকের সন্ধান চলেছে! ল্যাপল্যাণ্ড গ্রীণল্যাণ্ড—মাসিক-পত্রের কার্যালয়, কবির মনোমন্দির...যেখানে বলবে প্রিয়তমে, যেখানে...খাশা...

দুজনে মিলন-পাশে প্রেমশব্দে বিভোর, এমন সময় মহা-বিবক্তি-ভরে মশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিলেন অস্বস্তি...তিনি বালিতেছিলেন,—তাড়ার সময় সব ভুলি...দবকারী কাগজগুলো...

অস্বস্তি টেবিলের উপব স্তূপীকৃত কাগজ টানিতে উদ্রত...তার দৃষ্টি পড়িল মিলন-পাশে আবদ্ধ স্বপ্নলোক-যাত্রী ছুটিব দিকে...কপূরী তখন বালিতেছিল,—তাই যাবো, তাই যাবো। প্রিয়, তোমার সঙ্গে...নিষেধের বিস্তী পাষণ প্রাচীর ভেঙ্গে প্রেমের কাকলী-ভরা কাব্য-রচা সেই অমর লোকে...

যথেষ্ট! অস্বস্তি বিস্মিত! তার হুঁ চোখের দৃষ্টি পলকহীন...

কিন্তু নাট্যকাব এমন দরদে এ situationটুকু বন্ধা কবিয়াছেন, দেখিয়া তাজ্জব বনিতে হয়! অস্বস্তি বাঘের মত ঝাঁপাইয়া তাদেব ঘাড়ে পড়িলেন না, পিস্তল ছুড়িলেন না, একটা কাগজের বাণ্ডুল ভূমে নিক্ষেপ করিলেন, মনোযোগ-আকর্ষণের স্তম্ভ। এমন স্তম্ভ স্বামীব ছবি বিখেন কোনো নাটকে দেখি নাই! দুজনে চমকিয়া অস্বস্তির পানে ফিরিয়া চাহিল। তিন জনের তিনজোড়া চোখের দৃষ্টি মিলিল—ভাবের একেবাবে ত্রিবেণী-সঙ্গম!

এমনটি আর কোনো যুগের কোনো নাট্য-সাহিত্যে দেখি নাই !

বাত্তর মালা সবাইয়া সবিয়া আসিয়া কপূৰ্বা কহিলেন,  
—তুমি !...ফিবে এলে ! !

অশোক কহিল,—আপনি...। মিটিংয়েব দেবী হবেন...!

অস্বস্তান্ত কহিলেন,—হাঁ, আমি...কাগজগুলো ভুলে ফেলে গেছলুম !...কিন্তু কপূৰ্বা, তুমি...

উত্তজ্জ্বিত স্বরে কপূৰ্বা কহিল—হ্যাঁ, আমি... ভালোবাসি, ভালোবাসি অশোককে...আমার প্রাণের জন...তুমি অনেক দিয়েচ, অনেক গহনা, কাপড়, ব্লাউজ... কিন্তু ভালোবাসা ? তা কখনো পাইনি...ভালোবাসার পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুক ! শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে...

অস্বস্তান্ত শুদ্ধ ! আর দর্শকমণ্ডলী ? চক্ষু তাঁদের ভাঁটার মত গোল ! বক নাটকের অভিনয় তাঁরা দেখিয়াছেন, এমন ব্যাপারে তাঁরা পিতৃলের গুলিই চলিতে দেখিয়াছেন—বিশেষ সেই ‘ভ্রমবের’ কমাট শীন... সেই গোবিন্দলালের চাতের পিতৃলের গুলিতে বোহিণী, ...তাঁরা তেমনি একটা কিছু কল্পনা কবিত্তেছেন, তাঁরা তো জানেন না, বাঙালি নাট্যগগনে নূতন ভাস্কর উদ্ভিত হইয়াছে,—বাঙালি আর্ট-মঞ্চে প্রতিভাধর শিল্পীর লেখা নাটক দেখিতেছেন...

অতএব অস্বস্তান্ত পিতৃলের সন্ধান কবিল না। নাটকের এই স্ককেটই প্রথম দৃশ্যে পিতৃল চলিলে সে যে ডিটেকটিভ ডামা হইবে ! তা তো আর্টের অন্তর্গত নয় !...

কপূৰ্বা কহিল,—আমার তরুণ মনকে উপেক্ষায় ছেঁচে একেবারে বাটা বাটনা ক'রে দিয়েচো...নিষে যাব তোমার এই গয়নার্গাটি...নিষে যাব তোমার শিল্পের শাড়ী, আলমারী-ভরা বেনাবসী...

অস্বস্তান্ত একটা সোফায় বসিয়া পড়িলেন, ডাকিলেন,  
—অশোক...

অশোক অপ্রতিভের মত একবার চাহিল, কহিল,—  
তরুণ মনের ক্রন্দিত ক্ষুধা...স্পন্দিত বাসনা—

কপূৰ্বা তাকে ধমক দিয়া কহিল,—খবরদার, কোনো কৈফিয়ত নয় ! অবোধ মুক্ত মন—সে নিষেধের বাঁধন মানবে না ! সে যা চাইবে, তাই তাকে দিতে হবে। না হ'লে নব-নারীত্ব মুর্ছিত মৃত হবে !

এক ভৃত্য আসিয়া কহিল,—একখানা টিটি ডাকঅলা দিয়ে গেল...

অস্বস্তান্ত চিঠি পড়িলেন, বেশ চীৎকার স্বরে...

“সে মাঝা গেছে। আমায় ছুটি ! মুক্তি মিলেছে বন্ধু... আমি শীঘ্র ফিরছি তোমার দ্বারে। দেখা হলে সব কথা বলবো...ইতি লালিমা।”

কপূৰ্বা কঠিন দৃষ্টিতে চাহিল অস্বস্তান্তর পানে। অশোকের স্থির ভাব—আর অস্বস্তান্ত চিঠি পড়িয়া অট্ট-হাসি-ববে নাট্যমঞ্চ মুখবিত কবিয়া তুলিল।

এইখানে প্রথম অঙ্ক শেষ।...

এই একটি দৃশ্য দর্শকের চক্ষে এমন গভীর ভাবের তরঙ্গ তুলিল যে, তাঁরা তুলিয়া গেলেন উঠিয়া বাহিরে গিয়া সিগারেট পান কেনার কথা, গল্প-গুজবের কথা... সকলে একেবারে নিশ্চল, নিৰ্জীব, নিস্তরু নিখর !... দর্শকের মনে এ সমস্যা ভারী পাথরের মত বসিয়া গিয়াছে। পান-চুকটওয়ালা তার নিত্যকাব পালা গাহিতে শুরু করিয়াছিল, একজন দর্শক নিঃশব্দে তার পিঠে মোটা লাঠীর ঘা বসাইতে সে চট্ করিয়া বাহিরে পলাইল। উপরেব মহিলা-আসনে ছোট শিশুটা অবদি স্তম্ভিত—ট্যা ট্যা চীৎকার তুলিতে আন্ধ সে ভুলিয়া গিয়াছে। বাঙলা নাট্যমঞ্চে তাবও আজ ছাতির প্রাণের সাড়া পাইয়া বিমুগ্ধ, বিমূঢ়।

তার পব আধ ঘণ্টা বাদে পট উঠিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক শুরু হইল। “একটি কক্ষ।” বলিচাবী নাট্যকাব ! কাব কক্ষ, কোথাকার গৃহের কক্ষ, প্রোগ্রামে তাব এতটুকু নির্দেশ নাই ! এমন রহস্যে আচ্ছন্ন কবা... এ কি কন শক্তিমানের কাছ !

সজ্জিত ঘর—আগাগোড়া প্রাচীন মোগল ষ্টাইলে সাজানো। যেন হাবেমের কক্ষ। মনে হইল, ষ্টেজ-মানেজার ভুল কবিল না কি ? কোনো ঐতিহাসিক নাটকের শীনগানা গোঁজাযিল দিয়া... কিন্তু পরক্ষণে বুঝিলাম, তা নয়, ঐ যে কক্ষের কোণে পিয়ানো, একটা গ্রামোফোনও...দুখ মঞ্চশিল্পী ! একটু ইঙ্গিতকি প্রতিভার পবিচয় দিয়াছ, যাব চোপ আছে, সেই বুঝিবে। যাব নাই, সে থপরের কাগজে বাঙালি অনর্জদেব লেখা নাট্যসমালোচনা পড়িয়া বুঝুক।

একটা খানশামা আসিয়া বলিল—মোগলাই হোটেলের সব মোগলাই কাণ্ড !

তার পর প্রবেশ কবিল এক দাসী—চন্দ্রশেখরের সেই বৃলসমের মত পোষাক তার গায়...দাসী আসিয়া খানশামাকে ডাকিল—বকাউল্লা...

খানশামা কহিল—কি বলচিস্ জুলেখা ?

দাসীর নাম জুলেখা। জুলেখা কহিল—একখানা গান গা না ভাই বকাউল্লা...

বকাউল্লা কহিল—তুই গা...

জুলেখা গান ধবিল,—রবি বাবুর গান।...একটু বিম্বিত হইলাম। বিম্বয় ভাঙ্গিল গান খামিলে বকাউল্লার কথায়। বকাউল্লা কহিল—ঐ বাঙালী বহুজীব কাছে তুই এ গান শিখেচিস না ?

জুলেখা কহিল—হাঁ।

এ ইঙ্গিতে বুঝা যায়, নাটকের দাস-দাসী কুলী-পাচক অবধি কালচারের স্পর্শ পাইয়াছে...তার পর কক্ষে প্রবেশ করিল কপূরা...তার পিছনে অশোক। দাস-দাসী বিদায় লইল। এখানে নাট্যকাব অনায়াসে আবু হোসেনের দাই-মণ্ডর বা আলিবাবার আবদালা-মজিনার মত ঐ দাস-দাসীর দ্বারা ডুয়েট গান গাওয়াইতে পারিতেন—তা গাওয়ান নাই। ইতা হইতে বুঝা যায়, তাঁর প্রতিভা গ্যালারিব দাখ জানে না...তাঁর মৌলিকতা অসাধারণ!

অশোক হাঁকিল—চা...বান্দা...

কপূরা হাঁকিল—আইস-ক্রীম—বান্দী...

তার পর কথাবার্তা...কোন চাদিনী যামিনীতে কাবেরীর ভীরে পাখীর গান ভাসিয়া উঠিয়াছিল, কাখীরে ঝাউয়ের বনে কবে কোন অপরাহ্নে বাতাসে মর্ষরধ্বনি জাগিয়াছিল, মনে আছে? হু'রনেই বলিল, মনে আছে। তার পর নর-নারীর মনের বহু সমস্তার কথা,...তার আলোচনা; সেই সঙ্গে সে আলোচনায় ঙ্গীওবার্গ, বার্গশ, ফ্রেড, দরিত্র-নারায়ণ, মৌন-সমস্যা, আব সত্ত্বপ্রকাশিত আঁতুড়ে-গন্ধ-গায় ক'খানা মাসিকের নাম অবধি—পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা একেবারে! মাসিক-পত্রের প্রবন্ধেও এমন গবেষণা দেখা যায় না!

তার পর অশোক কহিল—একখানা গান গাও কপূর...

কপূরা কহিল—শোনো, গানের সুরে বাঙলার নারীর মর্ষ-বেদনাব ককণ কাহিনী...

কপূরা গান ধরিল—

ছিল এক নাবী, ওগো, তরুণ নারী।

আত্ম সে ছুঃখিনী গো, খুব ব্যাচানী।

স্বামী তার ব্যাড়া বড়, আপিস বেতো;

ফিরে ফের সন্ধ্যাবেলায় তামুক খেতো।

দুপুরে বাতায়নে, নাবীর হাঙ্গ দু'নয়নে ঝরতো বারি।  
গলির ঐ ওপাশে এক মেসের বাসে তরুণ কবি—

কলেজে পড়ে বি-এ, নয়ন দিয়ে দেখতো সে এ করুণ ছবি!

কবে হাঙ্গ চোখ-ইসারায় বেদনে বুক ছললো তারি।

পরে এক ঝড়ের দিনে বিকেল বেলা

এলো এক ট্যান্ডি—যেন স্বপন-ভেলা!

দুজনে চড়ে তাতে চললো দূরে সুরের পুরে—

অতীতের প্রণয়-ডোরে হিরা বাঁধা, শুক ও সারী!

কুলহারা আজ কুল পেলে! জয় গাও তে তারি।

অশোক কহিল—খাশা গান...বাঃ! এ গান পথে সুরের তাজাম চড়ে ঘুরে বেড়াবে...বাঙলার মুক মৌন নারীও এ সুরের সাড়ায় ভাষা পেয়ে ভেসে উঠুক...

সহসা সেই বকাউল্লা খানশামা এক চিঠি আনিয়া অশোকের হাতে দিল। অশোক খাম ছিড়িয়া চিঠি পড়িল, পড়িয়া ক্রুদ্ধিত করিয়া কহিল—এ কি!

কপূরা কহিল—কার চিঠি?

অশোক কহিল,—মা'র...

কপূরা কহিল—তোমার মা? আমাদের কথা তিনি জানেন?

অশোক কহিল,—না।

কপূরা কহিল—তবে আমাদের ঠিকানা পেলেন কি করে?

অশোক। জানি না! তাই আশ্চর্য হচ্ছি। আমাদের এ অজ্ঞাত-বাস...ঠিকানা কাকেও বলিনি, পাছে কোনো বিপদ ঘটে...

এই অবধি বলিয়া অশোক পায়চারি করিতে লাগিল, তাব মুখে স্বগত উক্তি,—এখন কি করা যায়? কি করি আমি?

এই জায়গায় এই দুটি মাত্র প্রশ্ন...মনের মধ্যে এই যে আকুল চিন্তা—এ প্রশ্নে মনে পড়ে হ্যামলেটের সেই ছত্র To be or not to be...বাঙলা নাটকে এই প্রথম হ্যামলেটের ঐ ছত্রের সঙ্গে পার্শ্ব দিবাব মত অমব ছত্রের দেখা পাইলাম। দ্বন্দ্ব নাট্যকার!

কপূরার চোখে-মুখে দ্বিধা-সংশয়-ভয় প্রভৃতি নানা বৃত্তির ছায়াপাত ঘটিতে লাগিল...কপূরা ডাকিল,—প্রিয়তম...

অশোক। ডাকচো?

কপূরা। ইয়া...একটি মাত্র উপায় শুধু আছে!

অশোক। মা'র কাছে অকপটে সব কথা প্রকাশ করে বলবো...কি গভীর আমাদের ভালোবাসা...কি অসীম অগাধ আমাদের প্রেম?...

কপূরা। বলো, সব কথা তাঁকে খুলে বলো। কোন লজ্জা নাই এতে। ভালোবাসায় লজ্জা কি, বন্ধু? আমার স্বদয়-পাত্র তাঁর সামনে উন্মুক্ত করে দেখাবো, আমি কত ভালোবাসতে জানি। তিনি বিচার করবেন...

অশোক একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ শিহরিয়া উঠিল, শিহরিয়া জবাব দিল—না, না। আমি পারবো না, পারবো না, স্বামী। মা বুঝবে না...মাগুলো চিরদিন ভীক, বুঝলে। শুনবে এ চিঠি?

কপূরা। পড়ো...

অশোক। শোনো...(পত্র-পাঠ)

“অশোক, আজ আমার ছুটি মিলেচে। আমার পায়ের শৃঙ্খল টুটেছে! আমার কাছ থেকে দূরে দূরে আর তোমায় থাকতে হবে না। যাকে তুমি তোমার পিতা বলে ডাকতে, আমাদের সে মহাশত্রু আজ ইহ-জগতে নাই। আশা করি, তোমার মনটি তেমনি

অমলিন আছে! শীঘ্র দেখা হবে। অনেক খবর নিয়ে আমি যাচ্ছি...বসন্তের পুলক-ভরা খবর। ঠাণ্ড তোমার মা।"

কপূর। এ 'চঠির' মানে কি অশোক? ঐ কথা... যাকে তুমি...?

অশোক। চূপ, চূপ, চূপ করো নারী...

অশোক একেবারে লাফাইয়া উঠিল। তার পর তিনি হাত দু'বে ছিট্কাইয়া গিয়া কহিল,—জানি না, আমি কিছু জানি না। কিছু জানতে চাই না। যে গেছে... এটুকুই যথেষ্ট। 'তার' বেসী আর কিছু জানতে চাই না... কিন্তু...মা যে এতনি এসে পড়বে! আমি, আমি...

কপূর। আমার স্বামী তোমার মাকে জানতেন।

অশোক। জানি না, ছনিয়ার কোনো খবরে আমার লোভ ছিল না...

কপূর। তুমি আমাদের কথা তোমার মাকে বলবে না?

অশোক। না, না পারবো না। আমার কোথায় যেন বাধে, কপূর...আমায় একটু ভাববার সময় দাও...

কপূর। তা হলে আর কোথাও যাও। এখানে ভাববার অবসর মিলবে না...এর মধ্যে তিনি যদি এসে পড়েন?

অশোক। কি করবো? কি করবো? কোথায় যাবো তবে?

কপূর। সতর্ক দাঁকনে মস্ত মাঠ আছে...মুক্ত আকাশের তলে মুক্ত বাতাসে ছাড়িয়ে দিয়ে তোমার মন...তার পর...

অশোক। ঠিক, ঠিক, ঠিক বলেচো। আমি আর দেবো করবো না...

কপূর। দাঁড়াও। বেয়াসা, এবাটো ট্যান্ড্রি জলদি বাসাও...

তাড়াতাড়ি কপূর একটা থান্ড্রিফ্রাফ, টিফিন-কারিয়ার আনিয়া দিল, কহিল—এও চা, আর এর মধ্যে কিছু কুচী চোষ্ট, আলু সেন্ড, আর কাটলেট আছে...

অশোক। প্রিয়তমে, এই ক্ষুধা গুণেই আমার কিনে বেখেচো তুমি...

অশোক চট্ কবয়া টিফিন-কারিয়ার ও ফ্রাঙ্ক লইয়া বিনয় ওহল...

কপূর ডাকিল—বান্দী...

সেই বান্দীর প্রবেশ। জুলেখা। কপূর কহিল—ঐগুঁগির আমার ছোট বেতের ব্যাগটা এনে দে...

বান্দী। বহু-বিবি চলে যাচ্ছেন?

কপূর। হাঁ, হাঁ, এখনি—এই দণ্ডে। না হলে আমার বাবার পথ চিহ্নদানের মত বন্ধ হয়ে যাবে...

বান্দী। থানা?

কপূর। না না...

বান্দী। চা...?

কপূর। না, না,—কিছু না। জসদি একটা একা...ঐ ঘর খালি একা। ডাক...এখনি যাবো। আমার বেতের ব্যাগ...? এই যে।

ঝড়ের বেগে কপূরও প্রস্থান করিল।

এইখানে কি গতির বেগ। নাটকের action চলিয়াছে যেন ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে...একেই বলে নাটকের গতি!

কপূর প্রস্থান করিবামাত্র ভিন্ন দ্বার পথে আসিয়া দেখা দিল, লালিমা—অশোকের মা।

সক পাড় ধুতি পরা...যুখে বিষাদের ভাব। কুঞ্চিত কেশে ছোট ছোট চোঁড়...স্বন্দর স্ত্রী...

লালিমা আসিয়া প্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিল, তার পর চারিদিকে চাহিল, মুহূ-স্বরে ডাকিল—অশোক...

বান্দী জুলেখার পুনঃ-প্রবেশ। লালিমা কহিল—আশোকের ঘর এ...আমার ছেলে অশোক? স্নেহভরা নীড়ভাষা অশোক?

বান্দী কহিল—জী।

লালিমা। অশোক কোথায়?

বান্দী। চলে গেছেন একটু আগে ট্যান্ড্রিতে...

লালিমা চারিদিকে আবার চাহিল, একটা নিশ্বাস ফেলিল, পরে সহসা তার নজর পাড়ল একটা চেয়ারে পরিত্যক্ত একখানা শাড়ীর পানে...উঠিয়া সেটা হাতে লইয়া বান্দীর পানে চাহিল, লালিমা কহিল—এ শাড়ী কার?

এই ছোট ব্যাপারে নাট্যকার কি কৌশল আর শক্তি যে প্রকাশ করিয়াছেন!...

বান্দী কহিল—এ শাড়ী বহু-বিবির...

লালিমা কহিল—বহু-বিবি?

বান্দী কহিল—হাঁ, তিনিও এই মাত্র একা চড়ে চলে গেছেন...

লালিমা কহিল—চলে গেছে...? একটু বিলম্ব নইলো না?...? (একটি দীর্ঘ নিশ্বাস)

দ্বার ঠেলিয়া গুলিয়া তদগ্বে ঘরে ঢুকিলেন অস্বস্তি। তাঁহার হাতে একটা বড় হাত-ব্যাগ...চাহনি উদাস... [এই দৃশ্যে দুই কবিতা সকলকে জড়ো করায় কি unity of action ফুটিয়াছে। এইটাই তো নাটকের আর্ট!]

লালিমা যেন সাপ দেখিয়াছে এমন ভাবে লাফাইয়া উঠিল, কহিল—তু-তু-তুমি—কোন স্মৃতির অতল কূপ থেকে উঠে এলে সহসা...আমার অতীতের শত-স্বপন-জড়িত স্মৃতির ছবি গো!

—একটু দেরী হয়ে গেছে। বলিয়া অস্বস্তি হতাশভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

লালিমা অস্বস্তির কাছে আসিয়া তার হাত নিছের হাতে তুলিয়া লইল। কহিল,—দেবী হয়ে গেছে—সত্যই দেবী বন্ধু?...

অস্বস্তি হাসিয়া কহিল,—তা নয়, তা নয়, তবে তোমার কিছু পরিবর্তন হয়নি তো...হাতের স্পর্শে সেই উত্তাপ...আজ্ঞা আমার শিরায়-শিরায় সেই কোকিলের কুজন ছুটিয়ে দিয়ে গেল। লালিমা...

লালিমা কহিল,—অয়স...

অস্বস্তি। এ দীর্ঘকাল তোমার মুখ ধ্যান করিচি।

লালিমা। আর আমি? আঙনে পলে পলে দগ্ধ হয়েছি...দুর্কৃত স্বামী, জানোয়ার, এ দেহ তার গ্রাসে তুলে দিলেও মন...এ মন, ওগো বন্ধু, তোমারি পরশ-কল্পনায় বিভোর ছিল, তগ্নয় ছিল...

লালিমা ও অস্বস্তি হুজনে চক্ষু মুদিল।...কি সুগভীর আবেশ!

তার পর লালিমা ডাকিল—অয়স, কালো মেঘ কেটে গেছে—আলো ফুটেচে। সে আলো বৃকে ধরে তোমার কাছে এসেচি। আজ আমার পাশে দাঁড়াও—হে আমার এক, হে আমার প্রব...

অস্বস্তি কহিল—হু...

লালিমা কহিল—অশোক? তোমার অশোক? বেচারী, অসহায়, একা...

অস্বস্তি কহিল—না, না, সে আজ একা নয়, একা নয়...

লালিমা কহিল—জানি। কিন্তু তুমি তাকে রক্ষা করো। তার হৃদয়ে উষ্ণ হয়েচে এক নারী—ঐ তার শাড়ী...অশোককে রক্ষা করো সে-নারীর গ্রাস থেকে। সে আমার ছেলে, কোনো দিন ছেলে বলে তার স্পর্শ বৃকে অহুভব করতে পাই নি। এই নারীকে দূর করে দাও। ছেলেকে একবার পেতে দাও। ছেলে সব ছেড়ে আমার পাক আজ—

এ কথাই মাতৃদেব বিকাশ চমৎকার!

হঠাৎ কপূরা আসিল, আসিয়া অস্বস্তির পানে চাহিল, চাহিয়া কহিল,—ঠিক, ঠিক, ঠিক! তাই হবে। মস্ত পাপ করেচি আমি। প্রকাণ্ড অজ্ঞার! তার প্রতিকার করতে চাই। বত বড় কঠিন প্রায়শ্চিত্ত হোক, তবু তা করবো। তোমার প্রতি অজ্ঞার, এই নারীর প্রতি অজ্ঞার, হুনিয়ার প্রতি অজ্ঞার—আমি অবিখ্যাসী, আমি প্রলয়ঙ্করী, আমি...কপূরা পাগলের মত অট্টহাসি তুলিল। তার পর কহিল—এইটুকু তার হাতে দিয়ো, এই চিঠিটুকু... আমি চলে গেলে...আমার সামনে দিয়ো না। শুধু এ-টুকু...এ আমার শেষ অনুরোধ। একদিন এ বাহু যদি পুষ্পমালার পরশ দিবে তোমার অন্তর অমৃত-সিক্ত করে থাকে, সেই অমৃত-স্মৃতির অনুরোধে...

চিঠিখানা অস্বস্তির হাতে দিয়া চোখে আঁচল চাপিয়া কপূরা চলিয়া গেল।

লালিমা কহিল,—কে এ নারী। কি ও বলে গেল? বলো, বলো, আমার বৃক কাঁপছে...অসহ্য যাতনা... বন্ধু...

অস্বস্তি কহিল,—হাঁ বলবো, বলবো, তোমায় বলবো সখী। এ নিয়তি। কে তাকে বোধ করবে? হৃদয় পূর্বে আমি বিবাহ করেছিলুম।

লালিমা। এই নারী...

অস্বস্তি। আমার স্ত্রী ছিল। আজ নেই। আজ তুমি আবার ফিরে এসেচো! এক গেল, আর এক এলো—ওঃ, ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি আছো! আমি তোমার মানি, আজ মানি।

লালিমার অবশদ্ব দেহ সোফার ঢুঁলিয়া পড়িল। অস্বস্তি যেন কাঠের পুতুল...নিষ্কম্প, স্থির, অবিচল!

এমন সময় অশোকের প্রবেশ।

অশোক কহিল—কপূরা, প্রিয়তম...তার পর চাহিয়া দেখে, সামনে অস্বস্তি, আর ঐ লালিমা, তার মা...!

অশোক চমকিয়া উঠিল,—ডাকিল—তুমি মা...মা... আর তুমি প্রতাপশালী জমীদার অস্বস্তি। কিন্তু সে কোথায় বেচারী অভাগিনী প্রেম-শিয়ারিনী?...বলো, বলো...

অস্বস্তি কহিল,—এই চিঠি দে দিয়ে গেছে...

ক্ষিপ্ৰ হস্তে চিঠিখানা কাড়িয়া অশোক পড়িল। উচ্চ রবেই পড়িল (নহিলে অপরে জানিবে কি করিয়া?)

অশোক কহিল—শোনো, তোমারও শোনো, সে কি লিখেচে...(পত্র পাঠ)

“অশোক প্রিয়তম—আমার বিদায় দাও। আমি মরিতে চলিলাম। এ পৃথিবী বড় অকরণ, প্রেমে এখানে অনলের দাহ, সুখ এখানে মরীচিকা! আমার সেই কাশি...ডাক্তার বলিয়াছে...যন্ত্রা। মাঝে মাঝে মনে করিয়া চোখের জল ফেলিয়া, একান্তে, নীরবে। আমার পাখী-টাকে উড়াইয়া দিয়ো...বেচারী খাঁচার পাখী! মুক্তির আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করো না! বিদায় প্রিয়তম—তোমার হুনিরী কপূরা...”

অশোক। শুনলে! শুনলে এ চিঠি! বাজও এমন নির্দয় রোলে বাজে না। বুকেচি, এ চক্রান্ত! হাহ, হাহ, হাহ, হাহ! শয়তানী, এ তোর কাজ! কেন তাকে মরণের পথে তাড়িয়ে দিয়েছিস? কেন এ তরুণ বয়সে তাকে মরণ-পথের যাত্রী করলি, শয়তান? সে আমার। তুই বিয়ে করেছিলি তাকে...তাতে বয়ে গেছে। তোর মত গুজো-কাঠ মড়ার অস্ত্র সে মঞ্জু-লতার সৃষ্টি হয় নি। তুই তাকে বিয়ে করে হত্যা করেচিস...শয়তান.

আমি তাকে ভালোবেসে প্রাণ দিতে চেয়েছিলুম !  
শরতান...

ফশ্ করিয়া একথানা ছোরা বাহির করিয়া অশোক  
হাসিয়া উঠিল। ভয়ে অস্বস্তির মুখ এতটুকু। লালিমা  
ছুটিয়া আসিয়া অশোকের হাত চাপিয়া ধরিল...কহিল—  
অশোক, কি করতে চাও তুমি ?

অশোক। খুন ! ঐ বৃদ্ধ পণ্ডকে। ঐ শরতানকে...

লালিমা। চূপ, চূপ, অমন কথা বলিস নে। আকাশ  
ফেটে চৌচির হয়ে যাবে—ছুনিয়া ধসে পাতালে সেঁধুবে !  
আমার কথা শোন...

অশোক। শুনবো না। কে তুমি ?

লালিমা। আমি তোর মা...

অশোক। কিসের মা !...এ প্রেম। হৃদয়ের অবাধ  
মুক্ত প্রেম...প্রেমের এ গঙ্গা—মা-ঐরাবত হলেও এর  
তোড়ে ভেসে যায়। সারা তুমি। আমার হৃদয়গিরি  
আলা নিবোতে দাও নারী। ওই শরতানের রক্ত-  
ধারায়...

লালিমা। না, না। তা হবে না। হতে দেবো না  
আমি...

অশোক। কেন হবে না ? কেন দেবে না ?

লালিমা। তবে শোন...যে কথা চিরদিন গোপনে  
হৃদয়-তলে চাপা থাকবে ভেবেছিলুম, সে কথা তবে  
প্রকাশ করি...এই প্রকাশ্য জন-সভায়...কাল দৈনিকে-  
সাপ্তাহিকে সে কথা ছাপা হয়ে যাক...

অশোক। কি কথা ?

লালিমা। ইনি তোর জন্মদাতা পিতা...কৈশোরে  
এঁরই প্রেমের সাধনার একে পরিচর্যা করে তোকে  
পেয়েছি আমি...ও...

লালিমা হৃম্ করিয়া পড়িয়া মুচ্ছিতা হইল।  
অস্বস্তি ঘেন দাঁড়-করানো কাঠ ! আর অশোক হাতের  
ছোরা ফেলিয়া লালিমার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া  
মা, মা, মা, মা, মা বলিয়া আর্ত রবে কাদিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক এইখানে শেষ। তার পর তৃতীয় অঙ্ক।

অস্বস্তি সেই বর। অস্বস্তি মোটা খাতা লইয়া  
কি সব হিসাব দেখিতেছে। লালিমা ব্রহ্মচারিণী বেশে  
আসিয়া প্রবেশ করিল। লালিমা কহিল—কি করচো ?

অস্বস্তি কহিল—তরুণ সমিতির আর-ব্যয়ের হিসাব  
দেখি। বার্ষিক অধিবেশন সামনে। তাই...

লালিমা। এত খাটলে মারা যাবে যে। নাইতে  
খেতে হবে তো...

অস্বস্তি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—আব তুমি ?  
তোমার নিজের পানে চেয়ে দেখেচা ?

লালিমা। আমি যে নারী...

অস্বস্তি। এখনও অভিমান !...লালি...

লালিমা। আর অমন করে ডেকো না...আমার সব  
এখন কালি হয়ে গেছে...লালিমা মরেচে। যাকে  
দেখচো, সে কালিমা ! এখন ওঠো, নাইবে, খাবে চলো।

অস্বস্তি। নাইবো খাবো—যদি একটা কথা রাখো।

লালিমা। কি কথা ?

অস্বস্তি। আমার পাশে পাশে থাকবে চিরদিন ?  
আর ছেড়ে যাবে না ?

লালিমা। এখনো এ আশা ?

অস্বস্তি। ছাড়তে পারি না ! বিয়ে করেছিলুম—  
তাকে রাখতে পারিনি...বিয়ে না করে থাকে পেয়েছিলুম,  
তাকেও ছাড়বো ? তবে এ ছুনিয়ার বাঁচা কিসের জন্ত  
লালিমা ? প্রাণের যা সাধ...

লালিমা। ছেড়ে দাও ও-কথা। এদের কোনো  
খপর পেলে ?

অস্বস্তি। অশোক ঢাকায় আছে। সেখান থেকে  
মাসিক পত্র বার করচে। আমি এক হাজার গ্রাহক করে  
দিয়েছি, বার্ষিক মূল্য গাঁট থেকে দিয়ে।

লালিমা। আর কপূরা ?

অস্বস্তি। সন্ধান পেয়েছি, বোম্বায়ে এক ফিল্ম  
কোম্পানীতে ঢুকেচে। তাদের কোম্পানীতে আমি বিশ  
হাজার টাকার শেয়ার কিনেছি। সে তা জানে না।  
এতেও প্রায়শ্চিত্ত হবে না ?

লালিমা। হে...তবু সেই দীর্ঘশ্বাসের সাগর তাদের  
মধ্যে...

অস্বস্তি। উপায় নেই। বেচারা অশোক তার  
খপর পায় নি। তা ছাড়া...

লালিমা। তা ছাড়া কি ?

অস্বস্তি। ঢাকায় সে প্রেম-চর্চার সুযোগ পেয়েচে।

লালিমা। কপূরা ?

অস্বস্তি। এক ভাটিয়া তার সহায়...

লালিমা। আমার কাজ তবে শেষ। আমার এবার  
বিদায় দাও, বন্ধু।

অস্বস্তি। কোথায় যাবে ?

লালিমা। জাপান।

অস্বস্তি। জাপান ?

লালিমা। হৃদয়ে যে আগ্নেয়গিরির আগুন—এত  
আগ্নেয়গিরি জাপান ছাড়া আর কোথাও নেই ! এই  
আগুনে আগুন লাগাবো আমি।

অস্বস্তি। আর আমি ?...

লালিমা। আমার আবার সেই বিয়ের-আগেকার  
সেই লালিমা ভাবতে পারো ? দেহের কথা ভুলে যেয়ো  
...চোখ বুজে ভেবো, আমি ! সেই মন, শুধু মন...

অস্বস্তি। আমার যদি তুমি তেমন দেখতে পারো...

লালিমা। জীবনটা কিছুই দেখা হলো না।  
আব একবার দেখবো তবে? ...কিন্তু না, আমরা যেতেই  
হবে। এমন একটা কিছু করবো, যাতে...থাক সে কথা  
—বন্ধু...

অস্বস্তান্ত। লালিমা...

লালিমা। বিদায় দাও—এক-একবার শুধু মনে  
করো আমরা...এক দুর্ভাগিনী নারী...কি যাতনা সয়ে  
ছিল—দেহ একজনকে দিয়ে, মন আর-একজনকে কাছে  
বন্ধক রেখে...

অস্বস্তান্ত। কিন্তু আমি তোমায় যেতে দেবো না।  
নারীর কাজ সেবা। আমি একা, আমরা দেখবার মত  
নারীর মহত্তর ব্রত আর কি আছে এ দুনিয়ায়,  
লালিমা...?

অস্বস্তান্ত লালিমার হাত ধরিল; লালিমা অস্বস্তান্তর  
বুকে মুখ রাখিল। তার পর কহিল—নাগী চিবদিন  
দুর্ভাগিনী...

অস্বস্তান্ত ডাকিল—লালিমা...

এময় সময় দ্রুত প্রবেশ কর্পূরা। কর্পূরা কহিল—  
আমি এসেছি...

অস্বস্তান্ত। কর্পূরা...

কর্পূরা। হ্যাঁ, আমি ফিল্ম তোলায় পব ছুটি  
পেয়েছি।

লালিমা। তোমার যন্ত্রা?

কর্পূরা। সেয়ে গেছে। বলো, বলো! কোথায়  
আছে অশোক? বলো...

অস্বস্তান্ত। ঢাকার।

কর্পূরা। তা'হলে আসি (টাইম-টেবল দেখিল)।  
ইস, আর পনেরো মিনিট পরে ঢাকা মেল ছাড়বে...

অস্বস্তান্ত। এই নাও টাকা...ট্রেনের ভাড়া...

কর্পূরা বেগে গ্রন্থান করিল। তখন অস্বস্তান্ত ডাকিল,  
—লালিমা...

লালিমা। অস...লালিমার চোখে জল।

অস্বস্তান্ত। প্রেম অমব—প্রেমে দুনিয়া ভ'রে উঠুক।  
এমনি মুক্ত, অবাধ প্রেম! বাঙালীর প্রাণ বন্ধেরে নয়,  
ভদ্রেরে নয়...বাঙালীর প্রাণ প্রেমের!

দুজনে দুজনের হাত চাপিয়া ধরিল গভীর আবেগে।  
এবং এইখানে নাটকের স্বনিকা-পাত।

অভিনয় শেষ হইলে বাসে আসিয়া চড়িলাম। বাসে  
থিয়েটার-ফেরতের দল গুটীকু লইয়া বেশ বাদাম্বাদ  
জুড়িয়া দিয়াছে। এক দল বলিল,—শ্রদ্ধ ঠকিয়েছে।  
হাণ্ডবিলে লিখেছে, বাঙালীর জাতীয় নাটক! এই কি  
বাঙালীর ঘরের ঘটনা? কোনো খার্ড-ক্লাশ বিদেশী  
নাটক ছাঁকা বাঙলা হরকে তর্জম করি ঠেকি চড়িয়েছে।  
বিদেশী কেউ এসে যদি এ নাটক দেখে বলে, এই কি  
বাঙালীর পরিচয়? যেমন abnormal creatures,  
তেমনি abnormal ঘটনা। হি!

রাগে আমার বস্ত্র টগবগ করিয়া উঠিল, কহিলাম,  
—মুর্থতার চরম। বাঙালীর ঘরের ঘটনা চাই নাটকে?  
বটে! বাঙালীর ঘরের ঘটনা কি আছে? সকালে  
নাওয়া-খাওয়া, আপিস যাওয়া, ছেলে-ঠাণ্ডানি, স্ত্রীকে  
গালি ও প্রহার, নয় স্ত্রীমুখের ভৎসনা-ভোগ! যেমন  
শাক-পাতা খায় বাঙালী—বৈচিত্র্যহীন ভোজ, তেমনি  
তার জীবনও বৈচিত্র্যহীন! তাতে নাটক লেখা চলে  
না! সমস্তা—জানেন মশায়, সমস্তা চাই! সমস্তা না  
হ'লে নাটক হয় না।

সে লোকটি বেশ ঝাঁজালো স্বরে কহিল,—এ সমস্তার  
স্বপ্নও বাঙালী দেখে না! যে সমস্তা নেই...

তার মুখের কথা লুফিয়া আমি কহিলাম—সে সমস্তা  
গ'ড়ে নিতে হবে। প্রতিভা তবে কি!...আপনাদের  
জন্মই বাঙালীর নাটক গড়ে উঠতে না! বোঝেন না,  
নাটকের নাটকত্ব কি চীজ?...

দু-চারিজন লোক সম্মুখে বলিল—আজ্ঞে, কি করে  
বুঝবো বলুন! পরসী খরচ কবে থিয়েটার দেখতে  
আসি। আপনার মত ফ্রী-পাশের কারাবাব নয়  
তো! ফ্রী-পাশ পেলে নাটক বোঝবার সামর্থ্য  
ঘটতো!

এ কথাবার পর কথা কহিতে গেলে ফল সাংঘাতিক  
হইতে পারে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। মন কিন্তু  
বিদ্রোহে তাতিয়া রহিল...

# মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

ভ্রমণ )

শ্রীমৌরীন্দ্রমোহন যুথোপাধ্যায়

## মোটরে কাশ্মীর-যাত্রা

রাওয়ালপিণ্ডি পৌঁছে আমাদের আগের কাজ হলো, গাড়ী ছাণি এন্, ডি, বাধাক্ষিপণ কোম্পানির ওয়ার্কশপে দেওয়া! কোথাও কোনো জুঁ আলুগা, বা কলকজা কোথাও টিলা হলো কি না, দেখে ঠিকঠাক করা আর ত্রেকে কোনো খুঁৎ না থাকে—এই সব পরখ করানো। কারণ, এবার শুদীর্ঘ পাহাড়-পথে পাড়ি! পাহাড়ের বাঁক, গোড়েন পথ,—ত্রেক যদি একটু বিগড়ায়, তাহলে গাড়ীও স্কলের প্রাণ নিয়ে টানাটানি ঘটতে পারে। কাজেই এখান থেকে শ্রীনগর-যাত্রী স্কলের গাড়ীর অঙ্গরাগ-পর্যবেক্ষণ একটা প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। সজ্জা কাচিয়ে নেবার জন্ত রজক ডাকিয়ে তার কাছে সব কাপড়-চোপড় পাঠানো হলো। এখান থেকে ছেলেরা আমাদের সহযাত্রী হবে—তাদের সঙ্গে মোট-ঘাট আছে বিস্তর। বড় ট্রাক প্রভৃতি অনেক জম্লে। অথচ গাড়ী যথাসম্ভব হালকা রাখা সঙ্গত আর নিরাপদ! কাজেই একখানি পৃথক গাড়ী ভাড়া করা হলো এন্, ডি, বাধাক্ষিপণ কোম্পানির কাছে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর অবধি সে গাড়ীর ভাড়া পড়লো ৯০ নক্কাই টাকা। স্থিৰ হলো, নেহাৎ প্রয়োজনীয় আসবাব ছাড়া, বিছানা-পত্র বাসন-কোসন প্রভৃতির মোট সেই ভাড়া-গাড়ীতে যাবে। ছেলেরা সঙ্গে একটি পাচক ব্রাহ্মণও ট্রেনে এসেছিল—সে আর আমাদের সাথে নেপালী বয়,—এরা দুজনে এই মোটঘাটের সঙ্গে সেই গাড়ীতে যাবে। গোটা-চারেক ভারী ট্রাক নিয়ে শেষে সমস্তা বাধলো! বাধাক্ষিপণ কোম্পানির ভারবাহী প্রকাণ্ড লরি ভোরে শ্রীনগর যাত্রা করছিল—ভারী ট্রাক কটা সেই লরিতে

চাপানো হবে, স্থিৰ হলো। এ-সবের মীমাংসা সেরে সারাদিনটা গোছগাছ করতে কেটে গেল। বাধাক্ষিপণ কোম্পানির অংশীদার এম্, কে, শেঠী মহাশয় আমাদের সুখ-স্বাস্থ্যের দিকে এমন মনোযোগী হলেন যে তাঁর খাতিরের ঘটায় আমরা অপ্রতিভ হয়ে পড়ছিলাম! কিন্তু তিনি নাছোড়বন্দা... আমাদের কোনো প্রতিবাদে জ্ঞেপ করলেন না। শেঠী-সাহেব পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ—তাঁর ভদ্রতা, তাঁর আতিথেয়তা অপূৰ্ণ!

বৈকালে তিনি বললেন,—চলুন রাত্রে কিং-কার্ণিভালে। আমরা বললাম, এই দীর্ঘ পাড়ির পর রাত্রি জাগা ঠিক হবে না। আবার সামনে এই দীর্ঘ পাড়ি পড়ে আছে। তখন তিনি ছাড়ান দেন।

তাঁর কাছে শুনলুম, রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৫ মাইল উত্তরে অর্থাৎ মোটরে তিন-চার ঘণ্টার পথে তক্ষশিলা... দেখবো না? এই তক্ষশিলা ছিল সূর্য্যবংশীয় ভারতের পুত্র তক্ষের রাজধানী। জয়েজয় রাজার সর্পযজ্ঞও এইখানে হয়েছিল। তাছাড়া ঐতিহাসিক যুগের বহু প্রাচীন শিলালিপি, ইমারতের ধ্বংস-স্তুপ আবিষ্কৃত হয়েছে! দেখার লোভ প্রবল হলো আমরা বললাম, আমাদের লক্ষ্য এখন শ্রীনগর, সেখানে যেতে পথের উপর যা-কিছু দেখবার থাকবে, দেখে যাবো। আপাততঃ অচল পথে কোনো কিছু দেখবার থাকলেও দায়ে পড়ে সে লোভ সম্বরণ করতে হবে। ফেরবার মুখে তক্ষশিলা, পেশোয়ার প্রভৃতি দেখে যাবার বাসনা আছে।

পেশোয়ার হিন্দু আমলের পুরুষপুর। সবজাগিন রাজা জয়পালকে পরাস্ত করেন এইখানে। তাঁর কিছু



ঘুরে সিঁদুরের ওপারে গুনলুম, প্রাচীন গাঙ্গার রাজ্য।  
মনটা চন্মন্ করে উঠলো! ভারতের একেবারে সীমান্তে  
এসে পড়েছি! প্রাচীন গৌরবের লীলাভূমিগুলি এত  
কাছে, হাতেব নাগালে বললেই চলে! এই পঞ্জাব হলো  
মহাভারতের লীলাক্ষেত্র! মহাভারতের মন্ত্র, শিবিরাজ্য,  
রামায়ণের কেকয়—সব এই পঞ্জাবে। শতদ্রু আর  
বিপাশা (বিয়াস) নদীর উত্তরে অবস্থিত ভূখণ্ড ছিল  
কেকয় রাজ্য। রাজগির কেকয় রাজ্যের রাজধানী।  
রাজগির এখনো বর্তমান আছে;—প্রাচীন সমৃদ্ধি  
কঙ্কালের মত। চন্দ্রভাগা (চেনাব) আর ইরাবতীর  
(রাভী) মধ্যবর্তী প্রদেশ ছিল সেকালের ময় দেশ; আর  
বিতস্তার (ঝিলাম) তীরবর্তী প্রদেশ ছিল শিবিরাজ্য।

সন্ধ্যাব পূর্বক্কে মোটেবে চড়ে বাওয়ালপিণ্ডি দর্শনে  
বেরিয়ে পড়া গেল। শ্রেষ্ঠ মহাশয় পথের সাথী হলেন;  
ওখানকার নানা জায়গা দেখিয়ে দিলেন। রঘুনাথজীর  
মন্দির; বিখ্যাত টোপি পার্ক—মাছুয়ের হাতে গড়া নয়  
—প্রকৃতির বৃকে আপনি জেগে উঠেছে তার অপূর্ব  
শোভা আর ঐশ্বর্য নিয়ে! ‘টোপি’ কথাটি কোথা থেকে  
এলো? কেউ কেউ বলেন, ‘টোপি’ স্তূপের অপভ্রংশ।  
হতে পারে, কারণ, পার্কটি বেশ উচ্চ ভূখণ্ডের উপর  
অবস্থিত।

বাওয়ালপিণ্ডি খুব প্রাচীন সতর নয়; তবে গন্ত  
ক্যাটনমেন্ট। সিটি আব ক্যাটনমেন্টের মাঝে ছোট  
একটি নদীর ব্যবধান—নদীটির নাম লেহ। প্রাচীন হিন্দু  
নগর গজীপুর বা গাজনৌপুরের উপর এই ক্যাটনমেন্টের  
স্থিতি। গজীপুর ছিল ভট্ট-রাজাদের রাজধানী। মোগল-  
আমলে বাওয়ালপিণ্ডির নাম ছিল ফতেপুর বাওরী। পরে  
ঘক্ব-সর্দার ঝাণ্ডা খাঁ বাওয়ালপিণ্ডির পতন করেন। এই  
বাওয়ালপিণ্ডিতে কাবুলের নির্বাসিত আমীর শাহ সুজা  
তার ভাই শাহ-জামানের সঙ্গে এসে আশ্রয় নেন। ১৮৪৩  
খৃষ্টাব্দে শিব সর্দার ছত্তর সিং ও শের সিং গুজরাট-যুদ্ধের  
পূর্বে ব্রিটিশের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। সীমান্ত-রক্ষা-  
কল্পে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বাওয়ালপিণ্ডিকে প্রকাণ্ড  
মিলিটারী ক্যাটনমেন্টে পরিণত করেছেন।

বাওয়ালপিণ্ডি থেকে ন’ মাইল দূরে মঙ্গল পাশ।  
এইখানে ব্রিটিশ সৈন্যধ্যক্ষ জেনারেল জুন-নিকলসনের  
স্মৃতি-রক্ষাকল্পে একটি স্তম্ভ ও জলের স্রোত তৈরী করা  
হয়েছে। জন নিকলসন ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লী অববোধের  
সময় নিহত হন।

বাওয়ালপিণ্ডির পার্কগুলি, ম্যাশি গেট, রঘুনাথজীর  
মন্দির, ইসলামিয়া কলেজ ও হস্টেল, জমা মসজিদ  
প্রভৃতি দেখবার জিনিষ। তাছাড়া এখানে পথ-ঘাট  
চমৎকার—সে কথা আগে বলেছি।

১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা আটটার স্নানাহার সেরে আমরা

বাওয়ালপিণ্ডি ত্যাগ করলুম। প্রশস্ত পথ। রেলোয়ে  
ব্রিজের তলা দিয়ে সোজা উত্তর-মুখে চললুম। হুধারে  
প্রশস্ত ক্ষেত, সামনে বহুদূরে পাহাড়ের প্রাচীর। পাঁচ-  
সাত মাইল আসবার পর দেখি, পাহাড় আপনাব শরীব  
এমনি বিসর্পিত করে পড়ে আছে যে, দেখলে মনে হয়,  
এখানেই বৃষ্টি পথের শেষ! ভারতবর্ষের সীমারেখা  
চেনে দাঁড়িয়ে আছে ঐ দীঘল পাহাড়ের শ্রেণী। এত  
উঁচু, মনে হয়, ওখার থেকে এখানে অন্তরীক্ষ-পথ দিয়ে  
কোনো গেচরেরও বৃষ্টি কোন কালে আসবার সম্ভাবনা  
হবে না! গাড়ী যত এগোয়, পাহাড় তত সরে-সরে  
যায়—যেন লোভ দেখিয়ে আমাদের নিজের কবলে  
পুরোপুরি আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে  
পথের চিহ্নমাত্র অল্পভব করা যাচ্ছিল না। আর তা  
যাচ্ছিল না বলে বুক কেমন ছম্ছম্ করছিল,—না  
জানি, কি হুর্গম পথ পাবো পাহাড় উত্তীর্ণ হতে!  
বাওয়ালপিণ্ডি থেকে ১৩ মাইল দূরে পথ একটু চড়াই—  
উঁচুতে উঠছি, তা বোঝা গেল। ১৭ মাইলে বরাকো  
—এখানে পথটা হ্রস্ব, কবে বাঁয়ে বেঁকে পড়েছে।  
শেষের চার মাইল গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ শ্রামল।  
বরাকোতে তিনখানি গাড়ীর জুজ টোল দিতে হলো  
৬।/০, অর্থাৎ গাড়ী পিছু ২।/০ করে। বাত্মীদেরই টোল  
দিতে হয়। টোল-ষ্টেশনের ধারে চায়ের দোকান—  
গরীব সবাই-খানার মত। তাব সামনে ধূলিধূসর কাঠ-  
ফলকে লেখা আছে—Welcome, “Tea Shop Very  
clean.”

বরাকোর বাঁয়ে বেঁকে একেবারে পাহাড়ের গায়ে  
উপর উঠলুম। ডাইনে উঁচু পাহাড়ের প্রাচীর, তার  
পায়ের তলায় পথ, আর বাঁদিকে ২০০০ ফীট গভীর  
গহ্বর, গহ্বরের ওপারে পাহাড় আর পাহাড়—ছোট  
বড় মাঝারি পাহাড়—যেন নগাধিরাজের ধনী গৃহস্থ আর  
গরিব প্রজ্ঞার দল সপরিবারে বাস করছে! দৃষ্টি বৈচিত্র্য  
খুব। বরাকোর টোল-ষ্টেশন একেবারে পাহাড়ের বৃকে।  
বরাকো থেকে পথ উঁচু হয়ে চলেছে,—খুবই গোড়েন—  
উপরে মার্বেল রাখলে গড়িয়ে পড়ে। বরাকোর ছ’  
মাইল পরে পাহাড়ের উপর ছত্তর গ্রাম। ছত্তরে নানা  
ফল-ফুলের মনোহর বাগান আছে। ছত্তরে বিশ্রাম-বাসের  
ব্যবস্থাও খাশা। এখান থেকে আবাব চড়াই—ঠিক  
কোমরবন্দের মত পথ ঘুরে উঠেছে! আরো চার  
মাইল পরে অর্থাৎ বাওয়ালপিণ্ডি থেকে তেইশ মাইল  
দূরে একটি নদী পেলুম। নদীর নাম শৈলগা। নদীব  
উপরে পুল আছে—নিরাপদে সে পুল পার হয়ে আবাব  
চড়াই। দম্ভরমত উঁচু পথে উঠতে লাগলুম; ইংরাজী  
১১ হরফের মত বাঁকা পথ। গোটাচারেক বাঁক পার হয়ে  
চেয়ে দেখি, প্রায় চার-পাঁচতলা উঁচু পথে উঠে পড়েছি!

এইখান থেকে পথের দাঁবে পাইন গাছের শ্রেণী নজরে পড়তে লাগলো। গাড়ী থামিয়ে এঞ্জিনে জ্বল নেওয়া হলো। পাহাড়ের গা ফেটে মাঝে মাঝে ঝরণা ঝরেছে—কোথাও বা পাইপ দিয়ে ঐ ঝরণার জলকে সর্ক ধারে বহাবার চেষ্টা করা হয়েছে—লোকে যাতে এই জ্বল সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে পারে। পাইপের মুখে বালতি পেতে যত-খুশী জ্বল নাও। জ্বল নেওয়া হলে গাড়ী চললো। পথ ক্রমে যত উঁচুতে উঠছে, বিভীষিকার মধ্যে তার গোপন সৌন্দর্য্য-মাধুরীও তত ফুটে বেরুচ্ছে! পথের একদার উঁচু পাহাড়ে ঘেঁষা—অপর দিকে চাঁব গাছের ঘন-জঙ্গল। এই চাঁব গাছের নির্যাস থেকে টারপিণ তেল তৈরী হয়। আমাদের এখানে যেমন তাল বা খেজুর গাছের গলাব কাছে খানিকটা ছাল কেটে ভাঁড় বেঁধে তাল-খেজুরের রস সংগ্রহ করে, চাঁব গাছের গায়ে মাঝে মাঝে কেটে তেমনি সর্ক তার দিয়ে ছোট ছোট মাটির গ্লাস বেঁধে দেছে—সেই সব গ্লাসে নির্যাস সংগৃহীত হয়। চাঁবের কি ঘন জঙ্গল? অথচ থাকে থাকে কে যেন গাছগুলিকে সাজিয়ে পুতেছে! বিলাতী ঝাউয়ের মত দেখতে গাছগুলি—পাতাব গাছ সবুজ রঙে বাহার যা খুলেছে, চমৎকার!

অবশেষে ট্রেট্ বসে এক জায়গায় এসে পৌঁছলুম। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ট্রেট্ সাতাশ মাইল। ট্রেট্ ডাক-বাংলা আছে, তার উপরে বরাকোর মত চায়ের দোকান তিন-চারখানি। সামনে লেখা আছে,—Your Refreshment Room—to the left, ডাঙিনেও তাই। দোকানগুলির দেওয়াল মাটিব—মাছ-ভোর উঁচু। পাহাড়ের গায়ে লাল-নীল-হলদে হরেক রঙের ফুলের গাছ; তাছাড়া ডালিম গাছের ঝাড়। কোনো ঝাড় ডালিমের লাল ফুলে আলো হয়ে বয়েছে, আবাব কোনো ঝাড়ে খলো-খলো ডালিম ফলেছে। বাংলার সেই মিঠে ছড়াটা মনে পড়ছিল, “ডালিম-গাছে তোতা পাখী”...কিন্তু তোতা পাখীর দর্শন মিললো না। একটু পরেই দেখি, একটা পাহাড়ের মাথা এমন উঁচু—যে, সেদিকে ঘাড় ফিড়িয়ে চাইলে মাথা ঘুরে যায়! তিন-তলা, চারতলা পাহাড়ের বুকে বিস্তর আবাদ-ক্ষেত, লোকের বসতি! পাহাড়ের গায়ে ছাগল চরছে। প্রকাণ্ড ছাগল...গায়ে বড় পাঁশুটে আর কপালের উপর মস্ত বাঁকা শিং। আকারে রামছাগলের মত এবং বেশ ফট-পুষ্ট! এ জায়গার নাম শ্রনিব্যাঙ্ক! শ্রনিব্যাঙ্ক হলো ৬০৫০ ফুট উঁচু—এখানে একটা মদেব ভাঁটা আছে (Brewery)! শ্রনিব্যাঙ্কে টোল দিতে হলো ৪ চার টাকা। বারা ম্যারিতে যাবে, এ টোল তাদের দিতেই হবে। বারা ম্যারিতে থাকবে না, ম্যারি পেরিয়ে আরো এগিয়ে যাবে, তারা রসিদ দেখিয়ে ম্যারিতে এ

টাকা ফেরত পায়। বরাকো থেকে এই যে পাহাড়ের বৃক্কের উপরকার পথ দিয়ে চলেছি, এ পথের নাম হলো শ্বিলাম-ভ্যালি রোড। এই পথ বন্ধা করবার জঙ্কই ষাট্রীদেব কাছ থেকে টোল সংগ্রহ করা হয়। যেখানে টোল দিলুম, সেখানে এক কাশ্মীরী মুসলমান বসে সারেসী বাজাছিল। পাহাড়ের উপর এমন জায়গা, আর তার সেই মিঠে সুর...আমাদের একেবারে বিমুগ্ধ করে তুললে! খানিক অপেক্ষা করে তার সুর উপভোগ কবে বেলা এগারোটার শ্রনিব্যাঙ্ক পাব হলুম। শ্রনিব্যাঙ্কের দেড় মাইল পরে ম্যারি। ম্যারি সব-চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উপর; ৭০০০ ফিট উঁচু। ম্যারি ক্যার্টনমেণ্ট মস্ত সহর—হাট, বাজার, বিলাতী দোকান, ফোঁজের ছাউনি, চার্ক, হোটেল, সিনেমা-হাউস, অভাব কিছু নাই! ম্যারিতে পৌঁছলুম, ঠিক বেলা দুপুরে। ম্যারি পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের গ্রীষ্মাবাস, তাছাড়া ফোঁজের মস্ত ছাউনি আছে। এখানে বৌদ্ধের তাপ শ্রচণ্ড হলও কষ্ট হচ্ছিল না। ম্যারিতে এসে দেখি, যে-সব পাহাড়, বন-জঙ্গল আমাদের মাথার বহু উপরে প্রায় আকাশের গায়ে ঠেকছিল, সেগুলো আমাদের কত নীচে যে নেমে পড়েছে! চাঁব গাছের জঙ্গল, পাইনের শ্রেণী—আব ঘোরা-বাঁকা পথ, নীচে খাদ খুব গভীর—সে যেন পৃথিবীর বুকখানা ফেটে পাতালের কোন্ বিরাট গহ্বর প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে হাঁ করে পড়ে আছে! দেখলে শুধু চক্ষু স্থির নয়, মাথা অবধি ঘুরে যায়! যদি গাড়ী একটু বেসামাল হয়, ডাইভার যদি একটু অসম্মানক হয়, তা হলে গাড়ীওদ্ধ কোথায় কত নীচে যে গিয়ে পড়বে,—কারো হাড়-পাঁজরার চিহ্ন থাকবে না, গাড়ী-সমেত গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে! তার পর পাহাড়ও কি এমন একটা! পাহাড়ের পর পাহাড়, তার পর পাহাড়! সংখ্যা নেই! আতঙ্ক হলো এই ভেবে যে, এত পাহাড় পার হয়ে কোথায় সেই ভূস্বর্গ কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর—সেখানে পৌঁছনো কি আর সম্ভব হবে! অথচ পেছুবার কথা মনে হলও গা শিউরে ওঠে! এই সাত হাজার ফিট উঁচু পাহাড় থেকে গড়ানে বাঁকা পথে নামতে হবে। গা শিউরাবার কথা! এ পথে দুর্ঘটনা খুবই হয়! এলাহাবাদে ললিত বাবুর কাছে এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে শেঠী সাহেবের কাছে শুনেছিলুম, ডাইভারের গৌরার্জুঁ বি বা বেঙ্ শিয়ারিতে কিম্বা গাড়ীর কলকড়া টিলে হয়ে কত গাড়ী—কত লরি—কত লোকজন মালপত্র-সমেত যে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার আর সংখ্যা নেই! তাছাড়া উণ্টো-মুখ থেকে ছ-ছ হাওয়ার গতিতে মোটর আসছে। কোথায় কোন্ বাঁকের মুখে হর্ণ না দিয়েই একদম সামনে পড়লো—এমন হয়। এ-পথে একটা জিনিষের দিকে

হাশিয়ার হয়ে চললে কতক নিরাপদ—সামনে পথে ধুলোর ঘূর্ণাচক্র দেখলে বুঝতে হবে, আগে গাড়ী আছে। তাই বুঝে হর্ণ দিয়ে সতর্কভাবে গাড়ী চালানো চাই, না হলে বিপদের আশঙ্কা। কাজেই আতঙ্ক হবার জট ছিল না।

মারি থেকে পথ আবার নামতে শুরু হলো। সে কি নামা—বাকের পর বাক পার হয়ে নেমে চলেছি তো নেমেই চলেছি। ভাগ্যে গাড়ীর নামা, তাই রক্ষা! মাহুশকে এমন ছুটে নামতে হলে কখন হয়তো বেদম হয়ে উন্টে ঠিকরে পড়তো! সে পথ-নামার ভদ্রী খুব রোমাঞ্চকর ব্যাপার। নেমে নেমে একটা পাহাড়ের স্বর্ণার ধারে বেলা সাড়ে বারোটায় গাড়ী দাঁড় করিয়ে লুচি-তরকারী ফল-মূলে টিফিন সারা হলো। তারপর স্বর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে ১২-৫৫ মিনিটে আবার গাড়ী চড়লুম। মারী থেকে দশ মাইল পরে দেওয়ালী—দেওয়ালী ২৫০০ ফিট উঁচু। ৭০০০ ফিট থেকে একেবারে ২৫০০ ফিটে নামা—যে নেমেছে, সেই জানে, আতঙ্কের সঙ্গে আমোদ এতে কতখানি! সামনে পিছনে আশে-পাশে সবুজ জঙ্গল আর পাহাড়ের দৃশ্য আগাগোড়া রমণীয়। এইখান থেকে আবার উঁচুতে ওঠা। যাকে বলে Zigzagging, এ পথে তাই। গাছের ছায়া নেই—পাহাড়ের পথ একে-বেকে পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দেওয়ালী থেকে প্রায় আট মাইল পরে ঝিলামের সঙ্গে দেখা হলো। দুধারে উঁচু পাহাড়—মাঝখানে বড় বড় শিলা-পাথরে গতি প্রতিহত হয়ে নাতিপ্রশস্ত শ্রোতস্থিনী বিপুল শ্রোতে নেমে নেমে চলেছে। সে শ্রোতে কাঠ ভেঙ্গে আসছে—পজ্জাবে ঝিলাম ষ্টেশনের কাছে যেমন দেখেছিলুম। বেলা দুটায় কোহালায় এসে পৌঁছুলুম। কোহালায় বাঁ দিকে পাহাড়ের কাঁধে ডাক-বাংলা, পোষ্ট অফিস—ডাঙিনে ঝিলাম নদী সগর্জনে শিলাস্তূপে তরঙ্গের আবাত দিতে দিতে বয়ে চলেছে। কোহালা হলো ব্রিটিশ রাজ্যের সীমানা। কোহালায় মস্ত পুল ঝিলামের ওপারের পাহাড়কে আঁকড়ে ধরেছে—কোহালায় ওপার থেকেই কাশ্মীর রাজ্য। এখানেও টোল দিতে হলো। এখানে পেট্রোল পাওয়া যায়। আমরা পেট্রোল নিলুম—তার পর বেলা ২-৫৪ মিনিটে পুলের উপর উঠলুম। পুল পার হয়ে বেলা ২-৫৬ মিনিটে কাশ্মীরের হিন্দুরাজ্যে পদার্পণ করলুম। হিন্দুরাজ্য! নিম্নে প্রাচীন পুরাণ-ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো যেন চোখের সামনে জল্জল্ করে উঠলো।

ঝিলাম এতক্ষণ ছিল আমাদের ডাইনে—এবার আমরা এলুম ডাইনে, ঝিলাম বাঁদিকে পড়লো। কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করবামাত্র গাড়ীর ড্রাইভারদের নাম আর গাড়ীর নম্বর একজন কর্মচারী note করে নিলেন। এর

আফিস-ঘরটি ঠিক পুলের প্রান্তে। পাকা ঘর। পথের ধারে লেখা আছে, Beware of Boulders. লেখা দেখেই গা ছমছমিয়ে উঠলো। এতক্ষণ যে পথ দিয়ে এলুম, সেখানে উঁচুতে ঝুলন্ত পাথর পাহাড়ের গায়ে দেখেছি বটে—কিন্তু সে পথে পথিককে সতর্ক করার জন্ত কোনো লেখা ফলক দেখিনি। এখন অকস্মাৎ লেখা দেখে মনে হলো, এ পথের ঝুলন্ত পাথর তাহলে একদম অচঞ্চল নন—তার গড়িয়ে পড়ার অভ্যাস তাহলে রীতিমত আছে। নাহলে হাশিয়ার করার দরুণ এ ফলক পাথর থাকবে কেন? এ পথে প্রায় পাঁচ মাইল আসার পর এক টানেল পার হলুম—তাছাড়া ছোটখাট করে কটি পুল পার হতে হলো। এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়, মাঝখানে গভীর খাদ—এই পুল ছাড়া পার হবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দেখলুম, পুরানো পুল ভেঙ্গে পড়ে গেছে, তার কাছে নতুন পুল তৈরী হয়েছে অর্থাৎ পাহাড়ের উন্নত অবয়ব আর ঐ খাদ, গহ্বর, নদী—এ যেন প্রকৃতির খেয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। দরদ জানে না, যমতার ধার ধারে না—যখন খুশী খেলার চলে ভেঙ্গে ধ্বসে পড়লেই হলো—তাতে মাহুশ বা গাড়ী চাপা পড়ুক বা তাদের অর্ধষ্টে বাই যটুক।

কোহালায় বারো মাইল পরে তুলাই। তুলাইয়ে ঝিলামের দিকে পাহাড়ের গায়ে ঝুলন্ত ডাকবাংলাখানি দেখতে যেন ছবিব মত। লেডি রিপন এই বাংলার কিছুদিন বাস করেছিলেন; তিনি এর নামে দেন Honeymoon Cottage. Honeymoon-বাগনের পক্ষে একটেক্স—যেন কোন্ কল্পনায় গড়া মায়াপুরী! এখানকার পথ পাহাড়ের গা কেটে তৈরী। অল্প বৃষ্টি হলে প্রায় পাহাড় ধ্বসে পড়ে। তুলাই থেকে পথ ঘুরে ঘুরে গেছে—কখনো নেমে ঝিলামের জলের কাছে গিয়েছে, আবার হঠাৎ বন-জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে বহু উর্দ্ধে অমন আট-দশ তলার সমান উঁচুতে উঠে গেছে! তুলাই থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ডোমেল। ডোমেল ২১৭১ ফিট উঁচু। এখানেও ডাক-বাংলা এবং পোষ্ট অফিস আছে। বেলা ৪-১৫ মিনিটে আমরা ডোমেল পৌঁছুলুম। ডোমেলের ঝিলামের সঙ্গে কিষণগঙ্গা ও কোন্হার নদী মিশিয়েছে; বাঁয়ে চমৎকার পুল। সেই পুল পার হয়ে বাঁদিকে যে পথ, সে পথ গেছে গ্র্যাবটাবাদ—নিধে পথ ভ্রমগরে গেছে; পুলের অধরে কিষণগঙ্গা নদীর তীরে বিষ্ণু-মন্দির; তার পিছনে এক প্রাচীন শিখ-কেলা আছে।

ডোমেলের কাঠম অফিস। এখানে টোল দিতে হলো—তার পর সরকারী খাতায় আমাদের নাম-খাম, কোথায় যাছি, কতদিন থাকবো, সঙ্গে বন্দুক আছে

কি না, কাটিরিজ আছে কত, এই সুব পরিচয় লিখিয়ে, বন্ধকের লাইসেন্স দেখিয়ে পাঁচালয় আবার গাড়ী ছাড়া হলো। খাঁকা-বাঁকা পথে কখনো উপরে উঠি, কখনো নীচে নামি—এটভাবে খানিক এসে এক সুন্দর বর্ণা দেখলুম। অর্থাৎ নাম যশকুল। বেলা পড়ে আসছিল—বেলা ৫.২০ মিনিটে পৌঁছলুম গড়হি। গড়হি ডাক-বাংলাখানি একেবারে পাহাড়ের গায়ে। পথের বাঁ দিকে ঝিলাম। ঝিলাম এখানে বেশ প্রশস্ত হয়েছে। গড়হির ওপারে পাহাড়েব ধারে হাতিয়ান গ্রাম, হাতিয়ান কাশ্মীর ষ্টেটের অন্তর্ভুক্ত। ওপারে নদীর ধারে কাশ্মীরী রমণীরা এই সন্ধ্যার পূর্বে স্নান করছিলেন,—অস্তগামী সূর্যের কিরণছটা, আর কাঁদের অঙ্গে ঐ ছুধে-আলতার বৎ, বাতাব বা খুঁগেছিল...নদীর জলে যেন কমলের মাল্য ভাসছে! যেমন কাশ্মীরী, তেমনি দেহের গড়ন—সুভৌল, সুঠাম, নাক-মুখ-চোখ একেবারে নিখুঁত! নদীর তীরে ঘাগরা খুলে বেধে শৌন্দর্যের নগ্ন আবরণে তাঁরা জলে নাটকিলেন এমন অসঙ্কোচে যে, দেখলে অবাক হতে হয়! তীর-পথে লোক চলেছে—সেদিকে লক্ষ্যমাত্র নেই!

গড়হির ডাকবাংলাটি খুব প্রশস্ত—বারো-চোদ্দকটি কামরা, বহু বাথরুম—তাছাড়া সুগোপীয় ও কাশ্মীরী খানার বন্দোবস্ত আছে। রাত্রির মত এইখানেই আস্তানা পাতবো স্থির করে গাড়ী বাতাব ব্যবস্থা করলুম। হিন্দু কিচেনে কাশ্মীরী খানার ফরমাশ দেওয়া গেল। তারপর গরম জলে স্নান সেরে আহালাদি করে শয়ন করা গেল।

ভোরে ঘুম ভাঙতে কাশ্মীরী খানা ও টিফিনের ফরমাশ করলুম। আগের রাত্রে খুব বৃষ্টি-বজ্রাবাত হয়ে গেছিলো। ভোর থেকে এমন শীত পড়লো যে গরম গেঞ্জি, ভায়েলা সার্ট, গবম কোট, ওলাব কোট, এমন কি, মাফলার পর্যন্ত ব্যব করতে হলো। তারপর ভাড়াভাড়ি স্নানাহার সাংবাদ পাল। হিন্দু-কিচেনে খাবার বন্দোবস্ত খুব ভালো। লোকজন সামনে বসে বস্তু করে খাওয়ায়। কি চাই? যত খুশী খাও! কেলনারের বা সুগোপীয় আদর্শের বাঁধা-ধরা গোণা রকম খাওয়ানো নয়। ডাল, কটী আব মাংস—এ তিনটি রান্নাও ভারী পরিপাটি।

আহালাদি সেরে বেলা ঠিক আটটায় গড়হি ছাড়লুম। গড়হিতে একটা ঠাকুর-বাড়ী আছে; সেখানেও বাত্রীদের বাসের ও আহারের ব্যবস্থা আছে।

গড়হির একটু আগে ঝিলামের উপর ঝোলা পুল। নদীর অপর পারে একটা পুরানো হুর্গের ধ্বংস-স্তূপ পড়ে আছে। শিখদের সঙ্গে এখানে পাহাড়ীদের এক যুদ্ধ হয়েছিল সেকালে। পাথর ছুড়ে পাহাড়ীরা বহু শিখকে অধম করে।

গড়হি থেকে ঝোল মাইল পথে চেনারি। চেনারিতে একটা বড় ঝরণা আছে। এখানে পথ বহুবার ধ্রুসে ভেঙ্গে গেছে, এবং বারবার সরকারকে সে পথ সাক্ষরিয়ে নতুন পথ তৈরী করতে হয়েছে। সর্বক্ষণ পথ পর্যবেক্ষণ করবার জন্য বহু কর্মচারী মজুৎ আছে। যেখানে ভাঙছে বা ধ্রুসে পড়ছে, সেখানে অমনি লোক লাগছে পথ মেরামত করতে।

চেনারি বা আঠারো মাইল দূরে উরি। উরির দৃশ্য-শৌন্দর্যের আর তুলনা নেই! চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়...এর পাশ দিয়ে ওর গা ঘেঁষে সে-সব পাহাড় ঘুরে এসে নদীর তীরে বাজারের সামনে দাঁড়ালুম। তখন দশটা। ডানদিকে বাজার; বাজারের অপরদিকে শুদৃশ্য ডাকবাংলা। এখানে সাদা কাক দেখলুম। তাছাড়া দেখি, উরিতে বহু মোটর আর লরি ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। মেল-ভ্যানের একজন কর্মচারী আমাদের জানানেন, আগের রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় পাহাড় ধ্রুসে সামনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে—প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে—তবে পথ সাক্ষর হবে। তখন গাড়ী থেকে নেমে চারিদিকে বেড়ানো গেল। বাজারে ঢুকে আপেল, নাশপাতি, আখরোট, বাদাম প্রভৃৎ কিনলুম। আখরোট দু' আনা চার আনা করে শ'। খোলা এমন নরম—হু আঙুলে টিপে ধরলেই ভেঙ্গে যায়! এগুলোকে বলে কাগজী আখরোট, কি তার স্বাদ! তেলা গন্ধ মোটে নেই!

দুই ঘণ্টা পরে পথ সাক্ষর হয়েছে শুনে আবার অগ্রসর হলুম। পথ তখনো সাক্ষর হচ্ছে। সম্ভবপূর্বে সে জায়গা পার হয়ে আবার গাড়ীর গতির বেগ বাড়িয়ে দেওয়া হলো। পথ একটু রকম...সেই ওঠা আর নামা, নামা আর ওঠা। উরির পর ঝিলামের শরীর আবার শীর্ণ হয়েছে। দূরে পীর্থ-পাহাড় পাহাড়ের দীর্ঘ শ্রেণী। উরি থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে পথের ধারে এক ভাস্কর মন্দির—মন্দিরটার নাম ব্রাহ্মুটি। ব্রাহ্ম-কূটীর নর তো? মন্দিরের পর থেকে পথ একটু সমতল হয়েছে। এর একটু আগে রামপুরের ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউস। এখান থেকে ত্রীনগর অবধি ইলেকট্রিকের তার গেছে কাঠের ঢাকার মধ্য দিয়ে। এখানে একটি চমৎকার পুল পার হলুম। পুলের নীচে মস্ত বর্ণা বয়ে চলেছে, নাম ওপিনালা। একটা জীর্ণ মন্দির দেখলুম, ভনিয়ার মন্দির। মন্দিরের দু' মাইল আগে নৌশেরা গ্রাম।

নৌশেরার তিন মাইল আগে থেকে ঝিলামের অঙ্গ আবার প্রশস্ত হয়েছে। সামনে পাহাড়ের শ্রেণী ক্রমে লুপ্ত হয়ে এলো। শুধু কাশ্মীরের উত্তরে হিমালয়ের একটা অংশ নান্দা পর্বত (২৬৯০০ ফিট উঁচু) আর হরমুখ শৃঙ্গ (২৬৯০০ ফিট উঁচু) মাথায় তুষার-কিরীট পরে দাঁড়িয়ে

আছে! সূর্যের কিরণ শুভ্র ভূষারের উপর পড়ে তার বটাকে কতক ঘোলাটে মেটে গোছ কবে তুলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন পাহাড়ের মাথার কে অজস্র হুণ ছড়িয়ে রেখেছে। মাঝে মাঝে কাশ্মীরী বস্ত্রী। বস্ত্রী পার হবার পর দুধারে পাহাড়ের কপাট কে যেন খুলে দিল। সামনে সমতল প্রান্তর—সবুজ তৃণ-লতায় সমাচ্ছন্ন। শস্তের প্রাচুর্যের সীমা নেই। ক্রমে বারামুলায় পৌঁছলুম।

বারামুলায় বহু লোকের বাস। ঝিলামের নুকে ক'খানা হাউস-বোট দেখা গেল; তার পন ফলের বাগান। পথের দুধারে অসংখ্য বাগান—আপেল-নাশপাতিতর ভারে গাছের ডাল একেবারে হুয়ে পড়েছে। এমন লোভ হচ্ছিল—বাগানে ঢুকে পড়ে মের্গ তাক। পাকা ফল পেড়ে খাবার জ্ঞা। ডাইনে পথের ধারে কাষ্টফলক। তাতে লেখা Way to Gulmarg, ডানদিকে তুয়ার-মণ্ডিত গুলমার্গ পলতও দেখা গেল।

বারামুলা থেকে পথের দুধারে পপলাব গাছের শ্রেণী। গাছগুলি সোজা সুপুৰি গাছের মত উঠে গেছে—মাথার কাছে কাঁকড়া পাতার গোছা—ঘোঁষাবেনি ঠাসাঠাসি। পথের দুধারে এই গাছ যেন স্তদীর্ঘ পাচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথে চেনাব গাছের দেখা মিললো। গাছগুলি আমাদের বট-অশথের মত। পাতাগুলি বড় বড়, আঙুরের পাতার মত দেখতে।

এই চেনাব গাছ পার্বত্য থেকে আমদানি। এ গাছ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কাশ্মীরে আমদানি করেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট লাহোরে এই গাছ পুঁতিয়েছিলেন, কিন্তু লাহোরের মাটিতে এ গাছ গজালো না। কাশ্মীরেই এ-গাছের প্রাচুর্য, তা'ও বারামুলা থেকে। বারামুলা থেকে বাঁয়ে পথ গেছে সোপুব। সোপুব থেকে উলার হুদে যেতে হয়।

বারামুলা থেকে প্রায় ১৭ মাইল পরে পাটন গ্রাম। পাটনে বড় বড় মাঠ চেনাব গাছে ঘেরা। মাঠে তরুণী কাশ্মীরী রমণীরা ঝুড়ি হাতে কেউ কাঠি-কুটো, গাছের ভাসা ডালপালা কুড়োচ্ছে, কেউ বা গোস্বে-দেওয়া ঘুঁটের তত্বিব কবছে। পরণে বড়ীন ঘাগরা আর কপেব প্রভায় দেহের গড়নে ঐ মুক্ত প্রান্তরে যেন কোন পরী-রাজ্যের বিচিত্র স্বপ্ন-কাহিনীর আভাস জাগিয়ে তুলেছে। কাশ্মীরী নারীর রূপের খ্যাতি ভূবন-জোড়া...সে খ্যাতির মধ্যে এতটুকু অভ্যাক্তি নেই। এই সব গরিব কাঠ-কুড়ানির মেয়েরা কোনো রাজার সিংহাসনে বসলে সিংহাসন তাদের রূপের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারা ভাগব চোখ তুলে ব্রীড়াইন অসঙ্খ্যচ দৃষ্টিতে আমাদের গাড়ীর পানে মাঝে মাঝে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তাদের দেখে ববীন্দ্রনাথের কবিতাব ছন্দে মন থেকে প্রশ্ন জাগছিল,—

কোন কাননের ফুল,

তুমি কোন গগনের তারা।

প্রান্তর-বৃক্ষে এই কণ-স্বপ্নমা কবির চিত্রকবির কল্পনায় স্বর্ণা বইয়ে দেয়।

পাটন থেকে ১৮ মাইল পরে শ্রীনগর। শ্রীনগরের সীমায় এসে দেখি, সামনে ঝিলাম। দু'ধারে পথ দুখানি হাতের মত ডাঙিনে আর বাঁয়ে বিস্তারিত রয়েছে। কোন দিকে বাবো, প্রশ্ন করবো। বলে গাড়ী থানানো হলো। অমনি দলে দলে লোক এসে হেঁকে দরলে। রবিবাবুব সেই কবিতা মনে পড়ছিল—লাগিল পাণ্ডা নিমেষে প্রাণটা কবিল কঠাগত। লোকগুলো কত আশাই যে দিতে লাগলো—হাউসবোট দেবে, হোটেল দেবে ইত্যাদি। আমবা তানাগুম, রাওয়ালপিণ্ডিব এন্, ডি, বাধাক্ষিপণ কোম্পানিব অফিসে আমরা যেতে চাই। একটা ছোকরা গাড়ীর কুটবোর্ডে চড় করে বসে পড়লো, বললে,—আমি পৌছে দেবো, জী হুতব।

তাকেই গাইড করে গাড়ী ছাড়লুম।

ডান দিকে বেকেই শ্রীনগরের বাজার। বাজার পাব হয়ে বেকে 'আমীরা কাদাল বা ফাঠ' দিছ। এই পুল পার হয়ে শ্রীনগরে প্রবেশ করলুম। পুল থেকে বাঁ দিকে নদীর গায়ে মহারাজার প্রাসাদ দেখা গেল। কাদাল অর্থে পুল। ঝিলামের উপর এই শ্রীনগরে সাতটি পুল আছে।

অচিরে এন্, ডি, বাধাক্ষিপণের অফিসে এসে পৌঁছলুম। পরিচয় পাবামাত্র তাঁদের এক কন্ঠচারী গাড়ীর সঙ্গে এসে আমাদের চেনাব-বাগে নিয়ে গেলেন। চেনাব-বাগের মধ্যে চেনাব নালা। এই চেনাব নালায় আমাদের ভগ্ন দুখানি হাউসবোট তাঁরা ঠিক করে রেখেছিলেন। একটির নাম Cutty Shark, অপরটির নাম Vishnu Vavan, দুখানি হাউস-বোটের সঙ্গে দুখানি কিটেন-বোট এবং দুখানি শিকারী আছে। শিকারী ছোট পাঙ্গীর মত, তবে পাঙ্গীর চেয়ে ছোট এবং ঢের হালকা। এই শিকারী অর্থ Pleasure boat, একে চড়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও।

বেলা তিনটার সময় হাউস-বোট অধিকার করলুম। ২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা ছেড়েছিলাম—১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগর। পথে বিজ্ঞানের জ্ঞান বহু সময় ব্যয় করোছি; তার দরুণ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য এতটুকু ভোগ কবতে হয়নি—একদিনের জ্ঞান মাথা কারো ধরা বা কোন অস্বস্তি বোধ হয় নি। এই দীর্ঘ পনেরো দিনে ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত...স্বদীর্ঘ পাড়—নব নব দৃশ্যে প্রাণে কি আনন্দ পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা হু:সাধ্য।

তারপর শ্রীনগর.....তার শোভা-সৌন্দর্য অতুলনীয়। কাশ্মীরকে কেন যে ভূস্বর্গ বলা হয়, সে-কথা বলবো বারান্তরে।

# রৌদ্র-মেঘে

## শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

### স্বভ্যত্যা-প্রশস্তি

সকাল বেলায় ফুটলো আভা নীল আকাশে !  
শ্রামলিমা বাগ-বাগিচায় ঘাসে-ঘাসে !  
শাখে-শাখে উঠলে! গেয়ে কতই পাখী,  
সাজলো বনে ফুল-পরীবা গন্ধ মাখি।  
বইলো বাতাস ঢেউ হুলিয়ে নদীর জলে—  
কি মাধুরী জাগলো মরি জলে-স্থলে !

পাঁচ'শ বছর পরে এ-সব থাকবে কি যে ?  
বনে লতা পুষ্প-মুকুল শোভায় ঘিরে ?  
দীঘির কালো জলের বুকে কমল-ডালা ?  
পানীর গলায় বুক-জুড়ানো স্তবের মালা ?  
মানুষ যত শক্তি পেয়ে উঠেছে ফুলে—  
আরাম-খোঁজে গর্কে মেতে উণড়ে তুলে  
ফেলচে বনের লতা-পাতায়—মৃদা কি তার ?  
স্বপন বুনে ঢুল আনে—সব তুচ্ছ-অসার !

ওই যে ছাখো উচ্চ গিরি গগন ছুঁয়ে।  
অস্ত্র-পাশে চূর্ণ কবি পাড়বে ভূঁয়ে।  
গিরির সকল চিহ্ন মুছে ধরার বুকে  
কল বসাবে, ফ্যাকটরি-মিল হাস্য-মুখে !  
সবুজ বনের শ্রামল বেগা ; গাছে গাছে  
গাইছে পাখী,—চাঁপা-বকুল ফুটে আছে ;  
দেগলে মরি, চিত্ত জুড়ায়, মুগ্ধ আঁখি—  
ভাস্সবে সবই—রাখবে না বে কিছু বাকী।

বারুদখানা গড়বে হোথায় ; তোপের পরব  
বানাবে—নয় দিগ্বিষ্মে খর্ব গরব।  
কল্লোলিয়া ওই যে নদী হাস্যমুখী  
চপল স্রোতে চলেছে ঐ উপল কুখি—  
বন্ধ-বাধা জানে না সে, মানে না কো—  
লৌহ-পাশে বাধবে তাহে,—তুলবে সাঁকো।  
জাহাজ-শ্রেনে ফেসবে ছেয়ে অঙ্গ উত্থাপ—  
খমকে ধ্বংস থাকবে নদী কর্দম-ভার !

ঈরার মালা হুলিয়ে বুকে নিখ'রিণী—  
দুষ্ট মেয়ে তুলচে লীলায় কলধনি !  
মুক্তা-সুরি হাসিতে তার পড়চে সুরে—  
রৌত্র মেখে বাম-ধনুকের বাণ্ডন স্তবে।

কিন্তু ও সব তুচ্ছ খেলা ! নেহাৎ অসার !  
বসাবে পাম্প, ইলেকট্রির মস্ত পাওয়ার !

মুক্ত আকাশ-তলে বিপুল হাওয়ার-সোটা  
মুক্ত বিশাল প্রাপ্তব অই অবাধ-ছোটা—  
শ্রান্তি-হরা স্নিগ্ধ আঁচল ধরণী-মার,—  
ধব-ছাড়া হাস, কত জীবের শয্যা-বিথার !  
প্রাস্তর ওই মিলিয়ে যাবে দু'দিন পরে,  
কাবখানা মিল—বস্তীতে বুক উঠবে ভরে।

পল্লীর বাট, কুঁড়ে, পুকুর, মুক্ত হাওয়া—  
ঘোমটা-মুখে বৌদি-দিদিব জল্কে যাওয়া—  
ঘাটের কুণ্ডে বাবলা-মূলে বাঁধা তরী—  
ছায়ায় ঢাকা আম-কাঁঠলের বাগান, মরি,—  
সবই যাবে। বয় যদি ভায়, রইবে স্মৃতি  
কাবব মনে ছন্দে-গাঁথা পুবাণ-গীতি !  
ধরাব বুকে মিলিয়ে যাবে গাঁয়েব রেখা—  
ট্রামেব রেলব লাইন শুধু থাকবে লেখা !  
আকাশ-নীলে ঢাকবে দোয়া, ঢাকবে দূলা,—  
স্বপ্নভোলা ব্যস্তবাগীশ মানুষগুলা  
খুঁজবে কোথায় আরাম-প্রীতি দয়া, মায়া ?  
মাথায় চড়া তপ্ত ববি—কোথায় ছায়া ?  
সত্যতা তাব উড়িয়ে ধ্বজা হাকবে জোরে—  
হাসি-বাঁশী ভাসে—ভাসে অকেজোরে।

### সেকালে ও একালে

সেকালে মানুষ বনে-জঙ্গলে যুগয়ায় হতো বার—  
মারিত সিংহ, হরিণ, ব্যাঘ্র, ভাল্লুক, গণ্ডার।  
হবিণের শিং, বাঘের চামড়া, ভাল্লুকের শির আনি  
ঘবের দেওয়ালে টাঙ্গাতো ; মেঝের বিছাতো সজ্জা মানি।  
যে দেখিত, তাব কি তাক লাগিত—বিশ্ময়ে সচকিত !  
দুঃস্থ পশু—তারে মাঝিয়াছে ! বার্য্য সে বাধানিত।

একালে সে বনে বসেছে সহর—বড় বড় পথ খোলা—  
চলে লোকজন—পিছনে মোটর ছোটো কামানের গোলা।  
তার ডাইভায়—যেন বাদশাহ ! দৃকপাত নাহি কারে—  
বাতাসের বেগে ঢালায় মোটর—পথে চাপা দিয়া মারে  
কুকুর-বিড়াল, মোরগ-ছাগল, নব-নানী কত শত—  
তাদের অস্থি-পগুবে-শিরে—কয়মালা গাঁথে না ত।

### জুহু-গাঁথী

মশাল জালিয়া দামামা-নিদাদে চলে যে বিজয়ী-বীর—  
তাহার শৌর্য্য-বীৰ্য্য বাধানি শ্রদ্ধায় নত শির !  
আকাশে আঁধার—আঁধার ধরণী—আঁধারে মলিন রাত্রি—  
বারেক দেখি না, সে আঁধার-পথে নীরবে কে চলে যাত্রী !  
পাহাড় কাটিয়া বচিছে নগর—সেতুতে সাগর বাঁধে—  
কামানের গোলা বুকে লয়—তার জয় গাহি কারু ছাঁদে ।  
বাথায় আতুর, অভাবে দলিত যে জন চলিছে পথে—  
কম্পিত পায়ে, ছুরু-ছুরু বুকে বার্থ যে মনোরথে—  
চলার বিরাম তবু নাহি তার—লক্ষ্য হয়েছে চর—  
আশার বাগিণী জীবনে শোনেনি—জানে বেদনার সুর !  
তার পানে ফিরে চাহো গো বন্ধু, বারেক নোয়াও মাথা—  
অটল ধৈর্য্য—অবিচল প্রাণ—গাহো তার জয়-গাথা ।

### স্বীকার

সুখে-দুখে রচা ধরণী বন্ধু, পথে তার আলো-ছায়া—  
ববি-শশী-তারা-খচিত আকাশ—জল-ঝড় মেঘ-মায়া !  
গ্রীষ্মের দাহ, শীতের হিমালী, আব্রণেব বাবিদারী—  
ফাগুনে ফুলে যশলে মাধুরী মলয় বেদনা-হাবা !  
হাসি আছে হেথা—আছে গো অশ্রু—বিরোধ,মমতা,স্নেহ ;  
বন্ধুর পাশে রয়েছে শত্রু ; নীরবে তীর—মক-গেহ !  
সবারে স্বীকার করিয়া পান্থ, এ পথে চলিতে হবে !  
জীবনের ডালি হবে তো পূর্ণ রস-বিচিত্র হবে !

### প্রকৃত ধনী

দিয়েছ আশা প্রাণে, স্বপন সীমাহীন—  
ইহার বেশী হেথা চাচি না কোনো দিন !  
অভাবে-নিরাশায়—আশা সে হবে সব ;  
স্বপন রচিবে গো বিভব নব-নব ।

### প্রার্থনা

দেবার শক্তি চাহি । কেরা মোবে দাতা ।  
ভুলে যাই কাবো কাছে দুটি হাত পাতা !  
অপূর্ণ যেথায় যার আছে এইখানে—  
পূরণ করিতে যেন পারি মোর দানে !

### হাঙলা উপন্যাস

মেশের বাসায় পাশের পড়া—  
রঙীন আশায় কাশ-গড়া !  
পাশের বাড়ীর জানলা খোলা—  
শাড়ীর আঁচল—ইয়ং দোলা ।

নিষ্টি মুখের একটু হাসি !  
ভীর পুলক-ছন্দ রাশি !  
দৃষ্টি উদাস, আবছা-দেখা—  
গুধুই হতাশ ভাগ্যে লেখা !  
বন্ধ কেতাব—পড়ায় ছাই !  
কেশের গন্ধ—পাই, না পাই !  
গেজেট খুলি—নাই'কো নাম !  
আসল ভুলি—প্রেমের দাম ।

সামনে বাড়ী—বিরাট ধুম !  
বাহন-গাড়ীর দো-দুয়-চুম !  
নাঈবের বেলায় ধ্রুপদের পর  
ভিড়ের মেলায় আসলো বর ।  
বাজছে শাঁখ—বাজ শানাই !  
বেজায় হাঁক—“রামকানাই !”

রোশনি-রূপ, রূপ-সাগর !  
গোল থামায় । বাসর-ঘর ।  
ধুমুর-ঝুম্ব বাজছে মল—  
নাইকো ঘুম—সুর পাগল !  
“গাও গো বর”—“চাও কনে”—  
প্রাণ পাথর । বাজ মনে ।

হোথা সুর-বাহার পূব মাতায় !  
হেথা বুক-আঁধার । প্রাণ যে যায় !

### পঞ্চোচ্চ ন্যটক

( থিয়েটারী ছন্দ )

প্রথম অঙ্ক । উঠলো পট ।  
নদীর তীর—কক্ষে ঘট  
সুন্দরী—সে নিচ্ছে জল ।  
হুঙ্কার—ঐ মোগল ।  
“ওবে পিশাচ”—ধর-পাকড় !  
নাযক ধরে—“মার চাপড় !  
ভাগ ডাকাত !” ( হাত তালি ।  
ভীষণ গোল—ঘোর গালি )  
নাম্বিকা চায়, মুছাঁ যায়—  
জল চোখে—বীর লুকাই ।  
দুয়ের অঙ্ক । উঠলো পট !  
কৈ সে ? কৈ প্রাণের নট !  
গান করণ—মন অবশ ;  
চোখ সজল, মুখ বিরস ।  
প্রাণ পাগল,—ঘব আশান—  
জ্ঞান-প্রবোধ—কোরাশ-গান ।

বন-পথে ঐ যাঁর দেখি  
ঐ লুকাই। সখি—সে কি ?  
পতন—মুজ্জী—উদ্গাদী—  
হায় বিধি আজ বাদী।

তিনের অঙ্ক কয়-জমাট।  
মোগল-দলে মাঝলো ঠাট।  
পোড় রে খোঁজ—চাট যে শোধ !  
কাঁড় পাঁচাড়—তর্গ বোধ।  
শাদ ফটক—লুঠ-তবাজ—  
হানু কামান—দিল দবাজ !  
'ভাগ' রে 'তীর'—কাট' রে টেক—  
নয় দেশী—হোক সে ফেক !  
তাই বা কি—জম নাটক—  
শুক যুদ্ধে নাট অটক !

চায়ের অঙ্ক। উঠলো শান্।  
রাজসভায় নাচ ঝান্।  
গান চলে, প্রাণ মাতার।  
দূত প্রবেশ। দিল তাতার।  
সাজরে সাজ ! নাচ খামে।  
ঝন-ঝন ডান্-বামে !  
ঘোড়-সওয়ার, কুচ-কাওয়ার—  
'জয় রাজার'—ঘোর আওয়ার।  
গেল, গেল ! না, না—জিত সে ঠিক।  
ভীষণ রণ—অন্ধ দিক।  
ঝন-ঝন ঝন-ঝন  
ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে সৈকগণ।  
খাড়া অসি হান্, মোগল, হান্—  
ভূমে লুটায় যে বক্ষে বাণ।  
রাজা অঝাঁক ! কে ? মাঝিস কে ?  
আসে উদ্গাদী ধনু-হাতে।  
“তুমি।” “রাজ তুমি !” আলিঙ্গন—  
নাগক-নাগিকা-মধু-মিলন।

ওঁটায় পট—দ্রুম-দ্রুম !  
আলোয়-আলোয় বাসু কি ধুম !  
ফুলের আসনে রাজা ও বাণী—  
নাচের গানের কি কারদানি !

### কাজের কাজ

ব্যবসাতে জী দিনে-দিনে বাড়ছে প্রাচুর্যে—  
বাজি-দিবস খাটছে বিষম মাখন চাটুর্যে !  
লেখাজোখা নাটকে—টাকা আসছে লাখে-লাখ ;  
খাবার শোবার সময় নাহি—খাটার নাহি ফাঁক !

গৃহিণী সে ঘরে আছেন—আছে ছেলে-মেয়ে—  
সময় নাহি—ভাদের পানে দেখেন বারেক চেয়ে।  
মেলের তাড়া—ইন্ডেরসে কোথায় বাধে গোল—  
ডকেব মাগটা শ্রাদ্দা গেল—সারা প্রহর রোল !  
সবাই বলে,—চিরকালটা কাজে মত্ত হবে ?  
টাকার পাহাড় জম্লে যে এই—ভোগ করবে কবে ?  
চাটুর্যে কয়—এই যে দাদা, একটু জমাই পুঁজি—  
তখন জ্বিরেন নিয়ে আরাম করবো নয়ন বুজি।  
দিনের পরে দিন চলে যায়—বছর ঘুরে চলে—  
কাজে কামাই নেই। চাটুর্যে খাটছে অম্বর-বলে।

সেদিন বাতে জলছে বাতি—সবাই নিযুম ঘূমে।  
খাতার কাঁড় খুলে মাখন হিসাব মেলায় ধূমে !  
দাখের পবে লাগ চড়েছে—জমার অঙ্ক মোটা—  
'নেট-প্রফিট' পাহাড় যেন দাঁড়িয়ে আছে গোটা !  
মাখন দেখে,—বতাই দেখে, বন্ধ ওঠে ছলে—  
এমন পড়তা—বাজারে নাম—চলতি হিসেব ভুলে  
ছুটা নেবার সময় কোথায় ? সে তো হাতেই মজুৎ—  
চলবে নিলে যখন খুশী—শরীর তো নয় বেজুৎ !

কালের চাকা চলছে ঘুরে—তারি ঘূর্ণণ পাকে—  
গীত-বখা-শব্দ জুঁয়ে যাচ্ছে মন্ত্যটাকে।  
বুলায় তুলি আকাশে নীল, কত সজল মেঘে—  
সে দিকে নাই নজর—মাখন ব্যবসা চালায় বেগে।  
খাতা-মেলান, বিলের তাগিদ—গেল কখন নবি—  
ব্যস্ত তারি চিন্তাতে বায় দিবস-বিভাবরী !  
রূপে-রসে-গন্ধে ভরা ধরণী যে এমন—  
জানবে না—সে মানবে না কো—এ যেন তার পণ !

সবাই বলে—খাটচো কেবল ! চিনির বলদ কি তে ?  
এত পয়সা—হুঁদিন আমোদ করবে না তা নিয়ে ?  
চাটুর্যে কয়—এই যে দাদা,—আর দুটো দিন খাটি !  
তাব পরে পা মুড়ে নেবো বোটুকখানায় মাটি।  
সেদিন রাত চাটুর্যে শোয়—ভাবে, ছুটির পালা—  
কাল থেকে ভোগ করবো ঠিকই থাকবে না কো জালা !  
ঘুমায় মাখন। কাল থেকে তার। বরাম খাটার কাজে !  
সকাল হলো। জগৎ জুড়ে প্রাণের সাড়া বাজে।  
কাজের চাকা ঘুরলো অব্যাহত—জীবন্ত ঘর্ষ—  
মাখন ওঠে না কো—ঘুমায়। রোজ হলো খর।  
বাড়ীর লোকে অবাক—ভাবে, রকম কেমন-ধারা ?  
অবশেষে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো তারা।  
মাখন তবু ঘুমায়—সে ঘুম ভাঙ্গে না কার ডাকে !  
মেলে না চোখ—কয় না কথা—পেলো কি আজ তাকে !  
যত ডাকে, ছায় না সাড়া ! ছুটি নেছে খাটি—  
জাগবে ন', সে পাটেবে না আর—জ্বিরেন পরিপাটি।













